পার্থিব পদার্থের রূপ ও স্বরূপ

রবীন্দ্রনাথ মাইতি, সাহিত্যভারতী, এম. এ., ডি. ফিল.

যোগাযোগ ও প্রাপ্তিস্থান
তপতী পাবলিশার্স
৫।১এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
পঞ্চানন দাস,
৪।১ ভূকৈলাস রোড,
কলিকাতা-২৩

প্রথম প্রকাশ – মার্চ, ১৯৬৯

মূল্য—১৫·০০

মুদ্রাকর :
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য
ঠাকুর প্রেস
১২৪, অরবিন্দ সরণী,
কলিকাতা-৬

যাঁদের মানস ও মননে বস্তুপ্রকৃতির দ্বন্দ্ব-মিলন স্পষ্ট হয়ে উঠছে-
সেই মহামানবের নামে এ গ্রন্থ নিবেদিত হল।

কৈফিয়ত

অপরাধ স্বীকার করি। গ্রন্থের পরবর্তী অংশের ভাষাকে আমি সম্ভবত জনসাধারণের জন্যে সহজ করে তুলতে পারিনি। প্রধান কারণ দুইটি। প্রথম, পাছে গ্রন্থ শেষ করতে না পারি, সেই ভয়ে তাড়াহুড়ো করা; দ্বিতীয়, আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব। শেষোক্ত কারণটি জোরাল। তারই ফলে অপ্রচলিত বা অল্পব্যবহৃত শব্দপ্রয়োগ, এবং জটিল বাক্যরীতি বা বক্রোক্তি প্রভৃতিকেই সুন্দর ভাষার নিদর্শন বলে আমাদের এক প্রকার সংস্কার জন্মে গেছে। এমন কি বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ঐরূপ ভাষা ব্যবহারের ফলে হয়ত যা বলতে চাই, তা ঠিকমত বলাও হয় না। কিংবা, তাতে হয়ত লেখকের মনের ভাবটি কিছু পরিমাণে পালটেও যায়। কিন্তু তবুও আমরা ঐরকম শব্দাদি প্রয়োগের লোভ দমন করতে পারি না। নিজেদের অজ্ঞাতেই মনে করে বসি যে, ভাষার সৌন্দর্য বা মূল মর্মটি সম্ভবত যথাযথ ভাবপ্রকাশের উপর নির্ভর করে না, সেটি নির্ভর করে বিদ্যাবত্তা জনিত দুর্বোধ্য প্রকাশভঙ্গির উপরেই। সুতরাং দীর্ঘকাল যাবৎ, এবং বংশানুক্রমে, এ-রকম মনে করতে করতে কঠিন ভাষা প্রয়োগ করবার বাসনাটি এক দৃঢ় সংস্কার হয়ে আমাদের প্রভাবিত করে চলে,—তখন কেবলমাত্র কিছু সংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তির বোঝার মত ভাষা ব্যবহার করতে না পারলে যেন আর আমাদের কৃতিত্ব প্রকাশ পায় না। অথচ শিক্ষার উদ্দেশ্যই হল, যা শিখি, তাকে যথাসম্ভব বেশির ভাগ লোকের কাছেই পৌঁছে দেওয়া। ভাগ করে ভোগ করার মধ্যেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির সার্থকতা। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে বোঝা যায়, অনেক সময়ই কঠিন করে লেখা হয় কেবল অজ্ঞতাকে ঢাকার জন্য নয়, সত্যকেও ঢেকে রাখবার জন্য।

পাঠ্যাবস্থায় নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সামান্য একটু বিজ্ঞান পড়েছিলাম। তার ফল হয়েছিল এই যে, সভয়ে বিজ্ঞানশিক্ষার পথ বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। কিন্তু পঁচিশ বছর আগে, রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়' পড়ে একটি নূতন আলো দেখলাম। কিছু পরে তাঁরই প্রবর্তিত 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' গ্রন্থমালার অন্তর্গত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের লেখা 'বিশ্বের উপাদান' গ্রন্থখানি পড়ার পর বিশ্বের বস্তুগত ভিত্তি ও মূল সত্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তবুও পরবর্তী প্রায় তেইশ বছর যাবৎ ঐ আগ্রহকে বাঁচিয়ে রেখেছিল তারাই। তবে জীবনযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পড়তে ক্রমেই কয়েকটি প্রশ্ন যেন ঐ আগ্রহটিকে পর পর আরও জোরদার করতে থাকে। প্রথম

প্রশ্ন : যুক্তির আলো দিয়ে দেখতে হলে, সত্যকে বস্তুগত সত্য বলে ধরে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ আছে কি? দ্বিতীয় প্রশ্ন : বিজ্ঞানের উচ্চ ডিগ্রি লাভ করেও ছাত্রেরা অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন কেন? তৃতীয় : যুক্তিতে আদৌ টেকেনা, পাঠ্যগ্রন্থের এমন বহুবিধ বিষয়কে প্রকৃত সত্য বলে পড়িয়ে কি আমরা তথাকথিত শিক্ষকরাই ছাত্রদের সরল ও স্বচ্ছদৃষ্টিকে যুক্তিপূর্ণ সত্য বস্তু বা সত্য ঘটনার দিক থেকে ফিরিয়ে রাখি না? —কিন্তু এখানে ও ঐ পর্যন্তই। সংসার ও সমাজজীবন কঠিন হয়ে উঠল। যা জানলাম, তা জানিয়ে দিতে ভয় পেলাম। অপরাধী হলাম।

বছর চারেক আগে সাহিত্য সংক্রান্ত একটি গবেষণার কাজে বহুদূর এগিয়ে গিয়ে বুঝলাম যে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সম্বন্ধে একটু প্রাথমিক জ্ঞান না থাকলেই নয়। ঐ নিয়েও কিছুদূর এগিয়ে দেখলাম, কিছু বিজ্ঞানশিক্ষা অপরিহার্য। বাহ্যত ভিন্ন মনে হলেও, প্রকৃত জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলির প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। প্রসঙ্গক্রমে, আমি আমার বর্তমান গ্রন্থবর্ণিত দু' একটি বিষয়ের পুনরুক্তি করছি। মেন্দেলিয়েভের পর্যায়িক ছক সংক্রান্ত একটি তত্ত্বগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় লিখেছি (পৃ. ৭৫) :

> তাই বহুকে না জানলে এককে জানা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। সাহিত্যশিক্ষা তাই ভণ্ডামির নামান্তর হয়ে যেতে পারে, যদি তার সঙ্গে ইতিহাস-শিক্ষা, দর্শন-শিক্ষা, বিজ্ঞান-শিক্ষাদির যোগ না ঘটিয়ে দেওয়া যায়, ঠিক যেমনভাবে বিজ্ঞানশিক্ষাও ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে,—ইতিহাস, দর্শন বা সাহিত্যাদি শিক্ষার সঙ্গে তার মিলন না ঘটিয়ে দিলে। কিংবা, জীববিদ্যার মূল্য কতটুকু, যদি তার সঙ্গে রসায়নবিদ্যার যোগ না থাকে ; রসায়নশাস্ত্রই বা কোন্ সার্থকতা আনবে, পদার্থবিদ্যার সহযাত্রী না হয়ে? অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি,—বিচ্ছিন্নভাবে এদের এক একটির সার্থকতা বা উপযোগিতা কতটুকুই বা?

যতদূর মনে হয়, এক অপরিবর্তিত খণ্ডিত দৃষ্টিই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে খোঁড়া করে রেখেছে। এইজন্যই শিক্ষক ছাত্র নির্বিশেষে আমরা সকলেই এমনভাবে প্রকৃত বা বাস্তব সত্যের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ি, জনসাধারণও 'হাস্যাস্পদভাবেই দুর্বল, বিশ্বাসপ্রবণ ও সন্দিগ্ধ, সন্দেহপরায়ণ ও সংস্কারাচ্ছন্ন, সাহসী অথচ ভীতসন্ত্রস্ত' হয়ে পড়েন। শতাধিক বর্ষ পূর্বে মনীষী ফ্যারাডে এই রকম সত্যবিমুখ ব্যক্তিদের সম্বন্ধেই অভিযোগ উত্থাপন (পৃ. ১৪৩-৪৪) করেছিলেন 'বিজ্ঞাত শক্তিগুলিই ঘটনার কারণ নির্দেশে সমর্থ কিনা, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অনুধাবন না করেই যাঁরা ঘটনার ফলাফলকে কোনও অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবজাত বলে কল্পনা করে নেন, অথবা যাঁরা বিচারবুদ্ধিকে স্থগিত রেখে

ফলাফলকে অতি সহজেই কোনও পৈশাচিক বা অপ্রাকৃত শক্তির খেলা বলে সিদ্ধান্ত করে নেন, অথবা একবারও ভেবে দেখেন না সে কর্মবিধি নির্ণয়ের ব্যাপারে তাঁরা আদৌ যোগ্য বা বিজ্ঞ নন।' তিনি বলেছিলেন :

> আমার মনে হয় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই চরম গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব সম্বন্ধে এমন একটা মস্ত বড় ত্রুটি থেকে যাচ্ছে যে তার ফলেই সমাজমানস এ রকম অবস্থায় তাড়িত হয়ে এসেছে।

এই প্রসঙ্গে আমি সেখানে উল্লেখ করেছি :

> বিজ্ঞানের আলোকগঙ্গা মানবমনের ভূগর্ভে উচ্ছ্বসিত হয়ে তার সুপ্ত চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে চাইছে, অথচ আলোক বিতরণের দায়িত্ববহনকারী শিক্ষাব্যবস্থাই সেই জ্যোতির্ময় সত্তার পথরোধ করে দিয়ে সমাজমানসকে সে সম্বন্ধে অজ্ঞ রেখে তাকে বিকৃত করে তুলছে।

বস্তুত পক্ষে, শিক্ষাক্ষেত্রের এই খণ্ডিত ব্যবস্থার সংশোধন না হলে, শিক্ষিত সাধারণের কাছ থেকে বিচারবোধের দ্বারা আলোকিত স্বচ্ছ দৃষ্টি আশা করা চলেনা। সেজন্য মনে হয় উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্য-ইতিহাস-সমাজনীতি প্রভৃতি নিয়ে 'আন্তর্বিষয়ক-সম্পর্ক' (Inter Subject Relations) নামে কয়েকটি পৃথক পাঠ্য বিষয় প্রবর্তিত হওয়া উচিত। তাছাড়াও, সেখানে এক একটি মূল বিষয়ের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কিত বিষয়গুলি (Inter Related Subjects) নিবিড়ভাবে যুক্ত করে দেওয়া একান্তই প্রয়োজন। বিশেষত, সত্যসন্ধান বা গবেষণার ক্ষেত্রে একথা অপরিহার্য। অথচ বর্তমান গ্রন্থ প্রস্তুতের জন্য অত শত লেখাপড়া করে মূল কাজ এগিয়ে নেওয়ার পরিবেশ আমার ছিল না। বরং, তখনকার পরিবেশের আক্রমণাত্মক হিংস্র প্রতিরোধটি ছিল দুর্বার। কিন্তু তখন স্বামী বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ে,—চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কর্মই সম্পাদিত হয় না। অপরাধের বোঝা আর না বাড়িয়ে ঐ মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যেই আমার অতি সামান্য শক্তি নিয়ে যতটুকু সম্ভব, পড়া ও লেখার কাজ আরম্ভ করলাম।

'৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাজ আরম্ভ করে অনুসন্ধান আর জানার কাজেই ব্যস্ত থাকতে হয়। যথাসম্ভব বেশি মানুষকে জানাবার কথাটি ভুলে যাইনি। কিন্তু সম্ভবত জাহির করার সংস্কারটিরও কখন এসে গেল। প্রকৃত পক্ষে, আমার এ কাজ যে কোন্ জাতীয়, তা স্থির করে নেওয়াই শক্ত ছিল। দর্শনের কাজ সত্যকে অনুসন্ধান করে দেখা, সেটি বিচারমূলক। বিজ্ঞানের কাজ সত্যকে যাচাই করে প্রমাণ করা, সেটি পরীক্ষা ও

সৃষ্টি-মূলক। সাহিত্যের কাজ সত্যকে জানিয়ে বা দেখিয়ে দেওয়া, সেটি জ্ঞাপন- বা প্রদর্শন-মূলক। সুতরাং দর্শন ও বিজ্ঞান যেমন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, এবং একটি ব্যতিরেকে অন্যটি ভ্রান্ত বা অচল হয়ে যেতে পারে, তেমনি সাহিত্যও দর্শন-বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল না হলে কোনা না কোনো সময়ে তা কাণা-গলিতে পড়ে যেতে বাধ্য। কারণ, সাহিত্যশিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞানাদির সংশ্রব না থাকলে সাহিত্য যে কোন্ বস্তুর পরিচয় জ্ঞাপন করেছ তার বিচার করবে কে? সে রকম কোনো উপযুক্ত বিচারক না থাকলে সাহিত্যিক মনে করেন,—তিনি যা বলেন তা'ই সত্য, তাঁর ওপর আর কারও কিছু বলার নাই; কারণ, তিনি সত্যকেই প্রকাশ করছেন, দর্শন-বিজ্ঞান শাস্ত্রে যদি সে সত্যের সাক্ষাৎ না মেলে তো ক্ষতি নেই, কারণ দর্শন-বিজ্ঞানের সত্য হয়ত বস্তু-সত্য, কিন্তু সাহিত্যিকের সত্য ভাব-সত্য, ভাবুক না হলে অন্যে তা বুঝবেন না, বোঝার অধিকারও অন্য কারও নাই; সুতরাং সাহিত্যিক তাঁর ঐ 'অকাজের সহস্র সঞ্চয়ে' এগিয়ে চলবেন। এরও ফল হয় এই যে, জগতে কাজের লোকেরা এ দিয়ে কার্যসিদ্ধি করে নেন। বস্তুসম্পর্কহীন অলৌকিক সত্যের পানে জনসমাজকে আঙুল দেখিয়ে দিয়েও আর তাঁরা যে কাজ সেরে নিতে পারছেন না, নতুন ঐ ভাব-সত্যের দোহাই তুলে তাঁরা সে কাজ সহজেই সেরে নেন; সাহিত্যিকেরা জয়মাল্য 'পুরস্কার' পেয়ে বগল বাজিয়ে বাড়ি ফেরেন। তারও পরের ফলটি হয় যে, সাহিত্যিকের সংখ্যা বিপুল হয়, এবং কাজের সাহিত্যিকও দেখা দেন, যাঁরা একই সঙ্গে কাজের কাজ অর্থাৎ নিজের কাজ সেরে নেন, এবং ভাবুক-সাহিতিকের অকাজের কাজকে উৎসাহিত করে অ-সাহিত্যিক কাজের-লোকেরও কাজ করে দেন। এঁরা সকলেরই কাজের সুবিধে করে দিয়ে সাহিত্যের কাজটিকে সহজ করে আনেন। কিন্তু দর্শন-বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞাপন- বা প্রদর্শন-মূলক সাহিত্যের কাজ কি করে অত সহজ হবে?

অনুসন্ধান আরম্ভ করেই তাই কাজের গুরুত্ব কিছুটা উপলব্ধি করলাম। বুঝলাম যে, মানুষ সত্যকে সন্ধান করবার জন্য প্রধানত দু'টি পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে,—(১) বস্তুর বস্তুত্বটি বাদ দিয়ে তার ভিতরকার অদৃশ্য স্বরূপ বা সত্যকে গ্রহণ করার পদ্ধতি; (২) বস্তুত্বের মধ্যেই সত্যকে দেখবার পদ্ধতি। প্রথম পদ্ধতি অনুযায়ী, সার্বজনীনভাবে মানুষ বস্তুত্ববিহীন কোনও শক্তি বা সত্যের সন্ধান লাভ করতে পারে নি; অথচ ঐ পন্থায় যদি সত্য কখনও না মেলে এবং এ বিষয়ে চিরকালই ব্যর্থ হতে হয়, তবুও কোনো কোনো মানুষ বস্তুত্বকে স্বীকার করতে চান না। আসলে কিন্তু এই সব মানুষ নাস্তিক; যদি বাস্তবিকভাবেই অকপট অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে সত্যের নামই বস্তুত্ব, তাহলে এঁরা কিন্তু সে সত্যকে সহ্য করবেননা। আর দ্বিতীয় পন্থা অনুযায়ী, বার বার অকপট-

ভাবে মানুষ বিশেষ কোনো পৃথক শক্তি বা গুণবিহীন ('নির্গুণ') কোনও বস্তুর সন্ধান না পাওয়ায়, কোনো কোনো ব্যক্তি বস্তু এবং তার গুণ বা শক্তিকে একই সমগ্রসত্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সম্ভবত এইটিই আধুনিক উদার বৈজ্ঞানিক পন্থা। যাঁরা এই পথে চলেন, তাঁরাই যথার্থ সত্যকাম, সত্যবিশ্বাসী, তাই যথার্থ আস্তিকও। বিশেষ কোনো পূর্ব ধারণা বা কল্পনার বশবর্তী হয়ে তাঁরা সত্যকে কোনো ভাবসত্য বা কোনো ফরমাশী তৈরী-বস্তু হিসাবে দেখতে চাননা। বিশ্বসত্য যেমন আছে, অভিপ্রেত না হলেও তাকে তাঁরা তেমন ভাবেই স্বীকার করতে চান।

কিন্তু পথটি স্থির করে নিলেও আমার কাজের দুরূহতা এইখানে যে, অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের কোনো আবিষ্কার এবং তজ্জনিত সত্যকে বুঝতে বা বোঝাতে হলে পূর্ববর্তী বহুবিধ আবিষ্কার সম্বন্ধেই অবহিত হতে হয়; অথচ, সাধারণত দেখা যায় যে, বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের ইতিহাসের গ্রন্থকারগণ প্রধানত বিদ্যালয়ে পাঠরত বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্যই 'পাঠ্যগ্রন্থ' প্রস্তুত করে থাকেন। তৎসত্ত্বেও, সব জায়গায় ঐসব গ্রন্থের দুর্বোধ্যতার দোহাই দিলে আমার কাজ চলবে কী করে? তবে আমার কাজের একটু সুবিধেও এই ছিল যে, এ-গ্রন্থ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোনো মৌলিক গবেষণার বা কোনো প্রামাণিক ইতিহাসের, বা বর্তমান ব্যবস্থার অন্তর্গত কোনো বিদ্যায়তনের অবশ্য-পাঠ্য গ্রন্থ নয়। তাই আকর-গ্রন্থগুলি থেকে প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি আহরণ করবার সময় তাদের কিছু সাজ-পোষাক পরিয়ে নতুন ভাবে সাজিয়ে, কিংবা অল্প কিছু ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে পুরানো সাজসজ্জা সমেতই তাদেরকে গ্রহণ করতে পেরেছি। সেগুলিকে ভিত্তি করে যেসব তাত্ত্বিক বা দার্শনিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, তার বহু অংশও হয় পুরানো, না হয় পুরানো তত্ত্বকে নতুন ভাবে বলা। কিন্তু সম্ভবত কিছু অংশও আবার বর্তমান গ্রন্থকারের চিন্তা-ভাবনারই ফল বিশেষ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, আলো যে একটি সুনিশ্চিত পদার্থ (পৃ. ২৮২, ৪৩২), ভর ও তেজের দ্বন্দ্বাত্মক মিলনের ফলেই যে আলোরশ্মির স্বয়ংক্রিয়মাণতা জনিত ত্বরিত গতি (পৃ ৪৩৫-৩৬), কিংবা, মস্তিষ্ক সমেত মানুষের এই দেহ আর তার জীবন যে ভর-তেজরই যন্ত্র-যন্ত্রী প্রক্রিয়া প্রসূত এক মহাসংগতি (পৃ. ৪৩১-৪৫), কিংবা, শক্তিক্ষেত্রের উপাদানও যে ভরতেজোময় মূল পদার্থ মাত্র (পৃ.৩৪২-৪৫, ৪৩৬-৩৯),—এসব কথা বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত পদার্থতত্ত্বগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতেই মনে এসেছে। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের অন্য প্রমাণাদি কিছু আছে কিনা জানি না। আবার বহুস্থলে ইতিহাস-লেখকগণ কেবল তথ্যপঞ্জী দিতে গিয়ে সূত্র রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি বলে অনুমান করেই অনেক ফাঁক আমায় পূরণ করে নিতে হয়েছে। অত্যন্ত দুঃসাধ্য বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব হওয়ায় সেসব অনুমান কোথাও কোথাও ভ্রান্ত হতে পারে। কিন্তু তবুও কিছুটা

দুঃসাহস প্রকাশ করেছি এইজন্য যে, গ্রন্থ-প্রকাশের পর সহৃদয় পণ্ডিত ব্যক্তিরা নিশ্চয় সহানুভূতি দিয়ে আমার সে সব ভ্রান্তি নিরসন করে দেবেন। আমার উদ্দেশ্য, যা ভাবি, বা যেমন করে ভাবি, তা যদি বিজ্ঞানভাবনার অনুরূপ হয়, তাহলে তা যেন অন্যকেও জানিয়ে দিতে পারি। তবে কোনওভাবে সার্থক হোক বা না হোক, বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়কে গণবোধ্য ভাষায় প্রকাশের প্রযত্নটি আদৌ সংগত হবে কিনা, সে সম্বন্ধে ভয়ও ছিল। কারণ, সুদীর্ঘ ২২।২৪ বছরের মধ্যেও 'বিশ্বপরিচয়ের' মত এদেশে প্রকাশিত আর কোনো গ্রন্থ চোখে পড়েনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একাজ প্রায় শেষ হয়ে আসার পর কয়েক মাস (এখ ন থেকে ৭।৮ মাস) আগে আশ্বাসের বাণী খুঁজে পেলাম। 'The Evolution of Physics'-গ্রন্থে আইনস্টাইন এবং ইনফেল্ড্ জানিয়ে গেছেন :

> Most of the fundamental ideas of science are essentially simple, and may, as a rule be expressed in a language comprehensible to everyone.

অর্থাৎ,

> বিজ্ঞানের প্রাথমিক ও আবশ্যক তত্ত্বগুলির অনেকাংশই মূলত সরল এবং সেগুলিকে সর্বজনবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করা যেতে পারে।—

কিন্তু কতকগুলি দুর্বিপাকের মধ্যে পড়ায় তখন আমি তাড়াহুড়ো করে গ্রন্থ শেষ করতে চলেছি।

কিন্তু ঐসব অনিবার্য কারণের জন্য গ্রন্থের কাজ শেষ করতে পারব কি না, সেজন্য সর্বক্ষণই উদ্বিগ্ন ছিলাম। হঠাৎ যদি কোনো আকস্মিক বিপদ এসে পৌঁছোয়, বা কোনো চূড়ান্ত দুর্ঘটনা ঘটে যায়,—এসব ভয় নিয়তই অস্থির করে তোলায় তাড়াতাড়ি কোনো রকমে গ্রন্থ শেষ করতে চেষ্টা করেছি, ভাষা কিভাবে সর্বজনবোধ্য হয়, সেদিকে যথাশক্তি নজর দিতে পারিনি। অথচ আর একটি চিন্তাও বার বার পীড়া দিয়েছে যে, সামন্তযুগীয় 'গুহ্য'-বিদ্যার গুরুবাদ ধ্বসে পড়েছে,—সে কি তার জায়গায় বিজ্ঞান-চিন্তার পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ? মধ্যযুগে গুরুরা তাঁদের বিদ্যাকে 'গুহ্য' বা গোপন করে রাখতেন। অত্যন্ত অল্প কয়েকজন শিষ্য ছাড়া সর্বসাধারণের কাছে তাঁরা তাকে কিছুতেই প্রকাশ করতে দিতেন না। তার একটি প্রধান কারণ ছিল, সেটি সকলের কাছে প্রকাশিত হয়ে গেলে খুব শীঘ্রই ধরা পড়ে যাবে যে, সেটি আসলে অবিদ্যা বা কুবিদ্যাই। সেক্ষেত্রে, গুরুরা সমাজকে ধাপ্পা দিয়ে, বহু মানুষকে শোষণ করে, ব্যক্তিগতভাবে ও বংশানুক্রমে সেই শোষণ করা পুঞ্জীভূত সম্পদ বা বিশেষ সুবিধাগুলি আর তাহলে ভোগ করতে পারবে না। কিন্তু যেভাবেই হোক না কেন, হাজার হাজার বছরের সেই দীর্ঘ-প্রচলিত গুরুবাদ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান বা বস্তুজ্ঞান যদি যথার্থজ্ঞান হয়ে থাকে,

তাহলে সার্বজনীন হয়ে যেতে তার ভয় কিসের? বস্তুত পক্ষে, সেই জ্ঞান সার্বজনীন হয়েই নিশ্চিত প্রমাণ দিতে পারে যে তা মিথ্যা নয়, তার মধ্যে কোনো ফাঁকি নাই, তা' প্রকৃত সত্যই। অপরপক্ষে, বস্তুবিবর্তনের ফলে প্রকৃত সত্যও আপনিই বিবর্তিত হয়ে চলেছে, এবং তার ধর্মই আপনাআপনি প্রকাশ পাওয়া। সুতরাং প্রকৃত সত্যের জ্ঞানকে সংকীর্ণ কোনো গণ্ডীতে পুঞ্জীভূত করে রাখার সকল প্রযত্নও গুরুবাদের ঐ পূর্বোক্তরূপ পরিণতির মতই ধুলিসাৎ হয়ে যেতে বাধ্য। তাই যতটা সম্ভব প্রমাদবিহীন ও নিশ্চিত-ভাবে যা শেখা যায়, তা যত সামান্যই হক না কেন, তাকে সর্বজনের কাছে পৌঁছে দেওয়াই শিক্ষাবিদের সব চাইতে বড় কাজ। যথার্থ সভ্যতা গঠনে সেইটিই তাঁর সর্বাপেক্ষা পুণ্য কর্ম। সে কাজে এতটুকু মাত্র সাহায্য করতে গিয়েও যে সম্ভবত অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়েছি, অপরাধমূলক সেই গ্লানি আজ বহন করতে হচ্ছে। কিন্তু তবুও গ্রন্থপাঠ বিষয়ে আমার পাঠকবর্গের দরদী প্রচেষ্টা হয়ত আমার উদ্দেশ্যকে কিছু পরিমাণেও সফল করে তুলতে পারে,—এই আশায় আকুলভাবেই উন্মুখ রইলাম।

৪।৪।'৬৭

গত ৪ঠা এপ্রিল আমার এই 'কৈফিয়ত'-ভাগের উপরোক্ত অংশটি শেষ করার প্রায় দেড় মাস পরে মে মাসের ১৫ তারিখে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার একটি সংবাদ আমার চোখে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ তারিখে। কিন্তু ঐ মাসের প্রথম দিক থেকে আরম্ভ করে ১৩ তারিখের মধ্যে বর্তমান গ্রন্থের প্রথম দু'টি পরিচ্ছেদ লেখা শেষ হয়েছিল। তবে সমগ্র গ্রন্থেই আমার যে একটি বিশেষ ধারণা অভিব্যক্ত হয়েছে, ঐ দু'টি অধ্যায়ের মধ্যে তার বিশেষ প্রকাশও ঘটেছে, সে সম্বন্ধে তিনটি উদ্ধৃত দিলাম :

(১)…এ পৃথিবীতে এই মন বস্তুটি প্রকৃতির এক আধুনিক সৃষ্টি, অভিনব সৃষ্টি সন্দেহ নাই, কিন্তু তাকে নিয়ে প্রকৃতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এখনও। [পৃ. ৭]

(২) বহুব্যাপ্ত সমাজের মধ্য থেকে একটি সার্বজনীন মানবসত্তাও সংহত হতে লাগল। [পৃ. ১৪]

(৩)…সকলেই মিলিত হয়ে গিয়ে যেন এক মহামানবসত্তার অভ্যুদয় ঘটিয়ে দিলেন।…স্বয়ং প্রকৃতি সেই বিরাট মনঃপদার্থকে সমগ্র বৈজ্ঞানিক-, তথা সমগ্র মানব-সমাজের ক্রমসংহত বস্তুদর্শন-ভাবনার মধ্য দিয়ে ক্রমোদ্ভূত করে চলেছেন। [পৃ. ৭৩]

গ্রন্থের পরবর্তী বহু স্থলে এসব কথা পল্লবিত এবং আরও জোরালভাবে ব্যক্ত হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ :

(১) পৃথিবীর উপর এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকা ভরতেজোময় মনঃ-পদার্থগুলি উপযুক্তভাবে সন্নিবিষ্ট বা সংস্থিত হলে ভর-তেজের স্বরূপ তো আর গোপন থাকতে পারে না।......সেই সন্নিবেশ নিয়ে যেন প্রকৃতির এক মহাপরীক্ষা চলছে। [পৃ. ৭৬]

(২) তাহলে বৈজ্ঞানিক মন কি সমাজ-মানসের এক অদৃশ্য ক্রমসংহত অবস্থা? পৃ. ৯৪]

(৩) বৃহৎ প্রকৃতি থেকে ক্রমোদ্ভূত হয়ে চলেছে বৃহৎ মানবসত্তা। [পৃ. ১৩৩]

(৪) তত্ত্ব, সত্য, বা জ্ঞানময় ব্রহ্মাণ্ডে মানবের অনুভবযোগ্য প্রথম জ্ঞানময় সত্তাই হল একটি মন। সে যেন চিন্ময়তার একটি একক। তাই একটি মনের মধ্যে এসে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেই মানবের কাছে কোনো বিশ্বতত্ত্ব বা বিশ্বসত্য বাস্তব সত্যে পরিণত হতে পারে। কিন্তু তত্ত্ববিবর্তনের ফলে এক অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া বশত তত্ত্বদেহেরও বিবর্তন ঘটে চলে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, তত্ত্বদেহরূপী সেই মনেরও ক্রমোবিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। ক্রমেই বহু মন একত্র হয়ে উঠছে, ব এক সূত্রে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে। তবে সেই একত্রিত মনটি হয়ত পূর্বোক্ত কারণে একটি মনের মাধ্যমেই বাস্তব হয়ে উঠেছে। নাহলে কোথা হতে ফ্যারাডে-ম্যাক্স্ওয়েল-হার্জের, স্তোলেতভ্-টমসন-প্ল্যাঙ্কের, টমসন-পয়েনকেয়ার-কাউফ্ম্যান-লরেঞ্জের, মাইকেলসন আর মর্লের সব প্রজ্ঞাধারা দুর্বার স্রোতে ছুটে এসে এক মহাসমুদ্রে হারা হয়ে গেল, আর অমনি একটি মনকে (আইনস্টাইনের মানসকে) অবলম্বন করেই বিশ্বতত্ত্ব বাস্তব সত্য হয়ে ফুটে উঠল! [পৃ. ২৯১]

কিন্তু এসব চিন্তার সূত্রপাত পূর্বে ঘটলেও বোঝা যাচ্ছে যে, সেগুলি ১৯৬৫ সালের ১৭-ই সেপ্টেম্বর তারিখেই বাস্তবভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছে। কারণ, পূর্বোক্ত সাপ্তাহিক পত্রে জানান হয়েছে যে, কয়েকজন বিজ্ঞানীর দ্বারা কয়েক বছর যাবৎ (৬ বছর ৯ মাস) সম্মিলিত প্রচেষ্টার পর ঐ ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে নানাবিধ মৌলিক উপাদানের সংযোগে এমন এক ধরনের প্রোটিন উৎপন্ন করা হয়েছে, যার জীবন্ত সত্তা বিদ্যমান এবং তা' অত্যন্ত সক্রিয়। প্রোটিন বস্তুটিই যে জীবনের ভিত্তিস্বরূপ, একথা বহু পূর্বেই বিঘোষিত হয়েছিল। ["Life is the mode of existence of protein bodies, the essential element of which consists in continual metabolic interchange with the natural environment outside them, and which ceases with the cessation of this metabolism bringing about the decomposition of the protein."—জীবনটা আর

কিছুনা, প্রোটিন-বস্তুর টিকে থাকবার একটি ধরন মাত্র। এর মূল রহস্য এইখানে যে, পরিবেশের প্রাকৃতিক পদার্থের সঙ্গে অনবরত আদান-প্রদান বা বিপাকের কাজ চালিয়ে এ বস্তুটি তার নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাখে (অর্থাৎ একই কালে পরিবেশ থেকে কিছু নিয়ে এবং পরিবেশের মধ্যে কিছু থুইয়ে দিয়ে সে তার নিজের মধ্যেই এক সঙ্গে সৃষ্টি ও ধ্বংসের কাজকে চালু রেখে দেহকোষের মধ্যে জীবনলীলা ঘটিয়ে তুলছে,—এরই নাম বিপাক। এভাবে কোষের মধ্যে যতদিন গ্রহণ-প্রক্রিয়াটি অধিকতর জোরালো থাকে, ততদিনই জীবদেহেরও বৃদ্ধি ঘটে; কিন্তু ক্ষয়ের মাত্রা বাড়তে আরম্ভ করলেই জীবনেরও ক্ষয়কাল আরম্ভ হয়ে যায়); কিন্তু সেই বিপাক ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলেই তার জীবন-ধারণ বা টিকে থাকার সেই ধরনটি আর থাকেনা (অর্থাৎ প্রোটিনের উপাদানগুলির সক্রিয় জোটটি তখন ভেঙে যায় এবং তার উপাদানগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারা তখন বস্তবগুলি নিষ্ক্রিয় মৌলিক উপাদান মাত্রে পরিণত হয়ে যায়।)]। কিন্তু প্রোটিন-বস্তুটি যে বাস্তবিকভাবেই জীবনের ভিত্তি স্বরূপ, পূর্বোক্ত ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত সক্রিয় দানাদার জীবন্ত প্রোটিন (ক্রিস্ট্যালাইন্ ইনসুলিন) সৃষ্টি করে সেই তথ্যকে সুপ্রমাণিত করলেন। কিন্তু তাঁরা এই সম্মিলিত উপাদান-জোট রূপ প্রোটিনকে যে সম্মিলিত প্রজ্ঞার দানা-বাঁধা সংহত রূপ বলেই ব্যাখ্যা করলেন (...the total synthesis of insulin is described as a crystallization of collective wisdom....,] তাতে হয়ত এই সমগ্র গ্রন্থটিই একটি ভূমিকার স্থান গ্রহণ করে রইল। কিন্তু এ ঘটনা মোটেই কোনো আকস্মিক বিষয় নয়। বহুব্যাপ্ত সমাজের মধ্য থেকে একটি সার্বজনীন বৃহৎ মানবসত্তা যে সংহত হয়ে উঠছে, 'পৃথিবীর উপর এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকা তরঙ্গেজোময় মনঃ-পদার্থগুলি' যে ক্রমশ সুসন্নিবিষ্ট হয়ে 'মহামানবমনের অভ্যুদয় ঘটিয়ে তুলছে, এবং অগণিত অবহেলিত ও নগণ্য মানুষের মনগুলিই যে একত্র হয়ে এই মহামানসকে উজ্জীবিত করে চলেছে, এ কেবল সেই সত্যকেই জানিয়ে দিল। কিন্তু আর একটি কথাও জানা গেল যে, মন যখন একক, তখন তার প্রকৃতি যাই হোক না কেন, মনগুলি যখন সুসন্নিবিষ্টভাবেই মিলিত বা একত্রিত, তখন সে মহামানবমন, অর্থাৎ গুণগতভাবেই একটি পরিবর্তিত সত্তা।

৩১।৫।'৬৭

১৯৬৭ সালের ৩১শে মে আমি উপরের ঐ পরবর্তী অংশটি (পৃ. এগার-তের) প্রস্তুত করেছিলাম। তারপর থেকেই গ্রন্থপ্রকাশের ব্যাপারেও শোষক-সভ্যতার দাঁতগুলি যেন চর্ম ও অস্থি ভেদ করে মজ্জা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে থাকে। বহুবিধ যাতনাকর পরিস্থিতি ও দুর্যোগের আরম্ভ হয়, এবং আজও তার বিরাম নাই। সবগুলি প্রুফই আমার

ছায়া দেখার সুযোগ না ঘটায় এবং সে কাজ অত্যন্ত বিশৃঙ্খলভাবে চলতে থাকায় বিভিন্ন শব্দের বানান সম্বন্ধেও শৃঙ্খলা বা সমতা রাখা সম্ভব হয়নি; মুদ্রণ এবং ব্লকের ব্যাপারেও দু' একটি মারাত্মক ভুল থেকে গিয়েছে। যেমন, ২৮৪ পৃষ্ঠার প্রথম পংক্তিতে '–৭'-এর জায়গায় '–১৭' ছাপা হয়েছে এবং ৩৩৮ পৃষ্ঠার ব্লকে + এর জায়গায় –, এবং - এর জায়গায় + হয়ে গিয়েছে। এসব ঘটনা কিন্তু প্রায় আমার আয়ত্তের বাইরেই ছিল। গ্রন্থের তথ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিষয়ে ভুলভ্রান্তি থাকাও অসম্ভব নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি এর মধ্য দিয়ে ক্রমেই সত্যসন্ধানের ক্ষেত্রে কোনো নতুন ও নিপুণ পদ্ধতি গড়ে উঠতে পারে নিজেকে ধন্য মনে করব।

গ্রন্থের ছবিগুলি (প্রচ্ছদ নয়) এঁকে দিয়েছে আমার একান্ত স্নেহভাজন ছাত্র কিশোর কোণার। ইতি।

বিনীত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মাইতি

২৫।৩।'৭১

সূচীপত্র

পরমাণুর পদধ্বনি

বিপুল এ বিশ্ব; বিচিত্র এ বসুন্ধরা! চোখ ডানা মেলে আকাশে ওড়ে—বাধা পায় না কোথাও। জলজলে তারাগুলি ছাড়া সবই তো শূন্য, মহাশূন্য। আর পৃথিবীর পানে তাকালে? সর্বত্রই বাধা, বস্তুর বৈচিত্র্য। ঐ বিপুল একত্ব, আর এই বিপুল বৈচিত্র্য—এত পার্থক্য কেন? না, একি একই মহাসত্যের কেবল দুটি দিক মাত্র? বিম্ব আর প্রতিবিম্ব, ছবি আর প্রতিচ্ছবি, ধ্বনি-প্রতিধ্বনি?

কী সে মহাসত্য; বিশ্বব্যাপ্ত কোন্ তথ্য সে! হাজার হাজার বছর আগে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়েছে মানুষ; উত্তর পায়নি। বিমূঢ় মানবাত্মা মাটির পানে চোখ ফিরিয়ে উৎসুক হয়েছে যথার্থ উত্তর মিলবেনা কি? অসীম আকূতি, অসংখ্য জিজ্ঞাসা। কিন্তু সদুত্তর কই? সব প্রশ্নধারা বার বার শেষে ঐ একই মহাজিজ্ঞাসায় এসে মিলিত হয়—বিপুল বিশ্বের ঐ অনন্ত একত্বের মাঝে এই পৃথিবী কি একান্তই একক, আর খাপছাড়া? না, তারও এই অসংখ্য বৈচিত্র্য, ঐ একত্বের কোনো লুকানো মহাসূত্রে গ্রথিত? অসংখ্য বস্তু, আর অসংখ্য তার ধর্ম। তারা কি ঐ মহাবিশ্বের কোনও অদৃশ্য পদার্থসত্তা থেকে উদ্ভূত বুদ্‌বুদ্ মাত্র—যেমন ঐ সুদূর আকাশের তারাগুলি? আকাশ-পরিব্যাপ্ত কোন্ সে পদার্থধারা সংহত হয়ে এসে একদিন এই ধরিত্রী রূপে ফুটে উঠল? কোন্ সে উপাদান বা উপাদানমালা—যা দিয়ে গড়ে উঠেছে এত রঙ, এত আলো; ধরিত্রী-জঠরে লুকানো এত সোনা, এত মানিক—সাদা আর কালো?

পার্থিব বিচিত্র বস্তুরাজির মূল উপাদান তাহলে কি? কী তাদের স্বরূপ? এ নিয়ে তাই প্রাচীনকালেই মানবমনে প্রশ্ন জেগেছে। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন ভাবে। সব চাইতে পুরানো সংবাদ পাওয়া যায় চীন দেশ থেকে। এখন থেকে প্রায় চার পাঁচ হাজার বছর আগেই সে দেশের লোকেরা জগতের মূল উপাদান হিসাবে পাঁচটি বস্তুর কথা ভাবতেন আগুন, মাটি, জল, কাঠ আর বাতাস। ভারতের এক ঋষিও এ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন খ্রীষ্টজন্মেরও কয়েক শ' বছর আগে। তাঁর উপাধি ছিল কণাদ, এবং তিনি এই নামেই পরিচিত। এখন থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্ববর্তী কোনও সময়ে তিনি

ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে 'বৈশেষিক' নামে দর্শনশাস্ত্র রচনা করেন। তাতেই তিনি প্রসঙ্গক্রমে উক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে প্রকৃত তত্ত্ব (বা ঈশ্বর তত্ত্ব) জানতে হলে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়—মূলত এই ছ'টি বিষয় জানা দরকার। কারণ, এদেরই সংযোগে বা সমবায়ে অন্য সব জিনিসের সৃষ্টি। এদের মধ্যে গুণ ও ক্রিয়ার আশ্রয় যে পদার্থে থাকে তারই নাম দ্রব্য। ক্ষিতি বা মৃত্তিকাও একপ্রকার দ্রব্য। এ দ্রব্যের দুটি বিভাগ—নিত্য আর অনিত্য। ক্ষিতির ক্ষুদ্রতম কণিকার নাম পরমাণু। এই পরমাণু নিত্য পদার্থ, অর্থাৎ এর উৎপত্তি বা বিনাশ নাই। এই চিরন্তন মূল কণিকাগুলি মিলিত হয়ে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ক্ষিতিজ বস্তুর সৃষ্টি করে। দুটি পরমাণুর মিলনে যে সমবায় গঠিত হয় তার নাম 'দ্ব্যণুক' (দ্বি+অণুক), তিনটি দ্ব্যণুকের মিলনে হয় ত্রসরেণু। এই ত্রসরেণু থেকেই ক্রমশ স্থূল বস্তুরাজির উৎপত্তি।

অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক'ণকার সমবায়ে যে বস্তু জগতের উৎপত্তি, এ রকম ধারণা সম্ভবত প্রাচীনকালে এশি·। থেকেই পূর্ব ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে ; বিশেষ করে গ্রীসদেশে। সেখানেও বস্তুজগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার দার্শনিক ভাবনা একত্র হয়ে কণিকার তত্ত্ব বা কণিকাবাদকে যেন আরও দৃঢ় করে তুলেছে। সেখানকার দার্শনিক চিন্তা আরম্ভ হয় অবশ্য বহু পূর্বে। গ্রীসের একটি উপনিবেশের (যেখানে বহু লোক উঠে গিয়ে বসবাস করে এবং হয়ত পরে তারা সেখানে রাজ্য স্থাপনও করে) নাম ছিল মিলেটাস। সেই মিলেটাস নামক স্থানের অধিবাসী এবং গ্রীক-দর্শনের জনক দার্শনিক থালেসের (Thales—640-546 খ্রী. পূ.) মতে জলই জগতের আদিম উপাদান। কারণ জলের মধ্যেই নিহিত (গুপ্তভাবে রক্ষিত) আছে গতিশক্তি। আর অন্য বস্তুকে ভিজিয়ে দেওয়ার ক্ষমতাযুক্ত এই জল থেকেই জীবনের সৃষ্টি। কিন্তু মিলেটাসের আর এক দার্শনিক অ্যানাক্সিমাণ্ডার (Anaximander —আনুমানিক 611-545 খ্রী. পূ.) মনে করতেন যে কোনো সসীম পদার্থের দ্বারা এত অসীম প্রকারের বিচিত্র বস্তুর উদ্ভব হতে পারে না। একটি কোনও অসীম বস্তু থেকে উষ্ণতা ও শীতলতা নামক দুটি বিরুদ্ধ গুণের সৃষ্টি হয়েছে। তাদেরই সংঘর্ষের ফলে জল, এবং তা' থেকেই পৃথিবী এবং প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে। প্রথম প্রাণী মৎস্য, ক্রমে ক্রমে মানুষাদি। অ্যানাক্সিমেনিস্ (Anaximenes—560-500 খ্রী. পূ.) নামে আরও একজন মিলেশীয়ান (মিলেটাসের অধিবাসী) পণ্ডিত কিন্তু তাঁর পূর্বোক্ত স্বদেশবাসী উভয় পণ্ডিতের ঐ দুটি মতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে বলেছিলেন, আদিম উপাদানটি অসীম হলেও তা' অজ্ঞাত থাকতে পারে না। সুতরাং সে পদার্থটি হচ্ছে মরুৎ বা বায়ু, এবং বিশেষ দুটি প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তা' থেকে

অন্যান্য বস্তুর উদ্ভব। হাল্কা হয়ে গিয়ে সেই মরুৎ আগুনে পরিণত হয়, আর ঘন হলেই বাতাস, মেঘ, জল, মাটি ইত্যাদি।

সমসাময়িক দার্শনিক পাইথাগোরাসের (Pythagoras—580 ?-500 ? খ্রী.পূ.) মত ছিল সংখ্যা থেকেই জগতের উদ্ভব। তাঁর অনুগামীরা বলেছেন সসীম তেজ বা অগ্নি, এবং অসীম মরুৎ—এই মূল উপাদানদুটির মিলন বা সমবায়েই এসেছে সৃষ্টির প্রথম প্রেরণা। তার ফলেই পুঞ্জীভূত এক রূপ ভেঙে হল দুই ; ক্রমে ক্রমে সংখ্যা-বৃদ্ধি হয়ে অসংখ্য।

ইলিয়াবাসী জেনোফেনিস্ (Xenophanes —570-480 খ্রী. পূ.) বহুদেববাদের (বহু দেবতা বর্তমান আছেন, এই মতবাদের) পরিবর্তে গ্রীসদেশে একেশ্বরবাদের (ঈশ্বর এক, এই মতবাদের) প্রচলন করেছিলেন। একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে তিনি তাঁর অভিমতটি বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে মানুষের সংখ্যা অসংখ্য বলে তারা দেবতাকে অসংখ্য মনে করে, ঠিক যেমন ষাঁড়ের হাত থাকলে সেও দেবতাকে ষাঁড়রূপেই আঁকত। পার্মেনাইডিস্ নামে আর এক ইলিয়েসীয় (ইলিয়াবাসী) পণ্ডিত জগতের সকল প্রকার বস্তুর মূলে যে অস্তিত্ব বিরাজ করছে তাকেই একমাত্র সত্তা বলে ধরে নিলেন। সমস্ত বস্তুর অস্তিত্বকে মিলিয়ে যে চিরন্তন সত্তা, তা কখনও পরিবর্তিত হয়ে বহু হতে পারে না। বহুর ধারণা মানুষ বা তার ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টিমাত্র। তাঁর শিষ্য ইলিয়ার আর এক দার্শনিক জেনো (Zeno) গুরুর মতকেই বিকশিত করে তুলেন।

কিন্তু হেরাক্লিটাস (Heraclitus—536-470 খ্রী. পূ.) বললেন সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। গতিই আদিম পদার্থ, তারই রূপ তেজ বা অগ্নি,—সরলরেখায় তা চলে না, এবং দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই তার প্রকাশ। অগ্নির ঊর্ধ্বমুখী আর নিম্নমুখী দুটি আবেগ আছে। সে দুটির সংঘর্ষেই পার্থিব সকল বস্তুর উৎপত্তি। আবার এই সংঘর্ষও একটি চিরন্তন নীতির (Destiny, Justice, Logos বা Reason) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা চালিত। সেইজন্যই প্রকৃতির মধ্যেও একটি সংগতি বর্তমান। এবং এই কারণেই সমাজ-জীবনের মধ্যে সংঘর্ষ বা অশান্তি, এবং সাম্য বা শান্তি বিরাজ করছে।

আদিম পদার্থের বিনাশহীনতা এবং বস্তু জগতের পরিবর্তন ও ধ্বংস—এই দুটি বিষয়কে সত্য বলেই মনে হল। পরবর্তী দার্শনিকবৃন্দ তাই ধরে নিলেন যে অবিনাশী মূল পদার্থগুলিও বহু। সৃষ্টি বা ধ্বংস এদেরই মিলন ও বিচ্ছেদমাত্র। খ্রী. পূ. পঞ্চম শতাব্দীতে এম্পেডকল্স্ (Empedocles—490-430 খ্রী. পূ.) বললেন, চিরকাল ধরেই ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চারটি অপরিবর্তনীয় চিরন্তন মৌলিক

পদার্থের মিলন-বিরহ চলছে। সেই সংযোগ ও বিচ্ছেদ, বা, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ রূপ চিরন্তন শক্তির সংঘর্ষের ফলেই চিরকাল ধরে সৃষ্টি ও ধ্বংস কার্য চলে আসছে। মিলনের ফলেই সৃষ্টি, সংহতি ও সুষমার, এবং বিচ্ছেদের দ্বারাই ধ্বংস ও বেদনার কাজ ঘটে চলেছে।

কিন্তু ঐ একই প্রকার চিন্তাধারার উপর ঐ শতাব্দীতেই আরও একটি নূতন চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটে। পরমাণুতত্ত্বের বা পরমাণুবাদের প্রতিষ্ঠাতা লিউসিপাস্ (Leucippus—500-428 বা 440 খ্রী. পূ.) ও তাঁর শিষ্য আবদেরার (Abdera) ডিমক্রিটাসই (Democritus—আনু. 460-370 খ্রী. পূ.) সেই ধারার প্রবর্তক। ডিমক্রিটাস মনে করতেন, প্রাকৃতিক জগতের যেকোনো প্রকার বস্তুকে ক্রমাগত ভেঙে ভেঙে চললে শেষ পর্যন্ত এমন এক অবস্থায় পৌঁছান যাবে, যখন তাকে আর কিছুতেই ভাঙা চলে না। অর্থাৎ জগতের প্রতি বস্তুই অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা দিয়ে তৈরী। সে সব কণিকাকে আর ভাঙা বা ভেদ করা যায় না। তাই গ্রীক ভাষায় তার নাম হল অ্যাটম (অর্থাৎ যাকে ভাঙা যায় না)। তিনি বলে গেছেন :

> প্রথানুসারেই মধুর মধুর হয়, প্রথানুসারেই তিক্ত (bitter) তিক্ত হয়, প্রথানুসারেই উত্তপ্ত উত্তপ্ত হয়, প্রথানুসারেই শীতল শীতল হয়, প্রথানুসারেই রঙ্ রঙ্ হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পরমাণু আর শূন্য (একেবারে ফাঁকা জায়গা) ছাড়া আর কিছুই নেই। অর্থাৎ, বোধের বিষয়গুলিকে বাস্তব মনে করা হলেও এবং তাদেরকে এ-রকমটি ভাবা প্রথা হয়ে গেলেও, তারা কিন্তু সত্য নয়। বাস্তব হচ্ছে একমাত্র পরমাণু এবং শূন্যই।

ডিমক্রিটাসের শিষ্য ছিলেন এপিকিউরাস (Epicurus—341-270 খ্রী. পূ.)। তিনিও ছিলেন এই ধারারই বস্তুবাদী (যাঁরা বস্তুকেই সমস্ত কিছুর আদি বা প্রথম এবং প্রধান সত্য মনে করেন) দার্শনিক। পরমাণু বা অ্যাটম সম্বন্ধে এঁদের ধারণা ছিল, সেগুলি আকৃতিতে এত ক্ষুদ্র যে তাদের চোখে দেখা যায় না। কিন্তু তারা অনাদি ও অবিনাশী। তবে তাদের আকৃতি, আয়তন ও ওজন বিভিন্ন হতে পারে। কিন্তু সেসব আকৃতি যত প্রকারই হোক না কেন, গুণের দিক থেকে তাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। তাদের সকলকারই গঠন একই পদার্থ থেকে। কিন্তু শূন্য অর্থাৎ শূন্যস্থান না থাকলে তো তাদের গতি বা গমনাগমন সম্ভব হয় না। সুতরাং শূন্যের মধ্য দিয়ে এই সর্বদা-বিচরণশীল অ্যাটম, আর অ্যাটমদের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান—এই দুইটি ব্যতিরেকে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কোথাও কিছুই নাই। এই সব বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট পরমাণুগুলি ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায় একত্র হয়েই জগতের সকল প্রকার বস্তুকে সৃষ্টি করেছে। তবে বস্তুর মধ্যে যে আমরা

ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলী দেখতে পাই, সেগুলি আসলে কোনো গুণ নয়। আমাদের মনই সেগুলিকে অনুমান বা সৃষ্টি করে নেয় মাত্র। আসলে প্রত্যেক বস্তুরই একটি করে গুণ থাকে। সেটি তার পরিমাণ বিষয়ক। কিন্তু আমরা যেটিকে গুণ বলি, সেটি আমাদেরই ইন্দ্রিয় কর্তৃক অনুমান করা গুণমাত্র। আর অ্যাটমের মধ্যে যে একটি গতিপ্রবণতা আছে, সেই শক্তির প্রভাবেই তারা একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হতে ছুটে যায়, ক্রমে ক্রমে গড়ে তোলে মাটি, জল, জীব, জন্তু। এই গতিপ্রকৃতির জন্যই পরমাণুগুলি কখনও খুব কাছাকাছি এসে যায়, আবার কখনও অল্প দূরে, কখনও বা খুব বেশী দূরে দূরে থাকে। তারই ফলে বস্তুরাজিও সংকুচিত প্রসারিত বা বিগলিত হয়। কিন্তু এই আবেগ কোনও বাইরের প্রেরণা নয়, এ তাদের ভেতরের আবেগ। তাই তারা বাইরে থেকে আসা কোনও নির্দেশ মেনে চলে না, অথচ আপন অন্তরের প্রেরণাতেই সৃষ্টির কাজ চালিয়ে যায়, কোথাও কোনো স্বেচ্ছাচারিতা দেখা যায় না।

অ্যানাক্জাগোরাস্ (Anaxagoras—আ. 499 আ. 428 খ্রী. পূ.) নামে আর এক পণ্ডিত কিন্তু মনে করলেন যে বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর মূলও বৈচিত্র্যময়। সব বস্তুরই একটি করে বীজ আছে। তা থেকেই সেই বস্তুর উৎপত্তি - যেমন স্বর্ণবীজ, প্রস্তরবীজ, অস্থিবীজ, উত্তাপবীজ। একটি বস্তুতেই সকল প্রকার বীজ আছে, কিন্তু প্রাধান্য একটিরই। বীজগুলির গুণ ভিন্ন ভিন্ন বলে বস্তুরও গুণ বিভিন্ন। কিন্তু এঁর মতে, এদের যে গতিশক্তি তা বহিরাগত। সে বহিঃশক্তি জগতে একটিমাত্র। তার নাম মন। সমগ্র বিশ্ব এক বিরাট মানসশক্তির বলেই চলছে। এই মানসশক্তি নিয়েই গ্রীকদর্শনে নূতন ধারার সূত্রপাত হল। সোফিস্ট্রা মানুষ আর তার মন ও ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাকেই একমাত্র সত্য বলে ঘোষণা করলেন। সক্রেটিস (Socrates—আ. 470-399 খ্রী. পূ.) বললেন প্রজ্ঞার কথা। তাঁর অনুগামী সিনিক, সিরেনাইক ও মেগারিক (ইউক্লিড Euclid —আ. 300 খ্রী. পূ.) সম্প্রদায় এ নিয়ে নানা আলোচনা করলেন। তারপর প্লেটো (Plato—আ. 428-348 খ্রী. পূ.) তাঁর প্রত্যয়বাদ (অর্থাৎ সুনিশ্চিত ধারণা বা বিশ্বাস সম্বন্ধীয় মতবাদ—Theory of Ideas) নিয়ে এলেন। সেই প্রত্যয়ও একটি মানসক্রিয়া মাত্র। তাঁর শিষ্য অ্যারিস্টটল্ (Aristotle—384-322 খ্রী. পূ.) সেই প্রত্যয় (Idea) বা তত্ত্বকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি বস্তুর জগৎকেও স্বীকার করে নিলেন। জগৎ সৃষ্টির উপাদানগত কারণ (material cause), তার গুণগত কারণ (formal cause), সৃষ্টিশক্তি-মূলক কারণ (efficient cause) এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্যের পরিকল্পনা-বিষয়ক কারণ

(final cause)—তিনি এই চারিটি মূল কারণের নির্দেশ দিলেন। এদের মধ্যে পৃথিবীর উপাদান-কারণ সম্বন্ধে অ্যারিস্টট্‌ল্ শেখালেন যে, সমস্ত পদার্থেরই মূলে রয়েছে এক আদিম বা প্রথম-পদার্থ (Prima materia বা initial matter)। অন্য কোনো কিছু থেকে তা সৃষ্ট হতে পারে না, বা অন্য কোনো কিছুতেই তা রূপান্তরিত হয় না। সেই প্রথম পদার্থের দুই জোড়া বা চারিটি প্রাথমিক গুণ—উত্তাপ-শীতলতা এবং শুষ্কতা-আর্দ্রতা। ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে বা ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে এগুলি যুক্ত হয়ে বস্তু-জগতের সকল প্রকার বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। এই সব গুণ থেকেই চারটি প্রাথমিক বস্তুর সৃষ্টি,—এম্পেডকল্‌স্ যাদের বলেছিলেন মৃত্তিকা, জল, আগুন আর বাতাস। প্রাথমিক গুণগুলি কিন্তু প্রাথমিক পদার্থের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত নয়। আমরা যখন জলকে গরম করি তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা সেখান থেকে শীতলতাটুকু সরিয়ে দিই, আর তার স্থান পূরণ করে দিই উত্তাপ দিয়ে। তারই ফলে জল শুকিয়ে বা উবে যায়। সুতরাং বলা যায় যে উপাদানগুলির পরস্পরের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে। এবং ভিন্ন বস্তুর উৎপাদনের অর্থই হয়ে দাঁড়ায় কেবল ভিন্ন গুণের নব-সন্নিবেশ মাত্র।—অ্যারিস্টট্‌লের এসব চিন্তাযুক্তির কাছে পরমাণুবাদ সহজেই হার মানল। হার মানল এই জন্যে যে, সত্যকে যাচাই করে দেখে নেওয়ার অমোঘ বা নিশ্চিত পদ্ধতি তখনও মানুষ আবিষ্কার করতে পারেনি। জগতের মূল উপাদান আর তার প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন চিন্তানায়কদের সিদ্ধান্ত-গুলির প্রায় সবই অনুমান-মূলক। সুতরাং তাঁদের দার্শনিক চিন্তার সত্যতাকে যাচাই করে নেওয়ার কোনও নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি তখন ছিল না। প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুমান বা সিদ্ধান্তগুলিকে পুনরায় হাতে কলমে পরীক্ষা দ্বারা তাদের সত্যতাকে যাচাই করে নিয়ে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছবার নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় আরও প্রায় দু হাজার বছর পরে। তার পূর্বে কেবল চিন্তাবীরদের বিতর্ক-পদ্ধতি ও ব্যক্তিগত প্রতিপত্তির দ্বারাই কোনও তত্ত্বের বা মতবাদের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়ে এসেছে।

অ্যারিস্টট্‌ল্ ছিলেন তাঁর যুগের সেরা গ্রীক পণ্ডিত ও চিন্তানায়ক। সেজন্য তাঁর মতামতের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। সুতরাং তিনি যে ভগবান মানতেন না, বা দেবতা সম্বন্ধে অজ্ঞ পুরোহিতবৃন্দের গালগল্পে বিশ্বাস করতেন না, তার ফলে তখনকার প্রচলিত নানাবিধ ধর্মীয় কুসংস্কারের মূলে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল। কিন্তু বিস্মিত হতে হয় এই ভেবে যে তিনিই আবার তৎকালীন সমাজ-প্রভাব বশত সম্ভবত আপনারই অজ্ঞাতে অন্যরূপ সংস্কারকে মানবসমাজের মধ্যে প্রোথিত করে (পুঁতে) দিয়েছিলেন। তাঁরই ব্যক্তিগত বিপুল প্রতিপত্তির

ফলেই সম্ভবত দু' হাজার বছর যাবৎ সমগ্র ইউরোপ ভূখণ্ডে ভাবাবেগই (intuition) যুক্তিকে দাবিয়ে রেখেছিল। বলবিদ্যা সম্বন্ধীয় তত্ত্ব প্রচার করে তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে বাইরে থেকে প্রযুক্ত কোনো বল (force) যখন একটি বস্তুকে আর ঠেলে দিতে পারে না, তার গতি তখন আপনা-আপনিই থেমে যায়। এর অর্থ, বহিঃশক্তির প্রভাব ব্যতিরেকে কোনো বস্তুর পক্ষেই গতিবান বা ক্রিয়াশীল হওয়া সম্ভব নয়। তবে ভাবাবেগ যাই বলুক না কেন, আসল সত্য কিন্তু তা নয়। দু হাজার বছর পরে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা করেই মহান বিজ্ঞানী গ্যালিলিও (Galileo Galilei – 1564-1642) সে সত্যকে আবিষ্কার করেছেন। সুতরাং মানসক্রিয়াজাত বা মনগড়া মতবাদ ও বাস্তব সত্য সর্বদা এক নয়। তাই জগতে অনেক মতবাদই কালক্রমে পরিত্যক্ত হয়েছে।

এ থেকেই বোঝা যায়, মন বা তার ক্রিয়া আজও সুপরিণত হয়ে উঠতে পারেনি। অথচ আজ ধরা পড়ছে যে লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার অণু-পরমাণু ও তার ক্রিয়ার মত কতকগুলি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া চিরকাল একই নিয়মে কাজ করে চলছে। সুতরাং মন নামক বস্তুটি যখন ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়ে আজ আমাদের কাছে অনিবার্য সত্য বস্তু রূপে ধরা পড়তে আরম্ভ করেছে, তখন বলা চলে যে এ পৃথিবীতে এই মন বস্তুটি প্রকৃতির এক আধুনিক সৃষ্টি। অভিনব সৃষ্টি সন্দেহ নাই, কিন্তু তাকে নিয়ে প্রকৃতির অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এখনও। আবার এটি হয়ত প্রকৃতির একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। কারণ প্রকৃতি-সৃষ্ট একমাত্র মনই প্রকৃতি-সৃষ্ট অন্যান্য সকল বস্তুর স্বরূপ বা নিয়ম কানুন বুঝে নিতে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু এই বুঝে নেওয়ার ব্যাপারে মন এখনও একটি অমোঘ বা নিশ্চিত প্রক্রিয়া হয়ে উঠতে পারেনি। তাই সে অপটু ও অপরিণত। সুতরাং জাগতিক সত্য নির্ণয়ের ব্যাপারেই যখন মনের যা কিছু বাহাদুরি, তখন জাগতিক সকল প্রকার সত্যকে না জানা পর্যন্ত সে নিজেও অজানা বহু সত্যের অধীন থাকতে বাধ্য। তাই আজও বহু সত্য প্রকৃতির বুকে লুকিয়ে থেকে তাকে যেন অদৃশ্য হস্ত দিয়েই শাসন করে চলেছে। কিন্তু প্রকৃতির বুকেই মনের বিশেষ স্থান হয়েছে বলে প্রকৃতিও তাঁর গোপন গৃহগুলির এক একটি দরজা তার কাছে খুলে ধরে তাকে পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলছেন। মন যেখানে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে পারছে, সেখানে সে বিজয়ী হয়ে উঠছে। যেখানে তার ঐ অপরিণতি বশতই তা সম্ভব হয়নি, সেখানে তার পথ আঁকাবাঁকা বা সর্পিল হয়ে উঠেছে। ফলে অপরিণত

মনের উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে গিয়ে ভ্রান্ত মতবাদই সমাজকে শাসন করছে। তার ফলে সমাজের পথও কুটিল এবং দীর্ঘায়িত হয়ে পড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জননী-প্রকৃতির শিক্ষা সেখানে থামছে না। তাই প্রতিপত্তিশালী দার্শনিকবৃন্দের চিন্তাধারা যখন একদিকে মানবমনে সত্য মিথ্যা জড়িত নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি করে চলেছে, তখন অন্যদিকে মানুষ যেন এক প্রাকৃতিক আবেগবশেই প্রাকৃতিক বস্তুজগতের সঙ্গে ক্রমাগত জড়িয়ে পড়ছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ তাদের অজানতেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

চীন-ভারত আর মিশর দেশে সে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল বহু পূর্ব থেকেই। পৃথিবীর মূল উপাদান কি, সে সম্বন্ধে ঐসব জায়গায় চিন্তা-ভাবনার উদ্বোধন ঘটেছিল। কিন্তু আমরা আগেই চোখ দিয়ে দেখি বা কান দিয়ে শুনি। মানস দর্শন (পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রভৃতির সাহায্যে মন কর্তৃক বিচার পূর্বক দর্শন) বা মানস শ্রবণ ঘটে তার পরে। এসব থেকেও মনের ব্যাপারটি বোঝা যায়। প্রকৃতি হয়ত তাঁর মানুষের জন্য এমন একটি ইন্দ্রিয় (মন) বানাতে শুরু করে দিয়েছেন, যা দিয়েই হয়ত শেষকালে আর সব ইন্দ্রিয়ের কাজ চলে যাবে। তাই একই সময়ে সমাজের একাংশ মন নিয়ে মেতেছে, আর অন্যাংশ পূর্বের মতই ইন্দ্রিয়গুলিকে শান দিতে ব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু চক্ষুকর্ণাদির সঙ্গে হাতের কাজের যোগসাধন ঘটলেই তবে মনের অগ্রগতি সম্ভব হয়। সেজন্য প্রথম দিকে চীন-ভারত-মিশরে এই দেখাশোনার কাজই বিশেষভাবে চলতে থাকে; আর সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজও। মিশরে আরম্ভ হয় খনি থেকে লোহা সংগ্রহ করে তাকে গালানোর কাজ, কাচ-চামড়া রঙ-গন্ধ তৈরির কারখানা স্থাপনের কাজ, ঔষধ প্রস্তুতের যন্ত্রাদি নির্মাণ ইত্যাদি। স্বভাবতই, এসব কাজের সূত্রপাত হয়েছে পূর্বোক্ত দার্শনিক চিন্তার আরম্ভেরও বহু পূর্বে; এবং তারই সম্প্রসারণ চলে খ্রীষ্ট জন্মের পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে। দৈহিক ও বাস্তব প্রয়োজনেই এসব কাজ চলছিল। নীল-নদের তীরে আলেক্‌জান্দ্রিয়া ছিল এসব কাজের এক প্রাচীন কেন্দ্র, আর সেই কারণে সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রও। পৃথিবীর বহু দেশ থেকে বহু লোকেরই সেখানে আনাগোনা। ফলে সেখানে খ্রী. পূ. শতাব্দীতেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে দার্শনিক ভাবনার সংযোগ ঘটেছিল। তাই তার ফলও হয়েছিল অপূর্ব। দেখা-শোনা, কাজ করা, চিন্তা-ভাবনা, ও তার ফলে উদ্ভাবন বা আবিষ্কার ও উৎপাদন। প্রথম খ্রীষ্টীয় শতকের পূর্বেই নানাবিধ রাসায়নিক যন্ত্রপাতি ও বহু প্রকার প্রক্রিয়াও উদ্ভাবিত হয়ে গিয়েছিল—ভস্মীকরণ (পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা—calcination), উদ্বায়ীকরণ

(হাওয়া লাগিয়ে উবিয়ে দেওয়া—volatilization), পরিশ্রাবণ (ছেঁকে বিশুদ্ধ করা—filtration), দ্রবীভবন (ভিজিয়ে বিগলিত করা--dissolution) ও কেলাসন (দানা বাঁধিয়ে তোলা—crystallization)। ধাতুকে কিভাবে সোনাতে পরিণত করা যায় সেই চিন্তারও সূত্রপাত এখানেই। কিন্তু তারপর রসায়ন-ভাবনা যেন ক্রমাগত স্বর্ণসন্ধান-লালসার পশ্চাতে মিলিয়ে যেতে লাগল।

মিশরের এই রসায়ন-বিদ্যা প্রথমে বাইজেন্টিয়ামের (রোম সাম্রাজ্যের পূর্ব দেশস্থ রাজধানী) মারফতে ইউরোপে প্রবেশ করে। আরবগণ মিশর জয় করার পরে এই বিদ্যার কিছু উৎকর্ষ-সাধনও করেছিল। তারা নাইট্রিক অ্যাসিড, আর কতকগুলি লবণ এবং তাদের বিশুদ্ধীকরণ প্রণালীর উদ্ভাবন করেছিল। আলেক্‌জান্দ্রিয়া থেকে 'কিমিয়া' কথাটি গ্রহণ করে তার পূর্বে আরবীয় 'অ্যাল্' উপসর্গটি জুড়ে দিয়ে তারা 'অ্যাল্‌কেমি' কথাটির সৃষ্টি করে নেয়। এ থেকেই 'অ্যাল্‌কেমিস্ট্রী' বা আধুনিক কালের শব্দ 'কেমিস্ট্রী' (রসায়ন শাস্ত্র) কথাটির উৎপত্তি। তারপর ৭১১ খ্রী.-এ আরবরা স্পেন দেশ জয় করে নিলে পশ্চিম ইউরোপেও অ্যাল্‌কেমি-বিদ্যার প্রচলন হয়। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে তখন সে বিদ্যার বড় একটা উন্নতি হয়নি। এম্পেডকল্‌সের ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ, আর অ্যারিস্টট্‌লের উত্তাপ-শৈত্য-শুষ্কতা-আর্দ্রতার সঙ্গে অ্যাল্‌কেমিস্ট্‌রা আরও তিনটি উপাদান এবং তৎসহ তিনটি গুণের কল্পনা জুড়ে দেয়। সেগুলি হচ্ছে—লবণ, গন্ধক, পারা, এবং যথাক্রমে তাদের তিনটি গুণ—দ্রাব্যতা (গলে যাওয়ার গুণ), দাহ্যতা (দগ্ধ হওয়ার গুণ), ও ধাতবতা (ধাতুর গুণ)। পশ্চিম ইউরোপে অ্যাল্‌কেমীয় বিদ্যা প্রবেশের সঙ্গে সেখানেও ধাতু থেকে স্বর্ণোৎপাদনের পরিকল্পনাটি ঢুকে পড়ে।

মধ্যযুগে ইউরোপের অর্থনৈতিক কাঠামো মিশরের মত কেন্দ্রভিত্তিক একটি কেন্দ্র, বা, বিশেষ একটি বা কয়েকটি স্থানের উপর নির্ভরশীল) ও সুবিন্যস্ত ছিল না। সেখানকার উৎপাদন ব্যবস্থা চতুর্দিকে বিতত (বিস্তৃত) বিচ্ছিন্ন ছিল। যান্ত্রিক উৎপাদন চলত গিল্‌ড্‌গুলিতে (পারস্পরিক সাহায্যমূলক ব্যবসায়ী বা কারিগর সংঘ) এবং ব্যক্তিগতভাবেই। তার ফলে উৎপাদন পদ্ধতির সকল প্রকার কৌশল বংশানুক্রমে মালিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। উৎপাদনে আর যারা অংশ গ্রহণ করত, বিজ্ঞান-চিন্তা বা উদ্ভাবনী-প্রক্রিয়ার দিকে তাদের কোনো নজরই দেওয়ার দরকার হত না। অথচ ক্রমেই প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক বেড়ে চলছিল। কিন্তু তাৎকালিক সামন্ততান্ত্রিক (সামন্ত অর্থাৎ অধীনস্থ রাজা বা মুখ্য প্রজা কর্তৃক শাসিত—এই ব্যবস্থায় সামন্ত বা জায়গীরদারগণ গরু, লাঙল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক থাকলেও তাঁরা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে উৎপাদক-

শ্রমিকের মালিক হন না) বিভাগগুলি পণ্যদ্রব্যের অবাধ চলাচলের পক্ষে যথেষ্ট বাধা হয়ে থাকায় সহজ-বহনযোগ্য ছোট ছোট অতি প্রয়োজনীয় মূল্যবান বস্তুগুলিরই আমদানী-রপ্তানি ব্যতিরেকে উপায় ছিল না। সেজন্য ইউরোপে প্রধানত শৌখিন (luxury) দ্রব্যগুলির আমদানী চলত—যার বিনিময় মূল্য ছিল প্রধানতই স্বর্ণ। সে কারণেই স্বর্ণসন্ধানের প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল অনিবার্য। সমগ্র মধ্যযুগের ইতিহাসই এক রকম সেই স্বর্ণসন্ধানের ইতিহাস। রসায়ন-বিদ্যার দ্বারা বিভিন্ন অনুপাতে বিভিন্ন বস্তুর সমাবেশে যখন অভাবিতপূর্ব লোভনীয় বস্তুগুলির উদ্ভব ঘটে উঠছে, তখন তা থেকে ঐ অপূর্ব বস্তুটিও বা পাওয়া যাবে না কেন,—যার স্পর্শে সমস্ত রোগ দূর হয়ে যাবে, যৌবন ফিরে আসবে, ধাতুও সোনা হয়ে উঠবে! এর ফল স্বরূপ আরবে অবশ্য অ্যালকেমির কিছুটা উন্নতি হল। কিন্তু ইউরোপ যেন 'সোনা' 'সোনা' করে উন্মাদ হয়ে গেল। প্রতিপত্তিশালী ক্যাথলিক গির্জার সম্প্রদায়গুলি অ্যাল্‌কেমি-বিদ্যাটি আর কারও হাতে ছেড়ে দেবে না, কিছুতেই না। অমিতপ্রভাব (অপরিমিত প্রভাবযুক্ত) অ্যারিস্টট্‌লের দার্শনিক ভাবনার অংশবিশেষকে বিকৃত করে, জগতের এবং মানুষের সর্ববিধ ক্রিয়াশক্তির পশ্চাতে এক বহিঃশক্তির প্রভাবকে মেনে নিতে বাধ্য করে তারা সাধারণ মানুষের মনকে বিষাক্ত ও দুর্গন্ধময় করে তুলল। ঐসব ভাবনা এবং দার্শনিকপ্রবরদের ঐ ভাবনা থেকে নিজেদের যেসব বিকৃত উদ্ভাবনা, সেগুলিকে তারা জনসমাজের উপর চাপিয়ে দিলে। যারা তা শুনবে না, তাদের শাস্তি, নব নব উদ্ভাবিত অকথ্য উৎপীড়ন ও মৃত্যু। সারা দেশ থেকে সুস্থ ভাবনা বিদায় গ্রহণ করল, বলিষ্ঠ চিন্তার উদ্বন্ধন (ফাঁসি) ঘটান হল, বিচারবোধ বা বিজ্ঞান-ভাবনাকে যেন হত্যা করা হল। যুগ-যুগান্তরের অন্ধকারে মানবসমাজ আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

পরমাণুর প্রতিষ্ঠা

ষোড়শ শতাব্দীর দিকে এসে মানবসমাজের নব অভ্যুদয় ঘটতে থাকে। আধুনিক যুগের সূচনা হয়। সভ্যতা-সূর্যের প্রথম আবির্ভাব দেখেছি এশিয়ায়, উত্তর আফ্রিকায় আর গ্রীসদেশের আসপাশের দ্বীপগুলিতে। কয়েক সহস্র বছরের পর মধ্যযুগে এসে তার অস্তগমনও আমরা লক্ষ্য করেছি। তারপর দীর্ঘকালের অন্ধকার শেষ হয়ে নূতন সূর্যের অভ্যুদয় ঘটল ঐ ষোড়শ শতাব্দীর দিকে। এবার কিন্তু ইউরোপে। ঐ সময় নাগাত ইউরোপের মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় ভাঙন ধরে। সমগ্র ইউরোপের পুরানো অর্থনৈতিক কাঠামোটিও টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যেতে থাকে। আর তার ফলেই ধনতান্ত্রিক (যে ব্যবস্থায় কল কারখানা প্রভৃতি উৎপাদনের উপায়গুলি শ্রমিক বা উৎপাদকের হাতে না থেকে ধনিকদিগের হস্তগত থাকে, অথচ শ্রমিকরা আর তাঁদের দাস থাকেন না) যুগ, তথা বিজ্ঞানের যুগ আরম্ভ হয়ে যায়।

বিজ্ঞানের যুগ বলছি এইজন্য যে মানুষ তখন থেকেই তার ধারণা, ভাবনা ও জ্ঞানকে পরীক্ষাগারে এসে পাকা করে নিতে আরম্ভ করে। মানুষ প্রথমে কিছু দেখে, তারপর তা থেকে শোনে আর তা নিয়ে ভাবে। চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই বস্তুর সঙ্গে মানুষের প্রথম পরিচয় ঘটে। তাতে অবশ্য বস্তুর সত্য পরিচয় অর্থাৎ তার অন্তর্গত রীতি ও গুণের পরিচয় নাও পাওয়া যেতে পারে। যেসব গুণ থাকার জন্য একটি বস্তুকে অন্য বস্তু থেকে পৃথক মনে হয়, তার সেই পৃথক ও বিশিষ্ট গুণাবলীই তার ধর্ম বা নীতি-নিয়ম। সেই সব পৃথক গুণই সেই বস্তুটিকে ধরে রাখে, অন্য বস্তুর পৃথক গুণাবলীর মধ্যে তাকে লুপ্ত হয়ে যেতে দেয় না। সেগুলি তার ধর্মই। বস্তুর এই প্রকার ধর্মের সঙ্গে পরিচয়ের নামই বস্তুর প্রকৃত পরিচয়। কিন্তু বস্তুর রূপ-গন্ধাদি গুণকে ধরবার জন্য জীবজগৎ যে ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করে নিয়েছে, তার সূক্ষ্মতা ও ধৃতিকুশলতার (ধারণ বা গ্রহণ করবার নিপুণতার) মান সকলের ক্ষেত্রে এক নয়। ফলে বস্তুজগতের প্রাথমিক পরিচয়টিও সকল জীবের এক রকম হয় না। তাছাড়াও মন নামক ইন্দ্রিয়টির কথা আমাদের প্রাচীন দার্শনিক শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে। সেই মনের সাহায্যে আমরা মানবকুল সকল প্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণকে একত্র করে কোনো বস্তুর ধর্ম-পরিচয় বা মোটামুটিভাবে তার একটি সামগ্রিক পরিচয় লাভ করে

থাকি। কিন্তু সেই মন নামক ইন্দ্রিয়টির নিপুণতাও সকলের ক্ষেত্রে এক হয়ে উঠতে পারেনি বলে মনের ক্রিয়া বা ভাবনাও সকল মানুষের ক্ষেত্রে এক রকম হয়ে ওঠে না। ফলে আমরা বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন রকম চিন্তা ভাবনা করে থাকি। বস্তুর ধর্ম বা সত্য পরিচয়টিও আমাদের কাছে ভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়। ভিন্ন ভাবনার আরও কারণ থাকতে পারে। কিন্তু এই মূল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বস্তুর ধর্ম-পরিচয় বা প্রকৃত পরিচয় যাঁদের ঘটে যায়, ঐ বস্তু-ধর্ম অবলম্বনের মাধ্যমে তাঁদের ভাবনাও ধীরে ধীরে এক হয়ে ওঠে, এবং এই বস্তু-জ্ঞানের জন্যই আপাতত আমরা তাঁদের বিজ্ঞানী বলে নামকরণ করতে পারি। আর অনুপযুক্ত মানসগঠন বশত যাঁদের ঐ পরিচয়টি ঘটে উঠতে চায় না, তাঁরা অবৈজ্ঞানিক ; তাঁদের দল অসংখ্য হতে পারে। কিন্তু মানুষ এখনও যেসব বস্তুধর্মের আসল পরিচয় লাভ করতে পারেনি, বিজ্ঞানচিন্তার মারফতেই সে তাদের সম্বন্ধেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অগ্রসর হয়। তখন তার যেন কতকটা অদৃষ্ট-দর্শন ঘটে থাকে। তারই ফল দর্শনশাস্ত্র। কিন্তু আজও মানুষের এই মনটি বিশেষভাবে পরিণত হয়ে উঠতে পারেনি বলে এই দর্শন সর্বক্ষেত্রে সার্থক হয়ে ওঠে না। তাই মানুষ কেবল দেখলেই শিখতে পারে না। দেখে-শুনে সে প্রথমে শুধু শিখতেই শেখে। তারপর সে বুঝতে পারে কিভাবে সার্থক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। তাই তখন তার কাজ হয়—কেবল বার বার দেখে (অর্থাৎ বহিরেন্দ্রিয়ের উপলব্ধির সাহায্যে) জ্ঞান লাভ করা নয়, বার বার দেখে আর বার বার তার পুনঃপরীক্ষা করে তার সত্য মিথ্যা যাচাই করে নেওয়া এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। ঠিকভাবে বলতে গেলে, তখনই তার যে জ্ঞান হয় তার নামই বিজ্ঞান বা বস্তুজ্ঞান। সেই বিশেষ প্রকার বিজ্ঞানবোধ উদ্দীপ্ত হওয়ার নামই মানসপদ্ধতির পরিবর্তন। সেরূপ ক্ষেত্রে মানুষের মন পরিণত হয়ে উঠতে থাকে। আর কেবল তখনই তার মানসদর্শনের ব্যাপক ক্ষেত্রটির অন্তর্গত ঐ বিজ্ঞানসম্মত ও বিজ্ঞানপুষ্ট দর্শনাংশটুকুই ভূয়োদর্শন বা প্রকৃত সত্যদর্শন হিসাবে গণ্য হতে পারে। তাই যে যুগে বিজ্ঞানের আরম্ভ, প্রকৃত দর্শনের আরম্ভও সেই যুগেই। দর্শন, বিজ্ঞান ও ভূয়োদর্শন—এভাবেই সভ্যতার অগ্রগতি ঘটে। সেই কারণেই বলা যায় প্রত্যক্ষ বিষয়জাত অনুমান-সিদ্ধান্তগুলিকে পুনঃপরীক্ষা করে দেখতে শেখার সময় ঐ ষোড়শ শতাব্দীর কাছাকাছি এসেই মানবসমাজ যেন নব সভ্যতার দ্বারদেশে এসে পৌঁছেছে।

ইউরোপের অর্থনৈতিক কাঠামোটি ভেঙে গিয়ে নূতনভাবে তা গঠিত হতে আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানবমনে এই প্রকার বিজ্ঞানবোধের উদ্বোধন ঘটে। লোহা গালিয়ে চাষের লাঙলাদি যন্ত্রপাতি এবং তাঁত যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে

প্রচুর পরিমাণে কৃষিজাত ও অন্যান্য যন্ত্রজাত বস্তু নির্মিত হতে থাকে। আবার অন্যপক্ষে, মানবমনের এই উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধির ফলেও জায়গীরদারী ব্যবস্থা (দ্র., পৃ. ৯) ভেঙে গিয়ে নূতন শিল্প-প্রক্রিয়া গড়ে উঠে। পূর্ববর্তী ব্যবস্থায় উৎপাদন হত নিছক প্রয়োজনের জন্য। কিন্তু যন্ত্রাদি সহযোগে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে প্রয়োজন ছাড়াও এখন থেকে ব্যবসার জন্য বা টাকার জন্যও উৎপাদন সম্ভবপর হল। শুরু হল ব্যবসা-বাণিজ্য, গড়ে উঠল বণিক সম্প্রদায়, আর হস্তশিল্পীর স্থলে বিশেষজ্ঞ-উৎপাদক। কারখানা বসে গেল স্থানে স্থানে। গ্রামে কৃষি-পুঁজিপতি ও শহরে শিল্পপতি ধনিক শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটল। উৎপাদন ও বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রয়োজনে বস্তুজগৎকে ভাল করে নেড়ে চেড়ে দেখার দরকার হল। শুরু হয়ে গেল অনুসন্ধান, ভাব-বিনিময়, পরীক্ষা ও পুনঃপরীক্ষা। ছাপাখানা স্থাপিত হওয়ার ফলে এসব কাজের সুযোগও বেড়ে গেল প্রভূতভাবে। বহু মন একত্র হওয়ার সুযোগও এসে গেল যেন আচমকা। বিচিত্র বস্তুরাজির নিবিড় ও প্রত্যক্ষ সংযোগে আসায় ক্রমে ক্রমে তাদের অন্তর্গত নিয়মাদি আবিষ্কৃত হতে থাকল এবং তার ফলে কেবলমাত্র এক একটি মনই যে সত্যের যথার্থ রূপটি দর্শন করবার পন্থা আবিষ্কার করে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল, তাই না ; যেন বহু মানুষের চিন্তাধারা বা সমাজমানস ও সত্যদর্শনের একই অভিমুখে ধাবিত হয়ে সংহত বা সম্মিলিত হওয়ার সুযোগ পেল। বিজ্ঞান-সূর্যের অভ্যুদয়ে শত শত বৎসরের পুঞ্জীভূত আঁধার দূর হয়ে যেতে লাগল। অ্যাল্‌কেমির যুগ শেষ হয়ে রসায়ন-বিদ্যা নূতন রূপ নিয়ে হাজির হল। অ্যাল্‌কেমিস্ট্‌দের যৌবনকে ফিরিয়ে আনার জন্য স্পর্শমণি সন্ধানের সকল প্রচেষ্টাই ইতিমধ্যে ব্যর্থ হয়ে গেছে ; কোনো ক্ষেত্রেই যৌবন ফিরে আসে না। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই তো রোগ তাপ দূরীভূত হয়! সুতরাং যৌবন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা বাতুলতার নামান্তর হলেও রোগ-শোক থেকে অন্তত্ সাময়িকভাবেও মানুষকে তো মুক্ত করা যায়। সুইজার্ল্যাণ্ডের চিকিৎসাবিজ্ঞানী প্যারাসেল্‌সাস্ (Paracelsus—1493-1541) তাই ওষুধ প্রস্তুতের প্রচেষ্টায় রসায়ন-বিদ্যাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করলেন। সফলও হলেন তিনি কিছুটা। তাঁর চিন্তাধারা কিন্তু তখন আর স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ রইল না। ছাপাখানার দৌলতে তাঁর যশের সঙ্গে তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতির কথাও চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। নূতন উদ্দীপনা পেয়ে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল থেকে এগিয়ে এলেন সমভাবের ভাবুকরা। অ্যাল্‌কেমিস্ট্‌দের চিন্তাধারা এতদিন পরে প্রকৃত পথের সন্ধান পেল যেন। কিভাবে রাসায়নিক পরিবর্তনগুলি ঘটে থাকে, গবেষণাগারে পুনঃপরীক্ষিত হয়ে যাওয়ার পর সে সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছান সম্ভব হল। ওদিকে আর একজন মনীষী এগ্রিকোলা (Georg Agricola—

1494 1555) অ্যাল্‌কেমিস্ট্‌দের অনুসন্ধানের অন্য দিকটি সম্বন্ধেও আগ্রহান্বিত হলেন। সে দিকটি হল খনি থেকে ধাতু-সঞ্চয়ন ও তার শোধনীকরণের দিক। এলোমেলো চেষ্টা না করে তিনি তৎকাল পর্যন্ত সংগৃহীত সকল প্রকার ধাতু ও তৎসংক্রান্ত উৎপাদনের সিদ্ধান্তগুলিকে একত্র করলেন। তার সঙ্গে তিনি স্বীয় সংগ্রহগুলিও যোগ করে দিলেন। এইভাবে একই জাতীয় বহু বস্তু ও বহু তথ্য একই পন্থায় একত্রিত হল। ফলে, তাদের সকলের মধ্যকার যে সাধারণ বা সর্বব্যাপ্ত নিয়ম ও তত্ত্ব, তা সহজেই ধরা পড়ে যেতে লাগল। পুনঃপরীক্ষার মধ্য দিয়ে সেসব তত্ত্বও প্রতিষ্ঠা লাভ করল। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল। বস্তুজগতের বহুব্যাপ্ত তত্ত্বগুলি ধরা পড়ে যাওয়ায় তাদের আকর্ষণ সর্বজনীন হয়ে উঠল। সেই অনিবার্য আকর্ষণে বহুব্যাপ্ত সমাজের মধ্য থেকে একটি সর্বজনীন মানবসত্তাও সংহত হতে লাগল।

এগ্রিকোলা এবং তাঁর অনুগামী বৃন্দের কাজের প্রথম ফল এই হল যে, কারখানাগুলিতে উৎপাদনের উন্নত প্রক্রিয়াগুলি কাজে লাগিয়ে দেওয়ায় পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের প্রায় সর্বত্র উৎপাদনের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল। কিন্তু এ হচ্ছে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োগের দিক। প্রথমের দিকে এই প্রয়োগের দিকটি বিজ্ঞানের তত্ত্বগত দিকটিকে ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে যায়। আসল ভাবধারা বা তত্ত্বের দিকটি কিন্তু মধ্যযুগীয় অ্যাল্‌কেমিস্ট্‌দের পুরাতন ধারণা ও ভাবধারাকে পরিত্যাগ করে খুব বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি। অথচ নূতন ও দ্রুত উৎপাদন ব্যবস্থায় সেসব মতবাদ আর মোটেই খাপ খায় না। অ্যারিস্টটলের মতবাদ অনুযায়ী, প্রথম-পদার্থ ও তৎসহ বহিরাগত মৌলিক গুণ-চতুষ্টয়ের ভিন্ন ভিন্ন সন্নিবেশের ফলেই বস্তুজগতের যা কিছু বৈচিত্র্য. সম্ভবত এই মতবাদই আসল তত্ত্ব বা প্রকৃত সত্যকে দু হাজার বছর যাবৎ ঢেকে রেখেছিল। অর্থাৎ বিচিত্র বস্তুর বিভিন্ন সমাবেশের ফলেই যে তাদের বিভিন্ন গুণাবলীর উদ্ভব ঘটে, এই সত্য সম্বন্ধে ঐ মতবাদই জনমানসকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল এতটা কাল। অ্যারিস্টট্‌ল্ যে বলেছিলেন বাইরে থেকে পাওয়া শক্তির উপরই বস্তুর গতিবেগ নির্ভরশীল-- তাঁর এই ভাবাবেগ-জনিত মতবাদ, মানুষের যুক্তি বা বিচারবোধকে যেন এতকাল যাবৎ জাগ্রত হতে দেয়নি। কিন্তু এখন মনীষী গ্যালিলিওর আবির্ভাবে এ ক্ষেত্রেও যেন নব সূর্যের অভ্যুদয় ঘটল। একমাত্র পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারাই সত্য বা তত্ত্বকে যাচাই করে নেওয়ার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার করে তিনি যুক্তিবাদ বা বিজ্ঞানচিন্তাকে ভাবাবেগের কবল থেকে উদ্ধার করে

দিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম জানালেন যে বস্তুর গতিবেগের জন্য বহিঃশক্তির (force) কল্পনাটি ভাববিলাস মাত্র। বস্তুর গতিবেগ তার নিত্য ধর্ম, সে অনন্য-নির্ভর। বহিঃশক্তি পথরোধ না করে দাঁড়ালে প্রত্যেক বস্তুই সমগতি (uniform velocity) সহ সরলরেখা ধরেই চিরকাল এগিয়ে চলে। গ্যালিলিওর পরে নিউটন (Isaac Newton—1642 1727) রীতিমত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তকে প্রমাণ করে জাড্যের নিয়ম (অর্থাৎ স্থির বা গতিবান, যে বস্তু যেমনভাবে অবস্থান করছে তার সেভাবে থাকবার যে ঝোঁক, তারই নিয়ম—Law of inertia) স্থাপন করেন (দ্র.—পরমাণুর অন্তঃপুরে)। তিনি প্রমাণ করেন যে, গতিবেগের সঙ্গে বহি.শক্তির সম্পর্কটির কল্পনা সম্পূর্ণতই ভাবাবেগপ্রসূত।

কিন্তু ফল হল আশ্চর্য। দার্শনিক চিন্তার মধ্যেও বিজ্ঞানের ঢেউ এসে লাগল। নির্ভুল চিন্তা হক বা না হক, ঠিক পথে চিন্তা করবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়ে দর্শন চিন্তার মধ্যেও বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করল। ক্রমে ক্রমে দর্শন-চিন্তার জগৎ থেকেও অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় শক্তির এবং ভাববিলাসের বিদায় নেওয়ার সময় ঘনিয়ে এল। এই সম্বন্ধে বস্তুজগতের গঠন সম্পর্কিত একটি দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রাচীনকালে গ্রীস দেশের অধিবাসী-বৃন্দ সুদূর নীল আকাশকে উচ্চতর বাতাস বা 'ইথার' নামে অভিহিত করেছিল। তারপর ল্যাটিন, ফরাসী ও ইংরেজ লেখক-বৃন্দের দ্বারা ব্যবহৃত হতে হতে ক্রমেই ইথার কথাটি মধ্যযুগ পেরিয়ে চলে আসে। কিন্তু অর্থ ওর ঐ একই থেকে যায়—যা স্বর্গলোককে ভরে থাকে। কিন্তু গ্যালিলিওর যুগে এসে যখন বিজ্ঞান-চিন্তার উদয় হতে থাকে এবং প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির কারণ অনুসন্ধানের আগ্রহ জাগে, তখন জাগতিক বস্তুসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়ার কারণ সম্বন্ধেও প্রশ্ন জাগতে আরম্ভ করে। তবে 'কেন' শব্দটির সাহায্যে সুদূর প্রাচীন-কালের যে সকল জিজ্ঞাসা চলত, তা এখন 'কিরূপে', এই কথাটিতে পরিণত হয়ে উঠেছে। বহিঃশক্তি প্রয়োগ ব্যতিরেকেই দুটি চুম্বকের মধ্যে 'দূরত্বে ক্রিয়া' চলতে থাকে 'কিরূপে'? বা, স্বর্গলোকের চাঁদের সঙ্গে মর্ত্যলোকের জলেরও 'দূরত্বে ক্রিয়া'র ফলে জোয়ার ভাটা 'কিরূপে' ঘটে উঠে—এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ফরাসী দার্শনিক দেকার্তে (Rene' Descartes – 1596-1650) বললেন যে বস্তুর উপর চাপ প্রয়োগ না করলে তার গতি বা ক্রিয়া ঘটতে পারে না। কিন্তু সে চাপকে অলৌকিক মনে করার কারণ নাই। বস্তুদ্বয়ের ব্যবধান সত্ত্বেও যদি তাদের মধ্যে ক্রিয়া ঘটে থাকে, তাহলে ধরে নিতে হয় যে যাকে আমরা ব্যবধান বলে মনে করি, তা আসলে কোনো শূন্যস্থানের ব্যবধান নয়। ঐ স্থানের মধ্যে কোনো না কোনো গতিশীল অতি সূক্ষ্ম পদার্থ কাজ করে চলেছে। বাতাস ইত্যাদির মত পার্থিব বস্তু কিছুটা স্থান পূরণ

করে থাকতে পারে; কিন্তু সমগ্র বিশ্বকে ভরে আছে পূর্বোক্ত ঐ মূল পদার্থ বা ইথার। অন্যান্য বস্তু যে তার মধ্যে ডুবে থেকে গতিবান হতে পারে, তার কারণ তারা সর্বদা সঞ্চরণশীল ঘূর্ণামান কিছু কিছু ইথার কণিকার স্থান গ্রহণ করে, এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ ইথার কণিকার ঘূর্ণিতে পড়ে তারাও চঞ্চল হয়ে উঠে। এমনকি ইথারের একটি কণিকার গতিচাঞ্চল্যের ফলেও শৃঙ্খল-বদ্ধ সমগ্র বস্তুজগৎই ঘূর্ণমান বা চঞ্চল হতে বাধ্য হয়—এভাবে দেকার্তেই সর্বপ্রথম এক ঘূর্ণামান মাধ্যমের কল্পনা করে নিয়ে 'ইথার' কথাটির মধ্যে নূতন ভাবের দ্যোতনা আনয়ন করেন। ইথার সংক্রান্ত এরূপ কল্পনাটিও একটি পরিকল্পনামাত্র, এবং ইথারের অস্তিত্বের বাস্তব প্রমাণও কিছু ছিল না। কিন্তু এরকম বাস্তবমুখী চিন্তার ফলে দর্শন-চিন্তার জগৎ থেকে নিছক ভাবাবেগপ্রসূত অতিলৌকিক কল্পনাগুলিও ক্রমেই অপসৃত হতে আরম্ভ করল।

অথচ ঐ ভাবাবেগই দু' হাজার বছর যাবৎ রাজত্ব করতে থাকায় প্রাকৃতিক সত্যকে প্রত্যক্ষ করবার চোখ খুলে যেতে আরও ঐ দু হাজার বছর লেগে গিয়েছে। মানব সভ্যতা দু হাজার বছর পিছিয়ে গেছে। আর তার ফলে ওদিকে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার পথও প্রায় রুদ্ধ হতে বসেছিল। কিন্তু নব-সভ্যতার অর্থাৎ যুক্তি ও বিচার শক্তির অভ্যুদয় কালে প্রকৃতি সম্বন্ধে দার্শনিকবৃন্দের কেবল পণ্ডিতী তত্ত্ব এবং পরীক্ষা-প্রয়োগবিহীন অনুমান-সিদ্ধান্ত গ্রহণের চিত্তাকর্ষক পথগুলিকে আর আঁকড়ে রাখা সম্ভবপর হল না। ইটালীর গ্যালিলিওর মত ইংরাজ বিজ্ঞানী বয়্যালও (Robert Boyle—1627-'91) এ সম্বন্ধে যথার্থ পথটি ধরিয়ে দিলেন। সে পথ বার বার অনুসন্ধান, বার বার পুনঃপরীক্ষা ও তার সমস্ত শেষ ফলগুলিকে সংগ্রহ করে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথ। ১৬৬১ খ্রী.-এ তিনি অ্যারিস্টট্‌লের পদার্থ সম্বন্ধীয় মতবাদকে নাকচ করে দিলেন। তিনি শেখালেন যে, বিশেষভাবে অনুসন্ধান ও পুনঃপরীক্ষা না করে এবং প্রকৃতিতে সংঘটিত কোনও ঘটনাকে গবেষণাগারে বার বার পুনঃসংঘটিত না করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা কোনো মতবাদ স্থাপন চলতে পারে না। রসায়ন-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হবে উপরিউক্তভাবে কোনও বস্তুর গঠন প্রণালী সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা, কার্যকরী-ভাবে বিশ্লেষণ দ্বারা ঐ বস্তুর উপাদানগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা, বিভিন্ন উপাদানের স্বরূপ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলাভের পর সংশ্লেষণের অর্থাৎ একত্রীকরণের দ্বারা আবার তাদের বিভিন্ন সমবায়ের ফলকে প্রত্যক্ষ করা, এবং তারপর শেষে এসব বিষয় সম্বন্ধে সার্বজনীন-ভাবে তত্ত্ব বা মতবাদ গড়ে তোলা।

এভাবে প্রকৃতি ও পার্থিব বস্তুর মূল উপাদান খুঁজে বার করার ব্যাপারে মানুষ যেন তার এতকালের ব্যর্থ অনুসন্ধানের পর প্রকৃত পথটির সন্ধান পেয়ে গেল।

কিন্তু বয়্যালের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেও দেখা গেল যে অ্যারিস্টট্‌লের এই বিষয়ক দার্শনিক সিদ্ধান্ত পরিত্যজ্য। বয়্যাল দেখালেন যে মূল উপাদান বহু, এবং সেগুলি সরলদেহ বস্তু। তাদের সমবায়েই জটিলদেহ বস্তু গঠিত হয়। সুতরাং এই জটিল বস্তুগুলি ভেঙে গেলে বা বিশ্লিষ্ট হলে মৌলিক উপাদানগুলিকেও ফিরে পাওয়া যায়। বস্তুর বায়বীয় (গ্যাসের মত) প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিতভাবে একটি সত্যকে প্রকাশ ও প্রমাণ করে দিলেন :

কোনো পাত্রে একটি বায়বীয় বস্তুর তাপমাত্রা স্থির রেখে অর্থাৎ তার উষ্ণতাকে একই অবস্থায় রেখে তার উপর চাপ দিলে দেখা যায় যে ঐ বস্তুর আকৃতিতে পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু ঐ পরিবর্তনের সঙ্গে ঐ চাপের একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে,---চাপ বাড়ালে আয়তন কমতে থাকে। অবশ্য তা এলোমেলোভাবে কমে না, চাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য বা অনুপাত রক্ষা করেই তা' কমতে থাকে : চাপ (Pressure---P) আর আয়তনের (Volume—V) গুণফল সর্বদাই একটি নির্দিষ্ট বা ধ্রুবসংখ্যা (constant) হয়ে যায়। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট গ্যাসের পক্ষে—

$$P \times V = \text{ধ্রুবসংখ্যা}$$

অর্থাৎ চাপ এবং আয়তনের দুটি সংখ্যার মধ্যে একটি বাড়ার সঙ্গে অন্যটি তার সাথে সামঞ্জস্য বা অনুপাত রক্ষা করেই কমে যায় বলে দুটি সংখ্যার গুণফলটি সর্বদাই স্থির সংখ্যা থেকে যায়।

বয়্যালের আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক রহস্যের এই নিয়মটিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে অনেক সুবিধেই আদায় করে নিয়েছে, অথচ কোথাও এ-নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। সুতরাং বস্তুপ্রকৃতি সম্বন্ধে এই যে আবিষ্কার, এ আর কেবল একক মানুষের কাছে উদ্ঘাটিত কোনো গোপন রহস্য হয়ে রইল না। এ হচ্ছে যা লুকিয়ে আছে, তাকেই কেবল উদ্ঘাটিত করে দেখে নেওয়া। সেই রূপ-দর্শনের জন্য যে চোখের দরকার, তার প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা দেশের ভিন্ন ভিন্ন মানুষ নির্বিশেষে একই প্রকার। তাই একক ব্যক্তির দ্বারা উদ্ঘাটিত সত্যটিও ইতর-ভদ্র, বাল-বৃদ্ধ ও দেশ জাতি নির্বিশেষে সার্বজনীন হতে বাধ্য। বস্তু সম্বন্ধে এই সার্বজনীন দৃষ্টিই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। এরই নাম বস্তুজ্ঞান বা বিজ্ঞান।

কিন্তু বস্তুবিশ্ব অনন্ত। সুতরাং তার অসংখ্য নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ সহজ কথা নয়,—বিশেষ করে মন যদি বৈজ্ঞানিক না হয়। কারণ, বস্তু ও তার প্রক্রিয়াসমূহের অন্তর্গত অবিচ্ছিন্ন নীতিসূত্রকে ঐ মন বা অন্তশ্চক্ষুর সাহায্যেই প্রথমে দেখে নিয়ে তারপর পুনঃপরীক্ষার দ্বারা তার সত্যতাকে যাচাই করে নিতে

হয়। আলোচ্যমান কালেও ঐ প্রকার মনকে সমাজের মধ্যে কমই খুঁজে পাওয়া যেত। তাই সেকালে বিজ্ঞানের পথটিও মোটেই সরল ছিল না। চিন্তা ও যুক্তির বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি সম্বন্ধেও তাই তখন নানাবিধ প্রমাদ ছিল। এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। যেমন, দহন-কার্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সেই সময়ে নানা মুনিই নানা ভ্রান্ত মত প্রকাশ করেছেন। সেসব মত ক্রমেই পরিত্যক্ত হয়েছে। তাদেরই একটির কথা উল্লেখ করছি।

১৭০০ খ্রী.-এ জার্মান রসায়নবিদ্ স্তাহ্‌ল (Georg Ernst Stahl) এ-রকমের একটি কল্পনা করে বসলেন যে দহন-প্রক্রিয়ার [বা, জারণ (oxidation)-বিজারণ (reduction) প্রক্রিয়ার—(Oxidation বা জারণ, অর্থাৎ কোনও বস্তুতে অক্সিজেন যুক্ত বা তা থেকে হাইড্রোজেন বিযুক্তকরণ ; reduction বা বিজারণ অর্থাৎ কোনও বস্তু থেকে অক্সিজেন বিযুক্ত বা তাতে হাইড্রোজেন যুক্তকরণ)] মূলে রয়েছে জগৎ-ব্যাপী একটি অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। গ্রীক শব্দ ফ্লোজিস্টস্ (Phlogistos---দাহ্য) থেকে তিনি সেই বস্তুটির নামকরণ করলেন ফ্লোজিস্টন্। তিনি অনুমান করে নিলেন যে প্রত্যেক বস্তুতেই সেই অদৃশ্য ফ্লোজিস্টন্ রয়েছে। দহন বা জারণ কালে সেই সূক্ষ্ম পদার্থটি সেখান থেকে উড়ে যায়, আর পড়ে থাকে তার পার্থিব ভস্মটি। সুতরাং দহনের অর্থই একটি বস্তুর বিশ্লেষণ ; অর্থাৎ বস্তু থেকে ফ্লোজিস্টন্ আর বস্তুর ভস্মাবশেষ, এই দুটিতে বিশ্লেষণ মাত্র। কয়লার মত যেসব বস্তুর ভস্মাবশেষ প্রায় থাকে না বললেই চলে, সেগুলি যথাসম্ভব বিশুদ্ধ ফ্লোজিস্টন্ পদার্থ। সুতরাং এই ফ্লোজিস্টন্-সমৃদ্ধ কয়লা থেকেই খনি মধ্যস্থ জারিত বস্তু ফ্লোজিস্টন্ গ্রহণ করে বিজারিত ধাতুতে পরিণত হয়ে যায়।

ফ্লোজিস্টন্‌বাদীদের এ সিদ্ধান্ত আপাতদৃষ্টিতে খুবই যুক্তিমূলক। তৎকালে বহুবিধ গ্যাস, ধাতু, ধাতব অক্সাইড (অক্সিজেন ও ধাতুর সংযোগে উৎপন্ন যৌগিক বস্তু) এবং লবণের (Salt—ধাতু ও অধাতুর সংযোগে উৎপন্ন যৌগিক) আবিষ্কার ঘটে গিয়েছিল। সেগুলি নিয়ে যে ব্যাপক পরীক্ষার কাজ চলতে থাকে, তাতেও ফ্লোজিস্টন্‌বাদ বেশ খাপ খেয়ে যায়। সুতরাং এই মতবাদ পূর্ববর্তী বহু ভ্রান্ত মত-বাদকে কোনঠাসা বা বিলুপ্ত করে দিয়ে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিল। অ্যারিস্টট্‌লীয় মতবাদ সম্পূর্ণরূপেই বিধ্বস্ত হল। কিন্তু এর বিষময় ফলও ঘটল। বিজয় গর্বে উচ্ছ্বসিত ফ্লোজিস্টন্‌বাদীরা তাঁদের ঐ মতবাদের অন্তর্গত বিরাট স্ববিরোধ এবং বিপুল ভ্রান্তিকে অবহেলা করে উদ্ভট সব পরিকল্পনা তৈরি করে ফেললেন—সেগুলি সম্পূর্ণতই অবৈজ্ঞানিক। তৎকালে বিজ্ঞানীরা একটি জিনিস লক্ষ্য করে-ছিলেন যে বাতাস না হলে দহনকার্য কিছুতেই চলতে পারে না। সে কথার সঙ্গে

সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য ফ্লোজিস্টন্‌বাদীরা বললেন যে দহনকালে ফ্লোজিস্টন্ তো একেবারে অন্তর্হিত হয়ে যায় না, দহন-কার্যের সঙ্গেই বাতাসের সাথে মিশতে থাকে মাত্র। সুতরাং মেশবার জন্য বাতাস না পেলে সে তো দাহ্য বস্তুটিকে ত্যাগ করতেই পারে না, দহন হবে কেমন করে? তখন বিজ্ঞানীরা আরও একটি জিনিস দেখেছিলেন যে, কোনও ধাতুকে পোড়ালে তার ওজন বেড়ে যায়। এর কারণ নির্ণয় ব্যাপারেও ফ্লোজিস্টন্‌বাদীরা দমলেন না। তাঁরা তখন আর একটি মতবাদও খাড়া করে তুললেন: ফ্লোজিস্টন্ কেবল একটি চূড়ান্ত হাল্কা পদার্থ নয়, মাধ্যাকর্ষণও তার ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না; বরঞ্চ 'ভারাবর্তন' (gravitation) বা মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে তার বিকর্ষণ ঘটে বলে, সে যে-বস্তুকে ভর করে থাকে, তার ভর (mass—একটি বস্তুতে যতটা পদার্থ থাকে সেই পদার্থত্বই তার ভর) কিংবা ওজন আগে থেকেই কমে থাকে; সেখান থেকে সে চলে গেলেই তবে ঐ বস্তুর আসল ভরটি ধরা পড়ে। একটি বস্তু থেকে অন্য বস্তু অপসৃত হলে তার ভর যে কমে যাওয়া উচিত—একথা ভাবতে তাঁরা রাজি হলেন না। অর্থাৎ যা আমরা বলেছিলাম,—চিন্তা ও যুক্তির বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি সম্বন্ধেও নানাবিধ প্রমাদ লক্ষিত হল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বিজ্ঞান-চিন্তা উন্নত হতে রইল। তার ফলে বহু ক্ষেত্রেই ফ্লোজিস্টন্‌বাদের ব্যর্থতা ধরা পড়ে যেতে লাগল।

অর্ধশত বর্ষব্যাপী রাজত্বকালের পর ফ্লোজিস্টন্-মতবাদকে ক্রমেই বিদায় গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু স্বয়ং বয়্যালের অনুমানও ত্রুটিমুক্ত ছিল না, যদিও সে অনুমানের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সততার দীপ্তি ছিল। ১৬৭৩ খ্রী.-এ তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে দহনকালে কোনও শোধক বা পাবক (অগ্নি) শক্তি (বা পদার্থ?)—'materia ignea'—ধাতুর মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় তার ভারকে বাড়িয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু ৭৫ বছর পরে ১৭৪৮ খ্রী.-এ রুশবিজ্ঞানী লমনস্‌ভ্ (M. V. Lomonosov—1711-'65) ভাবলেন যে ঐ পদার্থটি কোনও কল্পিত শক্তিমাত্র হতে পারে না। বাতাসের মধ্যে দহন-কার্যে যদি কোনো বস্তুর ভারবৃদ্ধি ঘটে, তাহলে এটাই সম্ভব যে, দহনকালে বায়ুকণাই ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার ভার বাড়িয়ে দেয়। বয়্যাল একটি রুদ্ধ কাচপাত্রে (বক যন্ত্রে) কিছু ধাতুকে উত্তপ্ত করছিলেন। কিছু ঝলসান পদার্থ সৃষ্টি হওয়ার পর তিনি যখন পাত্রটির সিল খুলে ফেললেন, তখন দেখলেন যে তার মধ্যে কিছুটা বাতাস প্রবেশ করল। তাতে তিনি কেবল ধরে নেন যে, পাত্রটি ভালভাবেই বায়ুনিরুদ্ধ ছিল। তারপর তিনি ধাতুসমেত পাত্রটি ওজন করে দেখেন যে, দহনের পূর্ববর্তী ওজন থেকে তার ওজন বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু লমনসভ্ ঐ একই পরীক্ষা চালান একটু ভিন্নভাবে। বায়ুনিরুদ্ধ অবস্থাতেই তিনি ধাতু সহ পাত্রটিকে

দু'বার ওজন করেন। একবার দহনের পূর্বে, আর একবার তার পরে। ওজনের হ্রাস বা বৃদ্ধি কিছুই ঘটেনি। তবে সিল ভেঙে তিনি তৃতীয় বারও ওজন করেছিলেন, ওজন বেড়ে গিয়েছিল। এ থেকে তিনি নিশ্চিতভাবেই ধরে নিয়েছিলেন যে বায়ু প্রবেশের জন্যই ঐ ওজন-বৃদ্ধি ঘটেছিল, কেবলমাত্র দহনের জন্য নয়। সুতরাং দহন-কার্যের মধ্যে সুপরিচিত বাতাস ছাড়া কল্পিত ফ্লোজিস্টন্ বা অপরিচিত কোনও বিশুদ্ধ পাবক (অগ্নি) শক্তির কোনও হাত নেই; ফ্লোজিস্টন্‌বাদ ভ্রান্ত অনুমান মাত্র। এক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক চিন্তার ভ্রান্তি বা প্রমাদ, এবং তারপর সেই ভ্রান্তি থেকে মুক্তির প্রমাণ নিশ্চিতভাবেই ধরা পড়ে।

কিন্তু বিভিন্ন বস্তুকে তার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া কালে বিভিন্ন সময়ে বার বার ওজন না করে দেখে লমনসভ্ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। এভাবে বস্তুর গঠন ও তাদের রাসায়নিক-প্রক্রিয়াগুলি সংখ্যাতত্ত্ব বা গণিততত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় রসায়ন-বিদ্যা একটি খাঁটি বিজ্ঞান শাস্ত্রে উন্নীত হল। লমনসভ্ উপরোক্ত পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধাতুকে দহন করে এবং বার বার তাদের ওজন করে একটি অবিসংবাদী তত্ত্ব নিরূপণ করলেন:

> রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণকারী সমস্ত বস্তুর মোট ভর (mass) প্রতিক্রিয়া শেষে উৎপন্ন নূতন বস্তু বা বস্তুসমূহের ভরের সঙ্গে হুবহু এক থাকে।

এই পরীক্ষিত সত্য বা তত্ত্বটি ভর (বা, ওজন)-সমষ্টির অপরিবর্তনীয়তার নিয়ম (Law of Conservation of Mass)-রূপে বিখ্যাত হল। এইভাবে দু' হাজার আড়াই হাজার বছর পূর্বেকার একদল পণ্ডিতের অনুমান-সিদ্ধান্ত একদিকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়ে যায়। অথচ প্রায় একই সময়ের আর একদল মনীষীর দার্শনিক চিন্তা এই দীর্ঘকালের ব্যবধান অতিক্রম করেও বিজ্ঞান মারফতে সত্যদর্শন বা ভূয়োদর্শন রূপে গণ্য হয়,—আড়াই হাজার বছর পূর্বে এঁরা ঘোষণা করেছিলেন:

> সাধারণভাবে বস্তুজগতের ক্ষয় নাই, বস্তুকে নূতন করে সৃষ্টি করাও চলে না, বিশ্বে বস্তুর মোট ভরপরিমাণ নির্দিষ্ট।

১৭৪১ খ্রী. নাগাত লমনসভ্ দু'রকম বস্তুকণার কথা কল্পনা করেছিলেন—(১) বস্তুর ক্ষুদ্রতম কণা বা মূল উপাদান। এগুলি ইন্দ্রিয়ের অগোচর থাকে এবং এগুলি অবিভাজ্য। এদের উপরেই বস্তুর গঠন ও প্রকৃতি নির্ভরশীল। এদেরই গুণের উপর নির্ভর করে বস্তুর গুণাবলী উপজাত হয়। (২) বৃহত্তর কণিকা—ক্ষুদ্রতম কণা বা মূল উপাদানের সংযোগেই এদের গড়ন বা ভর-প্রকৃতি উৎপত্তি লাভ করে। সমগ্র বস্তুটির গড়ন বা ধর্মও যা, এই কণিকার গড়ন বা

ধর্মও ঠিক তাই। ভিন্ন গড়নের এই সব কণিকা দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক বস্তু উপজাত হয়। এই কণিকাগুলি গতিশক্তি হারালে পরস্পরকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করে না। তাই এদের সংঘর্ষে কোনো পৃথক বস্তু উৎপন্ন হয় না। কিন্তু শৈত্য বা উত্তাপের দ্বারা যে বস্তুর পরিবর্তন ঘটে থাকে, তা' এদেরই গতির ফলে সম্ভব হয়।—লমনসভের এসব চিন্তার বিষয় তখন সুপ্রমাণিত হয়নি। কিন্তু আধুনিক অণু-পরমাণুবাদের সূচনা এখান থেকেই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন ও অক্সিজেন [অক্সিজেনের আবিষ্কারকদের নাম ও আবিষ্কার কাল—Karl Wilhelm Scheele (1742-86), 1774; Joseph Priestley (1773-1804), 1775] প্রভৃতি গ্যাসের আবিষ্কার হয়। এদের মধ্যে বিশেষ করে অক্সিজেন গ্যাসের আবিষ্কারটি (1774-75) খুব তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে। ১৭৭৩ খ্রী.-এ ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভইসিয়ে (Antoine Laurent Lavoisier---1743-94) বয়্যাল ও লমনসভের পরীক্ষাগুলি আরও নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, কোনো ধাতুকে উত্তপ্ত করার সময় ঐ ধাতুটি পাত্রমধ্যস্থ সবটা বাতাসই শুষে নেয় না, নেয় তার খানিকটামাত্র। আর সেই শুষে নেওয়া বাতাসের ওজন হয়, ধাতুটিকে উত্তপ্ত করার পর ধাতুর ওজন যতটা বাড়ে, ততটাই। অল্পকাল পরে তিনি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করলেন যে, বাতাসের যে অংশটি ধাতুর সঙ্গে এভাবে যুক্ত হয়, তা ঐ সদ্য-আবিষ্কৃত অক্সিজেন গ্যাস ব্যাতিরেকে অন্য কিছু নয়। শুধু তাই নয়, বাতাসের যেটুকু অংশ বাকি পড়ে থাকে, তা কিন্তু অক্সিজেনের মত দহনকার্যের সাহায্য করতে পারে না। বিজ্ঞানী তার নাম দিলেন 'অ্যাজোট' বা নিষ্প্রাণ (without life)। কিছু পরে ১৭৯০ খ্রী.-এ চ্যাপ্‌ট্যাল (J. A. Chaptal) একেই নাইট্রোজেন নামে আখ্যাত করেন। এই নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন ছাড়া বাতাসে আর যা থাকে তার পরিমাণ নগণ্য। কিন্তু ল্যাভইসিয়ের পরীক্ষাতে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয়ে গেল যে দহন কার্যের কারণ হিসাবে ধাতু আর ফ্লোজিস্টনের মধ্যে যে বিশ্লেষণ ঘটে বলে কল্পনা করা হয়েছিল, তা' সম্পূর্ণতই অর্থহীন। বস্তুত, দহনকালে ধাতুর সঙ্গে অক্সিজেনের সংযোগ ঘটে বলেই ধাতুর সাথে ঐ সংযুক্ত অক্সিজেনের ওজনটি যোগ হয়ে গিয়ে তার ওজনকে বাড়িয়ে দেয়।

ফ্লোজিস্টন্‌বাদ বিধ্বস্ত হয়ে গেল। ধাতুর সঙ্গে যে ফ্লেজিস্টন্‌ মিশে থাকে, এ ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রসায়ন সংক্রান্ত ধারণাগুলিকে বিচার করে দেখার দরকার হল। ধাতুগুলি তাহলে আর ধাতুভস্ম এবং ফ্লোজিস্টনের সমবায়ে গঠিত কোনো বস্তু নয়, সেগুলি অবিমিশ্র বিশুদ্ধ ধাতুই।

বাতাসও কোনো মৌলিক পদার্থ নয়, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসের সংযোগে গঠিত একটি যৌগিক বস্তু। জল মাটিও তাই। বরং বলা যেতে পারে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, সালফার প্রভৃতি উপাদানই রাসায়নিকভাবে মূল পদার্থ। পৃথিবীর মূল উপাদান সম্বন্ধে প্রাচীন কালের ঋষি ও দার্শনিকবৃন্দের যে ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ সংক্রান্ত সুপ্রিয় মতবাদ (পৃ. ২-৩), তা তাঁদের সুবিপুল খ্যাতি ও শ্রদ্ধেয়তা সত্ত্বেও যে ভ্রান্ত, তা জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। তবে আগুনের তেজ ছিল বটে। স্বয়ং ল্যাভইসিয়ে পর্যন্ত তাঁর এতকালের দহন প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারলেন না। তিনিও ধরে নিলেন, আগুন হয়ত একটি ভারহীন পদার্থ হবেও বা। তাঁর রাসায়নিক বস্তু তালিকার মধ্যে তিনি তাকে 'থার্মোজেন্' নাম দিয়ে উপযুক্ত আসন দান করলেন।

তাই বলে ল্যাভইসিয়ের অন্যান্য আবিষ্কারগুলির মান তাতে কমে যায়নি। তাঁর ঐ অক্সিজেন-তত্ত্বের আবিষ্কার যুগান্তকারী। এ দিয়ে সমগ্র রসায়ন-শাস্ত্র নূতন পথের সন্ধান পেয়েছে এবং একে দিয়ে ল্যাভইসিয়ে নিজেও বড় কম কাজ করিয়ে নেননি। পূর্ববর্তী ভরসমষ্টির অপরিবর্তনীয়তার তত্ত্বকে তিনি আরও বিকশিত করে তুললেন। তিনি প্রমাণ করলেন :

> প্রতিক্রিয়া শেষ হয়ে গেলে অংশগ্রহণকারী বস্তুসমূহের ভরের মোট পরিমাণই যে কেবল অপরিবর্তনীয় থাকে তাই নয়, তখনও তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ ভরও অক্ষুণ্ণ থেকে যায়।

এর তাৎপর্যও প্রভূত। অর্থাৎ অংশগ্রহণকারী মৌলিক পদার্থগুলি যদি কতকগুলি কণিকার সমষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া শক্তির দ্বারা তাদের কোনও পরিবর্তন ঘটতে পারে না। সুতরাং তারা অক্ষয় ও অব্যয়। তবে এ সিদ্ধান্তের একটি অন্ধকার দিকও ছিল।—সেই সময় রাসায়নিক শক্তির প্রচণ্ডতার বিষয় সর্বত্রই উপলব্ধ হয়েছিল। কণিকা সংক্রান্ত ব্যাপারে তার চাইতে কোনও বৃহত্তর শক্তির কল্পনা তখন অসম্ভব ছিল। ফলে, মূল কণিকার ঐ অক্ষয়ত্বের ধারণা বৈজ্ঞানিকদের মনে প্রায় বদ্ধমূল হয়ে যায়।

কিন্তু কণিকাবাদ (corpuscular theory) সম্বন্ধে লমনসভের ধারণা হয়েছিল যে, কোনও মিশ্র পদার্থের প্রত্যেকটি কণিকাও মিশ্র প্রকৃতির—সে প্রকৃতি ঐ সমগ্র বস্তুরই প্রকৃতিকে প্রকাশ করে। তাই ঐ মিশ্র কণিকাটির গঠনপদ্ধতি সুনির্দিষ্ট। কারণ, যে সুনির্দিষ্ট সম্পর্কের মাধ্যমে কতকগুলি মৌলিক বস্তু একটি সমগ্র মিশ্র বস্তুকে গড়ে তুলে, একটি মিশ্র কণিকার গড়নের মধ্যেও সেই নিয়মই বর্তমান। লমনসভ্ তাঁর এই চিন্তার বিষয়টিকে প্রমাণ করেননি। এটি কেবল তাঁর

অনুমানমাত্র ছিল। আর ল্যাভইসিয়ের মৌলিক বস্তুর অবিনশ্বরতার তত্ত্ব থেকে যে সিদ্ধান্ত টানা যায়, তাতেও কণিকার প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনও সুনির্দিষ্ট ধারণায় আসা যায় না। সেজন্য আরও পরীক্ষা এবং প্রমাণের প্রয়োজন ছিল। ১৮০১ খ্রী. থেকে ১৮০৭ খ্রী. পর্যন্ত ফরাসী বিজ্ঞানীদ্বয় প্রাউস্ট্ (Joseph Louis proust—1754-1826) এবং বার্থোলেকে (Claude Louis Berthollet—1748-1822) কেন্দ্র করে এই বিষয় সম্বন্ধে বিতর্কের ঝড় বয়ে যায়। প্রাউস্ট্ পূর্ববর্তী লমনসভ্ আভাসিত এবং ল্যাভইসিয়ে সমর্থিত নির্দিষ্ট অনুপাতের ধারণাকে জোরদার করে বললেন, যে প্রক্রিয়াতেই হক না কেন, একাধিক বস্তুকে রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে যৌগিক বস্তু গঠন করতে গেলেই তাদের পরিমাণের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট অনুপাত থাকা চাই। কোনও যৌগিক (একাধিক মৌলিক উপাদানে গঠিত বস্তু, কিন্তু সাধারণ বা ভৌত অর্থাৎ স্থূলদেহ-বিষয়ক প্রক্রিয়ার দ্বারা তাকে সহজে বিচ্ছিন্ন করে তার উপাদানগুলিকে পৃথক করা যায় না) বস্তুকে বিশ্লেষণ করে কেবল তাদের মূল উপাদানগুলির পরিমাণ জানলে হয় না। মূল উপাদানগুলির পরিমাণ পূর্বেই জেনে নিয়ে সেগুলিকে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা একত্র সম্মিলিত বা সংশ্লিষ্ট করেও দেখা দরকার,—কোনো উপাদানের কোনো অংশ সংযুক্ত না হয়ে বাকি পড়ে থাকে কিনা। এসব পরীক্ষা ভালভাবেই করে দেখা হল, এবং জানা গেল :

> কতকগুলি উপাদানকে রাসায়নিকভাবে যুক্ত করে অন্য একটি যৌগিক বস্তু গঠন করতে হলে তাদের পরিমাণের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক বা অনুপাত বজায় রাখতেই হবে।

বার্থোলে যতগুলি ক্ষেত্রেই দেখলেন যে, উপাদানগুলির মধ্যে সুনির্দিষ্ট অনুপাত না রাখলেও তাদের মিলন ঘটছে এবং অন্য বস্তুর গঠন সম্ভব হচ্ছে, প্রাউস্ট্ তার সবগুলি ক্ষেত্রেই প্রমাণ করে দিলেন যে, ঐ সংগঠিত বস্তুগুলি মিশ্র-পদার্থ হতে পারে, কিন্তু তারা কিছুতেই রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে পৃথক ধর্মবিশিষ্ট কোনো বিশুদ্ধ যৌগিক বস্তুকে সংগঠিত করতে পারে না। রাসায়নিকভাবে যৌগিক বস্তু তৈরি করতে গেলে তার উপাদানগুলির মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট অনুপাত বজায় রাখতেই হবে। এই তত্ত্বটি নির্দিষ্ট অনুপাতের নিয়ম (Law of Definite Proportions) নামে পরিচিত হল।

এই তত্ত্বকে অবলম্বন করে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ড্যাল্টন (John Dalton—1766-1844) ১৮০৩ খ্রী. থেকে গবেষণার কাজ আরম্ভ করে দিলেন। প্রথমে তিনি দেখতে চাইলেন, কোনো উপাদানের অন্য উপাদানের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার ক্ষমতা কি রকম।

এটি দেখতে গেলে কোনও একটি উপাদানকে এক-ভারবিশিষ্ট বলে কল্পনা করে নিতে হয়। তারপর তার সঙ্গে ঐ তুলনায় কত ভার বা কত ওজনের অন্য একটি উপাদানের রাসায়নিক সংযোগ ঘটে, তা দেখা দরকার। তাহলেই প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের তুলনা করে জানা যাবে, একটি উপাদানের অন্য একটি উপাদানের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার নির্দিষ্ট ওজন বা তুল্যাঙ্ক (equivalent weight) কত। আবিষ্কৃত গ্যাসগুলির মধ্যে হাইড্রোজেনের ওজন সব চাইতে কম বলে ড্যাল্টন এই হাইড্রোজেনকেই এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন মূল পরিমাপ বা একক বলে ধরে নিলেন। তারপর তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন একভাগ ওজনের হাইড্রোজেন গ্যাসের সঙ্গে কতভাগ ওজনের অন্য একটি উপাদান যুক্ত হয়ে যৌগিক গঠন করে। সেই ওজনটিকেই তিনি ঐ উপাদানের সংযুক্ত হওয়ার ওজন বা তুল্যাঙ্ক বলে গ্রহণ করলেন। কিন্তু পরে এ অনুমান অসুবিধেজনক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, যেসব উপাদান হাইড্রোজেনের সঙ্গে রাসায়নিকভাবে মিশে যৌগিক সৃষ্টি করতে পারে না, তাদের বেলায় কি হবে? দেখা গেল হাইড্রোজেনের সঙ্গে ঐভাবে না মিশলেও বেশির ভাল উপাদানই অক্সিজেনের সঙ্গে ঐভাবে মিশে যায়। সুতরাং পরে এই অক্সিজেনকেই একক ধরে নিয়ে তার তুলনায় অন্যান্য পরমাণুর আপেক্ষিক বা তুলনামূলক ওজন স্থির করাই সাব্যস্ত হয়। ড্যাল্টন দেখেছিলেন যে একভাগ ওজনের হাইড্রোজেনের সঙ্গে প্রায় আটভাগ ওজনের অক্সিজেন যুক্ত হয়ে যৌগিক গঠন করে। সুতরাং এই অক্সিজেনের মাপকেই সর্বনিম্ন মূল মাপ বা একক ধরে, এবং তাকে পুরাপুরি আট ওজনেরই উপাদান কল্পনা করে দেখা গেল যে এই ওজনের অক্সিজেনের সঙ্গে যত পরিমাণ হাইড্রোজেন মিশ খায়, তার যথার্থ ওজন হয় ১'০০৮। আবার এই ১'০০৮ ওজনের হাইড্রোজেনের সঙ্গে ৩৫'৫ ভাগ ওজনের ক্লোরিন রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়। আর এই তিনটি উপাদানের কোনো না কোনো একটি অন্য উপাদানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌগিক গঠন করতে পারে। সুতরাং ড্যাল্টন নির্দিষ্ট-অনুপাতের তত্ত্বের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন পরীক্ষার পর জানিয়ে দিলেন যে, রাসায়নিক ক্রিয়াকালে উপাদান-গুলির ওজনের অনুপাত যে সুনির্দিষ্ট থাকে, তা তার এই সংযুজ্য ওজন বা তুল্যাঙ্কের উপর নির্ভর করেই। তখন এ সম্বন্ধে তাঁর এই তুল্যাঙ্কের তত্ত্বটিকে ঠিকভাবে রূপদান করা সম্ভব হল। তত্ত্বটি পরিণত রূপ লাভ করে এইভাবে :

> সংযোজন বা বিয়োজন রূপ রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ঘটলে ঠিক যে পরিমাণ ওজনের একটি উপাদান ১'০০৮ ভাগ ওজনের হাইড্রোজেন, বা ৮ ভাগ ওজনের অক্সিজেন, বা ৩৫'৫ ভাগ ওজনের ক্লোরিনের সঙ্গে সংযুক্ত, বা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, সেই ওজনটিই ঐ উপাদানের তুল্যাঙ্ক।

কিন্তু এই ওজন সম্পর্কিত পরীক্ষাগুলি করতে গিয়ে ড্যাল্টন আরও একটি আশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করলেন। ক্রমেই জানা হয়ে আসছিল, কোন্ কোন্ উপাদান তাদের ওজনের কি কি অনুপাতে সংযুক্ত হলে তৎসংক্রান্ত যৌগিক বস্তু গঠিত হতে পারে। এবং তা থেকে এটাও বেশ স্পষ্ট হয়ে এল যে, মৌলিক পদার্থ মাত্রেরই গঠনটিও তাহলে বেশ সুনির্দিষ্ট। অর্থাৎ তাদের মূল কণাগুলিও সুগঠিত এবং এক অপরিবর্তনীয় নিয়মে সুঘটিত। এই সুসংগত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেই ১৮·৩ খ্রী.-এ বিজ্ঞানী ড্যাল্টন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুমান সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি জানালেন:

> দুটি উপাদানকে বিভিন্ন অনুপাতে যুক্ত করে বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন যৌগিক গঠন করা যেতে পারে (অবশ্য তখন ঐ উপাদানের তুল্যাঙ্কও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হতে বাধ্য)। কিন্তু সেই যৌগিকগুলির গঠনকালে যদি একটি উপাদানের ওজন সব ক্ষেত্রে একই রাখা যায়, তাহলে ঐ যৌগিক-গুলির মধ্যে অন্য উপাদানটির যে ভিন্ন ভিন্ন ওজন দরকার হয়, সেগুলির অনুপাত সরল থাকে (এবং সেগুলিকে ছোট ছোট সংখ্যা দিয়েই প্রকাশ করা যায়)—অর্থাৎ সেগুলি ১ : ২, ২ : ৫, ৩ : ৫, ৫ : ৭ এরকম হয়; কখনও তারা ১·৩ : ২·৫ বা ৩·৫ : ৪·৭ এরূপ হয় না।

শীঘ্রই পরীক্ষার মারফতে জানা গেল যে, মিথেন এবং এথিলিন নামে দুটি কার্বন-হাইড্রোজেন ঘটিত গ্যাসের মধ্যে হাইড্রোজেনের ওজন পরিমাণ এক থাকলে দুটি যৌগিকের কার্বনের ওজন পরিমাণ হয় যথাক্রমে ৩ ও ৬। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দুটি যৌগিকের কার্বনের অনুপাত দাঁড়াল ৩ : ৬ বা ১ : ২। অর্থাৎ একটি সরল অনুপাত। [নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন ঘটিত যৌগিকগুলিতেও সর্বক্ষেত্রে নাইট্রোজেনের ওজন পরিমাণকে এক রাখলে দেখা যায় যে নাইট্রাস্-অক্সাইড, নাইট্রিক অক্সাইড, নাইট্রোজেন ট্রাই-অক্সাইড, বা নাইট্রাস অ্যান্‌হাইড্রাইড, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড বা নাইট্রিক অ্যান্-হাইড্রাইড নামক যৌগিকগুলিতে অক্সিজেনের পরিমাণ হয় যথাক্রমে ৫৭, ১·১৪, (= ৫৭×২), ১·৭১ (= ·৫৭×৩), ২·২৮ (= ·৫৭×৪), ২·৮৫ (= ·৫৭×৫)। অর্থাৎ এদের অনুপাত হল ১ : ২ : ৩ : ৪ : ৫; অর্থাৎ সরল অনুপাত।] ড্যাল্টন কর্তৃক উদ্ভাবিত এই তত্ত্বটি গুণিতক অনুপাতের নিয়ম (Law of Multiple Proportions) বলে পরিচিত হলেও এই নামটি যে ঠিক নয়, তা সহজেই বোঝা যায়। কারণ, উপরি উক্ত অনুপাতের সংখ্যাগুলি পূর্ণ সংখ্যা হলেও যৌগিকের উপাদানদ্বয়ের একটি অন্যটির গুণিতক (অর্থাৎ দ্বিগুণ, তিনগুণ, পাঁচগুণ এরকমের) বা গুণনীয়ক (অর্থাৎ দু-

ভাগের বা তিন-ভাগের বা পাঁচ-ভাগের এক ভাগ এরকমের) নয়। একটি উপাদানের ওজন ঠিক থাকলে যৌগিকগুলির অন্তর্গত দ্বিতীয় উপাদানটির ওজনের অনুপাতগুলি সরল হয়, এটিই এই নিয়মের সার কথা। সুতরাং তত্ত্বটিকে গুণিতক অনুপাতের নিয়ম না বলে সরল অনুপাতের নিয়ম (Law of Simple Proportions) বললেই ঠিক হয়। কিন্তু যাই হোক না কেন, এ তত্ত্বের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। ঐ দ্বিতীয় উপাদানটি তো ১ : ২ বা ১ : ৩—এ রকম অনুপাতে যুক্ত না হয়ে ১.২ : ৩.৪ বা ২.৩ : ৫.৮ -এ রকম অনুপাতে যুক্ত হতে পারত। কিন্তু তা তো কখনই হয় না। প্রথম উপাদানটি যেন তার একটি বিশেষ কণিকা-বাহিনী নিয়ে দ্বিতীয় কোনো একটি উপাদানের একটি বিশেষ কণিকা-বাহিনীর সঙ্গেই সন্ধি করতে প্রস্তুত, নচেৎ ঐ দ্বিতীয়টির আর একটি বর্ধিত বাহিনীর সঙ্গে, না হলে আর একটির। অর্থাৎ দ্বিতীয় উপাদানটির কণিকা-বাহিনীগুলি যেন ঝাঁকে ঝাঁকে এবং ধাপে ধাপে এগিয়ে আসে। এক ধাপ থেকে আর এক ধাপ, মধ্যবর্তী কোনও অবস্থা নয়। হয় ৫, না হয় ৬ বা ৭। মধ্যবর্তী ৫½ বা ৬⅓-এর কোনও স্থান নেই প্রকৃতির জগতে। মধ্যবর্তী-কালীন সন্ধির পরিকল্পনা কল্পনা মাত্র, তা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ। যৌগিকগুলির মধ্যে গুণগত পরিবর্তন ঘটাতে গেলেই সেখানে পরিমাণগত ভাবে উল্লম্ফন অনিবার্য। কিন্তু ঐ কণিকাগুলি এরকম বাহিনীগত ভাবেই বা লাফ দিতে দিতে চলছে কেন? তাহলে কি একদিকে তাদের গড়ন যেমন সুগঠিত, অন্যদিকে তেমনি উৎস নির্বিশেষে সংগৃহীত একটি বিশেষ উপাদানের সমস্ত পরমাণুর (কাঠামো এবং) ওজনটিও হুবহু এক?—যার জন্যেই অন্য কোনো একটি উপাদানের নির্দিষ্ট কণিকাগোষ্ঠীর দলযুক্ত হওয়ার সময় তার (প্রথম উপাদানটির) নিজ কণিকাসমষ্টির মোট একটি ওজন তার নিজেরই অন্য কণিকাজোটের আর একটি মোট ওজনের দ্বারা সম্পূর্ণরূপেই বিভাজ্য হয়ে যাওয়ায় কোন ভাগশেষ আর থাকে না এবং তার ফলে তাদের অনুপাতটিও ১ : ২ বা ৩ : ৪এর মত সরল অনুপাতে প্রকাশিত হয়, [অথচ ১.৩ : ২.৫এর মত কোনো অনুপাতে যুক্ত হতে পারে না]! তাহলে তো মূল পরমাণু রূপ কণিকার কল্পনাটি মিথ্যে নয়, সে তো অপরিহার্য! সহস্র সহস্র বৎসরের ভাসমান দার্শনিক চিন্তাধারা ও জল্পনা-কল্পনা কি তাহলে এত দিন পরে শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মারফতে বাস্তবিকই একটি সত্যের প্রতিষ্ঠাভূমিতে এসে ঠাঁই পেল! এক অদ্ভুত উদ্দীপনায় ভরে গেল বিজ্ঞানীর মন। সুইজার্ল্যাণ্ডবাসী খ্যাতিমান বিজ্ঞানী বন্ধু বার্জেলিয়াসকে (Jons Jakob Berzelius—1779-1848) ড্যাল্টন লিখে পাঠালেন :

পারমাণবিক পরিকল্পনাকে অর্থাৎ পরমাণুরূপ কণিকাকে মেনে না নিলে গুণিতক অনুপাতের তত্ত্ব তো মিথ্যে হয়ে যায়!

ড্যাল্টন তাঁর পরীক্ষা ও সিদ্ধান্তগুলি থেকে পরমাণু ও তার প্রকৃতি সম্বন্ধে এতকাল পরে একটি গ্রহণযোগ্য মতবাদ গড়ে তুলতে সমর্থ হলেন। তা নিম্নোক্তরূপ:

(১) প্রত্যেকটি বস্তুই কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র কণা বা পরমাণুর সমষ্টি,—পরমাণুগুলি পারস্পরিক আকর্ষণে বদ্ধ হয়েই ঐ বস্তুটিকে উৎপন্ন করে।

(২) প্রত্যেক বস্তুরই তার নিজস্ব পরমাণু আছে। সরল বস্তুর পরমাণু অবিভাজ্য ও সরল প্রকৃতিবিশিষ্ট, কিন্তু জটিল বস্তুর পরমাণু জটিল। রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াকালে সেই জটিলতা ভেঙে গিয়ে সেটি কতকগুলি সরল কণিকায় পুনঃপ্রবর্তিত (পরিণত) হয়।

(৩) প্রত্যেকটি বস্তুর সব পরমাণুই আকারে ও ওজনে হুবহু এক, অন্য বস্তুর সরল বা জটিল পরমাণু থেকে তা ভিন্ন। একটি জটিল পরমাণুর ওজন তার অন্তর্গত সরল পরমাণুগুলির মোট ওজন মাত্র।

(৪) কতকগুলি জটিল পরমাণু একত্র হওয়ার ফলে কোনও জটিল বস্তুর উদ্ভব ঘটে। কিন্তু এক একটি জটিল পরমাণু কতকগুলি সরল পরমাণুরই এক একটি বিশেষ সমাবেশ মাত্র। এই কারণে দুটি উপাদান বিভিন্ন সমাবেশে মিলিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন যৌগিক গঠন করতে পারে।

ড্যাল্টন কিন্তু ধরে নিয়েছিলেন যে, পরমাণুর নিজস্ব গতি নাই, ল্যাভইসিয়ে-কল্পিত থার্মোজেন নামক উপাদানের শক্তিতেই তারা গতিবান হয়।

ড্যাল্টনের মতবাদ থেকে পরমাণু সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে একটি সংগত ধারণায় পৌছান গেল। কিন্তু সে সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিত হতে গেলে তাদের প্রত্যেকেরই বাস্তব গঠন, কাঠামো এবং প্রকৃত ওজন সম্বন্ধে নিশ্চিত হতেই হয়। সে তো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। মানুষ কল্পনার বাহাদুরি দেখাতে পারে। কিন্তু বাস্তবভাবেই যদি পরমাণুর অস্তিত্ব থেকে থাকে, তাহলে মানুষের চর্মচক্ষুর সে সাধ্য কোথায়, যা দিয়ে সে পরমাণুবিশেষকে তার বাস্তব স্বরূপে দেখে নিতে পারবে? এমনকি, কোথায় তার সে বুদ্ধিটকুও, যা দিয়ে সে পরমাণুর ওজন মাপবার একটি যন্ত্র বানিয়ে নিতে পারে? কেবলমাত্র কিভাবে ভাবা যায়, সেইটকুই সে আয়ত্ত করতে চলেছে। প্রাচীনকালের মানুষ. তা তাঁরা যতবড় ঋষি বা দার্শনিক হ'ন না কেন, সেটুকুও তাঁদের ছিল না। কিন্তু আলোকপিয়াসী তাঁদের অনেকেই সুড়ঙ্গ-পথে অন্ধের মত হাতড়াতে আরম্ভ করেছিলেন। সে চলার শেষ ছিল না। তাই বুঝি এই সুন্দর জগতের কত প্রেমিককেই না জীবনান্ত হতে হয়েছে। কত

গেছে, কত এসেছে। মনুষ্য সমাজের স্বার্থান্ধ একাংশের চক্রান্তের ফলেই হয়ত নিঃস্বার্থ অন্য অংশকে মর্মান্তিক ভাবে নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে। হয়তো বা কাউকে একেবারে পিছনে ফিরেই চলে যেতে হয়েছে। কিন্তু তাদের সকলের চলার সম্মিলিত বা শেষ ফলটি অগ্রগতি হিসেবেই গণ্য হয়েছে। তাইত শেষ পর্যন্ত মানব-সমাজ সূর্যদয়ের আলোকাভাস পানে এগিয়ে আসতে পেরেছে। এবং সেই কারণেই এতকাল পরে তার এমনভাবে ভাবতে শেখা! এমন বৈজ্ঞানিকভাবেই ভাবা! বিপুল এ বিশ্বের সবটকু জেনে নেওয়া,—সে কি সহজ কথা! কিন্তু তার সর্বব্যাপী নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে মানুষ তো ক্রমে ক্রমে ঠিকভাবেই ভাবতে শিখছে। না'ই বা হল এখন তার কিছুকালের জন্য একেবারে পরমাণু-জগতের সমুজ্জ্বল রূপটিকে দেখে নেওয়া। মনশ্চক্ষুটি তো তার এখন অনেকটা পূর্ণতাভিমুখী। অর্থাৎ তার তাত্ত্বিক চিন্তাটিও। তাই দিয়ে কি পরমাণুগুলির সত্যিকারের রূপটুকু না হ'ক, তার সত্যিকারের ওজনটিও না হ'ক, তাদের পারস্পরিক ওজনের সম্পর্কটি অর্থাৎ একের তুলনায় অন্যের ওজনটি কতগুণ বেশি বা কম, সেটুকুও নির্ণয় করে নেওয়া যায় না? সেই চেষ্টাই করলেন ড্যাল্টন। ভাবলেন, ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর অন্তত একটি তুলনামূলক বা আপেক্ষিক ভার নির্ণয় করে দেখবেন। হাইড্রোজেন গ্যাস তো সব চেয়ে হাল্কা। সুতরাং তার পরমাণুটিও সম্ভবত অন্যান্য পরমাণুর চেয়ে হাল্কা হবে। তাহলে এই হাইড্রোজেন পরমাণুকেই পারমাণবিক ওজনের একক ধরে নিতে ক্ষতি কি?

ক্ষতি না থাকলেও এর দ্বারা যে সুরাহা হবে তাও তো মনে হল না। তখন এটি জানা গিয়েছিল যে জলের মধ্যে অক্সিজেনের ওজন থাকে আটভাগ আর হাইড্রোজেনের ওজন থাকে এক ভাগ সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, জলের একটি মিশ্র পরমাণুর মধ্যেও এ ভাগ বজায় থাকবে। অর্থাৎ সেখানেও থাকবে একভাগ ওজনের হাইড্রোজেনের সঙ্গে আটভাগ ওজনের অক্সিজেনের যোগ। কিন্তু হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের ক'টি করে সরল-পরমাণু একসঙ্গে যুক্ত হয়ে জলের একটি জটিল-পরমাণু গঠন করে, তাতো জানা নেই। ধরা যাক সেখানে হাইড্রোজেনের পরমাণু সংখ্যা এক, এবং অক্সিজেনের পরমাণু সংখ্যা দুই। সুতরাং সেখানে যদি একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন এক এবং দুটি অক্সিজেন-পরমাণুর ওজন আট হয়ে থাকে, তাহলে একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর তুলনায় একটি অক্সিজেন পরমাণুর ওজন হবে চার। কিন্তু যদি জলের একটি জটিল-কণিকাতে উভয়ের পরমাণু সংখ্যা এক এক করে হয়, তাহলে অক্সিজেনের একটি পরমাণুরই ওজন দাঁড়াবে আট। আর সেখানে হাইড্রোজেনের পরমাণু সংখ্যা দুই ধরে

অক্সিজেনের পরমাণু সংখ্যা এক ধরলে হাড্রোজেনের পরমাণুর তুলনায় অক্সিজেনের একটি পরমাণুরই ওজন হয়ে যাবে ষোল। সুতরাং এ এক বিষম সমস্যা! এর সঠিক সমাধান না পেয়ে ড্যাল্টন আপাতত ধরে নিলেন যে উভয় উপাদানেরই একটি করে সরল পরমাণু মিলিত হয়ে জলের একটি জটিল পরমাণুর উৎপত্তি হয়। সুতরাং হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ওজনকে এক বলে ধরে নেওয়ায় অক্সিজেনেরও পারমাণবিক ভার আপাতত ঠিক হয়ে রইল আট। এই ধারণাই দীর্ঘকাল যাবৎ বজায় রইল যে, কোনও পরমাণুর পারমাণবিক ওজন, আর তার তুল্যাঙ্ক (অর্থাৎ অন্য পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ওজন) একই।

কিন্তু কিছুকালের মধ্যে এতে বিষম সমস্যা দেখা দিল। প্রথমত, দেখাই ত' গেছে, বিশেষ ওজনের একটি উপাদান ভিন্ন ভিন্ন ওজনের অন্য একটি বিশেষ উপাদানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন যৌগিক গঠন করতে পারে। যেমন দেখা গেছে, কিউপ্রিক অক্সাইড গঠনের সময় ৮ ভাগ ওজনের অক্সিজেনের সঙ্গে ৩১.৮ ভাগ কপার (তামা) যুক্ত হয়; অথচ কিউপ্রাস অক্সাইড গঠনের সময় ঐ আট ভাগ ওজনের অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয় ৬৩.৬ ভাগ কপার (তামা)। তাহলে এক্ষেত্রে কপারের সংযুজ্য-ওজন বা তুল্যাঙ্ক একবার দেখা গেল ৩১.৮, অন্য বার ঠিক তার দ্বিগুণ। তাহলে এর তুল্যাঙ্ক দু'বার দু' রকম হল বলে কি এর পারমাণবিক ওজনও দু' বার দু' রকম হবে? সত্যিই এ এক সমস্যা বটে। কিন্তু আরও গোল বাধল। অ্যামোনিয়া গ্যাসকে তার দুটি উপাদান হাইড্রোজেন আর নাইট্রোজেনে বিশ্লিষ্ট করলে দেখা যায় যে, নাইট্রোজেনের তুল্যাঙ্ক (বা পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার পারমাণবিক ভার) হচ্ছে ৪$\frac{২}{৩}$, অথচ নাইট্রিক অক্সাইড গঠনের সময় তার তুল্যাঙ্ক (অর্থাৎ পারমাণবিক ভার) হয় সাত। যদি অ্যামোনিয়ার একটি জটিল পরমাণুতে একটি নাইট্রোজেন-পরমাণু থাকে বলে ধরা যায়, তাহলে কি নাইট্রিক অক্সাইডের একটি জটিল পরমাণুতে নাইট্রোজেনের পরমাণুর সংখ্যা হবে ১$\frac{১}{২}$?—যেহেতু ৪$\frac{২}{৩}$-এর দেড়গুণ হয় সাত? তাহলে তো ধরে নিতে হয় যে, নাইট্রোজেন-পরমাণু দ্বিধা বিভক্ত হয়! বিজ্ঞানী তখন চোখে অন্ধকার দেখলেন। তিনিই না ইতিপূর্বে ঘোষণা করে দিয়েছেন, পরমাণু অবিভাজ্য, তাকে ভাঙা যায় না! তাহলে তো পরমাণু সম্বন্ধে ড্যাল্টনের উপস্থাপিত তত্ত্বের মধ্যে কোথাও গলতি থেকে গিয়েছে।

কিন্তু বিজ্ঞানের সাধনা একক মানুষের সাধনা নয় যে, একজন মানুষ

কাঁকতালে এসে মুফৎসে তার একক সিদ্ধিটি মেরে নিয়ে চলে যাবেন। বিজ্ঞানের মহাতীর্থে শত সাধকের সহস্র চিন্তার সংযোগ ঘ'টে এক মহামানবমনের অভ্যুদয় ঘটছে। সেই মহামানবমন সমগ্র বৈজ্ঞানিক সমাজের। তা' কোনও একক মানবের সামগ্রী নয়। এই একজনের অপূর্ণতা অন্য জনে পূরণ করে দিলে তবে সেখানে সামগ্রিক গতি সম্ভব হয়। ড্যাল্টনের অপূর্ণতা কিন্তু পূর্ণ হয়ে গেল অচিরেই আর দুজন সাধকের দ্বারা। সেকালের একজন ফরাসী বিজ্ঞানী গে লুসাক্ (Joseph Louis Gay Lussac—1778-1850) গ্যাস সম্বন্ধে একটি মূল্যবান তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। গ্যাসের তাপমূলক বৃদ্ধির নিয়ম (Law of Thermal Expansion of Gases) নামে সেটি পরিচিত হয়। তদনুযায়ী :

> কোনো গ্যাসের তাপের এক ডিগ্রী পরিবর্তন ঘটলেই দেখা যায় যে ঐ গ্যাসের শূন্য ডিগ্রী উষ্ণতায় যে আয়তন ছিল, তারই $\frac{১}{২৭৩}$ ভাগ আয়তনের পরিবর্তন ঘটে যায় (এক ডিগ্রী বাড়লে ঐ $\frac{১}{২৭৩}$ ভাগ বাড়ে এবং এক ডিগ্রী কমলে ঐ $\frac{১}{২৭৩}$ ভাগ কমে)।

১৮০৪ থেকে ১৮০৮ খ্রী.-এর মধ্যে গে লুসাক গ্যাস সম্বন্ধে নানা প্রকার গবেষণার পর গ্যাসগুলির সংযুক্ত আয়তনের একটি নিয়মও (Law of Combining Volumes) প্রকাশ করলেন। সেই রাসায়নিক নিয়মানুযায়ী :

> প্রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী উপাদানের প্রত্যেকটি, এবং তাদের সমবায়ে উৎপন্ন যৌগিক, –এদের সকলেরই আয়তনের মধ্যে যে অনুপাত থাকে, তা ছোট ছোট গোটা সংখ্যা দিয়েই প্রকাশ পায়।

অবশ্য অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি গ্যাস, এবং তাদের দ্বারা উৎপন্ন গ্যাসটিকে একই চাপ ও একই উষ্ণতায় রেখে মাপতে হবে। কারণ, বয়্যালই আগে প্রমাণ করেছেন যে, কোনো গ্যাসের চাপ বাড়ালে তার আয়তন কমে যায়, (PV = ধ্রুবক, পৃ. ১৭) এবং চার্লস্ (Jacques Alexander Ce'sar Charles—1 46-1823) প্রমাণ করেছেন, গ্যাসের উষ্ণতা (Temperature বা T) বাড়ালে তার আয়তনও (Volume বা V) বেড়েই চলে :

$$\frac{V}{T} = \text{ধ্রুবক}$$

জলের ক্ষেত্রে তো জানাই ছিল যে, বিদ্যুৎ সংযোগে দু'ভাগ আয়তনের সবটা জলীয় বাষ্পকে বিশ্লিষ্ট করলে দু'ভাগ আয়তনের হাইড্রোজেন আর একভাগ আয়তনের অক্সিজেন পাওয়া যায়। তাহলে এখানে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন আর

তাদের দ্বারা উৎপন্ন জলীয় বাষ্পের আয়তনের অনুপাত হল ২ : ১ : ২—এগুলি সবই ছোট পূর্ণ সংখ্যা। এভাবে একভাগ আয়তনের হাইড্রোজেন আর একভাগ আয়তনের ক্লোরিন গ্যাসকে একত্র মিশিয়ে তাদের মধ্যে বিদ্যুৎস্ফুরণ ঘটালে, বা তাকে প্রখর রৌদ্রে রাখলে একটি বিস্ফোরণ শব্দের সঙ্গে দু'ভাগ আয়তনের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাসের সৃষ্টি হয়। হাইড্রোজেন, ক্লোরিন এবং তাদের দ্বারা উৎপন্ন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাসের আয়তনের অনুপাত দাঁড়াচ্ছে ১ : ১ : ২—এরাও ছোট পূর্ণ সংখ্যা। অ্যামোনিয়া গ্যাসের ক্ষেত্রেও দেখা যায় নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, আর তাদের দ্বারা উৎপন্ন অ্যামোনিয়ার আয়তনের অনুপাত হয় ১ : ৩ : ২—সবই ছোট পূর্ণ সংখ্যা। ভগ্নাংশের বা খণ্ডাংশের বালাইমাত্র কোথাও নাই।

আশ্চর্য বটে! পূর্ববর্তী নির্দিষ্ট অনুপাতের বা গুণিতক (সরল) অনুপাতের নিয়মের ক্ষেত্রে পরমাণুর সঙ্গে তার ওজনের যে ঘনিষ্ঠ ও সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক লক্ষ্য করা গিয়েছিল, এখানেও দেখা যাচ্ছে পরমাণুর সঙ্গে তার আয়তনেরও সেইরূপ ঘনিষ্ঠ ও সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। তাহলে পরমাণুর ওজন ও তার আয়তনের মধ্যে নিশ্চয় কোনও বিশেষ সম্পর্ক আছে; এবং ড্যাল্টনের এ অনুমান সত্য যে, একটি উপাদানের সব পরমাণু যে কেবল ওজনের দিক থেকে এক তাই নয়, তাদের আকার বা আয়তনও এক। শুধু তাই নয়, সব গ্যাসের আয়তনের ব্যাপারে যখন ঐ সরল অনুপাত ও ছোট পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে, তখন সব গ্যাসের মধ্যেও ঐরূপ একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা খুবই সম্ভব। বার্জেলিয়াস এসব দেখে অনুমান সিদ্ধান্ত করলেন:

> উষ্ণতা ও চাপ এক থাকলে একই আয়তনের সকল প্রকার গ্যাসের মধ্যে পরমাণু সংখ্যা একই থাকে।

এ থেকে তখন ধারণা করা স্বাভাবিক হল যে, একটি যেকোনো আয়তনের হাইড্রোজেন গ্যাস এবং সম পরিমাণ আয়তনের অন্য একটি গ্যাস—এই উভয়ের মধ্যস্থিত পরমাণুর সংখ্যা যখন একই, তখন ঐ পরিমাণ আয়তনের হাইড্রোজেন গ্যাসের ওজনের তুলনায় ঐ পরিমাণ আয়তনের অন্য গ্যাসটির ওজন যত হবে,—একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের তুলনায় ঐ গ্যাসটির একটি পরমাণুর ওজনও তত হতে বাধ্য। সুতরাং সেইটিই হবে তার পারমাণবিক ওজন। বৈজ্ঞানিক হিসাবে বার্জেলিয়াসের তখন প্রবল প্রতিপত্তি। তাঁর সিদ্ধান্ত শুনে তখন সকলেই ভেবে নিলেন, তাহলে তো এভাবে অতি সহজেই প্রত্যেকটি উপাদানের পরমাণুর তুলনামূলক বা

আপেক্ষিক ভার নির্ণয় করা সম্ভব হবে। কিন্তু অচিরেই এরূপ চিন্তায় ভ্রান্তি ধরা পড়ল। যদি একই অবস্থায় একই আয়তনের সকল প্রকার গ্যাসের পরমাণু সংখ্যা এক হয়, তাহলে হাইড্রোজেন গ্যাস, ক্লোরিন গ্যাস এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস নিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, একভাগ হাইড্রোজেন এবং একভাগ ক্লোরিনের মধ্যে যতগুলি করে সরল পরমাণু থাকবে, তাদের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাসও ঠিক ততগুলি (এক-হাইড্রোজেন এবং এক-ক্লোরিন-পরমাণুওয়ালা) জটিল পরমাণু থাকতে বাধ্য। আর এদের সকলেরই পরমাণু সংখ্যা এক হওয়ায় এদের সকলের আয়তনও এক হতে বাধ্য। অর্থাৎ এক ভাগ হাইড্রোজেন গ্যাস ও এক ভাগ ক্লোরিন গ্যাস একত্র হয়ে এক ভাগই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস উৎপন্ন করবে। কিন্তু আসলে দেখা গেল তা' মোটেই হয় না, উৎপন্ন হয় দুভাগ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস। সব ঠিক হয়ে এসেও যেন সবই গুলিয়ে গেল। জার্মান বিজ্ঞানী স্টাহলের ফ্লোজিস্টন্‌বাদের মত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ড্যাল্টনের পরমাণুবাদেরও কি ঐরূপ ভরাডুবি ঘটবে? সুইজারল্যাণ্ডের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াসের চেষ্টা সত্ত্বেও?

এই মহাবিপদের সময় আর একজন ইটালী দেশীয় বিজ্ঞানী এগিয়ে এসে হাল ধরলেন। তাঁর নাম অ্যাভোগ্যাড্রো (Amedeo Avogadro—1776-1856)। ১৮১১ খ্রী.-এ তিনি ঘোষণা করলেন:

> এসব বিরোধের অবসান হয়ে যায়, যদি জটিল পরমাণুগুলিকে পরমাণু না মনে করে অণু বলে ধরে নেওয়া যায়—যেগুলির আকার বা আয়তন সর্বদা এক নয়, অথচ যেগুলি হচ্ছে সরল উপাদান ও যৌগিক বস্তু নির্বিশেষে সকল প্রকার বস্তুরই স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান থাকবার (অর্থাৎ নিজস্ব অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয়) ক্ষুদ্রতম সত্তা বিশেষ। পার্থিব বস্তু বা উপাদানমাত্রেরই ক্ষুদ্রতম কণা অবশ্যই পরমাণু। কিন্তু মৌলিক গ্যাসগুলির পরমাণু একক ও স্বতন্ত্রভাবে থাকতে পারে না, তারা জোড় বেঁধে ঐ রকম অণুর সৃষ্টি করে ঘুরে বেড়ায়। অন্য সব উপাদানের পরমাণু একা একা থাকতে পারে। কিন্তু তারা বা ঐ মৌলিক গ্যাসগুলির পরমাণুরাও যৌগিক বস্তু তৈরি করার সময় একে অন্য বা অন্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঐ যৌগিক বস্তুর এক একটি অণু গঠন করে নেয়।

অ্যাভোগ্যাড্রোর পরিকল্পনা অনুযায়ী:

একই উষ্ণতা ও চাপে সম আয়তন সকল প্রকার গ্যাসেরই ঐ অণুসংখ্যা সমান।

বাস্তবিকই অ্যাভোগ্যাড্রোর অনুমান থেকে সকল প্রকার বিরোধের অবসান হয়ে গেল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বস্তুধর্মজ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের এ একটি বিপুল বিজয়। সার্থক এই তত্ত্বদর্শন। তত্ত্ব কথাটির অর্থই তো বস্তুর (তৎ) ভাব (ত্ব) বা ধর্ম। আর তত্ত্বদর্শন হল সেই বস্তু বা বস্তুধর্ম-দর্শন। স্বয়ং বিজ্ঞানই এগিয়ে এসে একে সার্থক প্রমাণ করেছে বলে তাই এ যে সত্যদর্শনও। তত্ত্ব ও সত্যের মধ্যে তো কোনো বিরোধ নাই। আর সেইজন্যই তো সত্যজ্ঞানের অর্থ হতে পারে তত্ত্বজ্ঞান বা বস্তুজ্ঞান।

বাহাদুর বিজ্ঞানী বটে! আর তাঁর পরিকল্পনা। কত সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। সে সব আমরা অচিরেই দেখতে পাব। কিন্তু বিজ্ঞানের জগন্নাথ-ক্ষেত্রে শুধু জাতিধর্মনির্বিশেষে ব্যক্তি-মানুষ নয়, দেশকাল নির্বিশেষে সবই এসে যেন একাকার হয়ে গেল। কণাদ-লিউসিপাস-ডিমক্রিটাস থেকে ব্যয়্যাল-লমনসভ্-ল্যাভইসিয়ে-প্রাউস্ট্-ড্যাল্টন্-গেলুসাক-বার্জেলিয়াস-অ্যাভোগ্যাড্রো-সকলেই মিলিত হয়ে গিয়ে যেন এক মহামানবসত্তার অভ্যুদয় ঘটিয়ে দিলেন। ভারত-গ্রীস-ইটালী-ইংল্যাণ্ড্-রুশ-ফ্রান্স্-সুইজার্ল্যাণ্ড্ এসব জাতি ও দেশ-ভেদ লুপ্ত হয়ে গেল। আড়াই হাজার বছর যেন সংহত হয়ে গেল একটি মুহূর্তের মধ্যেই! বিশ্বপ্রকৃতির মহাযজ্ঞ-শালায় এসব জাতি ধর্ম-দেশ-কাল-ভেদের কতটুকু মূল্য! কিন্তু আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীকেই অবলম্বন করে মাতা বসুন্ধরার বক্ষস্তন্য দিয়েই যে স্বয়ং প্রকৃতি সেই বিরাট মনঃ-পদার্থটিকে সমগ্র বৈজ্ঞানিক তথা সমগ্র মানবসমাজের ক্রমসংহত বস্তুদর্শন-ভাবনার মধ্য দিয়ে ক্রমোদ্ভূত করে চলেছেন' মানুষমাত্রেরই কি তাতে এতটুকু আশ্বাস, শান্তি ও সান্ত্বনার কথা! সেই বিপুল মহামানবিক মন নিয়ে সমগ্র সমাজ যে সারা বিশ্বের মহৈশ্বর্যকে প্রত্যক্ষ করবে, আর তাকে মহানন্দে আস্বাদন করবে—এ কি তার কম গৌরবের! সেই আনন্দাস্বাদনের মহাভোজ সভায় এ কোন্ ব্যঞ্জনের পরিবেশন করলেন মনীষী অ্যাভোগ্যাড্রো! মহান বিজ্ঞানী,—প্রকৃতি তাঁর কাছে খুলে ধরলেন তাঁর সম্পদশালার এক বিপুল ভাণ্ডার। প্রকৃত সাধকের কাছে প্রকৃতি কত না উদার ও অকৃপণ! সর্বমানবের সাধনা মিলিত হলে হয়ত মানুষের হাতেই প্রকৃতি তাঁর সম্পদভাণ্ডারের সকল চাবিকাঠিই অর্পণ করে তাকে রাজরাজ্যেশ্বর করে তুলতে পারে। কিন্তু ঐ যে একক বিজ্ঞানীর সিদ্ধি, সে তো সমগ্র অতীত মানবেরই সিদ্ধি। আর তাই তো তাই নিয়ে সমগ্র ভবিষ্যৎ মানবসমাজও দ্রুতবেগে এগিয়ে চলবে। স্বয়ং ড্যাল্টন বা বার্জেলিয়াসও যদি আবার বাধা সৃষ্টি করতে চান, তা টিকবে কেন? ডিমক্রিটাসের অমর আত্মা আড়াই হাজার বছর পরেও যে বেঁচে উঠেছিল, সে তো কেবল তাঁর সত্যদর্শনের জোরেই।

কেবল গ্যাসের আপেক্ষিক গুরুত্বকে দ্বিগুণ করলেই তা বেরিয়ে আসে। অবশ্য এটি কোনো প্রকৃত ওজন নয়, কেবল একটি সংখ্যা মাত্র। হাইড্রোজেন-পরমাণুর তুলনায় অন্য একটি অণু কতগুণ ভারী সেই সংখ্যাটি মাত্র।

প্রকৃত মাপ বা ওজন বলেও আর জগতে কি থাকতে পারে? ফুট্‌ই হোক, বা পাউণ্ড্‌ই হোক, বা সেকেণ্ড্‌ই হোক,—এরা আদি-অন্তহীন কালের কোনও চিরন্তন একক নয়। কোথাও কোনো একটি নির্দিষ্ট বস্তুকে সকলে মিলে একক ধরে নিলে তবেই তার ঐ মূল্য। কোনো একটি নির্দিষ্ট বস্তুর ওজনকে এক গ্রাম ধরে নেওয়া হয়েছে বলেই সেটি ওজন বিষয়ক একটি গৃহীত একক হয়ে গেছে। তা যদি হয়, তাহলে ঐ হাইড্রোজেনের অণু বা পরমাণুর ওজনকে একক ধরে নিলে ওটিও একটি একক হবে না কেন, বিশেষ করে অণু-পরমাণুর মাপার ক্ষেত্রে? সেক্ষেত্রে তত্ত্বের দিক থেকে হাইড্রোজেনের পরমাণুর ওজন এবং গ্রাম-ওজনের মর্যাদা তো একই। যাই হোক, হাইড্রোজেনের তুলনায় এই যে একটি গ্যাসের আপেক্ষিক আণবিক ওজন, তুলনামূলকভাবে হলেও এটি একটি সংখ্যা। সুতরাং নিশ্চয় এর একটি বিশেষ মূল্য আছে। এ একটি সুনির্দিষ্টতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আছে। গ্রীক দার্শনিক পাইথাগোরাস তো সংখ্যাকেই পার্থিব বস্তুর মৌলিক উপাদান ধরে নিয়েছিলেন। সুতরাং এই আণবিক ওজনের সংখ্যাটি কি গ্রাম প্রভৃতি পূর্ব পরিচিত কোনও এককের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে না? যাতে করে ঐ সম্পর্কসূচক সংখ্যাটির অর্থ হতে পারে গ্রাম-আণবিক ওজন, বা গ্রাম-আণবিক আয়তন? অর্থাৎ ঐ তুলনামূলক বা আপেক্ষিক আণবিক ওজনের সংখ্যাটি যত, তত গ্রাম গ্যাস যতটা আয়তন জুড়ে থাকে ততটা আয়তন? সেই রকম কল্পনা করে নিলে, হাইড্রোজেনের আণবিক ওজন ২.০১৬, বা মোটামুটি ভাবে ২ হওয়ায় তার গ্রাম-আণবিক ওজন হবে দুই গ্রাম। এবং যেহেতু দেখা গেছে যে সাধারণ উষ্ণতায় (০° সেন্টিগ্রেডে) ও সাধারণ চাপে (৭৬০ মিলিমিটার পারদ স্তম্ভের চাপে) ঐ দুই গ্রাম পরিমাণ হাইড্রোজেনের আয়তন হয় ২২.৪ লিটার (১ লি. = ১০০০ সি. সি., অর্থাৎ এক হাজার ঘন সেন্টিমিটার), সেইজন্য এই আয়তনকেই হাইড্রোজেনের গ্রাম-আণবিক আয়তন বলেও ধরে নিতে পারি। কিন্তু নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, জলীয় বাষ্প প্রভৃতি অন্যান্য গ্যাসের ক্ষেত্রেই বা গ্রাম-আণবিক আয়তন কত হবে?

সাধারণ উষ্ণতা ও চাপে পৃথক পৃথক ভাবে ঐ ২২.৪ লিটার করে হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন গ্যাস এবং জলীয় বাষ্প নিয়ে ওজন করলে দেখা যায় যে, তাদের ওজন হয় যথাক্রমে ২, ২৮, ৩২ ও ১৮ গ্রাম। তাদের আয়তন এক থাকায়

অ্যাভোগ্যাড্রোর তত্ত্বানুযায়ী তাদের অণু-সংখ্যাও একই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঐরূপ ওজন বিভিন্নতার কারণ কি? নিশ্চয় একটি গ্যাসের একটি অণুর ওজনের সঙ্গে অন্য-গ্যাসের একটি অণুর ওজনের পার্থক্য থাকার জন্যই মোট অণু-সংখ্যা একই হওয়া সত্ত্বেও মোট ওজনের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। সেইজন্যই দেখা যাচ্ছে যে হাইড্রোজেনের একটি অণুর তুলনায় নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের একটি করে অণুর ওজন যথাক্রমে ১৪, ১৬, ও ৯ গুণ ভারী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু পুনরায় অ্যাভোগ্যাড্রোর তত্ত্বানুযায়ী, মৌলিক গ্যাসগুলি দুটি করে পরমাণু নিয়ে এক একটি অণুর জোট সৃষ্টি করে টিকে থাকে বলে হাইড্রোজেনের একটি অণুতেও দুটি পরমাণু থাকে। ফলে হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর তুলনায় নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের একটি করে অণুর ওজন হয় যথাক্রমে তার ২৮, ৩২ এবং ১৮ গুণ। অর্থাৎ এই ওজনগুলিই হাইড্রোজেন পরমাণুর তুলনায় এদের আণবিক ওজন। তাহলে ২৮ গ্রাম, ৩২ গ্রাম ও ১৮ গ্রামই হল যথাক্রমে ওদের গ্রাম-আণবিক ওজন। কিন্তু যেহেতু সাধারণ উষ্ণতা ও চাপে ঐ ঐ ওজন-পরিমাণের আয়তনও ২২.৪ লিটার, সেজন্য ওদের গ্রাম-আণবিক আয়তনও ঐ ২২.৪ লিটারই। অর্থাৎ হাইড্রোজেনের মত অন্য সকল প্রকার মৌলিক (নাইট্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি) ও যৌগিক (জলীয় বাষ্প প্রভৃতি) গ্যাসের ক্ষেত্রেও সাধারণ উষ্ণতা ও চাপে তাদের গ্রাম-আণবিক আয়তনও একই, অর্থাৎ ঐ ২২.৪ লিটারই থাকে।

কেবলমাত্র হিসাব ও সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে কী বিপুল কার্যকরী জ্ঞানের অধিকার লাভ করা গেল! সাধারণ উষ্ণতায় ও চাপে রেখে যে-কোনো গ্যাস থেকে ২২.৪ লি. আয়তনের গ্যাস নিয়ে ওজন করতে হবে। ঐ ওজনটি যত গ্রাম হবে, সেইটিই হবে ঐ গ্যাসের গ্রাম-আণবিক ওজন, আর ঐ সংখ্যাটিই হবে (হাইড্রোজেন অণুর তুলনায়) ঐ গ্যাসের আণবিক ওজনও! সব বস্তু গ্যাস নয়, কিন্তু উচ্চ তাপে সেগুলিকে গ্যাসে পরিণত করা যায়। সেগুলি থেকেও তো তাহলে এভাবে তাদের গ্রাম-আণবিক ওজনটি সহজেই স্থির করে নেওয়া যাবে। অর্থাৎ হাইড্রোজেনের একটি মাত্র পরমাণুকে সংগ্রহ করে ওজন করার দুঃসাধ্য কাজের দরকার নাই। গ্যাসেরও একটি মাত্র অণুকেই খুঁজে এনে ওজন করার দুরূহ কাজটিও করতে হবে না। অথচ হাইড্রোজেন পরমাণুর তুলনায় ঐ গ্যাসের অণুর ওজন কতগুণ বেশি, তা বেরিয়ে যাবে? আশ্চর্য বটে! পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য কি এর চেয়ে বেশি আশ্চর্য ও মহান্? যে অণুকে কখনও কেউ দু'চোখ দিয়ে দেখতে পেলে না, কোনো যন্ত্র বানাতেও পারলে না যার একক সত্তাটির পরিমাপ করার জন্য, ধরিত্রীর সুবিশাল বক্ষের ওপর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বর্ষ

দাপাদাপির পর সে কিনা এসে এমনভাবে ধরা দিলে মানুষের চিন্তায়! আর একেবারে তার নাড়ীনক্ষত্র নিয়েই! কী মহীয়সী মানুষের চিন্তা আর অকৃপণা প্রকৃতির মহামানবমন-নির্মিতি!

মানুষের হাতে ধরা দিয়ে অণুর অভিমান ঘুচে গেল। এবার সামনে এগিয়ে এল পরমাণু—যার সম্বন্ধেই ডাল্টনের ছিল একান্ত আগ্রহ। কি করে তাদেরও ওজনটি ঠিক করে নেওয়া যায়! মৌলিক গ্যাস সম্বন্ধে কিন্তু দেখেছি চিন্তার কারণ নাই। কারণ, অ্যাভোগাড্রোর অনুমান অনুযায়ী সেগুলির আণবিক সংখ্যা অর্থাৎ তাদের এক একটি মুক্ত অণুর মধ্যে যতগুলি পরমাণু থাকে তার সংখ্যা দুই। সুতরাং তাদের আণবিক ভারকে দুই দিয়ে ভাগ করলেই তাদের পরমাণুর ওজন মিলে যাবে। কিন্তু যেসব উপাদানের আণবিক সংখ্যা এক (১)?

এক্ষেত্রেও ১৮৫০ খ্রী নাগাদ অ্যাভোগ্যাড্রোর স্বদেশবাসী ক্যানিজারো একটি পথের সন্ধান পান। ১৮৫৮ খ্রী.-এ লিখিত তাঁর গ্রন্থমধ্যে সে পথের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদনুযায়ী, যে উপাদানের পারমাণবিক ওজন নির্ণয় করতে হবে, সেই উপাদানযুক্ত এমন কতকগুলি যৌগিক বেছে নিতে হবে যেগুলিকে বাষ্পে পরিণত করা যায়। প্রথমে ঐসব গ্যাসের আপেক্ষিক গুরুত্ব থেকে আণবিক ওজনগুলি অতি সহজে স্থির করে নেওয়া যায় (পৃ. ৩৭)। তারপর প্রত্যেকটি যৌগিককে বিশ্লেষণ করে তাদের এক একটির মোট ওজনের মধ্যে ঐ প্রয়োজনীয় উপাদানটির মোট ওজন কত আছে তাও পৃথক পৃথক ভাবে দেখে নেওয়া যায়। তারপর যৌগিকের মোট ওজন এবং তার অন্তর্গত ঐ উপাদানটির মোট ওজন,—এই উভয় ওজনের অনুপাতটি স্থির করে নিতে হবে। সেইটিই তাহলে হবে যৌগিকের একটিমাত্র অণুর ওজন এবং তার অন্তর্গত ঐ উপাদানটির পরমাণু বা পরমাণুসমূহের মোট ওজন,—এই উভয়েরও অনুপাত। আগে থেকেই যখন যৌগিকগুলির এক একটি অণুর ভার স্থির করে রাখা গেছে, তখন একটি অণুর ঐ ভারের মধ্যে প্রয়োজনীয় উপাদানের পরমাণুরও কত ভার আছে, তাও শতকরা হিসেবে সহজেই পাওয়া যাবে। যেমন ধরা যাক কার্বন ডাই অক্সাইড, ইথার আর অ্যালকহলের আণবিক ওজন যথাক্রমে ৪৪, ৭৪ এবং ৪৬। অথচ তাদের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনটি-গ্যাসের প্রত্যেকটির একশত ভাগের মধ্যে (অর্থাৎ শতকরা) কার্বনের ওজন আছে যথাক্রমে ২৭·৩, ৬৪·৯ এবং ৫২·২ ভাগ। তাহলে ঐ ৪৪, ৭৪ এবং ৪৬ এই ভাগগুলির বা এই আণবিক ওজনগুলির মধ্যে কার্বনের ওজন হয় যথাক্রমে ১২, ৪৮ এবং ২৪। এইভাবে আরও কতকগুলি কার্বন-যৌগিক নিয়ে দেখা যেতে পারে, বিভিন্ন যৌগিকের এক একটি অণুতে কার্বনের ভার কত। ঐ ভার নিশ্চয়ই কার্বনের পরমাণুর মোট ভার

বটে। অবশ্য ঐ গ্যাস-অণুগুলির কোনওটিতে তো মাত্র একটি কার্বন পরমাণুও থাকতে পারে! কোন্‌টিতে? নিশ্চয় যেটির ভার সব চাইতে কম সেইটিতে। আবার এও জানা আছে যে পরমাণু অবিভাজ্য। তা যদি হয় তাহলে অন্যান্য অণুগুলির কার্বন পরমাণুর মোট ভার, ঐ ক্ষুদ্রতম ওজন সংখ্যাটির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য হয়ে যাবে, কোনো ভাগশেষ থাকবে না। বাস্তবিকই দেখা যাচ্ছে যে,উপরি-উক্ত সংখ্যাগুলির প্রত্যেকটিই ক্ষুদ্রতম ১২ সংখ্যাটির দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হচ্ছে। তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত না এমন কোনো নূতন যৌগিক আবিষ্কৃত হচ্ছে—যার অণু-মধ্যস্থ কার্বনের ওজন ১২-র চাইতে কম (৬, ৩) হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ১২-সংখ্যাটিকেই কার্বনের পারমাণবিক ওজন ধরে নিতে কোনো বাধা থাকে না। এভাবে অন্যান্য উপাদানেরও পারমাণবিক ওজন নির্ধারণ করে নেওয়া চলে। এবং যে সংখ্যাগুলির আর কোনও গুণনীয়ক নাই অর্থাৎ যে সংখ্যাগুলিকে অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে গোটাগুটি সংখ্যা পাওয়া যাবে না, সেগুলির সম্বন্ধে আমরা এক রকম নিশ্চিতই হতে পারি। কারণ, বর্তমানে যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি পাওয়া যাচ্ছে, তা যদি একাধিক পরমাণুর ওজন সমষ্টিকে নির্দেশ করে থাকত, তাহলে একটি মাত্র পরমাণুর ভারকে নির্দেশ করার জন্য নিশ্চয় ঐ সংখ্যার কোনও গুণনীয়ক বা উৎপাদক থাকত। তবে যদি এক-ওজনওয়ালা হাইড্রোজেনের মত, বা তার চাইতেও কম ভারের অন্য কোনও উপাদান আবিষ্কৃত হয়, সে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। আপাতত তা হয়নি।

কিন্তু ক্যানিজারো নির্দেশিত পন্থার অসুবিধে এই যে, সকল উপাদানের যৌগিক তো আর বাষ্পীভূত হয় না। বেশির ভাগ ধাতুরই এরূপ কোনো যৌগিক গঠিত হয় না, যা সহজে বাষ্পীভূত হতে পারে। সেজন্য ঐ ১৮৫০ খ্রী. নাগাদ আর একটি পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেখা হল। এর সূত্রপাত হয়েছিল কিন্তু বহু পূর্বেই। ১৮১৯ খ্রী.-এ দ্যুলোঁ (Pierre Louis Dulong—1785-1838) এবং পেতি (Alexis Thérèse Petit -1791-1820) নামক দুজন ফরাসী বিজ্ঞানী একটি অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন। এক গ্রাম বিশুদ্ধ পাতিত (distilled—ডিস্‌টিল্‌ড) জলের এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্ উষ্ণতা (temperature) বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় তাপকে (heat) এক ক্যালরি বলা হয়, এবং এক গ্রাম অন্য কোনও বস্তুর ১° সে. উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য যত ক্যালরি তাপ লাগে, সেই সংখ্যাকে জলের তুলনায় ঐ বস্তুর আপেক্ষিক তাপ বা তাপাঙ্ক (specific heat) ধরা হয়। অবশ্য উষ্ণতা ও তাপের মধ্যে পার্থক্য আছে। উষ্ণতা হল কোনো একটি গরম জিনিসের যে কোনও বিন্দুতে তার গরম ভাবটির তীব্রতাগুণ, আর ঐ বস্তুটির তাপ হল বস্তুটির সর্বাঙ্গে যে গরম ভাব আছে তার মোট পরিমাণ। যাই হোক, বিভিন্ন

বস্তুর ঐ আপেক্ষিক তাপের (তাপাঙ্কের) একটি তালিকা প্রস্তুত করতে গিয়ে দ্যুলোঁ এবং পেতি লক্ষ্য করেছিলেন যে, কঠিন পদার্থ নির্বিশেষে কোনও সরল বস্তুর আপেক্ষিক তাপের সঙ্গে তার (তৎকাল প্রচলিত) পারমাণবিক ওজনটি গুণ করে দিলেই তা সব ক্ষেত্রে প্রায় ৬·৩ হয়ে যাচ্ছে।

আপেক্ষিক তাপ × পারমাণবিক ওজন = ৬·৩

এই ৬·৩ কে মৌলিক উপাদানসমূহের পারমাণবিক তাপ (atomic heat) বলে ধরা হল। সুতরাং বোঝা গেল ৬·৩-কে কোনও বস্তুর আপেক্ষিক তাপ বা তাপাঙ্ক দিয়ে ভাগ করলেই বস্তুটির পারমাণবিক ওজনও পাওয়া যাবে। তবে যেহেতু ঐ ৬·৩ সংখ্যাটি একটি সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নয়, একটি মোটামুটি সংখ্যা মাত্র, সেই কারণে যে পারমাণবিক ওজনটি পাওয়া গেল, তাও নিশ্চিত ভাবে ঠিক হতে পারে না। বাষ্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব থেকে তার আণবিক ওজন প্রায়ই সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। আবার দ্যুলোঁ-পেতির সূত্র ধরেও কোনো বস্তুর পারমাণবিক ওজন কেবলমাত্র মোটামুটি-ভাবেই নির্ণয় করা চলে। তাহলে কি করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়? বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, একটিমাত্র উপায়ের উপর নির্ভর করে বসে না থেকে দুটিকেই একসঙ্গে প্রয়োগ করে দেখা যায় না? একটির দ্বারা হয়ত অন্যটির ত্রুটি সংশোধিত হয়ে যেতে পারে!

আগেই দেখা গেছে (পৃ. ২৪) যে ১·০০৮ ওজনের হাইড্রোজেন বা মোটামুটিভাবে এক ভাগ ওজনের হাইড্রোজেন, কিংবা ৮ ভাগ ওজনের অক্সিজেন, কিংবা ৩৫·৫ ভাগ ওজনের ক্লোরিনের সঙ্গে যতভাগ ওজনের অন্য একটি বস্তু সংযুক্ত হতে পারে, সেইটিই তার সংযুজ্য ওজন বা তুল্যাঙ্ক (eqv. wt.)। রাসায়নিক যোগ বা বিয়োগ ঘটিয়ে সহজেই জানা যায় কতটুকু ওজনের কোন্ উপাদানের সঙ্গে কতটকু ওজনের হাইড্রোজেন (বা অক্সিজেন বা ক্লোরিন) সংযুক্ত থাকতে পারে। তা থেকে সেই উপাদানের তুল্যাঙ্ক কিন্তু খুবই নির্দিষ্ট-ভাবে নির্ণয় করে ফেলা যায়। আবার পরমাণু যখন অবিভাজ্য তখন যে-কোনো বস্তুর একটি মাত্র পরমাণু নির্দিষ্ট সংখ্যক হাইড্রোজেন-পরমাণুর সঙ্গেই যুক্ত হয়। সেই সংখ্যাটিকে তাহলে ঐ বস্তুটির সংযোজন ক্ষমতা (valency—হাইড্রোজেনের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার ক্ষমতা) বলা যেতে পারে। তাহলে যে বস্তুর একটি পরমাণুর সঙ্গে একটিমাত্র হাইড্রোজেন পরমাণু সংযুক্ত হতে পারে তার সংযোজন ক্ষমতা (valency) এক, যার একটি পরমাণু দুই বা চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে একত্র গ্রহণ করে তাদের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে তার সংযোজন ক্ষমতা দুই বা চার। আবার যে বস্তুর একটিমাত্র

পরমাণু হাইড্রোজেনের একটিমাত্র পরমাণুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়, সেখানে এক ওজনের হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য বস্তুটির সংযুজ্য ওজন (বা তুল্যাঙ্ক) এবং তার পরমাণুর ওজন একই হবে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনো বস্তুর একটিমাত্র পরমাণু হয়ত দুটি বা তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে এক সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে। সেখানে তার সংযুজ্য ওজন অর্থাৎ একটিমাত্র হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার ওজন হবে তার ঐ পরমাণুটির ওজনের দুই অথবা তিন ভাগের একভাগ মাত্র। অর্থাৎ সহজ কথায় কোনো বস্তুর পারমাণবিক ওজনকে তার সংযোজন ক্ষমতা (যেমন, ঐ ২ বা ৩) দিয়ে ভাগ করলেই তার সংযুজ্য ওজন মিলে যাবে।

$$\text{সংযুজ্য ওজন বা তুল্যাঙ্ক} = \frac{\text{পারমাণবিক ওজন}}{\text{সংযোজন শক্তি}}$$

কিংবা বলা যায়, কোনো উপাদান-বস্তুর তুল্যাঙ্কের সঙ্গে তার যোজন-শক্তি গুণ করলে তার পারমাণবিক ওজনটি নির্ণীত হয়ে যাবে। সুতরাং দ্যুলোঁ-পেতির সূত্র প্রয়োগ করে আমরা যেখানে একটি পরমাণুর মোটামুটি ভার পেয়ে যাব, সেখানে তাকে তার তুল্যাঙ্ক দিয়ে ভাগ করলে বস্তুটির একটি মোটামুটি যোজন-শক্তিরও পরিচয় পাব। কিন্তু কোনো বস্তুর একটি পরমাণু তো হাইড্রোজেনের (বা তার মত কোনও একযোজী বস্তুর) একটি বা একাধিক পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে যাওয়ার পরেও অন্য কোনো খণ্ডাংশের সঙ্গে মিলিত হয় না। তাই যোজন-শক্তির প্রকাশক সংখ্যাটি খণ্ডসংখ্যা বা ভগ্নাংশ হতে পারে না। সুতরাং যোজন-শক্তিমূলক যে মোটামুটি সংখ্যাটি পাওয়া যাবে, তার নিকটতম পূর্ণ সংখ্যাটিই হবে ঐ যোজনশক্তির সঠিক পরিচায়ক। সুতরাং ঐ পূর্ণ সংখ্যাটিই যদি বস্তুটির যোজনশক্তির দ্যোতক (প্রকাশক) হয়, তাহলে ঐ যোজনশক্তি দিয়ে তুল্যাঙ্ক বা সংযুজ্য-ওজনকে গুণ করলেই পরমাণুর সঠিক ভারটিও পাওয়া যাবে।

এভাবে উপাদানগুলির পারমাণবিক ভার আবিষ্কৃত হওয়ায় একটি দুরূহ সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। ড্যাল্টন চেয়েছিলেন বিভিন্ন বস্তুর কল্পিত পরমাণুগুলির অন্তত একটি আপেক্ষিক ভার নির্ণয় করতে। তাঁর সামনে ছিল দুস্তর বাধা। প্রথমত, পরমাণুর অস্তিত্বই ছিল কল্পনার বিষয় মাত্র। দ্বিতীয়ত, তিনি পরমাণু মাত্রকেই অবিভাজ্য ধরে নিয়েছিলেন, অথচ সরল পরমাণুর সঙ্গে আর এক প্রকার বিভাজ্য জটিল পরমাণুর অস্তিত্ব কল্পনা করেছিলেন। তার ফলে ব্যাপারটিও জটিলতর হয়ে যায়। তৃতীয়ত, ঐসব কল্পিত পরমাণুর আকার বা ওজন নগণ্য। তাদের পৃথকভাবে ধরে এনে তা থেকে তাদের পরিচয় পাওয়া অসম্ভব। তবুও

বিজ্ঞানী অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য তাঁর সেই দুঃসাহসিক যাত্রায় ক্রমে ক্রমে আরও দুঃসাহসী অভিযাত্রীর দল এগিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত কূলে এনে জাহাজ ভিড়িয়ে দিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানীর যাত্রা শখের যাত্রা নয়। তাঁর যাত্রাপথের শেষ নাই। জগতের বুকে কত এসেছে কত চলে গিয়েছে। তাদের বিচ্ছিন্ন যাওয়া আসার কোনো চিহ্নই হয়ত আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু বিজ্ঞানীর সাধনা কোনও মুনি বা ঋষির একক সাধনা নয়, তাঁর যাত্রা একত্র যাত্রা। জলবিন্দু থেকে জলধারা, খাল, নদী সবই ক্রমসংযুক্ত ও ক্রমোদ্ভূত হয়ে অনন্ত ও অবিরত মহাসমুদ্রকে আভাষিত করছে। যতবড় সিদ্ধিই ঘটুক না কেন, সেখানে বিশ্রামের অবসর নাই। পরবর্তী সিদ্ধির মধ্যেই যেন সেখানে পূর্ববর্তী সিদ্ধির সার্থকতা। বিশ্রাম, সিদ্ধি, ফলভোগ—সবকিছুই যাঁরা অনগ্রসর সমাজের জন্য পশ্চাতে ফেলে রেখে নিঃস্ব হয়ে এগিয়ে চলেছেন, তাঁদের চাইতে মহাযোগী আর কে? মহান সমৃদ্ধির তাঁরাই স্রষ্টা, কিন্তু বোধ করি দু' চোখ ভরে দেখবেনও না তাঁরা তা'।

জাহাজ তাই ভিড়তে না ভিড়তেই আবার সমুদ্রপাড়ি। অ্যাভোগ্যাড্রো কতবড় সিদ্ধি না এনে দিয়েছিলেন! কেবল এক আয়তন নাইট্রোজেন আর তিন আয়তন হাইড্রোজেনের মিলনে দু' আয়তন অ্যামোনিয়া গ্যাসের উৎপত্তি রূপ সমস্যার সমাধান নয়, বা কেবল গ্যাসের আপেক্ষিক গুরুত্ব থেকে তার আণবিক ওজন নির্ণয় করাই নয়, বিভিন্ন গ্যাসের বিভিন্ন গ্রাম-আণবিক ওজন ও সকল গ্যাসেরই একই গ্রাম-আণবিক আয়তন নির্ণয়, এবং তা থেকেই গ্যাসগুলির আণবিক ওজন নির্ণয়ের নতুন পন্থা আবিষ্কার, এবং এমনকি সকল প্রকার মৌলিক গ্যাস এবং আরও অনেক রকম মৌলিক উপাদানের পরমাণুর ওজন নির্ধারণও, তাঁরই অনুমান-সিদ্ধান্তের ফলে সম্ভব হয়েছে। ক্যানিজারো তাঁরই সিদ্ধান্তগুলিকে সার্থক প্রমাণ করেছেন এবং সেই সূত্রে দ্যুলোঁ-পেতিও পারমাণবিক ওজন নির্ণয় ব্যাপারে অপূর্ণতাকে পূর্ণত্ব দান করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীর তৃপ্তি নাই। যে-সব ওজন নির্ধারণ করা হল, সবই তো আপেক্ষিক। সাধারণ মানুষের জানা শোনা সংস্কারগত অতি পরিচিত একক দিয়ে কি তাদের মাপা যায় না? না কি অণু-পরমাণুর অস্তিত্ব বলে কিছু নাই, এ কেবল কথামালা, আর শূন্যে সৌধ নির্মাণ? দেখে শুনে পরীক্ষা করে তবেই না বিজ্ঞানীরা সঠিক সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছান! না হলে দু'হাজার বছরের সেই প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁদের তফাতটা কোথায়?

সঠিকভাবে প্রমাণ করতে প্রায় পুরো একশ' বছর লেগে গিয়েছিল। ১৮১১-তে ইটালীয় রসায়নবিদ্ অ্যাভোগ্যা অণু-পরমাণুর তত্ত্ব উপস্থাপিত রছিলে

১৯০৮ খ্রী.-এ তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রমাণ করেছিলেন প্যারিসের পদার্থবিদ্ পেরিন (Jean Baptiste Perrin—1870-1942)। কিন্তু তাঁর এই প্রমাণ আরও বহু পূর্বে ১৮২৭ খ্রী.-এই ব্রিটিশ উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী ব্রাউন (Robert Brown—1773-1858) কর্তৃক আবিষ্কৃত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানী ব্রাউন কুসুমের (ফুলের) পরাগ নিয়ে কাজ করছিলেন। স্বভাবতই ওগুলি ছোট কণিকা। দৈর্ঘ্য হবে এক ইঞ্চির প্রায় ৪।৫ হাজার ভাগের একভাগ মাত্র। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ঐ পরাগ বা রেণুগুলি জলের মধ্যে থাকলে গতিশীল হয়ে উঠে। বার বার পরীক্ষার ফলে তিনি দেখতে পেলেন যে, তরল পদার্থের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকাগুলির ঐ যে গতি, তা তরল পদার্থটির কোনো স্রোত বা তার বাষ্পীভবনের উপর নির্ভর করে না। সে গতি তাদের নিজেদেরই গতি। এমনকি, জৈব (জীব সম্বন্ধীয়) ও অজৈব নির্বিশেষে সকল প্রকার কণিকাই তাতে ক্রমাগত বিশৃঙ্খলভাবে সতত সঞ্চরমাণ (সর্বদা বিচরণশীল) হতে থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে ওদের সেই গতির বিরাম নাই। পার্থিব কোনো বস্তুর অবিরাম গতির এমন নিদর্শনের কথা
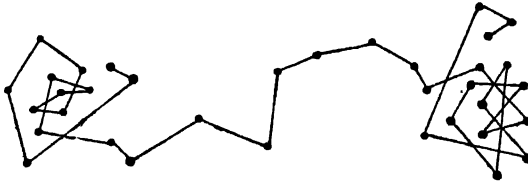
ইতিপূর্বে আর কখনও জানা যায়নি। খুব জোরাল মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখলে তাদের সঞ্চালন নিশ্চিতভাবেই ধরা পড়ে। কিছুক্ষণ যাবৎ একটি কণিকার গতিবেগ অনুধাবন করলে তার অদ্ভুত গতিপথটিরও পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য ব্রাউন এর তাৎপর্য ধরতে পারেননি। সে তাৎপর্য ধরা পড়ে ঐ শতাব্দীর সপ্তম দশকে এসে। ক্রমেই একথা না মনে করে পারা গেল না যে, তরলের অণুগুলিই আপনা-আপনি অবিশ্রান্তভাবে ছোটাছুটি করছে। সেই কারণেই ভাসমান কণিকাগুলিও ঐ অগণ্য অণুবৃন্দের বহুমুখী ধাক্কায় পড়ে মুহূর্তের জন্যও টাল সামলাতে পারছে না। তাই তাদেরও এই অবিরাম সঞ্চালন—এই ব্রাউনীয় সঞ্চালন। তাছাড়া তরলে ভাসমান কণিকাগুলিরও স্বয়ং সঞ্চালন আছে। তবে তরলের অণুগুলি এত ছোট যে সেগুলি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষমতার আওতায় এসে ধরা দেয় না। সেজন্য তাদের নিজেদের গতিবেগ আর প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং ঐ ভাসমান কণিকার গতিবেগ বা গতিপথ দেখেই পরোক্ষভাবে অনুগুলিরও

গতিবেগ উপলব্ধি করা যায়। অবশ্য বুঝতে পারা যায় যে অদৃশ্য অণুগুলির আকৃতি ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করেই কণিকাগুলির গতিবেগ বা তাদের গতিপথটি নির্দেশিত হয়ে থাকে। অণুগুলি বিশিষ্ট ভর বা বেগযুক্ত না হলে রেণুগুলির সঞ্চালনও স্থগিত থাকতে বাধ্য। কিন্তু যাই হোক না কেন, এভাবে অণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায়। পরে অবশ্য প্রমাণ হয় যে, গ্যাসের মধ্যেও অণুগুলি ক্রমাগত ছোটাছুটি করে বলেই গ্যাসগুলি সর্বদা ছড়িয়ে পড়তে চায়। শুধু তাই নয়। ঐ অণুগুলির মধ্যে এত বিরাট বিরাট ফাঁক থাকে যে কোনও গ্যাসকে চাপ দিয়ে তার ১।১৮০০ ভাগ আয়তনে নামিয়ে আনা যায়। কোনো গ্যাসকে ১।৪০০০ ভাগ পর্যন্তও করা যায়। প্রকৃতপক্ষে, অণুগুলির কতকাংশ ছুটে গিয়ে বদ্ধ গ্যাসপাত্রের গায়ে ভেতর থেকে চাপ সৃষ্টি করে। আমরা জানি যে, চাপদণ্ড (যে দণ্ডদ্বারা বায়ুনিরুদ্ধ ভাবে চাপ দেওয়া যায়,—পিচকারির দণ্ডের মত—piston) বা ঐ জাতীয় কোনো কিছু দিয়ে পাত্র মধ্যস্থ আয়তনকে পর পর সংকুচিত করা যায়। তৎকালে ক্রমে ক্রমে পাত্রমধ্যস্থ গ্যাসের স্থানাভাব হতে থাকে। তখন স্বভাবতই পাত্রের ভিতরের গায়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমিত ক্ষেত্রে ধাক্কা দিতে থাকা অণুর সংখ্যাও ক্রমেই বেড়ে যায়। আর সেইজন্যই তখন একটি নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ক্রমাগত চাপ বাড়তে থাকে। এই আয়তন কমা এবং চাপ বাড়ার সঙ্গে যে একটি সামঞ্জস্য বা সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক বা অনুপাত আছে ($PV =$ ধ্রুবক), অর্থাৎ গ্যাসের আয়তন বাড়ার সাথে সাথেই যে গ্যাসের চাপও অনুপাত রক্ষা করেই বাড়তে থাকে, তা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি (পৃ. ১৭)। তার মূল মর্ম কিন্তু এখন বেশ উপলব্ধি করা যায়—ঐ অণু-সঞ্চালনই। আবার গ্যাসের মধ্যে অণুগুলি সঞ্চরমাণ থাকে বলেই গ্যাসের উষ্ণতা বাড়লে অণুগুলিরও গতিশক্তি বেড়ে যায়। অর্থাৎ এখানে এ প্রমাণও পাওয়া গেল যে, তাপ-তেজই অণুবৃন্দের গতি তেজ রূপে প্রকাশ পায়। তারই ফলে তখন তারা ক্রমবর্ধিত বেগে পাত্রগাত্রে গিয়ে আছড়ে পড়ে এবং তার ফলেও আবার উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে অনুপাত রক্ষা করে গ্যাসের চাপ বা তজ্জনিত আয়তন (V) বেড়ে যায়। উষ্ণতা বাড়লে সেই অনুপাতে চাপ বা আয়তন বাড়তে থাকে $\left(\frac{V}{T} =\right.$ ধ্রুবক, পৃ. ৩০$\left.\right)$।

ব্রাউনীয় সঞ্চালনের তাৎপর্য ধরা পড়ায় অণু বা পরমাণুর অস্তিত্ব সাধারণভাবে প্রমাণিত হল। কিন্তু পরিচিত মাপকাঠি দিয়ে তাদের মাপার ব্যাপারটি অসম্ভব ছিল। তাদের আকৃতি এবং ওজন দুইই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। এত ক্ষুদ্র যে তাদের একটিমাত্র সত্তার মাপক-যন্ত্রের কথা কল্পনা করাও চলে না। বিশেষ করে যখন

একক অণু বা একক পরমাণুকে ধরে আনাই অসম্ভব। এইবার বুঝি বিজ্ঞানীকে হার মানতে হয়।

কিন্তু বিজ্ঞানীর সাধনা কি একক সাধনা, যে হার মানবে? সমগ্র বস্তুজগৎকে যে সত্য বিধৃত (আক্রান্ত) করে আছে, তা তাঁদের সম্মিলিত বিরাট মানস জগতের কোথাও না কোথাও এসে ধাক্কা দিয়ে যাবেই, যেভাবেই হোক না কেন। হয়ত কেবল তা কাছে এসে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া; কিন্তু তাতেই চলবে। বিজ্ঞানী ঘুর পথ ধরলেন। তাঁদের পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ আর মাপ-জোখ হিসাব চলল। আপাতত তাঁরা ওজন বাদ দিয়ে শুধু গুণে দেখতে চান, কোনও গ্যাসের গ্রাম-আণবিক আয়তনের মধ্যে কতগুলি অণু আছে। প্রধান সংকেত মিলে গেল ঐ ব্রাউনীয় সঞ্চালন থেকেই। বিজ্ঞানীরা পরম নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রম সহকারে তরলে ভাসমান কণিকার ভর এবং গতিবেগ প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করে নানাবিধ হিসাব থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এছাড়াও বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করলেন। কিন্তু শেষে দেখা গেল যে, সকলেই প্রায় এক জায়গায় এসে পড়েছেন। সাধারণ উষ্ণতা (০° সে.—শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) ও চাপে (৭৬০ মিলিমিটার পারদ স্তম্ভের চাপে) ২২.৪ লিটার (১ লি. = ১০০০ সি. সি. বা কিউবিক সেন্টিমিটার) আয়তন-যুক্ত গ্যাসের অণুসংখ্যা সকলেই গুণে দেখলেন, প্রায় একই। সে সংখ্যা মোটামুটি ৬.৫ × ১০^২৩। আরও ভালভাবে পরীক্ষা করে বর্তমানে ঐ সংখ্যাকে ৬.০২ × ১০^২৩ ধরা হয়। সব গ্যাসেরই গ্রাম-আণবিক আয়তনের মধ্যে এই একই অণুসংখ্যা। [তাদের গ্রাম পারমাণবিক আয়তনের মধ্যেও স্বভাবত পরমাণু সংখ্যাও ঐ একই। অর্থাৎ গ্যাস মাত্রেরই গ্রাম-আণবিক বা গ্রাম-পারমাণবিক সংখ্যা এই ৬.০২ × ১০^২৩।] কিন্তু এ তত্ত্বের মূল সূত্রের আবিষ্কর্তা অ্যাভোগ্যাড্রোই। তাঁর সূত্রকে অবলম্বন করেই এমন গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সম্ভব হল। তাই পরবর্তী বিজ্ঞানী-বৃন্দ যখন এ সংখ্যার পরিচয় পেলেন, তখন কিন্তু তাঁরা একথা ভুললেন না যে, কাঁর দৌলতে তাঁরা এ-সংখ্যার সন্ধান পেয়েছেন। তাঁরা সেই মহামনীষী দ্রষ্টার নামের সঙ্গেই একে যুক্ত করে দিলেন। অ্যাভোগ্যাড্রো-সংখ্যা নামেই এ-সংখ্যাটি অমর হয়ে গেল।

কিন্তু কী বিপুল তাৎপর্য এই সংখ্যাটির! পাইথাগোরাসের সংখ্যা-মহিমার কথা মনে পড়ে যায়। যন্ত্র আর বানাতেই হল না, অণু-পরমাণুর ওজন মাপা হয়ে গেল। পূর্বেই জানা হয়েছে যে, কোনো উপাদানের আপেক্ষিক ওজন যত, সাধারণ অবস্থায় তত গ্রাম গ্যাসের আয়তন ২২.৪ লিটার। আর এখন জানা গেল যে, ২২.৪ লিটার গ্যাসের অণুসংখ্যা ৬.০২ × ১০^২৩। সুতরাং ঐ উপাদানের ঐ গ্রাম-আণবিক ওজনকে (অর্থাৎ ২২.৪ লিটার গ্যাসের ওজনকে) তার মোট অণুসংখ্যা

(অর্থাৎ অ্যাভোগ্যাড্রো-সংখ্যা) দিয়ে ভাগ করলেই সুপরিচিত গ্রাম এককেই ঐ উপাদানের একটিমাত্র অণুর ওজন জানা হয়ে যাবে। এখন একটি অণুর মধ্যে যতগুলি পরমাণু আছে সেই সংখ্যা দিয়ে ঐ অণুর ওজনকে ভাগ করে ফেললেই তার পরমাণুর ওজন কত গ্রাম, তাও ধরা পড়ে যাবে। এভাবে হাইড্রোজেনের একটি অণুর ওজন হবে $২^{\cdot}০১৬/(৬^{\cdot}০২ \times ১০^{২৩})$ গ্রাম এবং একটি পরমাণুর ওজন হবে $১^{\cdot}০০৮/(৬^{\cdot}০২ \times ১০^{২৩})$ গ্রাম $= ১^{\cdot}৬৭ \times ১০^{২৪}$ গ্রাম।

$= {}^{\cdot}000000000000000000000000$ ৬৭ গ্রাম

এভাবে একটি মাত্র পরমাণুর আয়তন নির্ধারণও সহজ হয়ে পড়ে। যেমন ধরা যাক, সোডিয়ামের পারমাণবিক ওজন নির্ণীত হয়েছে—২৩। জানা আছে যে, সোডিয়ামের আপেক্ষিক গুরুত্ব ·৯৭। আপেক্ষিক গুরুত্ব বলতে 0° সে.-এ ১ ঘন সে. মি. (সি. সি.) বিশুদ্ধ জলের ওজনের (অর্থাৎ ১ গ্রাম ওজনের) তুলনায় ১ ঘন সে. মি. সোডিয়াম যতগুণ ভারী, তাই। অর্থাৎ সোডিয়ামের আপেক্ষিক গুরুত্ব ·৯৭ হওয়ার অর্থ : সি. সি. সোডিয়ামের ওজন (·৯৭ ÷ ১ গ্রাম = ·৯৭ গ্রাম)। সুতরাং ·৯৭ গ্রাম সোডিয়ামের আয়তন যদি ১ সি. সি. অর্থাৎ ১ ঘন সেন্টিমিটার হয়, তাহলে ২৩ গ্রাম সোডিয়ামের আয়তন হবে $(১/{}^{\cdot}৯৭) \times ২৩ = ২৩^{\cdot}৭$ ঘন সেন্টিমিটার। সুতরাং গ্রাম-পারমাণবিক ওজনের সোডিয়াম ২৩·৭ ঘন সে. মি. জায়গা জুড়ে থাকে (অবশ্য সাধারণ উষ্ণতা ও চাপে। সাধারণ উষ্ণতা 0° সে. এবং সাধারণ চাপ = ৭৬০ সি. সি. পারদ স্তম্ভের চাপ)। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে গ্রাম পারমাণবিক ওজনের মধ্যে $৬^{\cdot}০২ \times ১০^{২৩}$-টি পরমাণু বিদ্যমান থাকে। সুতরাং $৬^{\cdot}০২ \times ১০^{২৩}$-টি পরমাণুর আয়তন যদি ২৩·৭ সি. সি. হয় তাহলে ১-টি পরমাণুর আয়তন হবে $২৩^{\cdot}৭/(৬^{\cdot}০২ \times ১০^{২৩})$ সি. সি.।

অবশ্য এভাবে অণু পরমাণুর যে ওজন বা আয়তন পাওয়া গেল তা অবিশ্বাস্য-ভাবেই ক্ষুদ্র। হিসাবের মধ্যে তাদের পাওয়া গেলেও মানুষের ধারণায় তারা ধরা দেয় না। কেবল তুলনামূলক ভাবে তাদের পরিচয়টি কিছুটা স্পষ্ট হতে পারে মাত্র। যথা :—

(১) ১ গ্রাম আণবিক ওজনের অর্থাৎ ১৮ গ্রাম ওজনের জল যদি সমগ্র পৃথিবীর উপর বিছিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে ১ বর্গ সেন্টিমিটার স্থানে প্রায় ১০ লক্ষ জলের অণু উপস্থিত থাকবে। কিংবা, যদি ঐ ১৮ গ্রাম জলের প্রত্যেকটি অণুতে একটি করে লেবেল এঁটে সমস্ত সমুদ্রের জলে তাকে মিশতে দেওয়া হয়, তাহলে তাদের ভালভাবে মিশে যাওয়ার পর পৃথিবীর যে-কোনো জায়গা থেকে ১ গ্লাস পরিমাণ জল সংগ্রহ করে আনলে দেখা যাবে যে, তাতে অন্তত ১০০টি লেবেল-আঁটা অণু পাওয়া যাচ্ছে।

(২) যদি কোনো পাত্র থেকে খুব শক্তিমান বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্রের সাহায্যে তার মধ্যস্থিত বাতাসটি এমনভাবে টেনে নেওয়া যায় যে, তার চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের হাজার কোটি ভাগের একভাগ মাত্র হয়, অর্থাৎ পাত্রটি যদি প্রায় বায়ুশূন্য হয়ে যায়, তাহলেও দেখা যাবে যে তার ১-সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের একটি রেখার উপর যতগুলি অণু আছে তার সংখ্যা সারা পৃথিবীর জনসংখ্যারও (৩৫০ কোটি) অনেক বেশি।

(৩) ধরা যাক, হাইড্রোজেনের এক একটি অণুকে এমনভাবে ফাঁপিয়ে তোলা হল, যাতে তাদেরকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কোনো রকমে দেখা যেতে পারে। অর্থাৎ এক একটি অণুর ব্যাস ব্রাউনীয় কণিকার মত ১-ইঞ্চির অন্তত ৫ হাজার ভাগের এক ভাগ হল। এখন যদি ১ গ্রাম হাইড্রোজেনের প্রত্যেকটি অণুকে এভাবে ফুলিয়ে সব-গুলিকে একটি বাক্সের মধ্যে পুরে রাখতে হয়, তাহলে সে বাক্সটির প্রত্যেকটি বাহুকে অন্তত ½ মাইল দীর্ঘ হতে হবে।

কিন্তু সে যাই হক না কেন, পার্থিব সকল প্রকার বস্তুর মূলেই যে অণু বা পরমাণু বিদ্যমান, সে নিয়ে আর কোনো সন্দেহ রইল না। সে সব অণু-পরমাণুর ওজন বা আয়তনগত স্বরূপটিও জানা হয়ে গেল। ড্যাল্টন চেয়েছিলেন, অন্তত্তপক্ষে পরমাণুগুলির একটি তুলনামূলক ওজন নির্ণয় করবেন। কিন্তু অ্যাভোগ্যাড্রোর দর্শন থেকে কেবল যে সেইটুকু জানা গেল তাই নয়; আমাদের পরিচিত এককের মাধ্যমেই তাদের আসল ওজন এবং আসল আয়তনটিও ধরা পড়ে গেল। অক্সিজেন বা লঘু উপাদান হাইড্রোজেনের এক একটি অণু ও পরমাণুর সত্যিকারের ওজন জানা গেল। আবার অন্যান্য উপাদানের অণু বা পরমাণুর আপেক্ষিক ওজনও জানা যায়। সুতরাং (অক্সিজেন বা) হাইড্রোজেনের অণু বা পরমাণুর সঙ্গে তুলনামূলক-ভাবে তাদেরও অণু বা পরমাণুর সত্যিকারের ওজন (অর্থাৎ গ্রাম প্রভৃতি জানা এককের তুলনায় কত ওজন তাও) সহজেই বেরিয়ে আসে। ওদিকে তাদের সম্মিলিত আয়তনের পরিমাপ ও অ্যাভোগ্যাড্রো-সংখ্যা থেকে তাদের প্রত্যেকেরই অণু বা পরমাণুর ঐ প্রকারের সত্য আয়তনটিও মিলে যায়। আর তা যদি হয়, তাহলে তাদের এই ওজন বা আয়তনের সম্পর্কটির মধ্য দিয়ে কি সকল উপাদানের পরমাণুতে ছড়িয়ে আছে এমন কোনও একক সত্য লুকিয়ে নেই? না, পৃথিবীর সকল প্রকার বৈচিত্র্যের মূলে রয়েছে আবিষ্কৃত কয়েক প্রকার (তখন পর্যন্ত মাত্র ৬০/৬২ প্রকারের মৌলিক উপাদানের আবিষ্কার ঘটেছিল) মৌলিক বস্তুই? কিন্তু ভবিষ্যতে অনন্তকাল ধরে আবিষ্কারের মারফতে ঐ ষাট বাষট্টি সংখ্যাগুলি কি পর পর বেড়ে চলতে পারে না? আর যদি নাও বেড়ে থাকে, তাহলেও বা তা কেন? কেন ঐ ষাট বা বাষট্টি, বা আশী-নব্বই, বা অন্য কোনও সংখ্যায় এসে তা

থেমে দাঁড়াতে বাধ্য? এসব প্রশ্নের সমাধান তখনই সম্ভব হতে পারে, যখন তাদের সকলেরই অন্তর্বর্তী কোনও মূল সত্যকে জানা যায়। জানা যায় কোন্ অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীনে সে সত্য বিভিন্ন পরমাণুর অভ্যন্তর দিয়ে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে চলেছে, অথচ হয়ত এক আভ্যন্তরীণ একত্ব বন্ধনে বাঁধা হয়ে আছে। পার্থিব বস্তুই বল বা পৃথিবী বল, বা গ্রহ-নক্ষত্র বল, সব হয়ত ঐ সুদূর মহাকাশ থেকে উদ্ভূত বিম্ব-প্রতিবিম্ব মাত্র, এক মহা-একত্বের বৈচিত্র্যবিলাস ব্যতিরেকে আর কিছু নয়!

কিন্তু আমাদের সাধারণ মানুষের মত দার্শনিক-বিজ্ঞানীর চিন্তা অত যদৃচ্ছ বিশ্লেষণ করে এগোয় না। অসংখ্য অকথিত বিশ্লেষণের সম্মিলিত পূর্ণফল রূপেই যেন তাঁদের এক একটি প্রত্যয়ের উদ্বোধন ঘটে। তাঁদের দিয়েই যেন প্রকৃতি মানবসমাজের মধ্যে একটি প্রত্যয়সিদ্ধ কেন্দ্রক (nucleus) গঠন করে চলেছেন। তাই তাঁরা যেন বুঝতে পারেন প্রকৃতির বৈচিত্র্যবিলাসের মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও ঐ মহা-একত্বের সত্যটি এসে নিজেকে এতটুকু হলেও প্রতিফলিত করছে। সেইটুকু দেখতে পাওয়ার নামই দর্শন, আর মানুষের নিজেরই হাতে সেইটুকুর প্রতিফলন ঘটিয়ে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত ও বিশেষ জ্ঞান লাভের নামই বিজ্ঞান। তাই দর্শন অনেকটা একক-দর্শন হলেও বিজ্ঞান কিন্তু হয়ে উঠে সার্বজনীন জ্ঞান। দর্শন এগিয়ে চললেও বিজ্ঞানকে তাই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তার সত্যমিথ্যা নির্ণয় করে নিতে হয়। কিন্তু উভয়ের মূল কাজ একই—সত্যকে আবিষ্কার করা, সমগ্র বস্তু-জগতের বহু-বিচিত্রতার মধ্যে কোথায় সেই সত্যের প্রতিফলন ঘটছে তাই জেনে নেওয়া।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ

পার্থিব বস্তুর বহু-বিচিত্রতার মধ্যে বিজ্ঞানীরা বহুকালের সাধনার ফলে যে একত্বটি আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তা ঐ পরমাণুর একত্ব। সব বস্তুরই মূলে ঐ পরমাণু। কিন্তু সব পরমাণু তো এক নয়। তবু তো তাদের মধ্যে একটি ওজন বা আয়তনের সম্পর্ক মিলে যাচ্ছে। কিন্তু আয়তনের মর্ম তখনও ধরা পড়েনি, সম্ভবত আজও তেমন না। কারণ, ওজন আর আয়তনের মধ্যে প্রথমটি ভর (mass)-মূলক, আর দ্বিতীয়টি সম্ভবত তেজমূলক। পার্থিব (দৃশ্যমান) বস্তু সাধারণতই ভরপ্রধান বলে পার্থিব মানবের কাছে ভরের পরিচয়টি সহজতর হয়ে উঠে। তাই ঐ পারমাণবিক ওজনের সম্পর্ক ধরেই বিজ্ঞানীর দল এগিয়ে এলেন। প্রায় অ্যাভোগ্যাড্রোর অণু-পরমাণুর তত্ত্ব আবিষ্কারের সময় থেকেই সেই অগ্রগতির সূত্রপাত। অ্যাভোগ্যাড্রোর তত্ত্ব প্রকাশের অল্পকালের

মধ্যেই আপেক্ষিকভাবে যে সব মৌলিক উপাদানের পারমাণবিক ওজন নির্ণয় সম্ভব হয়েছিল তাদের মধ্যেই এক গভীর সম্পর্ক প্রতীয়মান হয়ে উঠেছিল। সেই সময় উপাদানের পারমাণবিক ওজন আর তার সংযুজ্য ওজন নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে রীতিমত বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছিল। ব্রিটিশ চিকিৎসাবিজ্ঞানী প্রাউট (William Prout—1785-1850) লক্ষ্য করেছিলেন যে, অনেকগুলি উপাদানেরই পারমাণবিক ওজন হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ওজনের পূর্ণ সংখ্যক গুণিতক (কোনও গুণফল) মাত্র। যে সব বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তার মধ্যে ভ্রান্তি ছিল। ১৮১৫ এবং '১৬-এ তিনি দুটি বেনামী নিবন্ধ প্রকাশ করে জানান যে, হাইড্রোজেনই তাহলে প্রাচীন দার্শনিকবৃন্দ কল্পিত সেই আদিম উপাদান, যা দিয়ে আর আর উপাদান তৈরি হয়। তাঁর এই মত প্রকাশের পর অন্যান্য কয়েক জনের মত ড্যাল্টনের বন্ধু স্কচ্ রসায়নবিদ্ টমসনও (Thomas Thomson - 1773-1852) এ সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি ঐ তত্ত্বকে অভ্রান্ত মনে করায়, এই সম্বন্ধে অন্য অভ্রান্ত বিশ্লেষণগুলির ফলকেও ভ্রান্ত মনে করতে দ্বিধা বোধ করেননি। প্রাউটের অনুগামীরা বহুদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। হাইড্রোজেনের তুলনায় ক্লোরিনের ওজন ৩৫.৫ (৩৫½) বলে নির্ধারিত হওয়াতে তখন তাঁরা এ-বিষয়ে হাইড্রোজেনের ওজনের অর্ধেক বা এমন কি শেষে এক-দশমাংশকেও পর্যন্ত একক রূপে কল্পনা করে নিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

প্রাউটের মূল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। কিন্তু তিনি অনুমান করেছিলেন যে বিভিন্ন ধাতুর মধ্যে যে ভৌত (স্থূলদেহ বিষয়ক) বা রাসায়নিক (সূক্ষ্মদেহ বিষয়ক) ধর্মের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, তার মূলে আছে তাদের ভর বা ওজনই। তা না হলে একই রাসায়নিক সাদৃশ্যবিশিষ্ট ধাতুত্রয়,—লোহা, কোবাল্ট্ ও নিকেলের সংযুজ্য ওজন প্রায় একই (২৮, তখনকার মত অনুযায়ী) হবে কেন? বস্তুতপক্ষে, এক জাতীয় হ্যালোজেন (অর্থাৎ লবণ-কারক) গোষ্ঠীর উপাদানগুলির মধ্যে কিংবা ক্ষারীয় ধাতুগুলির (যে ধাতু জলের অর্থাৎ উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াবশত ক্ষার বা alkali উৎপন্ন করে—ধাতু এবং অক্সিজেনের যৌগিকগুলিকে সাধারণত ক্ষারক বা base বলা হয়। যে সব ক্ষারক, জলে দ্রবীভূত হয় তাদের নামই ক্ষার বা alkali) মধ্যে বা প্লাটিনাম দলের ধাতুগুলির মধ্যেও নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। ইতিপূর্বে বার্জেলিয়াস বিভিন্ন উপাদানের পারমাণবিক ওজনের তালিকা নির্মাণ করেছিলেন। ফলে প্রাউটের অনুমানের সূত্রে ঐ সদৃশ উপাদান গোষ্ঠীর সঙ্গে ওজনের সম্পর্ক খুঁজে বার

করা সহজ হয়ে গেল। সুতরাং রাসায়নিক সাদৃশ্য এবং ওজনের উপর নির্ভর করে উপাদানগুলির একটি শ্রেণীবিভাগ করা যায় না কি? কারণ, শ্রেণীর মধ্যেই তো সত্যের প্রকাশোন্মুখ মাধুরীটি সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়। শ্রেণীবিভাগ লক্ষ্য করেই তাই না বিজ্ঞানীর দল সত্যের পানে অব্যর্থ গতিতে ছুটে চলেন! পার্থিব বস্তুমাত্রেরই শ্রেণীবিভাগ, জীবজগতের শ্রেণীবিভাগ, ধাতুর শ্রেণীবিভাগ! শূন্য প্রান্তরে হঠাৎ তাল-তমাল-হিন্তালাদি বিবিধ বিচিত্র বৃক্ষের সমারোহ দ্রুতগতি শকটারোহী যাত্রীর মনকে আকর্ষণ করে। তাকে যেন একটি বৃহত্তর সত্যের পানে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু কুহেলিকা ভেদ করে মন তো বেশী দূর এগোতে পারে না, সব যেন গুলিয়ে যায়। আর যখন সে-যাত্রীর সামনে এসে পড়ে কেবল একই শ্রেণীর বিন্যস্ত পাদপ (বৃক্ষ)-মালা—দিগন্তবিসারী প্রান্তরের তালীবনরাজিনীলা! সত্য এসে কেবল উঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়না, ঘোমটা খুলে যেন নিজের মোহন রূপকে প্রত্যক্ষীভূত করে তোলে। সমুন্নত দেহভঙ্গি, আতপত্রাকার (ছাতার মত) পত্রবিন্যাস সবই একে একে ধরা দেয়। অজানার বিস্ময় তখন জ্ঞানের সীমানায় ধরা দিয়ে মানবচিত্তের উপলব্ধিকে সার্থক করে তুলতে চায়। তাই প্রকৃতির রাজ্য থেকে তার শ্লথ (আলগা)-বিন্যস্ত বস্তুরাজিকে সংগ্রহ করে তাদের শ্রেণীবিন্যাসের চেষ্টা, সত্যসন্ধানী বিজ্ঞানীর যেন এক প্রাথমিক প্রচেষ্টা। এখানেই যেন সত্যসমৃদ্ধি-ভাণ্ডারের প্রধান চাবিকাঠি। তাই প্রাউটের ঐ অস্পষ্ট সূত্রটিকে অবলম্বন করে তখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত মৌলিক উপাদানগুলির শ্রেণীবিন্যাস মারফত তদ্‌মধ্যস্থিত প্রতিফলিত সত্যটিকে প্রত্যক্ষ করবার জন্য বিজ্ঞানীরা এগিয়ে এলেন।

১৮২৯ খ্রী.-এ ডুবেরিনার (Johann Wolfgang Döbereiner—1780-1849) কাজে হাত দিলেন। তিনি দেখলেন, যেন উপাদানগুলির মধ্যে সদৃশ-রসায়নধর্মী তিন তিনটি বস্তু একত্র এক একটি গোষ্ঠী বা দল গঠন করে আছে। এদের নাম দিলেন তিনি ত্রয়ী (triad)। ক্লোরিন-ব্রোমিন-আয়োডিন; লিথিয়াম-সোডিয়াম পটাসিয়াম; ক্যালসিয়াম-স্ট্রন্‌সিয়াম-বেরিয়াম; সালফার-সিলেনিয়াম-টেলুরিয়াম;—এদের ধর্ম যে সদৃশ, তার কারণ কি? তিনি লক্ষ্য করে আশ্চর্যান্বিত হলেন যে ত্রয়ীর অন্তর্গত দুটির পারমাণবিক ওজনের গড়ই প্রায় অন্যটির পারমাণবিক ওজনকে নির্ণয় করে দিচ্ছে। যেমন—

লিথিয়াম – ৭

সোডিয়াম—২৩ $\left[\frac{৭+৩৯}{২}=২৩\right]$

পটাসিয়াম—৩৯

কিংবা,

ক্লোরিন—৩৫·৫
ব্রোমিন—৮০·০ [৩৫·৫+১২৬·৫ ·৮১
আয়োডিন—১২৬·৫

তাহলে সব উপাদানই কি এভাবে ত্রয়ী বিন্যাসে বিন্যস্ত হয়ে রয়েছে? কিন্তু তাহলে অন্যান্য ত্রয়ীর মধ্যে ওজনের এ নিয়ম খাটছে না কেন? যেমন রৌপ্য (১০৮), সীসা (১০৪) আর পারার (১০০) মধ্যে? ডুবেরিনার ঠিক ধরতে পারলেন না রহস্যটি কোথায়। কিছুটা ব্যর্থ হয়েই তিনি অসম্পূর্ণ ত্রয়ীর কথা উল্লেখ করলেন—ফস্ফরাস্-আর্সেনিক-বোরন-সিলিকন ইত্যাদি।

অনেক দিন ব্যাপারটি এভাবেই পড়ে থাকার পর ১৮৫০ খ্রী.-এ জার্মান বিজ্ঞানী পেটেন্কফার (Max Joseph Von Pettenkofer—1818-1901) শ্রেণীবিভাগের ব্যাপারটি একটু অন্যভাবে দেখতে পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে তৎকালে নির্ধারিত সদৃশ উপাদানগুলির সংযুজ্য-ওজনের মধ্যেও একটি স্তর-বিন্যাস লুকিয়ে আছে। একটির ওজন অন্যটি অপেক্ষা ৮ বা ৮ এর কোনও গুণিতক বেশি। যেমন

লিথিয়াম—৭
সোডিয়াম—২৩=৭+(৮×২)
পটাসিয়াম—৩৯=২৩+(৮×২)

কিংবা,

ম্যাগনেসিয়াম—১২
ক্যাল্সিয়াম—২০=১২+(৮×১)
স্ট্রন্সিয়াম—৪৪=২০+(৮×৩)
বেরিয়াম—৬৮=৪৪+(৮×৩)

পেটেন্কফার আর বেশি দূর এগুতে পারলেন না বটে, কিন্তু কিছুদিন বাদে এই তত্ত্বকেই বিকশিত করে তুললেন ডুমা (Jean Baptiste André Dumas—1800-'84)। ১৮৫২ খ্রী.-এ তিনি যে নিবন্ধ প্রকাশ করলেন, তাতে তিনি কেবল ত্রয়ী-বিন্যাসের উপর জোর দিতে পারলেন না। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে, ত্রয়ীর মধ্যবর্তী উপাদানের প্রকৃত ওজন অগ্র পশ্চাৎ দুটি ওজনের গড় ওজন নয়, পরীক্ষাকালীন সম্ভাব্য ভুলের ছুট বাদ দিয়েও নয়। বরঞ্চ এ ব্যাপারে তিনি প্রাউটের অনুমানের উপরই জোর দিয়ে বললেন যে, মৌলিক উপাদানগুলির মধ্যে একটি পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক আছে। সে তাদের

সংযুজ্য ওজনকে অবলম্বন করেই। জৈব রসায়ন শাস্ত্রোক্ত সমগোত্রীয় শ্রেণীর [homologous series—দৃষ্টান্ত স্বরূপ: CH_4, $C_2H_6(=CH_4+CH_2)$, $C_3H_8(=C_2H_6+CH_2)$, $C_4H_{10}(=C_3H_8+CH_2)$, C_5H_{12}, $C_6H_{14}\cdots$] যৌগিকগুলির মত এদেরও দুটি বা তিনটির প্রকৃত পরিচয় থেকেই অন্যগুলিরও পরিচয় মিলে যেতে পারে। সদৃশ ধর্মের উপাদানগুলির মধ্যে বিভিন্ন সংযুজ্য ওজন আছে। তাদের মধ্যে একটি সব চাইতে কম। তার উপর নির্ভর করেই ঐ দলের আর সব বস্তুর রাসায়নিক ধর্মগুলি গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ পরবর্তী উপাদানগুলির ধর্ম যেন পূর্ববর্তী উপাদানগুলির সংযুজ্য ওজনের ক্রমবৃদ্ধির দ্বারাই নির্ণীত হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নাইট্রোজেনের কথা উল্লেখযোগ্য।

নাইট্রোজেন—১৪

ফসফরাস—৩১ = ১৪+১৭

আর্সেনিক—৭৫ = ১৪+১৭+৪৪ (<৪৪×১)

অ্যান্টিমনি—১১৯ = ১৪+১৭+৮৮ (<৪৪×২)

বিসমাথ—২০৭ = ১৪+১৭+১৭৬ (<৪৪× ৪)

এমনকি, অ-সদৃশ বস্তুগুলির (ফস্‌ফরাস-ক্লোরিন, আর্সেনিক-ব্রোমিন) সংযুজ্য-ওজনের মধ্যেও কিছু কিছু সম্পর্ক তিনি লক্ষ্য করতে পেরেছিলেন।

পর বৎসর ব্রিটিশ বিজ্ঞানী গ্ল্যাড্‌স্টোন (John Hall Gladstone—1827-1902) বললেন যে সদৃশ-ধর্ম বিশিষ্ট উপাদানগুলিকে মোটামুটি তিন ভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত করা চলে। তার পরের বছরে (১৮৫৪) কুক (Josiah Parsons Cooke—1827-'94) উপাদানগুলিকে মোট ৬-টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করলেন। তাদের প্রত্যেকটি শ্রেণীতেই নিজস্ব সংখ্যাগত নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান আছে। তিনি একটি ছক প্রকাশ করলেন। তাতে ঐ শ্রেণীর সঙ্গে সদৃশধর্মী উপাদান-গোষ্ঠীগুলিও নির্দেশিত হল। সে সব গোষ্ঠীর মধ্যেও পরস্পর সম্পর্ক নির্দেশিত হল। এভাবে বিস্তৃত শ্রেণীবিন্যাস এর আগে হয়নি। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রী.-এ অড্‌লিং (William Odling—1829-1921) যে শ্রেণীবিভাগ করলেন, তাতে তিনি ১৩-টি গোষ্ঠীর উল্লেখ করলেন। সেগুলি প্রধানতই ত্রয়ী-গোষ্ঠী। তবে ত্রয়ী বহির্ভূত উপাদানও তাতে ছিল। সাত বছর পরে (১৮৬৪) তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, উপাদান-গুলিকে তাদের পারমাণবিক ওজন অনুসারে সাজিয়ে গেলে বেশ একটি ক্রম লক্ষ্য করা যায়। সদৃশ উপাদানগুলির মধ্যে প্রভেদটি দেখা যায় ৪৮-এর। তবে ১৬,৪০ বা ৪৪-এর প্রভেদও আছে। সুতরাং তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে এদের সকলের উৎপাদক ৪-সংখ্যাটিই হয়ত এদের মধ্যস্থিত সাধারণ পার্থক্য হতে পারে।

এসব শ্রেণীবিন্যাস থেকে ক্রমাগত ঠিক হয়ে আসছিল যে উপাদানগুলির পরমাণু-রাজ্য জুড়ে একটি বিশেষ সত্য কোথাও লুকিয়ে আছে। সে সত্যটি যে তাদের ওজনকে অবলম্বন করেই সে সম্বন্ধে সন্দেহ দূরীভূত হয়ে আসছিল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের মনে উপাদানের পারমাণবিক ওজন আর সংযুক্ত ওজন নিয়ে যথেষ্ট অনিশ্চয়তার ভাব ছিল। শতাব্দীর পঞ্চাশের বছরগুলিতে যখন ক্যানিজারো নির্দেশিত পন্থা ও অন্যান্য আবিষ্কৃত পন্থার মারফতে সকল প্রকার উপাদানের পারমাণবিক ওজন নির্ধারণ করা সহজ হল, এবং ১৮৬০ খ্রী.-এর শেষদিকে অ্যাভোগ্যাড্রোর তত্ত্বও সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে গেল, কেবল তখনই কুহেলিকার জাল ক্রমচ্ছিন্ন হতে লাগল। পারমাণবিক ওজনই তখন ঐরূপ শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তিরূপে গৃহীত হতে থাকল। ১৮৬২-৬৩ খ্রী.-এ ফরাসী ভূতত্ত্ববিদ্ চ্যান্কোর্টয় (A. E. Béguyer Chancourtois) নিশ্চিতভাবে প্রত্যক্ষ করলেন যে, পারমাণবিক ওজন অনুযায়ী সাজিয়ে রাখলে সদৃশধর্মী উপাদানগুলিই নিয়মিতভাবে ফিরে ফিরে আসে। তাঁর সাজানর পদ্ধতিটি ছিল অভিনব। একটি সিলিণ্ডারের (নলাকৃতি পাত্রের) উপরে তিনি অক্ষের (মেরু- বা কেন্দ্র-রেখা) সমান্তরাল করে সমদূরবর্তী ১৬-টি সমান্তরাল রেখা অঙ্কন করেছিলেন। অক্সিজেনের পারমাণবিক ওজন অনুযায়ী ১৬-সংখ্যাটি গৃহীত হয়েছিল। তারপর তাদের উপর দিয়ে আর একটি শঙ্খিল রেখা (spiral) টানা হয়েছিল। এই রেখাটি সিলিণ্ডারের তলদেশ থেকে ৪৫° কোণ করে সর্পিল ভঙ্গিতে তার ওপর পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। এভাবে এই রেখার সঙ্গে পূর্ববর্তী ১৬ টি রেখার যে ছেদবিন্দুগুলি পাওয়া গিয়েছিল সেইগুলিই হয়েছিল এক একটি উপাদানের ওজনের নির্দেশক। দেখা গেল যে এক একটি সরলরেখার ছেদবিন্দু ধরেই সদৃশধর্মী উপাদানগুলি ফিরে ফিরে আসছে। শুধু তাই নয়। চ্যানকোর্টয় ধরে নিয়েছিলেন যে, শুধু একটি খাড়া দাগ ধরে নয়, সিলিণ্ডারের যেকোনো দুটি ছেদবিন্দুর সংযোজক সরলরেখা ধরে এগিয়ে গেলে আর আর ছেদ-বিন্দুতে যে সব উপাদান পাওয়া যাবে, তাদের মধ্যেও বিশেষ রাসায়নিক সম্পর্ক মিলে যাবে। চমৎকারিত্ব সত্ত্বেও কিন্তু এ পরিকল্পনা সমসাময়িক অন্যান্য বিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। তবে চ্যানকোর্টয় যে পারমাণবিক ওজনের সংখ্যাকেই উপাদানের ধর্মগুলির নির্দেশক বলে ধরে নিয়েছিলেন, তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে কিন্তু সন্দেহের কারণ রইল না।

ব্যাপারটি আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল, যখন প্রায় একই সময়ে (১৮৬৩) ব্রিটিশ রসায়নবিদ্ নিউল্যাণ্ড্স্ (John Alexander Reina Newlands—1838-'98) উপাদানগুলিকে কেবল তাদের পারমাণবিক ভারের ক্রমবৃদ্ধি অনুযায়ী

পর পর সাজিয়ে যেতেই তাদের মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে সংগতি ধরা পড়ে গেল। কাজের সুবিধের জন্য তিনি পর পর এক দুই ক'রে ঐ উপাদানগুলিকে সংখ্যাঙ্কিত করে নিয়েছিলেন মাত্র। কিন্তু তাতেই তিনি দেখতে পেলেন যে সমগোত্রীয় উপাদানগুলির সংখ্যা, ক্রমিক না হলে, সাতের ব্যবধানে ফিরে আসছে। অর্থাৎ, ৯ নম্বরের উপাদান সোডিয়াম, আর ৯+৭=১৬-নম্বরের উপাদান পটাসিয়ামের ধর্ম, ৯−৭=২ নম্বর উপাদান লিথিয়ামের ধর্মেরই সদৃশ। এই সাদৃশ্য সম্বন্ধে প্রত্যয়বান হয়ে তিনি তাঁর ছকে খাপ খাওয়ানর জন্য কতকগুলি উপাদানের স্থান-পরিবর্তন পর্যন্ত করে দিলেন। আবার কোনো কোনো স্থলে তিনি দুটি উপাদানকেও একই স্থানে স্থাপন করলেন। তবে ভবিষ্যতে যে আরও নূতন উপাদান আবিষ্কৃত হতে পারে এবং সেজন্য কোনো কোনো ঘর ফাঁক থাকা দরকার, তা তিনি মনে করলেন না। তাঁর তত্ত্ব অনুসারে কোনো উপাদানকে এক ধরলে তার পরবর্তী অষ্টম সংখ্যার উপাদানটি সদৃশ-ধর্ম বিশিষ্ট হয়। তাই এই তত্ত্বকে সংগীতজ্ঞ হিসাবে তিনি অষ্টকের তত্ত্ব (Law of Octaves) নামে আখ্যাত করলেন। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর প্রথম তিনটি অষ্টকের উল্লেখ করা যেতে পারে।—

H	Li	Be	B	C	N	O
F	Na	Mg	Al	Si	P	S
Cl	K	Ca	Cr	Ti	Mn	Fe

কিন্তু শোনা যায়, এ নিয়ে তাঁকে হাস্যাস্পদ হতে হয়েছিল। তিনি লণ্ডনের কেমিক্যাল সোসাইটিতে এ নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। সভার একজন বিশেষ সভ্য তাঁকে প্রশ্ন করে বসলেন, তিনি তো উপাদানগুলিকে সংখ্যাঙ্কিত করে সেই সংখ্যা নিয়ে রীতিমত গবেষণা করেছেন; তিনি কি উপাদানগুলির নামের আদ্যক্ষর নিয়ে কোনও গবেষণা করেননি? কিন্তু পারমাণবিক ভার-বৃদ্ধির ফলেই উপাদানগুলির পর্যায়ক্রমিক (এক একটি পর্যায়ের পর) প্রত্যাবর্তন ঘটে,– এই মহান সত্যটি যে নিউল্যাণ্ড্‌স্-এর অনুমানের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ছিল, তা আজ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। চ্যান্‌কোর্টয় এবং নিউল্যাণ্ড্‌সের অনুমান-সিদ্ধান্তের মধ্যে উপাদানের গুণাবলীর পর্যায়ক্রমিক প্রত্যাবর্তনের যে সত্যটি লুক্কায়িত ছিল, তার উপর ভিত্তি করে জার্মান বিজ্ঞানী মেয়ার (Julius Lother Meyer—1830-'95) এবং রুশ বিজ্ঞানী মেন্দেলিয়েভ (Dmitry Ivanovich Mendeleyev—1834-1907) প্রায় একই সময়ে এ সম্বন্ধে যথার্থ সংগত ও যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন

উভয়ের সিদ্ধান্তই প্রায় সমসাময়িক। সম্ভবত ১৮৬৮ খ্রী.-এর শেষে বা ১৮৬৯-

এর প্রথম দিকে মেয়ার তাঁর শ্রেণীবিন্যাসের একটি মোটামুটি ছক তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৮৬৯ খ্রী.-এর ফেব্রুয়ারী মাসেই তাঁর সেই ছকটি মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়ে যায়। তারপর মেয়ারের আবিষ্কৃত বিষয় প্রকাশিত হয় ১৮৭০ খ্রী.-এ, এবং তাতে তিনি মেন্দেলিয়েভের প্রথম প্রকাশিত নিবন্ধটির উল্লেখও করেছেন। কিন্তু মেন্দেলিয়েভ তাঁর ছকটিকে আরও বিকশিত করে প্রকাশ করেন ঠিক তার পরের বছরে অর্থাৎ ১৮৭১ খ্রী.-এ। এতে কেউ কেউ অনুমান করেন যে তিনিও হয়ত মেয়ারের নিবন্ধটির সাহায্য গ্রহণ করে থাকতে পারেন। এতে অবশ্য আশ্চর্যের কিছু নাই। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এইটিই স্বাভাবিক। কারণ, পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বিজ্ঞানের এই জগন্নাথ-ক্ষেত্রে শত মানুষের সহস্র চিন্তার প্রবাহ সম্মিলিত হয়ে জ্ঞানের এক অকূল মহাসমুদ্র সৃষ্টি করে চলেছে। ব্যক্তি সেখানে স্বতন্ত্র হয়েও লুপ্ত, তাঁর ব্যক্তিগত আবিষ্কারও তাই সার্বজনীন সমৃদ্ধি-বিকাশের সোপান মাত্র।

স্বয়ং মেন্দেলিয়েভ তাঁর Principles of Chemistry-গ্রন্থে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে গেছেন যে তিনিই পর্যায়িক নিয়মের মূল সূত্রাবলীর প্রথম প্রত্যয়বান্ আবিষ্কর্তা। তৎসত্ত্বেও ১৮৮২ খ্রী.-এ যখন মেয়ার এবং মেন্দেলিয়েভ উভয়কেই তাঁদের ঐ পূর্বোক্ত আবিষ্কারের জন্য রয়্যাল সোসাইটি থেকে ডেভি-পদক প্রদান করা হয়, তখন তিনি সে সম্মানকে ভাগ করে ভোগ করতে কুণ্ঠিত হননি। তার জন্য এই মনীষীদ্বয়ের পারস্পরিক সহযোগী মনোভাব ভবিষ্যৎ সভ্যতার সামনে এক সমুন্নত উজ্জ্বল আলোক-বর্তিকা হয়ে বিরাজ করবে। কিন্তু তাঁদের ঐ সিদ্ধান্তে পৌঁছবার কৃতিত্ব তাঁদেরও একার নয়। অ্যাভোগ্যাড্রো বা মেন্দেলিয়েভ এক একটি মাইল-স্টোন্ রূপে দাঁড়িয়ে থেকে তৎকাল পর্যন্ত সার্বজনীন বিজ্ঞান-সাধনা তথা সমাজ ও সভ্যতার মোট অগ্রগতির পরিমাণটুকু জানিয়ে দিচ্ছেন মাত্র।

কিন্তু আশ্চর্যান্বিত হতে হয় এই দেখে যে, একক নিষ্ঠা আর একাগ্রতার সামনে এসে সার্বজনীন সত্যও কেমন করে তার নিজেরই আবরণটিকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। মেয়ার বা মেন্দেলিয়েভ দুজনেই পাঠ্যপুস্তক রচনা করছিলেন। মেয়ারের গ্রন্থের নাম ছিল Modern Theories of Chemistry, আর মেন্দেলিয়েভের Principles of Chemistry। শেষোক্ত গ্রন্থটি রুশ ভাষায় ছাপা হয়ে প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই প্রথমে জার্মান ভাষায় এবং তারপর ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় সে গ্রন্থ অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। কিন্তু গ্রন্থরচনাকালে সম্ভবত উভয়ের কাছেই একটি সত্য সুনিশ্চিতভাবে ধরা পড়ে যায় যে, পর পর দুটি উপাদানের যে দুটি পারমাণবিক ওজন,—তাদের ঐ সংখ্যাদ্বয়ের মধ্যে একটি সুসমঞ্জস ক্রম বিদ্যমান আছে। পারমাণবিক ভার অনুযায়ী উপাদানগুলিকে পর

পর সাজিয়ে যেতেই তাঁদের কাছে উপাদানের গোষ্ঠীগত ধর্মের পর্যায়ক্রমিক পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্তনটি স্পষ্ট হয়ে উঠল। মেয়ার প্রধানত আয়তনাদি ভৌত গুণাবলীর পর্যায়িক প্রত্যাবর্তন লক্ষ্য করে বিস্মিত হলেন। আর মেন্দেলিয়েভ লক্ষ্য করেছিলেন প্রধানত রাসায়নিক গুণাবলীর পর্যায়িক পুনরাবর্তন। কিন্তু শ্রেণীবিন্যাস করতে গিয়ে উভয়েই একটি অনুমান করলেন, যা তাঁদের পূর্ববর্তী আর কেউ করেননি। তাঁরা উভয়েই ছক তৈরি করতে গিয়ে বুঝতে পারলেন যে তখনও পর্যন্ত বহু মৌলিক উপাদান অনাবিষ্কৃত থেকে গিয়েছে। তাই তাঁরা তাঁদের তালিকার মধ্যে তাদের জন্য কতকগুলি কল্পিত স্থানও ছেড়ে দিয়ে গেলেন। এ থেকেই বুঝতে পারা যায়, একটি সংখ্যার পরেই অন্য একটি অসংগত সংখ্যা দেখে তাঁরা এই ভেবে বিচলিত হননি যে, ওজনবৃদ্ধির নিয়ম ভঙ্গ হয়েছে। তাঁদের ধারণা হয়েছিল, এক সময়ে কোনো না কোনো উপাদান আবিষ্কৃত হয়ে সেখানে সংখ্যা দুটির মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়ে ঐ অসংগতি দূর করে দেবে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বলা যায়, বুঝি সত্যের দ্যুতি উজ্জ্বলতর রূপে এসে ধরা দিয়েছিল মেন্দেলিয়েভের চোখে। তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন। কোনো উপাদানের গোষ্ঠীগত ধর্মের সঙ্গে তার পারমাণবিক ওজন সামঞ্জস্যহীন হলে তিনি নিঃসন্দেহে ধরে নিতেন যে পূর্বে ঐ উপাদানের যে পারমাণবিক ওজন নির্ধারিত হয়েছে তা ভ্রান্ত। তিনি তখন ঐ উপাদানটিকে তুলে এনে তার স্বগোষ্ঠীর মধ্যে যথাস্থানে বসিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করতেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইউরেনিয়ামের উল্লেখ করা যেতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এ-ধাতুর আবিষ্কার হয়েছিল। রসায়নবিদ্‌রা এর পারমাণবিক ভার ঠিক করেছিলেন—১২০। মেন্দেলিয়েভ ধাতুটির গুণাবলী পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করলেন, ঐ ভার হওয়া উচিত—২৪০। নির্ভরযোগ্য হিসাবে দেখা গেল তাঁর সিদ্ধান্তই ঠিক। ঐ সময় নাগাত ৬৩-টি মৌলিক উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছিল। তার মধ্যে ২০-টি উপাদানেরই পারমাণবিক ভার তিনি এভাবে বদলে দিয়েছিলেন। তাঁর এই সব অনুমান কেবল নিরর্থক তত্ত্বচিন্তা ছিল না, এ ছিল তাঁর সত্যদর্শনই। দার্শনিক চিন্তার এ যে কত বড় মহান সার্থকতা, ভবিষ্যতের বিজ্ঞান-সাধনাই তার প্রমাণ দিয়েছে। শুধু তাই নয়। "তাঁর আবিষ্কারে পারমাণবিক বল-বিদ্যার বিকাশ জোর পাবে, এও তিনি দেখতে পেয়েছিলেন এবং রসায়নের মূলকথা পুস্তকে তা লিখেও যান।" মেয়ার কিন্তু এতদূর এগিয়ে যেতে সাহস করেননি, এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই মেন্দেলিয়েভের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়েছিল। আয়োডিন-টেলুরিয়ামের বেলায় যে স্থানপরিবর্তন ঘটেছিল, পরবর্তী-কালে 'আইসোটোপ' নামক বস্তুটির আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তার যথার্থ ব্যাখ্যা মেলা অসম্ভব ছিল।

ডুবেরিনার, নিউল্যাণ্ডস্ প্রভৃতি পূর্বগামী সকলেই, এমনকি মেয়ার পর্যন্ত, রাসায়নিক ধর্মানুযায়ী উপাদানগুলির একটি যথাযথ শ্রেনীবিন্যাস করতে চেয়েছিলেন, এবং ঐরূপ ধর্ম বা গুণাবলী অনুযায়ী তাঁরা উপাদানগুলিকে কয়েকটি গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীবদ্ধ করতেও সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা প্রধানত প্রত্যেকটি উপাদানকে এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরস্পরনিরপেক্ষ পৃথক সত্তা বলে ধরে নিয়েছিলেন। মেন্দেলিয়েভই সর্বপ্রথম নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত করলেন যে উপাদানগুলির মধ্যেই পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান আছে। তাদের পারমাণবিক ওজনের ঐ যে একটি সংখ্যা থেকে অন্য সংখ্যায় উঠে যাওয়া, তা কেবল খেয়ালী লম্ফন নয়। সত্যদর্শনের এক অমোঘ প্রভাবে তিনি সর্বপ্রথম উপাদানগুলির মধ্য থেকে এমন কোনো ধর্ম খুঁজে বার করতে চেষ্টা করলেন, যা নিশ্চিতভাবেই তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আভাস দিতে পারে। এমন কী ধর্ম, বা কী সে প্রকৃতি—যার দ্বারা একটি উপাদান অন্যটির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত? উপাদানগুলির বহুবৈচিত্র্যের মধ্যে কি এমন কিছু নাই, যা আর সব মৌলিক বস্তুরও মূল বলে গণ্য হতে পারে? নিষ্ঠাবান সাধকের কাছে আলোক এসে পৌঁচেছিল। তাঁর সত্যদর্শন ঘটেছিল, বা বলতে পারি ভুয়োদর্শন! বাস্তবিকই সত্যদৃষ্টির অমোঘ প্রভাবে তিনি যেন অপ্রতিরোধনীয় গতিতে এক অনিবার্য সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে গেলেন। অনিবার্য এইজন্যে যে, তার মত সহজ আর কিছু হতে পারে না। ঐ যে পারমাণবিক ওজনের ক্রমবৃদ্ধি, এর অর্থ কি কেবলমাত্র ভরের বৃদ্ধি নয়? তাহলে এই ভরই তো সেই প্রকৃতি, যার মধ্য দিয়ে পারমাণবিক ওজনের ক্রমবৃদ্ধির ফল স্বরূপ অন্যান্য গুণের তথা অন্যান্য নব নব উপাদানের এমন বৈচিত্র্যময় আবির্ভাব ঘটে উঠেছে! মাত্র ভরের উপর নির্ভর করেই মেন্দেলিয়েভ উপাদানমালার শ্রেণীবিন্যাস সম্পন্ন করলেন।

"পর্যায়িক ছকে রাসায়নিক উপাদানগুলির ধর্ম পর্যায়ক্রমে ফিরে ফিরে আসে। এ ছক মেন্দেলিয়েভ কিভাবে আবিষ্কার করেছিলেন তার একটা সুবিদিত কাহিনী আছে। এই নিয়মটা বার করবার জন্য তিনি যখন কাজ করছিলেন তখন তাঁর এক একটা ভিজিটিং কার্ডের পেছনে একটা উপাদানের নাম লিখে তিনি তা নিয়ে বলা যেতে পারে এক ধরনের পেশেন্স্ খেলা শুরু করলেন। কিন্তু কপাল তাঁর আর খোলে না—খেলা কিছুতেই মেলে না—শেষ পর্যন্ত একদিন কী মনে হল উপাদানগুলিকে তিনি সাজালেন তাদের পারমাণবিক ভার অনুসারে। মেন্দেলিয়েভ পরে বলেছিলেন যে এই সুপ্রস্তাব তাঁর মাথায় এসেছিল স্বপ্নে।

প্রসঙ্গত বিখ্যাত সোভিয়েত কবি মায়াকভস্কিও বলেন যে তাঁর সেরা লাইনগুলো তিনি রচনা করেছেন স্বপ্নে। অর্থাৎ মহামনীষীদের ভাবনার বহরটা বোঝা যাচ্ছে এ থেকে, স্বীয় বিষয়ে তাঁরা এমন তীব্রতায় মন ঢেলে দেন যে তা তাঁদের একেবারে আচ্ছন্ন করে থাকে।" 'রাজর্ষি' উপন্যাস রচনা সম্বন্ধে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন," · একটা গল্পের প্লট মনে আনতে চেষ্টা করলুম। ঘুম এসে গেল। স্বপ্নে দেখলুম—একটা পাথরের মন্দির।·· জেগে উঠেই বললুম, গল্প পাওয়া গেল।"

১৮৭১ খ্রী.-এ মেন্দেলিয়েভের যে পর্যায়িক ছক প্রকাশিত হল, তাতে তিনি বিস্তৃতভাবেই জানিয়ে দিলেন, কেমন করে ঐ ছকের অন্তর্গত স্থান-মাহাত্ম্য দেখেই একটি উপাদানের ভৌত বা রাসায়নিক গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যাবে। কেবল ঐ উপাদান মাত্রেরই নয়, তা দিয়ে রাসায়নিকভাবে উৎপন্ন কোনও যৌগিকের গুণাবলীও যে যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে, এমন কি মাত্রাগতভাবেও নিরূপণ করা সম্ভব, তাও তিনি বিশেষভাবে জানিয়ে দিলেন। এ কেবল তৎকালে আবিষ্কৃত উপাদানগুলি সম্বন্ধেই নয়। অনাবিষ্কৃত উপাদানের জন্য রক্ষিত শূন্যস্থান দেখেও সে সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়। তিনি নিজে অন্তত তিনটি শূন্যস্থান থেকে তিনটি অনাবিষ্কৃত উপাদান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করলেন। বোরন, অ্যালুমিনিয়াম আর সিলিকন—এই তিনটি আবিষ্কৃত উপাদানের নামের পূর্বে সংস্কৃত 'এক-' কথাটি জুড়ে দিয়ে তাদের নিম্নস্থ তিনটি শূন্যস্থানের জন্য তিনটি অনাবিষ্কৃত উপাদানের নাম দিলেন যথাক্রমে এক-বোরন, এক-অ্যালুমিনিয়াম, এক-সিলিকন। এদের ধর্ম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে রাখলেন। তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। ১৮৭৪, ১৮৭৯ এবং ১৮৮৫ খ্রী.-এ পর পর যে ধাতুত্রয়ের আবিষ্কার ঘটল, তাদের গুণাবলী যথাক্রমে ঐ এক-অ্যালুমিনিয়াম, এক-বোরন এবং এক-সিলিকন সম্বন্ধে যেসব গুণাবলীর কথা মহামনীষী সত্যদ্রষ্টা ঋষি বলে রেখেছিলেন, তার সঙ্গে নিম্নোক্ত তালিকানুসারে প্রায় হুবহু মিলে যায়।

	এক-অ্যালুমিনিয়াম (পূর্ব ঘোষিত গুণাবলী)		গেলিয়াম (পরীক্ষালব্ধ গুণাবলী)
পারমাণবিক ওজন	৬৮	...	৬৯.৯
আপেক্ষিক গুরুত্ব	৫.৯	...	৫.৯৪
গলনাঙ্ক (গালিয়ে দেওয়ার উষ্ণতা)	নিম্ন	...	৩০.১৫
	অনুদ্বায়ী (যা উদ্বায়ী নয়) বায়ুতে নিষ্ক্রিয়		সাধারণ উষ্ণতায় অনুদ্বায়ী বায়ুতে নিষ্ক্রিয়

	এক-অ্যালুমিনিয়াম (পূর্বঘোষিত গুণাবলী)		গেলিয়াম (পরীক্ষালব্ধ গুণাবলী)
	প্রচণ্ড উত্তাপে বাষ্পকে বিশ্লিষ্ট করে	…	বাষ্পের ক্রিয়া অজ্ঞাত
	অ্যাসিড্ এবং অ্যালকালিতে ধীরে ধীরে গলনীয়	…	অ্যাসিড এবং অ্যালকালিতে ধীরে ধীরে গলনীয়
অক্সাইড …	Ea_2O_3	…	Ga_2O_3
„	আপেক্ষিক গুরুত্ব—৫.৫	…	অজ্ঞাত
„	অ্যাসিডে গলে গিয়ে $Ea\,x_3$-ধরনের লবণ উৎপন্ন করে	…	অ্যাসিডে গলে $Ga\,x_3$-ধরনের লবণ উৎপন্ন করে
হাইড্রক্সাইড্	অ্যাসিড এবং অ্যালকালিতে গলনীয়	…	অ্যাসিড এবং অ্যালকালিতে গলনীয়
	লবণগুলির মৌলিক লবণ-গঠনের প্রবণতা	…	লবণগুলি মৌলিক লবণ গঠন করে
	সালফেট কর্তৃক অ্যালাম গঠন	…	অ্যালাম অজ্ঞাত
	H_2S অথবা $(NH_4)_2S$ কর্তৃক সালফাইড্ থিতিয়ে যায়	…	বিশেষ অবস্থায় H_2S অথবা $(NH_4)_2S$ কর্তৃক সালফাইড্ থিতিয়ে যায়
	অ্যান্‌হাইড্রাস্-ক্লোরাইড জিঙ্ক-ক্লোরাইড থেকে বেশি উদ্বায়ী	…	অ্যান্‌হাইড্রাস-ক্লোরাইড জিঙ্ক-ক্লোরাইড থেকে বেশি উদ্বায়ী
	উপাদানটি সম্ভবত বর্ণালি-বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে আবিষ্কৃত হবে	…	আবিষ্কার ঘটেছে বর্ণালি-বিশ্লেষণ পদ্ধতিতেই

	এক্‌-সিলিকন (পূর্বঘোষিত গুণাবলী)	জার্মানিয়াম (পরীক্ষালব্ধ গুণাবলী)
পারমাণবিক ওজন	৭২	৭২.৩২
আপেক্ষিক গুরুত্ব	৫.৫	৫.৪৭
পারমাণবিক আয়তন	১৩	১৩.২২
যোজন-শক্তি	৪	৪
আপেক্ষিক তাপ	০.০৭৩	০.০৭৬
ডাই-অক্সাইডের আপেক্ষিক গুরুত্ব	৪.৭	৪.৭০৩
„ আণবিক আয়তন	২২	২২.১৬

টেট্রাক্লোরাইডের স্ফুটনাঙ্ক	১০০°-এর নিম্নে		৮৬°
„ আপেক্ষিক গুরুত্ব	১·৯	···	১·৮৮৭
„ আণবিক আয়তন	১১৩	···	১১৩·৩৫

মেন্দেলিয়েভের পর্যায়িক ছকের দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পরেও বিজ্ঞানীরা সেদিকে বিশেষ মন দেননি। কিন্তু উপরি উক্ত উপাদানগুলি আবিষ্কৃত হওয়ার পর তৎসম্বন্ধীয় ঘোষণা প্রায় বর্ণে বর্ণে মিলে যাওয়ায় সেদিকে মনোযোগ দেওয়া ছাড়া রসায়নবিদ্‌দের আর গত্যন্তর রইল না।

১৮৬৯ এবং ১৮৭১ খ্রী.-এ মেন্দেলিয়েভ যে দুটি ছক প্রকাশ করেছিলেন, তা নিম্নোক্ত রূপ। শেষাঙ্কিত আধুনিক ছকটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এদের গুরুত্ব স্পষ্টীকৃত হয়ে উঠে।

I

			Ti=50	Zr=90	?=180
			V=51	Nb=94	Ta=182
			Cr=52	Mo=96	W=186
			Mn=55	Rh=104·4	Pt=197·4
			Fe=56	Ru=104·4	Ir=198
			Ni=Co=59	Pb=106·6	Os=199
H=1			Cu=63·4	Ag=108	Hg=200
	Be=9·4	Mg=24	Zn=65·2	Cd=112	
	B=11	Al=27·4	?=68	Ur=116	Au=197 ?
	C=12	Si=28	?=70	Sn=118	
	N=14	P=31	As=75	Sb=122	Bi=210 ?
	O=16	S=32	Se=79·4	Te=128 ?	
	F=19	Cl=35·5	Br=80	I=127	
Li=7	Na=23	K=39	Rb=85·4	Cs=133	Tl=204
		Ca=40	Sr=87·6	Ba=137	Pb=207
		?=45	Ce=92		
		? Er=56	La=94		
		? Yt=60	Di=95		
		? In=75·6	Th=118 ?		

[B. Nekrasov—Text-book of General Chemistry, 1962, p. 156]

II

		Group I	Group II	Group III	Group IV	Group V	Group VI	Group VII	Group VIII transitional to group I
		H 1							
Typical elements		Li 7	Be 9·4	B 11	C 12	N 14	O 16	F 19	
First Period	Series 1	Na 23	Mg 24	Al 27·3	Si 28	P 31	S 32	Cl 35·5	
	,, 2	K 39	Ca 40	— 44	Ti 50 ?	V 51	Cr 52	Mn 55	Fe Co Ni Cu 56 59 59 63
Second Period	,, 3	(Cu) (63)	Zn 65	— 68	— 72	As 75	Se 78	Br 80	
	,, 4	Rb 85	Sr 87	(Y) (88 ?)	Zr 90	Nb 94	Mo 96	— 100	Ru Rh Pd Ag 104 104 104 108
Third Period	,, 5	(Ag) (108)	Cd 112	In 113	Sn 118	Sb 122	Te 128 ?	I 127	—
	,, 6	Cs 133	Ba 137	— 137	Ce 138 ?	—	—	—	—
Fourth Period	,, 7	—	—	—	—	—	—	—	Os Ir Pt Au 199? 198? 197 197
	,, 8	—	—	—	—	Ta 182	W 184	—	
Fifth Period	,, 9	(Au) (197)	Hg 200	Tl 204	Pb 207	Bi 208	—	—	
	,, 10	—	—	—	Th 232	—	U 240	—	
Higher Salt Oxide		R_2O	R_2O_2 or RO	R_2O_3	R_2O_4 or RO_2	R_2O_5	R_2O_6 or RO_3	R_2O_7	R_2O_8 or RO_4
Higher hydrogen Compound				RH_3?	RH_4	RH_3	RH_2	RH	

[B. Nekrasov—Text-book of Genral Chemistry, 1962, p. 157]

ঐ পর্যায়িক ছকের গুরুত্ব যে অপরিসীম এবং সামগ্রিকভাবে তা যে কী প্রকারে পরবর্তী বিজ্ঞানশাস্ত্রের এক অপরিহার্য সামগ্রী হয়ে গেছে, তা তার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে (দ্র.—পরমাণুর অন্তঃপুরে)।

পর্যায়িক ছক

[তৃতীয় বন্ধনীর অন্তর্গত বিষয়গুলি পরে জানা গেছে। পরবর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

পার্থিব সকল প্রকার বস্তুর পরমাণুকে প্রথমে তাদের পারমাণবিক ভার অনুযায়ী পর পর সাজান হয়। তার ফলে তারা আপনাআপনিই কতকগুলি পর্যায়, শ্রেণী বা সারি, এবং গোষ্ঠীতে আশ্চর্যজনকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। [প্রত্যেকটি মৌলিক উপাদানের পরমাণুতে প্রোটন এবং নিউট্রন নামক দু'রকমের কণিকাযুক্ত একটি করে কেন্দ্রক (nucleus) থাকে। (কেবল সাধারণ হাইড্রোজেন-পরমাণুর কেন্দ্রকে একটি মাত্র প্রোটন-কণিকা বিদ্যমান থাকে।) কেন্দ্রকের চতুর্দিকে বেশ কিছুটা দূরে এক বা একাধিক ঘূর্ণ্যমান ইলেকট্রনের এক বা একাধিক খাপ থাকে। ইলেক্ট্রন সমন্বিত এ রকম খাপ এক থেকে সাত পর্যন্ত হতে পারে। এক-খাপ যুক্ত উপাদানগুলিকে প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, দুই খাপ যুক্ত উপাদানগুলিকে দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত এবং এভাবে শেষে সাতটি খাপ যুক্ত উপাদানগুলিকে সপ্তম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়। এ কারণেই পার্থিব সকল প্রকার উপাদানের পরমাণু মোট সাতটি পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।]

প্রথম তিনটি পর্যায়ে এক একটি সারি থাকায় তাদেরকে হ্রস্ব-পর্যায়, এবং পরেরগুলিতে দু'টি করে সারি থাকায় তাদেরকে দীর্ঘ-পর্যায় হিসাবে গণ্য করা হয়। তাদের মধ্যে শেষটি অবশ্য অপূর্ণ পর্যায়।

প্রথম পর্যায় ছাড়া আর প্রত্যেকটি পর্যায়ই ক্ষারীয় ধাতু (পৃ. ৫১) দিয়ে আরম্ভ এবং নিষ্ক্রিয় গ্যাস (যে গ্যাস অন্য উপাদানের সঙ্গে কোনোমতেই প্রতিক্রিয়া ঘটাতে চায় না) দিয়ে সমাপ্ত।

ছয়টি পূর্ণ পর্যায়ের শেষে যে ছয়টি উপাদান (নিষ্ক্রিয় গ্যাস) ওপর নীচ করে সাজান থাকে তাদের গুণাবলী সব প্রায় একপ্রকার বলে তাদেরকে এক গোষ্ঠীভুক্ত ধরা হয়। সে গোষ্ঠীর নাম শূন্য গোষ্ঠী। এই শূন্য-গোষ্ঠীকে নিয়ে প্রথম পর্যায়ের গোষ্ঠী সংখ্যা মোট দুই। কিন্তু অন্যান্য পর্যায়গুলির প্রত্যেকটি সারির গোষ্ঠী সংখ্যা আট। দীর্ঘ-পর্যায়ের প্রথম অর্থাৎ বেজোড়-সারিতে শূন্য-গোষ্ঠী নাই। কিন্তু তৎপূর্বে তিনটি করে উপাদান নিয়ে আর একটি অষ্টম গোষ্ঠী আছে। [প্রথম পর্যায় ছাড়া আর সব পর্যায়েরই শেষ সারিতে (প্রথম তিনটি পর্যায়ের শেষ ও প্রথম সারিকে একই সারি বলে ধরতে হবে) উপাদানগুলির

শেষ স্তরের ইলেট্রন সংখ্যা প্রথম গোষ্ঠী থেকে আরম্ভ করে এক দুই হিসাবে বেড়ে গিয়ে শূন্য গোষ্ঠীতে আটটি ইলেট্রনে শেষ হয়েছে।]

প্রথমটি ছাড়া ছয়টি পর্যায়ের শেষ সারিগুলির প্রথম তিনটি গোষ্ঠীর সব উপাদানই ধাতু বিশেষ (অর্থাৎ প্রতিক্রিয়ার পর এরা অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অক্সাইড হলে ক্ষারকধর্মী—basic, পৃ. ৫১ — হয়, কিন্তু এরা হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয় না) যদিও তৃতীয় গোষ্ঠীর উপাদানগুলিতে অতি সামান্যভাবে অ-ধাতুর (অর্থাৎ যাদের অক্সাইড হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে অম্লধর্মী—acidic হয়।—হাইড্রোজেন এবং অ-ধাতুর যৌগিককে অম্ল বা অ্যাসিড বলা হয়) প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়। চতুর্থ গোষ্ঠী থেকে আরম্ভ করে সব উপাদানই অ-ধাতু, এবং পরবর্তী গোষ্ঠীগুলিতে ক্রমাগত অ-ধাতুর গুণাবলীই বেড়ে চলতে থাকে, সপ্তম গোষ্ঠীর প্রকৃতি চূড়ান্তভাবেই অ-ধাতব। তারপর শূন্য বা শেষ গোষ্ঠীর উপাদানগুলি ধাতুও নয় অ-ধাতুও নয়, নিষ্ক্রিয় গ্যাস মাত্র। তার পরের উপাদানগুলিতে আবার প্রথম গোষ্ঠীর গুণাবলী পর্যায়ক্রমে ফিরে আসে। অর্থাৎ সেগুলিতে নূতন করে ধাতব গুণাবলীর পুনরাবির্ভাব ঘটে। দীর্ঘ-পর্যায়গুলির ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম এই যে, এগুলির প্রথম সারির সব উপাদানই ধাতু বিশেষ, এবং সপ্তম গোষ্ঠীর পরবর্তী তিনটি ধাতুই সদৃশধর্মী হওয়ায় (অথচ নিষ্ক্রিয় গ্যাসধর্মী না হওয়ায়) এগুলিকে একই গোষ্ঠীভুক্ত অর্থাৎ অষ্টম গোষ্ঠীভুক্ত ধরা হয়। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে, দীর্ঘ পর্যায়ের মধ্যেও গুণাবলীর এক বিশেষ ধরনের পর্যায়ক্রম বজায় থাকে: প্রথম থেকে উপাদানগুলির যোজন-শক্তিসীমা (একটি উপাদানের যোজন-শক্তি তুল্যাঙ্ক অনুসারে একাধিক হতে পারে) পর পর বেড়ে যায়। পর্যায়ের মধ্যবর্তী স্থলে অর্থাৎ তার প্রথম সারির অষ্টম গোষ্ঠীর পরেই তা আবার হঠাৎ কমে যায় এবং সেখান থেকেই (অর্থাৎ পরবর্তী সারির প্রথম থেকে) আরম্ভ হয়ে আবার তা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। শেষকালে পূর্ব পূর্ব পর্যায়ের মত তারও পরিসমাপ্তি ঘটে শূন্য-গোষ্ঠীভুক্ত একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসে।

উপাদানগুলির গোষ্ঠী সংখ্যাই তাদের যোজন-শক্তিসীমার নির্দেশক। যথা, তৃতীয় ও পঞ্চম গোষ্ঠীর উপাদানগুলির (সাধারণ ও) সর্বাধিক যোজন-শক্তি যথাক্রমে তিন ও পাঁচ। [বস্তুত অক্সিজেন ও ফ্লোরিন এবং দীর্ঘ পর্যায়ের প্রথম সারির তিন থেকে অষ্টম গোষ্ঠীর উপাদানগুলি ছাড়া আর সমস্ত উপাদানের বহিস্তরের ইলেক্ট্রন-সংখ্যাই তাদের যোজনশক্তি-সীমার নির্দেশক। কিন্তু দীর্ঘ-পর্যায়ের প্রথম সারির ঐ ৩য়-৮ম গোষ্ঠীর উপাদানগুলির ক্ষেত্রে যোজনশক্তি-সীমা হবে বহিস্তরের ইলেক্ট্রন-সংখ্যা এবং তৎপূর্ববর্তী স্তরের আট-বর্জিত ইলেক্ট্রন-সংখ্যার যোগফল।] প্রথম থেকে সপ্তম পর্যন্ত গোষ্ঠীভুক্ত উপাদানগুলিকে X ধরলে তাদের অক্সাইডের সূত্র হবে যথাক্রমে X_2O, XO,

X_2O_3, $XO_2(XH_4)$, $X_2O_5(XH_3)$, $XO_3(XH_2)$ এবং X_2O_7 (XH)। লক্ষণীয় যে অক্সিজেনের তুলনায় অ-ধাতুগুলির যোজনশক্তি-সীমা যেমন বাড়তে থাকে, চতুর্থ গোষ্ঠী থেকে হাইড্রোজেনের তুলনায় তাদের যোজনশক্তি-সীমা চার থেকে তেমনি কমতে থাকে এবং সর্বত্রই অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন উভয়ের তুলনায় দুইটি যোজনশক্তি-সীমার যোগফল থেকে যায় ৮ (অর্থাৎ, ৪+৪, বা, ৫+৩, বা, ৬+২. বা, ৭+১)। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে একটির যোজন-শক্তি জানা থাকলে অন্যটিরও সহজেই স্থির করা যায়। যেমন, যদি জানা থাকে হাইড্রোজেনের তুলনায় নাইট্রোজেনের যোজনশক্তি-সীমা তিন (NH_3), তাহলে বোঝা যায় যে অক্সিজেনের তুলনায় তার যোজনশক্তি-সীমা হবে ৮−৩=৫।

সারিগুলির মধ্যে অষ্টম সারিতে অর্থাৎ ষষ্ঠ পর্যায়ের প্রথম সারিতে যে একটি ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, তার কারণ এই যে, ল্যান্থেনামের পরবর্তী চৌদ্দটি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য বা বিরল ধাতুর পারমাণবিক গঠন প্রায় এক জাতীয় এবং সেজন্য তাদের গুণাবলীর সবই প্রায় ল্যান্থেনামের অনুরূপ। তাই তাদেরকে এখন ছকের বাইরে পৃথকভাবে দলবদ্ধ করে রাখা হয়। মেন্দেলিয়েভও তাঁর ছকে সিরিয়াম আর ট্যান্টেলিয়ামের মধ্যে একটি বিরাট ফাঁক রেখে দিয়েছিলেন। সেই ফাঁকটি অষ্টম শ্রেণীর পরবর্তী অংশ এবং নবম শ্রেণী এবং দশম শ্রেণীর প্রথমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকায় তাঁর ছকে মোট বারটি সারি ছিল। বর্তমানে ল্যান্থেনাম-বংশকে এক গোষ্ঠীভুক্ত ধরার জন্য মোট সারি সংখ্যা হয়েছে দশ। কিন্তু আসলে ল্যান্থেনাম-বংশের চৌদ্দটি উপাদানকে ধরে ষষ্ঠ পর্যায়ের মোট উপাদান সংখ্যা হয় ১৮+১৪=৩২। দশম সারিতেও ঠিক এই ব্যাপার ঘটেছে তৃতীয় উপাদান অ্যাক্টিনিয়ামের পরে। সুতরাং সেগুলিকেও ছকের বাইরে দ্বিতীয় একটি দলে দলবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি অর্থাৎ থোরিয়াম, প্রটো-অ্যাক্টিনিয়াম এবং ইউরেনিয়াম ছাড়া বাকি দশটি উপাদান বিজ্ঞানীদের দ্বারা কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন। সুতরাং সপ্তম পর্যায়ের মোট উপাদান সংখ্যা বর্তমানে বলা চলে ৩+৩+১০=১৬।

সপ্তম গোষ্ঠীর উপাদানগুলিকে (ফ্লোরিন-ক্লোরিন-ব্রোমিন-আয়োডিন এবং কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন অ্যাস্টেটাইন) হ্যালোজেন অর্থাৎ লবণ-কারক বলা হয়। কারণ তারা সোজাসুজি ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে লবণ তৈরি করতে পারে (পৃ. ৫১)

প্রথম পর্যায়ের উপাদান মাত্র দুটি। দুটিকেই ছকের অন্তর্গত খোপগুলির বাঁদিক ঘেঁষে বসান হয়েছে। অন্য হ্রস্ব পর্যায়গুলির আটটি করে উপাদান। তাদের মধ্যে প্রথম দুটি এবং শেষটি বাঁদিকে ও বাকিগুলি ডান দিকে স্থাপিত। দীর্ঘ-পর্যায়গুলিতে

(শেষের অপূর্ণ পর্যায়টি ছাড়া) আঠারটি করে উপাদান।—তাদের প্রথম দশটিকে ঐ পর্যায়ের প্রথম সারিতে খোপের বাঁদিকে, এবং বাকি আটটির মধ্যে শেষটিকে বাঁদিকে এবং অন্য সাতটিকে তাদের জোড় সারিতে খোপগুলির ডান দিক ঘেঁষে স্থাপিত করা হয়েছে। এভাবে প্রত্যেক পর্যায়ের শেষের নিষ্ক্রিয় উপাদানগুলির সবই খোপের বাঁদিকে বসেছে। সপ্তম বা অপূর্ণ পর্যায়টিতে সবগুলিই প্রথম সারির বাঁদিকে স্থাপিত। দীর্ঘ পর্যায়গুলিতে একটি জিনিস লক্ষ্য করা যায় যে, কোনও উপাদানের সঙ্গে তার গোষ্ঠীভুক্ত ঠিক উপরের বা ঠিক নীচের উপাদানটির ততটা গুণগত সাদৃশ্য নাই, যতটা আছে বরং তার নিজ সারিভুক্ত অগ্র ও পশ্চাতের উপাদানদ্বয়ের সঙ্গে। যেমন সপ্তম গোষ্ঠীর ব্রোমিনের সঙ্গে ক্লোরিন বা আয়োডিনের গুণাবলীর ততটা মিল নাই। তাই তাদের ঠিক পর পর উপর নীচ করে না বসিয়ে তাদের মধ্যে একটি করে ঘরের ব্যবধান রাখা হয়েছে। এইভাবে ষষ্ঠ গোষ্ঠীতে সিলেনিয়াম আর টেলুরিয়ামকেও খোপগুলির ডান দিকে বসিয়ে তদ্‌মধ্যবর্তী খোপের বাঁদিকে মলিব্‌ডিনামকে বসান হয়েছে,—কেবল পূর্বোক্ত দুটি উপাদানের মধ্যে ব্যবধান রাখারই জন্য। কিন্তু প্রথম গোষ্ঠীভুক্ত পটাসিয়ামের সঙ্গে রুবিডিয়ামের যথেষ্ট গুণ-সাদৃশ্য থাকায় তারা খোপগুলির বাঁদিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু পটাসিয়ামের সঙ্গে কপার অর্থাৎ তামার সাদৃশ্য অত্যন্ত কম বলে তামা ধাতুটি পটাসিয়ামের ঠিক নিম্নস্থ উপাদান হওয়া সত্ত্বেও খোপের ডান দিক ঘেঁষে বসেছে।

পর্যায়িক ছকের মধ্যে উপাদানগুলির সংকেত-নামকে এভাবে সন্নিবিষ্ট করার কারণ আছে। পর্যায়ের প্রথম থেকে পর পর এক একটি করে উপাদানের ধাতব ধর্ম ক্রমাগত কমতে থাকে। অথচ দীর্ঘ-পর্যায়গুলির দুটি করে সারি থাকায় শেষ সারির উপাদানগুলি পূর্ববর্তী সারির উপাদানের চেয়ে ধাতব ধর্ম সম্পর্কে দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই এক গোষ্ঠীভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পর পর ঠিক ওপর নীচের উপাদানের মধ্যে আর সে গুণ-সাদৃশ্য ততটা বজায় থাকে না। সেই জন্যই দীর্ঘ পর্যায়ের প্রথম সারির উপাদানগুলিকে খোপের বাঁদিকে ঘেঁষে এবং শেষ সারির উপাদান-গুলিকে খোপের ডান দিক ঘেঁষে স্থাপিত করা হয়েছে। স্বভাবতই দীর্ঘ-পর্যায়ের প্রত্যেকটি গোষ্ঠীই দুটি করে উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত,—প্রথম উপগোষ্ঠী কেবল প্রথম সারির উপাদান নিয়ে এবং দ্বিতীয় উপগোষ্ঠী কেবল দ্বিতীয় সারির উপাদান দিয়ে। মেন্দেলিয়েভ দ্বিতীয়-তৃতীয় পর্যায়ের উপাদানগুলিকে আদর্শস্বরূপ (typical) উপাদান বলে অভিহিত করেছিলেন। এই আদর্শ স্থানীয় উপাদানগুলির মধ্যে যেগুলি (প্রথম এবং দ্বিতীয় গোষ্ঠীভুক্ত) প্রথম উপগোষ্ঠীর উপাদানের সদৃশধর্মী, সেগুলিকে খোপের বাঁদিকে এবং যেগুলি (তৃতীয় থেকে পরবর্তী গোষ্ঠীভুক্ত) দ্বিতীয়

উপগোষ্ঠীর উপাদানসমূহের সদৃশ, সেগুলিকে খোপের ডান দিকে বসান হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় উপগোষ্ঠীর মধ্যে তফাতটি সব চেয়ে বেশি ধরা পড়ে প্রথম এবং সপ্তম এই দুই প্রান্তিক গোষ্ঠীতে। ফলে প্রথম গোষ্ঠীর অন্তর্ভুর্ক্ত-পটাসিয়াম-রুবিডিয়াম-সিজিয়াম-ফ্রান্সিয়াম এবং লিথিয়াম-সোডিয়াম নিয়ে যে প্রথম উপগোষ্ঠী, তাদের প্রত্যেকটিরই ধাতব ধর্ম অত্যন্ত স্পষ্ট বলে তারা জলের সঙ্গে প্রবল প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে জোরাল ক্ষার সৃষ্টি করতে পারে। অথচ ঐ প্রথম গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুর্ক্ত দ্বিতীয় উপগোষ্ঠীভুক্ত তামা-রূপা-সোনার সঙ্গে ওদের সাদৃশ্য নগণ্য। এইভাবে সপ্তম গোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রথম উপগোষ্ঠীভুক্ত উপাদান ফ্লোরিন-ক্লোরিন-ব্রোমিন-আয়োডিন—এসবই অ-ধাতু হওয়া সত্ত্বেও, ঐ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুর্ক্ত দ্বিতীয় উপগোষ্ঠীভুক্ত উপাদান ম্যাঙ্গানিজ-টেকনেসিয়াম-রেনিয়াম—এরা সকলে স্পষ্টত ধাতব গুণসম্পন্নই। সুতরাং বলা যায় যে প্রথম উপগোষ্ঠীগুলিতে পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে উপাদান-গুলির ধাতব গুণাবলীও ক্রমাগত জোরাল হতে থাকে।

অষ্টম গোষ্ঠীর উপাদানগুলির কিন্তু বিশেষত্ব আছে। প্রথম সারিগুলিতে তাদের তিনটি করে উপাদান এক একটি ত্রয়ী গঠন করে আছে। সুতরাং ওদের মোট সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৩×৩=৯। এই ত্রয়ীত্রয় প্রথম সারিগুলির বহিঃপ্রান্তে দাঁড়িয়ে যেন উপাদানগুলিকে শেষ সারিতে গড়িয়ে দিচ্ছে। অক্সিজেনের তুলনায় এই অষ্টম গোষ্ঠীর ত্রয়ী উপাদানগুলিরই যোজনশক্তি-সীমা সর্বাধিক অর্থাৎ আট হওয়ার কথা কিন্তু এ পর্যন্ত মাত্র কয়েকটি উপাদানেরই ঐরূপ শক্তির (XO_4) কার্যকারিতা লক্ষ করা গেছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি যে প্রাকৃতিক বস্তুময় জগৎ, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাহলে সমগ্র বস্তুজগৎকে তার মৌলিক উপাদান কয়টির মধে ধরে আনতে পারলে তা বিজ্ঞানীমাত্রেরই অপরিহার্য অনুধাবনীয় বিষয় হতে বাধ্য তাই পর্যায়িক ছকের ক্ষুদ্র গোষ্পদে যেমন একদিকে পার্থিব পদার্থ-নভের প্রতিফলন ঘটেছে, তেমনি তা অন্যদিকে সকল প্রকার প্রকৃতি-বিজ্ঞানীর বিজ্ঞান ভাবনার দর্পণ হয়ে গেছে। এ কেবল পথভ্রষ্ট আঁধার যাত্রীর কাছে বিদ্যুতের চকিত চমক নয়, বা কেবল অতীতের মহাশ্মশানের উপর অমানিশার চিতাগ্নি শিখা নয়। এ যেন পুরাণ কথিত সহস্র সগররাজতনয়ের ভস্মস্তূপপ্রাঙ্গণের অলকানন্দা, বা যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি—যুগযুগান্তব্যাপী সাধনার পর জেগে উঠেছে—জেগে উঠেছে ভবিষ্যতের যুগান্তব্যাপী নব সাধনার হোমানল রূপে। সে অনলে যা কিছু জীর্ণ তা দগ্ধ হয়ে যাবে; কিন্তু তার স্নিগ্ধ সঞ্জীবনী শিখায় প্রাণ-পদার্থ প্রদীপ্ত হয়ে উঠবে

পার্থিব পদার্থের গুণাবলী কেন ফিরে ফিরে আসে বহুকল্পিত বিমুগ্ধ আত্মার

মতো ? এক সাধকের মনে সেই মহাজিজ্ঞাসা জেগে উঠেছিল। আর অমনি একটি স্থান থেকেই তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল বিজ্ঞান মানসের অলিতে গলিতে, মানবচেতনার আকাশে-বাতাসে। প্রকৃতির জগতে শিহরণ উঠল। পারল না সে আর সত্যকে গোপন করে রাখতে। প্রেমিকের বাহুবন্ধনে ধরা দেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু সে প্রেমিক তো এতটুকু নয় যে একটুখানি জায়গায় তার স্থান! তা যদি হত তাহলে জগৎব্যাপ্ত রূপ তার কাছে ধরা দিতও বা কেমন করে? সে প্রেমিকও যে ছড়িয়ে আছে পৃথিবীব্যাপ্ত রূপ নিয়ে—মেন্দেলিয়েভ-টমসন-রঞ্জেন-বেকারেল কুরি-বোর-ফের্মি-সত্যেন্দ্রনাথ-ভাল্লার্তা-অ্যাণ্ডার্সন-আইনস্টাইন-রাদারফোর্ড—রুশ-ইংল্যাণ্ড-জার্মানী-ফ্রান্স-পোল্যাণ্ড-সুইডেন-ইটালি-ভারত-মেক্সিকো-আমেরিকা—সমগ্র পৃথিবী। জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হতে তাই হয়ত আর একটু সময়ের দরকার। কিন্তু কেবল সে অভিসারের সময়টুকু মাত্র, ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রতিক্রিয়া-সংকুল অরণ্যপথের মধ্য দিয়ে 'মানস-সুরধুনী পারে' সত্যের অভিসারের।

কিন্তু ঐ পর্যায়িক ছকের মুকুরে অনেক সত্যই প্রতিফলিত হয়েছে; মূল পদার্থ সম্বন্ধীয় অনেক তথ্যই। কোনো কোনো উপাদানের পারমাণবিক ওজন বা তাদের যোজনশক্তি সংক্রান্ত ভ্রান্তিগুলি সংশোধন করা সম্ভব হয়েছে। এমনকি, অনেক অজ্ঞাতপরিচয় উপাদানের হাঁড়ির খবরও বার করে দিয়েছিলেন মেন্দেলিয়েভ। কিন্তু শুধু মেন্দেলিয়েভ কেন, অনেকেই আজ ঐ ছকটির দিকে তাকিয়ে অনেক উপাদানের অনেক কথাই বলে দিতে পারেন। যেমন, কোনও উপাদানের পারমাণবিক ওজন নির্ণয় করতে গেলে, তার ওপর-নীচ এবং আশপাশের চারটি উপাদানের পারমাণবিক ওজনের গড়ই মোটামুটি ঐ ওজন নির্ণয় করে দেবে। জার্মানিয়ামের চার পাশের চারটি উপাদানের পারমাণবিক ওজন ২৮'০৮৬, ১১৮·৬৯, ৬৯·৭২ এবং '৪ ৯২১৬—এদের গড় ৭২'৮৫৪-ই মোটামুটিভাবে জার্মানিয়ামের পারমাণবিক ওজন (প্রকৃত ওজন ৭২'৫৯)। কিংবা ধরা যাক অ্যালুমিনিয়ামের ধর্ম বা গুণগুলির পরিচয় নিতে হবে। তৃতীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত হওয়ায় এর অক্সাইডের সূত্র হবে Al_2O_3, অর্থাৎ এর যোজন-শক্তি তিন। একই সারিতে বাঁদিকে বসে আছে ম্যাগ্‌নেসিয়াম—আদর্শ স্বরূপ ধাতু। আর ডান দিকে সিলিকন—দুর্বল ধাতু বিশেষ। সুতরাং যত দূর মনে হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামও একটি ধাতু হবে। তবে ম্যাগ্‌নেসিয়ামের মত হয়ত ততটা জোরাল ধরনের না। তাছাড়া ঠিক ওপরেই তো রয়েছে দুর্বল ধাতু বোরন, আর নীচে স্ক্যাণ্ডিয়াম ধাতু। সুতরাং সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হতে পারেই না,—অ্যালুমিনিয়াম উপাদানটি ধাতুই। সুতরাং পদার্থটি হয় হাইড্রোজেনের সঙ্গে মোটেই মিশ খায় না, অথবা তাদের প্রতিক্রিয়া ঘটলে একটি কঠিন যৌগিক উৎপন্ন হয়। একই সারিতে

ধাতু থেকে দুর্বল ধাতুতে রূপান্তর ঘটনের সন্ধিস্থলে থাকায় এর অক্সাইডের ক্ষারকীয় গুণাবলীও দুর্বল হতে বাধ্য, বা সেটি হবে ক্ষারাম্লধর্মী (ক্ষার ও অম্ল বা অ্যাসিড, এই উভয় ধর্ম বিশিষ্ট amphoteric)। আবার জার্মানিয়ামের মত এরও মোটাসুটি পারমাণবিক ভার হবে এর ঠিক চতুষ্পার্শ্বস্থ উপাদান চতুষ্টয়ের পারমাণবিক ওজনগুলির গড়। অর্থাৎ ১০'৮১১, ৪৪ ৯৫৬, ২৪'৩১২ এবং ২৮'০৮৬—এদের গড়, ২৭'৪১ (প্রকৃত ওজন ২৬'৯৮১৫)।

এভাবেই ত কোনো বিশেষ উপাদানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাৎ না ঘটলেও তার চার দিকে থেকে যারা তাকে পাহারা দিচ্ছে, তাদের ভাবগতিক দেখেই তার প্রভূত পরিচয় যোগাড় করে আনা যাবে। এ থেকেই আবার এক মহাসত্য প্রকাশ হয়ে পড়ছে যে, জগতে কোনো বস্তুই বিচ্ছিন্ন বা স্বয়ংসিদ্ধ হতে পারে না। তার সমগ্র পরিবেশের সঙ্গে সে কোনও না কোনও ভাবে যুক্ত থাকতে বাধ্য। অর্থাৎ তার সমগ্র পরিবেশই যেন তাকে মূর্ত করে তুলছে, রক্ষা করছেও। অথচ মূর্তিলাভের পর সে যেন কত না স্বতন্ত্র। তার আবির্ভাবটি ধরা পড়ে ; কিন্তু তার উল্লম্ফনের অন্তরালে যে উদ্ভব ও উত্তরণ রূপ প্রক্রিয়ার ইতিহাস, তা গোপন থেকে যায়।

মেন্দেলিয়েভের ছক প্রস্তুতকালে স্ক্যাণ্ডিয়াম, থ্যালিয়াম, জার্মানিয়াম প্রভৃতি অনেক উপাদানই আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু তিনি তাদের জন্য ছকের মধ্যে জায়গা রেখেছিলেন। তখন নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলির একটিও আবিষ্কৃত হয়নি বলে তাদের ধরন-ধারণ অজ্ঞাত থাকায় সেজন্য কোনও পৃথক স্থান সংরক্ষিত ছিল না। মূল ছকের অভ্যন্তরে তাদের স্থান হতেও পারে না। হতে যে পারে না, ক্রিয়াময় এতবড় কঠোর নিটোল সত্যের মধ্যে যে নিষ্ক্রিয়তার প্রবেশ নিষিদ্ধ, সত্যদ্রষ্টার কাছে তা যেন অস্পষ্ট থাকেনি। কিন্তু সত্যসাধকের কাছে এ সত্যও অস্পষ্ট থাকেনি যে, নির্গুণ নিষ্ক্রিয় সত্তার পরিকল্পনার মত মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। কোনও বস্তু মনের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে বলেই তাকে জানা যায়, তার সম্বন্ধে প্রতীতি বা জ্ঞান জন্মে। সংক্রমণের গতি যার নাই তাকে জানাও যায় না, দৃষ্টিশক্তি গিয়ে যতই তার চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে লুটোপুটি খেয়ে কেঁদে মরুক না কেন। আর অনুপ্রবেশের অর্থই তো গতি বা পারস্পরিক গতি, অর্থাৎ উভয়ের সম্পর্কেই একের তুলনায় অন্যের গতি। জলরাশি কি কেবল একলাই গতিশীল হয়ে মৃত্তিকার আবরণ উন্মোচন করে তার অভ্যন্তরে পৌঁছে তার স্বরূপটি জেনে আসতে পারে, যদি ঐ মৃত্তিকার কণিকামালা বারিবিন্দুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ে জলকণারও স্বরূপটি জেনে নিতে

না চায়? সুতরাং সংক্রমণের অর্থই যেখানে পারস্পরিক গতি, বস্তু বা কোনও কিছু সম্বন্ধে জ্ঞানই সেখানে ঐ বস্তু বা কোনও কিছুর ক্রিয়মাণতা। ব্যবহারিক সম্পর্কে যতই আমরা 'নিষ্ক্রিয়' কথাটির প্রয়োগ করি না কেন, দ্রষ্টা বা ঋষির চোখে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলিরও ক্রিয়াতাৎপর্য ধরা না পড়ে পারে না। তাই যখন তাদের আবিষ্কার ঘটল তখন স্বয়ং মেন্দেলিয়েভই তাদেরকে শূন্য-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে সর্বক্রিয়াশ্রয় অন্তর্গূঢ় পরমাণুমালার তালিকা-প্রকাশক তাঁর ঐ পর্যায়িক ছকটির একান্তে তাদের স্থান নির্ণয় করে দিলেন। ক্রমে ক্রমে জানাও গেল যে ঐটিই তাদের যথার্থ স্থান। এদিকে না হয় ওদিকে। তারা যেন যেকোনো একদিকে উত্তুঙ্গ শৈলমালার মত দাঁড়িয়ে থেকে পদার্থময় মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের প্রচণ্ড অভিঘাত প্রক্রিয়ায় পরমাণু-বুদ্‌বুদের চিরন্তনী ফেনিল কল্লোল সৃষ্টি করে চলেছে।

কিন্তু ছকের অভ্যন্তরেই অল্প কয়েকটি জায়গায় পাশাপাশি উপাদান যুগলের স্থান-পরিবর্তন ঘটান হয়েছে। আর্গন-পটাসিয়াম, কোবাল্ট-নিকেল এবং টেলুরিয়াম-আয়োডিন—এই যুগলত্রয়ের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই হাল্কা উপাদানটি ভারি উপাদানের পরেই স্থাপিত হয়েছে। মেন্দেলিয়েভ তাঁর মূল পরিকল্পনার পরিবর্তন ঘটিয়ে এসব ক্ষেত্রে নিয়ম ভঙ্গ করেছিলেন। তার কারণ ওজনের নিয়মটি এখানে গোষ্ঠীর নিয়মকে ভেঙে দিচ্ছিল। কেন যে ভাঙছিল, তার সমাধান তখন না হলেও ভবিষ্যতে হয়েছে। কিন্তু ভারিত্বের মর্যাদা অনুযায়ী স্থান দিতে হলে পটাসিয়ামকে শূন্য-গোষ্ঠীতে স্থান দিতে হয়, আর আর্গন জায়গা পায় একটি পর্যায়ের প্রথম সারির প্রথম গোষ্ঠীতে। অর্থাৎ তাহলে একটি ক্ষারীয় ধাতুর স্থানে এমন একটি উপাদান বসে যায়, যে কিনা নিষ্ক্রিয় গ্যাস; আর নিষ্ক্রিয় গ্যাসের স্থান গ্রহণ করে এমন একটি উপাদান, যে রীতিমত সক্রিয় ক্ষারোৎপাদক বস্তু! যেখানে একটি নিয়ম এসে আর একটি নিয়মকে ভেঙে দিতে চলেছে, সেখানে কোন্ নিয়ম অভ্রান্ত পথের সন্ধান দেবে? সেই প্রাকৃতিক নিয়মের বিপুল দ্বন্দ্ব-ঝঞ্ঝার মধ্যে বিজ্ঞানী এসে তাঁর নিপুণ হাতে হাল ধরে বসলেন। নৌকো এগিয়ে চলল অন্ধকার পথে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এসে দেখা গেল (দ্র.—পরমাণুর অন্তঃপুরে) তরি এসে কূললগ্ন হয়েছে।

তবুও কিন্তু বিজ্ঞানী ঐ তিনটি স্থল ছাড়া অন্য কোথাও তাঁর মূল নীতির পরিবর্তন করেননি—সেই ভর বা ভারের নীতিটির। তিনি নিজে লিখেছিলেন, "ভরই উপাদানের একমাত্র নিশ্চিত ধর্ম, যাকে অবলম্বন করেই তার অন্য ধর্মগুলির বিকাশ ঘটছে।" এবং "উপাদানের ভারের উপর নির্ভর

করেই সরল পদার্থগুলির গুণাবলী এবং যৌগিক পদার্থনিচয়েরও গড়ন (আকার) আর গুণাবলী বারে বারে ফিরে আসে।”

ভরই তাহলে বস্তু বা তার উপাদান মাত্রেরই মূল প্রকৃতি ? আর তারই বৃদ্ধি বা হ্রাসের ফলে নূতন গুণযুক্ত নূতন বস্তুর আবির্ভাব ? অর্থাৎ ভরের পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলেই যে বস্তুরও গুণগত পরিবর্তন ঘটে চলেছে—পর্যায়িক ছক এই সত্যটিকেই নিশ্চিতভাবে তুলে ধরল। উপরিউক্ত তিনটি স্থল ছাড়া ছকের প্রথম উপাদান হাইড্রোজেন থেকে শেষ উপাদান ইউরেনিয়াম পর্যন্ত পরমাণু জগতের সর্বত্রই এই সত্যটি ধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু এই ভরের পরিমাণগত পরিবর্তনেই যদি পরমাণুরও গুণগত পরিবর্তন ঘটে উঠে, তাহলে তো একথা বলা চলে যে, ভর আর গুণ একার্থক, যেমনটি বিজ্ঞানী নিজেই সিদ্ধান্ত করেছেন ? আর একথাও কি বলা চলে না যে ভরই যখন বিচিত্র ভঙ্গিতে বিচিত্র রকমের পরমাণু স্থষ্টি করে পরমাণু অণুর সোপান বেয়ে এই পৃথিবীর অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সকল প্রকার বস্তুর উদ্ভব ও লীলাবিলাসকে সম্ভব করে তুলেছে, তখন এই ভরই পৃথিবীর একমাত্র মূল উপাদান ? কিন্তু ভর যদি কোনো গুণ বা ধর্ম না হয়ে থাকে, তাহলে ভরকে উপাদান বলে চিহ্নিত করা, আর সমগ্রভাবে লোহা-পাথর-মাটিকেও পার্থিব উপাদান বলে ধরে নেওয়া একই কথা। অথচ বিদেহী (abstract) গুণ কি করে পদার্থ (concrete) হয় ? যখন আমরা জানি গুণ পদার্থেরই ? সুতরাং ভর য'দ গুণ হয়ে থাকে, তবে সে কোন্ পদার্থের গুণ বা ধর্ম ? সেই পদার্থই তো তাহলে মূল পার্থিব উপাদান হতে পারে ! এসব দার্শনিক চিন্তা কিন্তু নিরর্থক, যদি না আবার বিজ্ঞান এগিয়ে এসে মূল পদার্থটিরই সন্ধান দিয়ে দিতে পারে। রসায়ন-বিদ্যা আমাদের অনেক দূরে এনে পৌঁছে দিয়েছে সত্য, কিন্তু এর চেয়ে তো প্রাচীনকালের সেই তাত্ত্বিক দর্শন চিন্তা ভাল ছিল—যার মধ্যে পরীক্ষা ও পুনঃপরীক্ষামূলক প্রমাণের বালাই নেই ! কিন্তু এতদূর এগিয়ে আসার পর বিজ্ঞান কি তাহলে চোরা-বালির মধ্যে এনে ফেলে দিলে এত দিনের এত মানুষের সাধের সাধনা-তরিকে ?

কিন্তু না। এ রকম চিন্তাই অবৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানের কাছে অ-সমাধেয় সমস্যা বলে কিছু থাকতে পারে না। মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করবার জন্য লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ লিখিত হওয়ার দরকার হতে পারে। কিন্তু সত্যের স্বরূপই স্বয়ংপ্রকাশমানতা, এবং লক্ষ লক্ষ শাস্ত্রগ্রন্থের কোটি কোটি অনুশাসন দিয়ে তাকে কেবল ঢেকে রাখার প্রয়াস চলতে পারে মাত্র। আর গ্রন্থরাজির গ্রন্থিজাল রচনা কেবল সেই

প্রয়াসের বাহাদুরিটুকুই প্রমাণ করে দিতে পারে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে, বিজ্ঞান সেই স্বয়ংপ্রকাশ সত্যকে দেখে নিতে চায় বলেই সত্যের চির প্রসারিত হস্ত তাকে সাহায্য করে চলে, সত্যের বন্ধমুক্তি ঘটে। বিজ্ঞানের সাধনা তাই ঐ মিথ্যার গ্রন্থিমোচনেরই সাধনা, তার এক একটি সিদ্ধান্ত ঐ জালের এক একটি গ্রন্থি ছিন্ন করে চলেছে। সে যে সব সমস্যার সমাধান দিতে পারেনি, সে তার অগৌরবের কিছু নয়। কিন্তু ইতিমধ্যে সে যেসব দীর্ঘপোষিত যুগসঞ্চিত দুরূহ সমস্যার সমাধান এনে দিয়েছে, তা তার নিশ্চিত গৌরবের। আর তার এই গৌরবেই সমগ্র মানবসমাজও আজ গৌরবান্বিত, মহিমান্বিত ; বিস্মৃতি বা অবলুপ্তির গহ্বরমুখ থেকে মানবসমাজের এমন পুনরুদ্ধার! সুতরাং বিজ্ঞানের ঐ মহিমময় অতীত সিদ্ধিই তার ভবিষ্যৎ সিদ্ধির অব্যর্থ প্রমাণ। তার সাধনাক্ষেত্র আজ বহুধা প্রসারিত। রসায়ন-বিদ্যা হয়ত এক জায়গায় এসে ক্ষণ-বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। কিন্তু পদার্থ বা বস্তু-বিদ্যা এগিয়ে এসে যে সেখানে আলো তুলে ধরতে পারবে না, সেকথা জোর করে বলবে কে? দেখা যাক না কেন, সে আজ কী বলতে চায়, এ-সম্বন্ধে কী বলেছেই বা সে, আর কী তার ভবিষ্যতের উদ্দেশ!

বিজলীর রাজ্যে

প্রথম পর্ব

রসায়নবিদ্যার মত পদার্থবিদ্যাও প্রকৃতিবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, জীববিদ্যা, ভূবিদ্যা এবং দেহতত্ত্ব, শরীরতত্ত্বও। এমনকি, সমুদ্র ও সামুদ্রিক বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, বা অর্থনীতি-পৌরনীতি সমাজনীতি, রাজনীতি পর্যন্ত অনুসন্ধান ও পরীক্ষামূলক সকল প্রকার বিজ্ঞানই। প্রকৃতি থেকেই সকল প্রকার বস্তুর উদ্ভব, প্রকৃতির মধ্যেই সমস্ত কিছুর অবস্থিতি, বিস্তার এবং বিকাশ। এমনকি, প্রকৃতিলব্ধ প্রতিপত্তি প্রভাবে মানুষ সেই প্রকৃতির রাজ্যেও নানা প্রকার পরিবর্তন ঘটিয়ে দিচ্ছে। আবার প্রকৃতিতেই সকল বস্তুর বিলুপ্তি ঘটছে, যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইচ্ছা-স্ফুলিঙ্গেরও। সুতরাং সকল জলধারা ও নদনদী যেমন সাগর বা মহাসমুদ্রের অভিমুখী হয়ে ছুটে চলেছে, সকল বাসনা, প্রভাব এবং শিক্ষা-প্রকৃতিরও শেষ গম্যস্থল সেইরূপ পার্থিব বা বিশ্বপ্রকৃতি। বস্তু প্রকৃতিই হক, বা অভিনব বৈশিষ্ট্যময় মানস-প্রকৃতিই হক, বা অন্য কোনো প্রকার প্রকৃতিই হক,—মূল প্রকৃতিই মানুষের প্রথম ও শেষ শিক্ষণীয় বিষয়, সকল সাধকের শেষ সাধ্য সাধনার বস্তু। বা বলা যায়, প্রকৃতি নিজেই যেন এক মহাতপস্বী, আর মহাশিক্ষকও। এই পৃথিবীতে তাঁর বর্তমান সাধনা হয়ত এক মহামানস গঠনের সাধনা, বা হয়ত অন্য কিছুর সাধনা। কিন্তু কী যে সেই সাধনা, সেটুকু একমাত্র তিনিই জানিয়ে দিতে পারেন। তাই তিনিই বিশ্বজগতের একমাত্র শিক্ষকও। মানুষ বা আর যা কিছু সবই শিক্ষানবীস মাত্র। তাদের সকল প্রকার শিক্ষা সাধনার উদ্বোধন এবং পূর্ণতা সাধন সেই মহাশিক্ষয়িত্রীর হাতেই। এমনকি, শিক্ষার অর্থই প্রকৃতিশিক্ষা। সে প্রকৃতি—মৃত্তিকা, সমুদ্র, জীব, দেহ, মন, অর্থ, সমাজ বা আর যাই হক না কেন।

কিন্তু প্রকৃতির সাধনা কোনো বিচ্ছিন্ন বা সংকীর্ণ সাধনা হয়। বিশ্বব্যাপ্ত তাঁর দেহসাধনা। গ্রহ-নক্ষত্র ভুবন গগনময় সেই মহাতপস্যার বহির্ভূত কোনও বিষয়ের অস্তিত্ব অসম্ভব। আমাদের এই ধরিত্রীর আকাশ বাতাস অতিক্রম করে দূর নীহারিকার নভঃপ্রান্ত পর্যন্ত এক সত্যেরই দ্যোতনা। সর্বত্রই এক প্রেরণা পরিস্পন্দিত এই মহাসত্যকে ব্যর্থ করে দিয়ে শূন্যস্থান কি করে থাকতে পারে সত্যবিরোধী হয়ে, বা মিথ্যার নাম নিয়ে ? শূন্য বা মিথ্যা বলে কোথাও কিছুই নাই, ঠিক যেমন সংকীর্ণ বা বিচ্ছিন্ন সত্য বলেও কিছু নাই। হাইড্রোজেনের পর হিলিয়াম, আর হিলিয়ামের পর সোডিয়াম, বেরিলিয়াম,বোরন,কার্বন—ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে সত্য কথা।

কিন্তু তাই বলে তাদের মধ্যে শূন্যস্থান বলেও কিছু নাই। একভার হাইড্রোজেন আর চতুর্ভার হিলিয়ামের মধ্যে যে দুই বা তিন ওজনের হাইড্রোজেন বা অন্য কোনো পদার্থ আত্মগোপন করে থাকছে না, সে কথা কি জোর করে বলা যায়? তাদের অনুসন্ধানই তো হবে তাই বিজ্ঞানের অনুসন্ধান বা প্রকৃতি-অনুধাবন। কিন্তু এক, দুই, তিন—এরাও তো অসংখ্য স্পন্দনের কয়েকটি স্পন্দনসীমা মাত্র। বহু সংখ্যা যুগলের অন্তর্গূঢ় প্রেরণার প্রকাশেরই ভাষা শুধু। সেই প্রেরণাই তো বিশ্ববিধৃত (বিশ্বব্যাপ্ত) মহাসত্য। একাধিক যত বেশি সংখ্যা একত্র করা যাবে, সেই স্পন্দন প্রকৃতিও ততই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাই বহুকে না জানলে এককে জানা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। সাহিত্যশিক্ষা তাই ভণ্ডামির নামান্তর হয়ে যেতে পারে, যদি তার সঙ্গে ইতিহাসশিক্ষা, দর্শনশিক্ষা, বিজ্ঞানশিক্ষাদির যোগ না ঘটিয়ে দেওয়া যায়; ঠিক যেমনভাবে বিজ্ঞানশিক্ষাও ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে—ইতিহাস, দর্শন বা সাহিত্যাদি শিক্ষার সঙ্গে তার মিলন না ঘটিয়ে দিলে। কিংবা জীববিদ্যার মূল্য কতটুকু, যদি তার সঙ্গে রসায়নবিদ্যার যোগ না থাকে; রসায়ন-শাস্ত্রই বা কোন্ সার্থকতা আনবে পদার্থবিদ্যার সহযাত্রী না হয়ে? অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি বিচ্ছিন্নভাবে এদের এক একটির সার্থকতা বা উপযোগিতা কতটুকুই বা?

দেখেছিই তো মূল পার্থিব উপাদানকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে রসায়নশাস্ত্র কেবল তার ভরপ্রকৃতির সন্ধান পেলেও মূল উপাদানটি খুঁজে বার করতে পারল না। তাই তার সঙ্গে পদার্থ বা অন্য কোনো বিদ্যার অভিজ্ঞতাটুকু মিলিত করে দেখা অপরিহার্য হয়ে পড়ল। পদার্থশাস্ত্র নিয়েই আরম্ভ করা যেতে পারে। দুটির যোগ সুনিবিড়। কিন্তু এর ইতিহাস বোধকরি আরও বিচিত্র এবং চমকপ্রদ। বিশেষ করে এর কয়েকটি শাখার—যেখানে সে এমন সব বস্তুর সন্ধান পেয়েছে, যারা কিছুতেই ধরা দিতে চায় না। নব নব সাজ পরে আসে, আর কেবল ছুঁয়ে ছুঁয়ে প্রচণ্ড গতিতে বিদ্যুতের মত ছুটে পালায়। বা, আলো-চুম্বক-বিদ্যুৎই তাদের স্বরূপ, একথা না বলি কেন? শব্দ আর তাপ, আলো আর বিজলি—এদের কি হাতে করে ধরে রাখা যায়, যেমন ধরে রাখা যায় পাথরের টুকরোটিকে, বা এমনকি সোনা-রূপা-মণি-মুক্তোকে? একথা বলতে গিয়ে হয়ত আত্মপ্রতারণা হচ্ছে; তা জানি। ভাল করেই জানি যে যতই মণি-মুক্তোর গরব করি না কেন, তার প্রকৃত স্বরূপের কতটুকুই বা জানি? পরমাণু সম্পদ—সে তো ঐ দূর গগনের নীহারিকার মতই অ-ধরা, অ-ধরা হয়ে থাকে যেমন ঐ আলো আর বিদ্যুৎ। তাহলে এই পরমাণু, আর ঐ আলো-বিদ্যুৎ—এরাই কি সেই পৃথিবী-আকাশ ব্যাপ্ত অজানা মহাসত্যের দুটি প্রান্তিক অ-ধরা সত্য, ধরা দেওয়ার জন্য এমনভাবে চিরচঞ্চল হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে? কিন্তু কে

তাদের ধরবে, তারা নিজেরা না ধরা দিলে? "যমেবৈষো বৃণুতে তেন লভ্যঃ?" "সে যাকে দয়া করে ধরা দেবে কেবল সেই তাকে পাবে?" কিন্তু এই তো ক্ষুদ্র মানুষ আর তার অতিক্ষুদ্র শক্তি! কেমন করে সে ধরে রাখবে ঐ বিপুল শক্তিময়কে? মানুষেরও ভর আছে, আবেগ আছে, সে চলে বেড়ায়। কিন্তু তার মধ্যে এই ভর-তেজের মিলন-সূত্রটি কোথায়—যা ঐ প্রান্তদুটিকে যোগ করে দেবে? কিন্তু তা যদি না থাকবে, তাহলে এই ভর-গতিময় জীবের উদ্ভাবনাই যে ছলনা হয়ে যায়? প্রকৃতির উদ্ভাবনা কি ছলনা মাত্র?

কিন্তু প্রকৃতি যে মানসপদ্ধতিটি সৃষ্টি করে চলেছে, সেইটিই ত ঐ সূত্র। পৃথিবীর উপর এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকা ভরতেজোময় মনঃপদার্থগুলি উপযুক্তভাবে সন্নিবিষ্ট বা সংস্থিত হলে ভর-তেজের স্বরূপ তো আর গোপন থাকতে পারে না। এই সন্নিবেশ বা সংস্থানের মধ্যেই তাই সার কথাটি লুকিয়ে আছে। সেই সন্নিবেশ নিয়ে যেন প্রকৃতির এক মহাপরীক্ষা চলছে। বৈজ্ঞানিক মানস সৃষ্টিতেই যেন তার পূর্ণ সার্থকতা। সেই ঘটনা ঘটলে তখন আর বিচ্ছিন্ন একক মনের সর্ব প্রাধান্য থাকতে পারে না। পৃথিবীব্যাপ্ত এক বৈজ্ঞানিক ভাবনাই হয়ত তখন সমাজমানস নাম গ্রহণ করে সকল সমস্যার সমাধান এনে দিতে পারে। সত্যকে তখন আর খুঁজে বার করতে হবে না। সে তখন আপনিই এসে ধরা দেবে। যেমন ঐরূপ এক মানস-প্রকৃতি গঠনের শৈশবে ষোড়শ শতকের কাছাকাছি এসে বহু সত্যই ধীরে ধীরে ধরা পড়তে আরম্ভ করেছিল সমগ্র পৃথিবীকে হতবাক করে দিয়ে। খ্রীষ্টজন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্বে প্রশ্নাবলী ধ্বনিত হয়েছিল, কিন্তু তার উত্তর এসে পৌঁছতে লাগল দু'হাজার বছর পরে। কেবল ভরপ্রধান পরমাণুর প্রশ্ন নয়, গতিবান বস্তুর প্রশ্নও। অর্থাৎ বস্তুর পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের প্রশ্নও। কিন্তু পরমাণুকে যুগ যুগ ধরে মানুষ খুঁজে এসেছে। তারপর তার সেই অনুসন্ধান সাধনা যখন তার বৈজ্ঞানিক মনের জন্ম দিলে, তখনই গতির সত্যও প্রবল গতিতে এসে হাজির হয়ে গেল, একেবারে যেন হঠাৎই।

সত্যই প্রশ্ন জেগেছিল এখন থেকে আড়াই হাজার বছরেরও আগে। কিন্তু সে সম্ভবত অস্পষ্ট জিজ্ঞাসা মাত্র। প্রাচীন গ্রীসের সপ্ত জ্ঞানীর একজন জ্ঞানী পুরুষ মিলেটাসের দার্শনিক পূর্বোল্লেখিত থালেসই একথা জানতেন যে ঘর্ষিত অম্বর-স্ফটিক ছোট ছোট টুকরো বস্তুকে আকর্ষণ করতে পারে। আর অয়স্কান্তেরও (magnet—চুম্বক লোহা) ঐ আকর্ষণী শক্তি বিদ্যমান। কিন্তু তা আকর্ষণ করে শুধু অয়স্ বা লোহকে। অম্বর স্ফটিক ব্যবহার হত সাজানোর কাজেই। সোনা বা সোনা-রূপার মিশ্রণের মত ঔজ্জ্বল্যের জন্য এরও নাম ছিল ইলেক্ট্রন। তা থেকেই

ইলেক্ট্রিসিটি। থালেসের তিন শ' বছর পরে থিওফ্রেস্টাসও (Theophrastus—371-286 খ্রী. পূ.) আর এক খনিজ পদার্থের উল্লেখ করেছেন। ঘর্ষণের ফলে তা' আকর্ষণী শক্তিসম্পন্ন হয়। আর ঐতিহাসিক প্লিনি (Pliny—23-79 খ্রী.) উল্লেখ করেছেন অয়স্কান্ত বা চুম্বকের কথা। প্রাচীনকালে ইজীয় সাগর আর ভূমধ্য সাগরীয় দ্বীপাবলী থেকে লোহা নিষ্কাশিত হত। আর চুম্বক পাথরের খনি ছিল লঘু-এশিয়ার ম্যাগনেশিয়ায়। রোমের ঐতিহাসিক লিউক্রিসিয়াস (Lucretius—আ. ৯৬—আ. ৫৫ খ্রী. পূ.) বলেছেন, সেই থেকেই ওর নাম হয়েছে ম্যাগনেট। চুম্বক পাথরের অদৃশ্য শক্তি অবশ্য বহুবিধ পুরানো গাথার প্রেরণা যোগিয়েছে। কিন্তু ইলেক্ট্রিসিটি আর ম্যাগনেট সম্বন্ধে জ্ঞান ঐ পর্যন্তই। কী তাদের স্বরূপ, কেন তারা এমন ক'রে আকর্ষণ করে (কিংবা তাদের কোনো বিকর্ষণী শক্তি আছে কিনা), হাজার হাজার বছর ধরে এসব প্রশ্নের কোনো সমাধানই পাওয়া যায়নি। গ্যালিলিও-গিলবার্টের যুগে এসে যখন স্পষ্টভাবেই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির অভ্যুদয় ঘটল, কেবল তখনই পুরানো প্রশ্ন যেন একেবারে সমুচ্চ হয়ে উঠল।

রাণী এলিজাবেথের সাধারণ চিকিৎসক চৌম্বক-দর্শনের জনক গিলবার্টই (William Gilbert—1540-1603) সর্বপ্রথম অম্বর-স্ফটিক আর চুম্বক-পাথরের বিশেষ শক্তি সম্বন্ধে 'ইলেক্ট্রিক শক্তি', 'ইলেক্ট্রিক আকর্ষণ', 'চৌম্বক মেরু' প্রভৃতি কথার প্রয়োগ করলেন। যেসব বস্তু অম্বরের মতই আকর্ষণ করে, তাদের তিনি নাম দিলেন 'ইলেক্ট্রিকৃস্'। ধাতু আর যেসব বস্তুর এ শক্তি নাই, তাদের নাম দিলেন 'নন্-ইলেক্ট্রিকৃস্' (যা ইলেক্ট্রিকৃস্ নয়)। লোহার পাত বা তারকে উত্তর দক্ষিণে রেখে তাকে আঘাত করে বা টেনে বিস্তৃত করে, বা তপ্তলোহিত লৌহকে ঠাণ্ডা হওয়ার সময় আঘাত করে করে যে সব চুম্বক-প্রস্তুতকরণের কথা আজও উল্লেখ করা হয়ে থাকে তার কতকগুলি পদ্ধতি গিলবার্টই উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম এক যুগান্তকারী মতবাদ ঘোষণা করলেন যে এই পৃথিবীটিই একটি চুম্বক পদার্থ। তার দুদিকে উত্তরে আর দক্ষিণে দুটি চুম্বক-মেরু বিদ্যমান। তারাই পৃথিবীর যে কোনো স্থানের যে কোনো দোলায়মান চুম্বকের প্রান্তদ্বয়কে আপন আপন অভিমুখে আকর্ষণ করে টেনে নেয়। উত্তর মেরু টেনে রাখে চুম্বকের দক্ষিণ মেরুকে, আর দক্ষিণ ভূ মেরু টেনে নিতে চায় পৃথিবীর যেখানে যত চুম্বক আছে তাদের সকলকারই উত্তর মেরুকে। আমরা অবশ্য আজ পর্যন্ত ভুল ক্রমেই কোনো চুম্বকের উত্তর-সন্ধানী (যা উত্তর দিককে অনুসন্ধান করে) মেরুকে উত্তর মেরু, আর দক্ষিণাভিমুখী মেরুকে দক্ষিণ মেরু বলে থাকি। কিন্তু

ভুল করেছিলেন প্রাগ্‌বৈজ্ঞানিক যুগের দার্শনিকবৃন্দও, যাঁরা পার্থিব শক্তিগুলির নিয়ামক শক্তিকে দেখেছিলেন দূর আকাশের ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রলোকে।

অ্যারিস্টটলের মত এতবড় মনীষারও ভ্রান্তি ঘটেছিল। হয়ত সেজন্য প্রকৃত বৈজ্ঞানিক চিন্তার অভ্যুদয় ঘটতে দু' হাজার বছর বিলম্ব হয়ে গেছে, মানব সভ্যতা প্রায় দু হাজার বছর পিছিয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতির প্রভাবকে অতিক্রম করা অসম্ভব। কী স্বার্থসর্বস্ব সংকীর্ণ প্রবৃত্তির তাড়নার ক্ষেত্রে, কী পরহিতপ্রেরণার বৃহত্তর উপলব্ধির ক্ষেত্রে। তাই প্রাকৃতিক বিবর্তনের অপ্রতিহত অসীম শক্তি প্রভাবে পরিমিতশক্তি মানবমনও সেই বিবর্তন (ক্রমশ পরিবর্তন)-পথে প্রত্যাবর্তিত হতে বাধ্য হয়েছে। মানবমনের সকল প্রকার বৈশিষ্ট্য ও ইচ্ছাশক্তি সত্ত্বেও সেই বিবর্তনধারার অভিমুখ কারও দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারেনি, "ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন" ("বুদ্ধির দ্বারাও নয়, বহুবার বেদ পাঠের দ্বারাও নয়")। বস্তুত, অবিরত সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক সংকীর্ণ (অর্থাৎ স্বার্থযুক্ত) বৃত্তিগুলিকে জয় করার মধ্যেই যেমন মানবমনের শক্তি-সাধনার ও শক্তি-অর্জনের শ্রেষ্ঠত্ব, তেমনি প্রাকৃতিক সমগ্রসত্য উপলব্ধির জন্য প্রাকৃতিক মহান শিক্ষা গ্রহণ ও তার অনুগমনের মধ্যেও মানবমনের মাহাত্ম্য। এ যেন একই মনঃপ্রক্রিয়ার দুটি দিক—প্রাকৃতিক সংঘর্ষ, আর প্রাকৃতিক অনুগমন। অর্থাৎ অনিবার্য সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই অনিবার্য অগ্রগতি। দু' হাজার বছর ধরে ভ্রান্ত বা সংকীর্ণ চিন্তাধারার সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত মানবমনের বৈজ্ঞানিক সত্তায় উত্তরণের কাজ আরম্ভ হয়েছে। কীভাবে তা হয়েছে, তার কিছুটা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি। কিন্তু যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা এই যে, ষোড়শ শতাব্দীতে এসে প্যারাসেলসাস্‌-এগ্রিকোলা-গিলবার্ট-গ্যালিলিও নামক বৈজ্ঞানিক সত্তার অভ্যুদয় ঘটেছে। তারই অনিবার্য ঝোঁকে বা জাড্য প্রভাবে যেন ক্রমে ক্রমে বয়াল-নিউটনেরও আবির্ভাব, আর অনিবার্যভাবেই মানবমনে প্রাকৃতিক সমগ্রসত্যেরও আত্মসমর্পণের সমারোহ-প্রস্তুতি। ১৬৮১ খ্রী-এ বোস্টনগামী জাহাজের ওপর বাজ পড়ল, আর নক্ষত্রমালার অবস্থান দেখে বোঝা গেল যে দিগ্‌নির্ণয় যন্ত্রের চুম্বকের মেরুদ্বয় পালটে গেছে। চুম্বকের উত্তর মেরুকে দক্ষিণ মেরু ধরে নিয়ে নাবিকেরা তাঁদের গম্যস্থানেই জাহাজ টেনে আনলেন। কিন্তু আকাশের আলোময় এতবড় বিদ্যুৎ, আর মাটির কালোময় এতটুকু চুম্বকের মধ্যেকার অনাদি কালের গোপন প্রণয় কাহিনীটি শেষে কিনা ধরা পড়ে গেল পাহারাদার বিজ্ঞানী মনটারই কাছে!

শুধু কি তাই? সুন্দরী মেয়ে দুটি পথ বেয়ে চলেছে। সত্যিই তারা সুন্দরী। কিন্তু সুন্দরতর হতে চায় না কে? তারা পরেছিল পরচুলা। শুকনো কেশের

সে এক শ্রী। কিন্তু সামলানো যায় না যে! বার বার উড়ে এসে পড়ছিল গালে। রঞ্জকহীন কপোল দুটিতে তারা অমনভাবে বার বার আছড়ে পড়ছে কেন? আর সেটা ধরা পড়ে গেল একেবারে বিজ্ঞানীর চোখেই! সন্দিগ্ধমনা বিজ্ঞানীর যেন সব কিছুতেই সন্দেহ। সন্দেহ ভঞ্জনার্থে বয়্যাল মহিলাদ্বয়ের একজনের অনুমতি নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করে দিলেন। দেখা গেল শূন্যে দোদুল্যমান কুন্তলদামের কাছে মেয়েটি তার কবোষ্ণ (ঈষৎ উষ্ণ) করকমল নিয়ে আসতেই কেশপ্রান্ত ঝুঁকে এসে পাণি স্পর্শ করল। একবার নয়, বার বার। বয়্যাল সিদ্ধান্ত করলেন, মৃদু ঘর্ষণেই অলকগুচ্ছ ইলেক্ট্রিক শক্তিযুক্ত হয়ে যায়, তাই তার এমন দেহপিপাসা। নিউটনও একটি পরীক্ষা দেখিয়ে রয়্যাল সোসাইটিকে অবাক করে দিলেন। পেতলের ফ্রেমে আটকান একটি গোলাকৃতি কাচখণ্ডকে একটি অমসৃণ দ্রব্য দিয়ে কয়েকবার বেশ ভালভাবে ঘষে টেবিলে ছড়ান কতকগুলি খুব ছোট টুকরো কাগজের কাছে এনে ধরতেই কাগজগুলি এদিকে ওদিকে নেচে উঠল, কাচের গায়ে এসে ধাক্কা দিতে লাগল, এবং তাদের কেউ কেউ সেখানে একটু লেগে থেকে আবার লাফিয়ে পড়ল। তিড়বিড় করে তাদের ঐ বারংবার লম্ফন আর ব্যাঙ-নৃত্য উপস্থিত সবাইকে অবাক করে দিল।

ম্যাগ্‌ডেবার্গ্‌বাসী গ্যারিক (Otto von Guericke—1602-'86) কিন্তু দেখালেন যে একটি আবর্তমান (যা ঘুরছে) গন্ধক-গোলকের গায়ে কেবল হাত লাগিয়ে রাখলেই ইলেকট্রিসিটি উৎপন্ন হয় এবং তা ঐ গোলকেই স্থিতিলাভ করে। বস্তুত এই কৌশলকে অবলম্বন করেই ঘর্ষণজাত স্থির বা স্থৈতিক ইলেকট্রিসিটি উৎপাদনের যন্ত্র নির্মাণ সম্ভব হয়। গ্যারিকের চোখে আরও একটি জিনিস ধরা পড়ল। কোনও বস্তুতে ইলেক্ট্রিসিটি সঞ্চিত করার পর তার কাছাকাছি-অন্য কোনো ইলেক্ট্রিসিটি ধারণক্ষম বস্তুকে এনে ধরলে পরবর্তী বস্তুটিতেও আপনা আপনিই আবেশ ঘটে। তিনি এ সম্পর্কে আরও কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু ঐ বয়্যালের চোখেই আবার ধরা পড়ে গেল যে শূন্যস্থানের মধ্য দিয়েও ইলেক্ট্রিসিটির আকর্ষণী শক্তি কাজ করে চলে। ১৬৭৬ খ্রী.-এ পিকার্ড (Jean Picard—1620-'82) একদিন প্যারীর মানমন্দির থেকে একটি বায়ুচাপমান যন্ত্র নিয়ে আসছিলেন। হঠাৎ তিনিও দেখতে পেলেন যে, যন্ত্র মধ্যস্থ পারদের এক একটি ঝাঁকুনির ফলে নলের মধ্যে পারদের ওপরে যে বায়ুহীন শূন্যস্থান আছে সেখানে এক একটি দ্যুতির সৃষ্টি হচ্ছে। গন্ধক থেকেও যে এক ধরনের জলজলে প্রভার বিচ্ছুরণ ঘটে, সেই ঘটনা আবিষ্কৃত হওয়ায় তখন বিজ্ঞানীদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তাই ঐ শূন্যস্থানের দ্যুতির কারণও অনুমিত হল পারদীয়

গন্ধক। কিন্তু পিকার্ড-সৃষ্ট দ্যুতি নিয়ে হক্‌স্‌বী (Francis Hauksbee—?-1713) ইংলণ্ডে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। পারদপাত্রে উল্টানো পারদপূর্ণ কাচনলের খানিকটা পারা উপরদিককার বন্ধ মুখ থেকে কিছুটা নেমে এসে নলমধ্যে ঐ ওপরের দিকে যে শূন্যস্থান [টরিসেলি (Evangelista Torricelli—1608-'47) সর্বপ্রথম এই শূন্যস্থানটি আবিষ্কার করেন বলে তাঁর নাম অনুযায়ী ঐ স্থানটি টরিসেলি শূন্যস্থান নামে পরিচিত হয়] সৃষ্টি করে, তিনি তার মধ্য দিয়ে হাওয়া ঢুকিয়ে দিলেন। কাচের একটি বড় উপড়ানো ঢাকনা-পাত্রের (বেলজার) দ্বারা পারদপাত্র ঢাকা ছিল। তিনি দেখতে পেলেন যে তোড়ে হাওয়া ঢোকার সঙ্গেই ঐ পারদ কাচপাত্রের চারদিকে ধাক্কা মেরে লাফিয়ে উঠল, আর অমনি আলোর অসংখ্য ফুলঝুরি চারদিকে ঠিকরে উঠে পারাতেই নেমে এসে মিলিয়ে গেল। এই রকম আরও কতকগুলি পারদ সংক্রান্ত পরীক্ষার ফল দেখে হক্‌স্‌বী সিদ্ধান্ত করলেন যে গতি আর আংশিক শূন্যস্থান ছাড়া কোনো আলোই পাওয়া সম্ভব নয়, এবং যেহেতু ঘটনাগুলিতে আকর্ষণের কাজ আছে সেজন্য ধরে নিতে হবে যে আলোর কারণই ঐ ইলেক্ট্রিসিটি। হক্‌স্‌বীই প্রথম প্রমাণ করলেন যে ইলেক্ট্রিসিটি কেবল বস্তুর বহিস্তলেই বিরাজ করতে পারে, অন্যত্র নয়; আর ধাতুগুলিও ঘর্ষণের মাধ্যমে ইলেক্ট্রিক অর্থাৎ ইলেক্ট্রিসিটি যুক্ত হয়ে উঠে।

মাথা খাটিয়ে চিন্তাবুদ্ধি দিয়ে পরীক্ষা করে না হয় এসব জিনিসের আবিষ্কার হল। কিন্তু ঐ বোস্টনগামী জাহাজে বাজ পড়ে চুম্বকমেরু পালটে যাওয়ার ব্যাপারটি? বা, মানমন্দির থেকে নিয়ে আসা বায়ুচাপমান যন্ত্রের মধ্যে পারার ধাক্কা খেয়ে শূন্যস্থানে সৃষ্ট দ্যুতি-ঝলমলের বিষয়টি? কিংবা, ঐ কুন্তলদামের দেহপিপাসার ঘটনাটি?—একেবারে প্রায় একসঙ্গেই এসব বিষয় এবং আরও এরকম কত শত ঘটনা কোথা থেকে উজিয়ে এসে হাজির হল? এরকম কোনো ঘটনা কি ঘটেনি মানুষের লক্ষ বছরের জীবন যাত্রায়? আড়াই হাজার বছর পূর্বেকার অম্বর-স্ফটিকের আকর্ষণী শক্তির ব্যাপারটি মানুষের চোখে পড়েছে, আর পড়েছে অয়স্কান্তের আকর্ষণী শক্তির দুর্দান্ত প্রভাবটিও। কিন্তু তার আগে? থালেস যখন অম্বরের উল্লেখ করেছেন, তখন বোঝা যায়, হয়ত তার আগেই ওর ঐ অদ্ভুত প্রকৃতির কথা মানুষ জেনেছিল—জড়ের জীবতুল্য আকর্ষণী প্রকৃতির কথা। কিন্তু কত আগে তা প্রথম ধরা পড়েছিল? দু'শ' বা দু' হাজার বছর আগে বলেও ধরে নিতে আপত্তি নাই, যদি তখন অম্বর স্ফটিকের আবিষ্কার হয়ে থাকে, বা কাচ বস্তুটির। কিন্তু চুল-চামড়া তো মানবেতিহাসের প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিল। তখন কি তাদের ঐ অনুরাগের ব্যাপারটি মানুষ দেখতে পায়নি?

হলপ করে বলা চলে, পেয়েছিল। কারণ মানুষের চোখটিও ঐ চুল-চামড়ার মতই আদিম। কিংবা হয়ত আরও পূর্ববর্তী। সুতরাং দেখেছিল মানুষ ঠিকই। শুধু এ ব্যাপার নয়, হয়ত আরও কতনা ব্যাপারই। কিন্তু দেখবার যন্ত্র যে চোখ, তা তারা বানিয়ে ফেললেও, জিজ্ঞাসা করবার যে মন, তা তাদের ছিল না। তাই সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নও জাগেনি। প্রথম প্রাণের উদ্ভব থেকে দৃষ্টিশক্তির একটি মোটামুটি ধরনের ব্যবস্থা হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। সে তুলনায় তার পরে ঐ চোখের উদ্ভব থেকে স্নায়ুতন্ত্রের উদ্ভব ও তার বিকাশের মারফতে মানবিক মনটির একটি মোটামুটি গড়নকাল পর্যন্ত সময় লেগেছে নেহাৎ কম নয়। কিন্তু সে মন যখন গড়ে উঠল, তখন প্রশ্নও জাগল। পৃথিবীর আদি অন্ত, তার গতিপ্রকৃতি এবং তার মূল উপাদান সম্বন্ধেও নানা প্রশ্ন তাই জেগে উঠেছিল এখন থেকে আড়াই তিন কি চার-পাঁচ হাজার বছর আগেও। কিন্তু প্রশ্নের সমাধান করবে যে মন, কোথায় তখন সে? তাই আরও হাজার হাজার বছর কেটে গেল। তবুও সে সময়টি আগের ঐ কাল-পরিমাণগুলির তুলনায় নগণ্যই। কিন্তু যখন একবার সে বৈজ্ঞানিক মনটি বিবর্তিত বা উদ্ভূত হতে লাগল, তখন তার নির্মাণ-পর্বের প্রায় শুরুতেই সমাধানগুলিও একে একে এসে ধরা দিতে লাগল। প্রকৃতির খাশ নাট্যশালার এক একটি দরজা খুলে যেতে লাগল। অস্পষ্ট-ভাবে হলেও সুন্দরের সংগীত ভেসে এল। সত্যের পদধ্বনি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। নিজেকে নিঃসঙ্গ ভেবে অন্ধকারে শায়িত মানবশিশু অনেক ভয় পেয়েছে, অনেক কেঁদেছে। কিন্তু একবারটি সাহস করে বিছানায় হাত বাড়াতেই পেয়ে গেল মা'কে।

সুতরাং ঐ পারদ কুন্তলাদির ব্যাপারগুলি মোটেই আচমকা নয়। কেবল অন্ধের চোখ খুলে যাওয়ার যা অপেক্ষা ছিল, বা অন্ধকারে চকমকি আলোর। কিন্তু বিজ্ঞান-দীপ যখন মনের মধ্যে আলো জ্বালিয়ে দিলে তখন সবই একে একে ফুটে উঠল—অণুর ঝাঁপি, পরমাণুর পেটিকা (পেটরা), অয়স্কান্তের করঙ্ক (থালা, ডিবা) আর ইলেকট্রিসিটির কটোরা (বাটি)। একটু হাত বাড়িয়ে ডালাগুলি তুলে ধরতেই সমাধানগুলি উদ্যত হয়ে উঠল। না হয়েই পারে না। আলো জ্বলে গেছে যে! আর ডালাগুলিও তো তুলে ধরা হল। বৈজ্ঞানিক যুক্তিই সেই আলো, আর তার পরীক্ষা পুনঃপরীক্ষা ঐ দ্বিতীয়টি।

বিজ্ঞানী নিউটন সেই আলো দিয়েই আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। হকৃস্‌বী ইলেকট্রিসিটিকে আলোর কারণ মনে করেছিলেন। কিন্তু নিউটনই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগ করে আলোক রশ্মির মর্ম উদ্ঘাটন করে দিয়েছেন। আলোকের স্বরূপ কি, এবং তার রীতিনীতিই বা কি প্রকার, এ সম্বন্ধে তিনি

নানাবিধ পরীক্ষার দ্বারা বিজ্ঞানীকুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আলোকরশ্মি যে সরল রেখা ধরে চলে, এ সম্বন্ধে তিনি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ দেন। আজ আমরা অবশ্য এ ঘটনার বহুবিধ প্রমাণ জানি। একটি দৃষ্টান্তও দেওয়া যেতে পারে।
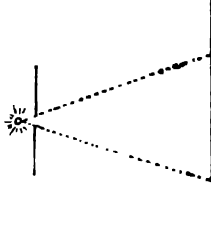
ধরা যাক কোন বাক্সের একদিকে একটি ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রের ঠিক পিছনে একটি দীপ রেখে ঐ ছিদ্রপথ দিয়েই আলোরশ্মি নির্গত হতে দেওয়া হল। তারপর ঐ রশ্মিপথে একটি পর্দা খাটিয়ে দেওয়া হল। পর্দায় রশ্মি বরাবর একটি গর্ত আছে, তার সীমাটি সরলরৈখিক, অর্থাৎ সরলরেখা দিয়ে গঠিত। দেখা যাবে যে ঐ গর্তটির ঐরূপ সীমাযুক্ত আকৃতির একটি আলো অদূরবর্তী দেয়ালের কালো তলে গিয়ে পড়েছে। এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে আলোরশ্মি সরলরেখায় চলে। না হলে পর্দা পেরিয়ে যাওয়ার পর তো সে বেঁকে গিয়ে দেয়ালের ওপরে গর্তের ভঙ্গিটিকে বিভিন্ন দিকে বাড়িয়ে বা বাঁকিয়ে দিতে পারত। কিন্তু কেমন করে আলোরশ্মির পক্ষে ঐ রকম সরলরেখা ধরে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব? স্বাভাবিক-ভাবেই মনে আসে যে, রশ্মিদেহটি সম্ভবত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা দিয়ে গঠিত এবং তারাই বিদ্যুৎগতিতে সরলরেখা ধরে ছুটে চলায় এরকমটি ঘটে উঠে।

আবার দেখা যায় যে, বায়ুর মধ্য দিয়ে যেতে যেতে যদি কোনো রশ্মি তার সামনে কাচ বা জলের মত কোনো স্বচ্ছ মাধ্যম পায়, তাহলে সে দ্বিতীয় মাধ্যমের
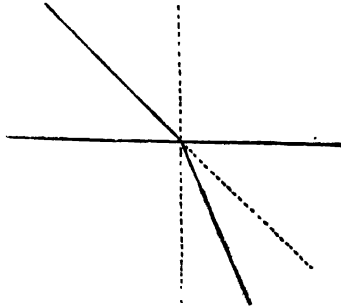
মধ্যে প্রবেশ করেও সরলরেখা ধরে এগিয়ে চলে। কিন্তু দেখা যায় যে, দ্বিতীয়

মাধ্যমে প্রবেশ করে কোনো রশ্মি সোজা পথ ধরে চললেও, সে তার পূর্ব অভিমুখ থেকে অন্যদিকে একটু সরে যায়। সেইজন্য এই ঘটনাকে আলোর প্রতিসরণ (refraction) বলা হয়। একটি লাঠির কিছু অংশ জলের মধ্যে একটু বাঁকা-ভাবে ডুবিয়ে ধরলেও ব্যাপারটি সহজে বুঝতে পারা যায়। কিন্তু রশ্মির ওরকম সরে যাওয়ার কারণ কি? রশ্মিকে কণিকা সমষ্টি ধরে নিলে এরও সংগত ব্যাখ্যা মিলে যায়। রশ্মি-কণিকা দ্বিতীয় মাধ্যমের তলে যেখান দিয়ে ঢুকতে চায়, সেখানকার মাধ্যম-বস্তুর কণিকার সঙ্গে তার সংঘর্ষ বাধে। ফলে রশ্মি-কণিকার বেগ কমে যায়, এবং তাকে একদিকে একটু সরতে হয়। মাধ্যমের উপর রশ্মির আপতন বিন্দুতে যদি লম্ব তোলা যায় তাহলে ঐ কণিকাগুলি হয় ঐ লম্ব বা অভিলম্বের দিকে আকৃষ্ট হয়ে (ঘনতর মাধ্যমে প্রবেশের ক্ষেত্রে) সেই দিক ঘেঁষে চলে, না হয় বিকৃষ্ট হয়ে (লঘুতর মাধ্যমে প্রবেশ করলে) লম্ব থেকে একটু দূরে সরে যায়।

এসব দেখেই বিজ্ঞানী নিউটন এক সাহসিক সিদ্ধান্ত করলেন যে, আলোক-রশ্মি কণিকা দিয়ে গঠিত। কেবল তাই না, তাকে কণিকাদেহ মনে করেই তিনি সর্বপ্রথম আলোর বিভিন্ন রঙের একটি অপূর্ব এবং সন্তোষজনক ব্যাখ্যাও উপস্থাপিত করলেন। তিনিই সর্বপ্রথম জানিয়ে দেন যে, পৃথিবীপৃষ্ঠে আপতিত সূর্যরশ্মিকে সাদা মনে হলেও সেটি মোটেই সাদাসিধে বস্তু নয়। তার মধ্যে রামধনুর সাতটি রঙই আত্মগোপন করে থাকে। তিনি বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা এ তত্ত্বকে প্রমাণ করলেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে একটি চাকতির উপর আড়াআড়িভাবে পর পর সাতটি রঙের ডুরে কেটে চাকতিটিকে খুব জোরে ঘোরাতে থাকলে ঘূর্ণ্যমান চাকতিটির বর্ণকে সাদাই দেখা যায়।

সূর্যরশ্মির সাতটি বর্ণকে বিশ্লিষ্ট করেও তিনি এ তত্ত্বের সুনিশ্চিত প্রমাণ দেন। একটি প্রিজ্‌ম্‌ অর্থাৎ তিন-পীঠ-ওয়ালা কাচের ওপর সূর্যরশ্মির একটি সংকীর্ণ ধারাকে ফেলে তিনি দেখিয়ে দিলেন যে, সে কাচের অন্য দিক দিয়ে ঐ রশ্মি বিনির্গত হওয়ার সময় সে প্রতিসরিত হয়ে সাতটি রঙে ভেঙে যায়। প্রতিসরণ-কালে দেখা যায় যে লাল রশ্মিই পূর্ববর্ণিত অভিলম্বের খুব কাছ ঘেঁষে চলতে থাকে। আর বেগনি রঙের রশ্মি-কণিকার তেজই বুঝি সর্বাধিক; তাই তাদের সঙ্গে কাচ-কণিকার সংঘর্ষ সর্বাধিক হওয়ায় পূর্বোক্ত লম্ব-পথটি আর তাদেরকে খুব কাছে টেনে রাখতে পারে না। তারা দূরে দূরে চলে যায়। অর্থাৎ রশ্মিরা কণিকাধর্মী বলেই তাদের সঙ্গে কাচ-কণিকার সংঘর্ষের ফলে তারা তাদের আপন আপন তেজমর্যাদা বা বিক্রম অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে চলতে থাকে।

সাদা রঙ্ হয়ে থাকার সময় তাদের যে কপট বন্ধুত্ব, তা তখনই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। কাচের প্রিজ্‌ম্ যেন তখন সাদা রশ্মিকে ভেঙে দিয়ে তাদের ভিন্ন ভিন্ন
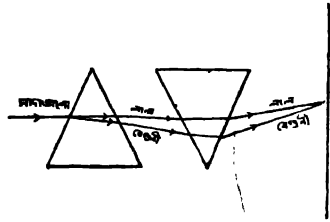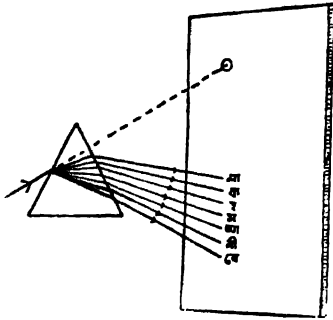
রঙ্‌কে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তবে প্রিজ্‌ম্ ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়ার পথে আর একটি প্রিজ্‌ম্‌কে যদি ঠিক মত (অর্থাৎ পূর্ববর্তী প্রিজ্‌মের বিপরীত ভঙ্গিতে) বসিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তাকে ভেদ করে যাওয়ার সময় আবার ঐ রশ্মিগুলি সব একজোট হয়ে সাদা রঙ্ ধরেই এগিয়ে চলে। আকাশে যে সাতরঙা রামধনু দেখা যায়, তারও কারণ, সাময়িকভাবে জলকণা জমা হয়ে ওখানেও একটি বিরাটাকার প্রিজ্‌ম্ গড়ে উঠে এবং সেই প্রিজ্‌ম্‌ই সূর্যকিরণকে ভেঙে তার বর্ণ ক'টিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সেই বিচ্ছিন্ন বর্ণমালার পাশাপাশি ঐরূপ সংস্থানের নাম বর্ণালি (spectrum)। নিউটন পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করে দেখান যে, সাদা রঙের রশ্মি থেকেই বর্ণালি, এবং বর্ণালি থেকেই আবার সাদা রঙ্ ফিরে পাওয়া যায়। এভাবে একই রশ্মিকে ইচ্ছামত বার বার ভেঙে তার দীর্ঘ পথে বহুবার রঙ্-বাহার সৃষ্টি করা চলে। কিন্তু আলোক-রশ্মির দেহ যে কণিকা দিয়ে গঠিত, এসব থেকে তার একটি মোটামুটি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ মিলে গেল।

সমসাময়িক কালের বিজ্ঞানী হাইজেন্‌স্ (Christian Huygens—1629-'95) কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহযুক্ত হলেন। কারণ, রশ্মিকে কণিকাসমষ্টি ধরে নিলে যত রকম অবিমিশ্র রঙ্ পাওয়া যাবে, তত রকমেরই রশ্মি-কণিকার কল্পনা করে নিতে হয়; কিংবা সাদা রঙের রশ্মির মধ্যে সর্বপ্রকার তেজবিশিষ্ট রশ্মি-কণিকার গতিবেগকে একই ধরে নিতে হয়। তিনি অনুমান করলেন যে, আলোদেহটি বস্তু-কণিকা দিয়ে গঠিত নয়, সে তেজ-তরঙ্গ। যে কোনো তরঙ্গের জন্য অবশ্যই কোনো বস্তুগত মাধ্যম চাই। হাইজেন্‌স্ কল্পনা করে নিলেন যে, সে মাধ্যম হচ্ছে ভারহীন সর্বব্যাপ্ত ইথার। যদিও আমরা জানি (পৃ. ১৫) যে ঐ ইথারও একটি কল্পিত

বস্তু মাত্র, এবং তার উপাদান বা গড়ন প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায়নি, তবুও তিনি মনে করলেন যে বহু বর্ণের বহু প্রকার রশ্মি-পদার্থের কল্পনার চাইতে এক রকমের ইথার পদার্থের কল্পনাই শ্রেয়। তরঙ্গবাদ সম্পর্কে তাঁর যুক্তিধারাকে এভাবে বলা যায় যে, আলো-তেজ ইথারের উপর দিয়ে ঢেউ তুলে আসে। এক এক রকমের আলোর এক এক রকমের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (দুটি তরঙ্গ-চূড়ার বা দুটি তরঙ্গ-খাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব)। সব আলো বা সর্বপ্রকার তরঙ্গের গতিবেগ সমান। কিন্তু ইথার থেকে অন্য মাধ্যমে এসে পড়লে তাদের সে বেগ ভিন্ন হয়ে যায়। সব রঙের আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য একত্রে মিলিত হয়ে সাদা রঙের সৃষ্টি করে। অথচ বর্ণালিতে তাদেরই বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আবার পৃথক হয়ে ধরা পড়ে। পর্দার গর্ত দিয়ে সিধে বেরিয়ে গিয়ে আলোরশ্মি যে দেয়ালের উপর পড়ে গর্তের সীমা-রেখার অনুরূপ সুস্পষ্ট সীমারেখা অঙ্কন করে দেয় বলে মনে হয়, তা আমাদের দেখার ভুল। দেয়ালের ঐ সীমারেখা নিশ্চয় অঁাকাবাঁকা। কারণ তরঙ্গ বা বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ কখনও সরলরৈখিক সীমা এঁকে দিতে পারে না। তবে রশ্মিদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য এত ক্ষুদ্র যে, সীমারেখার অঁাকাবাঁকা ভাবটিও অতি নগণ্য হয়ে উঠে। সে ভঙ্গিটি খালি চোখে দেখা তো দূরের কথা, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও তাকে দেখা যায় না। কত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু-কণিকা বা এমনকি কীট-পতঙ্গও তো আছে,—সব কি তারা চোখে বা যন্ত্রে ধরা পড়ে নাকি? আর প্রতিসরণের সময় তো আলোরশ্মি দিক পরিবর্তন করবেই। যত ছোট হ'ক না কেন, তরঙ্গমুখের একটি বিস্তার আছে। ইথার দিয়ে এসে নতুন মাধ্যমের তল ভেদ করার মুহূর্তে সেই বিস্তৃত আয়তনের যে ভাগটি প্রথমে তলের সঙ্গে ধাক্কা
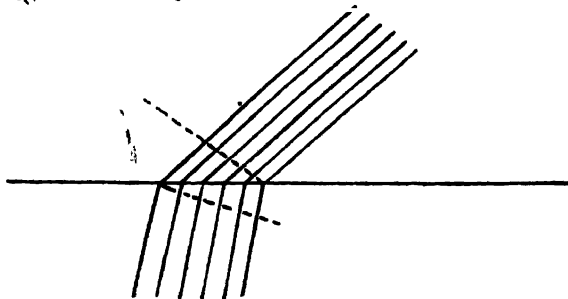
খায়, সে ভাগটি দ্বিতীয় মাধ্যমে চলবার উপযোগী স্তিমিত (হ্রাসপ্রাপ্ত) বেগ প্রাপ্ত হয়ে উঠে। অথচ দূরবর্তী অন্য অংশটিতে তখনও ইথারে চলবার ক্ষিপ্রতর বেগটি থেকে যায়। তার ফলে সামগ্রিকভাবে ধাক্কা-খাওয়া রশ্মিপথের দিকটিই পরিবর্তিত হয়ে যায়।

সমসাময়িক কালেই রবার্ট হুক (Robert Hooke—1635-1703) লক্ষ্য করলেন যে, কোনো আলোরশ্মির সামনে একটি অস্বচ্ছ পদার্থ থাকলে তার যে ছায়া পড়ে, সেই ছায়াময় অংশটিতেও কিছু আলোকপ্রভা দেখতে পাওয়া যায়। এ থেকে তিনি ধরে নেন যে, বাতাসের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আলোরশ্মি সম্ভবত সর্বদা সরলরেখা ধরে চলে না। কিন্তু এই বিষয়ে গ্রিমাল্‌ডি (Francesco Maria Grimaldi—1618-'63) বিশেষ অনুধাবন করলেন। ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া রশ্মির পথে প্রথমে একটি দণ্ডের প্রান্ত ভাগের একাংশ এবং তারপর একটি ছিদ্রযুক্ত পাত্র ধারণ করে তিনি দেখতে পান যে, আলোরশ্মি সরলরেখা ধরে চললে দণ্ডের ছায়া বা ঐ পাত্রের ছিদ্রের আলো যতবড় হওয়ার কথা তার চাইতে বড় হয়েছে। আলো উজ্জ্বল হলে দণ্ডের ছায়াতে কয়েকটি রঙিন ডুরেও দেখা যায়। তিনি এ রকম আলো-আঁধারি রেখায় বিশ্লেষণের নাম দিলেন 'অপবর্তন' (diffraction)।

এসব থেকে আলোকের তরঙ্গ-ভঙ্গি সম্বন্ধেও মতবাদ জোরালো হতে থাকে। কিন্তু কণিকাবাদ ও তরঙ্গবাদ, এ দুটি মতবাদ দিয়েই আলোক-রশ্মির নানা প্রকার রীতি ও গতিবিধির ব্যাখ্যা মিলে যাওয়ায় দুটি মতবাদই গ্রহীতব্য হয়ে উঠে। দীর্ঘকাল পরে উনবিংশ শতাব্দীতে এসে অবশ্য এ সম্বন্ধে আরও নতুন তথ্য সংগৃহীত হতে আরম্ভ করে। কিন্তু ইতিমধ্যে বিদ্যুতের 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে' বিজ্ঞান-'চিত্ত' যেন ঝলমল করে উঠল।

হক্‌স্‌বীর পর গ্রে (Stephen Gray—1666 or '67-1736), যিনি বুঝে ফেললেন ইলেকট্রিসিটি ধারণের ক্ষমতা কোনো বস্তুর রঙ্‌ বা ওরকম কোনো গুণের উপর আদৌ নির্ভর করে না। ওটি নির্ভর করে বস্তুর গঠনের ওপরই। যে জন্য ধাতব-তার ইলেক্ট্রিসিটি বহন করতে পারে, কিন্তু স্বীয় চাকচিক্য সত্ত্বেও পশম তা পারে না। ১৭২৯ খ্রী.-এ তিনি প্রমাণ দিলেন যে ধাতুরা ইলেক্ট্রিসিটির উৎস থেকে তাকে পরিবহণ করে অন্যত্র টেনে আনতে পারে। ১৭৩০-এ তিনি একটি ছোকরাকে রেশমী দড়িতে ঝুলিয়ে দিয়ে সত্যি সত্যিই দেখিয়ে দিলেন যে ইলেক্ট্রিসিটি টেনে এনে মানবদেহকেও ইলেক্ট্রিসিটি যুক্ত করা যায়। কিন্তু পরে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, পরিবাহক ধাতুকে রজন (resin)-খণ্ডের উপর স্থাপন করলে ধাতুটি অন্তরিত হয়ে যায়। অর্থাৎ তখন ঐ ইলেক্ট্রিসিটি ধাতুর মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়ে এলেও, সে আর রজনের দেহকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পারে না। এভাবে ইলেক্ট্রিসিটিকে এক জায়গায় ধরে রাখবার অদ্ভুত কৌশল আবিষ্কৃত হল। রজনের মত অন্তরক (যা দুটি বস্তুর মধ্যে বা অন্তরে থেকে তাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি

করে) পদার্থ ভেদ করে স্থির বা স্থৈতিক ইলেক্ট্রিসিটি যখন অন্যত্র ছুটে পালাতে পারবে না, তখন ইলেক্ট্রিসিটির আধার গাত্রে অন্তরক পদার্থের হাতল বা অন্য কিছু লাগিয়ে দিলে সেই হাতল ধরেই আধারের ইলেক্ট্রিসিটি নিয়ে রীতিমত নাড়াচাড়া চলবে। অথচ তাতে মানুষের হাত বেয়ে তা অন্য কোথাও পালাতে পারবে না, বা হাতে ধাক্কা মেরে হাতকেও তা জখম করে দিতে পারবে না। আবার আধারের গায়ে ধাতু বা ধাতব তার ঠেকিয়ে তাকে মুহূর্তের মধ্যেই অন্য আধারেও সহজেই চালান করে দেওয়া যাবে।

পিকার্ডের আবিষ্কার ফ্রান্স থেকে ইংল্যাণ্ডে এসে নতুন নতুন আবিষ্কার ঘটিয়ে তুলে। এবার কিন্তু ইংল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্স। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী গ্রে-র আবিষ্কার থেকে ফরাসী বিজ্ঞানী দু ফে (Charles Francois Cısternay du Fay—1698-1739) সিদ্ধান্ত করে বসলেন যে, যুগ যুগ ধরে যে-শক্তিকে কেবল মাত্র অম্বর স্ফটিকের বলেই মনে করা হত, আর গিলবার্ট যাকে মনে করেছিলেন কেবল ইলেক্ট্রিক বস্তুর, আসলে তা কিন্তু মোটেই কারও একার বা একটি দল বিশেষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। প্রত্যেক বস্তুই সে শক্তির অধিকারী—যেমন আলো-জল-হাওয়ার অধিকারী সকলেই। দু ফে দেখলেন শিখারও সে শক্তি আছে। একদিন তিনি গ্রে-র পরীক্ষা মত নিজেই একটি রেশমী দড়িতে ঝুলে পড়লেন, আর নিজেকে ইলেক্ট্রিসিটিযুক্ত করলেন। তারপর ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক অ্যাবি নোলে (Abbé Jean-Antoine Nollet—1700-'70) যখন তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন, খুবই কাছে, তখন তাঁর শরীর থেকে এক রকমের অসংখ্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কণ্টকাঙ্কুর নির্গত হয়ে চিড়বিড় করতে করতে নোলের দেহে গিয়ে প্রবেশ করল। অন্ধকারে তাদের আবার কী দ্যুতি! আর ঐ দুটি মানুষের সে কী অদ্ভুত শিহরণ!

দু ফে কিন্তু ইলেক্ট্রিক শক্তিকে সার্বজনীন করে তুললেও তিনি ঐ শক্তির দুটি ভিন্নরূপ প্রত্যক্ষ করলেন, এবং তাদের শ্রেণীভেদও করে দিলেন। এক জাতীয় শক্তি কাচ জাতীয়, আর অন্যটি রজন জাতীয়। এদের একে অন্যকে আকর্ষণ করে। অথচ সম জাতীয় হলে তারা পরস্পরকে দূরে ঠেলে দেয়। কিন্তু শুধু এইটুকু লক্ষ্য করেই তো এভাবে আদিম মানুষের মত নিরপেক্ষ দর্শক হয়ে থাকা যায় না। যে মনের কাছে প্রকৃতির মহৈশ্বর্য একে একে ধরা দিতে বাধ্য হচ্ছে, সে মনের প্রকৃতি তো এ নয়—কেবল স্তম্ভিত বা স্তব্ধ অভিনেতার ভূমিকা করে যাওয়া! অনুসন্ধানী হয়েছে বলেই তো তার কাছে গুপ্তধন ভাণ্ডারের দরজা খুলে গেছে! সে অনুসন্ধানী বিজ্ঞানী মনই তাই এগিয়ে এসে সমাধান খুঁজতে চাইল। ঐ আকর্ষণ ও বিকর্ষণের কারণ স্বরূপ দু ফে তাই সিদ্ধান্ত করলেন যে দু-রকমের তরল-

গ্যাস (fluid) থেকেই এ-রকমটি ঘটে। ঘর্ষণের ফলে তারা দুটি বস্তুর দেহে বিশ্লিষ্ট হয়ে বিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু তাদের মিলন ঘটলে তারা আবার নিরপেক্ষ রূপ ধারণ করে। -ইলেক্ট্রিসিটি বা তৎসংক্রান্ত বহু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছিল হয়ত কিছু আগে। কিন্তু বিজ্ঞানী-মনের বৈশিষ্ট্যই এখানে যে, ঘটনা বা তথ্য দর্শনের সাথে সাথেই সে তার অন্তর্নিহিত কারণ বা তথ্য-দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। তাই তার পরীক্ষা আর পুনঃপরীক্ষা চলতে থাকে। এভাবেই শেষে তার ঘটনাগত তথ্যের প্রকৃত-তত্ত্ব বা সত্যের দর্শন লাভ ঘটে।

কিন্তু সত্য বা তত্ত্ব যখন ঘটনাগত, তখন তা বস্তুগত বলেই মা সত্যদ্রষ্টা বিজ্ঞানীকেও ইলেক্ট্রিক-তরল বস্তুটির কল্পনা করে নিতে হল! বাস্তবিকই, বস্তু ছাড়া বিজ্ঞানীর কোনো উপায় নাই বলে ফ্লোজিস্টন বা ইলেক্ট্রিসিটির মত কোনো বস্তু এবং তার প্রকৃতি সম্বন্ধে কল্পনা ছাড়া তাঁদের গত্যন্তরও নাই। বস্তু আর তার প্রকৃতিই বিজ্ঞানী মনের প্রথম অবলম্বন, পরম নির্ভর এবং চরম আশ্রয়। এছাড়া কে তাঁর সামনে আলো এনে ধরবে? চিন্তার আশ্রয় হবে কে? আর চিন্তাহীন জীব তো জড়েরই তুল্য। শুধু বৈজ্ঞানিক কেন, সমগ্র মানব জাতিরও গতি-মুক্তি ঐখানে। তাই জীব-জগতের সেই কোন্ আদি সৃষ্টি থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর যাবৎ বস্তুধারা আর তার প্রকৃতি তাকে ক্রমাগত পথ দেখাতে দেখাতে এগিয়ে নিয়ে এসেছে আদিম অজ্ঞতার আঁধার গুহা থেকে ভ্রান্তির বনান্তরালে, প্রমাদের অরণ্য থেকে আভাসিত সত্যের ধূপছায়ায়। পদার্থ-প্রবাহের মধ্য দিয়ে জীবসত্তার উদ্বোধন ঘটল। আর জান্তব জগৎ থেকে মানবসত্তাটি উদ্ভূত হয়ে ক্রমবিবর্তনের ফলে যুক্তিবুদ্ধির জগতে নূতন প্রক্রিয়া রূপে পদোন্নতি লাভ করল। সুতরাং সেই মানুষ কী করে ঐ সর্বশক্তিমান বস্তু বা পদার্থ-প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, বা তার চিন্তাকে মুহূর্তের জন্যও সেখান থেকে সরিয়ে নিতে পারে? পদার্থ বা বস্তুর বিবর্তনে জীবদেহের উদ্বর্তন, জীবদেহের বিবর্তনে মন বা চিন্তাশক্তির উদ্ভব, আর চিন্তাবুদ্ধির বিবর্তনে যুক্তি বা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির ক্রমবিকাশ। জড়বস্তু আর জীবদেহ, এবং দেহোদ্ভূত মস্তিষ্কবস্তু প্রসূত চিন্তা আর যুক্তি—এরা তো সব বস্তুবিবর্তনেরই ক্রমানুসারী সোপান মাত্র। সুতরাং সমাজ-বিবর্তন ধারার অগ্রনায়ক সত্যসন্ধানী বিজ্ঞানী এটুকু বুঝতে পারেন যে, বস্তু-কল্পনা পরিত্যাগ করে শূন্য মার্গে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই তাঁর সামনে অনন্ত অন্ধকার এসে পথ আগলে বসবে। তাইতো তিনি বস্তু-কল্পনা পরিত্যাগের কথা মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারেন না। ভাবনা মানেই তো বস্তু-ভাবনা, আর ভাবনাহীনতা মানেই তো পশুত্ব বা জীবত্বহীন জড়ত্ব। তাহলে মানুষ কি আবার সেই পশুত্ব বা জড়ত্বের গুহাতে ফিরে যাবে তার বিপুল-

কালের সাধনা-সমুদ্ভূত চেতনার সমুজ্জল দীপশিখাটি নিভিয়ে দিয়ে? কিন্তু তা অসম্ভব। তাই অসম্ভব বা অলৌকিক কোনো কিছুর কল্পনাকে দাবিয়ে দিয়ে তাকে ঐ ঘটনা-সত্যের অন্তরালে বাস্তব কোনো সত্যকে কল্পনা করে নিতেই হয়, মানুষের চোখকে তা যতই ফাঁকি দিক না কেন। তাই বিজ্ঞানীর এমন ইলেক্ট্রিসিটি-তরলের কল্পনা!

কিন্তু তাহলে আমাদের সেই মূল প্রশ্নটি আবার এগিয়ে আসে। ইলেক্ট্রিসিটিও কি তাহলে পরমাণুর সমষ্টি মাত্র, কোনো নূতন উপাদান? তাহলে মেন্দেলিয়েভের ছকের মধ্যেও তার স্থান হবে কোথাও, কোনও অনাবিষ্কৃত উপাদানের জন্যে যেসব জায়গা খালি পড়ে আছে তাদের মধ্যে কোথাও? না কি পরমাণু-সত্তা ব্যতিরেকে এ এক অন্য পার্থিব উপাদান? কিন্তু মেন্দেলিয়েভ-ছকের আবিষ্কারের শতাধিক বর্ষ পূর্বে এ ধরনের ভাবনার কোনো কারণ ছিল না। তখন সবেমাত্র বৈজ্ঞানিক চিন্তার উষাকাল; ঘটনার কারণ নির্ধারণের প্রচেষ্টা জাগ্রত হলেও, সে সম্বন্ধে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত সর্বক্ষেত্রেই নির্ভুল হতে পারেনি। সমসাময়িক কালের ফ্লোজিস্টনবাদের মত যুগ্ম-তরলের তত্ত্বও অভ্রান্ত ছিল না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ফ্লোজিস্টনবাদ যেমন পূর্ববর্তী বৈজ্ঞানিক মতবাদকে উৎপাটিত করতে পেরেছিল, ইলেক্ট্রিসিটি সম্বন্ধে যুগ্ম-তরলের তত্ত্বও তেমনি নূতন পথ প্রদর্শনের সহায়ক ছিল। তখনও এ-সম্বন্ধে নিশ্চিত তত্ত্বের সন্ধান পেতে বিলম্ব ছিল। বিজ্ঞানীরা বেশি ঝুঁকেছিলেন ইলেক্ট্রিসিটি তৈরি করার দিকে, অর্থাৎ পূর্বেকার সেই ঘর্ষণ-যন্ত্রটিকে (পৃ. ৭৯) আরও জোরাল এবং সুসম্পূর্ণ করার দিকে। তাঁরা কিছুটা সফলও হয়েছিলেন। তার ফলে ১৭৪৫ খ্রী.-এর দিকে ইলেক্ট্রিসিটির পরীক্ষাগুলি দেখাবার জন্য হল্যাণ্ড আর জার্মানীতে রীতিমত প্রদর্শনীর মেলাও চলছিল। ঐ বছরেই পরীক্ষা প্রদর্শনকারীদের একজন ভন ক্লিস্ট্ (Ewald Georg von Kleist—?-1748) একটি ইলেক্ট্রিসিটি-পরিবাহকের সাহায্যে একটি বোতলকে ইলেক্ট্রিসিটি দিয়ে আহিত (ইলেক্ট্রিসিটি-সঞ্চারিত) করতে চেয়েছিলেন। বোতলের মধ্যে একটি লোহার পেরেক ছিল। একটি পরিবাহকের সাহায্যে তিনি সেটিকে ইলেক্ট্রিসিটি প্রস্তুতের যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করে আহিত করার পর (অর্থাৎ উৎস থেকে ইলেক্ট্রিসিটি টেনে এনে ইলেক্ট্রিসিটির বলাধান বা আধান যুক্ত করার পর) যেই সেটিকে হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন, অমনি তিনি হস্ত মারফতে সর্বাঙ্গে একটি প্রচণ্ড ধাক্কা অনুভব করলেন। তাঁর বাহু আর কাঁধ যেন নিমেষের মধ্যে স্তম্ভত্ব প্রাপ্ত হল। পরের বছরেই ১৭৪৬ খ্রী.-এ হল্যাণ্ডের লিডেনে খ্যাতনামা পদার্থবিদ্ মাসেনব্রোয়েকও (Pieter van Musschenbroek —1692-1761) পুনরায় ঐ জিনিস আবিষ্কার করলেন। তিনি কিন্তু যন্ত্র থেকে

ইলেক্ট্রিসিটি টেনে এনে তাকে স্থিতিবান করে ইলেক্ট্রিসিটির আধান (বল পরিমাণ) দ্বারা আহিত করেছিলেন বোতলের জলকে। বোতলের সঙ্গে পরিবাহী তার যুক্ত ছিল। সেই তার ইলেক্ট্রিসিটিকে বহন করে অন্যত্র পৌঁছে দিতে পারে। মাসেনব্রোয়েকের বন্ধু যখন তারপর বোতলটিকে এক হাতে ধরে আর এক হাত দিয়ে যন্ত্র ও বোতলের ঐ সংযোজক পরিবাহী তারটিকে বিচ্ছিন্ন করতে গেলেন তখন তিনিও হাতে আর বুকে প্রচণ্ড ধাক্কা পেলেন। তারপর মাসেনব্রোয়েকের নিজের পালা। পালা সাঙ্গ হলে তিনি বন্ধু রোমারকে (Rene´ Antoine Ferchault Re´aumur—1683-1757) লিখলেন যে সমগ্র ফরাসী রাজত্বের বিনিময়েও তিনি দ্বিতীয়বার ঐ ধাক্কা পরখ করতে পারবেন না। লিডেনেই ঐ পরীক্ষা হয়েছিল বলে ঐ ইলেক্ট্রিসিটি ধরবার যন্ত্রটি লিডেনের জার নামে অভিহিত হয়ে রইল। কিন্তু লিডেন-জারের আবিষ্কার পরবর্তী বহু পরীক্ষার পথকে প্রশস্ত করে দিল। মাসেনব্রোয়েকের এমন কঠোর অভিজ্ঞতাও সে পথকে রুদ্ধ করতে পারেনি। বিজ্ঞানের ইতিহাস সত্যসন্ধানের অভিমুখে দুঃসাহসিক অভিযানের মহিমময় ইতিহাস। বৈজ্ঞানিক নোলে নিজের দেহে ঐ ধাক্কা পরখ করলেন। তারপরে তিনি স্বয়ং রাজার সামনেও ঐ পরীক্ষা দেখিয়ে দিলেন। তাঁর ১৮০ জন প্রহরীর মধ্য দিয়ে ইলেক্ট্রিসিটি পাঠান হল। আরও উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা হল লিডেন-জার নিয়ে। এবার নিয়ে আসা হল কার্থিউসীয় সন্ন্যাসীদের। ন' শ' ফুট লম্বা লাইন করে সারিবন্দিভাবে তাঁরা দাঁড়িয়ে গেলেন। এক একটি লোহার তার দিয়ে তাঁরা প্রত্যেকে তাঁদের দুপাশের দণ্ডায়মান ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত হলেন। তারপর যে মুহূর্তে লিডেন-জারের সঙ্গে তাঁদের একজনকে সংযুক্ত করা হল, অমনি ধাক্কা খেয়ে ঝাঁকিয়ে উঠলেন গুরুগম্ভীর ঐ গোটা সাধুবাবার দলটি। কী মজাই না হয়ে উঠেছিল ওই ব্যাপার! ক্রমে ক্রমে লিডেন-জার নিয়ে পশুপক্ষী সাবড়ান চলল। সর্বত্রই লিডেন জারের মাহাত্ম্য কথা ছড়িয়ে পড়ল।

সমুদ্র ডিঙিয়ে আমেরিকাতেও সংবাদ পৌঁছল। এ নিয়ে গবেষণা করতে করতে ১৭৪৭ খ্রী. নাগাত ফিলাডেলফিয়ার ফ্রাঙ্কলিন (Benjamin Franklin—1706-'90) আবিষ্কার করলেন যে, খুব ছুঁচল ও তীক্ষ্ণাগ্র বস্তুগুলি যেমনভাবে ইলেক্ট্রিসিটি গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে, তেমন আর অন্য কিছুতে পারে না। তিনি আরও সিদ্ধান্ত করলেন, বস্তুমাত্রেই ইলেক্ট্রিক-অনল যুক্ত। সুতরাং যার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে যতটুকু থাকা দরকার তার বেশি থাকলেই তাকে বাড়তি বা পজিটিভ (ধন) ইলেক্ট্রিসিটি, আর তার কম থাকলেই তাকে ঘাটতি বা নেগেটিভ (ঋণ) ইলেক্ট্রিসিটি বলা সংগত। এরূপে তিনি খুব সংগতভাবেই দু ফে-র যুগ্ম-তরলের

তত্ত্বের স্থলে একক তরলের তত্ত্ব ঘোষণা করলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত থেকেই হাঁ-ধর্মী (পজিটিভ, বা ধন, বা পূরক, অর্থাৎ বাড়তি) ও না-ধর্মী (নেগেটিভ, বা ঋণ, বা পূরণীয়, অর্থাৎ ঘাটতি) ইলেক্ট্রিসিটির তত্ত্ব প্রচলিত হল। কিন্তু ফ্রাঙ্ক্‌লিন একটি বিষয়ের দিকে খুব বেশি জোর দিলেন। ইলেক্ট্রিসিটির দ্যুতি প্রভৃতি গুণ দেখে ঐ সময়ে গ্রে, ওয়াল (Wall), নোলে এবং উইঙ্কলার (J. H. Winkler) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছিলেন যে তার ধর্ম বিদ্যুৎ-ধর্মেরই সদৃশ। গ্যাসের বিস্ফোরণের ফলেই যে বজ্র বা বিদ্যুতের উদ্ভব ঘটে, এ-রকম বা অনুরূপ কতকগুলি ধারণা তখন প্রচলিত ছিল। কিন্তু ১৭৪৯ খ্রী.-এ ফ্রাঙ্ক্‌লিন এবং তাঁর বন্ধু কিনার্স্‌লি (E Kinnersley) এ সম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্ব ও পরিকল্পনা খাড়া করে তুললেন। বছরের শেষ দিকে ফ্রাঙ্ক্‌লিন তাঁর নোট বইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে ইলেক্ট্রিসিটি আর বিদ্যুতের সাদৃশ্য লিপিবদ্ধ করলেন :

(১) দ্যুতি, (২) বর্ণ, (৩) বঙ্কিম গতি, (৪) ক্ষিপ্রগতি, (৫) ধাতুর দ্বারা পরিবহণ যোগ্যতা, (৬) বিস্ফোরণের শব্দ, (৭) জল বা বরফে অবস্থান, (৮) বিদারণযোগ্যতা, (৯) জীবহনন ক্ষমতা, (১০) দাহ্য পদার্থকে দহনশীল করা, (১১) ধাতুগলন শক্তি, (১২) গন্ধকীয় গন্ধ।

উভয়ের মধ্যে এত সাদৃশ্য! সুতরাং আকাশের বিদ্যুৎকে কোনও তীক্ষ্ণাগ্র বস্তুর সাহায্যে মাটিতে নামিয়ে আনা যায় না? তরল-পাবক ইলেক্ট্রিসিটিকে তো টেনে এনে লিডেন-জারে ধরে রাখা যায়! ফ্রাঙ্কলিন এক পরিকল্পনা ফেঁদে বসলেন।

দুর্গচূড়ায় একটি পেল্লাই বড় বাক্স বানিয়ে রাখতে হবে, বা কোনো উঁচু গির্জার মাথায়, বা আর কোনো উঁচু জায়গায়। তার মধ্যে একটি ইলেক্ট্রিক স্ট্যাণ্ডের (দাঁড়াবার জায়গা) উপর একজন সান্ত্রীর (সৈনিক প্রহরীর) দাঁড়িয়ে থাকার জায়গা থাকবে। স্ট্যাণ্ড্‌টি থাকবে বেশ পরিষ্কার, আর শুকনো খট্‌খটে। স্ট্যাণ্ডের তলা থেকে একটি লৌহদণ্ড বেরিয়ে গিয়ে দরজার সামনে বাঁক নিয়ে অন্তত বিশ ত্রিশ ফুট উপরে আকাশ পানে উঠে যাবে। তার মাথাটিকে হতে হবে কিন্তু খুব তীক্ষ্ণ। ভেসে যাওয়া মেঘেরা যখন তার কাছ দিয়ে উড়ে যাবে, সে তখন ঐ মেঘ থেকে ইলেক্ট্রিক আগুন টেনে এনে সেই সান্ত্রীকে আহিত (ইলেক্ট্রিসিটির বা বিদ্যুতের বল আধান যুক্ত পৃ. ৮৯) করে দেবে, আর তার গা থেকে দ্যুতির চমক ঠিকরে পড়বে।—যদি সত্যিই তা সম্ভব হয়, তাহলে কি এভাবে ঐ তীক্ষ্ণাগ্র দণ্ডের সাহায্যে ঘরবাড়ি গির্জা বা জাহাজকে বজ্রপাতের হাত থেকে বাঁচিয়ে মানব জাতির প্রভূত মঙ্গল সাধন করা যাবে না?—১৭৫০ খ্রী.-এ ফ্রাঙ্ক্‌লিন এসব কথা লণ্ডনের কলিন্‌সন্‌কে (Peter Collinson) লিখে জানালেন এবং রয়্যাল সোসাইটির

সামনে প্রস্তাবটি পেশ করা হল। এ পরিকল্পনাকে কল্পনাসর্বস্ব ভেবে সোসাইটি ব্যাপারটিকে ব্যঙ্গের মত মনে করলেন। তাঁরা কেবল তাঁর গবেষণার বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণী ছাড়া আর এসব কিছু প্রকাশ করলেন না। তবে কলিন্‌সন্ কিন্তু দমলেন না। এ সম্পর্কে আরও যেসব চিঠি এসে গিয়েছিল সেগুলি নিয়ে তিনি গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। পর পর পাঁচটি সংস্করণ বেরিয়ে গেল। ক্রমে ইউরোপের প্রায় সব ভাষাতে তার অনুবাদও হয়ে গেল। তাতেও হল না। ল্যাটিন ভাষাতেও গ্রন্থটি অনূদিত হল।

ফিলাডেলফিয়াতে এমন উঁচু জায়গা পাওয়া গেল না, যেখান থেকে পরীক্ষা চালান যেতে পারে। ফ্রাঙ্ক্‌লিন তখন একটি খুব উঁচু স্তম্ভ বা ঐ রকমের কোনো বস্তু নির্মাণ করবার জন্য লটারির সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হলেন। হঠাৎ ফ্রান্স্‌ থেকে সংবাদ পৌঁছল। পরীক্ষাটি সারা হয়ে গিয়েছে। প্যারিসের কাছে মার্লি-লা-ভিলেতে রাজানুকূল্যেই ড্যালিবার্ড (Dalibard) সে পরীক্ষা সম্পন্ন করেছেন। একটি ছোট্ট ঘরে একটি ছোট্ট টেবিলের উপর একটি প্রায় চল্লিশ ফুট দণ্ড রাখা হয়েছিল। তার তলাটি ছিল একটি নন্-ইলেক্‌ট্রিক বা অপরিবাহী পদার্থের দ্বারা অন্তরিত। ড্যালিবার্ড্‌ একজন বৃদ্ধ অশ্বারোহী সৈনিককে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, মেঘের দিকে নজর রাখতে হবে। এদিকে একটি কাচের বোতলের মধ্যে একটি পিতলের তার ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল,—দণ্ড মারফতে আকাশের বিদ্যুৎ নিচে এসে পৌঁছলে ঐ তার দিয়ে তাকে বোতলে টেনে এনে গ্রেপ্তার করা যাবে। কয়েক দিনের সাগ্রহ প্রতীক্ষার পর সত্যিই একদিন উড়ে এল এক বজ্রগর্ভ মেঘ। সেদিনটি ১৭৫২ খ্রী.-এর ১০ই মে। অশ্বারোহী এসে বোতলটি তুলে তার ঐ তারটিকে দণ্ডের গায়ে ঠেকিয়ে দিলে। আর অমনি কড়াৎ কড়াৎ শব্দে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে গেল। তার বিকট গন্ধ, ঠিক যেন গন্ধকের মত। হতভম্ব হয়ে ভীতিবিহ্বল সৈনিক আর্তনাদ করে উঠল। প্রতিবেশীদের চেঁচিয়ে জানাল পুরোহিতকে ডেকে আনতে। অবিলম্বে পুরোহিত এসে গেল ; কিন্তু লোকটার সাহস ছিল বটে ! আবার সে ঐ তার ঠেকিয়ে নিজে একবার ব্যাপারটি পরখ করে ড্যালিবার্ডের কাছে খবর পাঠিয়ে দিলে। ড্যালিবার্ড্‌ এসে নিশ্চিন্ত হলেন যে ফ্রাঙ্ক্‌লিনের অনুমান অভ্রান্ত। এক সপ্তাহ পরে প্যারিসে ডেলর (Delor) প্রায় একশ ফুট দণ্ড দিয়ে পুনঃপরীক্ষা করে দেখলেন। ঘটনাটি সমর্থিত হল।

ফ্রাঙ্ক্‌লিন আশান্বিত হলেন। কিন্তু তাঁর মনে খটকা রয়ে গেল। তাঁর সিদ্ধান্ত কি তাহলে সত্যিই অভ্রান্ত ? আর কোনোভাবে এর পুনঃপরীক্ষা করে দেখা যায় না ? তড়াৎ করে মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল—ঠিক ঐ তড়িতের মতই। ছুটি

কাঠিকে আড়াআড়ি বেঁধে একটি ক্রশ (×) বানিয়ে ফেললেন। তার চারটে প্রান্তের সঙ্গে একটি মস্ত বড় পশমী রুমালের চারটে খুঁট বেঁধে দিয়ে তিনি একটি ঘুড়ি বানিয়ে নিলেন,—আকাশে উড়িয়ে দেবেন মেঘলোকের সংবাদ নিতে। ক্রশের খাড়া কাঠের সঙ্গে খুব তীক্ষ্ণাগ্র একটি তার প্রায় ফুটখানিক উঁচিয়ে বেঁধে দিলেন। সন্দেশবহ (সংবাদ বহনকারী)-রজ্জুটির নিম্ন প্রান্তে, হাতে ধরার জন্য একটি রেশমী সুতা লাগান রইল। আর ঐ রজ্জু এবং সূত্রের সংযোগস্থলে বাঁধা রইল একটি চাবি।—অভিযাত্রী বেরিয়ে পড়লেন। প্রায় নিঃসঙ্গ। কেবল তাঁর নিজের ছেলেটি সঙ্গে যা। বৃষ্টির ছাট থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে পিতাপুত্র একটি গাছের তলায় এসে আশ্রয় নিলেন, আর দিলেন ঘুড়িটিকে উড়িয়ে। বায়ুমণ্ডলের দেশ-দেশান্তর পেরিয়ে মেঘার্থী দূত গিয়ে পৌঁছল মেঘান্তঃপুরে। কিন্তু বড় বিলম্ব হয়ে যায় যে! বার্তা মেলে কই? হতাশ প্রেমিক ভেঙে পড়লেন। কিন্তু একি! সূত্রের আলগা তন্তুগুলি হঠাৎ টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল কেন? অস্থির আবেগে একটি অস্থি-সন্ধি (knuckle) ছুঁইয়ে দিলেন চাবিটায়। আলোর ফুলঝুরি ছড়িয়ে গেল। আবার ছোঁয়ালেন, আবার আলো ঝলমল। লিডেন-জারকে তড়িদাহিত করা হল, তড়িতের ধাক্কাও দেখা গেল। ইলেক্ট্রিসিটি আর বিদ্যুৎ যে এক জিনিস তা সুপ্রমাণিত হয়ে গেল।

ফ্রাঙ্ক্‌লিন এ সম্বন্ধে আরও নানা প্রকার গবেষণা চালিয়ে সিদ্ধান্ত করলেন যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেঘের বিদ্যুৎ ঘাটতি বা ঋণাত্মক, তার প্রকৃতি না-ধর্মী, যদিও হ্যাঁ-ধর্মী বা ধনাত্মক বিদ্যুতের মেঘও আছে। সুতরাং বজ্রপাতের অধিকাংশ ক্ষেত্রে পৃথিবীই মেঘকে আঘাত করতে চায়। মেঘ কিন্তু স্বেচ্ছায় পৃথিবীকে আঘাত করতে আসে না। ফ্রাঙ্ক্‌লিনের পরীক্ষা সর্বত্র প্রযুক্ত হতে লাগল। ফরাসী চিকিৎসাবিজ্ঞানী লেমনিয়ে (Louis Guillaume Lemonnier) দেখলেন যে মেঘনির্মুক্ত হলেও আবহাওয়া সর্বদাই তড়িৎযুক্ত থাকে। বিদ্যুৎ নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে সেন্ট্‌পিটার্স্‌বার্গের বিজ্ঞানী রিচ্‌ম্যানকে (Georg Wilhelm Richmann) ১৭৫৩ খ্রী.-এ প্রাণ হারাতে হল। তাতে তাঁর দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর যে প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থা থেকে তার বিশদ্‌ বিবরণ প্রকাশ করা হয়। রিচ্‌ম্যানের আত্মোৎসর্গ বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরকালের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

১৭৫৪ খ্রী.-এ ফ্রাঙ্ক্‌লিন যখন বজ্রপাতের হাত থেকে ঘরবাড়ীকে রক্ষা করবার জন্য বিদ্যুৎদণ্ড তুলতে চাইলেন, তখন ধর্মতত্ত্ববিদ্‌রা সোরগোল তুললেন : বজ্রবিদ্যুৎ তো ঈশ্বরের ক্রোধ মাত্র, তার উপর মানুষের হস্তক্ষেপ চলবে না। হার্ভার্ড্‌

কলেজের পদার্থতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক উইন্থ প (Jr. John Winthrop—1606-'76) কিন্তু জবাব দিলেন, তাহলে তো ঝড় বৃষ্টি তুষারের হাত থেকে বাঁচার চেষ্টাও নিরর্থক। কিন্তু যে হাত দিয়ে বজ্র-বিদ্যুতের নিবারণ করা হচ্ছে তাও তো ঈশ্বর প্রদত্তই।—জবাবটি মুখের মত হয়েছিল বটে! কিন্তু ফ্রাঙ্ক্লিনের ঐ বিদ্যুৎ-নিরোধ ব্যবস্থার মধ্যেও অনেকদিন যাবৎ ক্রটি থেকে গিয়েছিল। তবে গবেষণার কাজ খুব জোর আরম্ভ হয়ে গেল। ইতিপূর্বে টুর্ম্যালিন (tourmaline) নামক খনিজ পদার্থের আকর্ষণী শক্তির কথা জানা হয়েছিল। গবেষণাতে ধরা পড়েছিল যে, বস্তুটিকে গরম করলেই তবে তার দু'প্রান্তে দুরকমের বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়। কিন্তু ১৭৬৬ খ্রী. এ জানা গেল যে, উত্তাপটি এখানে বড় কথা নয়, দুটি প্রান্তের উত্তাপের পার্থক্যই মূল কথা, এবং ঠাণ্ডা করলে প্রান্তদ্বয়ের বিদ্যুৎ-ধর্মটি কেবল বদলে যায়। ক্রমেই অন্যান্য খনিজ স্ফটিকের মধ্যেও টুর্ম্যালিনের এই প্রকৃতি লক্ষ্য করা গেল। শুধু তাই নয়, কত বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর মধ্য থেকেও কত দিনের কত নিঃশব্দ বাণী বিজ্ঞানী মনের কাছে এসে ধ্বনিরূপ পেতে চাইল।

১৭৬০ খ্রী.-এ জার্মানীতে সালজারের (Johann Georg Sulzer—1720-'79) অভিজ্ঞতাকে এ রকমের একটি দৃষ্টান্ত বলে ধরা চলে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, দু'টি ভিন্ন ধাতুর দু'টি পাতের মধ্যে যদি ভিজে জিভ ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, আর পাত দুটি মুখের বাইরে একত্রে ঠেকান থাকে, তাহলে একটি অদ্ভুত স্বাদ অনুভব করা যায়; আর, এক ধরনের শিহরণ। মানুষের অতীতের দীর্ঘ জীবনযাত্রায় কত সময়ে তো কত রকমের নব নব আস্বাদন পাওয়া গিয়েছে, আর কত রকমের নূতন অনুভূতিও। কখনও সে নিয়ে কোনো প্রশ্ন জাগেনি। কিন্তু আজ? সেই চোখ মুখ নাক কান হাত সবই তো প্রায় এক রকমই মনে হয়, অন্তত বিগত কয়েক সহস্রাব্দ ধরে। তাহলে আজ তার সব ব্যাপারে এমন সন্দেহ, এমন অসন্তোষ, এমন জিজ্ঞাসা কেন? আসলে তার মনই পালটে যাচ্ছে, হয়ে উঠছে বৈজ্ঞানিক। তাই তার শত প্রশ্ন, এত উৎসুক্য। কিন্তু সব কিছুর সমাধান সে একদিনে পায়নি, বা কোনো মানুষ একলাও তা পায়নি। সালজারের ঐ অনুভূতির কারণটি অবশ্যই জানা যাবে। কিন্তু আশ্চর্য যে, কোটি কোটি মানুষের চোখ এড়িয়ে যাওয়া ব্যাপার সম্বন্ধে একক মানুষের প্রশ্নটি অহেতুক নয়। বা কে জানে, হয়ত আরও অনেকের মনে এ প্রশ্ন জেগেছিল, কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজ-মানসের তরল অবস্থায় তা কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। তাহলে বৈজ্ঞানিক মন কি সমাজ-মানসের এক অদৃশ্য ক্রম-সংহত (ক্রমাগত ঘনীভূত) অবস্থা? যেজন্য কোথাও কোনো প্রশ্ন অনিবার্যভাবেই প্রোথিতমূল হয়ে সমুদ্ভূত হয়ে উঠলে অনেক সময় মনে হয় এক উৎপাত যেন, বা কোনো আকস্মিক ঘটনা?

কিন্তু উৎপাত হলেও তা' অপ্রতিরোধনীয়; আকস্মিক হলেও অনিবার্য। অনিবার্যভাবেই যেমন জগতের একটি সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যময় সত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন জেগে উঠেছিল ১৭৮০ খ্রী.-এর নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে,—যদিও ঘটনার প্রথম দর্শকটির কাছে তা ছিল মোটামুটি আকস্মিক। শোনা যায় দর্শকটি একজন নারী। বোলোগনার (Bologna) একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও দেহতত্ত্বের অধ্যাপকের পত্নী। রুগ্না মহিলা। ভেক(ব্যাঙ)-পদভক্ষণে সেরে উঠতে পারেন। সুতরাং স্বামী গ্যালভানি (Luigi Galvani—1737-'98) স্বহস্তে দাদুরী (ব্যাঙ)-পদপংক্তিকে চর্মমুক্ত করে তাদের ছাড়িয়ে ছড়িয়ে ফেলছিলেন টেবিলের উপর। টেবিলটি একটি আহিত বিদ্যুৎযন্ত্রের পরিবাহকের কাছ ঘেঁষেই দাঁড়িয়েছিল। ভদ্রলোক বাইরে চলে গেলে ভদ্রমহিলা এসে ছাল ছাড়ান ছুরিটি নিয়ে খুটখাট করছিলেন। হঠাৎ ছুরিটির একটি প্রান্ত বিদ্যুৎ যন্ত্রের কাছ ঘেঁষে গেল, আর অন্য প্রান্তটি যুগপৎ ব্যাঙের পায়ের একটি স্নায়ুতে এসে লাগল। অমনি বিদ্যুৎযন্ত্র থেকে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়ে উঠল, আর যেন এক অদৃশ্য হস্ত এসে ঐ মৃত ব্যাঙ্‌টির পায়ে একটি প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে গেল। স্বামীকে তিনি সবই জানালেন। গ্যালভানি ব্যাপারটি পুনঃপরীক্ষা করে দেখলেন এবং কারণ নির্দেশের জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। ভ্যাকুয়াম বা শূন্যস্থানের মধ্যে ভেকপদ স্থাপন করেও তিনি বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ পেলেন। তাহলে বিদ্যুৎযন্ত্র ছাড়াও ব্যাপারটি ঘটবে কি? আগেই তো জানা হয়েছে, আবহাওয়াতেও বিদ্যুৎশক্তি ছড়িয়ে থাকে! বাগানে লোহার জালতি ছিল। সেখান থেকে তিনি লোহার হুক লাগিয়ে তাতে ঐ পা'গুলি ঝুলিয়ে দিয়ে তাদের কাঁপন লক্ষ্য করলেন। মেঘমুক্ত দিনেও নড়ন দেখা যায়, কিন্তু ঝড়ো মেঘ কাছাকাছি উড়ে এলো বড্ড বেশি। প্রথমে তিনি মনে করলেন, ওটা আবহাওয়ার বিদ্যুতেরই প্রভাব। কিন্তু তিনি দরজা বন্ধ করে একটি ধাতব পাত্রে পা'গুলি রাখলেন। তারপর তিনি তার দিয়ে পাদস্নায়ু বিদ্ধ করে তারটিকে পাত্রের গায়ে ঠেকিয়ে দিয়েও ঐ একই ফল দেখতে পেলেন। তিনি মনে করলেন যে ওটি সম্ভবত আদৌ আবহ (বায়ুমণ্ডলের)-বিদ্যুতের ব্যাপার নয়। কারণটি নিশ্চয় লুকিয়ে রয়েছে ঐ পায়ে বা পাত্রে, না হয় তারটিতে। তিনি পা'গুলিকে একটি কাচপাত্রে রেখে একটি বাঁকান কাচনলের দু'টি প্রান্ত দিয়ে একই কালে স্নায়ু আর মাংস স্পর্শ করলেন। কোনো পরিবর্তন ঘটল না। অথচ কাচদণ্ডের পরিবর্তে লৌহদণ্ড হলে নড়ন দেখা যায়। কিন্তু আরও মজার ব্যাপার যে, লোহা আর তামা, বা তামা আর রূপার মত দ্বিধাতুযুক্ত (দুটি ধাতু দিয়ে তৈরি) দণ্ড হলে খিঁচুনিটা জোর তো হয়ই, তা অবিরতভাবেই চলতে থাকে। গ্যালভানি

মনে করলেন দণ্ডটি সম্ভবত কেবলমাত্র পরিবাহকের কাজ করে, যেমন লিডেন-জারের পরিবাহক তারটি কেবল বিদ্যুৎপ্রস্তুত যন্ত্র থেকে বিদ্যুৎ বহন করে মাত্র। আসল তত্ত্ব জানতে গেলে ঐ স্নায়ু নিয়েই বিশেষ পরীক্ষা দরকার।

কিন্তু যতটুকু জানা গেল, তাতেই বৈজ্ঞানিক মহল চঞ্চল হয়ে উঠল। রীতিমত গবেষণা চলল। প্রায় ১৪।১৫ বছর পরে ব্যাপারটির যথার্থ ব্যাখ্যা দিলেন গ্যালভানিরই স্বদেশবাসী পেভিয়া (Pavia) বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যক্ষ ভোল্টা (Alessandro Volta—1745-1827)। ইতিমধ্যে কিন্তু পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নবিদ্যার অনেক উন্নতি সাধিত হয়ে গিয়েছে। ১৭৭৪ খ্রী.-এ প্রিস্ট্‌লি (Joseph Priestley—1733-1804) অক্সিজেন আবিষ্কার করেছেন। ১৭৭৫-এ ঐ ভোল্টাই ইলেক্ট্রোফোরাস অর্থাৎ আবেশের দ্বারা স্থৈতিক বিদ্যুৎ মাপবার যন্ত্র তৈরি করেছেন। ১৭৭৭ খ্রী.-এ কুলম্ব্‌ Charles Augustin Coulomb—1736-1806) ক্ষুদ্র পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি মাপবার জন্য টর্সান্‌ ব্যাল্যান্স্‌ বা মোচড়ান তুলাদণ্ড আবিষ্কার করে দেখিয়ে দেন যে, বিদ্যুৎ ও চুম্বকের আকর্ষণ-বিকর্ষণ ক্ষেত্রেও নিউটনের বিপরীত বর্গের নিয়ম [Law of Inverse Squares—এ বিশ্বের যে কোনো দু'টি বস্তুকণা পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ দুটি জিনিসের উপর নির্ভর করে—(১) বস্তুকণাদ্বয়ের ভরের গুণফল এবং (২) তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব। ঐ গুণফল যতগুণ বাড়ে, আকর্ষণ ততগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অথচ ঐ দূরত্ব বাড়লে আকর্ষণও তার সঙ্গে একটি বিশেষ সামঞ্জস্য বা অনুপাত রক্ষা করে কমতে থাকে। দূরত্ব ৪, ৯, বা ১৬ বা ২৫ গুণ বাড়লে আকর্ষণও যথাক্রমে ২, ৩, বা ৪ বা ৫ গুণ কমে যায়।—কুলমের তত্ত্বও এই নিউটন তত্ত্বের অনুরূপ। অর্থাৎ ভার বা ভরযুক্ত দুটি বস্তুকণার পরিবর্তে, শক্তি বা তেজযুক্ত দুটি বিপরীত মেরু সমন্বিত দুটি চৌম্বক বা বিদ্যুৎকণার ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য।] সমভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। অর্থাৎ দুটি বিদ্যুৎ-শক্তির ক্রিয়া বিদ্যুৎ-পরিমাণ দ্বয়ের গুণফলের সঙ্গে এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের সঙ্গে অনুপাত রক্ষা করে চলে। ১৭৮৩ খ্রী.-এ ক্যাভেণ্ডিস (Hon. Henry Cavendish—1731-1810) অক্সিজেন (O_2) এবং হাইড্রোজেন (H_2) গ্যাসের মিশ্রণের মধ্যে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে উভয়ের মিলন ঘটিয়ে জল (H_2O), এবং ১৭৮৫ খ্রী.-এ জলের ওপর অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের (N_2) মিশ্রণের মধ্যে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ ঘটিয়ে নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) তৈরি করলেন। ১৭৮৬ খ্রী.-এ বেনেট (Abraham Bennet—1750-'99) বিদ্যুৎ মাপার জন্য স্বর্ণপত্র-তড়িদ্বীক্ষণ মাপক-যন্ত্র তৈরি করলেন। [একটি অনুভূমিক ধাতব চাকতির কেন্দ্র থেকে ঝুলান একটি ধাতব-দণ্ডের অন্য প্রান্তে দুটি

অতি সূক্ষ্ম সোনার পাতা অত্যন্ত আল্গাভাবে ঝুলান থাকে। পত্রদ্বয় সহ দণ্ডের
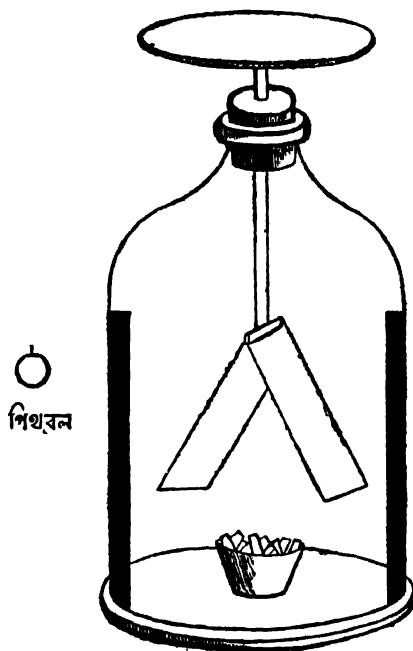
অংশবিশেষ একটি কাচের ফ্লাস্ক্ বা জারের মধ্যেই শূন্যে ঝুলতে থাকে। ধাতব দণ্ডটি কেবল পাত্রের প্রবেশপথে একটি অন্তরক অর্থাৎ বিদ্যুৎ-অপরিবাহী দ্রব্যের ছিপির মধ্যে শক্তভাবে আটকান থাকে। কোনো বিদ্যুৎযুক্ত বস্তুকে এনে চাকতির কাছে রাখলে বা তাতে ঠেকিয়ে দিলে চাকতি, দণ্ড ও পত্রদ্বয় বিদ্যুতের আধান (পৃ. ৮৯) দ্বারা আহিত হয়ে যায়। তখন পত্রদ্বয়ের মধ্যে সমধর্মী—পূরক (ধন), বা পূরণীয় (ঋণ)—বিদ্যুতের আবির্ভাব ঘটায় বিকর্ষণ বশত তাদের নিম্নস্থ মুক্তপ্রান্ত দু'টি ফাঁক হয়ে যায়,—বুঝা যায় যে ঠেকান বস্তুটি বিদ্যুৎযুক্তই বটে। পত্রদ্বয়ের ফাঁক অর্থাৎ তাদের বদ্ধপ্রান্তের কোণের বিস্তার দেখে বিদ্যুতের পরিমাণও জানা যায়। পরিমাণ বাড়লে কোণের বিস্তারও বাড়তে থাকে। চাকতিতে হাত লাগিয়ে দিলে দেহ দিয়ে বিদ্যুতের আধান পালিয়ে যায়। তখন এ ফাঁকও বুজে যায়।] এই যন্ত্র উদ্ভাবনের পূর্বে প্রধানত পিথ্-বল মাপক-যন্ত্র দিয়েই কাজ চলত, ক্যাভেণ্ডিসও ঐ দিয়েই কাজ চালিয়েছেন। ১৭৮৯ খ্রী.-এ ট্রুস্ট্উইজ্ক্ (A. Paets van Troostwijk—1752-1837) এবং ডীমান (J. R. Deimann—1743-1808) স্থিতি-বিদ্যুৎ সৃষ্টির একটি শক্তিশালী যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎ তরঙ্গ চালিয়ে উদক্-

বিশ্লেষণ (জল থেকে তার হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন, এই উপাদানদ্বয়কে পৃথকীকরণ) করলেন এবং এই প্রক্রিয়ায় বহুবিধ লবণ (ধাতু-অধাতুর যৌগিক) অম্ল (হাইড্রোজেন ও অধাতুর যৌগিক) এবং ক্ষারকের (ধাতু এবং অক্সিজেনের কতকগুলি যৌগিক) বিশ্লেষণ করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। বিদ্যুদ্বিশ্লেষণ প্রতিক্রিয়া আবিষ্কৃত হওয়ায় রসায়নবিদ্যার যুগান্তর এসে গেল।

গ্যালভানির গবেষণা এবং অনুমানও রীতিমত উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। তাঁর ঐ স্নায়ু সম্বন্ধীয় অনুমান নিয়ে ভোল্টা গবেষণার কাজ চালিয়ে দেখলেন যে, দু'টি ধাতু দিয়ে তৈরি বাঁকান দণ্ডের এক প্রান্ত চোখে এবং অন্য প্রান্ত তাঁর মুখে লাগিয়ে দিলেই ঐ সংযোগ-মুহূর্তে যেন একটি আলোর সংবেদনা (সাড়া) জেগে উঠে। তাহলে এখানেও কি ঐ বিদ্যুতের হাত ? সম্ভবত সালজারের অভিজ্ঞতার কথা মনে করে তিনি একটি সোনার আর অন্য একটি রূপার মুদ্রা জিহ্বায় ঠেকিয়ে একটি তার দিয়ে তাদের যোগ করেও দেখলেন। আশ্চর্য ব্যাপার! সংযোগমাত্রেই একটা তিক্ত আস্বাদের অনুভূতি, যেমন পেয়েছিলেন সালজার ১৭৬০ খ্রী. এ। এখানেও ঐ বিদ্যুতের খেলা! ভোল্টা ধরে নিয়েছিলেন যে, বিদ্যুৎশক্তির উৎপত্তির ব্যাপারে মাংসের কোনো হাত নাই। কারণ, মাংসকে না ছুঁইয়ে কেবল স্নায়ুর দু'পাশে ঐ দ্বিধাতু দণ্ড দিয়ে স্পর্শ করলেও একই ফল পাওয়া যায়। তাহলে মাংসের মত স্নায়ুর ব্যাপারটিও কি এক্ষেত্রে অকিঞ্চৎকর ? আর তাহলে ঘটনাটিও কি লিডেন-জারের অনুরূপ ঘটনা নয় ? তাছাড়াও তিনি ভাবলেন, ঐ শক্তি যে কেবল গতি সৃষ্টি করতে পারে তা নয়, দৃষ্টি বা আস্বাদনের স্নায়ুর ওপরও তার নিশ্চিত প্রভাব। তিনি দেখলেন যে, ঐসব গবেষণার জন্য অনিবার্য ঘটনা যেটি, সেটি হচ্ছে যে-কোনো পৃথক দু'টি ধাতুর সংযোগ। সত্যিই ত, গ্যালভানির অনুমান মত ব্যাঙের ঐ পা'গুলিই যদি ঐ শক্তির কারণ হয়ে থাকত, আর ঐ ধাতু দণ্ডটি যদি কেবল পরিবহনের কাজ করে থাকত, তাহলে শুধু লোহার দণ্ডই তো যথেষ্ট হত! সে জন্য আবার দু'টি ধাতুর যোগ কেন ? তবে দেখা গেল যে, একক ধাতু হলেও চলবে, যদি তার দু'টি প্রান্তের মধ্যে তাপমানের বেশ পার্থক্য থাকে। পার্থক্য থাকলেই রীতিমত খিঁচুনি চলতে থাকে। কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যখন দু' দিকের উষ্ণতা সমান হয়ে আসে, তখন আর ওরকমের কাঁপুনি থাকে না। যেটুকু থাকে, সেটি তাহলে একটি ধাতুদণ্ডের প্রান্তদ্বয়ের মধ্যে সাধারণভাবে যে পার্থক্য থাকে, সেজন্যই নিশ্চয়। এরকম সিদ্ধান্ত করে তিনি জানালেন যে এই নূতন রকমের গতিশীল শক্তিকে কেবল জীবসম্বন্ধীয় বা জৈব বিদ্যুৎই নয়, ধাতু সম্বন্ধীয় বা ধাতব বিদ্যুৎও বলা যেতে পারে। কিন্তু ওটি যে সত্যিই বিদ্যুৎশক্তি, সেটি প্রমাণ করবার

জন্ম ১৭৭৪ খ্রী-এর পরে তিনি কাজে নামলেন। স্বর্ণপত্র-তড়িদ্বীক্ষণ যন্ত্রের সঙ্গে একটি ছোট্ট ঘনীকারক লাগিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর নিজের মত একটি ঘনীকারক-তড়িদ্বীক্ষণ যন্ত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন। এর সাহায্যে দ্বিধাতু দণ্ড থেকে যে সামান্য পরিমাণ বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব, তার শক্তি (potential)-বৃদ্ধি না ঘটিয়েও তার পরিমাণকে ঘনীভূত ও বহু-গুণিত করা যেতে পারে। এভাবে প্রাপ্ত বর্ধিত-বিদ্যুৎপরিমাণকে যখন স্বর্ণপত্র-বিদ্যুদ্বীক্ষণ যন্ত্রের উপর ফেলা হল, তখন দেখা গেল যে, যন্ত্রের উপর তার প্রভাবটি বাস্তবিকই ঐ যন্ত্রের উপর বিদ্যুতের প্রভাবের মতই। যন্ত্রের সাহায্যে ভোল্টা দেখালেন যে, ঘনীকারকের উপরের প্লেটটি সরিয়ে নিলেই বিদ্যুতের শক্তি বৃদ্ধি হয়ে যায়, ফলে স্বর্ণপত্রদ্বয়ের মধ্যের ব্যবধান বেড়ে যায়। এ থেকেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, দু'টি ভিন্ন ধাতুর সংযোগ স্থলেই ঐ শক্তির উৎপত্তি ঘটে, এবং ওটি বিদ্যুৎশক্তিই।

কিন্তু কাঠখোট্টা ঐ শুকনো দু'টি ধাতুর সঙ্গে জ্যোতির্ময় বিদ্যুতের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? তিনি তাদের দু'টিকে একত্র করলেন, আবার বিচ্ছিন্ন করলেন, বিদ্যুৎ মাপক যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন। দেখলেন যে, একটি ধাতু পজিটিভ (অর্থাৎ বাড়তি বা পূরক বা ধন তড়িৎ যুক্ত) এবং অন্যটি নেগেটিভ (অর্থাৎ ঘাটতি বা পূরণীয় বা ঋণ) তড়িৎ যুক্ত হয়ে রয়েছে। তিনি বার বার বিভিন্ন ধাতু নিয়ে পরীক্ষা করলেন। ব্যতিক্রম নাই। আশ্চর্য যে, একই ধাতু একটি বিশেষ ধাতুর সহযোগে পজিটিভ বা ধন তড়িৎ-ধর্ম প্রদর্শন করলেও অন্যের সঙ্গে সহবাস কালে তার ভাবগতিক একেবারে পাল্টে যায়। সে হয়ে উঠে নেগেটিভ বা ঋণাত্মক। ১৭৯২ খ্রী.-এ তিনি একটি ধাতুর তালিকা প্রকাশ করলেন। তাতে ধাতুগুলিকে পর পর এমনভাবে সাজান হল যে, প্রত্যেকটি ধাতু তার পূর্ববর্তী যে কোনো ধাতুর সঙ্গে ঋণধর্মী হওয়া সত্ত্বেও অনুগ (অর্থাৎ পরবর্তী) ধাতুর যে কোনো একটির সঙ্গে সহগমন কালে ধনাত্মক হয়ে উঠে। অর্থাৎ ঐ তালিকা দেখেই আর্দ্র (ভিজা) পরিবাহকের দু'দিকে সংলগ্ন দু'টি ধাতুখণ্ডের কোন্‌টি থেকে কোন্‌টির দিকে যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলছে তা' নিঃসন্দেহে বলে দেওয়া যাবে,—শুধু বাড়তি-ঘাটতি তত্ত্ব সম্বন্ধে সামান্য একটু জ্ঞান থাকা দরকার হবে। জানা চাই যে, ফ্রাঙ্কলিনের বাড়তি বা ধন-বিদ্যুৎ নিশ্চয়ই ঘাটতি পূরণের জন্য জোরাল ধনাত্মক (বিদ্যুৎ-পজিটিভ) ধাতু থেকে ঋণাত্মক (নেগেটিভ) বা অপেক্ষাকৃত দুর্বল-ধনাত্মক (বিদ্যুৎ-পজিটিভ) ধাতুর দিকে ছুটে যায় এবং এভাবেই প্রাকৃতিক প্রেরণা বলে উভয়ের মধ্যে বিদ্যুৎসাম্য বজায় থাকে।

জগতের কোনো আশ্চর্যের চাইতে কম আশ্চর্য নয় যে, একই প্রক্রিয়া অনিবার্য-

ভাবেই উদ্ভূত হয়ে উঠছে এমন দুটি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ধর্মকে অবলম্বন করে, যারা সম্ভবত এক (বিদ্যুৎ) হয়েও প্রক্রিয়াকালে ভিন্ন (বাড়তি-ঘাটতি) সাজে অবতীর্ণ হতে বাধ্য। অথচ কিনা ঐ সাম্যকে ঘটিয়ে তুলবার জন্যই তাদের এমন বিপরীত সাজ? সাম্যই যদি শেষ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে একই প্রকৃতির এই সংঘর্ষমুখী ভিন্ন ধর্মের আয়োজন কেনই বা এমন অনিবার্য? কোন্‌টি তাহলে চরম সত্য? ঐ সাম্য? না, ঐ সংঘর্ষ? না দু'টিই? কিন্তু এই সাম্য বা দ্বন্দ্ব কার? লৌহ-তাম্রের, না, বাড়তি-ঘাটতি বিদ্যুতের? পৃথক হয়ে ওরা যখন পড়ে থাকে, মোটামুটিভাবে ওদের কোনও প্রক্রিয়া নাই। ঘাটতি-বাড়তির প্রশ্নও তাই স্তব্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু যখন তাদেরকে একত্রে এনে অভিসিঞ্চিত (ভিজা) পরিবাহকের দু'দিকে যোগ করে দেওয়া হল, তখনও যে ঘাটতি পূরণ হয়ে গিয়ে একটি স্থির সাম্যাবস্থা এসে গেল, ব্যাপারটি তাও তো নয়! অবিরতভাবে সেখানে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলতে লাগল। তাহলে কি সাম্যটি শেষ কাম্য নয়? কিন্তু সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্বটি? যদি দ্বন্দ্বই চূড়ান্তভাবে কাম্য হবে, তাহলে সাম্যের জন্য এমন অবিরত প্রযত্ন কেন? তাহলে কি সাম্যময় সংঘর্ষ বা সংঘর্ষময় সাম্যের নামই ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া? বা প্রকৃতিক্রিয়া? আর তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে ঐ যে ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া, তা কি কেবল প্রকৃতির,—অর্থাৎ ধর্ম বা গুণের? অর্থাৎ ঐ বাড়তি-ঘাটতি বিদ্যুৎ-ধর্মের? কিন্তু আমরা মেন্দেলিয়েভের কাছ থেকে যে পরমাণুর ভর-প্রকৃতির কথা শিখেছিলাম, তার কি হল? সেও তো একটি প্রকৃতি! তাহলে আসল বস্তুটি গেল কোথায়? যে পার্থিব মূল বস্তুর জন্য এত অনুসন্ধান, এত নিষ্ঠা, এত ত্যাগ, এমন আত্মোৎসর্গ? নাকি জগৎটাই একটা ভোজবাজি, কেবল কতকগুলি অপার্থিব গুণের খেলা,—যেমন অনেকটা মনে করতে শিখিয়েছিলেন অ্যারিস্টটল্‌? তাহলে কি আবার অ্যারিস্টটল্‌ ফিরে এলেন এতকালের যুদ্ধের পর বিদায় নিতে না নিতেই? আশ্চর্য ব্যাপারই বটে!

কিন্তু বৈজ্ঞানিক তো দমবার পাত্র নন! গুণ হলেই তাকে অপার্থিব হতে হবে কেন? এমনও তো হতে পারে, ঐ গুণগুলিই পৃথিবীর মূল উপাদান! গুণই উপাদান? বিশেষণ বিশেষ্যের একত্ব?? এ তো যেন এক বিস্মিত বিস্ময়!!! কিন্তু বিজ্ঞানীর সাধনা এই রকম বিস্ময়েরই সাধনা। মিথ্যার রাজ্যে সত্য এসে হাজির হলে সাধারণ মানুষের হয়ত তাতে বিস্মিত হবারই কথা। তা'বলে মিথ্যেই সত্য নয়। ওটি শুধু সমগ্র সত্যেরই আংশিক অবভাস (বিকৃত আভাস) মাত্র। সেইটি জানতে পারার নামই প্রকৃত জানা। বস্তুত ভোল্টা যা আবিষ্কার করলেন তার মধ্যেই প্রকৃত জ্ঞানের দ্যুতি। তাঁর ঐ সংযোগ-তত্ত্ব অনুযায়ী তিনি হয়ত

একথা বুঝেছিলেন যে, কঠিন পদার্থ মাত্রেই বিদ্যুৎ তরল যুক্ত থাকায় দুটি ধাতুর সংযোগের ফলে উচ্চ শক্তির বিদ্যুৎ নিম্ন শক্তির দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একটি অভিসিঞ্চিত পরিবাহকের সঙ্গে যুক্ত হলে ঐ অর্ধ-প্রবেশ্য বাহক-প্রাচীরের মধ্য দিয়ে কেন এবং কিভাবে যে একটি বিদ্যুৎবৃত্ত গঠিত হয়ে গিয়ে ঐ তড়িৎ-তরলটি আবার তার উৎসমূলেই (অর্থাৎ শেষে নিম্ন শক্তি থেকে পুনরায় উচ্চশক্তির ধাতুতে) ফিরে আসে, তার কারণ জানা গেল না। সুতরাং ভোল্টার এ ধারণা হয়েছিল যে, একটি বৃহত্তর সত্য কোথাও লুকিয়ে আছে; যা জানা হল, তা আংশিক জ্ঞান মাত্র। এই আংশিক জ্ঞানই বৃহত্তর সত্যের অভিমুখী হলে তবেই তা আংশিক জ্ঞান। নচেৎ আংশিক সত্যই সমগ্র সত্যরূপে অবভাসিত হলে সেটি ঐ বৃহত্তর সমগ্র সত্যের তুলনায় তুচ্ছ বা অকিঞ্চিৎকর বা মিথ্যা বলেই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং আপাতত ভোল্টার ঐ অসম্পূর্ণ তত্ত্বকে সম্পূর্ণ করবার জন্য বৈজ্ঞানিকদের নব প্রযত্নের প্রয়োজন। বিদ্যুৎ-তত্ত্বের মত এখানেও যেন রয়েছে সেই ঘাটতি পূরণের মাধ্যমে জ্ঞানের অগ্রগমন বা সভ্যতার অগ্রগতির তত্ত্ব। কিন্তু অসম্পূর্ণ হলেও সত্যের যে অংশরূপের দর্শন ঘটল, তাও কম আশ্চর্যজনক নয়।

ঘটনা সন্দর্শন হয়েছিল একটি মহিলার। নিষ্ঠাময় প্রশ্ন উত্থাপিত হল গ্যালভানির মনে। সমাধান এসে গেল ভোল্টার কাছ থেকে। কিন্তু যাঁর ঔৎসুক্যের নিবৃত্তি ঘটতে পারে, তিনি হচ্ছেন সালজার,—যিনি বহুপূর্বেই দু'টি ভিন্ন ধাতুর মধ্যে ভিজে জিভ ঢুকিয়ে দিয়ে একটি বিকট আস্বাদ লাভ করেছিলেন। এভাবেই সর্বব্যাপ্ত সত্যের আবরণ আংশিকভাবে হলেও একটি ছোট্ট গোষ্ঠীকে অবলম্বন করে উন্মোচিত হয়ে গেল। আবার তাকে অবলম্বন করেই শত সহস্র মানবমন সংহত হতে চলেছে—যেমন কিনা কতকগুলি কণিকা একবার কোনোমতে মিলিত হতে পারলে সেই জোটবদ্ধ কণিকাপুঞ্জকে কেন্দ্র করে তার চারদিক থেকে অসংখ্য জলকণা ক্ষিপ্রগতিতে ঘনীভূত হয়ে সৃষ্টি করে তোলে কুয়াশা বা মেঘমালা। এইভাবেই মন-মেঘ সঞ্চিত হয়ে যে বৃহত্তর বৈজ্ঞানিক সমাজ-মানসের অভ্যুদয় ঘটিয়ে তুলবে, সেই মানস-মুকুরেই না প্রতিফলিত হবে প্রকৃতির সমগ্র সত্যটি!

কিন্তু কি করে ঐ ধাতুসংযোগমূলক নগণ্য পরিমাণ বিদ্যুতের শক্তিকে বাড়িয়ে তোলা যায়, যাতে করে তার গুণাবলী সম্বন্ধে সঠিক পরিচয় পাওয়া যেতে পারে, বা তাকে বিশেষ কাজে লাগান যেতে পারে এই ছিল ভোল্টার চিন্তা। তিনি এরূপ মনে করলেন: সংযোগের ফলে রূপা (Ag) থেকে দস্তার (Zn) দিকে যে তড়িৎ-তরলটি প্রবাহিত হচ্ছে, তাকে সিঞ্চিত পরিবাহকের মধ্য দিয়ে অন্য একটি রৌপ্যখণ্ডের মধ্যে টেনে আনা যাবে। তার সঙ্গে আবার আর একটি দস্তাখণ্ড যোগ করা থাকলে দুই

জোড়া ধাতুর শক্তিসংযোগে বলবত্তর প্রবাহ সৃষ্টি হতে পারবে। সেই প্রবাহকে আরও ধাতুযুগলের মধ্য দিয়েও ক্রমাগত টেনে নিয়ে গেলে শেষে একটি বিপুল পরিমাণের তড়িৎশক্তি লাভ করা সম্ভব হবে। ১৮০০খ্রী.-এর ২০শে মার্চ তিনি লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি যোসেফ ব্যাঙ্কস্-এর (Sir Joseph Banks—1743-1820) কাছে চিঠি লিখে এ পরিকল্পনাটি পেশ করলেন। ঐ পত্রে তিনি আরও জানালেন
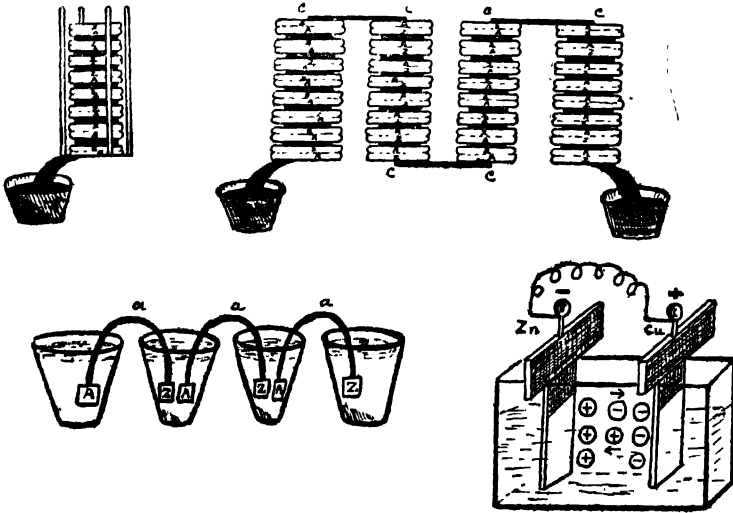
যে কতকগুলি পাত্রে চুনজল (brime) বা কোনো লঘু (যে দ্রবণে দ্রাব্যের মাত্রা কম থাকে) অম্ল (dilute acid) রেখে সেগুলিকে যদি কতকগুলি দ্বিধাতুর পরিবাহক (পরিবাহকের এক প্রান্ত দস্তা ও অন্য প্রান্ত তামার দ্বারা নির্মিত) দিয়ে এমন ভাবে সংযুক্ত করা যায় যাতে প্রত্যেকটি পরিবাহকের দস্তা ডান বা বাম যে কোনো এক দিকেই থাকবে, তাহলেও ঐ একই ফল পাওয়া সম্ভব হবে। ভোল্টার আবিষ্কৃত প্রথম যন্ত্রটি ভোল্টীয় স্তূপ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করল। আর দ্বিতীয়টি হল প্রথম ভোল্টীয় তড়িৎকোষ। অপ্রত্যাশিত ও অচেতন ভাবে এরই সূত্রপাত লক্ষ্য করা গিয়েছিল সালজারের সেই ধাতুযুগলের মধ্যে জিহ্বার অনুপ্রবেশ ঘটনায়। কিন্তু ভোল্টার ঐ পত্র প্রেরণের ঠিক ছ' সপ্তাহের মধ্যেই নিকলসন (William Nicholson—1753 1815) ও কার্লাইল (Sir Anthony Carlisle—1768-1840) রা যে তারিখে ইংল্যাণ্ডে বসে ভোল্টীয় স্তূপের সাহায্যে বর্ধিত পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রস্তুত করতে সমর্থ হলেন। তার দ্বারা তাঁরা সত্যসত্যই উদক্-বিশ্লেষণ করতেও সমর্থ হলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে ট্রুস্ট্‌উইক্‌ ও ডীমান স্থৈতিক বিদ্যুৎ

যন্ত্রের সাহায্যে এই কাজটি করেছিলেন। কিন্তু স্থৈতিক বিদ্যুতের মুহূর্ত প্রভাব, আর প্রবহমান বিদ্যুতের ইচ্ছানুরূপ দীর্ঘায়িত প্রভাব,—এদের মধ্যে পার্থক্য অনেক। তা না হলে স্বয়ং নেপোলিয়ান এর আবিষ্কর্তাকে (ভোল্টাকে) ১৮০১ খ্রী.-এ প্যারিসে আমন্ত্রণ করে এনে স্বর্ণপদক উপহার দিয়ে সম্মানিত করবেন কেন? বস্তুত, পূর্ববর্তী ঘটনার মত ঐ জল যে কেবল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুটি মৌলিক পদার্থে বিশ্লিষ্ট হয়ে গেল, তাই নয়। ১৮০০খ্রী.-এর সেপ্টেম্বর মাসে সাইলেসিয়ার তরুণ বিজ্ঞানী রাইটার (Johann Wilhelm Ritter—1776-1810) ঘোষণা করলেন যে ভোল্টীয় স্তূপের দু'টি প্রান্তের সঙ্গে জলরাশি যুক্ত করা হলে দু টি ধাতুপ্রান্তের একদিকে হাইড্রেজেন আর অন্যদিকে অক্সিজেন পৃথক পৃথক ও অবিমিশ্রভাবেই তাদের স্বকীয় সত্তা নিয়ে প্রকাশমান হচ্ছে। রাইটারের ব্যবহৃত ব্যাটারিটিই (অর্থাৎ একাধিক তড়িৎকোষের সমাহারমূলক যন্ত্রটিই) প্রথম Secondary অথবা সঞ্চয়িতা ব্যাটারি, যার দ্বারা সঞ্চিত গতিবিদ্যুৎ ক্রমক্রিয়মাণ হয়ে উঠতে পারে। রাইটার দেখলেন যে, দু'টি প্লাটিনাম তারকে জলে ডুবিয়ে তাদের বহিঃপ্রান্ত দু'টিকে একটি ব্যাটারির সঙ্গে সংযুক্ত করে দিলে জল থেকে একদিকের তার বেয়ে হাইড্রোজেন এবং অন্য দিক দিয়ে অক্সিজেন গ্যাস উদ্ভূত হতে থাকে। তারপর তিনি তার দু'টিকে ব্যাটারিচ্যুত করে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করায় দেখতে পেলেন যে তৎসত্ত্বেও বহির্বর্তনী মারফত ব্যাটারিচ্যুত তার দু'টি কিছুক্ষণ যাবৎ বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি করে জলকে বিশ্লিষ্ট করে দিচ্ছে। তবে তখন প্রবাহটি দিক্ পরিবর্তন করে গেল। ফলে গ্যাসগুলিরও উদ্ভব স্থান পরিবর্তিত হয়ে গেল। ১৮০৩ খ্রী.-এ বার্জেলিয়াস এবং হাইসিঙ্গারও (William Hisinger—1766-1852) পরীক্ষা করে দেখলেন যে বিদ্যুৎচালনার ফলে লবণ-দ্রবণগুলিতেও ঐ রকম ঘটছে। লবণ-দ্রবণ বিশ্লিষ্ট হয়ে গেলে পজিটিভ বা ধন-মেরুতে অম্ল (acid) এবং নেগেটিভ বা ঋণ-মেরুতে ক্ষার (alkali) বা ক্ষারকের (base) উদ্ভব ঘটছে। বিদ্যুৎ-রসায়ন বিদ্যার শুভময় যাত্রা দিয়েই উনবিংশ শতাব্দীর যাত্রা শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু পূর্বেই আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বৈজ্ঞানিক চিন্তার গতি সরলরেখা ধরে অগ্রসর হয়নি। কারণ পার্থিব সকল প্রকার গতির মতই তা' সংঘর্ষ-নির্ভর। এমনকি, বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সংঘর্ষের মত একই প্রক্রিয়ার মধ্যেও ভিন্ন ধর্মের সংঘর্ষ সর্বদাই উদ্ভূত হয়ে চলে। তড়িৎকোষের একই প্রবাহের মধ্যে দু'টি ভিন্নধর্মী মেরু-সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় আমরা সেইটিই লক্ষ্য করেছিলাম। সাধারণ দৃষ্টিতে হয়ত ঐ সংঘর্ষের রূপটি সর্বদা ধরা পড়ে না। কিন্তু বহুস্থলে তা আবার সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। যে ফ্লোজিস্টন্-বাদ অ্যারিস্টট্‌ল-বাদের উপর প্রচণ্ড আঘাত

হেনেছিল, তার নিজের মধ্যেই অবৈজ্ঞানিক ভাববিলাস উদ্‌গত হয়ে উঠেছিল। আবার যে বয়্যাল স্বয়ং তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞাবলে ঐ ফ্লোজিস্টন-বাদের প্রমাদ অপনয়ন (দূরীভূত) করেছিলেন, তাঁরই পাবকবাদের সিদ্ধান্তও ভ্রমমুক্ত ছিল না। গ্যালভানির মনে বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা উদ্যত হয়ে উঠল, কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাইলেন অবৈজ্ঞানিক ভাবে। এমনকি, তিনি ভোল্টার মতের যৌক্তিকতাও গ্রহণ করতে চাইলেন না। কিছুকাল পরে বার্জেলিয়াসের মত বিজ্ঞানীও অ্যাভো-গ্যাড্রোর সত্যানুসারী তত্ত্বকে গ্রহণ করতে পারেননি। ভোল্টার ঐ আবিষ্কারের প্রায় সমসাময়িক কালে স্বয়ং ড্যাল্টন, যিনি কিনা পরমাণুবাদকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করলেন, তাঁর মধ্যেও তো বৈজ্ঞানিক পরমাণু-কল্পনার সঙ্গে অবৈজ্ঞানিক অণু-কল্পনার ঐ একই দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত, বিজ্ঞানসাধনার ইতিহাস এই দ্বন্দ্বেরই ইতিহাস, আর তার অগ্রগতিও দ্বান্দ্বিক অগ্রগতি। স্বয়ং ভোল্টার মধ্যেই আবার সেই দ্বন্দ্বই উপচিত হয়ে উঠেছিল। একই মানস-প্রক্রিয়ার মধ্যে ঔৎসুক্য আর অনৌৎসুক্যের দু'টি বিপরীত ধর্মের দু'টি প্রান্ত যেন।

তরুণ বিজ্ঞানী রাইটারের ঘোষণার পর একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই সমুদ্যত হয়ে উঠেছিল,—কোষের মধ্যে উদক্ বিশ্লেষণটি ঘটছে কিভাবে এবং কোথায়? ধাতুদ্বয়ের মধ্যে যদি কোনো একটি বিশেষ ধাতু বা তড়িদ্দ্বারে তা ঘটে থাকে, যেমন ধরা যাক ধন-মেরুতে, তাহলে যে দেখা যাচ্ছে ঋণ (নেগেটিভ) তড়িদ্দ্বারে হাইড্রোজেনের উদ্ভব ঘটছে, তা কি করে সম্ভব হয়? কিভাবে হাইড্রোজেন কোনো বুদ্‌বুদ্ সৃষ্টি না করে উদক ভেদ করে ঋণ তড়িদ্দ্বারে গিয়ে হাজির হয়? লবণ-দ্রবণ-গুলিও কিভাবে বিশ্লিষ্ট হয়ে অ্যাসিড (অম্ল) আর ক্ষারের (অ্যালকালির) উৎপত্তি ঘটায়? পটাসিয়াম সালফেট লবণের দ্রবণকে যখন ঐভাবে বিদ্যুদ্বিশ্লিষ্ট করা যায় তখন দেখা যায় এক তড়িদ্দ্বারে অ্যাসিড এবং অন্য দ্বারে ক্ষারের উৎপত্তি ঘটছে! এমনকি ঐ দ্রবণটি যদি খুব জোরালভাবেই ক্ষারধর্মী হয়, তাহলেও ধনমেরুর আসপাশে অনিবার্যভাবেই অম্ল সৃষ্টি হতে থাকে। একটি কঠিন পরীক্ষাও করে দেখা হল। ঋণ-মেরুকে একটি পটাসিয়াম-সালফেট দ্রবণের পাত্রে এবং ধন-মেরুকে একটি জলপাত্রে নিমজ্জিত রাখা হল। তাদের মধ্যবর্তী স্থানে অন্য একটি জোরাল ক্ষার-দ্রবণের পাত্র স্থাপন করা হল। তারপর তার সঙ্গে দু'দিককার পাত্রের তরলগুলির সংযোগ ঘটিয়ে দেওয়া গেল। দেখা গেল যে মধ্যবর্তী জোরাল ক্ষার-দ্রবণের কঠিন বাধার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেও মুহূর্তের মধ্যেই ধন তড়িদ্দ্বারে সালফিউরিক অ্যাসিডের উদ্ভব হতে আরম্ভ করেছে। বিজ্ঞানীদের সামনে আবার এক দারুণ প্রশ্ন সমুদ্ভূত হয়ে উঠল।

কিন্তু বিজ্ঞানীর চিন্তায় অসমাধেয় বলে কিছু নেই। অনেকেই অনেক তত্ত্ব অনুমান করলেন। তাদের মধ্যে তখন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হল গ্রটাসের (Ch. J. D. von Grotthuss–1785-1822) অনুমানটি। তৎপূর্বে বস্তুর মূল উপাদান সম্বন্ধে লমনসভ্, ল্যাভইসিয়ে তাঁদের কণিকাবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ড্যাল্টনও ১৮০৩ খ্রী. থেকে তাঁর পরমাণু সম্বন্ধীয় গবেষণার কাজ জোর আরম্ভ করে দিয়েছেন। ওদিকে আলোকের তরঙ্গ-গতির সূত্রে পৃথিবীর জল স্থল আকাশ ও সর্ববস্তু পরিব্যাপ্ত মূল পদার্থ হিসাবে ইথার তত্ত্বটিও বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। ১৮০১ খ্রী.-এ ইয়ং (Thomas Young—1773-1829) রয়্যাল সোসাইটির সমক্ষে এ সম্পর্কে একটি তত্ত্ব উপস্থাপিত করে জানালেন যে, দু'টি ভিন্ন উৎস থেকে আগত দু'টি পৃথক তরঙ্গ একই বা প্রায় একই অভিমুখে ধাবিত হয়ে একত্র মিলিত হলে তাদের গতিবেগও একত্র হয়ে একটি মিলিত গতিবেগের সৃষ্টি করে। শব্দ- বা আলো- তরঙ্গের ক্ষেত্রেও এ ব্যাপার ঘটে থাকে। সেজন্য আলোর ক্ষেত্রে ঐ রকম ঘটলে আলোকের রশ্মি তখন তীব্রতর হয়ে চোখে লাগে। ঘটনাটির নাম দেওয়া হল আলোতরঙ্গ-সঙ্গম (interfernce of light)। এ তত্ত্ব দিয়ে ইয়ং অন্য কতক-গুলি বিষয়ের এবং কতকগুলি বিশেষ ধরনের অপবর্তন (পৃ. ৮৬)-জনিত বর্ণ-সমাবেশেরও ব্যাখ্যা দান করলেন। তবে তিনি তাঁর এ তত্ত্বটিকে বিশেষ পরীক্ষা বা যথোপযুক্ত আঙ্কিক গণনার দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। সেটি পেরেছিলেন নর্ম্যাণ্ডিবাসী ফ্রেসনেল (Augustin Jean Fresnel—1788-1827)। ১৮১৫ খ্রী.-এ ইয়ং-এর আবিষ্কারের কথা না জেনেই ফ্রেসনেল ঐ তরঙ্গসঙ্গম তত্ত্বের পুনরাবিষ্কার করেন। কিন্তু আলোর মূল তরঙ্গ-তত্ত্বটিই নিউটনের কণিকাবাদের বিরোধী হওয়ায় তাঁকে প্রথমে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাতে অবশ্য তাঁর উৎসাহ এবং জিদ বেড়েই যায়। তিনি শেষ পর্যন্ত বিশেষ পরীক্ষা ও আঙ্কিক তত্ত্বের সাহায্যে তাঁর মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে বিজয়ী হয়ে উঠেন। তিনি নিশ্চিতভাবে দেখিয়ে দেন যে, আলোকে তরঙ্গ বলে ধরে নিলেও তার সাহায্যে অপবর্তনের আলো-ছায়ার, এবং আলো-রশ্মির অনুমিত সরলরৈখিক পথযাত্রারও ব্যাখ্যা মিলে যায়। সুতরাং হাইজেন্‌সের অনুমান অনুযায়ী আলো-তরঙ্গকে সম্ভব করে তুলবার জন্য তার মাধ্যম হিসাবে সর্বব্যাপ্ত ইথারের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে রইল। ফ্রেসনেল সিদ্ধান্ত করলেন যে, স্থির ইথার সমুদ্রের ঢেউএর উপর দিয়েই আলোকের গতি সম্ভাবিত হয়ে চলেছে।

আলোকের প্রতিসরণ ঘটনার (পৃ. ৮৩) ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য ফ্রেসনেলকে মনে করতে হয়েছিল যে মুক্ত স্থানে বা অস্বচ্ছ পদার্থের মধ্যে এই ইথার স্থিরভাবে

অবস্থান করলেও গতিশীল স্বচ্ছ পদার্থের মধ্যে তাকে গতিশীল থাকতে হয়। তার সেই গতি ঐ পদার্থের প্রতিসরাঙ্কের (refractive index—আপতন-কোণ আর প্রতিসরণ কোণের একটি অনুপাত, দ্র., পৃ. ৮২) সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই চলতে থাকে। কিন্তু কিছুকাল পরেই প্রশ্ন উঠল যে, ইথারের মধ্য দিয়ে ভ্রাম্যমাণ কালো বস্তুর দ্বারা যদি ঐ চতুষ্পার্শ্বস্থ ইথার বস্তুটি আদৌ বিচলিত না হয়, তাহলে তার আণবিক গতি কি করে ইথারের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করতে পারে? এ কারণে ১৮৪৫ খ্রী.-এ কেম্ব্রিজের বিজ্ঞানী স্টোক্স্ (George Gabriel Stokes—1819-1903) ফ্রেসনেলের সিদ্ধান্তকে একটু পরিবর্তিত বা সংশোধন করে নিয়ে অনুমান করলেন যে, ভ্রাম্যমাণ পৃথিবী তার তলসংলগ্ন অঞ্চলের সমগ্র ইথার-সমুদ্রকেই নিজের সঙ্গে টেনে নিয়ে চলেছে। তবে অল্প একটু উপরে ইথার-সমুদ্রের অংশমাত্র আকৃষ্ট হয়, এবং আর একটু উপরে বাস্তবিকই সে সুস্থির হয়ে আছে। ইয়ং-এর মতো স্টোক্সের এই মতও কেবল প্রয়োজন মাফিক ছিল। প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্য দিয়ে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। সুতরাং এ তত্ত্ব খুব নির্ভরযোগ্য না হওয়ায় পদার্থবিদ্‌রা মোটামুটিভাবে মুক্ত অথচ স্থির ইথারের কল্পনার দিকেই ঝুঁকে রইলেন। ইথার-তত্ত্বের যৌবনকাল বোধকরি তখন ফুরিয়ে আসছিল। কিন্তু সে কেবল প্রাচীন বলেই ভার হয়ে টিকে রইল।

ইথার-পরিকল্পনার দ্বারা পার্থিব মূল পদার্থের অনুসন্ধান-সমস্যার কিছুমাত্র সমাধান হয়নি। অথচ ঐ তত্ত্বটি নিজেই কেবল একটি সমস্যা হয়ে আরও বেশ কিছুকাল উদ্যত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল। বরঞ্চ আমাদের পূর্বালোচিত সমস্যাটি সেই তুলনায় ধীরে ধীরে সমাধানের পথে এগিয়ে চলল। ১৮০৫ খ্রী.-এ মাত্র কুড়ি বছর বয়সে গ্রটাস মত প্রকাশ করলেন যে, জলের মধ্যে বিদ্যুৎ এসে পৌঁছলে তার বিদ্যুৎ-মেরুর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। তার ফলে বিদ্যুৎ-তরঙ্গপথে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি যথাক্রমে ধন- ও ঋণ- তড়িদ্দ্বারের দিকে ছুটে যেতে চায়। ঋণ-মেরুটি জলের একটি কণিকা থেকে একটি হাইড্রোজেন-পরমাণুকে আকর্ষণ করে নেয়। বিচ্ছিন্ন অক্সিজেন পরমাণুটি তখন পার্শ্ববর্তী পরমাণুর হাইড্রোজেন নিয়ে তার ক্ষতস্থান পূরণ করে। দ্বিতীয় কণিকাও তার পাশের কণিকা থেকে হাইড্রোজেন হরণ করে। এভাবে শেষ অক্সিজেনটির জন্য অর্থাৎ ধন-মেরুর সংলগ্ন অক্সিজেন-পরমাণুটির জন্য আর জল-কণিকা অবশিষ্ট না থাকায় সেটি ঐ তড়িৎ-মেরুকে অবলম্বন করে গ্যাস হয়ে উড়ে যায়। এভাবেই একটি মোটামুটি নির্ভরযোগ্য তত্ত্ব আবিষ্কৃত হল। কিন্তু স্বয়ং ভোল্টাই এ-সম্পর্কে একেবারে অন্ধ থেকে গেলেন। তিনি নিজে এরূপ পরীক্ষা করেছেন এবং তার বিবরণও লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু তাঁর আবিষ্কৃত

তড়িৎ কোষের এতবড় একটি রাসায়নিক তাৎপর্য সম্বন্ধে তিনি টু শব্দটিও করলেন না। এমন কি, যখন তাঁর সামনে এই প্রশ্নের বিষয় উত্থাপিত করা হল তখন তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন। কিন্তু বলে দিলেন যে, তাঁর বৈদ্যুতিক ব্যাটারির ঐ তো জাদু—তাতে পদার্থ ও রসায়ন উভয় বিদ্যারই চমকপ্রদ ফল প্রত্যক্ষ করা যাবে, তবে পরবর্তী বিষয়টির কোনো প্রাধান্য নাই, ওটা আকস্মিক মাত্র। তাঁর এই অনৌৎসুক্য সত্যই বিস্ময়কর। কিন্তু তাঁর নিজেরই চিন্তাধারা থেকে উদ্ভূত একটি প্রতিপত্তিশালী বৃত্তির সঙ্গে অন্য একটি বিরুদ্ধ অথচ বিনীত বৃত্তির দ্বন্দ্ব উপচিত হয়ে উঠেছিল। তারই প্রতিফলন ঘটল বিজ্ঞানীবৃন্দের সমাজমানসে। সংঘর্ষমুখী দু'টি বিরুদ্ধ দলের সৃষ্টি হয়ে গেল। রসায়নবিদ্‌রা বললেন যে, দ্বিধাতু-সংযোগের তত্ত্বটি কোনো ব্যাখ্যাই না। জারণ বিজারণের (পৃ. ১৮) মত কোনো রাসায়নিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলতেই পারে না। রাসায়নিক ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলেই ওসব প্রবাহও বন্ধ হয়ে যাবে। ওদিকে শুষ্ক ধাতুদ্বয়ের সংযোগেও যে বিদ্যুৎশক্তি বা বিদ্যুৎ-বিভবের উদ্ভব ঘটে,—পদার্থবিদ্‌রা তাঁদের এই যুক্তিকেই আঁকড়ে ধরে বসে রইলেন। কিন্তু তাঁরা বিরুদ্ধবাদীর বিরুদ্ধেও তূনির থেকে শর নিক্ষেপ করতে থাকলেন। তাঁরা বললেন যে রাসায়নিক ক্রিয়ার সঙ্গে বিদ্যুৎ-প্রবাহ শক্তির কোনো সম্পর্ক নাই। কারণ, বিদ্যুৎসৃষ্টি না করেও অনেক জোরাল রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া সুনিষ্পন্ন হয়। আবার ওরকমের অনেক প্রতিক্রিয়াই ঘটে বিদ্যুৎ আবর্তন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেই। এভাবে সমাজের একই বিজ্ঞানমানসের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হল। কিন্তু এ দ্বন্দ্ব বিদ্যুৎ-রসায়ন বিদ্যার অন্তর্গত দ্বন্দ্ব-মিলন মাত্র, বিজ্ঞানমানসের দ্বান্দ্বিক অগ্রগতির শুভ সূচনা।

তাহলে বিদ্যুৎ-রসায়ন প্রক্রিয়ার প্রকৃত ব্যাখ্যাটি কি হবে? রাসায়নিক সংযোগ বা বিশ্লেষণ ঘটে পার্থিব বস্তুসমূহের। তারা যে কণিকাদেহ,—লমনসভ্-ল্যাভইসিয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তা এক রকম নিঃসন্দেহে বলা চলে। ডাল্টনের সমসাময়িক গবেষণাও সেই কথা বলেছে। কিন্তু যে-বিদ্যুতের সাহায্যে তাদের মিলন বিচ্ছেদ সংঘটিত হচ্ছে, তার গড়নটি তাহলে কি রকমের? সেও কি কণিকাদেহ? না হলে কণিকার ওপর তার এমন নিশ্চিত প্রভাব কেন? আর গ্রটাসের কথা ঠিক হলে, কি করেই বা সে এমনভাবে কণিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়ে তাকে ঋণ-ধর্মী ও ধন-ধর্মী করে তুলে, এবং তার ফলে তারা যথাক্রমে ধন-মেরু ও ঋণ-মেরুর দিকে ছুটে যায়? তেলে জলে যে মিশ খায় না, এ তো জানা কথা। আর যদি শেষ পর্যন্ত ঐ বিদ্যুৎ, পরমাণুর মত কণিকাধর্মী হয়ে থাকে, মেন্দেলিয়েভের আবিষ্কার অনুযায়ী যার গুণবিভিন্নতা কেবল তার ভরকে অবলম্বন করেই গড়ে

উঠে, তাহলে সেকি ঐ অবিভাজ্য পরমাণুরও কোনো অংশবিশেষ ? না, অন্য কোনো ক্ষুদ্রতর কণিকা, যার কোনো ভর নাই, পৃথিবীর এক দ্বিতীয় উপাদান ?—এ প্রশ্নটি তখন সম্ভবত এরকম স্পষ্টভাবে বিজ্ঞানীদের মনে উত্থিত হয়নি। মেন্দেলিয়েভের আবিষ্কার পরবর্তী-কালের ঘটনা। কিন্তু মেন্দেলিয়েভ তত্ত্বের জন্ম কোনো আকস্মিক বা পূর্বসূত্রবিহীন হঠাৎ আবির্ভূত বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দীর্ঘকালের বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিবর্তনের মধ্য দিয়েই সে বস্তুটি ক্রম সম্ভাবিত হয়ে শেষে মেন্দেলিয়েভের মানস পটে প্রায় গুণগত পরিবর্তন রূপে নূতন তত্ত্ব হিসাবে জন্মলাভ করতে পেরেছিল। তার প্রমাণ এই যে, উপরি-উক্ত মূল প্রশ্নটি শতাব্দীর প্রারম্ভেই পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিকবৃন্দের মানসসত্তার উপর ক্রমাগত মৃদু আঘাত দিয়ে একরকম যেন তাঁদের অজ্ঞাতেই তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল। আকর্ষণ শক্তি হয়ে ধরা পড়েছিল বাইরের ঐ স্থূল প্রশ্নটি – সংশ্লেষণ বা বিশ্লেষণের শক্তিটি এল কোথা থেকে ? বিদ্যুৎ-শক্তি থেকে, না রাসায়নিক অন্য কোনো শক্তি থেকে ?

গ্রটাসের ব্যাখ্যা ছিল, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তাদের স্বাভাবিক বিদ্যুৎও ধন- ও ঋণ-ধর্মে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু ভোল্টার আবিষ্কারের ফলাফল বেরিয়ে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ১৮০১ থেকে ডেভিও (Sir Humphry Davy—1778-1829) ঐ বিষয় নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে, জলকে বিশ্লেষণ করলে দু'ভাগ আয়তনের হাইড্রোজেন আর এক ভাগ আয়তনের অক্সিজেন পাওয়া যায়। কিন্তু একেবারে বিশুদ্ধ জলকে বিদ্যুদ্বিশ্লেষণ করে দেখা সুকঠিন। কারণ, বিশ্লেষণকালে পাত্র বা আবহাওয়া থেকে তাতে অন্য বস্তু মিশ্রিত হয়ে যায় (এবং এই কারণে পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীরা জলকে বিদ্যুদ্বিশ্লিষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিলেন)। তবে স্বর্ণপাত্রে সে রকমটি হয় না। বিদ্যুদ্বিশ্লেষণের ফলে লবণ দ্রবণ থেকেও যে ক্ষারক (base) আর অম্ল (acid) পাওয়া যায়, তাও ডেভি পরীক্ষা করে দেখলেন। ঐ বিশ্লেষণী শক্তির প্রভাব দেখে তা দিয়ে তিনি সর্বপ্রথম ক্ষার (alkali) বিশ্লেষণেরও চেষ্টা করলেন। সেজন্য তিনি আড়াই শ' জোড়া ধাতব পাত সমন্বিত একটি ব্যাটারি প্রস্তুত করলেন। এর চাইতে শক্তিশালী ব্যাটারি এর আগে প্রস্তুত হয়নি। কিন্তু ডেভি দেখলেন এতেও ক্ষার-বিশ্লেষণ সম্ভব হল না। জোরাল পটাস-দ্রবণ বা শুষ্ক ক্ষারকে গলিত করেও কোনো ফল পাওয়া গেল না। তিনি তখন একটি নূতন পথ ধরলেন। বিশুদ্ধ পটাসকে (K_2CO_3) তিনি একটি অন্তরিত পাত্রের উপর রাখলেন,—খোলা হাওয়াতেই। পাত্রটিকে তিনি ব্যাটারির ঋণ-মেরুর সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। তারপর একটি তার দিয়ে ব্যাটারির ধন-মেরু, এবং ঐ পাত্রস্থ ক্ষারের উপরিতল এই দু'টিকে যুক্ত করে

দিতে আশ্চর্য ফল ফলল। এভাবে ১৮০৭ খ্রী. নাগাত তিনি ঐ ব্যাটারি দিয়েই বিশুদ্ধ পটাসিয়াম ধাতু টেনে বার করলেন। একই বছরে এভাবে সোডিয়াম ধাতুও বেরিয়ে এল। ডেভি তখন এই সব নবাবিষ্কৃত ধাতুর ধর্ম এবং রাসায়নিক সম্পর্ক থেকে নানাবিধ তথ্য খুঁজে বার করলেন। এসব ব্যাপারে জড়িত হয়ে তিনি রাসায়নিক শক্তির বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর পূর্বে কেউ কেউ সংযোগ-বিয়োগ রূপ রাসায়নিক প্রবণতার পশ্চাতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব কল্পনা করেছিলেন। কেউ কেউ আবার দু'টি শক্তির অভেদত্ব কল্পনা করে নিয়েছিলেন। তিনিও প্রথমে রাসায়নিক শক্তির প্রভাব দেখে রসায়ন প্রবণতার (affinity) তত্ত্বের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। কিন্তু শেষে তিনি ইলেক্ট্রোমিটারের সাহায্যে ভোল্টার পরীক্ষাগুলিকে পুনঃপরীক্ষা করে দেখেন এবং তাঁর দ্বিধাতু-সংযোগের তত্ত্বকে স্বীকার করে নেন। সেই তত্ত্বকেই তিনি রাসায়নিক সংযোগের সাধারণ তত্ত্ব হিসাবে বিকশিত করার চেষ্টা করেন। তিনি জানালেন যে, গন্ধকের (S) তুলনায় তামা (Cu) ধন-বিদ্যুৎধর্মী হওয়ায় তাদের যে পার্থক্য থাকে, তাদের ক্রমশ উত্তাপের ফলে তা আরও বেড়ে যায়। শেষে তারা মিলিত হয়ে যখন কপার সালফাইডে (CuS—তামা ও গন্ধকের যৌগিক) পরিণত হয়, তখন বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ হওয়ার জন্য সেখান থেকে কিছুটা উত্তাপ নির্গত হয়ে চলে যায়। তিনি অনুমান করলেন, দু'টি বস্তুর পরমাণু কাছাকাছি এসে পৌঁছলে তারা তাদের বস্তু ধর্মানুযায়ী দু'টি ভিন্নধর্মী বিদ্যুদাধানে আহিত হয়ে পড়ে। শেষে তাদের সংযোগ ঘটলে তারা আধান-নিরপেক্ষ হয়ে যায়। বিদ্যুদ্বিশ্লেষণ ঘটনায় বিদ্যুৎ-প্রবাহের মারফতে এরই পরোক্ষ প্রমাণ মেলে। কারণ, সংযোগের পূর্বে তাদের যে ধরনের আধান থাকে, বিভিন্ন মেরু থেকে তারা সেই ধরনের আধান গ্রহণ করতে পারে বলেই, তারা বিদ্যুদাহিত হয়ে মুক্ত হয় এবং তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়।

ডেভির অনুমান অনুযায়ী, আধানযুক্ত পরমাণুদ্বয়ের পারস্পরিক সংযোগের ফলে বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ যৌগিক গঠিত হয়। তখন পরমাণুগুলি বিদ্যুৎ মুক্ত হয় এবং সে-কারণে কিছুটা উত্তাপ নির্গত হয়ে যায়। অর্থাৎ যে-পরিমাণ বিদ্যুৎ চলে গেল, সে কি তাহলে কিছু পরিমাণ তাপ হয়ে চলে গেল ? অর্থাৎ পরিমাণের বিভিন্নতার জন্য কি তাহলে গুণেরও বিভিন্নতা ঘটে গেল ? বিদ্যুৎ আর উত্তাপের সম্পর্কটি কি তাহলে পরিমাণগত ও গুণগত ? বা পরিমাণগত বলেই গুণগত ? বিদ্যুতের সঙ্গে আলো আর উত্তাপের একটি বহিঃসাদৃশ্য আছে। বাজ পড়া দেখেছে এমন নিরেট বোকা মানুষেও তা' টের পেতে পারে। তাই ফ্রাঙ্কলিন যখন সর্বপ্রথম ইলেক্ট্রিসিটি আর বিদ্যুতের সদৃশ ধর্মগুলি লিপিবদ্ধ করছিলেন, তখন তিনি আলো আর উত্তাপ

দু'টিকেই বিদ্যুতের ধর্ম বা গুণরূপে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু তিনি ঐ বিদ্যুৎ আর উত্তাপের পারস্পরিক রূপান্তরের কথা কল্পনাও করতে পারেননি। স্বয়ং ডেভি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কারণ হিসাবে পরোক্ষভাবে রূপান্তরের কথাই বলে ফেললেন। কিন্তু তাঁর মনেও রাসায়নিক প্রক্রিয়াটির বিষয় প্রধান হয়ে থাকায় তার কারণ নির্দেশকালে সেই কারণের কারণ সম্বন্ধে প্রশ্নটি উঠেছিল কিনা, কিংবা উঠলেও তার প্রকৃতিটি কিরকম ছিল, জানা নেই। কিন্তু এক প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে যে অন্য প্রশ্নটি ঘনায়িত হয়ে উঠতে পারে,তা বেশ বোঝা যায়। অন্তত প্রশ্নটিকে এভাবে একটু স্থূলভঙ্গিতেও উত্থাপিত করা যায়,—তাহলে একই বহুরূপী সত্তা কি প্রকৃতির সুবিশাল রাজত্বের মধ্যে এমনভাবে চিরকাল তাদের রূপ পরিবর্তন করে চলেছে,— কখনো উত্তাপের হাওয়া বইয়ে, কখনো আলোর পতাকা দুলিয়ে, কখনো বা বিদ্যুতের আঁচলা উড়িয়ে? সে সত্তার প্রকৃত রূপটি তাহলে কী? কিছু না বুঝে সুঝে আমরা সাধারণ মানুষ সুচির অতীতের জনসাধারণের মত হয়ত তাকে কোনো এক প্রকার অলৌকিক শক্তি নামে অভিহিত করতে পারি, ঐ যা হোক যেন এক প্রকার অলৌকিকভাবেই সকল প্রকার লৌকিক প্রশ্নকে স্তিমিত করে দিয়ে। কিংবা না হয় ঐ সত্তাটিকে একটি লৌকিক শক্তি বলেই ধরে নিলাম—এই বৈজ্ঞানিক যুগে একেবারে অবৈজ্ঞানিক না হয়ে। কিন্তু তাহলে আমাদের সেই পুরানো মূল প্রশ্নটিই তো আরও প্রবল বিক্রমে উঁচিয়ে আসে। -ঐ শক্তিটি, অর্থাৎ ঐ বিদ্যুৎশক্তিটি না হয় এসে কোনো রকমে পরমাণুকে ভরে রইল, অর্থাৎ পরমাণুর ভরকেই। তারপরও না হয় সে পরমাণুদ্বয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করে তাদের সংযোগ ঘটিয়ে দিয়ে সরে পড়ল। কিন্তু দেখা তো গেল, গেল ঐ উত্তাপটিই। কেন এই রূপ-বদল? কেন ঐ তাপ-ক্ষয়? ওটি কি তাহলে ঐ মধ্যস্থতার আক্কেল সেলামী? না, মধ্যস্থতার পুরস্কারস্বরূপ ঐ নূতন পোশাক? যাই হ'ক না কেন, বর-বধূর মধ্যে না হয় যোগ আছে। কিন্তু তা বলে ঐ লৌকিক মধ্যস্থের সঙ্গে যে লৌকিক পাত্রপাত্রীর কোনও যোগ-সাজশ নাই, তাও বা বলি কি করে? তাহলে ঐ শক্তির বা তেজের সঙ্গেও ভরের যোগ? কিন্তু যোগটি কিরকম, তা তো কিছুতেই ধরা পড়ছে না! এক ভরের সঙ্গে অন্য ভরের, বা এক শক্তির সঙ্গে অন্য শক্তির সেই পরিমাণগত যোগ না কি? যার ফলে গুণগত পরিবর্তন ঘটে যায়? তা যদি হয় তাহলে এ তো বড় সাংঘাতিক কথা যে, ভর আর তেজ দু'টির কোনোটিকেও পার্থিব উপাদান বলা যাবে না। কারণ ঐ দু'টির অন্তরালে থেকে হয়ত সত্যসত্যই কোনো একটি বিশেষ পার্থিব উপাদান ঐ দু'টি মূল রূপ ধরেই সাজ পাল্‌টাচ্ছে। বা, ভর ও তেজকে পার্থিব উপাদান বলতে পারব এই কণ্ডিশানে যে তারা উভয়েই হয়ত

বৈষ্ণব তত্ত্বের মত দুই-এ-এক বা এক-এ-দুই মাফিক এক দ্বৈতাদ্বৈত (দুই হয়েও এক) বা অচিন্ত্যভেদাভেদ (ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও অচিন্তনীয়ভাবেই অভিন্ন) উপাদান-তত্ত্বরূপে বিরাজ করছে ?

প্রথমে প্রশ্নটি যেমন স্থূলভাবে উথাপিত হয়েছিল, তার সমাধানও হল ঐ দ্বৈত তত্ত্বের স্থূল ভঙ্গিতে। গ্রটাস বা ডেভি বিদ্যুৎ রাসায়নিক বিশ্লেষণের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে মূলত ঐ দ্বৈত (দুই ভাব যুক্ত) তত্ত্বের কথাই বলেছিলেন—একটি পরমাণুর দু'টি তড়িৎধর্ম প্রাপ্তির কথা। তাঁরা অবশ্য দ্বৈত তত্ত্বের কথা মুখ ফুটে বলেন নি। কিন্তু ঐ তত্ত্বটি ক্রমে পুষ্পায়িত হয়ে একেবারে দ্বৈত তত্ত্ব হিসাবেই রূপায়িত হয়ে উঠল তাৎকালিক শক্তিমান ও প্রভাবশালী বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াসের হাতে। ১৮২০ খ্রী. এর পর তাঁর সেই তত্ত্বটি একটি সুগঠিত শাস্ত্র হয়ে প্রকাশ পেল। ইতিপূর্বে তিনি বিদ্যুদ্বিশ্লেষণের সাহায্যে অম্ল, ক্ষার, ক্ষারক ও লবণ নিয়ে প্রভূত পরিমাণে গবেষণার কাজ করেছেন। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, চুম্বকের মত প্রত্যেকটি পরমাণুতেই বিদ্যুৎ-আধান বিশিষ্ট দু'টি করে বিপরীত মেরু আছে। কিন্তু তাদের ধর্ম কেবল বিপরীতই নয়, তাদের গুরুত্ব বা শক্তিপরিমাণও ভিন্ন। যেমন দু'টি বিপরীত মেরু থাকা সত্ত্বেও ক্লোরিনে ঋণশক্তি ও ক্ষারে ধনশক্তির প্রাধান্য। অক্সিজেন কিন্তু ব্যতিক্রম, পুরাপুরিই ঋণাত্মক। তিনি অক্সিজেন আর সোডিয়ামকে দু'টি প্রান্তিক উপাদান ধরে নিয়ে তাদের মধ্যেই অন্যান্য উপাদানগুলিকে তাদের ধন আর ঋণ ধর্মানুযায়ী সাজিয়ে গেলেন। হাইড্রোজেন থাকল নিরপেক্ষ স্থানটিতে বা তার কাছাকাছি। অবশ্য শ্রেণীটি হল রাসায়নিকভাবে প্রাপ্ত অন্য একটি বিভব (শক্তি) নির্দেশক শ্রেণী। এই শ্রেণীর দ্বারা দ্বৈত তত্ত্ব বেশ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হল। গন্ধক (সালফার) অক্সিজেনের তুলনায় ধনধর্মবিশিষ্ট বলে উভয়ে মিলে গন্ধকীয় অম্ল (সালফিউরিক অ্যাসিড—H_2SO_4) গঠন করে। তা' বলে যৌগিকটি নিরপেক্ষ হয় না। অক্সিজেনের শক্তিপ্রাধান্য থাকায় তা শেষে ঋণধর্মীই থেকে যায়। কিন্তু এভাবে অক্সিজেনের সঙ্গে ক্যালসিয়াম যুক্ত হয়ে যে যৌগিক (চুন বা lime—CaO) গঠন করে, তাতে ক্যালসিয়ামেরই বিদ্যুৎপ্রাধান্য ঘটে। সেইজন্য সেটি ধন-বৈদ্যুৎ (electro-positive) হয়ে থাকে এবং সহজেই ঋণবিদ্যুৎ-যুক্ত গন্ধকীয় অম্লের (সালফিউরিক অ্যাসিড—H_2SO_4) সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্যালসিয়াম সালফেট নামক লবণ (CaO, SO_3) গঠন করে। তার ধর্ম কিছুটা নিরপেক্ষ হয়ে এলেও পুরাপুরি নয়। কারণ, বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ হলে তা আবার কেমনভাবে নতুন করে প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে ফটকিরির মত দ্বিলবণ [$K_2SO_4.Al_2(SO_4)_3.24H_2O$] সৃষ্টি করে! কিন্তু পটাসিয়াম সায়ানাইড (KCN) প্রভৃতির

মত ত্রিমূল (ternary) যৌগিকগুলিকে তাহলে একটি যুগ্মপ্রকৃতির যৌগিকের সঙ্গে অন্য একটি উপাদানের সংযোগে গঠিত একটি বিশিষ্ট যৌগিক বলে ধরে নিতে হয়। কারণ, কেবল ধন-বৈদ্যুৎ বস্তুর সঙ্গেই ঋণ-বৈদ্যুৎ বস্তুর সংযোগ ঘটতে পারে। সুতরাং শুধু যুগ্মসংযোগ বা যুগ্মমিলনই সম্ভব হয়। তা সে একবার ঘটুক, বা একাধিক বারই ঘটুক না কেন।

বিদ্যুৎ-রসায়ন শক্তির মূল কারণ সম্বন্ধে কিন্তু গ্রটাস বা ডেভির তত্ত্ব অপেক্ষা বার্জেলিয়াস কোনো নতুন কথা না বলে কেবল তাঁদের পূর্ববর্তী তত্ত্বকে একটু ঘুরিয়ে দিলেন মাত্র। কিন্তু তাতে তাঁকে প্রমাদের মধ্যে পড়তে হল। তবে কাজটিকে সত্যিই এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন ফ্যারাডে (Michael Faraday—1791-1867)। ১৮৩৪ খ্রী.-এ তিনি স্থিতি-বিদ্যুৎ আর গ্যালভানীয় বিদ্যুতের একরূপতা প্রমাণের জন্য অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করছিলেন। লিডেন-জার থেকে তিনি বিদ্যুৎ এনেছিলেন। একটি পরিস্রাবক কাগজ (ছাঁকুনি কাগজ—filter paper) ভেদ করে বিদ্যুৎকে যেতে হবে। কাগজটি পটাসিয়াম আয়োডাইড (KI) এবং স্টার্চের ($C_6H_{10}O_5$)x দ্রবণ দিয়ে ভিজান ছিল। কাগজের ওপর যেখানে ধন মেরু যুক্ত ছিল, বিদ্যুৎ-গমনকালে সেখানে একটি নীল কলঙ্ক পড়ল। আচ্ছা তাহলে গ্যালভানীয় বিদ্যুতের সাহায্যে কি ওরকমের নীল দাগ পড়বে? একটি কমজোরী জ্ঞাতশক্তির ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ পাঠালে তাতে কত সময়ই বা লাগবে? নিশ্চয় দু'টি ক্ষেত্রেই বিদ্যুৎ পরিমাণ সমান হতে বাধ্য, বিদ্যুতের শক্তি যে ক্ষেত্রেই যা হক না কেন!— কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যারাডে কাজে লেগে গেলেন। অদ্ভুত নৈপুণ্যের সঙ্গে তিনি বহুবিধ দ্রব্যকে এভাবে বিদ্যুৎ-শক্তির দ্বারা বিশ্লেষণ করলেন। এ ব্যাপারে তিনি একটি বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। বিশ্লেষণের জন্য যে বিদ্যুৎ আনা হচ্ছিল, তা পর পর দুইটি বিশ্লেষণ ঘটিয়ে চলেছিল। এক,—ঐ উপরি-উক্ত বিশ্লেষণ। দুই,— অন্য একটি পাত্রে রক্ষিত লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড (dil. H_2SO_4) দ্রবণ বিশ্লেষণ। এর ফলে একই সময়ে একই পরিমাণ বিদ্যুতের সাহায্যে উৎপন্ন উপাদানের পরিমাণ (প্রথম ক্ষেত্রের) এবং উৎপন্ন হাইড্রোজেনের পরিমাণ (H_2SO_4-এর ক্ষেত্রে) জেনে নেওয়া সম্ভব হল। এভাবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট পরিমাণ হাইড্রোজেন উৎপাদনের (বিশ্লেষণের) জন্য যে বিদ্যুৎ লেগেছে, তাতে তড়িদ্দ্বারে কি পরিমাণ অন্য একটি বিশ্লিষ্ট বস্তু উৎপন্ন হচ্ছে, তা জানা গেল। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ফ্যারাডে দেখতে পেলেন যে, তড়িৎ-মেরুতে উদ্ভূত উপাদানের পরিমাণ বিদ্যুৎ পরিমাণের সঙ্গে অনুপাত রক্ষা করে চলেছে। অর্থাৎ যে পরিমাণে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বাড়ান যায় সেই পরিমাণে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই

একটি বস্তু বিশ্লিষ্ট বা উৎপাদিত হতে থাকে। শুধু তাই নয়। তিনি আরও দেখতে পেলেন যে একই বিদ্যুৎ-পরিমাণ থেকে উদ্ভূত কোনো একটি উপাদানের পরিমাণ তার তুল্যাঙ্ক বা সংযুজ্য ওজনের সঙ্গেও অনুপাত রক্ষা করেই উদ্ভূত হচ্ছে। তাহলে দুটি বস্তুর রাসায়নিক সংযোগটি কেবল বিদ্যুতের ওপরেই নয়, বিদ্যুতের পরিমাণের ওপরেও নির্ভরশীল ?

ফ্যারাডে নিশ্চিত হলেন যে রসায়ন-প্রবণতা এবং বৈদ্যুৎ প্রবণতা এক এবং অভিন্ন। নাহ'লে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই (সংযুজ্য ওজনের অর্থাৎ) রাসায়নিক-সংযোগার্থ নির্দিষ্ট ওজনের উপাদান পেতে গেলে সুনির্দিষ্ট পরিমাণের বিদ্যুতের প্রয়োজন হবে কেন ? সুতরাং যে ব্যাপার নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এত সন্দেহ এত তর্ক উত্থাপিত হয়েছিল, তার সমাধান পাওয়া গেল। অর্থাৎ, রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াটি যদি ব্যাটারির অভ্যন্তরে ঘটতে থাকে, তাহলে গতিবিদ্যুতের উদ্ভব-স্থলও আর অন্য কোথাও নয়, ব্যাটারির অভ্যন্তরস্থ ঐ রাসায়নিক কর্মক্ষেত্রেই। গতিবিদ্যুতের প্রথম তত্ত্ব-নির্ণায়ক স্বয়ং ভোল্টা যে তাঁর দ্বিধাতু-সংযোগ-তত্ত্বের অন্তর্গত আর্দ্র পরিবাহকের অজ্ঞাত ভূমিকা সম্বন্ধে অকপটভাবেই সন্দেহ ঘোষণা করেছিলেন, এতদিনে তার সমাধান ঘটল। আংশিক জ্ঞানই বিজ্ঞানীকে বৃহত্তর সত্যের অভিমুখে ঠেলে দিল। সমগ্র সত্যের অবভাসিত রূপটি ক্রমেই বিলীন হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু সমগ্র সত্যটি কোথায় ? আর কতদূরে ? সে কি "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে ?"—অতি সংগতভাবেই এ এক দার্শনিক জিজ্ঞাসা হতে পারে। এ কিন্তু বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নয়।

পূর্বেই বলেছি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সে-পথ কিন্তু মোটেই সরল নয়, তা দ্বন্দ্বাত্মক। তাৎকালিক রসায়ন-বিজ্ঞানের বৃহৎ-সংগঠক বার্জেলিয়াসের অন্তর্দ্বন্দ্বরূপেই তার পরিচয়। কিছুকাল পূর্বে তিনি দ্বিধাতু-সংযোগ-তত্ত্বের দিকে ঝুঁকেছিলেন এবং সে তত্ত্বের সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছিলেন। ফ্যারাডের আবিষ্কার সে বিশ্বাসের মূলে প্রচণ্ড আঘাত হানল। কারণ, ফ্যারাডের আবিষ্কার থেকে জানা গেল যে, গতি-বিদ্যুতের উদ্ভব (-ক্ষেত্রটি দ্বিধাতু-সংযোগের ক্ষেত্র নয়, তার উদ্ভব) ঘটছে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া-ভূমিতে, অর্থাৎ ব্যাটারির অভ্যন্তরেই। ইতিপূর্বে তিনি গে-লুসাকের প্রাথমিক গ্যাস সংক্রান্ত আয়তন তত্ত্বকে এই বিশ্বাসে মেনে নিয়েছিলেন যে একই উষ্ণতা ও চাপে সমান আয়তনের গ্যাসের পরমাণু সংখ্যা সমান (পৃ. ৩১) থাকে। হাইড্রোজেনের পরমাণুকে একক ধরলে সেই হিসাবে অক্সিজেনের পারমাণবিক ওজন হয় ষোল এবং জলের রাসায়নিক সূত্র (formula) হয় H_2O। কারণ, দু'ভাগ আয়তনের হাইড্রোজেন যখন একভাগ আয়তনের অক্সিজেনের সঙ্গে

যুক্ত হওয়ার ফলেই জলের উৎপত্তি সম্ভব হচ্ছে, তখন জলের একটি অণুতে হাইড্রোজেনের দু'টি এবং অক্সিজেনের একটি পরমাণুই থাকবে। কিন্তু বিদ্যুৎ-সংযোগ পরীক্ষায় ফ্যারাডে দেখলেন যে ৮ গ্রাম অক্সিজেনের সঙ্গে ১-গ্রাম হাইড্রোজেন যুক্ত হতে পারে। তাহলে এক্ষেত্রে অক্সিজেনের পারমাণবিক ওজন দাঁড়ায় ৮, এবং গে-লুসাকের আয়তন-তত্ত্ব সত্ত্বেও জলের সূত্র হয়ে যায় HO। এই যুক্তিতে কার্বন ও ক্যালসিয়াম প্রভৃতি উপাদানের পারমাণবিক ওজনও তাদের অর্ধেক হয়ে যায়। বস্তুত, ১৮১৩ খ্রী.-এ উলাস্টন (William Hyde Wollaston—1766-1828) ঐগুলিকে ওদের সংযুক্ত্য ওজন বলেই ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তখন বার্জেলিয়াসের বিপুল প্রতিপত্তি বশত সে মত দ্বিধাহীনভাবে গৃহীত হতে পারেনি। ফ্যারাডের আবিষ্কারের পর বার্জেলিয়াসের সেই ধারণার মূলেও আঘাত লাগল। তাছাড়া বার্জেলিয়াস-ঘোষিত বিদ্যুৎ-রসায়নের সমগ্র তত্ত্বটিই একটি অনুমানের উপর দাঁড়িয়েছিল। তদনুযায়ী, বিভিন্ন উপাদানের পরমাণুতে চুম্বকের মত বিপরীত বিদ্যুদাধান বিশিষ্ট দুটি পৃথক মেরু বিদ্যমান থাকেই, তাদের শক্তি-পরিমাণ অবশ্য ভিন্ন। ফ্যারাডে কিন্তু স্পষ্টই দেখিয়ে দিলেন যে বিদ্যুৎ-পরিমাণ (পরমাণুর অন্তর্গত) আধান (charge)-পরিমাণের সঙ্গে ত অনুপাত রক্ষা করে চলেই, তাছাড়া কোনও বিশেষ বস্তুর রসায়ন-প্রবণতা যে-বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমূর্ত (রূপপ্রাপ্ত) হয়ে উঠছে সে-বিশ্লেষণটিও একমাত্র ঐ বিদ্যুৎ-প্রবাহের গুরুত্বের উপর নির্ভরশীল। বার্জেলিয়াসের তত্ত্ব ভূমিসাৎ হ'তে চলল। জীবনব্যাপী সাধনা-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে চলেছে দেখে তাঁর মন দ্বন্দ্বসংক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। একদিকে ফ্যারাডে-আবিষ্কৃত নিশ্চিত সত্য, অন্যদিকে প্রবীণ মনের দীর্ঘ-পোষিত ও বহুপ্রশংসিত দৃঢ় ধারণা। তিনি তাঁর নিশ্চিত ধারণাকে যেন কিছুতেই ত্যাগ করতে পারছেন না। বিশেষ করে এই সুযোগে দল-পরিত্যক্ত ডুমাও কিনা তাঁর দ্বৈত-তত্ত্বের পরিবর্তে অন্য তত্ত্ব খাড়া করতে লেগে গিয়েছেন! আর তার দ্বারা তিনি বিজ্ঞানীদের কাছে প্রমাণ করবেন যে, রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় বিদ্যুতের কোনো প্রধান বা প্রাথমিক কাজ নেই! বার্জেলিয়াস তাঁর চিরস্মরণীয় আবিষ্কারগুলির কথা ভুলে গিয়ে কেবল তাঁর দীর্ঘ পোষিত প্রিয় তাত্ত্বিক চিন্তাকে আঁকড়ে ধরতে চেয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণও শুরু করে দিলেন। কিন্তু তাঁর সেই বিতর্ক বিজ্ঞানী সমাজের মধ্যেও যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে সমর্থ হল, তার ভিতর থেকেই পুরাতন ধারণার বদলে নতুন চিন্তার নিশ্চিত অভ্যুত্থানের সমর্থনও মিলে গেল।

বস্তুর গুণাবলী, তার নব নব সন্নিবেশ এবং তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার গোপন রীতি-নীতি পরীক্ষাগারে ক্রমাগতই ধরা পড়ার সাথে সাথে ধারণারও পরিবর্তন ঘটে যেতে লাগল। চিন্তা ও তার প্রকৃতির ক্রমবিবর্তন ঘটতে লাগল। দেখে

শেখার শক্তি কল্পনাবিলাস ও অবিমৃশ্যকারী (হঠকারী) উক্তিকে ক্রমে ক্রমে হটিয়ে দিয়ে সঠিক চিন্তার অভ্যুদয় ঘটিয়ে দিতে লাগল। নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন আরও কিছুটা এগিয়ে এল। ফ্যারাডে তাঁর পরীক্ষা থেকে চিন্তা করলেন যে, বিদ্যুৎ-কোষের মধ্যে কোনো একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে বিশ্লিষ্ট উপাদানগুলির উদ্ভব ঘটিয়ে দিচ্ছে। আবার সেই নির্দিষ্ট পরিমাণটি কোষের বিদ্যুৎ-বর্তনীর (বিদ্যুৎ-কোষের অন্তর্ভাগের রাসায়নিক দ্রব্যের এবং বহির্ভাগের তারের মারফতে বিদ্যুতের আবর্তন ঘটে বলে তাকে আবর্তনী বা বর্তনী বলা চলে) বিদ্যুৎ-পরিমাণের সঙ্গে অদ্ভুতভাবেই অনুপাত রক্ষা করে চলেছে। সুতরাং কোষের বহির্বতনীতে (বাইরের যে তার দিয়ে তড়িদ্দ্বার দুটি সংযুক্ত থাকে) বিদ্যুতের চলার পথে যে বাধা বা রোধজনিত (যান্ত্রিক) ক্রিয়া ঘটে, যার জন্য কিনা ধাতব তারের মধ্যেও রীতিমত উত্তাপের উদ্ভব ঘটে যায়, তা নিশ্চয় ঐ কোষ মধ্যস্থ রাসায়নিক শক্তির দ্বারাই সম্পাদিত হচ্ছে। অর্থাৎ বাইরে যাকে বিদ্যুতের শক্তি মনে হচ্ছে, আসলে সেটি কিন্তু কোষের অন্তঃপুরস্থ ঐ রাসায়নিক প্রবণতার শক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। রান্না ঘরের দরজা পেরিয়ে পুরুষ-পরিবেশক এসে বাইরের ঘরের টেবিলে খাবার দিয়ে গেল বলে সে-ই কিন্তু অন্ন-ব্যঞ্জনের কারক নয়। অন্তঃপুরিকা-নারী হয়েও গৃহিণীই কিন্তু এখানে পরমান্নের বা মিষ্টান্ন-পায়সের কর্তৃকারক। পরিবেশক শুধু ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে দরজা পেরিয়ে যাওয়া আসার অধিকার পেয়েই বাচাল হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, আসল ব্যাপারটি সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য ফ্যারাডে কিন্তু ১৮৩৪খ্রী.-এই দরজাগুলির নাম দিয়ে দিয়েছিলেন তড়িৎ-দ্বার,—অন্তঃপুরে প্রবেশের দরজার নাম পজিটিভ বা ধন-তড়িদ্দ্বার (anode), আর বেরিয়ে আসারটির নাম নেগেটিভ বা ঋণ-তড়িদ্দ্বার (cathode)। তিনি নিজেই কিন্তু হোয়েওয়েলের (Rev. D. D. William Whewell—1794-1866) দ্বারস্থ হয়েছিলেন এই রকম আরও কতকগুলি যুতসই নামের জন্য। ১৮০৫ খ্রী.-এ আবিষ্কৃত গ্রটাসের তত্ত্ব এবং ঠিক তার পরেই স্বীয় গুরু ডেভি কর্তৃক গৃহীত এই একই তত্ত্বকে প্রায় হুবহু মেনে নিয়ে ফ্যারাডেও মনে করেছিলেন, বিদ্যুদ্বিশ্লেষণের সময় যে-বস্তু বিগলিত বা বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়, সেই বিদ্যুদ্বিশ্লেষ্য বস্তুটির এক একটি অংশই বিদ্যুৎ বহন করে নিয়ে যায়। তাদের নামকরণ হল বিদ্যুৎ-বাহী কণিকা বা আয়ন। যেটি ঋণ-তড়িদ্দ্বারের দিকে যায় তার নাম পজিটিভ বা ধনাত্মক আয়ন, বা সংক্ষেপে ক্যাটায়ন (অর্থাৎ cathode-গামী ion)। যেটি ধন তড়িদ্দ্বারের দিকে যায় তার নাম নেগেটিভ বা ঋণাত্মক আয়ন সংক্ষেপে অ্যানায়ন (অর্থাৎ anode-গামী ion)।

এরকম নামকরণের যথেষ্ট সুফলও দেখা দিল। ফ্যারাডের সংস্পর্শে আসার

ফলে তাঁর ঐ বিদ্যুদ্বাহী কণিকার মূল তত্ত্ব গ্রহণ করে ড্যানিয়্যাল (John Frederic Daniell—1790-1845) ১৮৩৬ খ্রী.-এ বিদ্যুৎকোষের উন্নতি বিধান করে এমন এক প্রকার কোষের উদ্ভাবন করলেন যার থেকে আরও স্থায়ীভাবে গতি-বিদ্যুতের প্রবাহ প্রাপ্তি সম্ভব। কপার সালফেট ($CuSo_4$) দ্রবণে স্থাপিত একটি অনুপ্রবেশ্য (porus—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট) সিরামিক সিলিণ্ডারের মধ্যে একটি তামার ও একটি দস্তার তড়িদ্দ্বার দিয়েই এই ড্যানিয়্যাল-কোষটি গঠিত। এরও ক্রমোন্নতির ফলে ১৮৪১ খ্রী.-এ বানসেন(Robert Wilhelm Bunsen—1811-'99) -কোষ, ১৮৬৭ খ্রী.-এ লেকল্যান্স (Georges Leclanche´—1839-'82)-কোষ এবং ১৮৭৩ খ্রী.-এ ক্লার্ক (Latimer Clark)-কোষ উদ্ভাবিত হয়। কিছু পরে র‍্যালে (Lord John William Strutt Rayleigh—1842-1919)-হেল্‌ম্‌হোল্‌জ (Hermann von Helmholtz--1821-'94)-কারহার্ট (Henry S. Carhart) কর্তৃক ঐ ক্লার্ক-কোষের উন্নতি বিধান ঘটলে সেটি তড়িৎচালক বলের (কোষোৎপন্ন তড়িৎমাত্রার বা তড়িৎচালক বলের—electro-motive force—e. m. f.) একটি প্রামাণিক কোষ বলে আন্তর্জাতিকভাবেই গৃহীত হয়ে যায়। কিন্তু ফ্যারাডের ঐ বিদ্যুদ্বাহী কণিকার তত্ত্বের সাহায্যেই ১৮৩৯ খ্রী.-এ ড্যানিয়্যাল দেখিয়ে দিতে পারলেন যে, লবণ সম্বন্ধেও বার্জেলিয়াসের তত্ত্বটি ছিল ভ্রান্ত,—লবণের গঠন ধাতব অক্সাইড (পৃ-১৮) ও অ্যাসিড্ অ্যান্‌হাইড্রাইড দিয়ে নয়। ধাতব বিদ্যুৎ-বাহী কণিকা এবং অ্যাসিড্ বিদ্যুৎ-বাহী কণিকা দিয়েই লবণের দেহ সুগঠিত। হিটর্ফ্ (Johann Wilhelm Hittorf—1824-1914) এ তত্ত্বকে সঠিকভাবে বিকশিত করে তুললেও তখন তা সর্বজনগৃহীত হয়নি। তা হয়েছিল ১৮৮৩ খ্রী.-এ, আর্হেনিয়াস (Svante Arrhenius—1859-1927) যখন তার পূর্ণতা সাধন করে তা প্রকাশ করেছিলেন।

কিন্তু ফ্যারাডের আবিষ্কারের তাৎপর্যটি ফ্যারাডে নিজে যেভাবেই বুঝুন না কেন, সেটি একটি কঠোর সত্যের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিল—প্রাকৃতিক সমগ্রসত্যের উদ্দেশেই। তাঁর গুরু ডেভি (এবং তৎপূর্বে রুমফোর্ড?—Count Benjamin Rumford—1753-1814) দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, যান্ত্রিক ক্রিয়া থেকে উত্তাপের সৃষ্টি হয় এবং সেই উত্তাপই আবার যান্ত্রিক ক্রিয়ার মধ্যে নিজেকে রূপান্তরিত করে দেয়। অর্থাৎ যন্ত্র থেকে উত্তাপ সৃষ্টি হয় এবং উত্তাপও আবার যন্ত্রকে চালিত করে। বিদ্যুৎ যে উত্তাপে রূপান্তরিত হয়ে যায়, সে কথাও ডেভি অনুমান করেছিলেন (পৃ. ১০৯), তা আমরা দেখেছি। এই তত্ত্বকে ভিত্তি করে জুল (James Prescott Joule—1818-'89) ঐ তড়িৎ আর উত্তাপকে সঠিকভাবে

পরিমাপ করলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে ভোল্টীয় কোষে কোনও বস্তুর মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ প্রেরিত হলে যে ভোল্টীয় উত্তাপের সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে বিদ্যুতের আধানযুক্ত পরমাণুর সংখ্যার একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে। রুমফোর্ড আর ডেভি উত্তাপ ও যান্ত্রিক শক্তির সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছিলেন। ডেভি বলেছিলেন বিদ্যুৎ আর উত্তাপের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা। ফ্যারাডে রাসায়নিক শক্তিকেই বিদ্যুতের মূল কারণ বলে নির্দেশিত করেছিলেন। তা'হলে যান্ত্রিক শক্তি, উত্তাপ, বিদ্যুৎ আর রাসায়নিক শক্তি—এরা কি কেবল একই মূল শক্তির পরিবর্তিত রূপ মাত্র? আর তারই সাথে ঐ জুল-কথিত পরমাণু-সংখ্যার সঙ্গেও এমন নিবিড় যোগ? আশ্চর্য! কিন্তু জুল কর্তৃক প্রেরিত বিদ্যুতের পরিমাণ ও তৎসহ তদ্দ্বারা উৎপন্ন ধাতব তারের তাপ প্রভৃতির মাপ-জোখের মধ্য দিয়ে এসব অনুমান ও তত্ত্ব একত্রিত হয়ে একটি পরিপূর্ণ খাঁটি তত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। তার সাহায্যে সত্যিসত্যিই কোষ-প্রক্রিয়ার অন্তর্গত ঐ শক্তিগুলির ও তাদের রূপান্তরিত শক্তিসমূহের পরিমাণগুলিও একেবারে সংখ্যার হিসাবেই প্রকাশ করে দেওয়া যায়। শক্তিগুলির মূল উৎস কিন্তু থেকে যায় ঐ রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াটিই, অর্থাৎ বস্তুর রসায়ন-প্রবণতার শক্তিই। কিন্তু উপরোক্ত আশ্চর্যজনক যোগাযোগ ঘটনাটির সম্বন্ধেও সাক্ষ্য প্রমাণ এগিয়ে এলো। এগিয়ে এলো তারা একই বিজ্ঞানমানস-লোকেরই দেশান্তর হতে।

১৮৪২ খ্রী.-এ জার্মান চিকিৎসক রবার্ট্ মেয়ার (Julius Robert Mayer—1814-'78) গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মানুষের শিরার রক্তকে লাল দেখে অনুমান করেছিলেন যে, উষ্ণাঞ্চলে শরীরের অভ্যন্তরের তেজ-সৃষ্টির জন্য অল্প দহন (less combustion) দরকার; অর্থাৎ সেখানে তাপ-তেজ কম লাগে। এ থেকে তাঁর ধারণা হয় যে জগতে তেজের মোট পরিমাণ সর্বদাই এক। অর্থাৎ তার নূতন করে সৃষ্টি বা বিনাশ নাই। ১৮৪৭ খ্রী.-এ জুলও একেবারে হিসাব কষেই উত্তাপের যান্ত্রিক তেজ-প্রতিরূপকে সংখ্যা দিয়েই প্রকাশ করলেন। আরও অনেকে তেজের ঐ অপরিবর্তনীয়তার কথা চিন্তা করলেন। ১৮৪৭ খ্রী.-এ হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্‌ এ তত্ত্বকে পূর্ণতা দান করলেন। পরে অবশ্য ১৮৬৫ খ্রী.-এ ক্লসিয়াসও (Rudolf J. E. Clausius—1822-'88) জোরের সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে, বিশ্বের মোট তেজ-পরিমাণ সুনির্দিষ্ট। কিন্তু হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্‌ই জানিয়ে দেন যে, তেজ-পরিমাণের অপরিবর্তনীয়তা বিশ্বপ্রকৃতির একটি সার্বজনীন মূল তত্ত্ব। রুমফোর্ড, ডেভি এবং জুলের তত্ত্বানুযায়ী সুপ্ত (স্থৈতিক) বা প্রকাশিত (গতি) সকল প্রকার শক্তিই একেবারে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ উত্তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। শুধু তাই নয়,

যেকোনো তেজরূপই রাসায়নিক-, স্থিতি- বা গতি-বৈদ্যুতিক এবং চৌম্বক-শক্তি রূপেও পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।

লমনসভ-ল্যাভইসিয়ে প্রথম প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, জগতে বস্তুর মোট ভর-পরিমাণ অপরিবর্তনীয়। রুমফোর্ড্-ডেভি থেকে জুল পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফল থেকে জানা গেল, তার মোট তেজ-পরিমাণও সুনির্দিষ্ট। দুটি ক্ষেত্রেই পরিমাণের কথা। অথচ মোটামুটিভাবে এ পর্যন্ত আমরা যা জেনেছি তাতে বলা চলে যে, ভর আর তেজ দু'টিই বস্তুর গুণ বিশেষ। গুণ বলেই এদেরকে নিঃসন্দেহে পার্থিব বস্তু বা উপাদান বলতে পারা যাবে না, অথচ বিজ্ঞানী যখন এদের পরিমাণ সম্বন্ধে প্রমাণ দিচ্ছেন, তখন কি করেও বা বলা যায় যে এরা কোনো বস্তু নয়, কেবল গুণপনা মাত্র? এ যেন সেই যাদুকরের খেলা। আমার হাতে সোনা আর তোমার হাতে কিছুটা রূপো দিয়ে হাত বন্ধ করে রাখতে বলে যাদুকর দু'জনের মাঝখান দিয়ে আকাশে তাঁর যাদু-দণ্ডটি ঘুরিয়ে আনার পর হাত খুলতে বললে দেখা গেল যে তোমার রূপো আমার হাতে আর আমার সোনা তোমার হাতে চলে গিয়েছে; কিন্তু আবার ভাল করে মুঠোর মধ্যে ধরে রাখতে ব'লে যাদু-দণ্ড ঘুরিয়ে এনে তাঁর সোনা রূপা ফেরৎ চাইলে দেখা গেল যে আমার বা তোমার হাতে সোনা বা রূপার চিহ্নমাত্রও নাই। কিন্তু বিজ্ঞানীরা যাদুকর নন, বা যাদুতে ভোলার পাত্রও নন। নিশ্চয় একটি অজ্ঞাত সত্য কোথাও লুকিয়ে আছে, পার্থিব সকল প্রকার বস্তু নিয়েই বিচার বিশ্লেষণ, গবেষণা ও পুনঃপরীক্ষা করে ঐ ভর আর তেজ ছাড়া যখন আর কিছু মিলছে না, তখন একমাত্র ঐ দু'টিকেই পার্থিব উপাদান বলা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। অথচ ওদের ঐ অপূর্ব গুণপনার জন্য তো নিশ্চিতভাবে তা বলাও চলছে না। এ এক বিচিত্র অবস্থা! সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে এসে শেষে কিনা কূলে ঠেকেই ফুটো হয়ে নৌকো ডুবে যাবে? এত সাধ্য সাধনা আর শ্রমময় যাত্রা শেষে গুপ্তধনের ভাণ্ডার দ্বারে হাত লাগাতে গিয়েই হাত থেকে চাবিটা ছিটকে পড়ে যাবে সাগরজলে!

না হয় আর একবার ব্যাপারটি অনুধাবন করা যাক। তেজ-পরিমাণ যখন নির্দিষ্ট বলে প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন সেই পুরানো দ্বিধাতু-সংযোগের তত্ত্বটিকে আর কোনো মতেই টিকিয়ে রাখা চললনা। কারণ, কেবলমাত্র ধাতু-সংযোগ কি করে কাজ করবার অফুরন্ত শক্তির যোগান দেবে, যদি না ইতিমধ্যে কর্মলীন শক্তির জন্মান্তর ঘটিয়ে তাকে আবার ঐ উৎপত্তি স্থলেই টেনে আনা যায়? দেখা গেল ভোল্টার কোষে সেই রূপান্তরকরণটি বেশ সুষ্ঠুভাবেই চলতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও সম্ভবত জোর করে বলা যায় না যে, ধাতুসংযোগ-ক্ষেত্রেই ঐ তড়িৎচালক

বলের উদ্ভব হচ্ছে না। ওয়াল্টার নের্ণ্‌ষ্ট (Walter Nernst—1864-1941) তড়িৎবাহী কণিকার তড়িৎচালক বল সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে তড়িৎচালক বলের (e. m. f.) উদ্ভব-ভূমি এবং রাসায়নিক ক্রিয়ার উদ্ভব-ভূমি একই, এবং সেটি কেবল ধাতুদ্বয়ের সংযোগ-ক্ষেত্র নয়, সেটি ঐ ধাতুদ্বয়ের সঙ্গে তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থটিরও সংযোগ-ক্ষেত্র (অর্থাৎ ঐ ভোল্টীয় কোষটি)। গ্রটাস ভেবেছিলেন যে বিদ্যুৎবিশ্লেষ্য পদার্থের স্বাভাবিক বিদ্যুৎটি তার দুটি বিশ্লিষ্ট অংশের মধ্যে দুই প্রকারের বিদ্যুৎরূপে ভাগ হয়ে যায় (পৃ, ১০৬)। গ্রটাসের পরে ডেভিও অনুমান করেছিলেন, দুটি বস্তুর পরমাণু কাছাকাছি এলে তারা তাদের বস্তুধর্মানুযায়ী ভিন্নধর্মী বিদ্যুদাধানে আহিত হয়। ফ্যারাডেও গ্রটাসের তত্ত্বকে প্রায় পুরোপুরি মেনে নিয়ে বলেছিলেন যে, তড়িৎ-বিশ্লেষণ কালে বিশ্লিষ্ট অংশ দুটিই দু'রকমের তড়িৎ বহন করে বিপরীত তড়িৎ-মেরুর দিকে ছুটে যায়। তিনি ঐ অংশগুলিকে তড়িৎবাহক কণিকা (বা আয়ন) নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল যে, তড়িৎদ্বারদ্বয়ে সঞ্চিত বিদ্যুৎ-পরিমাণ দুটি যখন বস্তুদ্বয়ের রাসায়নিক তুল্যাঙ্কের সঙ্গে অনুপাত রক্ষা করে চলেছে (পৃ. ১১৩), তখন কোষের মধ্যে ধন আর ঋণ বিদ্যুৎকণাগুলির গতিবেগও এক। কিন্তু ১৮৫৩ খ্রী.-এ হিটর্ফ এ নিয়ে গবেষণা করলেন। তিনি এমন কতকগুলি লবণকে বিদ্যুদ্বিশ্লেষ্য হিসাবে বেছে নিলেন, যেগুলি বিশ্লিষ্ট হওয়ার পরে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া মারফতে লবণের সঙ্গে মিশে যাবেনা। এগুলি নিয়ে গবেষণার পরে তিনি জানালেন যে, তড়িৎ-বাহী কণিকাগুলির গতিবেগ এক নয়। উপাদানগুলি দিয়ে যৌগিক গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপের সঙ্গে ঐ বস্তুর তড়িৎ-বিশ্লেষণকালীন তড়িৎ-মাত্রারও কোনো সম্বন্ধ নাই। আর দ্রাবক নয়, বিশ্লেষ্য পদার্থই তড়িৎপ্রবাহ বহন করে নিয়ে চলে। [শত বর্ষ পূর্বে অ্যাবি নোলেও ব্যাপন (অর্থাৎ তরলের সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়ে যাওয়ার)-চাপ সম্পর্কে বলেছিলেন যে ঐ চাপ দ্রাব্য পদার্থের ঘনায়নের উপরই নির্ভর করে, দ্রাবক পদার্থের উপর নয়। পৃ, ১২২-২৩] সুতরাং এক্ষেত্রে ধরা যায় যে, লঘু দ্রবণে বিশ্লেষ্য পদার্থের তড়িৎ-বাহী কণা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তারা দূরে দূরে সরে যায়। তার ফলে দ্রাবকের অণুর সঙ্গে তাদের সংযোগের সম্ভাবনা থাকলেও তাদের পরস্পরের নিজেদের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাটি তার চাইতে আরও কমে আসে। অর্থাৎ গমনাগমনকালে ওরা প্রায়শই মুক্ত ও বাধাহীন হয়ে চলে। কিন্তু হিটর্ফের পূর্বোক্ত তাত্ত্বিক আলোচনার বিরুদ্ধে তখন তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হওয়ায় তাঁর ঐ তত্ত্বটির শেষাংশের পরীক্ষামূলক দিকটির বিষয় একেবারে চাপা পড়ে যায়।

একটু আগে ১৮৫১ খ্রী.-এ উইলিয়ামসন (Alex W. Williamson—1824-1904) মত প্রকাশ করেছিলেন যে, রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে অণু এবং পরমাণু সর্বদাই একটি গতিসাম্য রক্ষা করে চলে এবং অণুগুলি পরমাণু দিয়ে দৃঢ়গঠিত নয়। বরং তাদের মধ্যে পারস্পরিক পরমাণু-বিনিময় চলতে থাকে। বিদ্যুৎ-বিশ্লেষণ নিয়ে গবেষণাকালে ১৮৫৭ খ্রী.-এ ক্লাসিয়াসও জানালেন যে বিদ্যুৎ-বিশ্লেষণ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ঐ মত খুবই উপযোগী। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন যে, তড়িৎচালক বল সম্ভবত সর্বপ্রথম অণুগুলির মাথা এমনভাবে ঘুরিয়ে দেয় যে, ধন-কণিকাগুলি ঋণ-তড়িদ্দ্বারের দিকে এবং ঋণ-কণিকাগুলি ধন-তাড়িদ্দ্বারের দিকে ঘুরে যায়। তারপর ঐ বল অণুমধ্যস্থ দৃঢ়বদ্ধ কণিকাগুলিকে টেনে বার করে দেয়। সুতরাং ঐ বল যদি কণিকাগুলির পারস্পরিক আকর্ষণের চাইতে বেশি না হয়, তাহলে বিচ্ছেদ ঘটবে না। তবে বল বাড়তে থাকলে এক সঙ্গে অনেকগুলি অণুই বিশ্লিষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে, অত্যন্ত কম শক্তির তড়িৎচালক বলও বিশ্লেষণ ঘটিয়ে দেয় এবং তাতে যে কাজ বা তার ফল পাওয়া যায় তা প্রবাহমাত্রার সঙ্গে অনুপাত রক্ষা করেই ঘটতে থাকে। এ কারণে ক্লসিয়াস উইলিয়ামসনের মতের উপর নির্ভর করে পুনঃ সিদ্ধান্ত করলেন যে পরিবাহী দ্রবণের সব কণিকাই তড়িৎ-পরিবহন করে না। কণিকাসমষ্টির মাত্র কিছু অংশই পরিবহন চালিয়ে যায়। সেই তড়িৎ-বাহী কণিকাগুলি নিজেদের সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ বা স্থায়ীভাবে মিলিত হয়ে থাকে না। তাদের কোনো কোনো অংশ তরলের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে ঘুরে বেড়ায়, আর সঙ্গী খুঁজতে থাকে। তড়িৎচালক বল এই বিশ্রস্ত (আয়া) পরমাণুগুলির উপরেই প্রভাব বিস্তার করে প্রাথমিক কাজ আরম্ভ করে দেয়। সেই জন্যই অল্প শক্তিও কার্যকরী হয়। ক্লসিয়াস জানালেন যে, দ্রবণের মধ্যে তাপগতির প্রভাবের বলে অংশাণুগুলি অনিয়মিতভাবে ঘুরে বেড়াতে থাকে। তড়িৎ-বিশ্লেষণের জন্য বিদ্যুৎ-প্রবাহ আরম্ভ হলেই তাদের সেই স্বেচ্ছাবিহার বন্ধ হয়ে যায়। তখন বর্তমান বিদ্যুৎ-চালক বলের উদ্দিষ্ট পথে তাদের একমুখী গতি আরম্ভ হয়। ধন-কণিকা এক মুখে এবং ঋণ-কণিকা তার বিপরীত মুখে চলতে থাকে। পূর্ণাণুগুলির উপর অংশাণুগুলির প্রভাব বশত, এবং পূর্ণাণুগুলির পারস্পরিক প্রভাব বশত এমন শৃঙ্খলার সাথে কাজ চলতে থাকে যে, তার সাহায্যে বিশ্লেষণের কাজ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অংশাণু-গুলিও তাদের গতিশীলতার জন্য বিদ্যুৎপ্রবাহ-পথ অনুসরণ করে চলতে বাধ্য হয়। যে রকম বিশ্লেষণের ফলে অংশাণুগুলি প্রবাহের বিরুদ্ধাচরণ করে চলতে পারে, তা ক্রমাগতই বন্ধ হয়ে আসে। প্রথমে অতি সামান্য বল দিয়েই এ কাজ আরম্ভ হয়। ক্রমে ক্রমে ঝোঁক সৃষ্টি হয়ে বলবৃদ্ধির সঙ্গে সেটিও বেড়ে চলতে থাকে। এভাবে

ক্লসিয়াস তাঁর পূর্বগামী বিজ্ঞানী উইলিয়ামসন এবং হিটফের্র মতবাদের উপর ভিত্তি করে বিদ্যুদ্বিশ্লেষণ তত্ত্ব খাড়া করে তুললেন। প্রায় কুড়ি বছর পরে ১৮৭৬ খ্রী.-এ কোল্‌রস্‌চ্‌ও (Freidrich Kohlrausch—1840-1910) হিটফর্-কল্পিত স্বচ্ছন্দ তড়িৎকণা-বিহারের তত্ত্বটি মেনে নিয়েই সিদ্ধান্ত করলেন যে, যে-কোনো লবণের সঙ্গেই সংবদ্ধ হয়ে থাকুক না কেন, একটি তড়িৎ-বাহী কণার একটি নির্দিষ্ট গতিশক্তি বা আপেক্ষিক গতিবেগ আছে। সকল প্রকার মিশ্রণের মধ্যেই সেই বেগ এক। সুতরাং এই উপাঙ্গ-তড়িৎকণিকার গতিবেগ দেখে তৎসংক্রান্ত নির্দিষ্ট লবণের পরিবাহিতাও হিসাব কষে জানা যেতে পারে। কোলরস্‌চ্‌ অবশ্য তখন একথা বলতে পারেননি যে, তড়িৎপ্রবাহ আরম্ভ হয়ে যাওয়ার পূর্ব থেকেই দ্রবণের মধ্যে অংশাণুগুলি তাদের তড়িৎ-কণিকা নিয়েই একেবারে প্রস্তুত হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁর ঐ তত্ত্বপ্রকাশের অব্যবহিত পরেই প্রকৃতির জগৎ থেকে এমন সব সংবাদ এসে মনীষী-বৃন্দের বিজ্ঞানমানস-বাতায়নে আঘাত করতে লাগল যে পরীক্ষা ও পুনঃ-পরীক্ষাদির মাধ্যমে অচিরে এই রকম সিদ্ধান্তে না আসা ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

কিন্তু সে কথার আগে একবার কল্পনা করা যাক যে কোটি বর্ষ পূর্বে যদি আপেল গাছ তৈরি হয়ে থাকে, নিযুত বর্ষ পূর্বে যদি তার ফলের ভূতল পতন লক্ষ্য করবার জন্য সকল মানুষেরই এক জোড়া করে সাধারণ চর্মচক্ষুর উদ্ভব হয়ে থাকে, আর অযুত বা সহস্র বর্ষ পূর্বে যদি তার ঐ ভূতলপতনের কারণ সম্বন্ধে সন্দেহ করবার মন তৈরি হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সন্দেহ নিরসনের জন্য, এককভাবে হলেও, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে মাত্র তিন শ' বছর আগে, আর সে বুদ্ধি সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে কয়েক শ' বছর লাগছে। সে তুলনায় বিদ্যুদ্বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার তাৎপর্যটিকে বুঝে নেওয়ার জন্য মানবসমাজকে অন্তত শ' দেড়েক বছর না দিলে কেমন করে চলবে? তত্ত্ব আবিষ্কারের পর এখনও তো আশী বছর কাটেনি। কিন্তু অগুণতি বছর যাবৎ যে ঘটনা ঘটে গিয়েছে, তার মধ্যে এতকাল ধরে যে কী অপরূপ সত্যের দ্যুতি লুকিয়েছিল,—অথচ তা আমাদের একেবারে গৃহ প্রাঙ্গণেই, বা তাও বলি কেন, একেবারে গৃহকোণেই লুকিয়ে থেকে তা আমাদের এতকাল যাবৎ আলো দান করেছে,—তা যদি আমরা ইতিপূর্বে কখনও না দে'তে পেয়ে থাকি, তাহলে কি আমরা আমাদের এই আত্মম্ভরি দাম্ভিক আর বৃথা আস্ফালনকারী জাতটিকে অন্ধ না বলে চক্ষুষ্মাণ বলতে পারি? কিন্তু যখন সত্যই সে আলো এসে ঠিকরে পড়ল চোখে, তখন কি তাকে আমরা মহাশিল্পী প্রকৃতির বদান্য অবদান বলে গ্রহণ করবো, না আমাদের সাধনালব্ধ স্বোপার্জিত সম্পদ বলে মাথায় তুলে ধরব?

হয়ত দুইটিই (অঙ্গ-) সত্য হতে পারে। কিন্তু এ জগতে প্রধান ও প্রত্যক্ষ (অঙ্গী-) সত্য হতে হয় একটিকেই। তাহলে কোন্ সত্যটি এখানে প্রধান? লক্ষ বছরের ইতিহাস কিন্তু ঐ বদান্যতার সত্যটিকেই প্রধান বলে প্রতীয়মান করেছে। এই সবে মাত্র কয়েকশ' বছর ধরে মানবের সাধনা আর উপার্জনের সত্যটি ধীরে ধীরে মাথা তুলতে আরম্ভ করেছে। তাই যদি হয়, তাহলে মাতা-প্রকৃতি আর তার মানব-সন্তান, বস্তুবিশ্ব আর তা থেকে উদ্ভূত চেতনা ও সম্যক চেতনা বা বিজ্ঞান চেতনা— এদের মধ্যে ন্যূন হবে কে? বস্তুচেতনাকে যদি বস্তুর চাইতে বড় বলে দাবি করতে হয়, তাহলে তাকে নিয়ে হৈ-চৈ করার আগে, মাতৃদানকে বহুমান্য উপহার হিসাবে গ্রহণ করে সেই চেতনাটিকে অনুভবযোগ্য একটি বিশেষ বস্তুতে পরিণত করে তুলবার দায়িত্ব তো মানব জাতেরই! তাই কি সমগ্র মানবজাতির হয়ে সর্বপ্রথম সে দায়িত্ব মাথায় তুলে নিলেন বিজ্ঞানী-সাধকদলই!

এখন থেকে আশী-নব্বই বছর আগেকার যে সাধনা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করছি, তারও সূত্রপাতটি কিন্তু তাই আমাদের পূর্ববর্ণিত কল্পনা বা চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ঘটে উঠেছিল আরও প্রায় সওয়া শ'বছর আগে, যখন ১৭৪৮খ্রী. -এ অ্যাবি নোলের বিজ্ঞানী চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিল তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের ব্যাপন-ক্রিয়ার (অর্থাৎ সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়ে যাওয়ার) ব্যাপারটি। মানবচক্ষুর সামনেই হাজার হাজার বার এরকম ঘটনা ঘটে গিয়েছে। তারপর এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাও জাগ্রত হয়েছে হয়ত শত শত বার। কিন্তু একটি জিজ্ঞাসার সংবাদই লিপিবদ্ধ হয়ে এসে পৌঁচেছে আমাদের কাছে। আর তাকে আজ আমরা সসম্ভ্রমে গুছিয়ে রেখেছি আমাদের সংগ্রহ শালায়। একেই ত বলি মহিমময় যাত্রার আরম্ভ। অ্যাবি নোলে সেই অভিযানের একজন পতাকাবাহী। পতাকা বহনের যোগ্যতা তাঁর ছিল বৈকি! না হলে, ঝিল্লি (পাতলা অতি সূক্ষ্ম চামড়া) দ্বারা মুখবন্ধ, জলে নিমজ্জিত একটি অ্যালকহল পূর্ণ নলাকৃতি পাত্রে (cylinder) স্বতঃ অনুপ্রবিষ্ট জল যে অ্যালকহল-তরলটিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলার ফলে ঐ তরলটি বিস্ফীত (ফেঁপে ওঠা) ঝিল্লিকে ভেদ করে সবেগে উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত (উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত) হতে আরম্ভ করেছিল, তা দেখে সে সম্বন্ধে তাঁর মনেই বা বিশেষ ঔৎসুক্য জাগ্রত হবে কেন? সেই ঔৎসুক্যের ফলেই ত এখন আমরা জানতে পেরেছি যে, যে-কোনো দ্রবণে দ্রবীভূত বস্তুটি আপনা আপনিই দ্রাবকের সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়ে তার পাত্রের গায়ে ধাক্কা মেরে চাপ সৃষ্টি করে তাকেও বিস্তৃত করে তুলতে চায়। বিস্মিত হয়ে যেতে হয় এই ভেবে যে, জীবজন্তু আর শাকসব্জীর দেহান্তর্গত কোষ-ঝিল্লিগুলিতেই এই ক্ষমতা এমন অদ্ভুত হয়ে উঠেছে যে, তারা তাদের গায়ের ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে বাইরের জল বা তরল

বস্তুটিকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেবে, অথচ তার ভিতরের আর আর দ্রাব্য পদার্থকে কোনো মতেই তা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে দেবেনা। সুতরাং দ্রাবক-পদার্থটি ভিতরে গিয়ে দ্রবণটিকে ফাঁপিয়ে তুললে সেই দ্রবণ চারদিকেই ঝিল্লির গায়ে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। এই চাপই ব্যাপন-চাপ। এটি কিন্তু নির্ভর করে দ্রাব্য-পদার্থের উপর, দ্রাবক-পদার্থের উপর নয়। কারণ, দেখা গেছে যে, দ্রাব্য-পদার্থের প্রকৃতি আর ঘনায়নের উপরই নির্ভর ক'রে এই চাপের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। স্বাভাবিক ঝিল্লিগুলি সম্পূর্ণভাবে অনুপ্রবেশ্য নয় বলে প্রথমের দিকে এই ব্যাপন-চাপের মাপন-প্রণালির উদ্ভাবনটি সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সওয়া শ' বছরের ও পরে ১৮৭৭ খ্রী.-এ যখন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ফেফার (William Pfeffer—1845-1920) নিখুঁত ভাবেই এই চাপকে মাপতে সমর্থ হলেন, তখন আমাদেরই ঘরে প্রকৃতির গোপন আলোটি জ্বলে উঠল আমাদেরই নয়নে।

ফেফার পরীক্ষা করে দেখতে পেলেন যে ব্যাপন-চাপের ক্ষমতা অপরিসীম। কোনো দ্রবণে শতকরা মাত্র একভাগ চিনি থাকলেই সে যে-চাপ সৃষ্টি করতে পারে তা আবহ-চাপের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের সমান। ইট দিয়ে যেমন সৌধ নির্মিত হয়, সেইরূপ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ দিয়ে জীব এবং উদ্ভিদ্-দেহ গঠিত। সেই কোষের অন্তর্গত ক্রিয়াকলাপের দ্বারাই প্রাণীদেহের জীবন বা জৈব প্রক্রিয়া বজায় থাকে। সেই কোষ এবং কোষসমষ্টি জাত কোষ-কলাতে ব্যাপন-চাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অনিবার্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। সেই কারণেই তরুলতার সারাদেহব্যাপী সংবহন-তন্ত্রের ক্রিয়াশীলতা সম্ভব হয়, আর তার ফলেই উদ্ভিদ্-জগতের পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধি ঘটে। শতাব্দীর নবম দশকের গোড়ার দিকে আম্‌স্টার্ডামের (Amsterdam) ডি ভ্রিস (Hugo de Vries) ঝিমিয়ে পড়া উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। বিশুদ্ধ জলে ডুবিয়ে রাখলে গাছগুলি যেন ফুলে উঠতে চায়। কিন্তু উদ্ভিদ-কোষের অন্তর্গত দ্রবণের চাইতে বেশি ঘন দ্রবণের মধ্যে সেগুলিকে ডুবিয়ে রাখলে দ্রবণটি উদ্ভিদ কোষের মধ্যে একটি নিরুদককারী (কোষকে জলহারা করবার) প্রচেষ্টা প্রয়োগ করে। গাছগুলি তাতে শুকিয়ে যায়। কিন্তু ঘনত্বের দিক থেকে ঐ উভয়ের মধ্যবর্তী এক প্রকার সমশক্তির (সমমাত্রার—isotonic) দ্রবণ তৈরি করা সম্ভব। সে দ্রবণ ঐ উদ্ভিদ-কোষকে বারিদান বা নিরুদক কিছুই করেনা। অর্থাৎ ঐরূপ দ্রবণের ব্যাপন-চাপ ঐ কোষের আভ্যন্তরীণ চাপেরই তুল্য। অনেক রকমের লবণ থেকে ডি ভ্রিস এ রকমের কতকগুলি দ্রবণ তৈরি করে দেখতে পেলেন যে সেই সমশক্তিক দ্রবণগুলির শুধু ব্যাপন-চাপই যে এক তা নয়, তাদের হিমাঙ্কও (জমে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উষ্ণতা) একই।

ব্যাপারটি সত্যিই অদ্ভুত। কিন্তু ঘটনাটিও কম আশ্চর্যের নয় যে, ১৮৮৪ খ্রী.-এ ডি ভ্রিস তাঁর এই আবিষ্কারের বিষয়টি এমন এক ব্যক্তির কাছে ব্যক্ত করলেন যিনি মুহূর্তের মধ্যেই বুঝে নিলেন যে কেবল জীববিদ্যার ক্ষেত্রে নয়, পদার্থ ও রসায়নবিদ্যার ক্ষেত্রেও এর তাৎপর্য অপরিসীম। কাল বিলম্ব না করেই ভ্যাণ্ট্ হফ (Jacobus Henricus Van't Hoff—1852-1911) কাজে লেগে গেলেন—খুঁজে দেখবেন দ্রবণের এই ব্যপন-ক্রিয়ার সাথে কেবল তার হিমাঙ্কের নয়, তার বাষ্পচাপ এবং স্ফুটনাঙ্কেরও (ফুটে উঠবার জন্য প্রয়োজনীয় উষ্ণতা) কোনো সম্পর্ক আছে কিনা। দেখতেও পেলেন, সম্পর্কটি নিবিড়। কিন্তু অভাবিতপূর্বভাবেই সরলও। তিনিও বুঝতে পারলেন, তরলে দ্রবীভূত হলে কোনো বস্তুর অণুসমষ্টি ঐ তরল-তলে একটি চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। ঐ বস্তুটি গ্যাসীয় অবস্থাতেও ঐ তরলেরই সম আয়তন যুক্ত স্থানে যে চাপ সৃষ্টি করে, তা ঐ তরল তলের চাপেরই সমগোত্র (analogous)। শুধু তাই নয়, প্রায় সব ক্ষেত্রেই তারা সংখ্যাগতভাবেও সমান। ইতিপূর্বে রাউল (Roult) দেখেছিলেন যে প্রায় সকল লবণের এবং কোনো কোনো অম্লের ও ক্ষারকের হিমাঙ্ক বেশ নিম্নমান। অর্থাৎ তাদেরকে জমিয়ে তুলতে গেলে তাদের উষ্ণতাকে (temperature) যথাসম্ভব নিচে নামিয়ে আনতে হয়। এখন তার কারণটি বোঝা গেল। দ্রবণগুলির ব্যাপন-চাপ খুব বেশি বলেই ঐরূপ হয়। অর্থাৎ তাদের অণু সংখ্যা খুব বেশি। আগে যেমনটি মনে করা হয়েছিল তার চাইতেও ঢের বেশি। ভ্যাণ্ট্ হফ কিন্তু এ ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। পূর্বে গ্যাস সম্বন্ধে বয়্যাল জানিয়েছিলেন (পৃ ১৭) একই উষ্ণতায় (T) কোনো বস্তুর চাপ (P) এবং আয়তনের (V) গুণফল সর্বক্ষেত্রেই ধ্রুব অর্থাৎ স্থির থাকে।

$$PV - Const$$

হফ্ কেবল একে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে লিখলেন :

$$PV = inRT$$

[i = বিশেষ বস্তুর বস্তুধর্মের উপর নির্ভরশীল স্থির সংখ্যা বা ধ্রুবক, n = number বা অণুসংখ্যা এবং r = তথাকথিত গ্যাস-ধ্রুবক] কিন্তু তাহলে সমীকরণটিতে গ্যাসের চাপ, আয়তন প্রভৃতির মান বসিয়ে গেলে এ থেকে বস্তুধর্মের উপর নির্ভরশীল স্থির সংখ্যাটি (i-এর মান) সহজলভ্য হবে। ১৮৮৫ খ্রী-এ সুইডিস্ অ্যাকাডেমি অফ্ সায়্যান্সের কাছে সমীকরণটি উপস্থাপিত হয়ে প্রকাশিত হয়ে যায়।

ঠিক তার আগের বছর ১৮৮৪ খ্রী.-এ আর্হেনিয়াসও ঐ একই প্রতিষ্ঠানের কাছে তাঁর তড়িৎ-বিশ্লেষণ সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপিত করেন। গবেষণাকালে তিনি ক্লসিয়াসের ব্যাখ্যাই (পৃ. ১২০) মেনে নিয়ে সিদ্ধান্ত করলেন

যে, কোনও পরিবাহী দ্রবণে তার কণিকা-সমষ্টির মাত্র কিছু অংশই তড়িৎ-পরিবহন চালিয়ে যায়। তিনি মনে করলেন পরিবাহী দ্রবণের মোট কণিকা-সমষ্টির সঙ্গে ঐ অংশটি অর্থাৎ আসল পরিবাহী-কণিকার সমষ্টিটি সর্বক্ষেত্রেই একটি সম্পর্ক বা নির্দিষ্ট অনুপাত রক্ষা করে চলে। তখন তিনি দ্রবণের অন্যান্য অণুর সঙ্গে এই কণিকাগুলির গুণ-সমন্ধীয় পার্থক্যের বিষয় নিয়ে চিন্তা করেন নি। তিনি শুধু দ্রবণের মোট কণিকা-পরিমাণের সঙ্গে তড়িৎ-বিশ্লেষণে অংশ গ্রহণকারী কণিকা-পরিমাণের যথাযথ সম্পর্ক বা অনুপাতটি স্থির করে দিয়েছিলেন। বা বলা যায়, তিনি এক একটি পরিবাহী-দ্রবণের জন্য এক একটি করে তথাকথিত কার্যকরী সহগ (activity co-efficient) নির্ণয় করে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরের বছর ভ্যাণ্ট্ হফ্ যখন বস্তুধর্মের উপর নির্ভরশীল ধ্রুবকের (i) বিষয় উল্লেখ করলেন তখন ধরা পড়ে গেল যে ঐ ধ্রুবকের সঙ্গে আর্হেনিয়াসের কার্যকরী সহগগুলিও নিশ্চিতভাবেই এক নিবিড় সম্পর্ক বা নিশ্চিত অনুপাত রক্ষা করে চলেছে। অর্থাৎ জানা গেল যে, বিদ্যুৎবাহী কণাগুলিই তাহলে বস্তুধর্মের আসল নির্ণায়ক। প্রকৃতির একটি অমূল্য সম্পদ-ভাণ্ডারের প্রধান চাবিকাঠি শ্রম-তন্ময় তপস্বী বিজ্ঞানীর হাতে এসে পৌঁছল যেন আচমকাই। জানা হয়ে গেল যে, দ্রবণের পরিবাহী-কণিকাযুক্ত অণু সংখ্যাই তার ব্যাপন চাপ, তার পরিবহন-যোগ্যতা, এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে তার রাসায়নিক বস্তুধর্মও নির্ণয় করে দিচ্ছে। অর্থাৎ দ্রবণের পরিবহন-যোগ্যতা ততই বাড়তে থাকবে, যতই বাড়তে থাকবে তার ব্যাপন চাপ, বা প্রকারান্তরে ঐ একই গুরুত্ব বা শক্তি (concentration)-যুক্ত দ্রবণের অণু-সংখ্যা। সুতরাং বিয়োজন (dissociation) কালে এরই ফল প্রত্যক্ষীভূত হয়ে উঠবে।

প্রায় একই কালে সম্পূর্ণ অন্যভাবে চিন্তা করতে করতে অস্ওয়াল্ড্ও (Wilhelm Ostwald—1853-1932) ঠিক একই যুক্তি পেয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি গবেষণা করছিলেন জৈবাম্লগুলির অন্তর্গত রাসায়নিক প্রবণতার ধ্রুবকগুলি (affinity constant) নিয়ে। এর তাৎপর্য এই যে, কোনো অ্যাসিড বা অম্ল যখন একটি অ্যাস্টারের (জৈব যৌগ বিশেষ। যেমন—অ্যামাইল অ্যাসিটেট্, CH_3 $COOC_5H_{11}$ এবং ইথাইল ব্যুটিরেট, C_3H_7 $COOC_2H_5$) উদ্‌বিয়োজন বা উদ্‌ক পৃথকীকরণ ঘটায়, তখন তা দেখে তার অম্ল-শক্তিটি নিরূপণ করে নেওয়া। যে পরিমাণ গতিবেগ নিয়ে ঐ অম্লটি অ্যাস্টার থেকে জল তৈরি করতে পারবে, সেইটিই হবে তার অম্লের শক্তি। অসওয়াল্ড্ও দেখলেন যে তাঁর ঐ রসায়ন-প্রবণতার ধ্রুবকগুলিও আর্হেনিয়াসের পূর্বোক্ত কার্যকরী-সহগের সঙ্গে নির্দিষ্ট সম্পর্ক

বা অনুপাত রক্ষা করে চলেছে। কিন্তু এ কি করে সম্ভব হল? অম্লগুলিতে তো আর বিদ্যুৎ চালনা করা হয়নি যে তড়িৎপ্রবাহ সম্পর্কিত ঐ কার্যকরী সহগগুলির সঙ্গে এদের রসায়ন প্রবণতাও এমন সুসম্পর্ক বা অনুপাত রক্ষা করে চলবে? তা সম্ভব হতে পারে, যদি 'তড়িৎপ্রবাহ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব থেকেই দ্রবণের মধ্যে অংশাণুগুলি তাদের তড়িৎ-কণিকা নিয়েই একেবারে প্রস্তুত হয়ে থাকে'। না হ'লে কি করে ঐ পূর্বপ্রাপ্ত তথ্য বা তত্ত্বগুলি টিকে দাঁড়াবে যে,—দ্রবণের মধ্যে যত বেশি বিদ্যুদ্বাহী কণিকা থাকবে (১) ততই তার পরিবহনযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে, (২) তত বেশি ঐ সকল মুক্ত কণিকা থাকায় তার ব্যাপন-চাপও ততই বাড়বে, এবং (৩) সমস্ত অম্লই উদ্বিয়োজনকে ত্বরান্বিত করে বলে, তাদের সকলেরই অনিবার্য উপাদান হিসাবে হাইড্রোজেন তড়িৎকণার (H^+) আধিক্যই উদ্বিয়োজনের গতিবেগকে ততই বাড়িয়ে তুলবে? এ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই ১৮৮৭ খ্রী.-এ আর্হেনিয়াস বিদ্যুদ্বিয়োজনের তত্ত্বকে পরিণতি দান করেন। তৎসহ তিনি জানালেন যে, (অধিকাংশ লবণের মত) যে জায়গায় বিয়োজন ক্রিয়া প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে, সেক্ষেত্রে সেই দ্রবণের ভৌত ধর্মগুলিও (আপেক্ষিক গুরুত্ব, আয়তন, প্রতিসরাঙ্ক—refractive index, কৈষিকত্ব—capillarity) তার ব্যক্তিগত তড়িৎ-কণাগুলিরই গুণ সমষ্টি মাত্র। লঘু দ্রবণগুলিতে জোরাল অম্ল আর জোরাল ক্ষারকের নিরপেক্ষীকরণের (অম্লভাব ও ক্ষারক-ভাবকে পরস্পর কাটিয়ে দেওয়ার) তাপ (heat of neutralisation) যে কি করে সমান হয়, এতৎসংক্রান্ত জটিল প্রশ্নটিও এ তত্ত্বের সাহায্যে সমাহিত হয়ে গেল। তত্ত্বানুযায়ী আরও জানা গেল যে ঐসব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সাধারণ প্রক্রিয়াটি হল, অম্লের হাইড্রোজেন-তড়িৎকণা (Hydrogen ions—H^+) এবং ক্ষারকের (বা ক্ষারের) উদ্তড়িৎকণা (Oxygen ions—O^-, বা Hydroxyl ions—OH^-) থেকেই জলকণা (H_2O) গঠিত হয়, অথচ অন্যান্য তড়িৎ-কণাগুলি মুক্তই থেকে যায়। সুতরাং সর্বক্ষেত্রেই উদ্ভূত তাপ জলকণা গঠনাত্মক ($H^+ + OH^- \rightleftharpoons H_2O$) তাপের সমানই। তবে অম্ল বা ক্ষারক উভয়েই দুর্বল (less ionised বা অল্পমাত্রায় তড়িৎ-কণিকায় বিশ্লিষ্ট) হলে তাপীয় ফল অবশ্য পৃথক হয়ে যাবে।

তত্ত্ব সম্বন্ধে একটু ভুল বোঝা হতে পারে। সোডিয়াম-ক্লোরাইড্ (NaCl) যৌগিকটি প্রস্তুত করতে খুব তাপ লাগে বলে সেটি একটি সুদৃঢ় যৌগিক। নূতন তত্ত্বানুযায়ী, তারও উপাদানগুলিকে পৃথক করতে হলে তাকেও কেবল জলে মিশিয়ে দিলেই হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, জলে মেশানোর পর, না পাওয়া যায় ক্লোরিনের রঙ্, বা তার উগ্র গন্ধ, না পাওয়া যায় সোডিয়ামের কর্তৃত্বে

জল থেকে উদ্ভূত হাইড্রোজেন। কিন্তু ক্লোরিন তড়িৎকণা আর ক্লোরিন-পরমাণু কি এক জিনিস যে তড়িৎকণা থেকে পরমাণুর গুণাবলী দাবি করলে চলবে? ভুলে গেলে চলবেনা যে, নিরপেক্ষ পরমাণুর সঙ্গে ধন বা ঋণ যে কোনো তড়িৎ-আধান যুক্ত করলেই তবে তা বিদ্যুৎ-কণায় (আয়নে) পরিণত হয়।—ক্রমে ক্রমে অস্‌ওয়াল্‌ড্‌-হফ্‌-আর্হেনিয়াসের মিলিত তত্ত্ব সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করল। এমনকি অচিরেই রঞ্জেন-রশ্মিমূলক পরীক্ষা থেকে এও জানা গেল যে, বারি-বিগলিত হওয়ার পূর্বে দানা জাতীয় বস্তুর মধ্যেও আয়নগুলি (বিদ্যুদ্বাহী কণিকা. পৃ.-১১৫) বেশ সুসমঞ্জসভাবে সাজান থাকে। দেখা গেল যে, তড়িৎ পরিবহন পরিমাপ দিয়ে যেমন জানা গিয়েছিল, তার চাইতেও দ্রবণগুলি নিখুঁতভাবে আয়নায়িত থাকে। তবে লবণগুলি বারি নিমজ্জিত হলে আয়নগুলি ঠিক সাধারণ আয়ন না থেকে জলীয় (hydrated) হয়ে যায়।

শতাব্দী-সমুদ্ভূত প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেল। ক্রমোদ্ভূত সত্যের পতাকাবাহী হিসাবে হয়ত অভিযাত্রীদলের মধ্যে এখানে ওখানে রয়েছেন গ্যালভানি-ভোল্টা, গ্রটাস-ডেভি-ফ্যারাডে, হিটর্ফ-ক্লসিয়াস বা আর্হেনিয়াস। কিন্তু যাঁরা একই সত্যের জয় ঘোষণা করে দল বেঁধে চলেছেন, তাঁরাও বা কম কিসে? ওই ক্যাভেণ্ডিস্‌-ট্রুস্‌টউইজ্‌ক্‌-ডীমান, নিকলসন-কার্লাইল, রাইটার, রুমফোর্ড, উইলিয়ামসন-কোলরস্‌চ্‌, হফ-অস‌ওয়াল্‌ড্‌? কিংবা কেনই বা নাম করবনা নোলে-ফেফার-ডিভ্রিসের, বা ড্যানিয়্যাল-বানসেন-লেকল্যানস্‌ ক্লার্কের, কিংবা এমনকি মেয়ার-জুল-হেল্‌ম্‌হোল্‌জের? আরও বহু ব্যক্তির নাম করা চলে, যাঁরা বিদ্যুৎ শক্তিকে আবিষ্কার করেছেন—রয়্যাল-নিউটন, গ্যারিক-হক্‌স্‌বী গ্রে-দু ফে ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতি। কিংবা কেনই নয় লমনসভ ল্যাভইসিয়ে, ড্যাল্টন-বার্জেলিয়াস-অ্যাভো-গ্যাড্রো থেকে মেন্দেলিয়েভ পর্যন্ত আর আর রাসায়নবিদ্‌ মনীষীবৃন্দ, যাঁরা অণু-পরমাণুর তত্ত্বকে এগিয়ে এনে বিদ্যুৎ তত্ত্বের সঙ্গে যোগ করে দেওয়ার ফলেই ঐ তড়িৎ-রসায়ন শাস্ত্রের সূত্রপাত ও বিকাশ জোরদার হয়ে উঠেছে? কিংবা তাঁদেরও নাম কি না উল্লেখ করে পারা যায়, যাঁরা এই বর্তমান সহস্রকের (১০০১ খ্রী. থেকে ২০০০ খ্রী. পর্যন্ত সহস্র বৎসর) প্রথমার্ধে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক বোধকে জাগ্রত করে দিয়েছেন, আর তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো অভিযাত্রী সুমহান ব্রত উদ্‌যাপনের পুরস্কার হিসাবে পেয়ে গিয়েছেন শুধু বঞ্চনা আর নিগ্রহ, উৎপীড়ন বা মৃত্যুদণ্ড—সেই ব্রুনো-বানিনি-গ্যালিলিও-দেকার্তে, কলম্বাস-ম্যাগেল্লান, ভোলটেয়ার-দিদেরত প্রভৃতি? প্রকৃতির সমগ্রতাকে অনুসন্ধান করে বা'র করবার প্রবুদ্ধ বাসনায় পদার্থবিদ্যা, রসায়নতত্ত্ব এবং জীববিজ্ঞান সব এসে একাকার হয়ে গেল।

ইউরোপ-এসিয়া-আমেরিকার কত বিজ্ঞানী এসে হাত মিলিয়েছেন; তাঁদের ব্যক্তিগত সত্তা উজ্জ্বল থেকেও এক সমগ্র বৈজ্ঞানিক সত্তার অভ্যুদয় ঘটছে। একটি বিস্তীর্ণ অতীতই যেন এক একটি বৃহৎ বা আংশিক সত্য দর্শনের সঙ্গে মুহূর্ত-মাত্র হয়ে গিয়েছে। যেন দেশ-কাল-পাত্রের সকল সীমাবন্ধন লুপ্ত হয়ে গেল। অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাত আর সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে দ্বন্দ্বাত্মক অগ্রগতি ইতিহাস রচনা করে দিল। তারই নাম সত্যসন্ধানের ইতিহাস বা মানব-সভ্যতার ইতিহাস। বা, তাকেই বলতে পারি প্রাকৃতিক বিবর্তনের শ্রেষ্ঠ ও অমৃত ফলরূপে সমুদ্ভূত মানব-সমাজের বিজ্ঞানমানসের মহাসূচনার মহিমময় ইতিহাস।

দ্বিতীয় পর্ব :—

ইতিহাসের গতি প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠল। সেও এক বিচিত্র ইতিহাস। কিন্তু সে আলোচনার পূর্বে ক্ষণতরে দাঁড়িয়ে অন্তত আর কয়েকজনের কথা একটু জেনে নিতে হয়। অর্থাৎ তাঁদের আবিষ্কৃত সত্যের কথা। তাঁদের মানসজগতে একান্ত সংশ্লিষ্টভাবেই সেই সত্যটি উদ্‌বর্তিত হয়ে উঠেছিল চৌম্বক শক্তির বা তড়িৎ-চৌম্বক শক্তির রীতি-নীতি অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে। তারও গৌরবোজ্জ্বল যাত্রারম্ভ ঐ বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের একেবারে শেষ দিক থেকেই। ১৮১৯ খ্রী.-এ ওর্স্টেড্ (Hans Christian Oersted—1777-1851) যখন তৎপূর্ববর্তী ধারণা অনুযায়ী বিদ্যুৎ আর চুম্বকের মধ্যে, বিশেষ করে তাদের মেরুগুলির মধ্যে কি বিশেষ সম্পর্ক আছে, তা খুঁজে বার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তখন থেকেই তার সূচনা। প্রথমে তিনি একটি চুম্বকের কাঁটার ওপর গ্যালভানীয় ব্যাটারির তারকে সমকোণে ধরে রেখে বিশেষ কোনো ফল পান নি। একদিন তাঁর বক্তৃতার শেষে তিনি একরকম প্রায় হঠাৎই কিছু পূর্বে ব্যবহৃত একটি শক্তিমান গ্যালভানীয় ব্যাটারীর তারকে একটি সূচি-চুম্বকের (ফ্রেমে বসান খুব ছোট চুম্বক। যেদিকেই ঘোরান যাক না কেন, তার চুম্বক-কাঁটাটি সর্বদাই উত্তর-দক্ষিণে ঘুরে দাঁড়ায়।) কাঁটার সমান্তরালভাবে ধরে বলে উঠলেন, "তড়িৎপ্রবাহ চলা কালেই এবার তারটিকে চুম্বকের সমান্তরালভাবে ধরে দেখা যাক।" কিন্তু কথানুযায়ী কাজের সঙ্গেই একটি অভাবিতপূর্ব ঘটনা ঘটে গেল। তিনি দেখে বিস্মিত হলেন যে, চুম্বক-সূচির প্রান্তদ্বয় একটি প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে বিপরীত মুখে ঘুরে গিয়ে তারটির সঙ্গে প্রায় সমকোণ করেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর তিনি পুনরায় বললেন, "আচ্ছা, এবার তড়িৎ প্রবাহ মুখটি ঘুরিয়ে ধরা যাক।" তিনি তদনুরূপে তারটি ঘুরিয়ে ধরতেই দেখতে পেলেন যে চুম্বকের কাঁটাটি এবার পূর্ববর্তী গতির বিপরীত ক্রমে

লাফিয়ে ঘুরে গেল।—এভাবেই প্রাকৃতিক জগতের এক মস্ত বড় সত্য আবিষ্কৃত হয়ে গেল, এ রকম আকস্মিকভাবেই। কিন্তু জগতের কোনো ঘটনাই যে আকস্মিক বা অকারণ নয়, আমাদের এই পূর্ব সিদ্ধান্তের সমর্থনে নিউটন প্রসঙ্গে ল্যাগ্রেঞ্জের (J. L. Lagrange) বিখ্যাত উক্তিটির উল্লেখ করতে পারি,—"এ রকম আকস্মিক ঘটনা কেবল বেছে বেছে সেই সব ব্যক্তির কাছেই ধরা দেয়, যাঁরা তাদেরই যোগ্য।" কিংবা পরবর্তীকালে ম্যাক্স্ প্লাঙ্ক্ সম্বন্ধেও লরেঞ্জ যে কথা বলেছিলেন তার উল্লেখ করতে পারি,—এমন প্রেরণাময় ভাবকল্পনার (ideas)) সৌভাগ্য কেবল তাঁদের বেলাতেই দেখা যায় যাঁরা কঠোর শ্রম আর নিবিড় তপস্যা দিয়ে তা অর্জন করে থাকেন।

ওর্স্টেড্ পরে ঐ প্রবাহ আর কাঁটার মধ্যবর্তী স্থলে কাচ, কাঠ, ধাতু, জল, ধুনো (rasin), মাটি, পাথর রেখে রেখে দেখলেন যে, চুম্বকের উপর তড়িৎ প্রবাহের প্রভাব অপ্রতিরোধনীয়। পর বৎসর ১৮২০-তে ফার্সী জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং পদার্থবিদ্ অ্যারাগো (Dominique Francois Jean Arago—1786 1853) দেখলেন যে তড়িৎপ্রবাহ লৌহচূর্ণকেও আকর্ষণ করছে। সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, লৌহদেহ না হলেও তড়িৎপ্রবাহকে চুম্বকই বলতে হবে। এর পর ১৮২১ খ্রী.-এ ডেভি দেখলেন যে, লৌহচূর্ণের ঐ যে আপাতপ্রতীয়মান আকর্ষণ, তার প্রকৃত কারণ কিন্তু অন্য। সে কারণ, তারের বিন্দুগুলিকে কেন্দ্র করে লৌহচূর্ণের পরিধি-সজ্জা। সেই ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি চূর্ণই দ্বি(দুই) মেরুসম্পন্ন হওয়ার ফলে বিপরীত মেরুর আকর্ষণ ক্রমে [দুটি চুম্বকের দুটি ভিন্ন বা বিপরীত জাতীয় মেরু পরস্পরকে কাছে টানে, এবং দুটি সমান বা এক জাতীয় মেরু পরস্পর পরস্পরকে দূরে ঠেলে দেয়—দ্র, পৃ. ৭৭] লৌহচূর্ণগুলি তারের চারদিকে এক একটি করে বৃত্তাকার শৃঙ্খল বা ব্যূহ রচনা করে তুলে। তড়িৎপ্রবাহের এই চৌম্বক শক্তি একটি সমতলের উপরেই সমকোণে প্রভাব বিস্তার করে। তাই দেখে অ্যাম্পিয়ার (André Marie Ampère—1775-1836) তারটিকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে একটি শম্বিল (spiral—একটি গোল দণ্ডের উপর একটি তারকে কাছাকাছি ঘন ঘন জড়িয়ে তার থেকে দণ্ডটি টেনে নিলে শম্বিল প্রস্তুত হয়) তৈরি করলেন। তারপর তিনি সেই তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহ চালিয়ে দেখতে পেলেন যে, শম্বিলের ফাঁপা অংশের মধ্যে একটি চুম্বক দণ্ড ঢুকিয়ে দিলে তার ওপর প্রবাহের প্রভাব বহু গুণ বেড়ে যায়।

ওর্স্টেড চুম্বকের ওপর তড়িৎপ্রবাহের প্রভাব আবিষ্কার করেছিলেন। অ্যাম্পিয়ার আবিষ্কার করলেন একটি তড়িৎপ্রবাহের উপর অন্য তড়িৎপ্রবাহের প্রভাব। তিনি দেখলেন যে বিদ্যুতের গতি একমুখী হলে দুটি প্রবাহবাহী তার

পরস্পরকে আকর্ষণ করে, কিন্তু তারদ্বয়ের মধ্যে প্রবাহ দুটি ভিন্ন মুখে চলতে থাকলে তারদ্বয়ের মধ্যে বিকর্ষণ ঘটে। এতে কোনো কোনো সমালোচক বলেছিলেন, —এ আর নতুন কথা কি, এ তো সেই পুরানো আকর্ষণ-বিকর্ষণেরই ব্যাপার। অ্যাম্পিয়ার জবাব দিয়েছিলেন,—একমুখী সমান্তরাল প্রবাহদ্বয় পরস্পরকে আকর্ষণ করলেও, একধর্মী তড়িৎ কিন্তু পরস্পরকে বিকর্ষণই করে। আর এক ভদ্রলোক বলেছিলেন,—দুটি প্রবাহের প্রত্যেকে একই চুম্বকের ওপর কাজ করলে, তারা নিজেরা পরস্পরের ওপরে কাজ করবে, এটিও কি একটি নতুন কথা না কি? একথা শুনে অ্যারাগো তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে দুটি চাবি বার করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,— দুটির প্রত্যেকেই তো একটি চুম্বককে কাছে টানবে, তাহলে এরাও নিশ্চয় পরস্পরকে কাছে টানবে? - সত্যের প্রতি অবিশ্বাসী নাস্তিকের মুখের মত জবাবই বটে।

কিন্তু তড়িৎ প্রবাহ চুম্বককে কোন্ দিকে ঠেলে দেবে, তার সহজ তত্ত্ব অ্যাম্পিয়ার বলে দিলেন। ফ্যারাডে সেই তত্ত্বকে সম্প্রসারিত করে দেখিয়েছিলেন যে, প্রবাহ আর চুম্বক পরস্পর পরস্পরকে বেষ্টন করতে বা ঘিরে ফেলতে চায়। অ্যাম্পিয়ার আরও মনে করেছিলেন যে, চুম্বকত্বের মূল কারণই তড়িৎপ্রবাহ। চুম্বকের প্রত্যেকটি অণু বা কণিকারই একটি করে বিষুবাঞ্চল (উভয় মেরু থেকে সমদূরবর্তী মধ্যবর্তী অঞ্চল) আছে। সেখান দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলতে থাকে। সেই প্রবাহ-অঞ্চলটিই অণুর মধ্যে দুটি মেরু গঠন করে নেয়। চুম্বকের চুম্বকত্বের অর্থই অণুবৃন্দের প্রবাহকে একযোগে একই অভিমুখে প্রবাহিত করে দেওয়া। ভূ-চুম্বকত্বের কারণও পৃথিবীর তড়িৎপ্রবাহ।

কিন্তু এসব দেখে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, চুম্বক শক্তির সঙ্গে পরিবাহিতার সম্পর্কটি নিবিড়। ডেভি দেখলেন যে একটি ভোল্টীয় কোষের তড়িৎ-বর্তনীর সর্বত্রই একটি সমশক্তির চৌম্বক ধর্ম প্রকাশ পাচ্ছে। এমনকি, বর্তনীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যুৎপরিবহন-শক্তি সমন্বিত কতকগুলি বিভিন্ন ধাতব খণ্ডের একটি শৃঙ্খলকে বর্তনীর অংশ হিসাবে ঢুকিয়ে দিলেও এর ব্যত্যয় (ব্যতিক্রম) ঘটছেনা। তবে উষ্ণতা বাড়লে ধাতব তারের পরিবাহিতা অর্থাৎ বিদ্যুৎকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা কমে যায়, এবং বিদ্যুৎ-শক্তি বাড়ালে তার চুম্বকত্বও বেড়ে যায়। সুতরাং বর্তনীর প্রবাহটি কেবল পরিবাহকের উপর নয়, ব্যাটারির তড়িৎচালক শক্তির উপরও নির্ভরশীল। ব্যাপারটিকে একটি তত্ত্বরূপ দান করলেন ওহ্‌ম্ (Georg Simon Ohm—1789-1854)। তিনি ধাতুসমূহের তুলনামূলক বা আপেক্ষিক পরিবাহিতা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। একই রকমের পুরু বিভিন্ন ধাতব তার নিয়ে তড়িৎ-মাপক যন্ত্রের সাহায্যে তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন যে, তামা, সোনা,

রূপা, দস্তা, পিতল, লোহা, প্ল্যাটিনাম, টিন আর সীসার পরিবহন ক্ষমতা একই রকম হতে পারে, যদি তাদের দৈর্ঘ্য হয় যথাক্রমে ১০০০, ৫৭৪, ৩৫৬, ৩৩৩, ২৮০ ১৭৮, ১৭১, ১৬৮ আর ৯৭ [রূপার ভুল হিসেবটি ওহ্‌ম্ পরে সংশোধন করেছিলেন]। তারপর তিনি একই ধাতুর বিভিন্ন বেধবিশিষ্ট বিভিন্ন তার নিয়ে এও দেখলেন যে তাদেরও পরিবাহিতা একই হতে পারে, যদি তাদের দৈর্ঘ্যকে তাদের ব্যাস বা বেধ (cross section) অনুযায়ী (আনুপাতিক ভাবে) বাড়িয়ে বা কমিয়ে নেওয়া যায়। আবার বেধ ঠিক রেখে একই ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্যের তার নিয়েও তিনি পরীক্ষা করলেন। ১৮২৬ খ্রী.-এর জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি এ রকমের কতকগুলি তারকে তড়িৎ-বহনকারী একটি তারের অংশবিশেষরূপে ব্যবহার করে গ্যালভানোমিটারের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন দিনে তড়িৎপ্রবাহের মাপ নিয়ে একটি সূত্র আবিষ্কার করলেন :

$$X = \frac{a}{b+x}$$

[X=প্রবিষ্ট পরিবাহীর চৌম্বক ফলের গুরুত্ব অর্থাৎ তার প্রবাহের শক্তি, a=তড়িৎ-চালক বল, b=বর্তনীর অন্যাংশে বিদ্যুৎপ্রবাহকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা বা রোধ, x=প্রবিষ্ট পরিবাহীর দৈর্ঘ্য, সুতরাং b+x=বর্তনীর মোট রোধ] অর্থাৎ বোঝা গেল যে, রোধ বাড়ালে প্রবাহ কমে যাবে, এবং চালিকা-শক্তির বৃদ্ধিতে প্রবাহেরও বৃদ্ধি ঘটবে। এভাবে তড়িৎচালক শক্তি, প্রবাহের মাত্রা এবং তড়িৎ-প্রবাহের রোধ সম্বন্ধে ওহ্‌ম্ একটি নিখুঁত তত্ত্ব স্থাপন করলেন।

এ সম্বন্ধে গবেষণার কাজ ক্রমেই এগিয়ে চলল এবং সেজন্য নানাবিধ যন্ত্রপাতিও উদ্ভাবিত হয়ে উন্নত হতে লাগল। বিদ্যুৎপ্রবাহ চলার সময় বিভিন্ন তারের বিভিন্ন পরিবাহিতার জন্য প্রবাহ পথে যে বিভিন্ন প্রকারের বাধা বা রোধ সৃষ্টি হয়, তার পরিমাপক যন্ত্র নির্মিত হল। রিঅস্ট্যাট (rheostat) যন্ত্রের উদ্ভাবন হল—এর সাহায্যে বিশেষ সীমার মধ্যে তড়িৎ-রোধকে বাড়িয়ে কমিয়ে প্রবাহ পরিমাপ করা যায়। একই উদ্দেশ্যে রোধ-বাক্স (resistance box) উদ্ভাবিত হল,—এ আরও ভাল যন্ত্র। তবুও এসব যন্ত্রে নানাবিধ অসুবিধে ছিল। তাই পার্থক্য-নির্ণায়ক (differential) গ্যালভানোমিটার আবিষ্কৃত হল। আর আবিষ্কৃত হল 'হুইট্‌স্টোনের সেতু'। ১৮২০ খ্রী.-এ আবিষ্কৃত গ্যালভানোমিটার বা তড়িৎ-মাপক যন্ত্র নানাভাবে উন্নত হল—দোদুল-শিকল (suspended coil)-গ্যালভানোমিটার (১৮৩৬), স্পর্শক (tangent)-গ্যালভানোমিটার (১৮৩৯), সাইন (Sine)-গ্যালভানোমিটার (১৮৩৯) মুকুর বা আরসি (mirror) গ্যালভানোমিটার। ওদিকে ১৮০৩ খ্রী.-এ রাইটার

যে সঞ্চয়িতা ব্যাটারির বিবরণ দিয়েছিলেন, ক্রমে ক্রমে তারও প্রভূত পরিমাণ উন্নতি সাধিত হল। ১৮৫৯ খ্রী.-এ ঐ বিদ্যুৎ সঞ্চয়নের জন্য একপ্রকার সঞ্চয়িতা বা দ্বৈতীয়িক (secondary) ব্যাটারির উদ্ভাবন করা হল,—এর তড়িৎচালক বল হল পূর্ববর্তী ব্যাটারিগুলির চাইতে অনেক বেশি। পরে ১৮৮১ খ্রী.-এ এই ব্যাটারির একটি বিশেষ ত্রুটি দূর করায় এ কোষের শক্তি, ব্যবহারিক প্রয়োজন এবং ব্যবসায়িক উপযোগিতা আরও বেড়ে যায়।

কিন্তু একটি জিনিস না উল্লেখ করে পারা যায়না যে, এসব যন্ত্রপাতি মানুষই ক্রমে ক্রমে উদ্ভাবন করে নিয়েছে। প্রকৃতির বিধি বিধান সম্বন্ধে মানুষ তার অনুমিত তত্ত্বগুলিকে প্রমাণ করবার জন্য এবং ঐ প্রমাণিত তত্ত্ব দিয়ে তার নিজ প্রয়োজনগুলি মিটিয়ে নেওয়ার জন্যই সে এইসব যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছে। আসলে যে-বিজ্ঞানমানসের কাছে প্রাকৃতিক সত্যগুলি একে একে ধরা দিয়েছিল, সেই বিজ্ঞানমানসই ঐ যন্ত্রগুলিকে বানিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফলে যে-মানুষ ও তার যে বিজ্ঞান চেতনার অভ্যুদয় ঘটেছে, সেই মানুষ বা তার বিজ্ঞানচেতনাই আবার জাগতিক বস্তুর নব-সন্নিবেশ ঘটিয়ে তার প্রয়োজনীয় এমন সব বস্তু বা যন্ত্র তৈরি করে নিয়েছে, যাদের দিয়ে সে তার স্বার্থ বা অভীষ্ট সিদ্ধ করে নিতে পারবে। মানুষ যন্ত্র বানাচ্ছে, এর অর্থই তাই হল উদ্ভূত মানুষ উদ্ভাবন করেছে। অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে যে মানুষের উদ্ভব ঘটেছে, সেই মানুষের চেতনা বা চিন্তা বা প্রকৃতিই পার্থিবপ্রকৃতির অর্থাৎ বস্তুপ্রকৃতির উপর হস্তক্ষেপ করে তাকে দিয়ে নিজের কাজ সেরে নিচ্ছে। মানবচেতনা বা মানবপ্রজ্ঞার মহিমা এইখানেই; এর বেশি কিছুতে নয়। কারণ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুমিত-তত্ত্বকে যাচাই করার প্রক্রিয়ায় বা প্রকৃতি-পরিবর্তন প্রযত্নের প্রক্রিয়ায় মানুষ এমন সব নূতন তত্ত্ব বা সত্যের সন্ধান পেয়ে যাচ্ছে যার ফলে তার নিজের পূর্ববর্তী ধারণাও পাল্টে যাচ্ছে। বয়্যাল, ড্যাল্টন, গ্যালভানি, ভোল্টা, ডেভি প্রভৃতির মত যে সকল বিজ্ঞানীকে আমরা মানবপ্রজ্ঞার প্রতিভূ হিসাবে গ্রহণ করতে পারি, প্রাকৃতিক সত্যানুসন্ধানের প্রক্রিয়ায় তাঁদের বহু ধারণা এমনকি আবিষ্কৃত তত্ত্বও, পরবর্তী কালে অন্য তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে বর্জিত, বর্ধিত বা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এক একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় তার সাহায্যে প্রাকৃতিক জগতের এমন সব তথ্য ধরা পড়ে গেছে যে, সমগ্র চিন্তাজগতের মূল পর্যন্ত আলোড়িত হয়ে উঠেছে। পূর্ব ধারণাকে বদলে নিতে হয়েছে, মানবচেতনার পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। সুতরাং একথা বলা চলে যে, মানুষ যেমন তার চেতনা দিয়ে প্রকৃতির রূপান্তর ঘটিয়ে দিচ্ছে, সেই রূপান্তরকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে সে নিজেও, অর্থাৎ তার চেতনাও, রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু তাই বলে এতে তার মহিমা বিন্দুমাত্রও ম্লান হয়ে যাচ্ছেনা। এখনও পর্যন্ত যে তার চেতনা সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ামক হতে পারেনি, এটা তার অগৌরবের নয়। কিন্তু সে যে প্রকৃতির ওপরেও প্রভুত্ব বিস্তার করে তার স্বীয় অধিষ্ঠান ক্ষেত্রে আজ সম্রাট হতে চলেছে, এটি তার পরম গৌরবের। আবিষ্কার আর অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে তার ধারণা চেতনা বা অন্তঃপ্রকৃতির পরিবর্তন নিশ্চয়ই ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু সেও ধীরে ধীরে বহিঃপ্রকৃতিকে পরিবর্তিত করে চলেছে। একদিকে সে যতই অধীন হক, অন্যদিকে সে স্বাধীনও—ঠিক ঐ জগৎবিধৃত চুম্বক বা বিদ্যুৎমেরুর মতই। পজিটিভ (ধন বা পূরক) আর নেগেটিভ (ঋণ বা পূরণীয়)—উভয়ে উভয়ের বশ্যতা স্বীকারের জন্য চির উৎসুক প্রয়াসী। কিন্তু তাদের আত্মবিলোপের কোনো সম্ভাবনা নাই। চির স্বাধীন তারা। এই বশ্যতা ও স্বাধীনতার ইতিহাসই বিশ্বের ইতিহাস। অপরিবর্তনীয় এই প্রবাহ। এ না হ'লে প্রকৃতির মধ্যে পরম সত্য যে গতি বা প্রকৃতি, তারই উজ্জীবন অসম্ভব হয়ে ওঠে। সেই প্রগতির মূল তত্ত্ব বা প্রাণই এই দুই এর চিরদ্বন্দ্ব ও চির-মিলন প্রচেষ্টা। দ্বন্দ্ব আর মিলন সেখানে একই প্রক্রিয়ার দুটি অনিবার্য অবিচ্ছেদ্য ক্রিয়া শুধু। গতির অর্থই অন্যের তুলনায় অগ্রগতি, যেন অন্যের উপর পদস্থাপন করেই এগিয়ে যাওয়া। অথচ যতক্ষণ ঐ স্থাপনা ততক্ষণ তো স্থিতিই, অর্থাৎ উভয়ের মিলন ; কিন্তু ঐ মিলনের কাল কারণটিও তো গতি! তাই এমন মিলন-নির্ভর দ্বন্দ্বাত্মক অগ্রগতি! আর তাই ঐ গতিবান প্রকৃতিও তার সামগ্রিক প্রকৃতি বা অস্তিত্বের জন্যই দ্বৈতসত্ত্ব হতে বাধ্য। বৃহৎ-প্রকৃতি থেকে ক্রমোদ্ভূত হয়ে চলেছে বৃহৎ-মানবসত্তা। তাই বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে তাকে পরাভূত করে বৃহৎ-মানবসত্তাটি যখন এগিয়ে চলে, তখন তার সেই এগিয়ে যাওয়াটি হবে সমগ্রপ্রকৃতিরই এগিয়ে যাওয়া। তাই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই বশ্যতা স্বাধীনতার সম্পর্কটি মানুষের মহিমাকেই উজ্জ্বল ও অম্লান করে রেখেছে। বিজ্ঞানীর ঐ তত্ত্ব বা যন্ত্রাদি আবিষ্কার রূপ ঘটনাগুলিই সেই জয়ধ্বজা হয়ে সেই মাহাত্ম্যকে ঘোষণা করে দিচ্ছে। উল্লিখিত ঐ আবিষ্কারগুলি এবং আরও অসংখ্যবিধ আবিষ্কারই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, উনবিংশ শতাব্দীতে এসে মানবসমাজ তার নিশ্চিত অগ্রগতির জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে, তার সেই গতিই হবে প্রকৃতি-বিবর্তন প্রক্রিয়ারও বিপুল অগ্রগতি।

পরীক্ষা চলল, আবিষ্কার চলল। জীবতত্ত্ব ও রসায়নতত্ত্বাদির মত পদার্থতত্ত্বের ক্ষেত্রেও। বিদ্যুৎতত্ত্বের মত চুম্বকতত্ত্বেরও। ওর্স্টেডের গবেষণাকে উলাস্টন আরও এগিয়ে দিলেন। ১৮২০-তে ওর্স্টেড্ দেখেছিলেন তড়িৎপ্রবাহকে কাছে আনতেই যেন তারই ধাক্কা খেয়ে চুম্বক-সূচি নড়ে সরে গেল। উলাস্টন ভাবলেন, তড়িৎ-

প্রবাহের বিশেষ সন্নিবেশ দিয়ে এই নড়নটিকে স্থায়ী করা যায়না? যাতে করে ঐ সূচিটি ক্রমাগত ঘুরতে থাকবে বিদ্যুৎপ্রবাহের ক্রমাগত ধাক্কা খেতে খেতে? ১৮২১ খ্রী-এ রয়্যাল ইন্স্টিটিউটে বসে তিনি ডেভির সামনে সেই পরীক্ষাই করলেন। চুম্বকের চতুষ্পার্শ্বে ঘূর্ণায়মাণ তড়িৎপ্রবাহের মধ্যেও নিশ্চয় কিছু বিপরীত ফল ফলবে —এরকমও তাঁর আশা ছিল। কিন্তু তাঁর পরীক্ষা সফল হয়নি। তবে ওর্স্টেডের আবিষ্কার বা তাঁর সত্যদর্শন, অর্থাৎ প্রকৃতির অন্তঃপুরস্থ বিদ্যুৎ চুম্বকের গোপন প্রণয়লীলা সন্দর্শন থেকে উলাস্টনের মনে যে কৌতূহল জেগে উঠেছিল, তার নিরসন ঘটিয়ে দিলেন মনীষী ফ্যারাডে। ঐ বছরেই বড় দিনের প্রভাত উৎসবের অনুষ্ঠান হল সেই ঘটনা দিয়েই—পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম ঘটিয়ে তোলা সেই ঘটনা দিয়ে। ফ্যারাডে তাঁর পত্নীকে দেখিয়ে দিলেন, তড়িৎপ্রবাহের চতুষ্পার্শ্বে

একটি চুম্বক শলাকা অবিরাম গতিতে তাকে পরিক্রমা করে চলেছে। খুবই সোজা পরীক্ষা—পাত্রের পারদে চুম্বক-শলাকা খাড়াভাবে ডুবে রয়েছে, তলা থেকে একটু উপরে। একটি ছোট্ট সূত্রখণ্ডের একপ্রান্ত পাত্রের তলদেশে এবং অন্য প্রান্ত খাড়াভাবে অবস্থিত চুম্বক-দণ্ডের নিম্ন প্রান্তের সঙ্গে বাঁধা। তড়িৎপ্রবাহবাহী তারটিকে খাড়াভাবেই শলাকার ঊর্ধ্ব ও মুক্তপ্রান্তের কাছে আনা মাত্রে ঐ মুক্তপ্রান্তটি প্রবাহের চারদিকে ঘুরতে লাগল। বস্তুতপক্ষে ওর্স্টেড্ যে সত্যকে দেখতে পেয়েছিলেন, এই পরীক্ষার দ্বারা একদিকে যেমন তার সম্বন্ধে সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল, অন্যদিকে তেমনি সেই সত্যকে প্রয়োগ করে তার কার্যকরী পথের সন্ধানও মিলে গেল।

আগের বছর ১৮২০-তে অ্যারাগো এবং অ্যাম্পিয়ার ইস্পাতের কতকগুলি সূচকে বিদ্যুৎপ্রবাহবাহী একটি আবর্তকুণ্ডলীর মধ্যে ধরে রাখতেই দেখতে পেয়েছিলেন যে সেগুলি চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হল। ১৮২৫ খ্রী. এ স্টার্জিঅন (William Sturgeon—1783-1850) এই প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করে যে তড়িৎ চুম্বক তৈরি করলেন সেটি নয় পাউণ্ড (স্বীয় ওজনের প্রায় কুড়ি গুণ) ওজনযুক্ত ভরকে টেনে তুলে ধরতে পারে। তিনি কিন্তু ইস্পাতের বদলে কোমল লোহার ব্যবহার করেছিলেন এবং লোহাটিকে বেঁকিয়ে অশ্বক্ষুরাকৃতি (ঘোড়ার পায়ে পরানো নালের মত) করে তাকে অন্তরিত করার জন্য সেটিকে বার্নিশ করে নিয়েছিলেন। একটি অনাবৃত তামার তার দিয়ে সেটিকে জড়ান হয়েছিল, আবর্তগুচ্ছটি ছিল ১৮ পাকের একটি মাত্র স্তর। আর তড়িৎ আনা হয়েছিল তামা ও দস্তাযুক্ত একটি সাধারণ তড়িৎকোষ থেকে। আশ্চর্যের বিষয় হয়েছিল যে, প্রবাহ চালনা করতেই লোহাটি

শক্তিমান চুম্বকে পরিণত হল। কিন্তু প্রবাহ বন্ধ করা মাত্রেই তার চুম্বকত্ব অন্তর্হিত হয়ে গেল। এর পর অধ্যাপক মোল (Moll) যে-অশ্বক্ষুরাকৃতি তড়িৎ চুম্বক তৈরি করলেন, তা দিয়ে ১৫৪ পাউণ্ড্ ভার তোলা সম্ভব হল। আমেরিকার অ্যালবানি-বাসী যোসেফ হেনরি (Joseph Henry—1799-1878) এর প্রভূত উন্নতি সাধন করলেন। লোহাকে বার্নিশ না করে তিনি তারটিকেই রেশমি সুতা দিয়ে জড়িয়ে নিলেন এবং ১৮ পাকের বদলে প্রথমে ৪০০ পাক জড়িয়ে ১৮২৯ এর মার্চ্ মাসে একটি শক্তিশালী বিদ্যুৎ-চুম্বক তৈরি করলেন। তারপর তিনি তড়িৎ-চুম্বক নিয়েই নানাবিধ গবেষণা চালিয়ে এ যন্ত্রকে আরও যথেষ্ট শক্তিমান করে তুললেন। কিন্তু ঐ ১৮২৯ খ্রী.-এর আগস্ট্ মাসে তিনি যখন ঐ গবেষণার কাজ করছিলেন, তখন একদিন হঠাৎ প্রবাহবাহী আবর্তগুচ্ছের (কুণ্ডলের) তারের এক জায়গায় ছিঁড়ে যাওয়ায় তিনি দেখতে পেলেন যে সেখান থেকে একটি বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে গেল। "প্রকৃতি যেন মুহূর্তের জন্য ঘোমটা খুলে তাঁকে আকৃষ্ট করে টেনে নিয়ে গেল আর একদিকে।" তিনি তাঁর সুযোগ মত এ নিয়ে গবেষণা করলেন এবং ১৮৩২ খ্রী.-এ তাঁর গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করলেন। কিন্তু তড়িৎশক্তির এই প্রকৃতির মূল মর্মটি তখনও ঠিক স্পষ্ট হয়ে উঠল না। সেটি হল আরও কিছুকাল পরে। ফ্যারাডে এর মূল তত্ত্ব আবিষ্কার করে তা প্রমাণ করে দিলেন।

হেনরি ভেবেছিলেন তড়িৎশক্তি যদি চুম্বকশক্তির জন্মদান করতে পারে, তাহলে চুম্বকশক্তিও হয়ত তড়িৎ সৃষ্টি করতে পারবে। এ নিয়ে গবেষণা করতে করতে ১৮৩০ খ্রী.-এ তিনি একটি জিনিস প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি একটি লৌহ (চুম্বক) দণ্ড (আর্মেচার) নিয়েছিলেন। তার মাঝামাঝি কিছু অংশে তামার তার জড়ান ছিল এবং তার মুক্ত প্রান্তদ্বয় একটি অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বকের বাহুদ্বয়ের উপর সন্নিবিষ্ট ছিল। তারের প্রান্তদ্বয়কে বেশ কিছুটা দূরাবস্থিত একটি বিদ্যুৎমাপক যন্ত্র বা গ্যালভানো-মিটারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। ব্যাটারি থেকে নিয়ে আসা প্রবাহের সাহায্যে পূর্বোক্ত বাহুদ্বয়কে যেই চুম্বকায়িত করা হল, অমনি গ্যালভানোমিটারের কাঁটা সামান্যভাবে নড়ে উঠে পুনরায় পূর্বস্থানে এসে স্থির হয়ে গেল। বোঝা গেল যে, স্থাপিত লৌহদণ্ডটিতে চুম্বকশক্তির আগমনে তাতে জড়ানো তারটিতেও বিদ্যুৎশক্তির আগমন ঘটেছে। তারপর প্রবাহ বন্ধ করে ঐ চুম্বকত্ব ঘুচিয়ে দিলেও দেখা গেল যে, মিটারের কাঁটাটি আবার বিপরীত মুখে সামান্য নড়ে গিয়ে পুনরায় পূর্বস্থানে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল। হেনরি বুঝলেন যে, চুম্বকও বিদ্যুৎ সৃষ্টি করতে সমর্থ। কিন্তু এ ব্যাপারেও ফ্যারাডে ঠিক এই সময়ে স্বাধীনভাবে গবেষণা করে তাঁর সিদ্ধান্ত প্রকাশ

করলেন। এসব ঘটনার অনেক পূর্ব থেকেই ফ্যারাডের জানা ছিল যে, কোনো তড়িদাহিত বস্তু অন্য একটি তড়িদ্‌বিহীন বস্তুকে প্রভাবিত করতে পারে। সুতরাং বহু পূর্বেই বিজ্ঞানীর মনে আর এক বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন জেগেছিল : তাহলে প্রবাহবাহী একটি তার কি অন্য একটি বিচ্ছিন্ন তারের মধ্যেও প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারে? ১৮২৫ খ্রী.-এ তিনি একটি প্রবাহবাহী তারকে একটি বিচ্ছিন্ন তারের কাছে এনে পরীক্ষা করছিলেন। এই শেষোক্ত তারটি কিন্তু একটি গ্যালভানোমিটারের সঙ্গে সংযুক্ত করা ছিল, যাতে এর মধ্যে প্রবাহ সৃষ্টি হলেই তড়িৎমাপক যন্ত্রে তা ধরা পড়ে। ফ্যারাডে দেখলেন প্রবাহবাহী তারকে বিচ্ছিন্ন তারের কাছে আনাতে মিটারের কাঁটা ঘুরলনা। কিন্তু তিনি দমলেননা। তিন বছর পরে ১৮২৮ খ্রী-এ তিনি আবার পরীক্ষা করলেন এবং এবারেও তিনি বিফল হলেন। আবার তিন বছর পরে তিনি অন্য পথ ধরলেন। ১৮৩১ খ্রী.-এর আগস্ট মাসে তিনি আর একটি পরীক্ষা করলেন। একটি কোমল লোহার আংটার অর্ধেক অংশ একটি তার দিয়ে জড়িয়ে একটি আবর্তগুচ্ছ সৃষ্টি করলেন। দু'দিকে সামান্য একটু করে ব্যবধানে বাকি অর্ধেকটিতেও আর একটি তারের পৃথক আবর্তগুচ্ছ। একটি তারকে গ্যালভানোমিটারের সঙ্গে এবং অন্যটিকে একটি বহু কোষযুক্ত শক্তিমান ব্যাটারির সঙ্গে যুক্ত করা হল। এই শেষোক্ত তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহ পাঠান মাত্রেই মিটারের কাঁটা নড়ে উঠল। কিন্তু একটু নড়েই সে আবার তার পূর্বস্থানেই এসে দাঁড়াল। প্রবাহ বন্ধ করার সময়ও
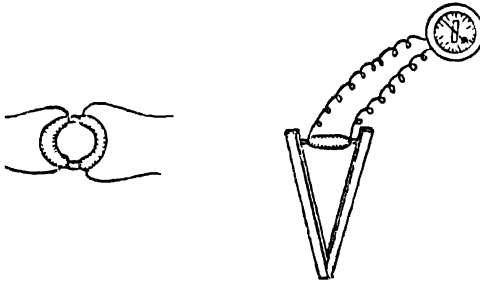
ঠিক একই ফল হল। ফ্যারাডে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন এবং পরের দিন একটি লোহার নলাকার চোঙকে তারাবর্তিত করে তারের প্রান্তদ্বয়কে গ্যালভানোমিটারের সঙ্গে লাগিয়ে দিলেন। তারপর তিনি দু'টি দণ্ড-চুম্বককে V-আকৃতি বিশিষ্ট করলেন এবং তাদের মুক্ত প্রান্ত দু'টির মধ্যে চোঙটিকে এভাবে স্থাপন করলেন যাতে চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ দু'টি মেরু চোঙের দুই প্রান্তে লাগান যায়। তারপর তিনি দেখলেন, যখনই ঐ মেরুদ্বয়কে চোঙের সঙ্গে যুক্ত বা বিযুক্ত করা হচ্ছে তখনই পূর্ব পরীক্ষার মত গ্যালভানোমিটারের কাঁটা সাময়িকভাবে নড়ে উঠছে। ফ্যারাডে নিশ্চিন্ত

হলেন যে, চুম্বকশক্তি বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। অ্যারাগো এবং অ্যাম্পিয়ার কিন্তু লক্ষ্য করেছিলেন এর উল্টো জিনিস।

ঐ বছরের ১-লা অক্টোবর তারিখে ফ্যারাডে আবিষ্ট (induced) বিদ্যুৎ আবিষ্কার করলেন। ১৮২৪ খ্রী.-এ অ্যারাগো লক্ষ্য করেছিলেন যে, তামার থালাকে কাছে এনে ঘোরাতে থাকলে চুম্বক সূচি নড়ে ওঠে। তখন তার কারণটি বোঝা যায়নি। কিন্তু ফ্যারাডের এ পরীক্ষা থেকে সে কাহিনীরও মর্মোদ্ঘাটন হয়ে গেল। একটি কাষ্ঠ খণ্ডের চারদিকে একটি সুদীর্ঘ অন্তরিত (রেশমী সূতা বা অপরিবাহী অন্য কোনো জিনিস দিয়ে জড়ান) তামার তারের আবর্ত তৈরি করে তার প্রান্তদ্বয়কে তিনি গ্যালভানোমিটারের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। ঐ আবর্তের ওপর দিয়েই আর একটি ঠিক ঐরকম আবর্তগুচ্ছ তৈরি করে তার মধ্য দিয়ে শক্তিমান ব্যাটারি থেকে যেই তড়িৎপ্রবাহ চালনা করা হল, অমনি মিটারের কাঁটা খুব সামান্যভাবে নড়ে উঠে পূর্বস্থানে ফিরে এল। প্রবাহ বন্ধ করে দিতেও একই ফল পাওয়া গেল, কিন্তু এবার কাঁটাটি নড়ে উঠল বিপরীত মুখে। বার বার এইভাবে তড়িৎচালনা শুরু ও বন্ধ করে দিলে বার বার ঐ কাঁটার ঐরূপ বিচলনও চলতে থাকে। কয়েকদিন পরে ১৭-তারিখে তিনি শুধু একটি স্থায়ী চুম্বককে শুধুমাত্র একটি বিদ্যুৎহীন আবর্তের মধ্যে হঠাৎ ঢুকিয়ে দিয়েও (এবং হটাৎ টেনে বার করে নিয়েও) ঐ একই প্রভাব প্রত্যক্ষ করলেন। এসব পরীক্ষা থেকে স্পষ্টই জানা গেল যে, চুম্বক-মেরু বা তড়িৎ-প্রবাহবাহী তার নিকটবর্তী বস্তুকে আবিষ্ট করে দিতে, অর্থাৎ স্পর্শ না করেও তার মধ্যে প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারে, যদিচ সে প্রভাব নগণ্যই। কিন্তু তখন তা যত নগণ্যই মনে হোক না কেন, ফ্যারাডের এই আবিষ্কার ছিল যুগান্তকারী।

ওদিকে আমেরিকাতে যোসেফ হেনরিও আগস্ট মাসে তাঁর ঐ একই পরীক্ষার জন্য তোড়জোড় করলেন। কিন্তু তিনি ঐবছরে কিছু করে উঠতে পারেননি। পরের বছর আবার কাজ আরম্ভ করার পূর্বেই তিনি একটি কাগজে দেখতে পেলেন যে, চুম্বকের তড়িৎ-উৎপাদন ক্ষমতার কথা ইতিমধ্যে ফ্যারাডে পরীক্ষা-সহ প্রমাণ করে দিয়েছেন। তখন তিনি তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে তার ফলাফল প্রকাশ করলেন।—ফ্যারাডের তত্ত্ব-বিবরণ জানার পূর্বে তিনি নিজে যা জেনেছিলেন এবং ফ্যারাডের বিবরণ পাঠের পরেও গবেষণায় যা পেলেন, ১৮৩২ খ্রী. এই তিনি তা একত্র প্রকাশ করলেন। ওদিকে ফ্যারাডে কিন্তু হেনরির বিবরণ না জেনেই এই বিষয়ে গবেষণার কাজ এগিয়ে নিয়ে চললেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রেরণা এসেছিল অন্য সূত্রে। ১৮৩৪ খ্রী.-এ জেঙ্কিন (William Jenkin) দেখতে পেয়েছিলেন যে, কোনো তড়িৎ-চুম্বককে যে তারটি বেষ্টন করে থাকে, তা যদি কোনো

একক কোষের ধাতব পাতগুলিতে সংযুক্ত থাকে, তাহলে সেটি কোনোক্রমে হঠাৎ বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেই তন্মুহূর্তে ধাক্কা খায়।—তারের দুটি প্রান্তকে দু'হাতে ধরে থাকলে তা টের পাওয়া যায়। প্যারীতে ম্যাসনও (A P. Masson) এ জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন। ফ্যারাডে ব্যাপারটি অনুধাবন করতে লাগলেন। ঐ ধাক্কার ব্যাপারটিকে তিনি আবেশ বলে ব্যাখ্যা করলেন। তবে এ আবেশ পূর্বের মত পারস্পরিক আবেশ বা এক কর্তৃক অন্যের আবিষ্ট হওয়া নয় ; এ হচ্ছে স্ব-আবেশ, অর্থাৎ প্রবাহ বন্ধ হওয়া মাত্রেই তারটির একাংশ নিজেই তার অন্যাংশকে ক্ষণেকের জন্য আবিষ্ট করে দেয়—আর তারই জন্য ঐ ধাক্কা (বা স্ফুলিঙ্গ)। তিনি দেখিয়ে প্রমাণ করলেন যে, প্রবাহ বন্ধ করে দিলে ঐ প্রবাহের অভিমুখেই একটি বাড়তি প্রবাহ সৃষ্টি হয়ে প্রবাহের শক্তিকে বাড়িয়ে দেয়। আর প্রবাহ চালু করে দিলেও তৎক্ষণাৎ প্রথমে ঐ একই অভিমুখে একটি বাড়তি প্রবাহ সৃষ্টি হয়ে মূল প্রবাহের শক্তিকে ক্ষণকালের জন্য কমিয়ে রাখে। বস্তুতপক্ষে, সংযোগ ছিন্ন করে দিলে ঐ বাড়তি প্রবাহটিই ধাক্কা মেরে ঠিকরে পালিয়ে যায়। ফ্যারাডের এ ব্যাখ্যা প্রথমে গৃহীত না হলেও পরে তা অসংখ্য প্রমাণাদির মারফতে স্বীকৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে, ঐ আবিষ্ট বিদ্যুৎ দিয়েই সস্তায় বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র বা ডাইনামো নির্মাণের সূত্রপাত এখানেই। এই ডাইনামোই মানুষের সভ্যতাকে একটি নূতন যুগে এনে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে।

তিন বছর পরে ১৮৩৭ খ্রী.-এ হেনরি লণ্ডনে এসে ফ্যারাডের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। এই সময় একদিন ফ্যারাডে, হুইটস্টোন (Charles Wheatstone —1802-'75), ড্যানিয়্যাল এবং হেনরি, চার জনে মিলে থার্মোপাইল (বিকিরিত তাপের মাপক যন্ত্র) থেকে তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিলেন। হেনরি আগেই ১৮২৯ খ্রী.-এ এ-ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সুতরাং তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করা সম্ভব হল। বিদ্যুতের আবেশী চরিত্রের নিভৃত বার্তাকে ইচ্ছামত শুনে নেওয়ার কৌশল জানা হয়ে গেল। সুতরাং যত অস্পষ্টই হক না কেন, তার অফুরন্ত কাকলিকে সংহত করে সেখান থেকে বজ্রনাদ ধ্বনিত করে তুলতে কতক্ষণ ? ডাইনামো রূপ বজ্রনাদ ? পরের বছর অর্থাৎ ১৮৩৮ খ্রী.-এ হেনরি প্রিন্সটনে গবেষণা চালিয়ে আবিষ্ট বিদ্যুৎ থেকেও পুনরায় আবিষ্ট বিদ্যুৎ সৃষ্টি করলেন। এমন কি, তিনি তারপর তৃতীয় ক্রমেরও তড়িৎ সৃষ্টি করতে সমর্থ হলেন। অথচ কয়েক বছর আগে ফ্যারাডের বা তাঁর নিজেরই পরীক্ষার মধ্যে দ্বিতীয় বার সৃষ্ট যে আবিষ্ট বিদ্যুতের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, তার শক্তি বা স্থায়িত্ব ছিল নগণ্যই। ঐ তৃতীয় ক্রমের তড়িৎ হেনেই হেনরি ক্রমহস্তধৃত (পর পর হাত ধরাধরি করা) পঁচিশ জন

মানুষের একটি গোটা দলকেই ধাক্কা দিতে পেরেছিলেন। এমনকি, পঞ্চম ক্রমের তড়িৎ হেনেও বাহুতে ধাক্কা দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু যে তাম্রতারাবর্তিত লৌহ (চুম্বক) দণ্ড (আর্মেচার) থেকে হেনরি (পৃ. ১৩৫), এবং যে লোহার আংটা থেকে ফ্যারাডে (পৃ. ১৩৬) আবেশ ক্রিয়া লক্ষ্য করেছিলেন, ঐগুলিকেই প্রথম প্রবাহ পরিবর্তক (transformer) বলে ধরে নেওয়া চলে। এসব দেখে গ্র্যাফটন্ পেজ (Charles Grafton Page—1812-'68) ১৮৩৬ খ্রী.-এই একটি আবর্তগুচ্ছ উদ্ভাবন করে ১৮৩৮ খ্রী.-এই তার প্রভূত পরিমাণ উন্নতি সাধন করলেন। তার দ্বারা দ্বিতীয় (ক্রমের) আবর্তন চক্রেই (circuit) অতি উচ্চ মানের বিদ্যুৎচালক বল (e. m. f.—পৃ. ১১৬) আবিষ্ট করা গেল, আর তাই দিয়ে উভয় চক্রের (তারের) মধ্যবর্তী শূন্য স্থানের (নলের) মধ্য দিয়ে প্রায় ৪½ ইঞ্চি দীর্ঘ তড়িৎ-ঝলক উদ্ভূত হল। ১৮৫০ খ্রী.-এ তিনি আর এক আবেশী আবর্তগুচ্ছ তৈরি করলেন। তাতে বাতাসের মধ্য দিয়ে ৮ ইঞ্চি দীর্ঘ ঝলক ঠিকরে গেল। কিন্তু পেজ-এর আবিষ্কারের কথা না জেনেই পরের বছর জার্মান বিজ্ঞানী রুম্‌কর্ফ'ও (Heinrich Daniel Rühmrorff or Ruhmkorff—1803'-77) যে আবেশী আবর্তগুচ্ছ তৈরি করলেন তার দ্বারা বাতাসের ভিতর দিয়ে ২ ইঞ্চির ঝলক সম্ভব হল এবং তদনুযায়ী তাঁরই নামানুসারে আবেশী আবর্তগুচ্ছ রুম্‌কর্ফ-আবর্তগুচ্ছ নামে অভিহিত হয়ে যায়। এর সাহায্যে শুধু যে পারস্পরিক আবেশের তত্ত্বটি ভালভাবে বোঝা গেল তাই নয়। এর সাহায্যে নিম্নমানের প্রবাহবাহী বা মুখ্য আবর্তগুচ্ছের প্রবাহকে বার বার অতি দ্রুত ভাঙা গড়ার (শুরু ও বন্ধ করার—পৃ. ১৩৭) মধ্য দিয়ে প্রবাহহীন বা গৌণ আবর্তগুচ্ছের প্রান্তদ্বয়ের মধ্যে খুব উচ্চ মানের যে আবিষ্ট বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা সম্ভব হল, তার কার্যকারিতা অপরিসীম। তড়িৎশক্তি সহজলভ্য হল। তাকে দিয়ে মানুষ তার নিজের কাজ সহজে সেরে নেওয়ার প্রায় অফুরন্ত সুযোগ পেয়ে গেল। তড়িৎপ্রকৃতিকে কাজে লাগিয়ে বহিঃপ্রকৃতি বিজয়ের অভিযান শুরু হয়ে গেল। বিদ্যুৎযুগ নবসভ্যতার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে দিল।

বহিঃপ্রকৃতিকে পরিবর্তন করতে গিয়ে মানুষ নিজেও কম পরিবর্তিত হয়নি। তার চিন্তা ও চেতনা ক্রমাগতই নূতন রূপ প্রাপ্ত হতে লাগল। বজ্র-স্ফুরণকে যে-মানুষ দেবতার ক্রোধ মনে করে তা থেকে বাঁচবার জন্য কেবল পূজা আর আরাধনা করে যুগ যুগ ধরে দেবতার বেদীমূলে মাথা খুঁড়ে মরেছে, সে আজ মাথা তুলে দেখে নিল তড়িৎশক্তির মূল রহস্যটি কি। তার ধারণা বদলে গেল। সে এগিয়ে গিয়ে বজ্র-বিদ্যুৎকে ধরে এনে মাটির মধ্যে চালান করে দিলে। লৌকিক

চেতনার অভ্যুদয়ে আলৌকিক বিশ্বাস সুড়ঙ্গ পথে পলায়ন করতে লাগল। চেতনার রূপান্তর ঘটতে আরম্ভ করল। সারা জগৎময় মানুষের চেতনা ও কর্মধারা-পরিবর্তনের নূতন যু। এসে গেল। ঐ বিজ্ঞানীবৃন্দের অনুসন্ধান-প্রক্রিয়ার মধ্যেই সেই পরিবর্ত্যমান চিন্তাপদ্ধতির প্রাথমিক সুস্পষ্ট সূচনা। তত্ত্ব সন্ধান করতে গিয়েই একদিন হেনরি ও ফ্যারাডে যে সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা কোনো গুহানিবাসী ধ্যানী সন্ন্যাসীর তপস্যালব্ধ তথাকথিত একাকী-প্রাপ্ত সত্য নয়। সে সত্য বস্তুত ফ্যারাডে-হেনরিকে অবলম্বন করে এসে পৌঁছল সমগ্র মানবচেতনার দূর দূরান্ত প্রদেশে। বিজ্ঞানী হয়ে রইলেন উপলক্ষ মাত্র, সত্যটি কিন্তু সার্বজনীন হয়ে গেল। বৈজ্ঞানিক-সত্যই তাই সার্বজনীন বা বিশ্বজনীন, বা একমাত্র মহাসত্য নামে চিরচিহ্নিত হতে লাগল। কিন্তু পূর্বেই দেখেছি, আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি তখনই প্রকৃত সত্য হয়ে উঠে, যখন তারা প্রাকৃতিক সমগ্রসত্যের আভাস জাগিয়ে তুলবার কাজে অংশ গ্রহণ করে। এই অংশগ্রহণই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, অংশের ক্রমসমাবেশই পূর্ণতার অভিমুখী, গতির মূল প্রেরণা। না হলে পূর্ণতা বলে পৃথক কোনো বস্তুর অস্তিত্ব থাকলে, সেও তো অংশেরই সমমান হয়ে পড়ে। কারণ সম্পূর্ণতা মানে তখন হয়ে দাঁড়ায় সীমাযুক্ত পূর্ণতা। আর সীমাবদ্ধ হলেই সেও তো অংশ বা অপূর্ণ হয়ে উঠে। সুতরাং পূর্ণতা বলে পৃথক কোনো তত্ত্ব থাকা অসম্ভব। পূর্ণতা কেবল ক্রমাগতই বিবর্তিত বা অভিব্যক্ত হতে পারে মাত্র। এবং এই অর্থেই পূর্ণতা কথাটির যা কিছু তাৎপর্য। সুতরাং সমগ্র মানবসমাজের মত তার সমগ্র চেতনাও ক্রমাভিব্যক্ত হয়ে চলেছে। অর্থাৎ সে গতিশীল, অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার, বা অংশ থেকে বৃহতের অভিমুখী। সমগ্র মানবচেতনার সেই যে গতি, তার বিজ্ঞানমানসের অগ্রগতি,—বিজ্ঞানীদের চিন্তাপরিবর্তনের মধ্যেই তার সুস্পষ্ট পদচিহ্নরেখা। এক তত্ত্বকে আবিষ্কার করতে গিয়ে যেমন সেখানে আর এক নূতন তত্ত্বের, বা এক নূতন কার্যকরী শক্তির আবির্ভাব ঘটছে, তেমনি তত্ত্বচিন্তাও সেখানে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। একজনের ভ্রান্তি অন্য জনের দ্বারা নিরসন প্রাপ্ত হচ্ছে। এবং ক্রমে ক্রমে সঠিক চিন্তা বা অপ্রমাদের অভ্যুদয় ঘটছে।

তড়িদাবেশের কারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও এ ঘটনা সুস্পষ্ট। কুলম্ব্ প্রভৃতি বিজ্ঞানী ভেবেছিলেন যে, তড়িদাধান দূর থেকেই পরস্পরকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করে। উভয়ের মধ্যবর্তী কোনও মাধ্যমের হস্তক্ষেপের ফলে যে তা সম্ভব হয়, তা নয়। তড়িৎ-অপরিবাহী মাধ্যমের মধ্য দিয়েও তড়িতের ঐ কার্য ঘটে। সুতরাং তড়িদাবেশের ক্রিয়া 'দূরত্বে ক্রিয়া' (দ্র, পৃ. ১৫)। বস্তুত এটি একটি অনুমান মাত্র, প্রমাণসাপেক্ষ কল্পনা শুধু। ফ্যারাডে কিন্তু এ সম্পর্কে অন্য কল্পনা করলেন। সেটিও একটি

প্রমাণসাপেক্ষ তত্ত্ব মাত্র। প্রাকৃতিক ঘটনা বা কার্য সন্দর্শনের পর তার কারণ সম্বন্ধে এও একটি অনুমান। কিন্তু পরবর্তী পরীক্ষা ও প্রমাণ বলে উভয় অনুমানের মধ্যে যেটি সঠিক বলে জানা গেল সেই পূর্ব-দর্শনই প্রকৃত-দর্শন বা প্রকৃতি সন্দর্শন রূপে পরিগণিত হতে পারে। যিনি সেই সত্যকে দর্শন করতে সমর্থ, তিনিই দার্শনিক। দার্শনিক ফ্যারাডে বললেন, ঐ আকর্ষণ-বিকর্ষণের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী মাধ্যমের ভূমিকা অসামান্য। সেই মাধ্যমের অণু বা কণিকা মারফতেই ঐ তড়িৎশক্তির কার্য সম্ভব হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে, তড়িৎশক্তির উদ্বোধন ঘটে অন্তর্বর্তী অপরিবাহী মাধ্যমের আণবিক ক্রিয়ার মারফতেই। সুতরাং ফ্যারাডে এই মাধ্যম বা অপরিবাহী বস্তুকে dielectric অর্থাৎ বিষম-বৈদ্যুৎ (বিদ্যুৎ-প্রবর্তক বা তড়িৎ-প্রবেশক) বস্তু নামে অভিহিত করলেন। তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন যে, পূর্বোক্ত বিজ্ঞানীদের অনুমান মত বিদ্যুদাবেশের কাজ মাধ্যম নিরপেক্ষভাবে সরলরেখা ধরে অগ্রসর হয়না। তার কাজ চলে মাধ্যমের কণিকাগুলিকে অবলম্বন করে বক্রপথে। তিনি ইতিপূর্বে ঐ ধরনের বক্ররেখাগুলির নাম দিয়েছিলেন বলরেখা। পূর্বে সীবেক (Thomas Johann Seebeck – 1780-1831) প্রভৃতি বিজ্ঞানীরও এই বলরেখা সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা ছিল। কিন্তু ফ্যারাডেই সর্বপ্রথম ১৮৩১ খ্রী.-এ লৌহচূর্ণের পথ-সমাবেশ প্রসঙ্গে তাদেরকে বলরেখা নামে অভিহিত করেন। এখন তাঁর পরীক্ষা থেকে এটি প্রমাণিত হল যে, বিদ্যুৎশক্তির গুরুত্ব নির্ভর করে এই অপরিবাহী মাধ্যমের প্রকৃতির উপরেই। মাধ্যমের পরিবর্তনে তারও পরিবর্তন ঘটে। এইভাবে তিনি আপেক্ষিক আবেশ-ক্ষমতার (specific induction capacity) চূড়ান্ত তত্ত্বটি আবিষ্কার করলেন। ক্যাভেণ্ডিসও বহুপূর্বে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। অন্যান্য বহুবিধ সিদ্ধান্ত বা আবিষ্কারের মত তাঁর এ আবিষ্কারটির বিষয়ও তিনি প্রকাশ করেননি বলে তা জনসমাজের দৃষ্টি বহির্ভূত থেকে গিয়েছিল। কিন্তু ফ্যারাডে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ দিলেন। তাঁর যন্ত্রটি ছিল খুবই সরল। একটির মধ্যে আর একটি, এভাবে সাজান দুটি বড় ও ছোট গোলক। তাদের মধ্যবর্তী ফাঁপা জায়গাটিতে যা ইচ্ছে তাই দিয়ে ভরা যায়। সুতরাং এই বিভিন্ন তড়িৎপ্রবেশকগুলির মাধ্যমে তড়িদাধান কি পরিমাণে সক্রিয় হচ্ছে তা বুঝতে পারা যায়। তড়িৎশক্তির আকর্ষণ-বিকর্ষণ ক্ষমতার পরিমাপক হিসাবে তিনি বাতাসকে একটি প্রমাণ (standard) তড়িৎপ্রবেশক ধরে নিয়ে তার সঙ্গে তুলনা করে দেখতে পেলেন যে, গন্ধকের ঐ ক্ষমতা ২.২৬ গুণ বেশি, সিলিকনের দ্বিগুণ এবং কাচের ১.৭৬ গুণ। ১৮৩৭ খ্রী.-এ তিনি এসব তথ্য প্রকাশ করলেন। এই সূক্ষ্ম বিষয়টি নির্ধারণের ব্যাপারে পরীক্ষাগত ত্রুটির জন্য প্রথমে

অবশ্য একটি প্রবেশকের ভিন্ন ভিন্ন মাপ পাওয়া গেল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ক্রমে ক্রমে অন্যান্য বহু পদার্থেরই ঐ ক্ষমতার পরিমাপ স্থিরীকৃত হতে লাগল, এবং এইভাবে মনীষী ফ্যারাডের তত্ত্বদর্শনের সারবত্তা প্রমাণিত হল।

শুধু কি এই? ফ্যারাডে আরও অনুমান করেছিলেন যে আলোর সঙ্গেও বিদ্যুৎ বা চুম্বকের প্রত্যক্ষ নিবিড় সম্পর্ক থাকতে বাধ্য। অনেক পরীক্ষা করলেন তিনি। কিন্তু সে সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ মিললনা। কিন্তু ফ্যারাডের মত জবরদস্ত বিজ্ঞানী খুব কমই দেখা যায়। তাঁর নিষ্ঠা মৌনী বা ধ্যানী তপস্বীর যোগসাধনাকে হার মানাতে পারত। তাই সেই সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভও করেছিলেন। প্রকৃতই তা যেন ছিল এক দর্শন। তাই দৃষ্টিও হয়েছিল অব্যর্থ। দার্শনিকের দৃঢ় প্রত্যয় শেষে সত্য প্রমাণিত হল। ১৮৪৫ খ্রী.-এ সত্যসত্যই তাঁর পরীক্ষায় চুম্বক-বক্ররেখা বা বলরেখা হয়ে উঠল দ্যুতিময়। আর আলোকরশ্মি চৌম্বক বলরেখায় রূপান্তরিত হল। একটি চুম্বকায়িত (অর্থাৎ চুম্বকত্বপ্রাপ্ত মেরুসমন্বিত) রশ্মিগুচ্ছকে তিনি একটি ভারি কাচখণ্ডের ভিতর দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। কাচটি একটি বৃহৎ বিদ্যুৎ-চুম্বকের দ্বারা প্রভাবিত খুব জোরাল চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যেই আসীন ছিল। একটি নিকল (William Nicol)-প্রিজ্‌ম্ অর্থাৎ বর্ণালি-বিশ্লেষক ত্রিপৃষ্ঠ (তিন পীঠওয়ালা দ্র., পরমাণুর অন্তঃপুরে) কাচের সাহায্যে দেখা গেল যে, চুম্বকের প্রভাবে এসে রশ্মিরেখা বেঁকে গিয়েছে, তার কম্পন ধরা পড়ছে আর একটি ভিন্ন তলে। ফ্যারাডে বললেন যে কেবল ভারি কাচের নয়, কঠিন ও তরল পদার্থ, অম্ল ও ক্ষার, তেল, জল, অ্যালকহল, ইথার—সব বস্তুরই এ ক্ষমতা বিদ্যমান। চুম্বক-ধর্ম যে কেবল লোহা আর নিকেলের,—এ তিনি মনে করতে পারলেননা। খুব বেশি উষ্ণতায় যখন লোহার চৌম্বক গুণ কমে যায়, তখন তিনি মনে করলেন, খুব কম উষ্ণতায় কেবলমাত্র লোহার নয়, অন্যান্য ধাতুরও চৌম্বক গুণ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। ১৮৩৬ খ্রী.-এ তিনি ধাতুদের –৫০° সে উষ্ণতায় এনে পরীক্ষা করে কোনো ফল পেলেন না। ১৮৩৯ খ্রী.-এও তিনি তাদের –৮০° সে. উষ্ণতায় এনে আবার পরীক্ষা করলেন। এবারেও তিনি ব্যর্থ হলেন। কিন্তু তবুও তিনি ভগ্নোদ্যম হলেননা। ১৮৪৫-এ তিনি ধরতে পারলেন যে, কোব্যাল্ট্ও একটি চৌম্বক পদার্থ, এবং ১৮৪৬ খ্রী-এ তিনি তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফলাফল প্রকাশ করলেন। '৪৫-এর ৪ঠা নভেম্বর তিনি তাঁর নতুন বিদ্যুৎ-চুম্বকের মেরু মধ্যে রেশমের সুতা বেঁধে একটি ভারি কাচখণ্ডকে ঝুলিয়ে দিলেন এবং চুম্বকটিকে উত্তেজিত (excited) করতে থাকলেন। দেখা গেল যে, কাচখণ্ডটি মেরুদ্বয় থেকে দূরে সরে গিয়ে একটি চুম্বকত্বহীন নিরক্ষীয় স্থানে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। অন্যান্য পরীক্ষা করে ফ্যারাডে ক্রমে ক্রমে দেখতে পেলেন যে,

খুব উচ্চশক্তির চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে সকল প্রকার কঠিন ও তরল পদার্থই আকৃষ্ট বা বিকৃষ্ট হতে পারে। গন্ধক, ভারতীয় রাবার, অ্যাস্‌বেস্‌টস্‌, নরদেহের কলা—সব কিছুই। ১৮৫০ খ্রী-এ তিনি এর নামকরণের জন্য হোয়েওয়েলের পরামর্শ চাইলেন এবং তাঁর নির্দেশ মত চুম্বক-পদার্থের দুইটি শ্রেণীর জন্য দুইটি পৃথক নাম গ্রহণ করলেন।—যেগুলি ভূ চুম্বকের সমান্তরাল থাকে সেগুলির নাম সম-চৌম্বক (para-magnetic), আর যেগুলি তার সঙ্গে তির্যকভাবে থাকতে চায় সেগুলির নাম বিষম-চৌম্বক (dia-magnetic) পদার্থ। ইতিপূর্বে ব্রাগম্যান্‌স্‌ (Anton Brugmans —1732-'89), বেকারেল (Antoine César Becquerel –1788 -1878), বেলিফ (Le Baillif), সাইজে (Saigey) এবং সীবেকও চুম্বকের দ্বারা দু'তিনটি পদার্থকে বিকৃষ্ট হতে দেখেছিলেন। কিন্তু ফ্যারোডের সেকথা জানা ছিলনা। হোয়েওয়েল যখন তাঁকে বেকারেলের গবেষণার কথা জানালেন, তিনি জেনে বিস্ময় প্রকাশ করলেন যে, এতবড় একটি তথ্য ও তত্ত্বের কাছে পৌছেও বেকারেল তার তাৎপর্য না বুঝে সেকেলে ধারণাকে আঁকড়ে রইলেন! বিষম-চৌম্বক শক্তির পরীক্ষামূলক পরিচয় পেয়ে ফ্যারাডে এতটা উত্তেজিত হয়েছিলেন যে, তিনি মন্তব্য করেছিলেন, এমনকি একটি মানুষও চৌম্বক ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে মহম্মদের শবাধারের মত সেও চৌম্বক রেখার সঙ্গে তির্যক না হয়ে গিয়ে পারেনা।

কিছুকাল পরে ১৮৫৩ খ্রী. এ একটি ঘটনা ঘটল। তিনজন যাদুকর অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করে (table-turning) তুলছেন। সারা লণ্ডন সহর সরগরম। অনুসন্ধানাদি না করেই কেউ বললেন, এ বোধকরি বিদ্যুতের খেলা। কেউ মনে করলেন, এ সবই ঐ চুম্বকের কেরামতি। কেউ ভাবলেন, আর কোনও অজ্ঞাত ভৌত শক্তি খুব সম্ভব। ফ্যারাডে ব্যাপার বুঝে লিখলেন, "এভাবে যারা টেবিলকে উল্টে দেয়, তাদের উপরেই টেবিল উল্টে না দিয়ে তো আমার কোনো কাজই হয়নি। আমার কাজই হয়না অন্যভাবে। আমার কাছে তাই অসংখ্য প্রশ্ন আসতে লাগল। সে সম্বন্ধে আমার মতামত জানিয়ে শেষ পর্যন্ত সব প্রশ্নকে প্রশমিত করতেই হল আমাকে। কিন্তু মানবমন সংশ্লিষ্ট আমাদের এই জগৎ কি রকম হাস্যাস্পদভাবেই দুর্বল, বিশ্বাসপ্রবণ ও সন্দিগ্ধ, সন্দেহপরায়ণ ও সংস্কারাচ্ছন্ন, সাহসী অথচ ভীতসন্ত্রস্ত!" সেই সব লোকের বিরুদ্ধে ফ্যারাডের প্রচণ্ড অভিযোগ ছিল—"আমাদের বিজ্ঞাত শক্তিগুলিই ঘটনার কারণ নির্দেশে সমর্থ কিনা, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অনুধাবন না করেই যাঁরা ঘটনার ফলাফলকে কোনও অজ্ঞাত ভৌত শক্তির প্রভাবজাত বলে কল্পনা করে নেন, অথবা যাঁরা বিচার বুদ্ধিকে স্থগিত রেখেই সেই ফলাফলকে অতি সহজেই কোনও পৈশাচিক বা অপ্রাকৃত শক্তির খেলা

বলে সিদ্ধান্ত করে নেন, অথবা একবারও ভেবে দেখেন না যে, কর্মবিধি নির্ণয়ের ব্যাপারে তাঁরা আদৌ যোগ্য বা বিজ্ঞ নন।' "আমার মনে হয় শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই চরম গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব সম্বন্ধে এমন একটা মস্ত বড় ত্রুটি থেকে যাচ্ছে যে, তার ফলেই সমাজমানস এ রকম অবস্থায় তাড়িত হয়ে এসেছে।" বিজ্ঞানের আলোক-গঙ্গা মানবমনের ভূগর্ভে উচ্ছ্বসিত হয়ে তার সুপ্ত চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে চাইছে, অথচ আলোক বিতরণের দায়িত্ব বহনকারী শিক্ষাব্যবস্থাই সেই জ্যোতির্ময় সত্তার পথরোধ করে দিয়ে সমাজমানসকে সে সম্বন্ধে অজ্ঞ রেখে তাকে বিকৃত করে তুলছে, —শতাধিক বর্ষ পূর্বেও এ বিষয় যাঁর চোখ এড়িয়ে যেতে পারেনি, তাঁকে দ্রষ্টা বলব না তো বলব কাকে? হোক না কেন তাঁর সেই দর্শন আংশিক-দর্শন মাত্র! যেমন ছিল তাঁর পূর্বগামী ভোল্টার! শতবর্ষ পরে ঋষি আইনস্টাইনও তো সার্বিক দর্শনের অধিকারী হতে পারেননি। সে বেদনাময় ইতিহাসের বিষয় যথাস্থানে উল্লেখ করা যাবে। কিন্তু আংশিক দর্শন মাত্রই যে ভ্রান্ত-দর্শন না হয়ে, সমগ্রসত্য-দর্শনের সোপানাবলীতে পরিণত হতে পারে,সে বিষয়টি ক্রমাগতই স্পষ্ট হয়ে আসছে। আর আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ীবা পূর্ণ বা সমগ্র সত্য যদি ক্রমাভিব্যক্ত হতে থাকে, তাহলে আংশিক সত্যের তাৎপর্য তো অপরিমেয় হয়ে উঠে।

কিন্তু যাঁরা তড়িৎপ্রবেশক বস্তুর ক্রিয়মাণতাকে স্বীকার করতে পারেননি, অথচ একটি বা দুটি তড়িৎ-তরলের অস্তিত্ব কল্পনা করেও জগতে সুনির্দিষ্ট তেজপরিমাণের তত্ত্বটিকে উপেক্ষা করেছিলেন, তাঁদের দৃষ্টিতে সে তাৎপর্য ধরা পড়তে পারেনা। তড়িৎ-তরলের কাল্পনিক তত্ত্বটি সত্য হতে পারত, যদি তাকে ঠিক রাখতে গিয়ে নির্দিষ্ট তেজপরিমাণের সত্যটিকে বিসর্জন না দেওয়া হত। অর্থাৎ ঐ কাল্পনিক তত্ত্বটি বিজ্ঞানীর মনঃসম্ভূত অস্তিত্ববান্ সত্য হওয়া সত্ত্বেও তার সার্থকতা রইলনা। সুতরাং অস্তিত্বের দিক থেকে সে নিশ্চিত হলেও মানবপ্রগতিতে সে অসার্থক বলে পরিত্যক্ত। অথচ মাধ্যম নিরপেক্ষভাবে তড়িৎশক্তির 'দূরত্বে ক্রিয়া'-মতবাদের (পৃ.১৪০) বিরুদ্ধে ফ্যারাডে যে বিদ্যুৎ-প্রবেশক মাধ্যমের তত্ত্বটি কল্পনা করলেন, তা ঐ নির্দিষ্ট তেজপরিমাণের তত্ত্বাদির মত অন্য কোনও পরীক্ষিত তত্ত্ব বা সত্যের বিরোধী হয়নি। তাই সে-মতবাদের সত্যতা কেবল অস্তিত্বময় নিশ্চিত সত্যতা নয়। সে-তত্ত্ব অন্যান্য আংশিক সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সমগ্রসত্যের মালিকা রচনা করে চলে। সুতরাং সেটিও নিশ্চয় একটি আংশিক সত্য বটে। কিন্তু তাৎপর্যময় ও সার্থক। তার মধ্যে হয়ত সামান্যভাবে কোনো ত্রুটি থাকতে পারে। কিন্তু তবুও তাৎপর্যময় আংশিক সত্য বলেই সে অভিব্যক্ত সমগ্র সত্যের অভিমুখী। সমগ্র সত্যকে সেও অভিব্যক্ত করে তুলেছে। সুতরাং কল্পনা দিয়ে সত্যকে গড়ে তুলবার মত কোনো

মৌলিক ত্রুটি বা ভ্রান্তি সে নয়। সত্যকে অবলোকন করবার (চোখ ভরে দেখার) পদ্ধতিগত সে ত্রুটি। কুয়াশার মধ্য দিয়ে যখন সমুচ্চ গিরিশৃঙ্গের রবিকরোজ্জ্বল মোহন রূপটিকে চিনে নেওয়া গেল, কেবল তখনই কুয়াশাপসরণের জন্য অপেক্ষাটিও আত্যন্তিক হয়ে উঠল। সে কুয়াশা সরিয়ে দিলেন তরুণ অভিযাত্রী ম্যাক্স্ওয়েল (James Clerk Maxwell—1831-'79)। ১৮৬১-৬২-খ্রী.-এ এবং তার পরেও তিনি ভৌত বলরেখা সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করলেন। তাতে তিনি ফ্যারাডের মতবাদকেই আঙ্কিক তত্ত্বের মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের আসল শক্তি যে অপরিবাহী তড়িৎ-প্রবেশক এবং পরিবাহী-বস্তু, এই উভয়ের মধ্যেই অধিষ্ঠান করে থাকে,—ফ্যারাডের এই মতবাদকেই তিনি জোরদার করে তুললেন। তবে ফ্যারাডে মনে করেছিলেন যে, বিদ্যুদাহিত সক্রিয় বস্তুর দ্বারা তড়িৎপ্রবেশকের কণিকাগুলির ধন- এবং ঋণ- এই উভয় মেরু সমন্বিত (অর্থাৎ চুম্বকায়িত) হওয়ার জন্যই আবেশ প্রক্রিয়া ঘটে থাকে। সুতরাং যখন বহিঃশক্তি প্রভাবে এই অবস্থার সৃষ্টি এবং সে শক্তির অপসারণে কণিকাগুলির পুনর্বার স্বাভাবিক নিশ্চলাবস্থা-প্রাপ্তি, তখন এই আবেশাবস্থাটিকে একটি বলাক্রান্ত অবস্থা বলে ধরে নিতে হয়। কিন্তু ম্যাক্স্ওয়েল জানালেন যে, পরিবর্তনটি ঘটছে তড়িৎপ্রবেশকের কণিকাগুলির মেরুযুক্ত হওয়ার জন্য নয়। তার আসল কারণ তড়িতের স্থানান্তর (electric displacement)। আবেশ-প্রক্রিয়া তড়িৎ-স্থানান্তর প্রক্রিয়া মাত্র। বিদ্যুৎ-প্রবেশকের মধ্যে যে ঘটনা ঘটে, তা' অনেকটা স্থিতিস্থাপক কঠিন পদার্থের ন্যায়, বহিঃশক্তিটি সরিয়ে নিলে যেটি তার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। সুতরাং তড়িৎপ্রবাহ দু'ভাবে হয়। একটি মূল তড়িৎপরিবাহী ধরে চলতে থাকে, অন্যটি অপরিবাহী তড়িৎ-প্রবেশক ধরে বেরিয়ে আসে। প্রথমটি পরিবাহিত প্রবাহ, আর দ্বিতীয়টি হল স্থানান্তরিত প্রবাহ। আবেশকালে অপরিবাহী মাধ্যমে সাময়িক স্থানান্তরিত প্রবাহের কাজ চলতে থাকে। সেই প্রবাহস্রোতের গতি প্রায় আলোর গতিরই তুল্য। সুতরাং যদি সহাবস্থিত (অপরিবাহী বায়ু) এবং সহব্যাপ্ত (পরিবাহী তার) মাধ্যমদ্বয়কে পৃথক গুণবিশিষ্ট বস্তু বলে ধরে নিই, তাহলেও বায়ুস্থ সমগতিসম্পন্ন চৌম্বক মাধ্যমের স্থিতিস্থাপকতা গুণটি রশ্মিবহ মাধ্যমেরই সমগুণযুক্ত। তড়িৎচুম্বক এবং আলোক বিচ্ছুরণ নামক ঘটনাদ্বয় যে বস্তুত সমস্বভাব এবং তাদের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র বা মাধ্যম যে একই, ম্যাক্স্ওয়েল এই মতবাদকে উন্নত করে তুললেন। কিন্তু তাকেই আবার পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করে দিলেন হার্জ (Heinrich Rudolf Hertz -1957-'94)।

ম্যাক্স্ওয়েলের যে ভয় ছিল, হার্জের আবিষ্কারে তার নিরসন হল। কিন্তু

তা হল ম্যাক্স্ওয়েলের মৃত্যুর ন' বছর পরে। ১৮৮৮ খ্রী.-এ হার্জ্ লিডেন-জার এবং আবর্তকুণ্ডলীর বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ থেকে বিদ্যুৎ চৌম্বক প্রবাহকে উদ্‌ঘাটিত করতে সমর্থ হলেন। ফলে স্থানান্তরিত প্রবাহের অস্তিত্ব প্রমাণিত হল। দেখা গেল যে, কম্পমান তড়িৎ-ক্ষরণ (discharge) কালে বিদ্যুচ্চৌম্বক স্রোত আকাশে বিচ্ছুরিত হয়ে যায়। সেই প্রবাহের দুটি অংশ। একটি বৈদ্যুৎ, অন্যটি চৌম্বক। তাই তার ঐ বিদ্যুচ্চৌম্বক নাম সার্থক। হার্জ্ প্রত্যেকটিকে পৃথকভাবে প্রত্যক্ষ করলেন। দেখলেন যে, টিন বা অন্য কোনো প্রতিফলকের উপর তড়িৎসম্পাত ঘটান হলে সেটি দ্বিধা বিশ্লিষ্ট হয়ে দুই বিপরীত মুখে ছুটে যায়। ঐ প্রবাহকে উদ্‌ঘাটিত করবার জন্য হার্জ্ একটি যন্ত্রও আবিষ্কার করলেন। একটি ধাতব আংটার এক জায়গায় একটু কাটা অংশ বা ফাঁক। সেই ফাঁকের দু'দিকের দু'টি প্রান্তে দু'টি পিতলের বর্তুল। উপযুক্ত অবস্থায় আংটার ওপরে প্রবাহসম্পাত ঘটলে বর্তুলদ্বয়ের মধ্যে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়তে থাকে। বিদ্যুচ্চৌম্বক প্রবাহ নিয়ে হার্জ্ অনেক পরীক্ষা করলেন। তিনিই সর্বপ্রথম বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ দিলেন এবং পরীক্ষার দ্বারা দেখিয়ে দিলেন যে তার গতিবেগ আলোকের গতিবেগের তুল্যই। সুতরাং আলোক-বিকিরণ যে বিদ্যুচ্চৌম্বকীয় ঘটনাই, হার্জের পরীক্ষা থেকে তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল। দুটি প্রক্রিয়ার পার্থক্য কেবল তাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে। বিকিরণের তরঙ্গ বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গের চাইতে আরও ছোট, আরও সূক্ষ্ম। কিন্তু হার্জের পরীক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ফ্যারাডে ম্যাক্স্ওয়েলের তত্ত্বকে প্রমাণিত করা। তিনি সে তত্ত্বকে যথাযথ ও নির্ভরযোগ্যভাবেই প্রমাণ করে দিলেন।

ফ্যারাডে, ম্যাক্স্ওয়েল এবং হার্জের আবিষ্কার ও উদ্ভাবিত তত্ত্বের বিকাশমান অবস্থা থেকে যেন প্রাকৃতিক জগতের নূতন দরজা খুলে গেল। বস্তুজগতের মূল উপাদানের অনুসন্ধান অবশ্যই চলেছে। সে তো কেবল অনুসন্ধান নয়। সে যেন এক দুঃসাহসিক মহাভিযান। বিজ্ঞানী-সমাজের সতর্ক সচেতন প্রযত্নের ফল স্বরূপ যেন অভাবিতপূর্বরূপে প্রকৃতির কাছ থেকেও আশীর্বাদ বা পুরস্কার এসে পৌঁছল। ডেভি বিদ্যুৎপ্রবাহ বেষ্টনকারী লৌহচূর্ণের পরিধিসজ্জা প্রত্যক্ষ করেছিলেন (পৃ. ১২৯)। ঘটনাটি নিশ্চয় দৃশ্যমান প্রক্রিয়া। কিন্তু ওর্স্টেড্-অ্যারাগো-অ্যাম্পিয়ার-ওহম্-ফ্যারাডে-হেনরি প্রভৃতি বিজ্ঞানী বিদ্যুৎ আর চুম্বকের মধ্যে যে সম্পর্কটি ধরে ফেললেন, বহুকাল পূর্বে ১৬৮১ খ্রী.-এ বোস্টনগামী জাহাজের নাবিক-বৃন্দ যে ঘটনাটিকে প্রত্যক্ষ করেও (পৃ. ৭৮) তার তাৎপর্যটি বুঝে উঠতে পারেন নি, সেই বিদ্যুৎ ও চুম্বকের সম্পর্কজনিত ঘটনাটি কিন্তু বৈদ্যুৎ শক্তি ও চৌম্বক শক্তি-

রূপী দুটি অদৃশ্য গুণের অদৃশ্য প্রভাব-জাত প্রক্রিয়া। সে প্রক্রিয়া বস্তুকে অবলম্বন করে দৃশ্যমান ঘটনারূপেই প্রকাশিত। কিন্তু গুণ আবার বস্তুকে অবলম্বন করে দৃশ্যমান ঘটনা ঘটায় কেমন করে? ফ্যারাডেই তো প্রমাণ করেছেন, বলরেখা ধরেই বিদ্যুৎ আর চুম্বকের কাজ চলে এবং তাদের বলরেখাগুলি পরস্পর পরস্পরকে আঁকড়ে বা ঘিরে ধরে। যারা একে অন্যকে ঘিরে ধরে, তারা বস্তুসত্তা না হলে অন্যকে আঁকড়ে ধরে কেমন করে? তাই ধরে নিতেই হয় যে, বিদ্যুৎশক্তি বা চুম্বকশক্তিকে অর্থাৎ তাদের বলকে যতই নির্বস্তুক মনে হক না কেন, সে অবশ্যই বস্তুসত্ত্ব। সেইজন্য চুম্বক বলরেখাও দ্যুতিময় হয়ে উঠে, আলোরশ্মিও চৌম্বক বলরেখায় রূপান্তরিত হয়ে যায় (পৃ. ১৪২)। এমনকি, যাকে বিদ্যুতের আবেশ বলা হয়, সে প্রক্রিয়াটিও যতই অদৃশ্য হোক না কেন, ফ্যারাডে ধরিয়ে দিলেন যে তারও কাজ চলে ঐ বক্র বলরেখাগুলিকেই অবলম্বন করে (পৃ. ১৪১)। তা যদি হয়, তাহলে ঐ রেখাগুলির যে বস্তুসত্তা, তাকে কি বল-বস্তু নামে অভিহিত করা যায়না? আর সেই অভাবিতপূর্ব অদৃশ্য সত্তাবিশিষ্ট বল-পদার্থগুলিকেই কি পার্থিব মূল পদার্থ বলে ধরে নেওয়া যায়না? বিজ্ঞানীবৃন্দের বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে যা জানা যায়, তাতে আর ঐ পদার্থধারাকে ইথারের মত কেবল প্রয়োজন সাধনার্থে নিছক কল্পিত ও অপ্রমাণিত সত্তা বলে মনে করার কারণ থাকেনা। নিশ্চয় সে এখন এক বাস্তব অস্তিত্ব, অথচ কল্পিত ইথারের মতই সে সর্বব্যাপ্ত। সুতরাং নিশ্চয় তাকে মূল পদার্থ বলেও হয়ত ধরা যায়। কিন্তু সে যে আর সব পার্থিব বস্তুরই মূল উপাদান, অর্থাৎ ঐ বলপদার্থগুলি দিয়েই যে আর সব পার্থিব বস্তু বা তাদের পরমাণুবৃন্দ গঠিত হয়েছে, তার প্রমাণ কই? তাহলে প্রকৃতির আশীর্বাদে নূতন জগতের দরজা কতটুকুই বা খুলল?

বস্তুত, বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট পুরস্কারই পেলেন। তাঁদের চিন্তাধারা ভিন্ন খাত ধরে প্রবাহিত হতে চাইল। তারটি পড়ে আছে নিষ্ক্রিয় হয়ে, তার সঙ্গে তার পরিবেশের কি কোনো সম্পর্ক আছে? তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠান হল। অমনি কোথা থেকে তার চৌম্বক ধর্ম এসে গেল? তারের যোগ তো একমাত্র তার পরিবেশের সঙ্গেই। চৌম্বক গুণ কি তাহলে ঐ শূন্যদেহ পরিবেশ থেকেই এসে গেল? তার পরিবেশ কি তাহলে একটি চৌম্বক ভাণ্ডার বিশেষ? অন্যদিকে আবার, তারের শঙ্খিলটি পড়ে আছে, ব্যাটারির সঙ্গে তার কোনো যোগই নাই। অথচ যেই তার মধ্যে চুম্বকদণ্ড ঢুকিয়ে দেওয়া হল, অমনি তারের মধ্যে বিদ্যুৎ এসে পৌঁছে গ্যালভানোমিটারের কাঁটাটিকে সরিয়ে দিলে। কোথা থেকে এলো ঐ তড়িৎ? ঐ শঙ্খিলেরও তো তার পরিবেশ ছাড়া আর কোনো কিছুর সঙ্গে কোনও

যোগ নেই ! তাহলে এই ঘটনাগুলি কি একটি মহাসত্যকে প্রকাশ করে দিচ্ছে যে, আপাতদৃষ্টিতে যতই বিচ্ছিন্ন মনে হক না কেন, এজগতে প্রত্যেকটি বস্তুই তার পরিবেশ প্রভাবের সঙ্গে এক অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে যুক্ত এবং সেই সূত্রে বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুই প্রত্যেকটি বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত ? আর উপরোক্ত ঘটনা থেকে তো এ প্রশ্নও সহজে উত্থাপিত হয়,—তাহলে বস্তুর ঐ পরিবেশটি কি কোনো তড়িৎ-ভাণ্ডার বিশেষ ? কিন্তু তাহলে ঐ চুম্বক আর বিদ্যুতের ভাণ্ডার তো সর্বত্রই। সারা জগৎই তো বিদ্যুৎ আর চুম্বকের অদৃশ্য ক্ষেত্র বিশেষ। ওদিকে আবার তারটি বা শম্বিলটি যখন স্থিরভাবে পড়ে থাকে, তখন তারটির কোনও চৌম্বক শক্তি নাই, শম্বিলটিও নিস্তড়িৎ। ফ্যারাডের পরীক্ষা থেকে খুব ভাল করেই প্রমাণ হয়ে গেছে যে ওদের একটি যখন স্থির হয়ে থাকে তখন অন্যটিও যেন চিরস্থির হয়ে পড়ে থাকে। অথচ ওদের যেকোনো একটি চলতে আরম্ভ করলেই অন্যটিও যেন কোথা থেকে আবির্ভূত হয়ে অনিবার্য ও অচ্ছেদ্যভাবেই তার সঙ্গ গ্রহণ করে চলতে থাকে। চলতে থাকে অবশ্য পরস্পরেই পরস্পরকে ঘিরে ধরে।

অর্থাৎ সমগ্র জগৎটিই তাহলে বিদ্যুচ্চৌম্বক-অবস্থিতি ক্ষেত্র-বিশেষ ! আর সেই ক্ষেত্রমধ্যে গতির দ্বারাই বিদ্যুচ্চৌম্বক বল ক্রিয়াশীল হয়ে উঠছে, বিদ্যুৎ বা চুম্বকের যুগপৎ ক্রিয়া চলছে (দ্র., পরমাণুর অন্তঃপুরে) ! ক্রিয়ার অর্থই তাহলে দাঁড়াচ্ছে গতি। বা বলা যায়, গতি ও ক্রিয়া একার্থক। আবার এখানে গতি বলতে বোঝা যাচ্ছে অবস্থার বা ক্ষেত্রাবস্থার পরিবর্তন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ক্ষেত্রাবস্থার পরিবর্তন ঘটলেই বল বা শক্তির আবির্ভাব ঘটতে বাধ্য। হঠাৎ পরিবর্তন ঘটলে ঐ শক্তির আবির্ভাবটিও হঠাৎই হয়ে থাকে। আবার পরিবর্তনটি যদি হঠাৎ ও বিপুল হয়ে থাকে, তাহলে হঠাৎই বিপুল পরিমাণ শক্তির আবির্ভাব ঘটে থাকে। প্রবাহবাহী তার যখন অকস্মাৎ ছিন্ন হয়, সেই তারের চৌম্বক ক্ষেত্রটি তখন অকস্মাৎ পরিবর্তিত হয়ে যায়। তার ফলে বিপুল পরিমাণ শক্তির অকস্মাৎ আবির্ভাব ঘটে। হঠাৎ নবাগত সেই বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি আলো হয়ে ঠিকরে পালায়। আবেশ ঘটনাতে তারই প্রমাণ মেলে। কিন্তু যে শক্তি এসে পৌঁছায় সে তার নিজ ক্ষেত্র ছাড়া আর কোথা থেকেই বা আসবে ? আবার শক্তি যখন আলো-বিদ্যুতের খেলা দেখিয়ে ঠিকরে পালায়, কোথায় বা সে গিয়ে আশ্রয় নেবে তার নিজ ক্ষেত্রটিতে ছাড়া ? আর ঐ শক্তি বা বল যদি বলপদার্থ হয়ে থাকে তাহলে মূল ক্ষেত্র থেকে পদার্থের আবির্ভাব ঘ'টে ঐ মূল ক্ষেত্রেই কি তার তিরোধান ঘটছে না ? আর তা সত্য হলে ঐ বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্র বা বলপদার্থই তো আলো আর বিদ্যুতের উপাদান নিশ্চয়ই হতে পারে ! কিন্তু তাহলেও আরও

একটু অন্তত প্রমাণ করতেই হয় যে, পরমাণুদেরও উপাদান ঐ আলো-বিদ্যুৎই। বিজ্ঞানীবৃন্দের প্রযত্ন সেই খাত ধরেই এগিয়ে চলল। কিন্তু বিদ্যুচ্চৌম্বক শক্তির মত মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও যখন সর্বত্র বিদ্যমান, তখন তারও একটি সর্বত্র বিরাজিত ক্ষেত্র নিশ্চয় থেকে থাকবে। তাহলে সে ক্ষেত্রটি হবে কোন বস্তুর? তার জন্য কি তাহলে অন্য কোনো বল-পদার্থের অস্তিত্বও অনিবার্য? কিন্তু তখন বিজ্ঞানীদের কাছে নূতন-ক্ষেত্র জগতের দরজা খুলে গেছে। অচিরেই তাঁরা তার সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের মুক্ত পরিবেশে এসে যেন অবারণ বিচরণ শুরু করে দিলেন। ইতিমধ্যে তাঁদের পূর্ব অনুসন্ধানের কাজ আরও অনেক দূর এগিয়ে এল।

কেবল হার্জ্ নন। প্রায় একই সময়ে, লিভারপুলে অধ্যাপক লজও (Sir Oliver J Lodge) গবেষণা করতে করতে তারের মধ্যে কম্পন ও প্রবাহ লক্ষ্য করে ম্যাক্স্‌ওয়েলের তত্ত্বকে প্রমাণ করতে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন। হার্জ্ বলেছেন যে ইতিমধ্যে তাঁর আবিষ্কার না ঘটলে লজও নিশ্চয় সে তত্ত্বকে ভবিষ্যতে প্রমাণ করে দিতেন। কিছু পূর্বে ডাবলিনেও অধ্যাপক ফিট্‌জেরাল্ড্ (George Francis Fitzgerald—1851-1901) ঐ তত্ত্বকে স্বীকার করে ঐ প্রবাহ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে এবং তাকে আবিষ্কার করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এঁদের কাঁরও প্রয়াস সফল হয়নি। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, যতই দিন অতিবাহিত হচ্ছে, ততই দেখা যাচ্ছে যে প্রায়ই একই সময়ে একই বিষয় নিয়ে বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন বিজ্ঞানী অন্যনিরপেক্ষ ভাবেই চিন্তা করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। মনীষীবৃন্দের সংখ্যা বর্ধিত হচ্ছে; অথচ তাঁদের চিন্তাধারাও যেন ক্রমশ একই খাতে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করছে। কার্য-দর্শকরা যেন ক্রমেই অধিক সংখ্যায় কারণ-দ্রষ্টা হতে চলেছেন। বৈজ্ঞানিক চিন্তা ধীরে ধীরে নিশ্চিত গতিতে সমাজমানসকে আক্রান্ত করছে। যেখানেই তার কাজ শুরু হয়েছে, সেখানেই ক্রমাগত সারা অঞ্চল জুড়ে তার জয় পতাকা উত্থিত হয়েছে; দিক্ হতে দিগন্তরে তার জয়শঙ্খনাদ ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রধানত ঐ ইউরোপকে অবলম্বন করে যে তার যাত্রারম্ভ, তা কোনো দৈব ঘটনা বা দৈবাৎ-এর বিষয় নয়। কারণ, এ পর্যন্ত আমরা যতটুকু দেখেছি এবং ভবিষ্যতেও আমরা যা দেখব, তার প্রতি উদ্ধত অশ্রদ্ধা বা অসংগত দম্ভ পোষণ না করলে মনীষীবৃন্দের মহামূল্য আবিষ্কারগুলি সম্বন্ধে বলা চলে যে, ঘটনা-মাত্রেরই কারণ সম্বন্ধে অলৌকিক অনুগ্রহের অনুভাবনাটি অবৈজ্ঞানিক। বিশ্বব্যাপারের মধ্যে অর্থাৎ সমগ্র প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে যেখানে যা কিছু ঘটছে, বিজ্ঞানীবৃন্দ তার সব কিছুর কারণ নির্ণয় করতে পারেননি, —শুধুমাত্র এই যুক্তিতে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত অসংখ্য সত্যের আলোক পানে চোখ বন্ধ করে রাখতে পারে একমাত্র দাম্ভিক আর

অবিশ্বাসী নাস্তিকেরাই ; কিন্তু আসলে এই দম্ভ আর নাস্তিক্য স্বার্থগোপনেরই নিপুণ কৌশল মাত্র। সুতরাং সত্যের প্রতি বিতৃষ্ণ নাস্তিক না হলে এটুকুও বলা চলে যে, প্রধানত ইউরোপেই বিজ্ঞানচিন্তার প্রসারটি কোনও দৈবাৎ-এর বা দৈবানুগ্রহের ব্যাপার নয়। তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে তার মোটামুটি সূত্রপাতের কালটিতে গিয়ে পৌঁছতে হয়। পূর্ববর্তী কালের, এবং বিশেষ করে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপীয় অর্থনীতি-সমাজনীতি এর মূল কারণ হতে পারে কিনা, অনুধাবন করলে হয়ত সঠিকভাবেই তা জানা যেতে পারে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে এসে যে ইউরোপীয় সমাজমানসে বিজ্ঞান-ভাবনার অমন মহিমাপ্রদীপ্ত প্রসৃতি ঘটল, তার কারণ কিন্তু ঐ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীই ; এবং উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বিস্ময়কর ভাবনাগুলিও মোটেই খাপছাড়া বা আকস্মিক নয়। সুতরাং বিদ্যুদ্বিশ্লেষণাদি তত্ত্বগুলির ক্ষেত্রে যে বৈজ্ঞানিক চিন্তার ঐক্য ঘটে উঠছে, তার কারণটি স্বাভাবিকই। এ যুগের কোনও আবিষ্কার কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত মানুষের একক আবিষ্কার নয়। ফ্যারাডে-ম্যাক্সওয়েল-হার্জের সঙ্গে তাই লজ-ফিট্‌জেরাল্ড্‌ও অনিবার্যভাবে যুক্ত। তত্ত্বের নাম ফ্যারাডে-ম্যাক্‌স্‌ওয়েল তত্ত্ব, বা অন্য যে কোনও নাম হক না কেন, তা যেন ক্রমাবিভূর্ত একই বৃহত্তর সুমহান চিন্তা চেতনার অমৃত ফল বিশেষ। হার্জের পরে যাঁরা ঐ আবেশ-তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নানাবিধ যন্ত্রপাতি নির্মাণ করেছেন, তাঁরাও সেই চেতনার অংশীদার। হার্জের পর লিডেন-জার বা আবর্তকুণ্ডলীর স্ফুরণ থেকে বিদ্যুচ্চৌম্বক বিচ্ছুরণকে ধরবার জন্য এঁরা নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করতে লাগলেন। ব্র্যানলি (Edouard Branly) এবং লজ কর্তৃক উদ্ভাবিত কোহিয়ারার (coherer) নামক যন্ত্রটি তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। যন্ত্রটিতে একটি নল আছে, লৌহচূর্ণ দিয়ে ভরা। বিদ্যুৎবর্তনীর মধ্যে একটি ভোল্টীয় কোষ, একটি গ্যালভানোমিটার এবং ঐ যন্ত্রটি সন্নিবিষ্ট থাকে। লৌহচূর্ণ প্রচণ্ড রোধ সৃষ্টি করে। কিন্তু বিদ্যুৎপ্রবাহ কোহিয়ারারে এসে পৌঁছলেই বিদ্যুৎযোগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেন লৌহকণিকাগুলিও একটু করে জোড়া লাগতে থাকে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে একটি অবিচ্ছিন্ন পরিবাহকের সৃষ্টি হতে থাকে। ফলে লৌহকণিকাগুলির রোধও কমে আসে। তখন ব্যাটারি থেকে তড়িৎ-প্রবাহ ক্রমাগত অধিক পরিমাণে বাহিত হতে আরম্ভ করে এবং তার ফলেই গ্যালভানোমিটারের কাঁটাও ক্রমাগত দূরবিক্ষিপ্ত হতে থাকে। রিঘি (Augusto Righi—1850-1920) হার্জের (আন্দোলক) কম্পন-কারক বা প্রবাহ-বিচ্ছুরক যন্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন।

এই রকম আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই উনবিংশ শতাব্দীতে মানুষের উদ্ভাবনী

চিন্তার নিশ্চিত জয়যাত্রা এগিয়ে চলল। চিন্তার বিকাশ আর চিন্তার বিস্তৃতি বা ঐক্য,—এ দিয়েই মানবসমাজের অগ্রগতির সংজ্ঞা নিরূপিত হতে লাগল। এ সত্য ধরা পড়তে লাগল যে, সমগ্র মানবসমাজের মনন-বিকাশের অর্থই হয়ে দাঁড়াচ্ছে বহু মানবের অনুভূতি আর মননের ঐক্য। আর বিশ্বব্যাপ্ত বস্তুবিধৃত সত্যের ঐক্যই যে মানস-ঐক্যের একমাত্র অবলম্বন, বস্তু বিজ্ঞান বা প্রকৃতি-বিজ্ঞানের দৌলতে তাও জানা হতে লাগল। বিদ্যুৎ-পরিবাহী ধাতুর মত ভাবনা-পরিবাহী ঐ বস্তুধারা, যার উৎস সন্ধানের জন্য বিজ্ঞানীর এমন শত শত বর্ষব্যাপী অভিযান! কিন্তু মূল বস্তু বলতে কি, অর্থাৎ পার্থিব বস্তুর প্রকৃত উপাদান কোনটি বা কোনগুলি, এখনও আমরা তার সঠিক সন্ধান পেলামনা। সুরঙ্গের আলো আর এক সুরঙ্গের পথ দেখিয়ে দিয়েছে মাত্র। সারা হয়ে গেছেন বিজ্ঞানীর দল। যা শেষ পর্যন্ত মিলেছে আসলে তা হল বস্তুর দু'টি গুণ মাত্র—তার সেই ভর-প্রকৃতি, আর তার এই বিদ্যুৎ (বা বিদ্যাচ্চৌম্বক)-প্রকৃতি। এই বিদ্যুৎ-প্রকৃতিকে অনুধাবন করতে গিয়ে আর যাদের পাওয়া গেল, সেই তাপ, চুম্বক, আলো,—তারাও সব গুণ বা তেজবিশেষ। বড়জোর না হয় ঐ বিদ্যুৎকে তাদের প্রতিভূ-তেজ বলে ধরে নিতে পারি। কিন্তু তার বস্তুত্ব বা উপাদানত্ব কোথায়? আর তাহলে ভাবনার অধিষ্ঠান-ভূমিও বা কোথায়? ঐ বৃক্ষ-লতা নদী-পর্বত লৌহ-তাম্রময় বস্তু জগতে কি? তাহলে কে বানাল এই মন্দির, সেতু? কে গড়ে তুলেছে এমন প্রতিমা, সৃষ্টি করেছে এত নৃত্য, এত গান? আর কেনই বা নয় ঐ লিডেন-জারটি? বা গ্যালভানোমিটার যন্ত্রটি? এরাও তো ভাবনার অধিষ্ঠান ভূমি! যে এদের উপভোগ করছে, তার ভাবনা হয়ত ঐ বস্তুভার নিয়ে। কিন্তু যে এদের বানিয়েছে তার ভাবনা তো তাদের বস্তুতত্ত্ব নিয়েই। সুতরাং কী সে তত্ত্ব, যার অভিমুখী হয়ে ভাবনার এমন বিকাশ! স্থূল বস্তুকে যখন সে গড়ে তুলেছে, তখন স্থূলবস্তুর সর্বাঙ্গ জুড়েই সে তত্ত্বটি অনুস্যূত (গাঁথা) হয়ে আছে। সুতরাং সেই তত্ত্বটিই ঐ স্থূলবস্তুটির মূল উপাদান নয় কি,—যাকে অবলম্বন করে ভাবনার এই ক্রমবিকাশ? তাহলে বিকাশমান ভাবনার পরিবাহক বস্তুটি পার্থিব মূল উপাদান ছাড়া আর কিছুতো হতে পারেনা। তাহলে তারও লীলাক্ষেত্র ঐ ভরতেজ রূপ প্রকৃতির মধ্যেই? কিন্তু তেজ বা বিদ্যুৎ তো চপলা! তাকে কেমন করে অবলম্বন করে রইবে ভাবনা? কিন্তু করে বলেই কি ভাবনাও এমন চিরচঞ্চল? কিন্তু ভরপ্রকৃতি? সেও কি চঞ্চলস্বরূপ? তার সম্বন্ধে অন্তত আর এইটুকু জেনে নিতে হয়। হলে কোথায় আর পাওয়া যাবে গুণবিযুক্ত মূল উপাদানকে? তাই আর একবার ফিরে তাকাতে হয় সেই মেন্দেলিয়েভের ছকের দিকেই, যেখান থেকে সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়েই চলে আসতে হয়েছিল। বিদ্যুতের

নিথর আঁধারে নিশ্চিত ব্যর্থতার মরণ বরণ ছাড়া আপাতত সেই ভাল ; উপায় নেই। কিন্তু তাতেও বা লাভ কি ?

বস্তুজগতের পিছনে চুপি সাড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিরানব্বইটি পরমাণু। কী তাদের বাণী, কে তা বলবে ? এক একটি যেন হিমালয়ের মত অটল, কিংবা অগ্নিগর্ভ বিসুবিয়াসের মত। কোন্ শক্তি সে বহ্নিমুখ খুলে দেবে ? আর তাকে কুপিত না করেই তার জঠর সম্পদ দেখে নেবে ? অসীম আকূতি, অনন্ত পিপাসা বিজ্ঞানীর। মহাতপস্বীর সাধনার হোমানল জ্বলে গেল দিকে দিকে। প্রকৃতি কেঁপে উঠল বার বার। এমন নিষ্ঠাময় মিলিত সাধনার কাছে ধরা না দিয়ে পারবে কেন সে ? আবার যেন সারা বিশ্বময় বিদ্যুতের দ্যুতি ঝলসে উঠল বার বার। তাহলে এই বিদ্যুৎই কি আজ সাধের মানুষকে দেওয়া প্রকৃতির আশীঃপূত সার্থকতম উপহার ! কিন্তু সত্যিই তো, বিদ্যুতের চাইতে কোন্ শক্তি বড় হতে পারে আর ? বিজ্ঞানী পেয়ে গেলেন তাঁর অস্ত্র। সেই বিদ্যুৎ-অস্ত্র দিয়েই তো তাহলে পরমাণুর বহ্নিমুখ উন্মোচিত হতে পারে ! অস্পষ্ট ভাবনার শিহরণে তিনি নিজেও কেঁপে উঠলেন। কিন্তু এগিয়ে চললেন আর একবার নিশ্চিত পদক্ষেপে। বিদ্যুতের পুনর্জন্ম ঘটল।

বিপর্যস্ত পরমাণু

প্রোজ্জ্বল আলো আর দীপ্যমান তাপ বিজলির দলে ভিড়ে গেল। ফ্যারাডের স্বপ্নদর্শন সার্থক হল। স্বপ্নদর্শন বা তত্ত্বদর্শনই। কিন্তু সে কি বিজ্ঞানীর বস্তুতথ্য দর্শন, না ঋষির বিশ্বরূপ দরশন? এ বিশ্ব কি তাহলে বস্তুবিশ্ব শুধু? আর সত্য কি একমাত্র ঐ বস্তুসত্যই? কিন্তু তাহলে কোথায় সে বস্তুমূল, সত্য যার নাম? বস্তু কি তাহলে ঐ গুণদ্বয় মাত্র, না তাদের সমাহার? ঐ ভর আর তেজের? খুঁজে তো মিলল না কোথাও কোনো বস্তুসত্তা। বিজ্ঞানী নিরুপায়। তাঁর আর একটু অনুসন্ধান বাকি। বিদ্যুৎশক্তিটি আলো আর তাপ প্রভৃতি ছাড়া অন্যান্য পার্থিব শক্তির সত্যিকারের প্রতিভূ হতে পারে কিনা, এটি হয়ত পরীক্ষা করে দেখা দরকার। অবশ্য সেটি তত বড় কথা নয়, আপাতত আমরা ঐ প্রতিভূ-শক্তিকে বিদ্যুৎ বা আলো প্রভৃতির বদলে কেবল শক্তি বা তেজ বলেই ধরে নিতে পারি। হয়ত আসল প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেলে এ ব্যাপারেও একটি সমাধান মিলে যেতে পারে। কিন্তু একটি জিনিস এখনও অনুসন্ধান করে দেখে নিতে বাকি আছে যে, ভর আর তেজ—হ'ক না এরা কোনো অধরা বস্তুর দুটি গুণ—এদের পরস্পরের মধ্যে কি কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই? যদি থাকে তাহলে সেটি কি কোনো পার্থিব সম্পর্ক হবেনা? সত্যিই তো, বিদ্যুৎশক্তির মধ্যস্থতায় দুটি পরমাণুর মিলনসাধন প্রক্রিয়ার পরিকল্পনায় এ প্রশ্ন আগেও উঠেছিল (পৃ. ১০৯-১১)। সেখানে এও দেখা গিয়েছিল যে, মিলন-প্রক্রিয়ায় কেবল কিছুটা তাপ নির্গত হয়ে চলে যায়, তাকে বিদ্যুৎশক্তির তাপীয় রূপান্তর মনে করা যেতে পারে। কিন্তু তখন তো বিজ্ঞানীরা কেবল মিলন-মাতাল হলেন, দ্বৈত তত্ত্বের উদ্ভাবনার দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগলেন। আর সেই ফাঁকে ঐ তড়িৎ-তাপের অদ্বৈত তত্ত্বের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিয়ে ভর তেজের সম্ভাব্য মূল অদ্বৈত তত্ত্বটি বেশ ফাঁকি দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। কিন্তু এখন? শুধু তড়িৎ-তাপে তো চলছেনা। ভর তেজ নিয়ে দেখতেই হয়। কিন্তু সেটি হবে কি দিয়ে? বিজ্ঞানীদের সম্মিলিত তপস্যার কাছে প্রকৃতির ইঙ্গিত—ঐ বিদ্যুৎ দিয়েই।

কাজ মিলে গেল। বিংশ শতাব্দীর যাত্রার আয়োজন শুরু হয়ে গেল। কিন্তু সত্যিই কি বিশেষ দিনক্ষণ ধরে প্রকৃতি দেবী তাঁর প্রিয়তম মানবসন্তানের কাছে এসে মূল মন্ত্রটি উচ্চারণ করে সরে পড়েন? দেখেছিই ত প্রকৃতির কাজের ধারা। সব কিছুকে ক্রমে ক্রমে উদ্ভূত করে তোলাই যেন সেই রীতি। রয়ে বসে চলে সেই

কাজ। কিন্তু যখন সময় ঘনিয়ে আসে, একেবারে ওস্তাদের মার,—অব্যর্থ, অপ্রতিরোধনীয়। মন্ত্রটির অর্থ হয়ত মুহূর্তে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার সূচনা ঘটেছে অনেক আগেই। কত কাকলি, কত মন্দ্র, তারপরে না সুস্পষ্ট ধ্বনি। সুতরাং সূচনার কালটিই না কতকাল! হয়ত অষ্টাদশ-উনবিংশ গোটা যুগ্ম-শতাব্দীই! তার আগেও তো আমরা দেখেছি (পৃ. ৭৯-৮০) ১৬৭৬ খ্রী.-এ পিকার্ড্ যখন মান মন্দির থেকে বায়ুচাপমান যন্ত্র নিয়ে আসছিলেন, তখন টরিসেলীয় শূন্য-স্থানের মধ্যে কী অপূর্ব দ্যুতি বিচ্ছুরণ ঘটছিল। সেই থেকে যেন বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছিল, এবং অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভেই বেশ কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানী শূন্যস্থানের মধ্যে তাঁদের পরীক্ষার বিষয়কে সন্নিবিষ্ট করে কাজ করতে আরম্ভ করছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে ১৭০৫ খ্রী.-এই হক্স্‌বী লক্ষ্য করেছিলেন যে, কোনো পাত্রে হাওয়াকে যথাসম্ভব কমিয়ে দিলে সেই পাতলা হাওয়ার মধ্যে কাচের ঘর্ষণে এক রকমের ঔজ্জ্বল্য দেখা দেয়। বেশ কিছুকাল পরে ১৭৪৪ খ্রী.-এ গ্রুমার্ট্ (Gottfried Heinrich Grummert—1719-'76) এবং ওয়াট্‌সন (Sir William Watson—1715-'87) বোধহয় সর্বপ্রথম ঐভাবে সূক্ষ্মায়িত গ্যাসের মধ্য দিয়ে অবিরত বিদ্যুৎ-ক্ষরণ ধারা প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। ওয়াট্‌সন একটি তিন ফুট দীর্ঘ এবং তিন ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট দু'মুখ বন্ধ কাচনল নিয়েছিলেন। তার দুটি প্রান্ত দিয়ে দুটি ধাতব পাতের অল্পাংশ নলের মধ্যে ঢোকান ছিল। তিনি সেই কাচনলের মধ্য থেকে যথাসম্ভব বায়ু টেনে নিয়ে একটি তড়িৎ যন্ত্রের সাহায্যে নলের দুটি ধাতব প্রান্তকে যুক্ত করে দিয়েছিলেন। তারপর তিনি ক্রমেই ঐ নলের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রেরণ করতে থাকেন এবং দেখতে পান যে, নলের প্রান্তদ্বয়ে অল্প ঢোকানো ঐ ধাতব পাত দুটির মধ্যে ৩২ ইঞ্চি দীর্ঘ স্থান জুড়ে বিদ্যুচ্ছটা স্ফুরিত হচ্ছে। তার আকৃতি কিন্তু সাধারণ রশ্মি-বিচ্ছুরণের মত মার্জনী (ঝাঁটা) সদৃশ নয়। রং তার উজ্জ্বল রূপালি। ঠিক যেন মেরুজ্যোতি, চঞ্চল মন্দোজ্জ্বল আলোক শিখা। সেকালে বিদ্যুৎকে যে একটি তরল পদার্থ মনে করা হত, তা আমরা আগেই দেখেছি। স্মরণীয় যে, কাচ জাতীয় আর রজন জাতীয় দু'রকমের তড়িতের জন্য দু ফে দু'রকমের তরল পদার্থের কল্পনা করেছিলেন (পৃ. ৮৭-৮৮)। কিন্তু ফ্রাঙ্ক্‌লিন তড়িতের দুটি প্রকৃতিকে একই তরলের বাড়তি ও ঘাটতি রূপ কল্পনা করে এ সম্বন্ধে যুগ্ম-তরলের স্থলে একক-তরলের তত্ত্ব ঘোষণা করেছিলেন (পৃ. ৯০-৯১)। তখন সেই একক-তরলের উপর নির্ভর করে ওয়াট্‌সন্ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অগ্রসর হলেন। তিনি দেখলেন যে, কোনো অতিপ্রাকৃত বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়াও ঐ জ্যোতির্ময় আলোকশিখার উদ্ভব ঘটছে। সুতরাং নিশ্চয় তার একটি সংগত কারণ থাকা

দরকার। তিনি অনুমান করলেন যে খুব সম্ভবত ঐ বিদ্যুৎ-তরলটি ঐ যন্ত্রটির মধ্যে সাম্যাবস্থা রক্ষার চেষ্টা করছে। তার ফলেই সে তার স্বীয় স্থিতিস্থাপক গুণে শূন্য নলের মধ্য দিয়ে নিজেকে এভাবে প্রসৃত বা বিস্তৃত করে দিচ্ছে। কিন্তু নোলেও প্রায় একই সময়ে ঐ রকম সব পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ চালিয়ে এ-ব্যাপারটির ভিন্ন ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি বললেন যে একটি বহির্গামী প্রবাহের কণিকাগুলির সঙ্গে একটি বিপরীতমুখী অন্তর্গামী প্রবাহধারার কণিকাগুলির তুমুল সংঘর্ষের ফলেই ঐ আলোর উৎপত্তি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা গেলনা। দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যাপারটি ঐভাবেই পড়ে রইল। প্রকৃতি যেন তখন শুধু কয়েকবার উঁকি দিয়ে চলে গেল মাত্র।

বহুকাল পরে ১৮২১ খ্রী-এ ডেভি আবার দেখতে পেলেন যে ঐরূপ নলে দু'টি কার্বন-দণ্ডের মধ্যে বিদ্যুৎক্ষরণ ঘটলে তার কাছাকাছি জায়গায় যদি কোনো চুম্বক দণ্ড এনে ধরা যায় তাহলে তড়িৎধারা চৌম্বক ক্ষেত্রের পাশে এসে বেঁকে যায়।
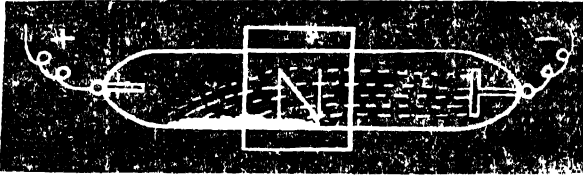
কিন্তু তখনও এ বিষয় নিয়ে বিশেষ কেউ মাথা ঘামালেননা। প্রায় সতর বছর পরে ১৮৩৮ খ্রী.-এ ফ্যারাডেই আবার এবিষয় নিয়ে একটু অনুধাবনের চেষ্টা করলেন। একদিন তিনি নলের মধ্যে বাতাসকে বেশ কমিয়ে দিয়ে দুটি প্রান্তিক পিতল-দণ্ডের মারফতে তড়িৎ প্রেরণ করছিলেন। ক্রমে তিনি দেখতে পেলেন যে, যেন এক বিশেষ ধরনের বেগনি রঙের কুজ্ঝটিকাস্রোত ধন মেরু থেকে ঋণ-মেরু পর্যন্ত প্রসৃত হয়ে রইল। ঠিক ঋণ-মেরু পর্যন্ত না। কারণ একটি রক্তিম ছটা যেন ঋণ-মেরুটিকে ঘিরে রইল, আর ঐ কুজ্ঝটিকার ধারা যেন তার কাছাকাছি এসেও তাকে স্পর্শ করতে পারলনা, একটি আঁধার আবরণ উভয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে একটি ব্যবধান রচনা করে দিলে। আবিষ্কারকের নাম অনুযায়ী আঁধার জায়গাটির নামকরণ হয়েছিল ফ্যারাডের আঁধার স্থল। কিন্তু আসলে যে ব্যাপারটি কী ঘটল, তা বোঝা গেলনা। একি কাচ বা রজন জাতীয় বিদ্যুতের কোনো ব্যাপার? অর্থাৎ ঐ বাড়তি-ঘাটতি তত্ত্বের? কিন্তু প্রকৃতির ব্যাপারই আলাদা। অত্যন্ত জটিল বলে যাকে মনে হবে, তা হয়ত কিছুইনা, জলের মত পরিষ্কার। আবার যাকে বেশ সোজা

বলেই মনে হচ্ছে, সে যে কী পরিমাণে বাগড়া দিতে পারে, তা ভেবে কূল-কিনারা পাওয়া যায়না। ফ্যারাডে তাই অব্যর্থদ্রষ্টা দার্শনিকের ন্যায় শুধু এইটুকু জানিয়ে রাখলেন,—পজিটিভ (বাড়তি) নেগেটিভ (ঘাটতি) বিদ্যুৎক্ষরণোপযোগী ভিন্ন অবস্থাগুলির সঙ্গে যে ফলাফল জড়িয়ে আছে, সমগ্র বিদ্যুৎবিজ্ঞান-দর্শনের উপর তার প্রভাবটিও হবে সুদূরপ্রসারী আর অভাবিতপূর্ব।

আরও প্রায় বিংশ বর্ষের বর্ষণ ধারা কেঁদে কেঁদে চলে গেল। ব্যাপারটি পড়ে রইল প্রায় যেমনকে তেমন, যুগবিলোড়নকারী এমন অসীম তাৎপর্যময় ব্যাপারটিও। কিন্তু সত্যিই কি এরকম একটি ঘটনা এভাবে এতকাল পড়ে থাকতে পারে, ঐ সমীক্ষা আর অনুসন্ধানের যুগেও? বিজ্ঞানসাধনার ধারা কি অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবাহিত হয়ে যেতে পারেনা বিজ্ঞানমানসের গোপন খাত বেয়ে, বিজ্ঞানীর সচেতন চিন্তার নিভৃত অন্তরাল দিয়ে? নিশ্চয় তা পারে, এবং অনিবার্যভাবেই তাকে পারতে হয়। তা না হলে সেই পরীক্ষার ধারাকে শেষ পর্যন্ত আবার চালু করে দিতে পারেন কিনা টুবিঞ্জেনের একজন সাধারণ কর্মী, যিনি ফুঁ দিয়ে কাচের যন্ত্রপাতি তৈরি করেন! ১৮৫৩ খ্রী.-এ প্যারিসের ম্যাসনকে (A. P. Masson) একটি শক্তিমান রুম্‌কর্ফের আবেশী-আবর্তগুচ্ছ (পৃ. ১৩৯) থেকে টরিসেলীয় শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎক্ষরণ চালনা করতে দেখে গ্যাসিও (J. P. Gassiot—1797-1877) পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন গ্যাসবাহী কয়েকটি নল তৈরি করছিলেন। তাই দেখে ১৮৫৫ খ্রী.-এ ঐ কাচপাত্র-নির্মাতা গাইস্‌লার (Heinrich Geissler—1814-'79) বাতপাম্প্ বা পারদ বাষ্প-নিঃসারণ যন্ত্র উদ্ভাবন করে খুব দক্ষতার সঙ্গে ঐ রকম সব নল তৈরি করতে লাগলেন। আর ঐ যন্ত্রই শেষে কিনা হয়ে গেল বিজ্ঞানীর যুগব্যাপী সাধনার উপযোগী সহজলভ্য যন্ত্র! গাইস্‌লার শুধু দাঁড়িয়ে গেলেন তাই না, অমর হয়ে গেলেন। পরে তিনি যন্ত্রপাতি নির্মাণের এক বিরাট কারখানার মালিক হয়েছিলেন। কিন্তু বছর তিনের মধ্যেই বন-এর প্লুকার (Julius Plücker—1801-'68) গাইস্‌লারের নির্মিত নিঃসারিত নল নিয়ে বিদ্যুৎ-ক্ষরণের গবেষণার কাজটি আবার আরম্ভ করে দিলেন। সর্বপ্রথম ঐ নল তৈরির কৃতিত্ব গাইস্‌লারের নয়। কিন্তু তাঁরই নামে ঐ নলের নাম চালু করে দিলেন প্লুকারই। গাইস্‌লার-নলের বিদ্যুৎ বিচিত্র শোভা সৃষ্টি করে জনসাধারণের নয়ন রঞ্জন করতে লাগল।

কিন্তু কার ঐ শোভা? ঐ গ্যাসের, না ঐ বিদ্যুতের? বিদ্যুতের আলো-বৈচিত্র্যের কোনো সংবাদ তো আমরা পাইনি। আর ঐ নলের মধ্যে গ্যাসেরাও তো সাধারণ অবস্থায় বর্ণবৈচিত্র্যহীন। প্রায় একশ বছর আগে নিউটন যে বর্ণালি আবিষ্কার

করেছিলেন, তাতেও আমরা রঙ-বাহার দেখেছি। তাহলে সেই বর্ণবৈচিত্র্যের সঙ্গে কি এই গ্যাসীয় বস্তুর কণিকাগুলির বর্ণবৈচিত্র্যের কোনো সম্পর্ক আছে? আর সে সম্পর্ক কি বিদ্যুৎকে নিয়েই? কারণ বিদ্যুৎযুক্ত না হলে তো ঐ বস্তুকণিকাগুলি বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠতে পারেনা। সুতরাং যদি ওদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক থেকে থাকে, তাহলে কী সে সম্পর্ক? সেই সম্পর্কের মধ্যেই কি তাহলে বিদ্যুৎ আর আলোর নিগূঢ় সম্পর্কের সংবাদটি পাওয়া যাবেনা? এখনি এ প্রশ্নের পুরোপুরি সমাধান না মিললেও আঁধার ক্রমেই ফিকে হয়ে আসতে লাগল। মাতা প্রকৃতি যেন ঠিক সময় বুঝেই কোন্ অদৃশ্য লোক থেকে নেমে এসে বিজ্ঞানীর সামনে ঐ আলোরশ্মি দিয়েই বস্তুকণিকার অভ্যন্তর প্রদেশটিকে একবার চকিত চমকে দেখিয়ে দিলেন।

প্রায় একই সময়ে ১৮৫৯ খ্রী-এ জার্মান রসায়নবিদ্ বানসেন (Robert Wilhelm Bunsen –1811-'99) কাচ-প্রিজমের সাহায্যে বর্ণালি-বিশ্লেষণের কাজ করছিলেন। তাঁর পরীক্ষা চলছিল কিন্তু সূর্যালোক নিয়ে নয়। সে পরীক্ষাতে আলোর উৎস ছিল সাধারণ নুনজলে ভিজান একটি জ্বলন্ত ছিন্ন কম্বল। নিউটনের বর্ণালিতে সূর্যরশ্মি থেকে প্রাপ্ত রামধনুর যে সাতটি রঙের বাহার দেখা গিয়েছিল, তা যেন ছিল পাশাপাশি পৃথক পৃথক রঙ-বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও একটি অবিচ্ছিন্ন একটানা বর্ণধারা। কিন্তু এক্ষেত্রে বানসেন কয়েকটি মাত্র সরু রেখা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেননা। রেখাগুলির মধ্যে একটি অবশ্য খুব উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের। তিনি এবং আর এক জার্মান বিজ্ঞানী কির্চফ্ (Gustav Kirchhoff –1824-'87) মনে করলেন যে, কাচ-প্রিজম্ আলোরশ্মিকে ভেঙে তার বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গগুলিকে পৃথক করে দেয়, কিন্তু লবণের মধ্যে সূর্য-রশ্মির মত দৃশ্যমান সকল প্রকার আলোর সমাহার থাকেনা। তার মধ্যে কেবল নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট হলুদ বর্ণের আলোটিই বিদ্যমান থাকে। তাই প্রিজম্টি একমাত্র ঐ হলুদ বর্ণকেই আমাদের চোখের সামনে ধরে দেয়। কিন্তু সাধারণ লবণের ($NaCl$) মধ্যে তো থাকে সোডিয়াম (Na) আর ক্লোরিন (Cl)। ঐ হলুদ রঙটি তাহলে কার? সোডিয়ামের, না ক্লোরিনের? ক্লোরিন এবং হাইড্রোজেন যুক্ত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে (HCl) জলে মিশিয়ে তার মধ্যে কম্বল ডুবিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করা হল। হলুদ রঙ পাওয়া গেলনা। অথচ সোডিয়াম আর হাইড্রোজেন যুক্ত কস্টিক সোডা ($NaOH$)-দ্রবণের পরীক্ষায় সেই হলুদ হাসি ঝরে পড়ল। সুতরাং ঐ হলুদ রঙটি যে একমাত্র সোডিয়াম বস্তুটিরই বৈশিষ্ট্য, তাতে আর কোনো সন্দেহ রইলনা। অর্থাৎ যে বস্তুর বিকীর্ণ আলোরশ্মিকে

প্রিজ্‌মের দ্বারা বিশ্লেষণ করলে ঐ প্রকার হলুদ বর্ণের উজ্জ্বল রেখা বিশিষ্ট বর্ণরৈখিক সমাবেশটি পাওয়া যাবে, সে বস্তুটি নিশ্চয় সোডিয়াম হবে। ক্রমেই জানা গেল যে, সকল রাসায়নিক উপাদানের, বা তাদের যৌগিকের প্রত্যেকেরই নিজস্ব বর্ণবৈশিষ্ট্য বা আলো-তরঙ্গ আছে। বর্ণালি বিশ্লেষণ দ্বারা তাদের সব পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন সমাবেশ ধরা পড়ে। সে সব বর্ণবিন্যাসের কোনো কোনোটি খুবই সরল, আবার কোনো কোনটি অত্যন্ত জটিল। কিন্তু তাদের ঐ বিশিষ্ট বর্ণবিন্যাস বা রঙের ক্রমগুলি দেখে কোন্‌টি যে কোন্ বস্তুর আলোবিন্যাস, তা সহজেই চিনে নেওয়া যায়। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যেখানেই ঐ বস্তুটি অবস্থান করুক না কেন, কেবল তার আলোরশ্মিটি আমাদের কাছে এসে পৌঁছলেই প্রিজ্‌ম্ সাহায্যে তাকে বিশ্লেষণ করলে তার কুল-পরিচয়টিও সহজে সংগ্রহ করে নেওয়া সম্ভব হয়। আলোর রূপ থেকেই এভাবে বস্তুর স্বরূপটিও বুঝে নেওয়া যায়।

আবার আমরা সকলেই জানি যে খুব উত্তপ্ত হলে সব বস্তুই জ্বলজ্বল করে এবং আলো দেয়। তাই ধরে নিতে হয় যে, তাপ-রশ্মি এবং আলো-রশ্মি এই উভয় প্রক্রিয়াই মূলত এক। সেই কারণে এদের প্রত্যেকটিকেই তাপ-বিকিরণ প্রক্রিয়া (thermal raditaion) হিসাবে ধরা হয়। উনুন থেকে যে রশ্মি তাপের বোধ জাগায় তার নাম উত্তাপ-রশ্মি বা লাল-উজানী রশ্মি (দৃশ্যমান রশ্মিগুলির মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সর্বাধিক। তার চাইতেও দীর্ঘতর তরঙ্গবিশিষ্ট আলোকে লাল-উজানী রশ্মি বলা হয়)। কিন্তু কোনো বস্তুর তাপ বাড়তে থাকলে তার জ্বলজ্বলে লাল রশ্মিটি ক্রমেই পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং শেষে ঐ বস্তুটি থেকে সাদা আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকে। অর্থাৎ যতই উত্তাপ বৃদ্ধি ঘটতে থাকে, ততই বিকিরণ ঘটনাটি প্রচণ্ড হয়ে উঠে এবং উত্তাপ বৃদ্ধির ফলে বস্তুটি থেকে বিচ্ছুরিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যও ততই ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হতে থাকে। অর্থাৎ বোঝা যায় যে, উত্তাপ আর আলোর সম্পর্কটি ঘনিষ্ঠ এবং তার সঙ্গে ঐ বর্ণ-সম্পর্কটিও জড়িয়ে আছে। কিন্তু এর সঙ্গে বিদ্যুতের সম্পর্কটি কোথায়, তা খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়লনা। অথচ আমরাতো বিদ্যুৎবিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবেই দেখেছি (পৃ ১০৯ ১৩) যে, রাসায়নিক ও তাপশক্তির সঙ্গে বিদ্যুৎশক্তির নিশ্চিত সম্পর্ক বিদ্যমান! তাছাড়া গাইস্‌লার-নলের মধ্যেও দেখছি যে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠিয়ে দিলেই তবে বর্ণবৈচিত্র্যহীন গ্যাস-অণুগুলি বর্ণোজ্জ্বল শোভা বিস্তার করতে থাকে! সমস্তই স্পষ্ট হয়ে এসেও আবার যেন ঝাপ্‌সা হয়ে উঠে। আরও সাধনা, আরও পরীক্ষা চাই। প্লুকার তাঁর ক্ষরণ-নলের পরীক্ষাটিকে এগিয়ে নিয়ে চললেন।

১৮২১ খ্রী.-এ ডেভি যা করেছিলেন, প্রায় চল্লিশ বছর পরে প্লুকারও তাই দিয়ে

শুরু করলেন এবং চুম্বকের প্রভাবে ক্ষরণ-ধারার সেই একই ফল প্রত্যক্ষ করলেন। কিন্তু তিনি তৎসহ, চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে পূর্বোক্ত নেগেটিভ-ছটার একটি অদ্ভুত পরিবর্তনও দেখতে পেলেন। ঋণ-তড়িদ্দ্বারটিকে পাতের বদলে একটি বিন্দুতে পরিণত করে দিলে সমস্ত নেগেটিভ-দ্যুতিটি ঐ বিন্দুভেদী চৌম্বক বলরেখার ওপরে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। মনে হয় যেন তড়িদ্দ্বারের প্রান্তমুখী এক নমনীয় লৌহচূর্ণ-শৃঙ্খলমালা। আর ঋণ তড়িদ্দ্বারটি যদি প্লাটিনাম ধাতু দিয়ে তৈরি হয়, তাহলে দেখা যায়, তা থেকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য কণিকা বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে কাচনলের গায়ে পড়ে জমা হতে থাকে। প্লুকার মনে করলেন, ঋণ-তড়িদ্দ্বার থেকে বিচ্ছিন্ন প্লাটিনাম কণাগুলির গনগণে তাপ থেকেই ঐ চৌম্বকালোকের উৎপত্তি। তিনি দেখলেন যে, তড়িৎক্ষরণকালে ঋণ-তড়িদ্দ্বারের কাছেই কাচনলের গাত্র এক অনুপ্রভ আলোকচ্ছটায় জল জল করতে থাকে বটে, কিন্তু চৌম্বক ক্ষেত্রটি যেই পালটে দেওয়া হয়, অমনি ঐ আলোকচ্ছটাও সরে গিয়ে স্থান পরিবর্তন করে। এ থেকেই আবার এক নূতন আবিষ্কারের পথ খুলে গেল। ১৮৬৯ খ্রী.-এ প্লুকারের ছাত্র হিটফর্ ঐ বিন্দু-তড়িদ্দ্বার আর প্রতিপ্রভ আলোর মাঝে একটি কঠিন বস্তু স্থাপন করতেই দেখতে পেলেন যে, প্রক্রিয়াকালে ঐ বস্তুর পেছনে একটি ছায়া এসে পড়ল। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন যে, নেগেটিভ-দ্যুতিটি ঋণ-তড়িদ্দ্বার থেকে সরলরেখায় ধাবিত বিচ্ছুরিত রশ্মিগুচ্ছ ছাড়া আর কিছু নয়। ওরাই নলের গায়ে ধাক্কা দিয়ে অমন প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে। তাঁর সিদ্ধান্তটি ১৮৭৬ খ্রী.-এ বার্লিনের গোল্‌ড্‌স্টাইনের (Eugen Goldstein –1850-1930) দ্বারা সমর্থিত হল। তিনি দেখলেন যে তড়িদ্দ্বারটিকে বিন্দুরূপে না রেখে বিস্তৃত করে দিলেও, যদি কঠিন বস্তুটিকে তড়িদ্দ্বারের খুব কাছাকাছি এনে রাখা যায় তাহলেও ছায়া পড়তে থাকে। এ থেকে বোঝা গেল যে ঋণ-তড়িদ্দ্বার বা ক্যাথোড থেকে রশ্মিগুলি এলোমেলো ভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েনা। তড়িদ্দ্বারের তলের প্রত্যেকটি অংশ থেকেই নির্গত হয়ে তারা সকলে প্রায় একই অভিমুখে ছুটে চলতে থাকে। আর প্রত্যেকটি রশ্মিধারাই তার নির্গত বিন্দুতে তলের উপর লম্ব রেখা ধরে এগিয়ে চলে। অর্থাৎ সাধারণ আলোরশ্মির নিয়ম কানুনই তো তারা মেনে চলেছে। সুতরাং এসব থেকে ওগুলিকে রশ্মি ছাড়া আর কিছু বলা যায়না। তবে ঋণ-তড়িদ্দ্বার বা ক্যাথোড থেকে তারা নিঃসৃত হচ্ছে বলে তাদের নামকরণ হল ক্যাথোড-রশ্মি বা ঋণ-রশ্মি। হিটফর্ আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন যে, নল থেকে ক্রমাগত বাতাস টেনে নিতে থাকলে নেগেটিভ-মেরু আর নেগেটিভ-ছটার মধ্যবর্তী স্থানে একটি আঁধার স্থল উদ্ভূত হয়ে ক্রমাগত বেড়ে চলতে থাকে এবং শেষে সেটি সমস্ত

নলকেই ভরে তুলে। ১৮৭৮ খ্রী.-এ ক্রুক্‌স্ (Sir William Crookes—1832-1919) এ ব্যাপারটি নিয়ে বিশেষভাবে অনুধাবন করলেন।

কিন্তু হিটর্ফের অনুসন্ধানের এক বছর পরে ১৮৭০ খ্রী -এ ভার্লে (Cromwell Fleetwood Varley—1823-'83) ঐ রশ্মিগুলি সম্পর্কে এক আশ্চর্য অনুমান করে বসলেন যে, সেগুলি ঋণ-মেরু থেকে তড়িদুৎক্ষিপ্ত (বিদ্যুৎ দ্বারা উৎক্ষিপ্ত বা উত্তোলিত) ক্রমায়িত পদার্থকণা দিয়েই গঠিত ; কণিকাগুলি ঋণ-বিদ্যুৎদাধান-যুক্ত বলেই চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে এলে ওভাবে দূরে সরে যায়। আশ্চর্য কল্পনা বটে বিজ্ঞানীর—রশ্মি বা শক্তিকেও পদার্থ বলে কল্পনা! পদার্থ পদার্থ করে কি ওঁরা উন্মাদ হয়ে যাবেন নাকি? তবে এ কল্পনা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে একে নিঃসন্দেহে মানব চিন্তার ইতিহাসে এক গুণগত ক্রান্তির (দশান্তর প্রাপ্তির) দ্যোতনাময় অমোঘ মহাসূচনা বলে ধরে নেওয়া চলে। তাহলে আর **দু'বছর পরে সারা পৃথিবীময় এই ঘটনার (এবং পর্যায়িক ছক আবিষ্কার ঘটনারও) শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য এখন থেকেই আয়োজন চালিয়ে যাওয়া কর্তব্য।**

কিন্তু প্রকৃতির বিধান অমোঘ (অব্যর্থ, সার্থক)। তাকে অন্যথা করবার ক্ষমতা কারও নেই। সর্বশক্তিমান বলে যদি কোনো অপ্রাকৃত বিধাতার কল্পনা করা যায়, তাঁরও না। আর যদি তাঁর থেকে থাকে বলেও ধরে নিই, তাহলেও তাঁকে **প্রকৃতি থেকে ভিন্নরূপে কল্পনা করবার কোনো যোগ্যতাই মানুষের নাই।** কারণ, সাকার বা নিরাকার, 'নিত্য' ও 'সনাতন' এবং 'সর্বগত' বা 'স্থাণু', যা কিছু রূপেই তাঁকে কল্পনা করা যাক না কেন, সে কল্পনার জন্য প্রাকৃতিক বস্তুর দ্বারস্থ হতেই হবে। কিন্তু বিশেষ মানুষের স্বার্থবিরোধী কর্মমাত্রকেই যদি অন্য ব্যক্তির অন্যায় বা পাপের দৃষ্টান্ত বলে প্রতিপন্ন করতে হয়, তাহলে সেই অন্য ব্যক্তির শাস্তারূপী কল্পিত সত্তাকে সুবিধে মাফিক অসংখ্য অসম্ভব ও উদ্ভট গুণযুক্ত হতেই হয়। কিংবা, 'নিঠুর পীড়নে' অগণিত দুর্ভাগার 'বক্ষ নিঙাড়ি' পাওয়া কোনো বিশেষ ব্যক্তির সৌভাগ্যকে যদি ঐ সৌভাগ্যবান বা অনুগ্রহভাজনেরই স্বীয় ন্যায় ও পুণ্য কর্মের পুরস্কার বলে ঘোষণা করতে হয়, তাহলে তজ্জন্য পূর্বোক্ত মন্দভাগ্য ব্যক্তিমাত্রেরই দুর্দশা বা পীড়ন মূলক যাতনাকে সেই দুর্ভাগার নিজেরই পাপকর্মের ফল বলে বিধান দেবেন যিনি, তাঁর মধ্যে তো ঐ অদৃশ্য বা অপ্রমেয় সত্তাধিকারীর অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি সংক্রান্ত কল্পনা-সমর্থনযোগ্যতা থাকতেই হবে! কিন্তু প্রকৃতির সে যোগ্যতা কোথায়, যা ঐ যদৃচ্ছ কল্পিত বিধাতায় বিদ্যমান, যেজন্য তাঁকে যা-ইচ্ছে-তাই ধরে

নিতে বাধেনা। আর 'অবাঙ্‌মনসগোচরা'দি কথার বর্ণ শব্দাদি সবই তো লৌকিক বা প্রাকৃতিক। তাছাড়া ওকথাগুলির তাৎপর্য প্রতিপন্ন করছে কোনো অপ্রাকৃত বিধাতা হঠাৎ আবির্ভূত বা ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত হয়ে নয়—বিশ্বরূপাদি দর্শন সম্বন্ধে বহুমানিত ঋষিবৃন্দের সহস্র আশ্বাস বাণী সত্ত্বেও নয়।—কিন্তু যেসব বস্তুকে মানুষ কখনও দেখেনি, যাদের কথা কখনও সে শোনেনি, যাদের সম্বন্ধে কোনোদিন কোনো কল্পনাও পর্যন্ত করতে পারেনি, প্রকৃতির রাজ্যের সেই সব নিয়ম কানুন তত্ত্ব একে একে তার মনের কাছে, চোখ বা কানের কাছে ধরা দিয়ে, তার করায়ত্ত হয়ে, তার কণ্ঠ-জিহ্বা-দন্ত-তালু-ওষ্ঠ-প্রান্তে বাণীবদ্ধ হয়ে ক্রমে ক্রমে তার বাক্ মনের গোচর হওয়াতেই ঐ কথাগুলি তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। সুতরাং 'অ-শ্রুত' বা 'অ-দৃষ্ট' কথাগুলি সার্থক প্রতিপন্ন হয়ে উঠছে তখনই, যখনই তারা হয়ে উঠছে অশ্রুতপূর্ব বা অদৃষ্টপূর্ব। নচেৎ তার সার্থকতা কোথায়, কোনো কোনো বিশেষ ব্যক্তির কল্পনার বাহাদুরিতে ছাড়া? আর কেবল ভবিষ্যতেই যার তাৎপর্য ধরা পড়বে বলে মনে হয়, অতীতের কোনো অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকেই তার সম্বন্ধে কোনও প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে কি? যেমন অতীত অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষ বাস্তব থেকে অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য প্রাকৃতিক সত্য সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে দিচ্ছেন ঐ বিজ্ঞানীরা? তাতেও তো আজও কত প্রমাদ! তাহলে অতীত-বর্তমানের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান-নিরপেক্ষভাবে ভবিষ্যৎ সম্পর্কীয় কল্পনার সম্বন্ধে নিশ্চয়তা কোথায়? কিন্তু প্রকৃতির যে বিপুল শক্তি অনাদিকাল থেকে ক্রমে ক্রমে সার্বজনীনভাবেই অভিব্যক্ত হয়ে উঠছে, শক্তিমত্তা সম্বন্ধে মানুষের প্রায় সকল কল্পনাকেই যদি তা' ছাড়িয়ে চলতে থাকে, তাহলে সেই প্রত্যক্ষীভূত প্রাকৃতিক মহাশক্তির জন্য আজ মানবমনোরাজ্যে ক্রমসংকুচিত সেই কল্পিত অপ্রমেয় বিধাতার আসনটি ছেড়ে দিতে অগৌরবের কী আছে? প্রকৃতির বহু অংশই আজ আমাদের চোখে নিরাকার—কিন্তু তার পদধ্বনি স্পষ্টই শুনতে পাই, পরমাণুর মত। তাইতেই তো বুঝি, আজ সে নিরাকার প্রতীয়মান হলেও সে আছে। আবার তার বহু অংশই তো দেখতে পাই 'অদাহ্য', 'অক্লেদ্য' বা অশোষ্য' ইত্যাদি। আর 'নিত্যসর্বগতা'দি কথা তো আমরা শিখেছি প্রকৃতিকে দেখেই। সুতরাং সর্ব-অভীষ্ট প্রদায়িনী সর্বমঙ্গলদায়িকা সর্বার্থসাধিকা হক, বা না হক, মহাশক্তিময়ী অঘটন-ঘটন-পটিয়সী প্রকৃতিই না সেই বিধাতা! অন্ধ কিনা সে, তা আজও জানা যায়নি। আজ পর্যন্ত মানুষ এমন নয়ন বানিয়ে নিতে পারেনি, যা দিয়ে সে প্রকৃতির নয়ন পানে তাকিয়ে তার সমগ্র রূপমাধুরী প্রত্যক্ষ করে নিতে পারে, বা তথাকথিত অন্ধ প্রকৃতিকে অপ্রয়োজনীয়, বাহুল্য মনে করে সেখান থেকে সে তার বানানো চোখ দুটিকেও ইচ্ছা করলেই সরিয়ে নিতে পারে। সুতরাং

তার বিধান যদি অমোঘ হয়ে থাকে, আর ঐ উন্মাদ বিজ্ঞানীর মনেই যদি সে ধরা দিতে চায়, তাহলে উপায় কি? বিজ্ঞানী কিন্তু আশ্চর্যভাবেই কল্পনা করে বসেছেন বিচ্ছুরিত আলোরশ্মি বা ক্ষরিত বিদ্যুৎশক্তি জড়বস্তুকণিকার সমষ্টিই। প্রমাণ যদি মিলে যায়, নিরুপায়। আপাতত দেখা তো গেল যে ভার্লে যা অনুমান করলেন, ক্রুক্‌সের গবেষণা থেকে সেগুলি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

শূন্যস্থান নিয়ে ক্রুক্‌স তাঁর গবেষণা আরম্ভ করেছিলেন ১৮৭৩ খ্রী.-এ। সেই সময় তিনি থ্যালিয়ামের পারমাণবিক ওজন নির্ধারণ করছিলেন। বাতাসের প্লবতার (ঊর্ধ্বচাপের) ফলে ওজনপাল্লা পাছে এদিক ওদিক হয়ে যায়, তজ্জন্য তিনি ওজনের কাজটি শূন্যস্থানেই চালাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যখন তিনি বায়ু-নিঃসারিত ধাতব পাত্রে উত্তপ্ত বস্তুগুলিকে ওজন করে দেখছিলেন, তখনও মানদণ্ড যেন বার বার এলোমেলো হয়ে যেতে লাগল। উষ্ণতা-পার্থক্যের জন্য বায়ুস্রোত বশত যে কিভাবে ঐ রকম অনিয়মিত ঘটনা ঘটতে পারে, তা তিনি বুঝে উঠতে পারলেননা। বিষয়টি নিয়ে তিনি বিশেষভাবে গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। এভাবে ১৮৭৫ খ্রী.-এ তাঁর বিখ্যাত রেডিওমিটার (আলো বা উত্তাপের তরঙ্গ নির্দেশক) যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হয়।

প্রথমে ক্রুক্‌স্ এবং আরও কেউ কেউ মনে করেছিলেন যে, ইথারের মত কোনো কল্পিত সর্বগত বস্তুর তরঙ্গচাপের ফলেই সম্ভবত বায়ুহীন যন্ত্রের মধ্যে ক্ষুদ্রকায় বাত-শকুনের (বাতাসের সামান্য চাপের ফলেই যার পাখা ঘুরে যায়) পাখাগুলি ঘুরে যাচ্ছে। কিন্তু ক্রুক্‌স্ বায়ু-নিঃসারণ প্রক্রিয়াটিকে এমন এক পর্যায়ে তুলে আনলেন যে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল পাখাগুলি আর ঘুরে যাচ্ছেনা। তখন টাইট (P. G. Tait—1831-1901) আর দেওয়ারের-(James Dewar—1842-1923) সঙ্গে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, ঐ ঘূর্ণনের কারণটি অবশিষ্ট গ্যাসের অণুসমষ্টির অভিঘাত ব্যতিরেকে আর কিছু হতে পারেনা। অবশিষ্ট গ্যাসের বেগবান অণুগুলি ছুটতে ছুটতে গিয়ে উত্তপ্ত পাখার কৃষ্ণ তলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর তারা সেখানে প্রতিহত হয়ে বর্ধিত ভরবেগ নিয়ে ফেরার সময় পাখাগুলিকে অমনভাবে ধাক্কা মেরে ঘুরিয়ে দিয়ে আসে। তাঁদের এই সিদ্ধান্তের ফলে গ্যাস সম্বন্ধীয় ক্রিয়মাণ গতিতত্ত্বের (Kinetic energy of gases) প্রবর্তনা ঘটে গেল। ম্যাকওয়েলস্ তারপর একে আঙ্কিক তত্ত্বের দৃঢ়ভূমিতে এনে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

কিন্তু ক্রুক্‌স্ তাঁর গবেষণার কাজ চালাতে চালাতে ১৮৭৮ খ্রী-এ এসে হিটর্ফ-দৃষ্ট ঘটনাই (পৃ. ১৫৯) প্রত্যক্ষ করলেন। ব্যাপারটি অবশ্য তাঁর কাছে অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু বাতশূন্য নলে নেগেটিভ-মেরু আর নেগেটিভ-ছটার মধ্যে আবির্ভূত

আঁধার স্থানটি যে ক্রমবিস্তার লাভ করে ধন-মেরু পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে যায়, তা তিনি বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করে সে সম্বন্ধে পূর্বাবিষ্কৃত আণবিক তত্ত্বটি প্রয়োগ করলেন। ঐ প্রসৃত সমগ্র অন্ধকার স্থানের বেধটিকে তিনি অবশিষ্ট গ্যাসের গতিবান অণুগুলির মুক্ত বিচরণ পথের সাধারণ দৈর্ঘ্য বলেই ব্যাখ্যা করলেন। এবং ঐ আঁধার স্থানটি ফ্যারডের আঁধার-স্থলের সঙ্গে পার্থক্য বশত ক্রুক্‌সের আঁধার-স্থল নামে আখ্যাত হল। কিন্তু রেডিওমিটার যন্ত্রের উদ্ভাবনের ফলে ক্রুক্‌স্ বায়ুহীন নলমধ্যস্থ অবশিষ্ট গ্যাসের সক্রিয় আণবিক গতি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হলেন। তিনিও ভার্লের মত সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হলেন যে বহু পরীক্ষিত ক্যাথোড্ বা ঋণাত্মক-রশ্মিগুলি বাস্তবিকই অণুপ্রবাহ ব্যতিরেকে অন্য কিছু নয়। প্রথমে গ্যাসের অণুগুলি এসে ঋণ-তড়িদ্দ্বারের উপর আছড়ে পড়ে। সেখান থেকে তারা রজন জাতীয় ঋণাত্মক আধান গ্রহণ করে। কিন্তু তার ফলে তড়িদ্দ্বারের সঙ্গে একই জাতীয় বিদ্যুতের বিকর্ষণ প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটে। তারা তখন মুহূর্ত মধ্যেই তড়িদ্দ্বারের তলের উপর লম্বরেখা ধরে ছুটে যায়। কিন্তু উত্তেজিত ঋণ-মেরু থেকে তারা প্রচণ্ড অতিরিক্ত বেগ সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। তার ফলে তারা ঐ একই মেরুর দিকে ধাবিত অপেক্ষাকৃত অল্পবেগযুক্ত অণুদলকে স্বীয় বিচরণ পথ থেকে হটিয়ে দেয়। দু' দলের সংঘর্ষ বাধে আঁধার রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। শক্তিদ্বন্দ্বের স্বাক্ষর রেখে যায় দ্বন্দ্বোজ্জ্বল সীমান্ত রেখা। নিকটবর্তী কাচপাত্রের গায়ে যে অণুপ্রভা বা প্রতিপ্রভা জেগে ওঠে, সেও ঐ কাচের সঙ্গে অণু-সংঘর্ষেরই ফল মাত্র। কিন্তু তড়িদ্দ্বার থেকে যারা ছুটে আসে, গুণের দিক থেকে তারা কতটা না পালটে যায়! ফ্যারাডের কথায় (দ্র., পৃ. ১৪৮-৫৩) তাদের নিশ্চয় বলা যেতে পারে 'দীপ্যমান পদার্থ' (radiant matter)। তিনি আরও সব সুন্দর সুন্দর পরীক্ষার দ্বারা দেখিয়ে দিলেন যে দীপ্যমান পদার্থ সরলরেখা ধরেই চলে। সামনে কঠিন সামগ্রী এনে ধরলে তারা তার পেছনে ছায়া নিক্ষেপ করে, পথের মাঝে পেতে রাখা ছোট পাখাওয়ালা চাকাকে ঘুরিয়ে দিতে পারে, আর চৌম্বক ক্ষেত্রে এসে পৌঁছলেই পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তিনি আরও দেখলেন যে দুটি নিকটবর্তী ঋণাত্মক রশ্মি পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। সুতরাং তারা যে বিদ্যুদাহিত কণিকা-প্রবাহ, তাতে আর সন্দেহ করা চলেনা। বায়ুশূন্য পাত্রের গ্যাসাবশেষের এই যে অবস্থা, ক্রুক্‌স্ একে গ্যাসপরের অবস্থা বা পদার্থের চতুর্থ অবস্থা (কঠিন-তরল-গ্যাসীয় ব্যতিরেকে) বলে অভিহিত করলেন। ১৮৮১ খ্রী.-এ রিকি (Eduard Riecke—1845-1915) মাপ জোখ করে দেখিয়ে দিলেন যে চৌম্বক ক্ষেত্রে এসে পড়লে অণুস্রোতের ঐ কণিকাগুলি যেন চৌম্বক বলরেখাকে অক্ষরূপে পরিণত করে তার চারদিক দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে শঙ্খিল ভঙ্গিতে এগিয়ে চলে যায়।

কিন্তু ভার্লে-ক্রুক্‌সের অণু-ঝর্ণার তত্ত্বকে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হল। ইতিপূর্বে ডপলার (Christian Doppler - 1803-'53) আলোরশ্মি সম্বন্ধে একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন।—যদি কোনো আলোর উৎস তার দ্রষ্টার পক্ষে গতিবান থাকে, তাহলে উৎসনিঃসৃত আলোতরঙ্গের পর্যায় (period—একটি পূর্ণ তরঙ্গ গঠনের কাল) দর্শকের চোখে ভিন্ন তরঙ্গ পর্যায় বলে মনে হবে। ১৮৮০ খ্রী.-এ টাইট্‌ প্রশ্ন তুললেন যে, বায়ুহীন নলের গ্যাসীয় কণিকাগুলি যদি গতিবান থাকে তাহলে তাদের থেকে পাওয়া প্রদীপ্ত কম্পনগুলি নিশ্চয় ডপলার-তত্ত্বকে মেনে চলবে। টাইট্‌ অনেক চেষ্টা করেও সেরকম কিছু দেখতে পেলেননা। তবে একথাও বলা যায় যে, ক্রুক্‌সের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কণিকাগুলি যখন অন্য কণিকা-দলের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলেই প্রদীপ্ত হয়ে উঠে, তখন ঐ সংঘর্ষের ফলেই তারা তাদের অনেকটা বেগই খুইয়ে ফেলে। আর তা যদি হয় তা'হলে তাদের ঐ সংঘর্ষজনিত প্রদীপ্ত কম্পন থেকে উপরোক্ত তত্ত্বের নিয়মকানুন কি করে প্রত্যক্ষ করা যাবে? কিন্তু বিকল্প তত্ত্বও সমুদ্ভূত হল। কেউ কেউ মনে করলেন, ঋণাত্মক রশ্মির বিকিরণ ঘটনাটি ইথার-বিক্ষুব্ধিরই ফল বিশেষ। বিশেষত, হার্জ্‌ পরীক্ষা করে দেখলেন যে, রশ্মিগুলি কোনো বাহ্য তড়িৎ বা চৌম্বক শক্তিকে সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে হচ্ছে না। বা তারা কোনো স্থিতি-বৈদ্যুৎ ক্ষেত্রের electrostatic field) দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে বলেও প্রতীয়মান হচ্ছেনা (পরে দ্রষ্টব্য)। এই দেখে তিনি ভার্লের অনুমান সিদ্ধান্তটিকে নাকচ করে দিলেন। ফিট্‌জেরাল্ড্‌ অবশ্য ধরিয়ে দিলেন যে, ক্ষরণ-নলের (মোক্ষণ নল, discharge tube—তু. পৃ, ১৫৬, ১৫৮) মধ্যে অন্য কোনো তড়িৎক্রিয়ার ফলে হয়ত রশ্মিজাত প্রভাবটি বহিঃক্ষেত্রে এসে পৌঁছতে পারছেনা - এমন হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু ক্রমে দুটি দলই বেশ প্রবল হয়ে উঠল। ১৮৯৬ খ্রী -এ কিয়েলের লেনার্ড্‌ (Philipp Lenard—1862-1947) এবং জার্কনেস (V. Bjerknes) বললেন, ঋণাত্মক রশ্মিগুলি পদার্থ নিরপেক্ষ-ভাবে ইথার-বিক্ষুব্ধিজাত তরঙ্গ বিচ্ছুরণ মাত্র। অন্য দল বললেন, ওগুলি কণিকা-সংঘর্ষ জনিতই। প্রথম তত্ত্বের পক্ষে অসুবিধে এই ছিল যে, রশ্মিরাজি পদার্থের মতই চুম্বকদণ্ডের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। দ্বিতীয় তত্ত্বের পক্ষেও অসুবিধে ছিল। হিটর্ফ, উইডেম্যান (E. Wiedemann—1852-1928) এবং এবার্ট (H. Ebert) প্রভৃতি বিজ্ঞানী ঋণাত্মক রশ্মির ভেদ ক্ষমতা পূর্বেই লক্ষ্য করেছিলেন। পরে আরও ভাল করে দেখলেন হার্জ্‌ এবং তৎশিষ্য বন-নিবাসী লেনার্ড্‌। বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা লেনার্ড দেখলেন যে ঋণাত্মক রশ্মিগুলি একটি পাতলা অ্যালুমিনিয়ামের কপাট ভেদ করেও ক্ষরণ- বা মোক্ষণ-নল থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। সুতরাং এ কি করে

সম্ভব যে, আলোরশ্মি যেসব ধাতব পাতকে কিছুতেই ভেদ করে যেতে পারেনা, ঐ ঋণাত্মক রশ্মিগুলি স্বচ্ছন্দেই তাকে ভেদ করে এগিয়ে যায়! যত সূক্ষ্মই হক না কেন, তা'বলে সোনার পাতকেও ভেদ করে সবেগে বেরিয়ে যাবে কিনা পদার্থ-কণিকারা? সত্যিই এক সমস্যা। বিচিত্র আর অভিনব। ডাল্‌টেতো শক্তিকেই পদার্থ কল্পনা করে বসলেন। কিন্তু এখন যে দেখা যাচ্ছে ঋণাত্মক রশ্মিকে পদার্থও বলা চলে, শক্তিও বলা চলে? অথচ আবার জোর করে কোনোটাই বলা চলছেনা। তাহলে কি ভর (পদার্থ) আর তেজ (শক্তি) সত্যসত্যই এক অদ্বৈত সত্তায় বিরাজমান? কিংবা তা' না হলে, এই কি সেই পূর্বোক্ত অবাঙ্‌মনসগোচর বিধাতা (পৃ. ১৬১),—সর্বার্থ, সর্বমঙ্গল ও সর্ব-অভীষ্টের পরিবর্তে যাঁকে লাভ করবার জন্য আদিষ্ট হয়ে যুগ যুগ ব্যাপী নিরীহ মানবকের এমন নিঃস্বার্থ ও প্রাণান্তকর সাধনার প্রয়োজন? আপাতত প্রকৃতির রাজ্যেই তো তাঁর সন্ধান মিলে যাচ্ছে। সুতরাং প্রকৃতিই বা কেন না হতে পারে সেই বিধাতা? বিজ্ঞানচেতনা তো কোনো নিছক-কল্পনাকে মেনে নিতে পারেনা। যে কল্পনা সুচির কাল যাবৎ কেবল অপ্রমাণিত তত্ত্ব হিসাবেই থেকে যাচ্ছে, বিজ্ঞানের সাধনার বিষয়ই তো প্রমাণ করে দেওয়া যে তা কোনো তত্ত্বই নয়, তা শুধু ভ্রান্ত কল্পনা বা তত্ত্বের অবভাস মাত্র। তাই সম্ভবত বিধাতাকে 'মনসগোচর' করবার জন্য ইংরাজ বিজ্ঞানী জে. জে. টমসন (Sir Joseph John Thomson—1856-1940) আর একটি তত্ত্ব প্রয়োগ করে দেখতে চাইলেন। তিনি বললেন, যে-রশ্মিগুলি ধাতব পাতের ওপর এসে ধাক্কা দিচ্ছে, তারাই যে তাকে ফুঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এমন কি কথা আছে? যে ধাতব পাতের ওপর তারা গিয়ে আছড়ে পড়ছে, সে পাতটি নিজেই ত তখন একটি বিশেষ অর্জিত ক্ষমতার বলে তার অন্য দিক থেকে রশ্মি-বিচ্ছুরণ চালিয়ে যেতে পারে। সকল প্রকার কল্পনার যোগ্য একটি বিশেষ সত্তাকে না পেতেই টমসন তাকে বাঁধন পরিয়ে, তাকে সুনির্দিষ্ট আকার দিয়ে মিথ্যা কল্পনার অবকাশটুকু নষ্ট করে দিলেন।

কিন্তু বিজ্ঞানীর এ প্রচেষ্টা কেন? সেই কোন্ আদিম কাল থেকে প্রকৃতিকে নিয়ে মানুষ কত কল্পনার জাল বুনে এসেছে। কত অন্তরে কত আশার আলো জ্বলে উঠেছে। কত সৌরভে মনপ্রাণ ভরে গিয়েছে। কত লাবণ্যে কতনা নয়ন সার্থক হয়েছে, হৃদয় মন সব জুড়িয়ে গেছে। কিন্তু সেই নয়নাভিরাম প্রকৃতিকে নিয়ে বিজ্ঞানীর আজ এ কী বিশ্লেষণ, চুলচেরা বিচার? অরুণের রথে আরোহণ করে সূর্যদেবতা ছুটে চলেছেন আকাশে। জ্যোতির্ময় তাঁর রূপ। উদয়াচল থেকে তাঁর যাত্রা শুরু, অস্তাচলে গিয়ে তাঁর বিরতি। নরলোকেও অমনি নেমে আসে নিদ্রার আমেজ। অসীম সন্তোষে মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। শান্তি, শান্তি, সুমধুরা

শান্তি। শ্রান্ত চেতনার কী মধুর মুক্তি। কিন্তু আবার কখন সে জেগে ওঠে। চেতনার কলরব পড়ে যায় তার সারা দেহে মনে, আর বহির্জগতের অরণ্যে কাননে বৃক্ষ-পল্লবে, সমুদ্র কল্লোলে। আবার সে 'রাঙাবাস পরা' যোগিনী পারা ঊষার দিকে নয়ন উন্মীলন করে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে, তপনোন্মুখ হয়। ক্রমেই সূর্যদেব এসে পৌঁছান তাঁর রথাশ্ব নিয়ে—প্রতাপান্বিত মার্তণ্ড! আবার দিন চলে যায়. আবার সন্ধ্যা নামে। গিরি নদী-নির্ঝর-কান্তার-প্রান্তর একাকার হয়ে যায়। যেন একটি আচ্ছন্ন অভিভূত সত্তা। কিন্তু সেটুকুর জন্যই যেন সারা আকাশ এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। মুহূর্তের মধ্যেই নভতল চঞ্চল হয়ে ওঠে। অঞ্চল তার বিস্রস্ত হয়ে পড়ে। দিকে দিকে জ্বলে উঠে মণিদীপা তারকা। অমৃতের ঝর্ণা ঝরিয়ে দেয় চাঁদ। ছায়া (দীপ্তি) ছন্দে ছুটে চলে ছায়াপথ, মেরুজ্যোতি আঁচলা উড়িয়ে এসে দাঁড়ায়। রাত গেল, দিন গেল, মাস গেল; বছর অতিবাহিত হল, যুগ যুগান্তর চলে গেল। কে জানে, কোথা থেকে একদিন হঠাৎ এসে পৌঁছল শত ঔৎসুক্য. শত জিজ্ঞাসা। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল কল্পনার জাল। ভয়ার্ত প্রকৃতি যেন সংকুচিত করে ফেললেন নিজেকে। সূর্য হয়ে উঠল হিলিয়ামাদি গ্যাসের 'ভাপে ভরা ফানুস' কেবল। এমন মেরুজ্যোতি, তাও হয়ে গেল 'আকর্ষণ-বিকর্ষণ' তত্ত্বের ক্রিয়াভূমি মাত্র। আর চাঁদ হয়ে উঠল কঠিন কংকর গিরির কতকগুলি হাঁ শুধু।

আবারও দিন এলো আর গেল। গেল মাস বছর। কিন্তু যুগকে বুঝি আর বার বিদায় নিতে হয়না। মনে হল কল্পনা গেল থেমে। থামল কিন্তু ক্রন্দন। কাঁদন-অবশ চেতনা ধীরে ধীরে চোখ চাইল; কেন সে অবশ হবে? রাজা আর পুরোহিত, রাজ-পুরোহিত—এরাই শুধু ঈশ্বরের দ্রষ্টা, দেবতার দূত? আর সেই সূত্রে সকল তত্ত্বের জ্ঞাতা, সর্বমানবের ভাগ্যবিধাতা? আর এদের কুলতিলক বংশধর বণিককুলই সকল তত্ত্বের, সকল শক্তির একমাত্র ধারক, মানবের ভাগ্য-নিয়ামক, প্রকৃতির পরম ব্যাখ্যাতৃ (ব্যাখ্যাকার)? সূর্যতত্ত্বের জ্ঞাতা কি তাহলে ঐ মানববাহিত যুগ যুগ ধাবিত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানবাংশটুকু? সেই কি তাহলে দেখিয়ে এসেছে মানবসমাজের অংশ আর তার সমগ্র ভাগের মত সূর্য আর তার ঐ রথ ও অশ্বকে সেদিনও পর্যন্ত? তাই সমাজের সর্ব অঙ্গে অবিরত অবারিত নিষ্পেষিত এমন যাতনা? কিন্তু রথ আর তার ঘোড়া দেখেছে সে যুগ যুগ ধরে; দেখেছে কি ঐ আসল সূর্যটিকে? চোখ কি তার কোনোদিন উন্মীলিত হয়ে দেখতে পেয়েছে সে রূপমাধুরী! দিন নাই ক্ষণ নাই অমৃত ঝরে পড়ছে, বিরাম নাই বিশ্রাম নাই আলোকবর্ষণ চলছে। নির্বিচার সে অমৃত-বর্ষণ, নির্বিশেষ সে দ্যুতিমা-ক্ষরণ। দূর থেক সুদূরে, যুগ থেকে যুগান্তরে সকল দেশে সকল কালে চলেছে সেই প্রাণ-

বিচ্ছুরণ। মহতের থেকেও মহীয়ান্, অণুর চাইতেও অণীয়ান্, কিছুমাত্র বাদ পড়েনি সে বর্ষণ থেকে। ধরিত্রীতেও লাবণিমাখা সে রশ্মিনির্ঝর এসে পৌঁছায়। সুদূর থেকে শূন্যদিগন্ত পাড়ি দিয়ে প্রচণ্ড গতি নিয়ে তারা ছুটে আসে। আসে আর আসে আর আসে। অবিরত আবেগে ছুটে ধেয়ে আসে। জড়িমার বুকে এসে আছড়ে পড়ে,—মৃত্যুও প্রাণ হয়ে ওঠে। পত্রপল্লব শিউরে ওঠে চুম্বনে চুম্বনে। ওষ্ঠপ্রান্ত অমৃতের স্পর্শে খুলে যায়। খুলে যায় ষ্টোমাটার (পত্র-রন্ধ্রের) পেলব অধর*। হেসে ওঠে ক্লোরোফিল সবুজ তরঙ্গে। শুরু হয় আলো আর উদক মিলন। মাটি থেকে উঠে আসে জলের ফোয়ারা জাইলেম দিয়ে। রন্ধ্রে রন্ধ্রে সাড়া পড়ে যায়। সঞ্জীবনী সুধা নিয়ে অক্সিজেন আকাশে ছড়িয়ে পড়ে জীবকুল প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠে, শুরু হয় দেওয়া-নেওয়া জীব আর তরু, গতি আর অগতির মাঝে। জীবজগৎ কার্বন-ডাইঅক্সাইড পাঠিয়ে দেয় পল্লবের কাছে। উদকের শেষাংশ হাইড্রোজেন তার সাথে একাকার হয়ে যায়—সর্বাঙ্গমিলন। তবুও কী বিপ্রলম্ভ (অহেতুক বিরহ ভয় জনিত) ব্যথা, "দুঁহু ক্রোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"; "অশ্রু তার আকাশে পড়ে

* সূর্যরশ্মি পত্ররন্ধ্রে প্রবেশ করলে বৃক্ষের মূলকাণ্ড শাখা-প্রশাখার জাইলেম নামক টিস্যু বা কলা দিয়ে মাটি থেকে ওপরে উঠে আসা জল (H_2O) সূর্যরশ্মি সহযোগে স্বীয় মূল উপাদান হাইড্রোজেন (H) এবং অক্সিজেনে (O) বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। ঐ অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ বা সমগ্র জীবজগৎই শ্বাস মারফতে তা গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। আবার জীবকুলও শ্বাস ত্যাগ করলে তার শরীর থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) নামক গ্যাস বর্জ্য বা পরিত্যাজ্য দ্রব্য হিসাবে বেরিয়ে গিয়ে পত্ররন্ধ্রে প্রবেশ করলে পূর্বোক্ত জলের অবশিষ্ট হাইড্রোজেনের সঙ্গে তার মিলন ঘটে। ফলে হাইড্রোজেন, কার্বন আর অক্সিজেন দিয়ে বৃক্ষের শর্করা ($C_6H_{12}O_6$) জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত হয় এবং তা ফ্লোয়েম নামক কলা দিয়ে বৃক্ষের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। সূর্যরশ্মির কিছুটা শক্তিও তাপরূপে (ক্যালরি—পৃ. ৪১) সঞ্চিত হতে থাকে এবং কিছুটা জলীয়বাষ্পও (H_2O) আবার আকাশে গড়িয়ে পড়ে। প্রক্রিয়াটি চলে পত্রকোষের ক্লোরোফিল নামক সবুজ পদার্থের সাহায্যে। [সবুজ বা কোনও রঙ্ আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য-বিভিন্নতার ফল মাত্র] সমগ্র প্রক্রিয়াটির নাম **Photo-synthesis** বা সালোকসংশ্লেষ। এর ফলেই সূর্যশক্তিকে কাজে লাগিয়ে জীবজগতের অস্তিত্ব বা প্রাণশক্তির বিকাশ। গাছ বাঁচে; শাক শব্জি ফল খেয়ে পশুরা বাঁচে, মানুষ বাঁচে। আবার পশুর মাংস বা দুধ খেয়েই মানুষের পুষ্টি ঘটে।

শিখা পরিবাহী হয়ে উঠে। এ ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ১৮৮২ খ্রী. এ বার্লিন-বাসী গিজে (W Giese) গ্যাসীয় পরিবহণকে বিদ্যুৎবিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি বলেন, অনুমান করা হয় যে বিদ্যুদ্বিশ্লেষণের সময় বাইরে থেকে তড়িৎ-চালক বল প্রযুক্ত হওয়ার পূর্বেই অণুগুলি পরমাণু বা আয়নে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে তারাই পরে বিদ্যুৎক্ষেত্রের প্রভাবে এসে গতিবান হয়ে নিজেদের সাথে বিদ্যুতের আধান বহন করে নিয়ে যেতে পারে। তারই ফলে আবার তরলের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহের পথ প্রস্তুত হয়ে যায়। সুতরাং তা যদি হয়, তাহলে গ্যাসের ক্ষেত্রেও সেই অনুমান প্রয়োগ করে বলা যেতে পারে যে তারও পরিবাহিতা ঐ আয়ন-উপস্থিতির জন্যই সম্ভব হয়। সাধারণ চাপ ও উষ্ণতায় সকল গ্যাসের মধ্যেই অত্যল্প পরিমাণ আয়নের উপস্থিতি কল্পনা করা চলে। উষ্ণতা বাড়িয়ে দিলে গ্যাসের অন্যান্য অণুগুলিও বিচ্ছিন্ন হতে থাকায় পর পর ঐ আয়নের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। দু'বছর পরে ম্যাঞ্চেস্টারের সুস্টারও (Arthur Schuster—1851-1934) সূক্ষ্মায়িত গ্যাসের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-ক্ষরণ তত্ত্বের ব্যাপারে সাধারণভাবে এই তত্ত্বটিকে জোরদার করলেন। তিনি বললেন যে, উষ্ণ তরল যখন খুব উচ্চমাত্রায় বিদ্যুৎবিভব যুক্ত হয়, তখনও সেখানে তড়িদ্দ্বার থেকে যে-গ্যাস উদ্ভূত হতে থাকে, তার মধ্যে বিদ্যুৎবিভবের নাম মাত্র থাকেনা। সুতরাং ধরা চলে যে, তরলের অণুগুলি তড়িৎযুক্ত তলের (তড়িদ্দ্বারের) উপর আছড়ে পড়ার পর বিদ্যুৎ-আধানের কোনো অংশকেই আর তারা বহন করতে পারেনা। তারপর তাই দুটি অণুতে যখন ধাক্কা লাগে তখন তারা পরস্পরে অক্ষুণ্ণ থাকে, কেউ কারও মধ্যে বিদ্যুৎ সংক্রমিত করে দিতে পারে না। সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, বিদ্যুৎ পরিবহণের জন্য গ্যাসের অণুগুলির পক্ষেও সর্বপ্রথম বিশ্লিষ্ট (আয়নায়িত) হয়ে যাওয়া দরকার।

ঋণাত্মক রশ্মির ক্ষেত্রেও সুস্টার ঐ আহিত (বিদ্যুতের আধানযুক্ত) কণিকার তত্ত্ব প্রয়োগ করলেন। হিটর্ফের একটি পরীক্ষাকে অনুধাবন করে তিনি তার সমর্থনও পেয়ে গেলেন। তিনি ধন- আর ঋণ-তড়িদ্দ্বার দুটিকে খুবই কাছাকাছি রাখলেন। দেখা গেল যে অত্যন্ত নিম্নচাপেই ক্রুক্সের আঁধার-স্থলটি ঋণ-তড়িদ্দ্বার থেকে বিস্তৃত হয়ে গিয়ে ধন তড়িদ্দ্বার ছাপিয়েও কিছু দূরে চলে যাচ্ছে। এরকম ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিদ্যুৎক্ষরণটি (কুজ্ঝটিকা) সর্বদাই ধন-তড়িদ্দ্বার থেকে ক্রুক্সের বিপরীতমুখী (গামী) আঁধার-স্থলের অন্তঃসীমার নিকটতম বিন্দু পর্যন্ত এগিয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ধনাত্মক তড়িদাধানের কাছাকাছি জায়গায় তৎসংলগ্ন অঞ্চলেই দুটি ভিন্নমুখী প্রবাহ

চলতে থাকে। একটি ধন-তড়িদ্দ্বারের বিদ্যুৎক্ষরণ প্রবাহ, অন্যটি ঋণ-তড়িদ্দ্বারের আঘাত খাওয়া অণুপ্রবাহ। কিন্তু একই স্থলে এরকম দ্বিমুখী প্রবাহ কেবল তখনই সম্ভব হতে পারে, যখন কোনও কণিকা-বাহিত একমুখী প্রবাহ জাড্যের (ঝোঁকের) প্রবাহেই খুব তোড়ের সঙ্গে অন্যের বলরেখার উল্টো দিকেও ছুটে গিয়ে পৌঁছোয়। ১৮৮৭ খ্রী.-এ স্যুস্টার দেখিয়ে দিলেন যে, দুটি তড়িদ্দ্বারের মধ্যে বিভবপার্থক্য খুব কম থাকলেও বাতাসের মধ্য দিয়ে বেশ একটি বিদ্যুৎস্রোত প্রবাহিত হতে পারে। অবশ্য সেক্ষেত্রে এমন একটি ব্যবস্থা করে দিতে হয়, যাতে ভিন্ন একটি তড়িৎপ্রবাহ স্বাধীনভাবে তার নিজস্ব পথ ধরে চলতে পারে। অর্থাৎ (একটি) বিদ্যুৎক্ষরণ নিজেই বাতাসের মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দিতে পারে যে, অত্যল্প তড়িৎচালক বলের প্রয়োগেই (অন্য একটি তড়িৎপ্রবাহকে কার্যকরী করবার জন্য) তার পরিবহণ ক্ষমতা এসে পৌঁছায়। পূর্ব মতবাদ দিয়েই তিনি এ ব্যাপারের ব্যাখ্যা করে বললেন, প্রধান ক্ষরণ থেকে উদ্ভূত আয়নগুলি সমগ্র পাত্রমধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এবং তারাও অতিরিক্ত তড়িদ্দ্বার সৃষ্ট ক্ষেত্রের প্রভাবে এসে পৌঁছলেই এই শেষোক্ত দ্বারদ্বয়ের মধ্যে সঞ্চালিত হয়ে প্রবাহ সৃষ্টি করতে থাকে।

কিন্তু ঐ বছরে হার্জ যখন দেখতে পেলেন যে পাশাপাশি একটি বিজলি-ঝলকের পথ আর একটি বিদ্যুৎ চমকের পথকে সুগম করে তুলছে, তখন তিনি বিশেষ অনুধাবনের পর বুঝতে পারলেন যে, প্রথমোক্ত ঝিলিক থেকে বেগনি-রঙের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (দৃশ্য রশ্মিসমূহের মধ্যে এই রঙের রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ক্ষুদ্রতম) চাইতেও অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গবিশিষ্ট বেগনিপারের আলো (ultraviolet ray) বিচ্ছুরিত হয়ে আসার ফলেই অন্য চমকটি সম্ভব হচ্ছে। আরও দেখা গেল যে, যে জায়গার মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ ঝিলিক মেরে চলে যেতে পারে, সেখানে যদি বাতাসের মধ্যে খুব ক্ষুদ্রতরঙ্গ বিশিষ্ট আলোকপাত ঘটান যায়, তাহলেও ঐ বিদ্যুৎঝলক আরও দীর্ঘতর ব্যবধান অতিক্রম করতে পারে। শীঘ্রই ধরা পড়ল যে, ঋণ তড়িদ্দ্বারের উপর ঐ আলো ফেললেই আলোটি ফলপ্রদ হয়ে উঠে। হলওয়াচস্ (Wilhelm Hallwachs—1859 1922) দেখিয়ে দিলেন, এক প্রস্থ ধাতুকে ঋণ বিদ্যুতে আহিত করে বেগনিপারের আলোতে এনে রাখলে সংলগ্ন অঞ্চলের হাওয়া এমন একটি অবস্থায় এসে পৌঁছায় যে, বিদ্যুদাধান তার মধ্য দিয়ে সহজেই পরিবাহিত হয়ে পালিয়ে যেতে পারে। আবার রাদারফোর্ড (Ernest Baron Rutherford—1871-1937) দেখতে পেলেন যে, একটি ধাতব পাত্রে বেগনিপারের আলো এসে

পড়লেই কাছাকাছি বাতাসের আয়নগুলি ঋণ-বিদ্যুদাহিত হয়ে যায়। তিনি সুকৌশলে তাদের গতিবেগও মেপে ফেললেন।

কিন্তু বছর দুয়েকের মধ্যেই টমসনও ঘূর্ণায়মান মুকুর দিয়ে মেপে দেখলেন যে ঋণাত্মক রশ্মির গতিবেগ সেকেণ্ডে প্রায় ১.৯ × ১০⁷ সে. মি.। আলোর গতিবেগের (সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল—কিছু পরে দ্রষ্টব্য) তুলনায় তা এত নগণ্য বেগসম্পন্ন যে, ঋণাত্মক রশ্মিগুলিকে আর ইথারতরঙ্গ বলে চিন্তা করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। আবার পেরিন দেখলেন যে, নলাকার ধাতব পাত্রও ঐ রশ্মি গ্রহণ করে ঋণ বিদ্যুতে আহিত হয়ে যায়। এবং টমসনও দেখিয়ে দিলেন, রশ্মিপথের পাশে চুম্বক এনে রাখলে তাড়া খেয়ে তারা ঘুর পথ ধরে, তখন তারা আর নলাকার পাত্র মধ্যে ঢুকে পড়তে পারেনা, পাত্রটি তখন আর আহিত হয়না। কিন্তু ঋণাত্মক রশ্মিগুলি কেবল আলোকধর্মী হলে তা কি করে সম্ভব হয়? ঐ রশ্মি যে ঋণ-বিদ্যুৎ বহন করছে, এসব পরীক্ষা থেকে তাও সুপ্রমাণিত হল এবং ১৮৯১ খ্রী.-এ স্টোনি (G. Johnstone Stoney—1826-1911) ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণিকগুলির নামও দিয়ে দিলেন—'ইলেক্ট্রন'।

কিন্তু দু পক্ষের যুক্তিই প্রবল। সুতরাং সংঘর্ষও উত্তাল হয়ে উঠল। সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য তত্ত্বদর্শনেরই প্রয়োজন। কিন্তু পুরানো যুগের সেই দুর্বল তত্ত্বচিন্তা দিয়ে একটি দুর্বল রকমের সমাধান পাতলে দেওয়া তো সত্যানুসন্ধানী বিজ্ঞানীর কাজ হতে পারেনা। সুতরাং প্রকৃত সমাধানের জন্য প্রকৃত তত্ত্বটিকেই যেভাবে হক খুঁজে বার করতে হয়। তার জন্য তো চাই আরও ঘটনাসংকেত। বিজ্ঞানীদের এমন ঐকান্তিক আগ্রহ আর নিষ্ঠাতেও কি প্রকৃতির কাছ থেকে সে সংকেত মিলবেনা? প্রাকৃতিক সেই চিন্তাবস্তু কি প্রাকৃতিক সেই সংকেত-বস্তুকে কোনও সমধর্মী তরঙ্গের অভিঘাতে উজিয়ে আনতে পারবেনা তার 'চলোর্মি'-শিখরে (ঢেউয়ের চূড়ায়)? বিজ্ঞানীকুলমানসের অন্তঃপুরে ভাবনা, মনীষা আর উদ্দীপনা গোপনে সঞ্চিত সংহত হতে থাকল। ধীরে ধীরে পরিমাণগত পরিবর্তন চলতে লাগল। হঠাৎ একদিন দেখা গেল প্রকৃতির দেহে গুণগত পরিবর্তনও ঘটে গেছে। ঘটনাটি ঘটে গেল।

১৮৯৫ খ্রী.-এর ৮ই নভেম্বর উজ্‌বার্গের রুৎগেঁ বা রঞ্জেন (Wilhelm Konrad Röntgen—1845-1923) সে ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন। যেন আচমকাই। ক্রুক্‌সের নলকে একটি অস্বচ্ছ কালো কার্ডবোর্ডে ঢেকে পরীক্ষার কাজ চালাচ্ছিলেন। কাছে পড়েছিল এক টুকরো কাগজ, বেরিয়াম প্লাটিনো-সায়ানাইড দিয়ে রঞ্জিত। নলের মধ্যে বিদ্যুৎক্ষরণ হওয়া মাত্রেই কাগজের ওপর

প্রতিপ্রভা দেখা গেল। ভাল করে ব্যাপারটি তলিয়ে দেখে বোঝা গেল যে, নলের মধ্যে বিদ্যুৎক্ষরণ থেকে নিশ্চয় এমন এক প্রকার রশ্মি নির্গত হচ্ছে, যেগুলি ফটোগ্রাফের প্লেটকে প্রভাবিত করতে পারে, এবং অন্তত কতকগুলি বস্তুর উপর পতিত হলে সেখানে তারা প্রতিপ্রভারও সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া ঋণাত্মক-রশ্মি
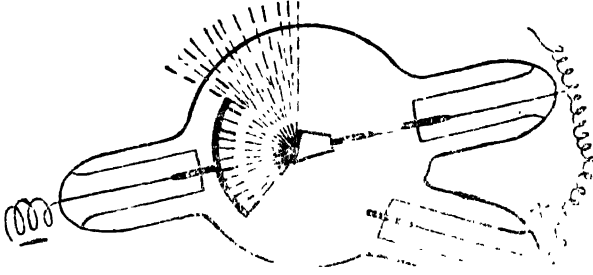
যেখানে এসে কাচের গায়ে ধাক্কা দিয়ে পীতাভ সবুজ আভায় তার গায়ে লাবণ্য ঢেলে দিচ্ছে, সেখান থেকেই ঐ অজ্ঞাত রশ্মি বিকীর্ণ হতে থাকে। অজ্ঞাত বস্তুকে এক্স্ (X) এই অক্ষর বা বর্ণ দিয়ে বিশেষিত করে আবিষ্কর্তা রঞ্জেন তার নাম দিলেন এক্স্-রশ্মি। পরে অবশ্য আবিষ্কর্তার নামেই এর নাম রাখা হয় রঞ্জেন-রশ্মি। রঞ্জেন দেখলেন যে রশ্মিগুলি সরলরেখা ধরেই চলতে থাকে। কিন্তু আলোরশ্মি যেমন একটি মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করলে প্রতিসরিত হয়ে একটু বেঁকে যায়, এ রশ্মি সেভাবে প্রতিসরিতই হয়না। এমনকি, চৌম্বক ক্ষেত্রেও তার বক্রতা ঘটেনা। অধিকন্তু, কোনও বস্তু মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে সামান্যভাবে শোষিত হয়ে পড়লেও তারা এমন বহু অস্বচ্ছ সামগ্রীকেও ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারে, যেগুলিকে ভেদ করে সাধারণ আলো বা এমনকি বেগনিপারের আলোও বেরিয়ে আসতে পারেনা। তাদের এই ভেদন ক্ষমতার জন্য তারা চামড়া ও রক্তমাংস ভেদ করে গিয়ে হাড়ে লেগে সেখান থেকে প্রতিহত হয়ে ফিরে এসে অস্থি প্রভৃতির ফটোও তুলে দিতে পারে। ফল হল অসীম গুরুত্বপূর্ণ। সুস্টার লিখে গেছেন যে, রঞ্জেন-রশ্মি আবিষ্কারের কিছু পরেই ম্যাঞ্চেস্টারে তাঁর নিজ গবেষণাগারটি বৈদ্যজনাকীর্ণ হয়ে উঠেছিল—চিকিৎসকবৃন্দের রোগীবর্গের দেহাভ্যন্তরস্থ যাতনা-স্থানে কোনো কাঁটা ফুটে আছে কিনা, ইত্যাদি বিষয় এক্স্‌রে ফটো তুলে দেখে দিতে হবে, রোগী রোগিণীদের একান্ত ইচ্ছা।

সামঞ্জস্য স্থাপনের সংকেত মিলে গেল। কিন্তু প্রকৃতি তো কোনো কিছুকেই প্রত্যক্ষভাবে দু'হাত দিয়ে ধরে নিয়ে এসে মানুষের দু'হাতে তুলে দেননা। স্নেহ-

দাত্রী তিনি, বিধাত্রীও। কিন্তু তিনি বুঝি তাঁর সাধের মানুষকে করে তুলতে চান গৌরবান্বিত, স্বশক্তিপ্রতিষ্ঠিত। মানুষকে তাই হাত বাড়িয়েই প্রকৃতির কাছ থেকে রত্ন সম্পদ তুলে নিতে হয়। তাই ঐ সংকেত-সূত্র ধরেই চিন্তা আরম্ভ হল। রঞ্জেন-রশ্মির প্রকৃতি নিয়েই জল্পনা চলল। কেউ তাকে বললেন, সর্বব্যাপক ইথারের বহু-অন্বেষিত দীর্ঘ তরঙ্গকম্পন, কেউ বললেন, অন্য কিছু। কিন্তু ইথারের ব্যাপারটি ক্রমেই জটিল হয়ে পড়ল। তার যথার্থ গুণাগুণ বা অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া সম্ভব না হলেও তবুও তার ভৌতিক ছায়াটি মাঝে মাঝে কোথা থেকে হঠাৎ বিজ্ঞানীবৃন্দের মনলোকে আবির্ভূত হয়ে তাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলবার চেষ্টা করেছে (পৃ. ১৬৪)। তা সত্ত্বেও বোঝা যাচ্ছে যে, আলোরশ্মির বাহন হিসাবে তাকে যেন আর ধরে রাখতে পারা যাচ্ছেনা। আলোকের গতিবেগ নির্ণয়ের ব্যাপারে এ বিষয়টি খুব সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। ক্রমাগতই মনে হতে লাগল যে, পৃথিবীর উপর পার্থিব পরিবেশ বা ইথার জনিত পরিবেশের মধ্যে আলোকের যথার্থ গতিবেগ নির্ণয় যেন প্রায় অসম্ভব। কারণ, পৃথিবী নিজেই দুইভাবে (আহ্নিক বা প্রাত্যহিক, ও বার্ষিক) গতিশীল হওয়ায় এখানে আলোর গতিবেগটি পৃথিবীর সেই গতিবেগের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকছে। অথচ পৃথিবী স্বয়ং একটি রশ্মি চালক (luminiferus) মাধ্যমের (অর্থাৎ ইথারের) মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে যাচ্ছে এবং আলোরশ্মিকেও সেই মাধ্যমের মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে। সুতরাং মাধ্যম জনিত বাধার তারতম্যের ফলে তুলনামূলকভাবে আলোকের গতিবেগ নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। ১৮৮১ খ্রী.-এ চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইকেলসন (Albert Abraham Michelson—1852-1931) প্রত্যক্ষ পরীক্ষার দ্বারা ঐ মাধ্যম বা ইথারের সম্বন্ধে একটি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইলেন। সেই সময় তিনি জার্মানীতে ছিলেন। সুতরাং বার্লিনেই পরীক্ষা হল। আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য পট্‌সডামেও পুনঃপরীক্ষা করা হল। কিন্তু এসব পরীক্ষাতে কোনো-ক্রমেই ইথারকে ফ্রেসনেলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী (পৃ ১০৫-১০৬) সুস্থির পদার্থ বলে মনে করা গেলনা। ইতিপূর্বে আলোর গতিবেগ নির্ণয়ের জন্য অনেকেই নানাভাবে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের সে চেষ্টার মূল নীতিটি বেশ সরলই ছিল। ধরা যাক আলোর গতিবেগটি খুব প্রবল নয়, এবং একজন লোক কোনো একটি বিশেষ জায়গায় দাঁড়িয়ে কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তে একটি আলো জ্বালিয়ে দিল। যদি দু' মাইল দূরে একটি আয়না পাতা থাকে তাহলে আলোরশ্মি সেই আয়না পর্যন্ত গিয়ে সেখানে প্রতিফলিত হয়ে আবার ঐ ব্যক্তির কাছে ফিরে আসবে। যাওয়া আসাতে ঐ রশ্মি মোট চার মাইল চলবে। তারপর যখন তা ফিরে এসে

লোকটিকে সে সংবাদ জ্ঞাপন করবে তখন ঘড়ি থেকে সময় দেখে ঐ চার মাইল চলবার জন্য কত সময় লেগেছে জানা যাবে, এবং তা থেকেই তার গতিবেগও সহজেই নির্ণয় করা যাবে।

এই তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে পর্যবেক্ষক বিজ্ঞানীবৃন্দ আলোর গতিবেগ নির্ণয়ের জন্য যে চেষ্টা করেছিলেন, তাতে তাঁরা সকলেই প্রায় একই সংখ্যার কাছাকাছি এসে পৌঁচেছিলেন। সকলেই দেখেছিলেন যে, শূন্যস্থানে আলোকের গতিবেগ সেকেণ্ডে প্রায় ৩০০০০০ কিলোমিটার বা ১৮৬০০০ মাইল। ১৮৮২-তে মাইকেলসনও প্রায় একই ফল প্রাপ্ত হলেন। কিন্তু ঐ শূন্যস্থান বা ইথার-মাধ্যমের তত্ত্বটির সমাধানের জন্য লর্ড রালেব অনুরোধে কয়েক বছর পরে ১৮৮৭ খ্রী.-এ তিনি পুনরায় বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন। ওহিওর ক্লেভল্যাণ্ডে ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক মর্লির (Edward Morley—18 8-1923) সঙ্গে ইন্টারফেরোমিটার নামক উদ্ভাবিত একটি যন্ত্রের সাহায্যে এ সম্বন্ধে সেই পরীক্ষাটি সম্পন্ন করা হল। কিন্তু মাইকেলসন-মর্লির এই পরীক্ষাতে জানা গেল যে, আলোর গতিবেগটি পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরত্বের উপর মোটেই নির্ভর করছেনা। কেন্দ্রের নিকটবর্তী ভূপৃষ্ঠে, কিংবা কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী পর্বতশীর্ষে তার গতিবেগ একই; অথচ পৃথিবী ঘূর্ণমান থাকায় ভূপৃষ্ঠের চাইতে গিরিশৃঙ্গের গতিবেগ অনেক বেশি। সুতরাং জানা গেল যে, কোনো দর্শকের পক্ষে আলোর উৎসের গতিশীলতার জন্য যে ঐ আলোকের গতিবেগটির পৃথক হবে হবে (ডপলার তত্ত্ব পৃ. ১৬৪), মোটেই তা নয়। অর্থাৎ ধরে নিতে হয় যে, আলোকের উৎস যদি, গতিশীল থাকে, তাহলে তার সঙ্গে তার চতুষ্পার্শ্বস্থ ইথার-সমুদ্রও গতিশীল থাকে, সুতরাং আলোতরঙ্গনির্ভর গতিকে সম্ভব করবার জন্য তার বাহনরূপী ইথারের কল্পনাকে যদি সত্য বলে ধরে নিতেই হয়, তাহলে এও ধরে নিতে হয় যে, ফ্রেসনেলের অনুমান অনুযায়ী সমগ্র ইথার সমুদ্রকে আর সুস্থির পদার্থ বলা চলেনা। বরং এ বিষয়ে স্টোক্‌সের অনুমানই (পৃ. ১০৬) সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী। অর্থাৎ পৃথিবীর সাথে তার ঐ মাধ্যম বস্তু বা ইথারটিও প্রায় একই ভাবে ছুটে চলেছে।

এই রকমের একটি অসম্ভব বিষয় প্রমাণিত হতে চলেছে দেখে বৈজ্ঞানিক মহলে প্রচণ্ড বিস্ময় সৃষ্টি হল। ইথার-তত্ত্ব আরও জটিল হয়ে উঠল। পদার্থ বিজ্ঞানীবৃন্দ তার জটিল পাকে মর্মান্তিকভাবে জড়িয়ে পড়লেন। ১৮৯৬ খ্রী.-এ গ্লেজব্রুক (R. T. Glazebrook) মন্তব্য করলেন যে, বিদ্যুৎ, চুম্বক, ঔজ্জ্বল্যময় বিকিরণ এবং মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে বিজড়িত ইথার-তত্ত্বের সমস্যা সমাধানের

জন্য আর একজন দ্বিতীয় নিউটনের প্রয়োজন ঐকান্তিক হয়ে উঠেছে। বাস্তবিকই অল্পকাল পরে সেই দ্বিতীয় নিউটনের আবির্ভাব ঘটল। এবার কিন্তু বিজ্ঞান-মানসের কামনা সমুদ্ভূত ব্যক্তিটির নাম হল আইন্‌স্টাইন (Albert Einstein—1879-1955)।

বোঝা যাচ্ছিল যে ইথারের দিন ফুরিয়ে আসছে। সুতরাং রঞ্জেন-রশ্মির প্রকৃতি নির্ণয়ের ব্যাপারে ইথারের তরঙ্গ নিয়ে যতই জল্পনা চলুক না কেন, টমসন কিন্তু অন্য পথ ধরলেন। তিনিই বোধহয় ঐ রশ্মির শ্রেষ্ঠ ধর্মটির সন্ধান দিয়ে দিলেন। তিনি জানালেন, রঞ্জেন-রশ্মি গ্যাসের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় তাকে পরিবাহী করে তুলে। পরিবাহিতার আয়ন-তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করে তিনি ঐ ব্যাপারটিকেও ধরে নিলেন এক প্রকারের বিদ্যুদ্বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া, যার মারফতে অণুগুলি পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিশ্লেষিত হয়ে যায়। সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, এ হচ্ছে আর কিছু না, গ্যাসেরও আয়নায়ন। অচিরেই দেখা গেল যে রঞ্জেন রশ্মির সংস্রবে পরিবহণ শক্তিপ্রাপ্ত গ্যাসকে যদি কাচ-উলের ((glass wool) ছিপির ভেতর দিয়ে জোর করে ঠেলে বার করা যায় তাহলে তার আর ঐ শক্তি থাকেনা। সুতরাং জানা গেল যে, যে-প্রকার গঠনের জন্য গ্যাসের ঐ পরিবহণ-ক্ষমতা, তা এত স্থূল ধরনের যে, প্লাগের (ছিপির) ছিদ্র পথ দিয়ে আসার সময় সেটি আর বজায় থাকতে পারেনা। ঐ গ্যাসের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎচালনা করলেও তার পরিবাহিতা নষ্ট হয়ে যায়। তড়িৎ-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটিতেও ঠিক এই ঘটনা ঘটে। কারণ, বিদ্যুৎ-বিশ্লেষ্য দ্রবণের মধ্যে ও দীর্ঘকাল যাবৎ তড়িৎ চালনা করলে উপস্থিত আয়নগুলি ক্রমাগত প্রবাহ পথ দিয়ে অপসৃত হয়ে যায়। শেষে দ্রবণটিরও আর পরিবহণযোগ্যতা থাকেনা। এইভাবে গ্যাসের ক্ষেত্রেও মনে করা যেতে পারে যে, এক্‌স্-রশ্মির দ্বারা গ্যাসের মধ্যেও যেসব পরিবাহক বস্তুর উদ্ভব ঘটে, সেগুলিও বিদ্যুৎচালনার ফলে আধান পরিবহণ করতে করতে সকলেই ক্রমে ক্রমে নিষ্কাশিত হয়ে যায়।

আবার এই তত্ত্বটির সাহায্যে রঞ্জেন রশ্মি প্রভাবিত গ্যাসের অন্য একটি ধর্মেরও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। গ্যাসের মধ্যে চালিত প্রবাহের শক্তিটি রশ্মি বিকিরণের গুরুত্ব আর তড়িৎচালক-বলের উপরেই নির্ভর করে। যদি বিকিরণ ঠিক রেখে তড়িৎচালক-বল বাড়িয়ে দেওয়া যায় প্রবাহটি বাড়ে বটে, কিন্তু অনির্দিষ্টভাবে না। একটি সম্পৃক্ত অবস্থায় বা শেষ সীমায় এসে পৌঁছায়। রঞ্জেন-রশ্মির দ্বারা আয়ন-উৎপাদন খুব দ্রুতই চলতে থাকে। কিন্তু তড়িৎ-চালক বল সেগুলিকে ক্ষিপ্রতর গতিতে সরিয়ে দেয়। তখন ঐ বল আর অধিক কাজ করতে পারেনা।

ফলে ঐ সম্পৃক্ত অবস্থাটি এসে পৌছায়। ইতিমধ্যে আরও সব তথ্য সংগৃহীত হতে লাগল। বোঝা গেল যে রঞ্জেন-রশ্মি প্রভাবিত গ্যাসের পরিবাহিতার ব্যাপারটি শিখা থেকে উদ্ভূত গ্যাসের, কিংবা গিজে আর স্থস্টারের তত্ত্বপ্রযুক্ত ক্ষরণপথ থেকে উদ্ভূত গ্যাসের পরিবাহিতার সমধর্মী। বাষ্পের মেঘরূপে ঘনায়ন থেকেই ঐরূপ ঐক্যের প্রমাণ মিলে যায়। বহু পূর্বেই ১৮৮০ খ্রী.-এ আইৎকেন (John Aitken) লক্ষ্য করেছিলেন যে শিখা থেকে উদ্ভূত গ্যাস অন্য একটি সম্পৃক্ত গ্যাস থেকে জলীয় বাষ্পকে অধঃক্ষিপ্ত করে দেয় (causes precipitation)। ১৮৮৭-তে হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্‌ও দেখেছিলেন যে, যে-গ্যাসের মধ্য দিয়ে তড়িৎক্ষরণ ঘটান হয়েছে তারও ঠিক একই ক্ষমতা আছে। ১৮৯৬ খ্রী.-এ কেম্ব্রিজের ক্যাভেণ্ডিস গবেষণাগারে কাজ করতে করতে ইংরাজ পদার্থবিদ উইলসনও (Charles Thomson Rees Wilson—1869-) দেখিয়ে দিলেন যে, রঞ্জেন-রশ্মি প্রভাবিত গ্যাসেরও একই দশা ঘটে। স্থতরাং আয়নতত্ত্বের ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, শিখা থেকে উদ্ভূত, এবং তড়িৎক্ষরণযুক্ত, এবং রঞ্জেন-রশ্মি প্রভাবিত ঐ তিন প্রকার গ্যাসের মধ্যেই আয়ন বর্তমান থাকে, এবং তারা বাষ্পের ঘনীভবন কেন্দ্র হিসাবেই কাজ করে চলে।

জল্পনা থেকে সংকেতের দ্যোতনা স্পষ্ট হয়ে উঠল। টমসনই আবার সামঞ্জস্য স্থাপনের তত্ত্বকে দর্শন করালেন। ১৮৯৭ খ্রী.-এর ৩০শে এপ্রিল রয়্যাল ইনস্টিটিউশানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে ঋণাত্মক রশ্মি সম্বন্ধে তিনি অণু-ঝর্ণার তত্ত্বের সঙ্গে লেনার্ড্‌-দৃষ্ট বস্তুভেদী রশ্মিপথ সংক্রান্ত (তরঙ্গ) তত্ত্বের সামঞ্জস্য স্থাপন করে দিলেন। তিনি জানালেন যে, ঋণাত্মক-রশ্মির প্রতিপ্রভাব মাত্রা তো অপরিবর্তনীয় নয়। তা তো ক্রমাগতই কমতে থাকে। লেনার্ডের তালিকা (table) থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, একটি রশ্মির স্বীয় ঔজ্জ্বল্যের মান প্রায় অর্ধেকটা কমে যাওয়ার পূর্বেই সাধারণ চাপে বায়ুর মধ্য দিয়ে তা আধ সেন্টিমিটার অতিক্রম করে যেতে পারে। অথচ এই একই চাপে একটি বায়ুর অণু যেতে পারে মাত্র ১০⁻⁵ (১/১০০০০০) সেন্টিমিটার এবং একটি নিঃক্ষিপ্ত বায়ুর অণু তাতেই তার অর্ধেক পরিমাণ ভরবেগ (ভর × বেগ) খুইয়ে ফেলে। অবশ্য এমনও হতে পারে যে সেই একই অণুটি শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌচচ্ছেনা। তাহলেও, সংঘর্ষজনিত তির্যক গতির ফলে ঐ দৈর্ঘ্যের মাত্র কয়েক গুণ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করলেই একটি অণুর ভরবেগের অর্ধেকটা কমে যাবে। স্থতরাং লেনার্ডের নল-বহিস্থ রশ্মিশোষণ সংক্রান্ত পরীক্ষাগুলি থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, অণু-কণিকাগুলি যেমন চলবার সময় তাদের ভর ও বেগ খুইয়ে ফেলে, ঋণাত্মক রশ্মিও ধাবমান হতে হতে তার ঔজ্জ্বল্য বা প্রতিপ্রভা খুইয়ে ফেলে। স্থতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, ঋণাত্মক রশ্মিমালাও অত্যুচ্চ গতি সমন্বিত তড়িদাহিত কণিকাগুচ্ছই। সেই আধানবাহক কণিকা বা

ইলেক্ট্রনগুলির আকৃতি অবশ্য সাধারণ অণু বা পরমাণুর তুলনায় অত্যল্প। কিন্তু যে কোনো গ্যাস নির্বিশেষে ঐ বাহক কণাগুলি একান্তই এক। তারই জন্য নল-মধ্য গ্যাসের প্রকৃতি যাই হোক না কেন, চুম্বকজনিত বিক্ষেপও সেখানে সর্বদাই একপ্রকার। ১৮৯৭ খ্রী.-এই কল্পিত পরমাণুর চাইতেও ক্ষুদ্রতর কণার অর্থাৎ ইলেক্ট্রনের বাস্তব অস্তিত্বের প্রমাণ মিলে গেল। আশ্চর্য ঘটনা!

লক্ষ লক্ষ বৎসর মানুষ যার সন্ধান পায়নি, তার সন্ধান মিলে গেল। প্রকৃতির রাজ্য থেকে আর একটি পর্দা উন্মোচিত হয়ে গেল। মানবজাতি সত্যোপলব্ধির অধিকতর নিকটবর্তী হয়ে ধন্য হল। তার সাধনা তাকে আরও একধাপ উঁচুতে তুলে দিলে। কিন্তু সিদ্ধিটা কি তার আরও অনেক দূরে? না, সে কি তার প্রার্থিত বস্তুর কাছাকাছি এসে হাজির হয়ে গেছে? পার্থিব মৌলিক উপাদানের সন্ধান কি সে তাহলে অচিরেই পেয়ে যাবে? আর জগৎব্যাপ্ত সেই উপাদানের স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করে কি তার সমগ্র সত্যের দর্শন ঘটবে? যার নাম হতে পারে বিশ্বরূপদর্শন? কি পরমাণুর চাইতেও সূক্ষ্ম যে বস্তুর সন্ধান সে আজ পেয়ে গেল, তাই দিয়ে কি তাহলে এ জগৎ গঠিত? তাই যদি হয়, তাহলে এ আর নতুন কি কথা হল? পরমা কণিকার স্থান গ্রহণ করল আর এক কণিকা, শুধু এই ত। অবশ্য শুধু এই মাত্র নয় টমসন্ আবিষ্কার করলেন যে, যে-কোনো উপাদানের যে-কোনো পরমাণু থেকে উথি হয়ে আসুক না কেন, ঋণাত্মক-রশ্মি-কণিকাগুলি সর্বদাই এক। ১৮১৫-১৬ খ্রী.- প্রাউট বলেছিলেন, সকল উপাদানেরই পারমাণবিক ওজন হাইড্রোজেন-পরমাণুর ওজনে একটি পূর্ণ-সংখ্যক গুণিতক (গুণফল) মাত্র, এবং সেইজন্য হাইড্রোজেন-পরমাণুটিকে জগতের আদিম উপাদান বলে ধরে নেওয়া যায়। কিছুকাল পরে জা গিয়েছিল যে অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রে ঐ গুণিতকটি সর্বদা পূর্ণ সংখ্যা থাকে স্নতরাং হাইড্রোজেন-পরমাণুকে আর মূল উপাদান বলা চলেনা। আরও কিছুক পরে জানা গিয়েছিল যে পার্থিব মূল উপাদান যদি বলতেই হয়, তাহলে বলতে হবে পরমাণুকেই; যদিও সব বস্তুর পরমাণু হুবহু এক নয়, এবং তা প্রকার সংখ্যাও ৯২-টি। টমসন্ এখন ৯২ সংখ্যাটিকে কেবল ১-এ নামিয়ে আনলে সেই ১-টি, ক্ষুদ্রতম পরমাণু অর্থাৎ হাইড্রোজেন-পরমাণুর চাইতেও অনেক ছো এদিক থেকে টমসন্-গোষ্ঠীর আবিষ্কার নিঃসন্দেহে সত্যকে আমাদের আরও অ কাছে এনে হাজির করে দিয়েছে। কিন্তু কতটা কাছে তা কি করে বলা যাবে? তো পড়ে আড়াই হাজার বছর আগেকার সেই লিউসিপাস-ডিমক্রিটাস-এপিকিউ গোষ্ঠীর বস্তুবাদী দার্শনিকবৃন্দের তত্ত্বচিন্তার কথা, যাঁরা ঘোষণা করেছিলেন জগ অগণিত কণিকা দিয়েই তৈরি। অভেদ্য বা অবিভাজ্য সেই কণিকার নামব

রা হয়েছিল 'অ্যাটম', ভারতীয় সংস্কৃত ভাষায় 'পরমাণু'। আজ অবশ্য পরমাণুর হতেও ক্ষুদ্রতর বস্তুসত্তা বেরিয়ে এল পরমাণুর ভেতর থেকেই। কিন্তু পরমাণু সম্বন্ধে দের ধারণাটি কি ছিল? তাঁরাও তো বলেছিলেন পরমাণুর মধ্যে আকার আয়তন ওজনগত যত পার্থক্যই থাক না কেন, সে তাদের পরিমাণগত পার্থক্যই। আর ফলে সেইজন্যই যা গুণগত পার্থক্য। তাহলে পরমাণু সম্বন্ধে তাঁদের ধারণাটি ঊনবিংশ তাব্দীর পরমাণু-চিন্তার সঙ্গে একেবারে এক ছিল বলি কি করে? বরঞ্চ াদের সেই 'অ্যাটম' সম্বন্ধীয় ধারণাটিও অনেকটা নবাবিষ্কৃত ইলেক্ট্রনের সামিল। ব তাই যদি হয়, তাহলে ইলেক্ট্রনের আবিষ্কারটি আমাদেরকে সত্যের কতটা ছে এগিয়ে দিল? প্রাচীন পদার্থবিদ্‌রা অবশ্য কণিকার তড়িৎধর্মের কথা ল্পনাই করতে পারেননি। কিন্তু এটি তো তার একটি গুণ মাত্র। সুতরাং াসল বস্তু বা মৌলিক উপাদানটির সন্ধান তাঁরা পেয়েছিলেন। এমন কি ামরা এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে একথাও বলতে পারি যে টমসন-গোষ্ঠীর ঐ াবিষ্কারের কিছুকাল পূর্বে মেন্দেলিয়েভ-গোষ্ঠী কি দেখিয়ে দেননি যে যাকে মামরা উপাদান বলেই প্রধানত মনে করে আসছি, আসলে তা কেবল একটি রসত্তা—যার পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলেই পরমাণুর গুণগত পরিবর্তন ঘটে লেছে? তাহলে আমরা একথাও বলতে পারি যে, প্রাচীন মনীষীবৃন্দ উপাদানের ধ্যে হয়ত এই ভরটিরও গন্ধ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাহলে মানুষের ত অনুসন্ধান এতদিনের এমন সাধনা কি সব ব্যর্থ? সে কি শুধু ঐ একই বস্তুর কাছে র বার ঘুরে ঘুরে ফিরে আসা? সভ্যতার অগ্রগতি বলতে কি তাহলে শুধু এক ত্তপথে গতি? বিবর্তন বা গতি বলতে কি কেবল আবর্তন? কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখলে বুঝতে পারি, চিন্তাশক্তিটিও তো আমাদের এগিয়ে চলেছে। কেন আমরা কই প্রণালিতে চিন্তা করব? বিচার-প্রণালিকে আমাদের আরও এক ধাপ এগিয়ে ানতেই হয়। মেন্দেলিয়েভও তো নিজেই লিখে গিয়েছেন, "ভরই উপাদানের কমাত্র নিশ্চিত ধর্ম যাকে অবলম্বন করেই তার অন্য ধর্মগুলির বিকাশ ঘটেছে।" নিশ্চয়ই ভর সম্বন্ধে প্রাচীন মনীষীবৃন্দের এ ধারণা ছিলনা। ভরটি যে একটি গুণমাত্র, ধারণা কি চিন্তার তথা সভ্যতার অগ্রগতির সূচনা করে দিচ্ছেনা? আর তাই দি হয় তাহলে ঐ ভরটিকেই পার্থিব উপাদান বলে ধরে নিতে আপত্তি কোথায়? ণকে যে পদার্থেরই গুণ মনে করতে হবে—এ পুরানো চিন্তাকে আর কতকাল রাখা চলে?

তাই যদি হয়, তাহলে টমসন্‌-গোষ্ঠীর যে আবিষ্কার, তার কি কোনো সার্থকতা রশ্মি বা আলো, সে তো শুধু গুণ মাত্র। আর গুণ মানে তো আমাদের

সাবেকী চিন্তায় বস্তুগুণ বলেই জেনে এসেছি। নব্য চিন্তায় গুণকে যদি পদার্থ-গুণ বলে ভাবার দরকার না থাকে, তাহলে কেনই বা ওঁরা এমনভাবে ঋণাত্মক রশ্মিমালাকে পদার্থের গুণ তো দূরের কথা, একেবারে পদার্থকণিকা বলেই প্রমাণ করবার জন্য এমন আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছেন? কিন্তু ব্যাপারটি কি সত্যিই তাই? সত্যিসত্যি কি বিজ্ঞানীরা গুণকে পদার্থ প্রমাণ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গিয়েছেন? আসলে কিন্তু প্রমাণ ওঁরা কিছুই করতে চাননি। আর চাইলে তা পারতেনও না কোনো দিন। পারতেন শুধু নিছক-কল্পনার পানে ধাওয়া আর সব মানুষ বা মনুষ্য-গোষ্ঠীর মত বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে। বিজ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে আমরা ভুরি ভুরি প্রমাণ পেয়েছি যে, যেখানেই আজগবী কল্পনাকে সত্য প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে, সেখানেই শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীকেও পিছু হঠতে হয়েছে। এর একমাত্র কারণ, বিজ্ঞানীরা কোনও অলীক কল্পনাকে জোর করে সত্য প্রমাণ করতে চাননি। তাঁরা চেয়েছেন শুধু সত্যটিকে দেখে বা বুঝে নিতে। তাঁদের কল্পনা সেই বিশ্বব্যাপ্ত সমগ্রসত্য-দর্শনেরই কল্পনা। বা সামাজিক ব'লে তা পরিকল্পনাও। তাই সত্যকে পরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁরা সকল প্রকার কল্পনা করতেই প্রস্তুত। আবার সেজন্য সকল প্রকার সাধের কল্পনাকেও পরিত্যাগ করতে তাঁদের কুণ্ঠা নাই। একদিকে তাঁরা মহাভোগী বটে, অন্যদিকে তাঁরা মহাসন্ন্যাসী। একমাত্র সত্যসন্ধানীর ভোগই তাই সার্থক—কারণ, একমাত্র এই ক্ষেত্রেই ভোগের নামান্তর ত্যাগ বা তপস্যা। মহাতপস্বী বিজ্ঞানী তাই প্রমাণ করতে চান কেবল সত্যকে—যা তাঁরা দেখেছেন এমন সত্যকে। যা তাঁরা এখনও দেখেননি, কল্পনার চোখ দিয়ে ছাড়া, সে সত্যকেও। তাই টমসন্‌রা যা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, সেটি একরকম তাঁদের প্রত্যক্ষীভূত সত্যই। ক্রমে ক্রমে তার আরও প্রমাণ মিলে গেল। আবার স্বয়ং টমসন্‌ও যে মিথ্যা কল্পনা করেছিলেন, তার ভ্রান্তিও যে সুপ্রমাণিত হয়েছিল তাও আমরা দেখতে পাব। প্রাচীন ঋষি বা আধুনিক বিজ্ঞানী, যিনি যত বড়ই হউন না কেন, তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধি তখনই সার্থক হয়, যখন তা সমগ্র সমাজেরই উপলব্ধির গোচরীভূত হয়ে যেতে পারে। তেমনি আবার এক বিশেষ ব্যক্তির অভিমত আজ সাধারণ মানুষের কাছে যত ভ্রান্তই মনে হোক না কেন, সমগ্র মানবসমাজের চিত্তমুকুরে প্রতিফলিত হয়ে তাঁরই অভ্রান্ত চিন্তাটি সার্থক প্রতিপন্ন হয়ে যেতে পারে।

টমসন্‌-গোষ্ঠী তাই একমাত্র সত্যকে ছাড়া আর কিছুই প্রমাণ করতে চাননি। সেই সত্যানুসন্ধানের ফলেই প্রমাণ হল যে ঋণাত্মক রশ্মিমালা কণিকাধর্মী। কিন্তু নিশ্চয় এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, গুণকে কণিকা বলে জানবার সার্থকতাই বা কি,—যেখানে নব্য বিচারে নব্য প্রমাণে দেখতে পাচ্ছি যে গুণকে আর পদার্থগুণ বলে চিন্তা করার

দরকারই নেই? কিন্তু এ চিন্তাটিও সেকেলে। এই মুহূর্তে যার দরকার নাই, পর মুহূর্তে তার দরকার আছে কিনা, এ কথা বলবে কে? বিজ্ঞানী তো অতীত বা মধ্যযুগীয় ভবিষ্যৎ-বক্তার মত নন। সত্য যদি ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত হতে থাকে, প্রয়োজনেরও বিবর্তন না ঘটলে চলবে কেমন করে? স্থতরাং এই মুহূর্তের প্রয়োজনে যা সার্থক, পর মুহূর্তেই তার পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটে যাওয়ার জন্য ঐ একই আপাতদৃষ্ট প্রয়োজনের মানটিও তৎসঙ্গে বদলে যেতে বাধ্য। কিন্তু গুণ যদি কণিকাধর্মী বলে ধরা পড়ে, তাহলে আমাদের পূর্ব কল্পনাটি কি মিথ্যে হয়ে যায়? না, আরও ভাল করে জানা হয়ে যায় যে ঐ পূর্বকল্পনাটি নিছক কল্পনা নয়। গুণকে আর পদার্থ বলে মনে করার দরকার নাই এইজন্যে যে, এখন তো প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে, সত্যিসত্যিই ঐ গুণটিই কণিকা বা পদার্থ বিশেষ? কিন্তু তাহলে চিন্তার অগ্রগতি হল কোথায়? অগ্রগতি হল এইখানটিতেই যে, গুণকে যেমন আর পদার্থগুণ বলে ভাবার দরকার নাই, পদার্থকেও তেমনি আর গুণবিশিষ্ট না ভাবলেও চলে। তবে এ হয়ত চিন্তার অধিক অগ্রগতি। ব্যক্তিচিন্তায় আবির্ভূত সত্য সম্বন্ধে এই ধারণা-বাষ্প সমগ্র সমাজমানসে সংহত মেঘরূপ ধারণ করবার পূর্বে যে এখনও বস্তু আর গুণের (বা ধর্মের) একরূপতাকে দ্বিধা বিভক্ত করে দেখতে হবে, তার কারণ জড়ত্বের বন্ধন ঘুচিয়ে দিয়ে দীর্ণ চিন্তা এখনও উন্নত চিন্তায় রূপান্তরিত হতে পারেনি।

কিন্তু আর একটি অগ্রগতির কথা আমরা না ভেবে পারিনা যে, যাকে আমরা ক্যাথোড্-রশ্মি বা ঋণাত্মক রশ্মি হিসাবে দেখেছি, তাকে কণিকা বা ভর-সত্তা বলেও যেমন জানলাম, তেমনি তার আলো-সত্তা আর বিদ্যুৎ-সত্তার সঙ্গেও আমরা পরিচিত হলাম। এখন আমরা পরবর্তী দুটি পৃথক সত্তার বদলে তার তেজ-সত্তারই সঙ্গে পরিচয়ের কথা উল্লেখ করতে পারি (তুল., পৃ. ১৪৭, ১৫১-৫৩)। তবে ঐ ভর-সত্তা বা তেজ-সত্তা উভয়েই যখন গুণবিশেষ, তখন ঐ গুণ-সত্তাদ্বয়ের মধ্যে সম্পর্কটি কোথায়? বস্তুতপক্ষে, এইটিই ছিল আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় (পৃ. ১১০, ১৫১-৫৩, ১৬৪-৬৫)। পার্থিব উপাদানের শ্রান্ত ক্লান্ত ব্যর্থ সন্ধানীর কাছে এইটুকু খুঁজে বার করার প্রচেষ্টাই ছিল একমাত্র আশা-ভরসা। বর্তমান আবিষ্কারের ফলে যেন সত্যিই সে আশার আলো একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হয়ত বিজ্ঞানীর দীর্ঘকালের তপস্যা সার্থক হতে চলেছে। যে ঋণাত্মক রশ্মির মধ্যে ভর-ধর্ম আর তেজ-সত্তা এমনভাবে উদ্ভত হয়ে উঠেছে, তার বিশেষ অনুধাবন তাই ঐকান্তিক হয়ে উঠল। টমসন্ এবং তাঁর সঙ্গী শিষ্যের দলও এই রশ্মি নিয়ে গবেষণা ও তত্ত্বচিন্তা চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে, পরমাণুর অংশ হিসাবে ঐ ক্যাথোড্-কণা বা ইলেক্ট্রন ঋণ-বিদ্যুৎ সমন্বিত। অথচ একটি পরমাণু কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ।

সুতরাং একটি পরমাণুতে ঐ ঋণাত্মক বিদ্যুতের সমপরিমাণ ধণাত্মক বিদ্যুৎ থাকতে বাধ্য। একমাত্র তাহলেই তাদের যোগফল শূন্য হয়ে পরমাণুটির পক্ষে বিদ্যুৎনিরপেক্ষ ভাব ধারণ করা সম্ভব হয়। এই সময় নাগাৎ টমসন্ যেন চিন্তা করছিলেন, ঐ কল্পিত অপ্রাপ্ত ধন-বিদ্যুৎটি সম্ভবত দেহবন্ধনহীনভাবেই সারা পরমাণু জুড়ে মেঘের মত ছড়িয়ে থাকে এবং পরমাণুর সমস্ত ভরই ঐ আবিষ্কৃত ঋণাত্মক কণিকাটি দিয়েই গঠিত হয়। টমসনের এ কল্পনা যে ভ্রান্ত ছিল, পরে আমরা তা জানতে পারব (দ্র.—পরমাণুর অন্তঃপুরে)।

কিন্তু অচিরেই টমসন্ তাঁর গবেষণার যে ফলাফল প্রকাশ করলেন তার দ্বারা আধানযুক্ত কণিকার তত্ত্ব সংক্রান্ত বৃহত্তম বাধাটিও দূর হয়ে গেল। হার্জ্ লক্ষ্য করেছিলেন, স্থিতি-বৈদ্যুৎ ক্ষেত্রে (electrostatic field) ঋণাত্মক রশ্মির বিক্ষেপ (অভিমুখ বা গতিমুখ বা দিকের পরিবর্তন, ও তার পার্থক্য জনিত মাপ বা মাত্রা) ঘটেনা (পৃ.-১৬৪)। এই জন্যই টমসন্ মনে করেছিলেন যে ঐ রশ্মি কণিকাদেহ হতে পারেনা। দুটি ধাতব পাতের মধ্যে বিভব পার্থক্য (potential difference) বজায় রেখে তিনি তন্মধ্য দিয়ে ঋণাত্মক রশ্মি প্রেরণ করে ঐ ফল প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু টমসন্ জানালেন, ঐ রকম অবস্থাতে রশ্মিগুলি সূক্ষ্মায়িত গ্যাসের মধ্যে যেসব আয়ন সৃষ্টি করে, তারাই পাতের ওপরে গিয়ে জড়ে যায় এবং এভাবে মধ্যবর্তী স্থলের বিদ্যুৎ শক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়। নলের গ্যাসকে তিনি যথাসম্ভব মোক্ষণ করে নিগে (টেনে বার করে বা সরিয়ে দিয়ে) যখন ঐ প্রকার বিভ্রান্তির মূল কাবণটি অপসৃত করে দিলেন. তখন দেখা গেল যে, রশ্মিবিক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে। স্থিতি-বৈদ্যুতিক বিক্ষেপ আর চৌম্বক বিক্ষেপকে মেপে নিয়ে ১৮৯৭ খ্রী.-এ তিনি ঋনাত্মক কণিকার ভর (m—mass) আর তার বিদ্যুৎ-আধানের (e—electrical charge) অনুপাত ঠিক করে ফেললেন (দ্র.—পরমাণুর অন্তঃপুরে)। পদ্ধতিটি বেশ চাতুর্যপূর্ণ। দুটি জ্ঞাত শক্তির বৈদ্যুৎ আর চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে বিদ্যুৎ-কণিকাটি প্রেরণ করে তার বিক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। দুটি ক্ষেত্রের অভিমুখ এক থাকলে ওর্স্টেডের আবিষ্কার অনুযায়ী (পৃ. ১২৮) স্বভাবতই সমকোণ ধরে তড়িৎ-কণার ওপর তাদের পারস্পরিক প্রভাব পড়বে। সুতরাং কণিকাটির বিক্ষেপ অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রের প্রভাবজাত তার দিক্ পরিবর্তন দেখে তার ওপরে কার প্রভাব কতটা বা কিরকম পড়ছে, তার আন্দাজ পাওয়া যাবে। এদিকে বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-কণিকার বিক্ষেপ যেমন তার ক্রিয়মাণ তেজ (e—kinetic energy) বা গতিশক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে, চৌম্বক ক্ষেত্রে সেইরূপ ঐ বিক্ষেপ ঘটে তার ভরবেগের (ভর × বেগ—m × u) উপর নির্ভর করে। সুতরাং তুলনামূলক বিচার করে টমসন্ দেখতে পেলেন যে, সূক্ষ্মায়িত গ্যাসের প্রকৃতি

নির্বিশেষেই কণিকার ঐ অনুপাতটি m/e সর্বদা এক থাকছে। ভরকে গ্রাম-এককে, আর আধানকে বিদ্যুচ্চৌম্বক এককে প্রকাশ করলে m/e হচ্ছে $১০^{-৭}$। তড়িদ্বিশ্লেষণের সময় একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর (আয়নের) ক্ষেত্রে m/e হয় এর হাজার গুণ [পরবর্তীকালে অবশ্য নিখুঁত মাপে জানা গেছে যে ওটা হাজার গুণ না, ১৮৪২ গুণ]। যদি দুটি ক্ষেত্রেই আধানের পরিমাণের মানটি এক হয়, তাহলে বুঝতে পারা যায় যে, ঋণাত্মক কণিকার ওজন পরমাণুর ওজনের চাইতে অনেক [১৮৪১/১৮৪২ ভাগ] কম। আর তাহলে বলা চলে যে ঐ কণিকাগুলিই হয়ত আদিম-কণিকা, যা দিয়ে আর আর সব পরমাণু গঠিত হয়েছে। তবে পরমাণুর সমস্ত ভরটি যে ঋণাত্মক কণিকা দিয়ে গঠিত একথা জোর করে বলা চলেনা।

ঋণাত্মক রশ্মির উপাদান হিসাবে রজন জাতীয় (resinous—পৃ. ৮৭) আধান-যুক্ত কণিকাগুলির পরিমাপ পেয়ে যাওয়ায় আর একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থিত হল। তাহলে তো কাচজাতীয় (vitreous—পৃ. ৮৭) বিদ্যুৎযুক্ত অনুরূপ কোনো কণিকাও থাকতে পারে! বছর দশেক আগে গোল্ড্স্টাইন দেখিয়েছিলেন যে, যদি ক্ষরণ-নলের (পৃ. ১৬৪) ঋন-তড়িদ্দ্বারটি সচ্ছিদ্র হয়, তাহলে ঐ ছিদ্র দিয়ে তার পেছন দিকে ঐ নলের মধ্যেই এক রকমের বিকিরণ বেরিয়ে আসতে থাকে। তিনি তার নাম দিয়েছিলেন canal ray বা নালিকা-রশ্মি। বর্তমানে উইয়েন (Wilhelm Wien—1864-1928) দেখিয়ে দিলেন যে সেই নালিকা-রশ্মিগুলি ধনবিদ্যুৎযুক্ত কণিকা দিয়ে গঠিত। কিন্তু তার m/e টমসন্ প্রদর্শিত ঋণাত্মক রশ্মির m/e অপেক্ষা বহুগুণ বেশি। অথচ তা কিন্তু বিদ্যুদ্বিশ্লেষণের ক্ষেত্রের m/e-এর সঙ্গে সমমান। আরও আশ্চর্য যে, উৎস নির্বিশেষে ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণিকা সর্বদা এক হলেও ধনাত্মক কণিকাগুলি কিন্তু সর্বদা এক থাকেনা। ১৮৯০ খ্রী.-এ সুস্টার তাঁর বেকারীয় বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, গ্যাসের অণুর এবং তার ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়নের মধ্যে সংঘর্ষ বা চাপের নিয়মটি (law of impact) যদি পৃথক হয়ে থাকে, তাহলে বলতেই হয় যে এই দু'রকম আয়নের পরিব্যাপনের (ছড়িয়ে যাওয়ার) হারটিও পৃথক হবে। তিনি তাঁর ক্ষরণতত্ত্ব (theory of discharge) থেকে অনুমান করেছিলেন যে, ঋণাত্মক আয়নগুলি দ্রুততর গতিতেই পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়। ১৮৯৮ খ্রী.-এ (John Zeleny) যখন দেখলেন যে রঞ্জেন-রশ্মি মারফতে বাতাসের মধ্যে যেসব আয়ন উদ্ভূত হতে থাকে, তার মধ্যে ধনাত্মক আধানের আয়নগুলি সুনিশ্চিতভাবেই ঋণাত্মক আয়নের চাইতে মন্থর, তখন উপরোক্ত মতবাদই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

গ্যাসের আয়নের আধান-পরিমাণ স্থির করার জন্য ১৮৯৭-৯৮ খ্রী.-এ টমসন্ এবং তাঁর শিষ্য টাউন্সেণ্ড (Sir J. S. E. Townsend—1868-) একটি

পরিকল্পনা তৈরি করলেন। এ পরিকল্পনাটি বেশ চাতুর্যপূর্ণ ছিল। প্রথমে নির্দিষ্ট তড়িৎচালক বল প্রয়োগ করে রঞ্জেন-রশ্মি প্রভাবিত কোনও গ্যাসের বিদ্যুৎ-প্রবাহের পরিমাপটি জানা হয়। তার ফলে ঐ গ্যাসের আয়নের nev (n= গ্যাসের একক আয়তনের অন্তর্গত আয়ন সংখ্যা ; e=একটি আয়নের আধান-পরিমাণ ; v=তড়িৎচালক বলের অধীনে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়নের গড় গতিবেগ) স্থির করা যায়। এদের মধ্যে v-এর পরিমাপটি রাদারফোর্ড ঠিক করে ফেলেছিলেন (দ্র.—পরমাণুর অন্তঃপুরে)। সুতরাং e-এর মাপটি কোনোক্রমে জানা হলেই n-এর মানটিও জানা হয়। তৎপূর্বে ১৮৯৬ খ্রী.-এ জানা হয়েছিল (পৃ. ১৭৬-৭৭) যে, জলীয় বাষ্পের দ্বারা সম্পৃক্ত ধূলিনির্মুক্ত বায়ুর মধ্য দিয়ে রঞ্জেন-রশ্মি পাঠালে উদ্ভূত আয়নগুলিকে কেন্দ্র করে তাদের চতুর্দিকে জলীয় কণাগুলি এসে জমতে থাকে। উৎপন্ন মেঘমালার মধ্যে একটি এমন সম্পৃক্ত অবস্থা এসে যায়, যা সাধারণ ঘনায়নের মধ্য দিয়ে ঘটে ওঠা সম্ভব নয়। সুতরাং ঐভাবে মেঘায়নের হার মাপ করে বিন্দুগুলিরও আকৃতি মাপা হল। কতটা জল জমেছে তার সঙ্গে তুলনা করে দেখতেই জলবিন্দুর সংখ্যাও বেরিয়ে এল। বস্তুত ঐটিই হল আয়নেরও সংখ্যা। এভাবে n এবং v-এর গুণফল জানা হয়ে গেল। সুতরাং nev-কে এই nv দিয়ে ভাগ করতেই e-ও আর অজ্ঞাত রইলনা। দেখা গেল যে, যে-কোনো গ্যাসই হক না কেন, নির্দিষ্ট অবস্থায় তার আয়নের পরিমাণ সর্বদাই এক থাকে। বাতাসের হাইড্রোজেনের, কিংবা বিদ্যুদ্বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার অন্তর্গত হাইড্রোজেন-আয়নের আধানও ঐ একই।

১৮৯৯ খ্রী.-এর শেষভাগ পর্যন্তও পদার্থবিদ্‌রা টমসনের এসব ধারণা সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননি। ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি যখন ডোভারে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশানের সভায় 'পরমাণুর চাইতেও ক্ষুদ্রতর ভরসত্তা সম্বন্ধে' (on the exietencs of masses smaller than the atoms) নামক নিবন্ধটি পাঠ করেন তখন শ্রোতৃবৃন্দ যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করলেও, তাঁরা এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেননি। বক্তা প্রথমে ঋণাত্মক রশ্মির উপাদান-কণিকাগুলির m/e সম্বন্ধে তাঁর ১৮৯৭-তে আবিষ্কৃত তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারপর তিনি দেখান যে ঐ অনুপাতটির সঙ্গে বেগনিপারের আলো থেকে পাওয়া ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণার m/e (এবং e) এবং হাইড্রোজেন-পরিমণ্ডলের মধ্যে গনগনে উত্তপ্ত কার্বন দ্বারা উৎপন্ন ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণার m/e একই। এবং বেগনিপারের আলোর ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-পরিমাণটি (e) বিদ্যুদ্বিশ্লেষণের সময় কোনও মিশ্রণের হাইড্রোজেন-পরমাণু বাহিত বিদ্যুৎ পরিমাণের সমান। তিনি সিদ্ধান্ত

করলেন যে, যে-কোনো সূত্রেই পাওয়া যাক না কেন, ঋণ-বিদ্যুতের পরিমাণটি যে-একক দিয়ে তৈরি হয়, তার আধান-পরিমাণ ৬ × ১০^{-১০} স্থিতি-বিদ্যুৎ এককের সমান, এবং ঐ এককটি বিদ্যুদ্বিশ্লেষণের হাইড্রোজেন পরমাণুর ধনাত্মক আধানেরই তুল্য। নিম্নচাপের গ্যাসে ঋণাত্মক বিদ্যুতের এই এককগুলি সর্বদাই নির্দিষ্ট ভরযুক্ত কণিকার দ্বারা বাহিত হয়ে থাকে। সে ভরটি কিন্তু অতি সামান্য— হাইড্রোজেন আয়নের ১·৪ × ১০^{-৩} মাত্র। প্রত্যেক পরমাণুতেই এই রকমের কতকগুলি কণিকা থাকে। গ্যাসের প্রতি কণিকা থেকে এদের একটি করে কণিকা খসে যাওয়াই আয়নায়ন প্রক্রিয়ার মূল রহস্য। টমসনের এসব সিদ্ধান্ত ক্রমেই বহুসমর্থিত হতে থাকে। বর্তমানে ঠিকভাবে জানা হয়ে গেছে যে, বিদ্যুতের আধান এক একটি একক-পরিমিত স্বতন্ত্র সত্তা বিশেষ। কাচ বা রজন যে জাতীয় হ'ক না কেন, তার পরিমাণ ৪·৮০ × ১০^{-১০} স্থিতিবৈদ্যুৎ একক-যুক্ত, বা ১·৬ × ১০^{-১৯} কুলম্ব্ [সিলভার নাইট্রেট ($AgNO_3$) দ্রবণের মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ পাঠালে ঋণ তড়িদ্দ্বারের ওপর ·০০১১১৮ গ্রাম রূপা জমা হয় তাকে ১ কুলম্ব্ পরিমাণ বিদ্যুৎ বলা হয়]। ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণার স্টোনি-প্রদত্ত সেই 'ইলেক্ট্রন'-নামটি সর্বজনগৃহীত হয়ে গেল। বিদ্যুদ্বিশ্লেষ্য তরল, অথবা গ্যাস, যারই হোক না কেন, প্রত্যেকটি আয়ন এ-রকমের এক একটি আধান বহন করে চলে। বিদ্যুদ্বিশ্লেষণের আয়ন বা ধনাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত গ্যাসের আয়ন এক বা একাধিক বস্তু পরমাণু দিয়ে গঠিত। কিন্তু গ্যাসের ঋণাত্মক আয়নগুলির মধ্যে কতকগুলি, পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত থাকে না, তারা মুক্ত ইলেক্ট্রন।

বহুবিঘোষিত জগৎ-ভোলানো নিরপেক্ষ পরমাণু বিপর্যস্ত হয়ে গেল। জয়োদ্ধত অচ্ছেদ্য অভেদ্য পরমাণু বিজিত ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ল। অটুট দেহ থেকে বেরিয়ে এল লাবণি, নাম ওর ইলেক্ট্রন—বিরহ বেদনায় উন্মাদ, চঞ্চল, তেজোময়। অধীরা বিধুরা ছুটে বেড়ায় মিলন-তিয়াসে। পড়ে রইল যে দেহ, তারও কি বেদনার সীমা আছে? নাম তার আয়ন। বিরহোদ্দীপ্ত, উত্তেজিত, অস্থির সে। শুরু হয়ে যায় তারও উদ্দাম অন্বেষণ, উন্মত্ত আয়ন। অণু, পরমাণু, আয়ন, ইলেক্ট্রন,—এদের সোপান বেয়ে চলেছেন বিজ্ঞানী। কিন্তু যাত্রার কি শেষ আছে? সত্যান্বেষণের মহান অভিযাত্রীর? ঐ ইলেক্ট্রনটি কি তার শেষ সোপান হবে? ঐ ভর-তেজরূপী ইলেক্ট্রনটি? কিন্তু নিশ্চয় ওটি সেই প্রাচীন কালের দার্শনিকবৃন্দের কল্পনার পরমাণু-ধন নয়। ওটি বাস্তব বিদ্যুৎ সম্পদও যে। কিন্তু কল্পনা আর কতদূর ছুটতে পারে? বাস্তবটা যে তার চাইতে অনেক বেশি গতিবান। গতিই যার স্বরূপ, অতীতের কোনও কল্পনালব্ধ রূপ কি তার চাইতে মোহন হতে পারে?

পরমাণুর অন্তঃপুরে

প্রথম পর্ব

থমকে দাঁড়াতে হল বিজ্ঞানীকে। প্রকৃতির মধ্যে যা ঘটেছে, বিজ্ঞানী কেবল তাই প্রত্যক্ষ করলেন। প্রকৃতির রাজ্যেই অণু-পরমাণুর মত ছড়িয়ে আছে আয়ন-ইলেক্ট্রন। বিজ্ঞানী কেবল তাদের চিনে নিলেন, সনাক্ত করে দিলেন। না, শুধু তাই কেন, বিজ্ঞানী যে তাদের পারমাণবিক বন্ধন ঘুচিয়ে হাতের কাছে টেনে এনেও দেখলেন কিছু কিছু! এ কথা ঠিক যে, আয়ন বিচ্ছিন্ন-করণের কয়েকটি প্রক্রিয়া এত সহজ যে এতকাল সেকথা কেন জানা যায়নি, সেটাই এক আশ্চর্যের বিষয়। আসলে ওরা যে এভাবে এত সহজেই ওদের আণবিক বা পারমাণবিক বন্ধন ঘুচিয়ে বিকলাঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে এটা ভাবাই শক্ত ছিল। তবে আরও শক্ত একথা ভাবা যে, তা যদি না হত, তাহলে ওদের শক্ত বাঁধন খুলে দেখবার শক্তি আজ মানুষ পেত কি করে? কিন্তু রশ্মিঘাত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকৃতির রাজ্যে যে আয়নায়ন চলছে, সেই ঘটনাকে যদি আমরা আকস্মিক-আবিষ্কার বলে ধরেও নিই, তবুও বিদ্যুদ্বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে হাঁ-ধর্মী আর না-ধর্মী এই দু' জাতের আয়নকে দু' দিকে ঠেলে তরল ও গ্যাসের স্বাভাবিক এলোমেলো আণবিক বা আয়নিক প্রকৃতিকে বিজ্ঞানী শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দিতে পেরেছেন, সেজন্য কৃতিত্ব তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য। কিন্তু একথাও অস্বীকার করে লাভ নাই যে, প্রকৃতির দান বা আশীর্বাদকে স্বীকার ও গ্রহণ, এবং তারই ফলে ক্রমে ক্রমে প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে প্রাকৃতিক অভিশাপ মোচন, এ দু'য়ের কোনোটার মধ্যেই অগৌরবের কিছু নাই। বস্তুতপক্ষে, বিজ্ঞানের ইতিহাস এই সত্যটিকেই বার বার বিঘোষিত করে এসেছে। একদিকে বস্তু আর জীব-বিবর্তনের প্রবাহ, অন্যদিকে বস্তুসংঘের রূপান্তরকরণের ধারা, এই নিয়েই বিজ্ঞানের ইতিহাস। মানস-গঠনে প্রকৃতির প্রভাব, আর প্রকৃতির পরিবর্তনে মানসপ্রভাব—এইই বর্তমান পৃথিবীর আর তার সমাজপ্রগতির অনিবার্য প্রক্রিয়া। একই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত দুই ভিন্ন ক্রিয়াই তাই তুল্যমূল্য। তুল্য-মূল্য যে, তার প্রমাণ, এখনও মানুষকে অন্ধকার পথে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির পানে তাকিয়ে প্রার্থনা করতে হয়, "আলো দাও আমাকে, হে প্রকৃতি।" কিন্তু ক্ষণপ্রভা যখন আলো দান করে ছুটে পালায়, তখন মানুষও শুরু করে দেয় তার পথ-অতিক্রমণ। যতটা দেখেছে আলোয়, সেটুকু তো সে চলেই, যে পথের

নির্দেশ সে পায়নি সেই অন্ধকার পথেও সে তার মনের আলোটি জ্বালিয়ে দিয়ে দুঃসাহসিক অভিযান শুরু করে দেয়। স্বভাবতই সেই মৃদু আলোকে স্খলন পতন ঘটে কত অভিযাত্রীর। কিন্তু কোথাও না কোথাও মোড় ঘুরলে দেখতে পায় আবার আলো। ক্যাথোড্-কণিকার আলো-আঁধারী গোলক-ধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে হয়ত হঠাৎ জ্বলে উঠে রঞ্জেন-রশ্মির কম্পমান শিখা, জননী-প্রকৃতির স্নেহ-নির্দেশ।

আবার বিজ্ঞানী এগিয়ে চলেন। আর তাই সেই উপাদান-সন্ধানের পুরানো প্রশ্নটি জেগে ওঠে ভর-তেজ সম্পর্ক সন্ধানের নূতন ভঙ্গিতে। কতদূর এগিয়ে চলার পর আবারও তাই তাঁকে থমকে দাঁড়াতে হয় নতুন নির্দেশের জন্য। অক্লান্ত পথিকের ঐকান্তিক আগ্রহের কাছে আবারও নেমে আসতে হয় প্রকৃতিকে তাঁর দুজ্ঞেয় লোক থেকে সে নির্দেশ নিয়ে। রঞ্জেন-রশ্মির নির্দেশ পৌঁছায় ১৮৯৫ খ্রী.-এ। ১৮৯৬-তেই নূতন সংকেত এসে গেল—উদ্দীপনাময়, উদ্দেশভরা, দ্যোতনা-টলমল।

কাচনলের প্রান্ত থেকে অদৃশ্য রঞ্জেন-রশ্মি তার প্রচণ্ড ভেদশক্তি নিয়ে ধাবিত হচ্ছিল। প্রতিপ্রভ বস্তুর দীপ্তির মতই তো তা হয়ে উঠেছিল পীতাভ সবুজ প্রভায় জ্বলজ্বলে। তাহলে ঐ প্রতিপ্রভা গুণটিই কি রঞ্জেন-রশ্মির কারণ হতে পারেনা? ইতিপূর্বে এমন কয়েকটি বস্তুর সন্ধান মিলেছিল, যেগুলিকে কিছুক্ষণ আলোতে ধরে রাখলেই তারপর তারা আরও কিছুকাল যাবৎ বহিরালোক ব্যতিরেকেই নিজেরা জ্বল জ্বল করতে থাকে। সুতরাং বিজ্ঞানীরা দেখতে চাইলেন সাধারণ-ভাবে ঐসব প্রতিপ্রভ বস্তুই ঐ রকমের রশ্মি-বিচ্ছুরণ ঘটায় কিনা, যে-রশ্মি অস্বচ্ছ বস্তুকেও ভেদ করে ফটো-প্লেটে গিয়ে ছবি তোলার কাজ চালিয়ে যাবে, বা অন্যান্য বস্তুতেও আঘাত করে তার মধ্যে প্রতিপ্রভা জাগিয়ে তুলবে। ঐ বিজ্ঞানী-বৃন্দের মধ্যে একজনের নাম কিন্তু অমর হয়ে গেল। এ. সি. বেকারেলের পৌত্র, এড্মণ্ড্ বেকারেলের (Edmond Becquerel—1820-'91) পুত্র হেনরি বেকারেল (Henry Becquerel—1852-1909) প্রতিপ্রভ বস্তু হিসাবে একটি ইউরেনিয়াম-লবণকে নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। ইতিপূর্বে তাঁর বাবাই দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে ইউরেনিয়াম এবং পটাসিয়ামের দ্বি-সালফেট লবণটি একটি প্রতিপ্রভ বস্তু। হেনরি বেকারেল সেই দিয়েই কাজ আরম্ভ করে দিলেন,—লবণ পছন্দের পেছনে অন্য কোনো গূঢ় বৈজ্ঞানিক কারণ ছিলনা। পরিকল্পনাটি এই ছিল যে, একটি ফটো-প্লেটকে দুটি ঘন কালো রঙের কাগজ দিয়ে বেশ ভাল করে এমন ভাবে জড়িয়ে রৌদ্রে রাখতে হবে যেন একটুও সূর্যরশ্মি সেই প্লেটে গিয়ে না

লাগতে পারে। এভাবে-জড়ানো প্লেটটির ওপর কোনো প্রতিপ্রভ বস্তুকে স্থাপন করে সব শুদ্ধ ওটিকে রৌদ্রে রেখে দিতে হবে। তার ফলে সূর্য-কিরণের সংস্পর্শে বস্তুটির প্রভা জেগে ওঠে। প্রতিপ্রভাই যদি রঞ্জেন-রশ্মির উৎস হয়ে থাকে, তাহলে রবিরশ্মিতে তার ঘুম ভাঙার সাথে সাথে রঞ্জেন-রশ্মিও জেগে উঠবে। তখন সে তার ভেদ ক্ষমতা নিয়ে কালো কাগজ ভেদ করেই ফটো-প্লেটে গিয়ে পৌছবে এবং সেখানে প্রতিপ্রভ বস্তুটিরই সুনির্দিষ্ট ফটো তুলে দেবে। সাবধান হয়ে বেকারেল ইউরেনিয়াম-লবণের একটি দানা নিয়ে ঐভাবেই কয়েক ঘণ্টা যাবৎ উজ্জ্বল সূর্যালোকে রেখে দিলেন। তারপর যখন শেষকালে খুব সাবধানতার সঙ্গে কাগজে মোড়া প্লেটটিকে ঘরে নিয়ে এসে ডেভালাপ (বিবর্ধন করে পরিস্ফুট) করলেন, তখন সত্যিই দেখা গেল প্লেটের ওপরে প্রতিপ্রভ বস্তুটির ছায়াচিত্র (silhouette) উঠে গিয়েছে। বেকারেল নিশ্চিন্ত হলেন। রবিরশ্মি যে-আবরণ ভেদ করে যেতে পারেনা, সে-আবরণ আর ভেদ করবে কে—ঐ, রঞ্জেন-রশ্মি ছাড়া? তিনি ধরে নিলেন, প্রতিপ্রভ বস্তুর অন্তঃপুর থেকে রঞ্জেন-রশ্মির ঘুম ভাঙল বুঝি।

কিন্তু ভুল ভাঙল তার নিজেরই। এই নিয়ে তিনি কয়েকদিন যাবৎ নানাভাবে আরও সব ছবি তুলে তাঁর পরীক্ষার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন আকাশে উঠল মেঘ। ইউরেনিয়াম-লবণ ঝিমিয়ে গেল, তার প্রভা ক্ষীণ হয়ে রইল। পরীক্ষা ঠিক হবেনা ভেবে বেকারেল ঐ কাগজে-মোড়া প্লেটটিকে নিয়ে দেরাজে তুলে রাখলেন। লবণের দানাটি কাল কাগজের ওপরই একইভাবে পড়ে রইল। কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। তারপর একদিন দেখা গেল আকাশ নির্মেঘ। বেকারেল ভাবলেন, আজ সেই পরীক্ষাটি করে দেখলে হয়না? কিন্তু এতদিন প্লেটটি ওভাবে পড়ে রয়েছে, নষ্ট হয়ে যায়নি ত? কি মনে হল, প্লেটটি নিয়ে তিনি ডেভালাপ করলেন। কিন্তু একি!! অন্ধকারের মধ্যে থেকেও ইউরেনিয়াম-লবণ ফটো-প্লেটের ওপর তার স্বাক্ষর রেখে দিয়েছে। এ যে সত্যিই ঐ লবণটির প্রতিচ্ছবি! কিন্তু সূর্যালোকে প্রতিপ্রভা জাগিয়ে যে ছবি তোলা হয়েছিল, আঁধারের শিল্প যে তার চাইতেও নিপুণ, আর নিখুঁত! কার এ 'নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে'? তাহলে কি ছবি তোলার ব্যাপারে প্রতিপ্রভা-জনিত রশ্মির কোনো হাত নেই! তাহলে কোন্ রশ্মির নিপুণ কোন্ হস্ত গোপনে এসে এমন নিখুঁত ছবি এঁকে দিয়ে গেল!

ক্লান্ত বিজ্ঞানীর ভ্রান্ত পথেও এসে আলো জ্বালিয়ে গেল কে? কোন্ মমতাময়ীর আলো সে? বেকারেল আরও কয়েকজনের সঙ্গে একত্রে পরীক্ষা চালাতে লাগলেন।

সে সব পরীক্ষাতে ইউরেনিয়াম-লবণ এবং ফটোগ্রাফের প্লেটের মধ্যে এমন সব বস্তু দিয়ে ব্যবধান রচনা করা হল যেগুলি সহজেই রশ্মি শোষণ করে নিতে পারে। প্রতি ক্ষেত্রে দেখা গেল, ঐ শোষক পদার্থেরই ছায়াছবি উঠে যাচ্ছে। বিজ্ঞানী ভাবলেন, যে-আলো বিকীর্ণ হয়ে আসছে, তা ঐ শোষক বস্তুটিতে পড়ে শোষিত হয়ে যাওয়ার ফলেই বোধকরি তারই ছবি উঠেছে কিন্তু কোনো সূত্রে কোনো বহিরাগত আলো ব্যতিরেকেই কি ইউরেনিয়াম-লবণ ওরকম আলো বিকিরণ করতে পারবে? আলো যার মধ্য দিয়ে ভেদ করে পৌঁছতে পারবেনা, বেকারেল এমন একটি বাক্স তৈরি করে তার মধ্যে, তলার উপর ফটোগ্রাফের প্লেটটিকে পেতে দিলেন। তারপর তার ওপর ইউরেনিয়াম-লবণের কতকগুলি দানা ছড়িয়ে রেখে দেখলেন তাদের প্রত্যেকটিরই ছায়াছবি উঠে গিয়েছে। আর একটি পরীক্ষায় লবণ-দানা আর প্লেটের মধ্যে একটি অ্যালুমিনিয়াম পদক স্থাপন করে দেখা গেল, পদকটিরই ছবি উঠেছে; দানাগুলি সেখানে কিছু অস্পষ্ট। এ ব্যাপারে ইউরেনিয়াম-লবণ ছাড়া বাইরের কোনো আলোর যে কোনো হাত নেই, সে সম্বন্ধে বেকারেল নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু প্রতিপ্রভ এবং প্রতিপ্রভ নয়, এমন সব বিভিন্ন ইউরেনিয়াম-যৌগিক নিয়ে দেখা গেল যে সর্বদাই তাদের ছবি উঠেছে। এখন একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এতে প্রতিপ্রভারও কোনো হাত নাই, যৌগিকগুলির অন্তর্গত ঐ ইউরেনিয়াম-ধাতুটিই বিকীর্ণ রশ্মির একমাত্র উৎস। কারণ, প্রত্যেকবারেই সে তার স্বাক্ষর রেখে গেল ঐ নিকষ কালো আঁধার রাজ্যে আলোকের দূত হয়ে। আর এই জন্যই তো দেখা যাচ্ছে ইউরেনিয়াম-লবণের চাইতে ইউরেনিয়াম-ধাতুর নিজের ছবিটিই হয়ে ওঠে আরও স্পষ্ট, আরও উজ্জ্বল। তাহলে কি ঐ গুরুভার ইউরেনিয়াম ধাতুটিরই অন্তঃপুরে লুকিয়ে থেকে কোনো গোপন আলো-পশারিণী নিত্য নিয়ত পাঠিয়ে চলেছে এমন রশ্মি-নির্ঝর! বেকারেলের ভুল ভেঙে গেল।

কালো কাগজ কিংবা সূক্ষ্ম ধাতব পর্দা ভেদ করে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতার কথা বিচার করলে, রঞ্জেন-রশ্মি আর এই আবিষ্কৃত চির পুরাতন রশ্মিধারাকে এক জাতীয় বলতে হয়। কিন্তু তবুও কী বিপুল তাদের পার্থক্য! নল-মধ্যস্থ যেকোনো গ্যাসকে ক্রমাগত পাতলা করতে করতে সাধারণ আবহ-চাপের দশ লক্ষ ভাগের চাইতেও কমিয়ে এনে তড়িদ্দ্বারের মারফতে সেখানে আমাদের সচরাচর ব্যবহৃত ১১০ ভোল্ট্ বিদ্যুতেরও শত শত গুণ পরিমিত বিদ্যুৎ পাঠিয়ে ঝলক সৃষ্টি করতে না পারলে এক্স্-রশ্মির দর্শন মিলবেনা। কিন্তু ঐ নূতন রশ্মি অবিরতভাবেই স্ফুরিত হয়ে চলেছে সাধারণভাবে পাওয়া একটি ধাতু, বা এমনকি, তার যে কোনো যৌগিক থেকে। কিন্তু একটি জায়গায় বেকারেল ওদের ধর্ম বা গুণের মধ্যে একটি মস্ত বড়

ঐক্য ধরে ফেলেছিলেন যে, ইউরেনিয়াম-রশ্মিও তার গমন পথের হাওয়াকে বিদ্যুৎ-পরিবাহী করে তুলে। আর সে রশ্মিমালা চৌম্বক ক্ষেত্রে এসে যে কেবল বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় তাই না, তারা বিদ্যুতের আধানও পরিবহণ করে চলে ; এবং চলে একই মুখে। তাদের বিক্ষেপ (পৃ. ১৮২-৮৩) দেখে সে আধানের ধর্মও সহজেই জানা হয়ে যায়।

জ্যোতির এই অফুরন্ত উৎসের কাহিনী চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। প্যারী নগরী সে সংবাদে আন্দোলিত। আগের বছর অর্থাৎ ১৮৮৫ খ্রী.-এ ওখানকার স্কুল অফ্ ফিজিক্স্ অ্যাণ্ড্ কেমিস্ট্রীতে গবেষণাগারের কর্মপরিচালক (Director of Laboratory Work) পিয়ের কুরি (Pierre Curie – 1859-1906) পদার্থবিদ্যার অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেছেন। তিনি তখন তাঁর নব-পরিণীতা পত্নী মেরি কুরিকে (Marie Sklodowska Curie – 1867-1934) সঙ্গে নিয়ে ওখানেই বাস আরম্ভ করেছেন। বিজ্ঞানসেবাই পতি-পত্নীর আরাধ্য বিষয় ও চরম আদর্শ। ফলে বেকারেলের আবিষ্কার তাঁদের উদ্দীপিত করে তুলল। উভয়েই চিন্তা করতে লাগলেন, কোন্ সে উৎস,—যেখান থেকে ধেয়ে আসে 'অকারণ অবারণ' অফুরন্ত আলো! মেরি তাঁর ডক্টর উপাধির থিসিস্ প্রস্তুতির কাজ ছেড়ে দিয়ে এই দিকে ঝুঁকে পড়লেন। বিষয়ের অভিনবত্ব তাঁদের যেন পাগল করে তুলল।

কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে এমন একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার জায়গা? পিয়েক কুরি যদিও ইতিপূর্বে স্কুলে বসেই স্ত্রীকে নিয়ে কাজ করবার অনুমতি লাভ করেছিলেন, এবং যদিও তাঁরা ওখানেই তাঁদের কাজ চালাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁরা তো ভাল করেই জানেন, কী অসুবিধের মধ্যেই না তাঁদের কাজ চালিয়ে যেতে হচ্ছে। ১৮৮৩ থেকেই পিয়ের কুরি ওখানে কাজ করছেন। কিন্তু তাঁর নিজের কাজ চালাবার জন্যে না ছিল কোনো গবেষণাগার, না ছিল নিজের অধীনে কোনো একখানি ঘর। অর্থ তো ছিলই না। কয়েক বছর কাজ করার পর তবে তাঁর কাজের জন্য কর্তৃপক্ষ যৎসামান্য বাৎসরিক সাহায্যের বরাদ্দ করেছিলেন। ঐ সময় পর্যন্ত তাঁর কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ হত স্কুলের গবেষণা তহবিলের স্বল্পপরিমিত অর্থ থেকে বহু কষ্টে কিছু বাঁচিয়ে। আর গবেষণার কাজ চালাতে হত হয় ছাত্রদের কোনো ঘরে, না হয় সিঁড়ির সামনে বারান্দায়। কিন্তু এসব দেখে কুরি দম্পতী দমে গেলেননা। নিচের তলায় ভাঁড়ার ও যন্ত্র-বিপণির জন্য একটি কাচের ঘর ব্যবহৃত হচ্ছিল। পিয়ের কুরি সেই ঘরটি কোনো রকমে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চেয়ে নিলেন।

ইউরেনিয়াম-রশ্মি যে পরিমাণে বাতাসকে আয়নায়িত ক'রে বিদ্যুৎ-পরিবাহী ক'রে তুলতে পারে, তাতেই তার শক্তির পরিচয়। ইতিপূর্বে এক্স্-রশ্মির দ্বারাও যে কি

পরিমাণে এই আয়নায়ন চলে, সে সম্বন্ধে প্রধান তত্ত্বগুলি জানা হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং গবেষণার পথ মিলে গেল। ইউরেনিয়াম-রশ্মি দ্বারা আয়নায়িত বায়ুর মধ্য দিয়ে যে অত্যল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ অতিক্রম করান সম্ভব হয়, তা মাপার জন্য স্বামী পিয়ের এবং ভাশুর জ্যাক্‌স্ (**Jaques Curie**)-এর উদ্ভাবিত ও পরীক্ষিত পন্থা থেকে প্রভূত সাহায্যও পাওয়া গেল। একটি সূক্ষ্ম সংবেদনশীল ইলেক্ট্রোমিটার (বিদ্যুৎ-মাত্রা-মাপক) যন্ত্রে ঐ উপরোক্ত তড়িৎ মাপা হত। আসলে ঐ তড়িৎপরিমাণকে একটি পিয়েজো-ইলেকট্রিক কোয়াজ (**Piezo-electric quartz**) থেকে পাওয়া বিদ্যুৎপরিমাণের সঙ্গে সমতা বা সাম্য সম্পন্ন (**counterbalance**) করে দেখাই হল ঐ পদ্ধতির মূল নীতি। সুতরাং একটি কুরি-ইলেক্ট্রোমিটার, একটি পিয়েজো-ইলেকট্রিক কোয়াজ, আর একটি আয়নায়ন-প্রকোষ্ঠ, এগুলি সবই সেই ছোট্ট স্যাঁৎসেঁতে ঘরখানির ভিড় ঠেলে কোনো রকম ক'রে যা হ'ক বসিয়ে দেওয়া হল। কাজ শুরু করে দিলেন মহীয়সী মহিলা।

মেরির প্রাথমিক কাজের ফল হল চমৎকার। তিনি দেখলেন যে, তেজক্ষরণ ব্যাপারে ইউরেনিয়াম-লবণের যে-পরিমাণ কাজ দেখা যায়, তা সর্বদাই ঐ লবণের অন্তর্গত ইউরেনিয়াম-পরিমাণের সঙ্গে সামঞ্জস্য বা অনুপাত রক্ষা করে চলে। আর কোনো কিছুর সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নাই। কিংবা রাসায়নিক বিক্রিয়া বা আলো তাপ প্রভৃতি কোনো বহিঃশক্তির উপরও তা নির্ভরশীল নয়। সুতরাং প্রমাণিত হল, ইউরেনিয়ামের ঐ যে তেজ-ক্ষরণ প্রকৃতি, তা তার পারমাণবিক প্রকৃতিই। কিন্তু এর পর বিজ্ঞানীর কাজ শুরু হল অন্য পথে। পতি-পত্নী ভাবলেন, পৃথিবীতে এই ইউরেনিয়ামই কি একমাত্র উপাদান, যা অযাচিতভাবেই নিত্য নিয়ত তেজ বিলিয়ে চলে ? মেরি কুরি এই তেজ-ক্ষরণ প্রক্রিয়ার নামকরণ করেছিলেন—**radio-activity** বা তেজস্ক্রিয়তা (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'স্ফোরণ')। যে সব বস্তুর এ ক্ষমতা আছে, অর্থাৎ যারা **radio-active** বা তেজস্ক্রিয় তারা তেজস্ক্রিয় উপাদান বা **radio-element** নামেই পরিচিত হল।

গবেষণার দ্বিতীয় পর্যায়ে মেরি কুরি যেন সত্যিই ক্ষ্যাপার মত 'পরশ পাথর' খুঁজতে লেগে গেলেন। এ যাবৎ যত সব মৌলিক উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছিল তিনি তাদের সবগুলিকে নিয়েই একে একে পরখ করে দেখলেন। তাদের যৌগিকগুলিও সব পরীক্ষিত হল। পর্বতপ্রমাণ সে কর্মস্তূপ। কিন্তু তিনি সুদৃঢ় পদে এগিয়ে চললেন। তেজস্ক্রিয় রশ্মিকে সনাক্ত করবার জন্য তিনি অবশ্য ফটোগ্রাফিক প্লেটের ব্যবহার করেননি। তাঁর ঐ সনাক্তকরণ পদ্ধতি ছিল যথাসম্ভব সরল। তড়িদাধান-নির্দেশক একটি অত্যন্ত সরল ধরনের স্বর্ণপত্র-তড়িদ্বীক্ষণ যন্ত্রকে (পৃ. ৯৭) প্রথমেই তড়িদাধান

দিয়ে আহিত করে নিতে হয়। একটি ধাতব দণ্ডের একপ্রান্তে আলগাভাবে ঝোলান দুটি খুব পাতলা সোনার পাত থাকে। কোনো তড়িৎযুক্ত দ্রব্যকে একবার শুধু ঐ দণ্ডে ঠেকিয়ে দিতে হয়। তাহলে তখন স্বর্ণপত্র দুটি সমধর্মী আধানে আহিত হওয়ায় বিকর্ষণের ফলে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। ফলে পাত দুটির মুক্ত প্রান্তে ব্যবধান সৃষ্টি হয় এবং উপরের বদ্ধ প্রান্তে একটি কোণ তৈরি হয়ে যায়। সে কোণ বড় বা ছোট হয় ঐ পাত দুটির মধ্যবর্তী উৎপন্ন ব্যবধান অনুযায়ী, অর্থাৎ ঐ ধাতব দণ্ড বা মাপক যন্ত্রটি কি পরিমাণে তড়িদাহিত হয়েছে তার উপর নির্ভর ক'রে। দণ্ডে যতক্ষণ আধান থাকে, স্বর্ণপত্রদ্বয়ের ঐ ব্যবধানও ততক্ষণই বজায় থাকে,—অবশ্য যদি পত্রদ্বয়কে কোনো অপরিবাহী পদার্থ দিয়ে অন্তরিত করে রাখা যায়। বায়ু একটি ভাল অন্তরক বস্তু। অন্য কোনো ব্যবস্থা না করে দিলেও সংলগ্ন বায়ুই পত্রদ্বয়কে বেশ কিছুকাল যাবৎ অন্তরিত (ব্যবধানযুক্ত) করে রাখতে পারে। কিন্তু ইউরেনিয়াম বা তার কোনো যৌগকে যদি যন্ত্রের মধ্যে ঐ পাতগুলির কাছ বরাবর রাখা যায়, তাহলে তেজস্ক্রিয়-রশ্মি বিকিরণের ফলে বাতাস অতি দ্রুতই আয়নায়িত (অর্থাৎ পরিবাহী) হয়ে পড়ে। ফলে সে আর ঐ পত্রদ্বয়ের মাঝখানে থেকেও অন্তরকের কাজ নিষ্পন্ন করতে পারেনা। পত্রদ্বয়ের বিদ্যুৎ তখন সেই বাতাস দিয়েই পালিয়ে যায়। আর তখন ভারাবর্তন (মাধ্যাকর্ষণ-gravitation) বলে পত্রদ্বয়ের মুক্ত প্রান্তদ্বয় নিচের দিকে ঝুলে পড়ায় ওরা পরস্পরের কাছে এসে যায়। এভাবে স্বর্ণপত্রের ব্যবধান অচিরেই ঘুচে যায়। দু' তিন মিনিটের মধ্যেই ধরা যায়, যে-বস্তুটি কাছে এনে রাখা হয়েছে তার থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিকিরণ চলছে কিনা, অর্থাৎ বস্তুটি তেজস্ক্রিয় কিনা। এভাবে সকল রাসায়নিক উপাদান আর তাদের যৌগসমূহকে পরীক্ষা করে মেরি কুরি আরও একটি তেজস্ক্রিয় বস্তুর সন্ধান পেলেন। ইউরেনিয়াম-যৌগের মত থোরিয়াম-যৌগেরও যে তেজস্ক্রিয় শক্তি আছে কেবল তাই নয়, সে শক্তিও পারমাণবিক, আর ইউরেনিয়ামের সঙ্গে সমমাত্রা সম্পন্ন।

কেবল ধাতু বা তাদের যৌগিক নয়, বহুবিধ খনিজ দ্রব্য নিয়েও পরীক্ষা চলল। জানা গেল, তাদেরও কোনো কোনোটি তেজস্ক্রিয়। কিন্তু তারা সব ইউরেনিয়াম-থোরিয়াম সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু, কিন্তুরও কিন্তু আছে। জানা গেল যে ওদের বিকিরণ ক্ষমতা ইউরেরিয়াম থোরিয়ামের চাইতেও শত শত গুণ বেশি। এ কী করে সম্ভব হল! ইউরেনিয়াম থোরিয়ামের শক্তি-পরিমাণ সম্বন্ধে খুব ভাল করেই পরীক্ষা করে দেখা হল। না, ভুল হয়নি ত! তাহলে? তাহলে কোথা থেকে আসছে এই অফুরন্ত অপরিমিত তেজ! মেরি কুরি সিদ্ধান্ত করলেন, নিশ্চয়ই তা আসছে আরও কোনো অনাবিষ্কৃত মৌলিক উপাদান থেকে। যেসব উপাদান ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল,

সেগুলি সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত যে, সেগুলির পক্ষে এত শক্তিমান হওয়া তো দূরের কথা, ইউরেনিয়াম থোরিয়াম ছাড়া তাদের আর কোনোটি আদৌ তেজস্ক্রিয়ই নয়। আকুল আগ্রহে অস্থির হয়ে পড়লেন কুরি,—কি করে তাড়াতাড়ি কাজটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়! পিয়ের কুরি তাই এখন থেকে তাঁর সর্বক্ষণের সাধনাসঙ্গী হয়ে উঠলেন। দানা বা কেলাস (crystal) সম্পর্কে তাঁর নিজের পূর্বারব্ধ গবেষণার কাজ স্থগিত হয়ে পড়ে রইল।

ইউরেনিয়াম-খনিজ হিসাবে তাঁরা বিশুদ্ধ পিচব্লেণ্ড্‌কেই পছন্দ করে নিলেন। ওর তেজস্ক্রিয় ক্ষমতা ইউরেনিয়াম-অক্সাইডেরও চতুর্গুণ। প্রথমে ওঁরা ধরেই নিয়েছিলেন, পিচ্‌ব্লেণ্ড্‌ থেকে সেই নতুন বস্তুটি খুব কমই পাওয়া যাবে। বড় জোর একশ' ভাগে এক ভাগ। কিন্তু আশ্চর্য, একশ'তে যে দশ লক্ষ ভাগেরও এক ভাগ মেলেনা। তেজস্ক্রিয়া সম্পর্কে ওঁদের গবেষণা পদ্ধতিটি ছিল একেবারেই অভিনব। প্রথমে ওঁরা সাধারণ রাসায়নিক বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়ার মারফতে পিচ্‌ব্লেণ্ড্‌কে বিশ্লেষিত করে নিয়ে সেখান থেকে বস্তুসংঘগুলিকে পৃথক করে নিতেন। তারপর তাদের প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক ভাবে মেপে দেখতেন, কার তেজস্ক্রিয়তা কতটা। বিশ্লেষণ এগিয়ে চলতে থাকলে দেখা গেল যে কতকগুলি বস্তুসংঘ ক্রমে ক্রমে অধিকতর ভাবে তেজস্ক্রিয় গুণাবলীর জানান দিচ্ছে। সুতরাং বোঝা গেল যে, অনুসন্ধেয় মূল বস্তুটি ক্রমাগত বেশি করে ঘনীভূত হয়ে পড়েছে। ফলে ঐ রকম বিশ্লেষণের মারফতে ঐ বাঞ্ছিত মূল বস্তুটির রাসায়নিক গুণাবলীও ক্রমে ক্রমে জানা যেতে লাগল। এইভাবে এগিয়ে গিয়ে শেষে ওঁরা বুঝতে পারলেন যে, প্রধানত দুটি মাত্র অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের মধ্যেই তেজস্ক্রিয়-শক্তি যেন তার শেষ আশ্রয় স্থল খুঁজে নিয়েছে। পিচ্‌ব্লেণ্ডের মধ্যে অনাবিষ্কৃত দুটি উপাদানের সন্ধান মিলে গেল,—ওরা তেজস্ক্রিয়। আবিষ্কারক বিজ্ঞানী-দম্পতী দু'বছরের কঠোর সাধনার পর ১৮৯৮ খ্রী.-এর জুলাই মাসে মৌলিক বস্তু হিসাবে পোলোনিয়ামের অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করলেন। রেডিয়ামের অস্তিত্বের কথা বিঘোষিত হল ডিসেম্বর মাসে।

কিন্তু রসায়নবিদদের কাছে তাদের পৃথক সত্তাকে ধরে এনে না দেখাতে পারলে বিশ্বাস্য হবে কেন? অথচ খনিজ বস্তুর মধ্যে তাদের পরিমাণ এতই নগণ্য যে সে আশা দুরাশা মাত্র। ওঁরা জেনেছিলেন যে পিচ্‌ব্লেণ্ডের মধ্যে পোলোনিয়াম ধাতু বিসমাথের, এবং রেডিয়াম ধাতু বেরিয়াম ধাতুর সহগামী হয়ে বাস করে। কিভাবে যে ঐ দুটি বস্তুসংঘ থেকে ওদেরকে পৃথক করে ছেঁকে বার করতে হবে, তাও তাঁদের জানা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে বিপুল পরিমাণে ঐ ব্যয়বহুল খনিজ পিচ্‌ব্লেণ্ড্‌? অর্থ তো দূরের কথা, কাজ চালানোর একটি উপযুক্ত জায়গা নেই। কাজে সাহায্য করার

কোনো পরিচারকও যে নেই! পিচ্ব্লেণ্ডের প্রধান খনি বোহেমিয়ায়। ইউরেনিয়াম নিষ্কাশনের জন্য অষ্ট্রিয়া সরকার সেখানে কাজ চালাচ্ছিলেন। বিজ্ঞানী-দম্পতী ভাবলেন ওখানকার ঐ খনিজ পদার্থের যে-অবশিষ্টাংশ কাজে লাগান হচ্ছেনা, তা থেকেই রেডিয়াম এবং পোলোনিয়ামের অংশ বিশেষ অবশ্যই মিলে যাবে। ভিয়েনার অ্যাকাডেমি অফ্ সায়্যান্সের দৌলতে ওঁরা অল্প দামেই কয়েক টন অবশিষ্টাংশ পেয়ে গেলেন। প্রথমে নিজেদের পকেট থেকেই দাম দিতে হত। পরে অবশ্য কিছু সাহায্য মিলল। কিন্তু কাজের জায়গা নিয়ে দুর্ভোগের অন্ত ছিলনা। উঠোনের ওদিকের একটি পরিত্যক্ত ভাঁড়ার ঘরেই ওঁরা কাজ চালাতে বাধ্য হলেন। ঘরটি একটি কাঠের ছাউনি মাত্র। মেঝেটা তার খনিজ দাহ্য পদার্থ দিয়ে তৈরি। ছাতটা কাচের— ফাটা-ফুটো, জল পড়ে। ঘরের আসবাব বলতে একটি জীর্ণ টেবিল, ঢালাই (cast লোহার একটি দুর্ব্যবহার্য উনুন, একটি ব্ল্যাকবোর্ড। রাসায়নিক বিক্রিয়াজাত বিষাক্ত গ্যাস বেরিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো হুড্ নেই। সুতরাং ঐ সব বিষাক্ত পদার্থকে টেনে নিয়ে উঠোনে রাখতে হত। আবহাওয়া বিরূপ হলে কেবল জানালা খুলে রেখে ওগুলোর সেই বিষাক্ত পরিবেশের মধ্যেই কাজ চালাতে হত। কোনো রকমে কাজ-চালান-গোছের ঐ অস্থায়ী গবেষণা-গৃহেই প্রায় সহায়সম্বলহীন অবস্থায় দু' বছর কাজ চালিয়ে যেতে হল।

কাজ চলত রাসায়নিক বিক্রিয়ার, আর তেজস্ক্রিয়তার গবেষণার। ক্রমেই সক্রিয় পদার্থ অধিকতর ভাবে কাছে এসে যেতে লাগল। অথচ স্কুলের গবেষণাগারের পরিচারক, পিয়ের কুরির নিকট কৃতজ্ঞ, বিশ্বস্ত, অনুরক্ত ও দরদী কর্ম-সহায়ক পেতি (Petit) ছাড়া স্কুলের আর কোনো পরিচারকের কাছ থেকে তাঁরা কোনো সাহায্য পাননি। সুতরাং পুরো কাজটিকে ভাগ করে নেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ রইলনা। পিয়ের রইলেন রেডিয়ামের গুণাবলীর অনুসন্ধান করতে। আর তারও আগে মেরি রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে খাটি রেডিয়াম ধাতুটিকেই ছেনে ছেঁকে বার করে আনতে লাগলেন। এক একবার তাঁকে আধ মনেরও বেশি জিনিস নিয়ে কাজ করতে হত। তলানি আর তরলে ভরা বিপুলাকার পাত্রগুলিতে ছাউনি ভরে যেত। তাদের নাড়াচাড়া করা, তাদের মধ্যে তরল দ্রবণ পরিবর্তন করা আর ঢালাই লোহার কড়াতে একটি প্রকাণ্ড লৌহদণ্ড দিয়ে ঐসব ফুটন্ত মাল-মশলাগুলিকে একসঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নেড়ে যাওয়া যেন এক অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। মেরি প্রথমে খনিজ পদার্থ থেকে এভাবে রেডিয়ামযুক্ত বেরিয়াম নিষ্কাশিত করে বার করতেন এবং ওদের ঐ ক্লোরাইড্কে (ক্লোরিন সম্পর্কিত যৌগিক) আংশিক কেলাসে বা দানায় পরিণত করার চেষ্টা করা হত। যে অংশাবশেষের মধ্যে রেডিয়াম এসে জমা হত, তার দ্রবীভবন

প্রায় অসম্ভব হত। ফলে রেডিয়াম-ক্লোরাইড্ অংশটি পৃথক হয়ে পড়ে রইত। গবেষণাগারের ঐ অতিসূক্ষ্ম কাজগুলি করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ত। লোহা আর কয়লাগুঁড়ো থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। তবুও শেষ পর্যন্ত রেডিয়াম সংগৃহীত হল, কিন্তু পোলোনিয়াম নিষ্কাশন আরও কঠিন ব্যাপার ছিল। হেনরি বেকারেলের মত কয়েকজন বিজ্ঞানীকে তাঁরা কিছু রেডিয়াম লবণ ধার দিতেও সমর্থ হলেন।

প্রকৃতির প্রায়-অভেদ্য অন্তঃপুর থেকে বিজ্ঞানীরা ঐ রেডিয়াম ধাতুটিকেই ছিনিয়ে আনলেন। তখন তাঁদের সে কী উদ্দীপনা! স্বতই জ্বল জ্বল করে উঠল নতুন সামগ্রীটি। পিয়ের চাইতেন তাঁদের নবাবিষ্কৃত উপাদানটি শোভাময় হবে। কিন্তু যখন তা আবিষ্কৃত হল, তার প্রত্যাশাতীত জ্যোতির্ময় রূপ দেখে তিনি মোহিত হয়ে গেলেন। কত দিনের কত আশার ধন! মিলিত সাধনার অমৃত ফল! ছাত্রদের সাথে অতি সাধারণ সামান্য একটু ভোজ্য দ্রব্য গ্রহণ করে তাঁদের কত শত দিন কেটে গেছে। অতি দীন পুরানো জীর্ণ ছাউনিটার প্রশান্ত গাম্ভীর্যের মধ্যে ক্ষিপ্র পদচালনায়, আগ্রহ উদ্দীপ্ত বাক্-বিনিময়ে কত সন্ধ্যা গভীর নিশীথে গিয়ে মিলিয়ে গেছে। উনুনের পাশে হয়ত এক কাপ চা খেয়েই শ্রান্ত ক্লান্ত শরীরকে চাঙ্গা করে তুলতে হয়েছে। একটুও বাড়িয়ে বলা নয়, মেরি কুরি নিজেই এসব কথা বলে গিয়েছেন। জীবনটা যেন তখন তাদের কাছে ছিল স্বপ্নের।

স্বপ্ন সার্থক হল বিজ্ঞানীর। সে স্বপ্ন তাঁরা নিজেরাই রচনা করেছিলেন, সার্থকও করেছিলেন নিজেরাই। কিন্তু দেখেছি, তার আগেই আর এক বিজ্ঞানীর কাছে প্রকৃতির সংকেত এসে গিয়েছিল। নাহ'লে রঞ্জেন-রশ্মি সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রতিপ্রভ বস্তু হিসেবে তিনি কেনই বা বেছে নেবেন ঐ ইউরেনিয়াম-লবণটি? কেনই বা তাঁর কর্মনির্বাহের এক বিশেষ ক্ষণে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠবে, আর তিনি তাঁর কাজ স্থগিত রেখে কালো কাগজে মোড়া ফটোগ্রাফের প্লেটটিকে দেরাজে তুলে রাখবার সময় লবণের দানাটিকেও ঐ কাগজের ওপর ফেলে রেখে দেরাজের অন্ধকারে তাদের একত্রে বন্দী করে রাখবেন? কিংবা কয়েক সপ্তাহ পরে যখন তিনি এক মেঘমুক্ত দিবসে আবার তাঁর সেই পূর্ব-পরীক্ষাটি করে দেখতে চাইলেন, তখন ঐ প্লেটটির উপযুক্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগায় কেনই বা তিনি ওটিকে বাতিল না করে উলটপালট করে দেখলেন? এতগুলি 'কেন'র সদুত্তর পাওয়া শক্ত। এগুলি নিশ্চয় তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার রূপ বিশেষ কার্যটির কারণ। কিন্তু ঐ কারণগুলির কারণ যে বিজ্ঞানীর মস্তিষ্ক নয়, তা বলা হয়ত অসংগত হবেনা। আবার ঐ কারণটিই যতই প্রাকৃতিক হক না কেন, মানুষের মত সে প্রকৃতি যে সচেতন নয় তাও হয়ত বলা যেতে পারে। সুতরাং সেই প্রকৃতির মানুষী-চেতনা না থাকতেও পারে। কিন্তু সত্য হোক,

মিথ্যা হোক, যে তত্ত্বের প্রভাবে এতগুলি ঘটনা একসঙ্গে ঘটে গেল, তাকে যা বিশ্বচেতনা বলতে বেধে থাকে, তহলেও একথা বলা চলে যে কুরি-দম্পতী তাঁদের মানবিক বুদ্ধি নিষ্ঠা আর শ্রম দিয়ে যে কাজ করে গেলেন, বেকারেলের কর্মপদ্ধতির অন্তর্গত ঐ আকস্মিক ঘটনাগুলিই কিন্তু তার প্রধান সূত্র বা প্রাথমিক সংকেত। শুধু তাই নয়, তাঁদের ঐ কাজ সেই আকস্মিক বা প্রাকৃতিক সংকেতেরই সুমহান মানবিক পরিণতি। সে পরিণতি নিশ্চয়ই মানবমস্তিক প্রসূত, কিন্তু তার সূচনা নিশ্চয় প্রকৃতি-দ্যোতিত (আভাষিত)। বিজ্ঞানসাধনার ইতিহাসে যুগ যুগ ধরে আমরা ঐ সংকেত, আর সম্পাদনার মধ্য দিয়ে যে মহান প্রগতি সন্দর্শন করতে পারি, তা প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে কাজের ঐ ভাগ বাঁটোয়ারা এবং অনিবার্য যোগাযোগ দে একথা আর কিছুতেই অস্বীকার করা চলেনা যে, ওদের মধ্যে কোথাও একটি নিবি সম্বন্ধসূত্র আছে। সে সম্বন্ধ জড়ত্বের দিক থেকে হতে পারে, বা চেতনার দিক থেকে বা উভয়েরই দিক থেকে। কিংবা হয়ত তা অন্য কোনো অজ্ঞাত দিক থেকেও হ পারে। আবার এও তো দেখেছি যে প্রকৃতির রাজ্য বস্তুত সংকেতেরই রাজ্য। কি তৎসত্ত্বেও মানুষের কর্মসাধনার কোনো বিশেষ পর্যায়ে যখন সে যোগ্য হয়ে ওঠে, একমা তখনই তার সাধনাসূত্র হিসাবে ঐ সংকেত তার কাছে প্রত্যক্ষীভূত হয়। সুতর ওদের সম্বন্ধটি কেবল নিবিড় নয়, ওটি নাড়ীরই যোগ। আর নিশ্চয় ওটি বিশ্বজনী তা' না হলে, কেনই বা কুরি-দম্পতীর মত পদার্থবিদ্‌কে তাঁদের পদার্থচর্চার বিশু ক্ষেত্র থেকে সরে এসে রসায়নতত্ত্বের সরোবরে এমনভাবে অবগাহন সেরে নিতে হ এবং ভ্যান্ট্ হফ্ বা আর্হেনিয়াসের মত রসায়নবিদ্‌কেও বা কেন তাঁদের তত্ত্বকে পূর্ণ দান করার জন্য ফেফার-ডি ভ্রিসের মত উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের ওপর নির্ভ করে থাকতে হয় ?

এই জন্যই বোধকরি একদিন যখন বিজ্ঞানীর কাছে প্রকৃতির সংকেত এ পৌঁচেছিল আর তিনি এক্স্-রশ্মি আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তখন পদা বিজ্ঞানীর গবেষণা মন্দিরে চিকিৎসাবিজ্ঞানীর ভিড় জমে গিয়েছিল (পৃ. ১৭৩) আর এই জন্যই পদার্থ ও রসায়ন তত্ত্বের মিলিত প্রয়োগে যখন রেডিয়াম আবিষ্কৃত হ তখন ফরাসী দেশে রেডিয়াম-থেরাপি বা কুরি-থেরাপি নামে চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক নূতন শাখাও জন্মলাভ করল। রেডিয়াম-পদার্থের শারীরতাত্ত্বিক প্রভাব অনুধাব সাহায্য করার জন্য পদার্থবিজ্ঞানী পিয়ের কুরি স্বয়ং চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের সা মিলিত হয়েছিলেন। কিন্তু তৎপূর্বে তেজস্ক্রিয় রশ্মির ফলাফল সম্বন্ধে গিজেলে (**F. Giesel**) একটি ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছিল। পিয়ের কুরি সদ্য প্রকাশিত সে ঘোষণাকে যাচাই করতে গিয়ে স্বেচ্ছায় কয়েক ঘণ্টা যাবৎ তাঁর নিজের বাহু

রেডিয়াম-ক্রিয়ার (রেডিয়াম-লেডের) প্রভাবে উপস্থাপিত রেখেছিলেন এবং তাতে তার হাতে পুড়ে যাওয়ার মত ক্ষত হয়ে গিয়েছিল। বেকারেলও একবার পিয়ের কুরির কাছ থেকে কিছু রেডিয়াম-লবণ নিয়েছিলেন। একটি কাচনলে ঐ লবণ নিয়ে তিনি সেটিকে তাঁর ফতুয়ার পকেটে রেখে ছাত্রদের কাছে কয়েক ঘণ্টা যাবৎ রেডিয়ামের গুণাবলী সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। কয়েকদিন পরে দেখা গেল যে, যে-জায়গাটিতে কাচনলটি ছিল, সেইখানটিতে তাঁর গায়ের চামড়ায় ঐ নলাকৃতির একটি লাল দাগ হয়ে গিয়েছে। কয়েকদিন পর সেখানে অসহ্য যন্ত্রণা হল। চামড়া কেটে গেল। ঘা হয়ে গেল। ছ'মাস লাগল তাঁর সেরে উঠতে। তিনি কুরি-দম্পতীর কাছে এসে স্বীকার করেছিলেন, রেডিয়ামকে তিনি ভালবাসলেও তার প্রতি তাঁর একটি বিদ্বেষও আছে। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানীদের এসব অভিজ্ঞতার ফলও হল অদ্ভুত। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা এগিয়ে এসে রেডিয়াম-রশ্মির শারীরতাত্ত্বিক গুণাবলী সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করে দিলেন। প্রথমে ইতর প্রাণীদেহে, তারপর মানুষের শরীরে তারা এর প্রভাব প্রত্যক্ষ করলেন। দেখা গেল যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুব সামান্য মাত্রার রেডিয়াম-রশ্মি জৈব ব্যবস্থার উপর সুন্দর ফল দেখিয়ে দেয়; তার প্রভাবে বিভিন্ন চর্মরোগ বেশ ভালভাবেই আরোগ্য হয়ে যায়। আবার এও দেখা গেল যে, জীবদেহের বিভিন্ন জাতীয় কোষের উপর তার প্রভাবের ফলও বিভিন্ন। যেসব কোষ যত তাড়াতাড়ি বংশবৃদ্ধি করে, রশ্মিপ্রভাবে তারা তত তাড়াতাড়িই খতম হয়ে যায়। ফলে সুস্থদেহের কোষ বা কলার উপরে প্রভাব বিস্তারের চাইতে ক্যান্সার বা মারাত্মক ধরনের টিউমার প্রভৃতি রোগে যেসব কোষের বৃদ্ধি খুব দ্রুত চলতে থাকে, তাদের উপর ওর প্রভাব আরও মারাত্মক হয়ে উঠে। সোনার কেসে কিছু রেডিয়াম ঘটিত দ্রব্য নিয়ে ক্যান্সার বা টিউমার অঞ্চলে সেটিকে স্থাপিত রাখলে স্বতই বিকিরণ চলতে থাকে, এবং পুরানো রোগ না হলে তা প্রায় নির্মূল হয়ে যায়।

স্বভাবতই ইউরেনিয়াম-রশ্মির মত রেডিয়াম-রশ্মিও চৌম্বক ক্ষেত্রে এসে পড়লে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, নিজেরা বিদ্যুৎ-আধান পরিবহণ করে, আর বাতাসকে আয়নায়িত ক'রে তাকেও বিদ্যুতের পরিবাহী করে তুলে। জানা হল যে, সূর্যরশ্মির মত তারাও প্রতিপ্রভ বস্তুর ঘুম ভাঙিয়ে তার প্রভাবকে জাগিয়ে তুলতে পারে। অতি নগণ্য আণুবীক্ষণিক (অণুবীক্ষণ যন্ত্র না হলে দেখা যায়না এমন) পরিমাণের রেডিয়ামও জিঙ্ক্-সালফাইড বা প্ল্যাটিনো-সায়ানাইড প্রভৃতির মত বস্তুর পর্দার ওপরে এসে পড়লে অন্ধকারের মধ্যেও সেগুলি জ্বল্ জ্বল্ করে উঠে। এমনকি, জিঙ্ক্-সালফাইডের সঙ্গে অতি নগণ্য পরিমাণ রেডিয়াম মিশিয়েই তার প্রলেপ দিয়ে ঘড়ির কাঁটা বা

অন্যান্য যন্ত্রের বিভিন্ন নির্দেশক-সূচিগুলিকে বেশ স্থায়ী-ভাবেই উজ্জ্বল করে তোল চলে। তার ফলে রাত্রির আঁধারেও ঐসব অতিপ্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির উপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হয়ে উঠে। জীবনযাত্রাপদ্ধতির বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এসে এই তেজস্ক্রিয় রশ্মিমালা যেন মানবপ্রগতির পথে আলো তুলে ধরল। তার প্রভাবে বিস্ময় জেগে উঠল।

কিন্তু যাত্রাপথের সুগমতা জনিত আনন্দভোগের শুভক্ষণে কেন এ বিস্ময় এর ঠিক ঠিক জবাব দিতে গেলে জেনে নিতে হয়, এ বিস্ময় কার? এ কি ভোগসর্বস্ব মানুষের বিস্ময়, অপ্রত্যাশিত শিকার নাগালে এসে গেলে হিংস্র শ্বাপদের মত যে-মানুষ বিস্মিত-লোলুপ হয়ে উঠে? না, একি যুক্তিসমৃদ্ধ মহামানবের বিস্ময়, জগদ্ধিতায় অকুণ্ঠ ত্যাগের উদ্দেশ্যে বিপুলপ্রাপ্তি জনিত যাঁর চিত্তচমৎকৃতি? বস্তুত, বিস্ময় এই জন্য যে, নগণ্য পরিমাণ ঐ রেডিয়াম-কণা কেমনভাবে ঐ জিঙ্ক্-সালফাইডের পর্দাকে দীর্ঘকাল যাবৎ এমন উজ্জ্বল করে রাখে? রশ্মি বা তেজই যদি প্রতিপ্রভা সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে, তাহলে ঐ অনুপরিমাণ রেডিয়াম-কণা থেকে এত তেজ আসে কি করে? এ প্রশ্ন তাই ভোগী মানুষের নয়, এ প্রশ্ন সত্যপ্রাপ্তি আর সত্য-বিতরণের জন্য ত্যাগী বিজ্ঞানীর। বিস্ময় তাঁর এই জন্যে যে, আগেকার নিশ্চিত বৈজ্ঞানিক প্রমাণানুযায়ী তো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে—বিশ্বের মোট তেজ-পরিমাণ সুনির্দিষ্ট, এবং তেজকে ধ্বংস বা সৃষ্টি করা চলেনা, সে কেবল এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হতে পারে মাত্র। তাহলে ঐটুকু রেডিয়াম-কণা এমন বিপুল তেজের উৎস হতে পারে কেমন করে? সে যে প্রায় সমান উদ্যমেই অবিরাম গতিতে তেজ বিকিরণ করে চলে, তার প্রমাণ তো পিয়ের কুরিই দিয়ে দিয়েছেন। তিনি দেখতে পান যে, রেডিয়াম ঘটিত বস্তু পরিবেশস্থ অন্য সব বস্তুর চাইতে সর্বদাই অধিকতর উত্তপ্ত হয়ে উঠে। এই থেকে এর তেজ পরিমাপ করবার পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এসে যায়। তাপ-পরিমাণ মাপার জন্য ওপর নিচ সমান বেড়ের গ্লাসের মত যে তামার পাত্র বা ক্যালরিমিটার ব্যবহার করা হয়, তিনি সেই রকম একটি ক্যালরিমিটার নিয়েছিলেন। কেবল তার দেয়ালটি যথেষ্ট পুরু, যাতে করে তার মধ্যে বরফ আর রেডিয়াম-ঘটিত পদার্থটি রেখে দিলে সমস্ত তেজস্ক্রিয় রশ্মিই বরফ আর পাত্রগাত্রের মধ্যেই শোষিত হয়ে যায়, এতটুকুও বাইরে বেরিয়ে আসতে না পাবে। তেজ থেকে উপজাত তাপের প্রভাবে কত সময়ের মধ্যে কী পরিমাণ ওজনের বরফ গলে জল হয়ে গেল, তা দেখেই বিকীর্ণ তাপ বা তেজের পরিমাণটিও জানা গেল। সাধারণভাবে এক গ্রাম জলের এক ডিগ্রি উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য যে তাপ লাগে তাকে এক ক্যালরি পরিমাণ তাপ বলে ধরা হয়। এর সঙ্গে তুলনা করেই প্রতি সেকেণ্ডে নির্দিষ্ট পরিমাণ রেডিয়াম থেকে তেজোদ্ভূত তাপের পরিমাণটিও জানা হয়ে গেল।

পিয়ের কুরি হিসেব কষে দেখলেন যে, এক গ্রাম রেডিয়াম ঘণ্টায় ১৪০ ক্যালরি তাপ ছাড়তে পারে। তাতে এক গ্লাস জলকে ফুটিয়ে তুলতে ৬ দিন লেগে যাওয়ারই কথা। কিন্তু ঐ তাপ বিকিরণের হার যত সামান্যই হোক না কেন, যখন বিচার করা যায় যে হাজার হাজার বছর যাবৎ ঐ তাপ অবিরতভাবেই বিকীর্ণ হয়ে চলেছে, তখন তার মোট পরিমাণটি আশাতীতভাবেই বিপুল হয়ে ওঠে। এত বিপুল তাপ আসে কোন্ উৎস থেকে? এ যে অফুরন্ত তেজ! অথচ তেজ-পরিমাণ তো সুনির্দিষ্ট, তার ক্ষয় বা সৃষ্টি নাই। মনে আছে, বিজ্ঞানীকে খুঁজে বার করতে হবে ভর আর তেজ—এ দুটি গুণসত্তার মধ্যে কোনও গোপন সম্পর্ক আছে কিনা। কিন্তু ওখানে যে দেখা যায় তেজটিও অফুরন্ত, অথচ ভরটিও অক্ষয়!

বিজ্ঞানীরা ভাবলেন ঐ অভাবনীয় অদৃষ্টপূর্ব ঘটনার কারণ যদি খুঁজে বার করতে না পারা যায়, তাহলে এমন ঘটনা কি সৃষ্টি করা যায়না, তেজস্ক্রিয়তার উপর যার নিশ্চিত প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যাবে? তাহলেই তো উল্টো পথে সেই সূত্র ধরেই রহস্যভেদ সম্ভব হতে পারবে? ওঁরা এক যোগে উঠে পড়ে সেই পন্থাই অনুসরণ করতে লেগে গেলেন। "বৈদ্যুতিক চুল্লিতে গলান হল ইউরেনিয়ামকে, শূন্যের নিচে ১৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ঠাণ্ডায় এনে দেখা গেল, দ্রবণ থেকে অধঃক্ষেপ করা হল, ক্লোরিনের সঙ্গে জুড়ে পরিণত করা হল গ্যাসে, জোরালো বিদ্যুৎক্ষেত্রের মধ্যে রাখা হল; শক্তিশালী চুম্বকের দুই মেরুর মাঝখানে রেখে লক্ষ্য করা গেল, প্রচণ্ড চাপ দিয়ে দেখা হল, তারপর হাল ছেড়ে দেওয়া হল। অর্থাৎ মেরে ধরে বুঝিয়ে সুজিয়ে, আদর করে দুয়ো দিয়ে কিছুতেই কিছুনা। ইউরেনিয়ামের কোন বিকার নেই। এত বিপদ আপদেও তার একটুকু নড়চড় নেই। সমানে সেই একই রশ্মি নির্গত হচ্ছে তা থেকে।"

তবে কুরি-দম্পতী দেখেছিলেন যে, বিকিরণ বন্ধ হয়না বটে, কিন্তু চৌম্বক ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে পাঠালে বিকীর্ণ তেজরশ্মি নিজেরাই পরিবর্তিত হয়ে দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় (দ্র., পৃ. ২০০)। কতকগুলি রশ্মি চৌম্বক ক্ষেত্র ভেদ করে ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়, ঐ ক্ষেত্র মধ্যে ঢুকবার আগে যেমন চলছিল তেমনই। আর কতকগুলি চৌম্বক ক্ষেত্রে পৌঁছে তাদের পথ পরিবর্তন করে বেঁকে গিয়ে অন্য পথ ধরে। সুতরাং বোঝা গেল ওরা ইলেক্ট্রনের মত বিদ্যুদ্বাহী কণিকা। সত্যিই দেখা গেল, ওরাও ঋণ-বিদ্যুৎযুক্ত বটে। আর ওদের e/m-ও (পৃ. ১৮২-১৮৪) ইলেক্ট্রনের e/m-এর তুল্য। সুতরাং তেজস্ক্রিয়-রশ্মির অংশবিশেষ যে ইলেক্ট্রন-কণিকামালা, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রইলনা। কেবল পার্থক্য এই যে, ক্ষিপ্রতম ক্যাথোড্ রশ্মির গতিবেগ যেখানে ১৫০০০০ (১½ লক্ষ) কিলোমিটারের বেশি নয়, সেখানে ওদের কারও কারও গতি প্রায় আলোকের গতির সমান, অর্থাৎ সেকেণ্ডে প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার বা ১৮৬০০০ মাইল।

তেজস্ক্রিয়-রশ্মির ঐ মিশ্র-চরিত্রের প্রমাণ অন্য দিক থেকেও পাওয়া গেল। প্রমাণ হল যে ওদের গমনপথে ভিন্ন ভিন্ন বেধযুক্ত বস্তু এনে রাখলে প্রথমের দিকে রশ্মি-মালার অনেকটাই ঐ বস্তুতে শোষিত বা অঙ্গীভূত হয়ে যায়। কিন্তু ক্রমেই এ ব্যাপার কমে আসে। কিছু অংশ বেশ কিছুটা বেধ-বাধা অতিক্রম করে বেরিয়ে যায়। তাদের শোষণ হয় অনেক কম। স্বভাবতই প্রথম দিকের বহুশোষিত রশ্মির একই প্রকৃতি, ওরাই ইলেক্ট্রন; তিন মিলিমিটার বেধযুক্ত অ্যালুমিনিয়ামের পাত ভেদকালে ওরা সবই শোষিত হয়ে পড়ে। আর অল্পশোষিত রশ্মিমালা ভিন্ন প্রকৃতির। পরে কিন্তু নিউজিল্যাণ্ড থেকে আগত গবেষক ছাত্র ইংল্যাণ্ডবাসী পদার্থবিজ্ঞানী রাদারফোর্ড অত্যুচ্চ শক্তির চৌম্বক ক্ষেত্রে রশ্মি পাঠিয়ে দেখলেন যে, কুরি-দম্পতীর পরীক্ষায় যে রশ্মির বিক্ষেপ ধরা পড়েনি, ঐ দ্বিতীয় জাতের সেই রশ্মি মালাও দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়; অন্যাংশ পূর্ববৎ একই অভিমুখে এগিয়ে চলে।
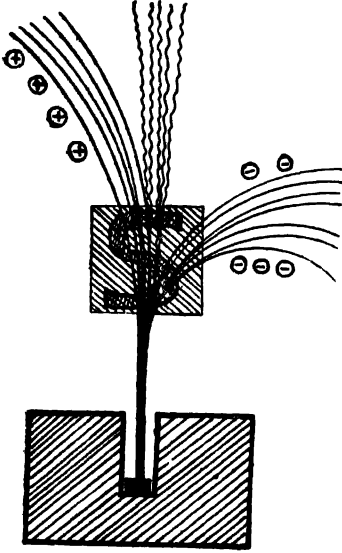
এই শেষোক্ত রশ্মির গতিবেগ আলোর গতিবেগের সমানই। বস্তুত এরা সাধারণ আলোকরশ্মির মতই, কিন্তু এদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য আরও অনেক কম বলে এদের ভেদ-শক্তি অত্যন্ত বেশি এবং সেই কারণেই ইলেক্ট্রনের তুলনায় এরা শোষিত হয় অত্যন্ত কম। এক ফুট পুরু লোহাকেও এরা ভেদ করে বেরিয়ে যায়। আর যেসব রশ্মি ইলেক্ট্রনের মত দিক পরিবর্তন করে, তারা কিন্তু বিক্ষিপ্ত ইলেক্ট্রন-ধারার অভিমুখের বিপরীত পথ ধরে। সুতরাং চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব যখন ওদের ওপর বর্তাচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই ওরাও বিদ্যুৎ-বাহী। কিন্তু যখন ওরা ইলেক্ট্রনের গতিপথের বিপরীত পথ ধরে চলেছে, তখন নিশ্চয় ওদের বিদ্যুদাধান ধনাত্মক, তুলনায় ওদের গতিবেগ কম হলেও সেকেণ্ডে ২০০০০ (২০ হাজার) কিলোমিটার তো বটেই। ওরা কিন্তু অন্য বস্তুর মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করবার সময় সব চাইতেই বেশি করে শোষিত হয়ে পড়ে। ১/২০ মিলিমিটার পুরু অভ্র বা এ্যালুমিনিয়ামের চাদর, বা এমনকি সাধারণ কাগজ, বা ৭ সেন্টিমিটার বায়ুস্তর অতিক্রম কালেই রেডিয়ামের এই প্রকারের সমস্ত রশ্মিই শোষিত হয়ে শেষ হয়ে যায়। গ্রীক বর্ণমালার প্রথম বর্ণ দিয়ে ওদের নামকরণ

হল 'আল্‌ফা'-রশ্মি, আর দ্বিতীয় বর্ণ দিয়ে ইলেক্ট্রন-ধারার নামকরণ হল 'বিটা'-রশ্মি। অবিক্ষিপ্ত রশ্মিরাজি তৃতীয় বর্ণ 'গামা'র নামেই নামাঙ্কিত হয়ে রইল।

একটি জিনিস দেখা গেল যে চৌম্বক ক্ষেত্রে বিক্ষেপের পর মোড় ঘুরে চলবার সময় বিটা-রশ্মি যেমন বেশ প্রশস্ত পথ রচনা করে বিভক্ত হয়ে চলতে থাকে, আল্‌ফা-রশ্মির পথ ঠিক তেমনটি হয়না। ওরা সংকীর্ণ পথ ধরেই চলে। কারণটি আর কিছু নয়, ওদের প্রত্যেকে প্রায় সমান তেজীয়ান। তাই ওদের কেউই নিচে নামবেনা, বা অন্যকে ওপরে উঠতে দেবেনা। কিন্তু বিটা-রশ্মির ইলেক্ট্রনদের তেজ সকলকার এক নয়। যাদের তেজ বেশি তারা ওপরে ওপরে চলে, কম-তেজীরা (পৃথিবীর টানে) নিচের দিকে নেমে আসে। ফলে সামগ্রিকভাবে ওদের পথসজ্জা প্রশস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু আর একটি বড় পার্থক্য এই যে, বিটা বা গামা-রশ্মি তাদের পথ-পরিক্রমায় যেখানে একে একে পর পর শোষিত হতে থাকে, আলফারা সেখানে সকলেই একসঙ্গে পর পর তেজ হারিয়ে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করে সকলেই এক সঙ্গে নিঃশেষিত হয়ে পড়ে। এর ফলও ফলে অদ্ভুতভাবে—বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঐ অতিক্রান্ত দূরত্ব মেপেই আল্‌ফা-কণিকারাজির তেজমাত্রার হিসেব পাওয়া যায়।

বাতাস বা কোনো গ্যাসকে আয়নায়িত করার ব্যাপারে গামা-রশ্মির ক্ষমতা অবশ্য সব চাইতে কম। বিটার তার চাইতে বেশি। কিন্তু একই উৎস থেকে বহির্গত আল্‌ফার শক্তি বিটার প্রায় শতগুণ। লক্ষণীয় যে, আয়নায়ন ক্ষমতা যার যত বেশি, সে-ই তত বেশি শোষিত হয়ে পড়ে। দুটি গুণের মধ্যে যোগটি নিবিড়। কারণ, আয়নায়নের জন্য তেজ লাগে, এবং খুব বেশি আয়ন সৃষ্টি করে বলেই আলফা-রশ্মি থেকে অচিরেই প্রচুর পরিমাণে তেজ ব্যয়িত হয়ে যাওয়ায় তারা অন্য বস্তুর দ্বারা খুব দ্রুতই শোষিত হয়ে পড়ে। একটি মাত্র আল্‌ফা-কণিকা বায়ুর মধ্যে প্রায় দু লক্ষ আয়ন-জোড় সৃষ্টি করতে পারে। এ থেকেই তার শক্তির পরিমাপ সহজেই পাওয়া যায়। পরিমাণটি হয়ে উঠে প্রায় ৬×১০^{৬} (৬০ লক্ষ) ইলেক্ট্রন-ভোল্ট্ [এক ভোল্ট্ বিভব-পার্থক্য অতিক্রম করতে হলে একটি ইলেক্ট্রন যে-পরিমাণ তেজ অর্জন করে তাকেই এক ইলেক্ট্রন-ভোল্ট বলে। ১ই. ভো.= ১·৬×১০$^{-৯}$ জুল বা ১·৬×১০$^{-২}$ আর্গ্। যে বল (force) প্রয়োগের ফলে ১ গ্রাম ভরবিশিষ্ট বস্তু প্রতি সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে ১ সেন্টিমিটার করে পর পর বেড়ে যাওয়া বেগ উৎপন্ন করতে পারে, তাকে ১ ডাইন বলা হয়। এবং এই ১ ডাইন বল প্রয়োগে বলের প্রয়োগ-বিন্দু বলের অভিমুখে ১ সে. মি. সরে গেলে যে কার্য হয় তাকেই ১ আর্গ্ বলা হয়।] অর্থাৎ এ শক্তি অর্জন করতে হলে একটি ইলেক্ট্রনকে ষাট লক্ষ ভোল্টের বিভব পার্থক্যযুক্ত বিদ্যুৎক্ষেত্র অতিক্রম করতে হবে। আয়নায়ন মারফতে এই তেজ প্রয়োগের কারণেই জৈব প্রক্রিয়ার উপরেও আল্‌ফা-কণিকাগুলির প্রভাব দেখা যায় সর্বাধিক,

তারপরে বিটার, এবং শেষে গামা-রশ্মির। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তেজষ্ক্রিয় পদার্থকে সামান্য একটু আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখলেই আল্‌ফা-কণিকাগুলি শোষিত হয়ে যায় বলে ওদের থেকে বিপদের সম্ভাবনাও খুব কম। সে তুলনায় বিটা থেকে বিপদের ভয় অধিকতর, গামা থেকে সেই ভয় সর্বাধিক। জৈব দেহে প্রবিষ্ট বিকিরণ-মাত্রা (radiation doze) কম হলে অবশ্য এসব রশ্মি থেকে ভয়ের বিশেষ কোনো কারণ থাকেনা। নরদেহে প্রবিষ্ট বিকিরণ-মাত্রা হপ্তায় গড়ে ১/৫ রঞ্জেন [যে পরিমাণ বিকিরণের ফলে সাধারণ অবস্থায় ১ ঘন সেন্টিমিটার বাতাসে ২০০০০০০০০০ (দু শ' কোটি) জোড়া আয়ন উৎপন্ন হতে পারে তাকে ১ রঞ্জেন-বিকিরণ বলা হয়।] করে হলেও মানুষ তার প্রভাবকে সহজেই সহ্য করে নিতে পারে। তবে অল্প সময়ের মধ্যে পাঁচ ছ'শ করে রঞ্জেন-বিকিরণ মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠে।

কিন্তু বিজ্ঞানীর সামনে যেন আচমকা এক নতুন জগতের আবির্ভাব ঘটল। হতবাক্ বিস্মিত বিমূঢ় হয়ে যেতে হয়। শত ঔৎসুক্য, শত জিজ্ঞাসা। এক প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে শত প্রশ্ন সমুদ্যত হয়ে উঠে। এক তেজষ্ক্রিয় রশ্মির উৎস খুঁজে পেতে না পেতে দেখা গেল সে আর এক নয়, সে ত্রিধারা। সুতরাং প্রশ্নটিও ত্রিধা বিভক্ত হয়ে গেল। সৌভাগ্যের কথা যে, তিন জনের এক জনকে আগেই জানা হয়ে গিয়েছিল। ওরা বিটা-রশ্মির ইলেকট্রন, ঋণ-বিদ্যুৎ কণিকা। বিদ্যুৎ আর ভর, দুটিই ওদের সত্তা-পরিচয়। বাকি দুজনের মধ্যে গামা-রশ্মি তো অনেকাংশেই সাধারণ আলোরশ্মিরই মত। অন্তত ওর তড়িৎ-পরিচয় কিছু মিলছেনা। কিন্তু ভাবগতিক দেখে বেশ স্পষ্টই মনে হচ্ছে, আল্‌ফা-কণিকাগুলি যেন ইলেক্ট্রনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েই সমুপস্থিত। ওদের কুল-পরিচয় সংগ্রহ করবার জন্য বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড্ বেরিয়ে পড়লেন।

টমসনের বিদ্যুচ্চৌম্বকীয় পদ্ধতি (পৃ. ১৮২-৮৩) প্রয়োগ করে রাদারফোর্ড আল্‌ফা-কণিকাকে দুটি জ্ঞাতশক্তির বিদ্যুৎ এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়েই পাঠিয়ে দিয়ে তাদের বিক্ষেপ লক্ষ্য করলেন। বিক্ষেপটি মাপা যায় কণিকার গতি এবং তার e/m (বা m/e) থেকে। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের e, এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের mu থেকে তুলনামূলক ভাবে বিক্ষেপ বিচার করে (পৃ. ১৮২-৮৪) রাদারফোর্ড্ বুঝতে পারলেন, আল্‌ফা-কণিকার সর্বাধিক গতিবেগ সেকেণ্ডে ১৯০০০ কিলোমিটার। এ বেগ প্রচণ্ড হলেও বিটার ইলেকট্রনের বেগ ওর চাইতে ১০ থেকে ১৫ গুণ বেশি। কিন্তু আল্‌ফার ভরটি ঐ ইলেক্ট্রনের চাইতে অনেক বেশি, প্রায় হাইড্রোজেন-পরমাণুরই সমান। হয়ত ওটি কোনো অজ্ঞাত পদার্থেরও আয়ন হতে পারে। আর যদি আল্‌ফার বিদ্যুৎ-আধানটি প্রাথমিক আধানের (elementary charge), অর্থাৎ একটি ইলেক্ট্রনের আধান-পরিমাণের তুল্য হয়ে

থাকে, তাহলে ওর ভরকে হাইড্রোজেন-পরমাণুর ভরের দ্বিগুণই বলতে হয়। কিন্তু ও রকম ভরের কোনো পরমাণুর কথা তো জানা যায়নি।

সুতরাং রাদারফোর্ড্ অন্য রকম অনুমান করলেন। ধরে নিলেন যে, আল্‌ফা-কণিকার আধান ইলেক্‌ট্রনের সমান নয় বেশি। সুতরাং ওর ভরও হাইড্রোজেন-পরমাণুর ভরের দ্বিগুণের চাইতেও বেশি। একটি ইলেক্‌ট্রনের বিদ্যুৎ-পরিমাণই যদি আধান-পরিমাপের একক হয়ে থাকে, তাহলে আল্‌ফার আধানকে দুই ধরলে তার ভর হয় তখন একটি হাইড্রোজেন-পরমাণুর চার গুণ। সে ক্ষেত্রে ওকে দু'বার আয়নায়িত (অর্থাৎ পরমাণু থেকে দু'বার দুটি ইলেক্‌ট্রন ছিনিয়ে নেওয়া) হিলিয়াম-পরমাণু বলা চলে। কিন্তু ওর আধানকে ছয় বা সাত এককের ধরলে ওর ভর হয় হাইড্রোজেন-পরমাণুর বার বা চৌদ্দ গুণ। সেক্ষেত্রে ধরতে হবে কারবন- বা নাইট্রোজেন-পরমাণু যথাক্রমে ছয় বা সাত বার আয়নায়িত হয়ে ওদের উদ্ভব ঘটিয়েছে। রাদার-ফোর্ড্ এবং সডি (Frederick Soddy--1877-?) প্রথম অনুমানটিকেই ঠিক বলে ধরে নিয়ে জানালেন যে, আল্‌ফা-কণিকা দুবার ইলেক্‌ট্রন-ছেড়া হিলিয়াম-পরমাণুই। অনুমানের সমর্থন হিসাবে তাঁরা দেখতে পেলেন যে, তেজস্ক্রিয় বস্তুর খনিমাত্রেই হিলিয়াম উপস্থিত। কোনো ব্যতিক্রম নাই। কিংবা, তেজস্ক্রিয় বস্তুর অনুপস্থিতিতে অন্য কোনো খনিতেও হিলিয়াম মেলেনা। সুতরাং হিলিয়াম দ্রব্যটি যতই ভাল মানুষ সেজে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকুক না কেন, একেবারে খাঁটি তেজস্ক্রিয় বস্তুর সঙ্গেই সে ভাব করে ঘুপ্‌টি মেরে আছে। খনির মধ্যে হিলিয়ামের অস্তিত্ব দেখলেই বুঝতে হবে সেখানে তেজস্ক্রিয় পদার্থ আত্মগোপন করে আছেই। কিন্তু রাদারফোর্ড এবং সডি বললেন যে, হিলিয়াম যে বাইরে থেকে এসে খনির মধ্যে ঢুকে পড়ে তা নয়, খনির অন্তর্গত তেজস্ক্রিয় বস্তুর পরমাণু-স্ফোরণ থেকেই দুই-ইলেক্‌ট্রন-বিহীন হিলিয়ামের উদ্ভব ঘটেছে।

কিন্তু এ যে আর এক বিস্ময়! এক পরমাণু থেকে আর এক পরমাণুর জন্ম? পরমাণুরা না মৌলিক উপাদান! আর এতদিন যে নিশ্চিতভাবেই জেনে আসা হয়েছে পরমাণু অবিনশ্বর, অপরিবর্তনীয়! অবশ্য ঐ অবিরত স্ফোরণ আর প্রজনন সত্ত্বেও যে ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, পোলোনিয়াম বা রেডিয়ামের এতটুকুও পরিবর্তন ঘটেছে, তাও মনে হচ্ছেনা। কিন্তু তাহলে তাদের অক্ষয় দেহ থেকে হিলিয়াম-দেহটি উঠে আসে কি করে? রহস্যের উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে বিজ্ঞানী আবার এক নতুন রহস্যের জাল সৃষ্টি করে তুললেন! কিন্তু বিজ্ঞানী তো কোনো হঠকারী দার্শনিক নন যে কেবল গলার জোরেই মানবমনোরাজ্যের নির্বিকার অধীশ্বর হয়ে বসে রইবেন। তাঁর দর্শনকে তাই প্রদর্শন করাতে হয়। অজ্ঞাতসত্তার দিকে আঙুল দেখিয়ে দিয়ে জনমানসকে যাহোক

কোনো একদিকে অভিমুখী বা অভিগামী করে দিয়ে তিনি সরে পড়তে পারেননা। যা আছে, যতই তা অনাকাঙ্ক্ষিত, বা এমন কি অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হোক না কেন, তিনি যদি তাকে সত্যই প্রত্যক্ষ করে থাকেন, তাহলে কেন তিনি তা প্রত্যক্ষ করিয়ে দিতে পারবেননা, কেবল চিরকাল ধরে মানুষের অযোগ্যতা বা দৃষ্টিক্ষীণতার দোহাই দেবেন? রাদারফোর্ড-সডি দায় এড়িয়ে গেলেননা। ওঁরা সত্যিকারের বিজ্ঞানী যে!

কিন্তু না। এ কেবল রাদারফোর্ড্ বা সডির কথা নয়। এ দায় কেবল একক বিজ্ঞানীর হতে পারেনা। এ দায় সত্যদ্রষ্টার, বিজ্ঞান-মানসের। তাই আমরা বহুবার লক্ষ্য করেছি, বিজ্ঞানমানসের একাংশে যে প্রশ্ন সমুত্থিত হয়, কেবল সেখান থেকেই যে তার উত্তর মেলে তাই না। হয়ত সে উত্তর এসে যায় তার অন্যাংশ থেকেও। এক বিজ্ঞানীর নিশীথ স্বপ্ন হয়ত আর এক বিজ্ঞানীর দিনমানকে সার্থক করে তোলে। একের মানসদর্শন হয়ত অন্যের নয়নেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে জগতের প্রত্যক্ষীভূত হয়ে যায়। প্রকৃতি থেকে যখন প্রশ্ন আসে, প্রকৃতি থেকে তার সমাধানও আসে। কেবল এই দুটি আসার মধ্যে একটি সার্বজনীন ভূমিকা থাকা চাই, কারণ প্রকৃতি যে সার্বজনীন! তাই সত্যজিজ্ঞাসুবৃন্দের মানসসত্তা যখন সার্বজনীন রূপ নেয়, তখন তার কাছে অসমাধেয় বলে কিছু থাকেনা। আপাতদৃষ্টিতে যে অসমাধেয় মনে হয় তার কারণ, ব্যাপকতর রহস্যকে ধরে ফেলবার জন্য ব্যাপকতর মানসসম্মেলনের অভাব। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, যতই বিজ্ঞানীবৃন্দের সাধনা সম্মিলিত রূপ গ্রহণ করছে, ততই প্রকৃতির বহুবিস্তৃত অঞ্চল থেকে সার্বজনীন বা ব্যাপকতর প্রশ্নগুলিরও সমাধান এসে পৌচছে! রাদারফোর্ড বা সডি যে দুর্ভেদ্য রহস্যের সামনে এসে পড়লেন, তার সমাধান এসে গেল একদল সমুৎসুক বিজ্ঞানীর কাছে। রাদারফোর্ড-সডি-র‍্যামজে (Sir William Ramsay—1852-1916)-রয়ড্স্ (Thomas D. Royds—1884-1955) তো একই বিজ্ঞানচেতনা।

উত্তরটা আচমকা আসেনি। ধীরে ধীরে উজ্জীবিত বিবর্তিত হয়ে এল। ১৮৯৮-'৯৯ সালেই থোরিয়াম-যৌগিক নিয়ে গবেষণা করতে করতে রাদারফোর্ড লক্ষ্য করছিলেন যে অক্সাইড-থোরিয়া অপ্রত্যাশিতভাবেই বাতাসের পরিবাহিতাকে বাড়িয়ে কমিয়ে দেয়। তিনি মনে করলেন, খুব অল্প পরিমাণে হলেও থোরিয়া তার নিজ দেহ থেকে এমন একপ্রকার বাস্তব পদার্থকে উৎক্ষিপ্ত করে দেয়, যে কিনা নিজেই এক তেজস্ক্রিয় পদার্থ, এবং বাতাসের প্রবাহে সেও পরিবাহিত হতে পারে। তিনি পদার্থটির নাম দিলেন, থোরিয়াম-ক্ষরণ। কিন্তু সত্যিই কি ওটি একটি পৃথক মৌলিক পদার্থ? থোরিয়ামের মতই?

এসব বিষয়ে গবেষণার পথ সুগম করে দিলেন কেম্ব্রিজের বিজ্ঞানী উইলসন। রঞ্জেন-রশ্মি প্রভাবিত গ্যাসের আয়নায়ন সম্বন্ধীয় আলোচনায় (পৃ. ১৭৭, ১৮৪) আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, ১৮৯৬ খ্রী. নাগাৎ উইলসন ধরতে পেরেছিলেন, জলীয় বাষ্প বা অন্য কোনো গ্যাস-বাষ্প বায়ুমধ্যে অতিসম্পৃক্ত (**super-saturated**—অর্থাৎ সাধারণ মিশ্রণ প্রক্রিয়ার দ্বারা একটি বস্তুর সর্ব অবয়বকে অন্য বস্তু দিয়ে সম্বন্ধযুক্ত বা আক্রান্ত বা ভরপূর বা সম্পৃক্ত করে তুলার পর প্রথম বস্তুর মধ্যে ঐ দ্বিতীয় বস্তুটিকে চাপ দিয়ে এবং শেষে উত্তাপ দিয়ে যতটা সম্ভব ঢুকিয়ে বা ধরিয়ে দিলে যে অবস্থা হয়, সেইরূপ) অবস্থায় থাকলে, সেই বাতাসে যদি যথেষ্ট ধূলিকণা থাকে তাহলে এক একটি ধূলি কণাকে কেন্দ্র করে বাষ্প-কণিকাগুলি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি জমে গিয়ে কুয়াশার সৃষ্টি করে। বাষ্প-সম্পৃক্ত বাতাসকে খুব শীতল অবস্থায় এনে অতিসম্পৃক্ত করে তুলা যায়। সেটি সম্ভব হয়, কোনো সিলিণ্ডার বা নলের চাপদণ্ডকে (পিস্টনকে) হঠাৎ
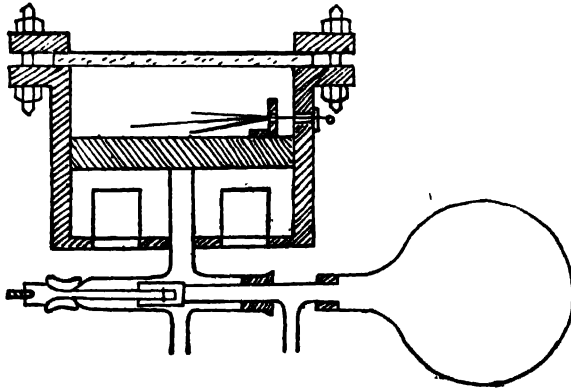
টেনে এনে তার ভিতরকার হাওয়ার আয়তনকে হঠাৎ অনেকটা বাড়িয়ে দিলে। পরে উইলসন এও লক্ষ্য করে দেখলেন যে ধূলি-কণার বদলে বিদ্যুৎ-আধানযুক্ত এক একটি আয়ন, বা যেকোনো আধান-কণিকার দ্বারাও এ কাজ চলে। সুতরাং সম্পূর্ণ ধূলিমুক্ত বাতাসকে জলীয় বাষ্পে সম্পৃক্ত অর্থাৎ পরিপূর্ণ করে তাকে আয়নায়িত করে তোলার পর যদি হঠাৎ তার আয়তন বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সেখানে মুহূর্তের মধ্যেই যে শৈত্য সৃষ্টি হবে, তাতেই এক একটি আয়নকে অবলম্বন করে এক একটি দৃশ্যমান কুয়াশা-কণিকারও সৃষ্টি হবে। সুতরাং যদি কোনোভাবে ঐ মেঘায়ন-কক্ষে (**cloud chamber**) নগণ্য পরিমাণ আল্‌ফা-কণিকা পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে তাদের অবলম্বন করে যে পৃথক পৃথক জলকণা জমে উঠবে, তাদের গুণে ফেলতে পারলেই আল্‌ফা-কণিকার সংখ্যাও পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয়, আল্‌ফা-

কণিকা তার যাত্রাপথের চতুর্দিকে যে আয়নমালা সৃষ্টি করে চলবে, তাকে অবলম্বন করেও মেঘায়ন চলতে থাকবে। সেই মেঘরেখা অনুসরণ করেই আল্‌ফা-কণিকার গতিপথও সহজেই নির্ণীত হয়ে যাবে। এমন কি, তখন ফটো-প্লেটে সেই মেঘকণা বা মেঘরেখার ছবি তুলে নিয়েও তার ক্ষণবিলাসকে বর্ষ বর্ষান্তর যাবৎ স্থায়ী করে রাখা সম্ভব। বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম সম্ভব হবে একটি মাত্র নিক্ষিপ্ত পারমাণবিক কণিকার (atomic projectile), বা এমন কি একটি মাত্র ইলেক্ট্রনের বিচরণ-পথকে স্পষ্টরূপেই চিহ্নিত করে দেখা।
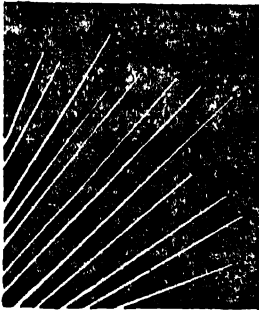
(১) (২)

১। আল্‌ফার কুয়াশা পথ
২। দুটি মাত্র আল্‌ফার মেঘায়ন-পথ
৩। পরমাণুর মধ্য দিয়ে আল্‌ফার পথ
৪। ধীরগতির ইলেক্ট্রনের পথ
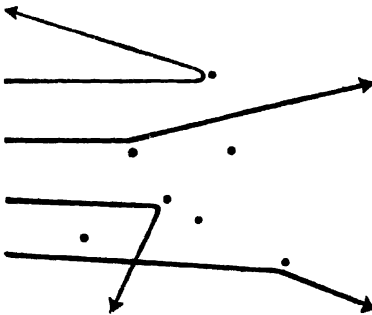
(৩) (৪)

আশ্চর্য পরিকল্পনা! চিন্তার অভিনবত্ব-স্মরণে স্তম্ভিত হতে হয়। এক সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য, সে কতটুকুই বা! একটি আঙুলও তার চাইতে চওড়া। আর একের পীঠে অন্তত তের চৌদ্দটি শূন্য বসালে (১০০০০০০০০০০০০০—দশ লক্ষ কোটি বা এক কোটি কোটি) যে সংখ্যা মিলবে, তা দিয়ে ঐ এক সেন্টিমিটারের দৈর্ঘ্য পরিমাণকে ভাগ করলে যে দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে, তাকে কি কল্পনার মধ্যেও আনা যায়? আবার

এটিই যার ব্যাসের দৈর্ঘ্য, এমন কণিকার অস্তিত্বও কি সম্ভব? অথচ সেও যে আছে, আর আছে তার প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে, সেকেণ্ডে প্রায় ২0000 কি. মি. (১২২ হাজার মাইল) গতিবেগ নিয়েই, তার কোনো তাত্ত্বিক প্রমাণ নয়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে ঐ মেঘায়ন কক্ষটির দিকে তাকিয়েই! মানুষ তার মনশ্চক্ষু দিয়েই ঐ অকল্পনীয় কণিকার গতিবেগ লক্ষ্য করেছে, অথচ পুরাকালের যোগী-ঋষির মত ঐ দর্শনকে তাঁর ব্যক্তিগত দর্শন না করে তাকে বিশ্বজনের করে তুলেছে! সেই তো তার বিশ্বরূপদর্শন! কিন্তু এমন করেছে যে, সে মানুষ কতো বড়। কতো নিপুণ তার শিল্প কর্ম! কতো মহীয়ান সে!

উইলসনের এই মেঘায়ন-কক্ষের পূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য বেশ কয়েক বছর লেগে যায়। কিন্তু ঐ তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে যখন উইলসন দেখিয়ে দিতে পারলেন যে, ইউরেনিয়াম-বিকিরণ থেকে উৎপন্ন আয়ন এবং রঞ্জেন-রশ্মির প্রভাবজাত আয়ন-কণিকাগুলি হুবহু এক, তখন সেই ১৮৯৯ খ্রী-এই টমসন রাদারফোর্ডকে সেই যন্ত্রের প্রভূত পরিমাণ উপযোগিতার কথা লিখে জানালেন এবং তখন থেকেই রাদারফোর্ড তার ব্যবহার মারফতে প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হতে লাগলেন। ঐ যন্ত্রের সাহায্যে একটিমাত্র পরমাণু, বা এমন কি একক ইলেক্ট্রনের যাত্রাপথ-রেখাও চোখের সামনে এসে হাজির হল। রাদারফোর্ড তাঁর পূর্বকথিত থোরিয়াম-ক্ষরণের গবেষণায় সহজেই ধরতে পারলেন যে, বস্তুটির বিকিরণ ক্ষমতা ক্রতই কমে আসে। পরে জানা যায় যে, আর সব তেজস্ক্রিয় বস্তুরও এ হাল। তারা যে ক্রমাগত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে চলে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল। কারণ, দেখা গেল যে, কোনো তেজস্ক্রিয় বস্তু থেকে কোনো সময়ের মধ্যে যতগুলি আল্‌ফা-কণিকা নির্গত হয়, পরবর্তী এ পরিমাণ কোনো সময়ের মধ্যে সেই সংখ্যা কমে যায়, এবং এভাবে ক্রমে ক্রমে আল্‌ফা-কণিকা আরও কম হারে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। তবে প্রত্যেকটি তেজস্ক্রিয় বস্তুর মোট পরিমাণের সঙ্গেই তার নিক্ষিপ্ত আল্‌ফা-কণিকা অনুপাত রক্ষা করে চলে। ঐ বিশেষ বস্তুটির পরিমাণ কম বা বেশি হলে নিক্ষিপ্ত কণিকার সংখ্যাও কম হয়, অথবা বেড়ে যায়। কিন্তু প্রথম আবিষ্কৃত বস্তু দুটির (ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়াম) ক্ষেত্রে ধরা পড়ল যে ওদের অর্ধায়ু (half period or half life) লক্ষ লক্ষ বছর। অর্ধায়ু বলতে একটি নির্দিষ্ট কাল পরিমাণ, যে সময়ের মধ্যে কোনো রেডিও-উপাদানের অবশিষ্ট তেজস্ক্রিয়-শক্তির অর্ধেকটি ক্ষয়িত হয়ে যায়। এক একটি রেডিও-উপাদানের পক্ষে ঐ সময় বা period-টি সুনির্দিষ্ট। অর্ধেকটি ক্ষয় হয়ে যাওয়ার পর বাকিটার অর্ধেকটি ক্ষয় পেতেও ঐ একই সময় লাগে। তারপরেও বাকির অর্ধেকের জন্য ঐ সময়, এভাবে শেষে বস্তুটির তেজস্ক্রিয়তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। যে নিয়মে ঐরূপ ঘটে থাকে, তা exponential law নামে

পরিচিত হয়েছে। এতদনুযায়ী পরে জানা গেছে, রেডিয়ামের অর্ধায়ু ১৬০০ বছর। কোনো কোনো বস্তুর অর্ধায়ু আবার এক সেকেণ্ডেরও লক্ষ লক্ষ ভাগের ভগ্নাংশ মাত্র। [কেন এমন হয় তার কারণ এখনও সঠিকভাবে আবিষ্কৃত হয়নি।] কিন্তু এ থেকে বুঝতে পারা গেল যে, তেজস্ক্রিয় বস্তু হ্রাসপ্রাপ্ত হয় বলেই নিক্ষিপ্ত আল্‌ফা-কণিকার সংখ্যাও পর পর কমে আসে। তখন বস্তুটিও তার পুরাণো গুণাবলী পরিত্যাগ করে শেষকালে নতুন উপাদান রূপে পরিণত হয়। কিন্তু আরও জানা গেল যে, তেজস্ক্রিয় বস্তুর সকল পরমাণুই এক সঙ্গে আল্‌ফা-কণিকা নিক্ষেপ করেনা। কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ বস্তুর মাত্র কিছু সংখ্যক পরমাণুই এক সঙ্গে আল্‌ফা বা অন্য কোনো তেজোময় কণিকার বিকিরণ চালিয়ে যেতে পারে। যার অর্ধায়ু যত বেশি, যুগপৎ বিকিরণকারী পরমাণু-সংখ্যাও তার তত কম। এর অর্থ হল, ইউরেনিয়ামের চাইতে রেডিয়ামের অর্ধায়ু যে অনেক কম, তার কারণ, একই সময়ের মধ্যে রেডিয়ামের অধিক সংখ্যক পরমাণু বিকিরণ চালায়। অর্থাৎ একই সময়ে ইউরেনিয়ামের চাইতে রেডিয়াম অধিক পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় বা তার ভর খুইয়ে ফেলে।

রাদারকোর্ডের থোরিয়াম-ক্ষরণ সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তটি পাকাপোক্তভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তিনি তাঁর গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। মেরি কুরি জানিয়েছেন যে, ইতিপূর্বে ১৯০০ খ্রী. নাগাৎ পিয়ের কুরি এবং তিনি নিজে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তেজস্ক্রিয় রূপ ঘটনাটি পারমাণবিক রূপান্তর রূপ ঘটনার সঙ্গেই বিজড়িত হয়ে আছে। অর্থাৎ তেজস্ক্রিয়তা গুণটি পরমাণুরই গুণ বটে। তাঁরা দেখেছিলেন যে, রেডিয়াম-সংলগ্ন হাওয়াও তেজস্ক্রিয় হয়ে উঠে। অর্থাৎ সে হাওয়া নিজেই বিকিরণ চালিয়ে যায়। রাদারফোর্ড্ এবং সডি (দেখতে চাইলেন, বাস্তবিকই ওটি কোনো পারমাণবিক গুণ কিনা) এই সূত্র ধরে রেডিয়াম সংশ্লিষ্ট হাওয়াকে পরীক্ষা করে দেখলেন যে, রেডিয়াম থেকে এক রকমের গ্যাসীয় নূতন উপাদান উদ্ভূত হওয়ার ফলেই বাতাস তেজস্ক্রিয় হয়ে উঠে। একটি দু-মুখ খোলা কাচ নলে (দ্র., পৃ. ২০৯) প্রতিপ্রভ বস্তু হিসেবে খনিজ উইলেমাইটের কয়েকটি টুকরো রেখে নলের মধ্য দিয়ে ওঁরা রেডিয়াম সংস্পর্শে বহুক্ষণ থাকা কিছু বাতাসকে চালিয়ে দিলেন। নলটি ভরে গেলে দু দিকের সংলগ্ন দুটি স্টপ্‌কক্ বন্ধ করে দেওয়া হল, যেন ভিতরের গ্যাস বেরিয়ে যেতে না পারে। তারপর বাতাস বা গ্যাস বার করে দেওয়ার জন্য নলের একদিকে একটি রাবার-বল লাগান হয়, আর অন্যদিকে লাগান হয় একটি U-আকৃতির নল। U-নলটি তরল বাতাসে ডুবান থাকে। তার ফলে ঐ নলের উষ্ণতা শূন্য ডিগ্রির নিচেও ১৯০° পর্যন্ত নেবে গিয়ে নলটিকে যথেষ্ট শীতল করে দেয়। আর ঐ U-নলের অন্য প্রান্তটি অন্য একটি আধারের সঙ্গে যুক্ত থাকে। তার ভিতরে লাগান থাকে আর একটি প্রতিপ্রভ (জিঙ্ক্ সাল্‌ফাইডের)

বস্তুর প্রলেপ। পরীক্ষাকালে গ্যাসে ভরা নল সমেত সমগ্র যন্ত্রটিকেই রেডিয়াম বস্তু থেকে বহুদূরে পৃথক জায়গায় রাখতে হয়, যেন ওর মধ্যে বাইরে থেকে কোনোভাবেই রেডিয়ামের প্রভাব এসে না পড়ে। কিন্তু নলের মধ্যে তখন কোনো সাক্ষাৎ প্রভাব না থাকলেও দেখতে পাওয়া যায় যে, রেডিয়ামের কাছে আনা উইলেমাইট জ্বল জ্বল করতে
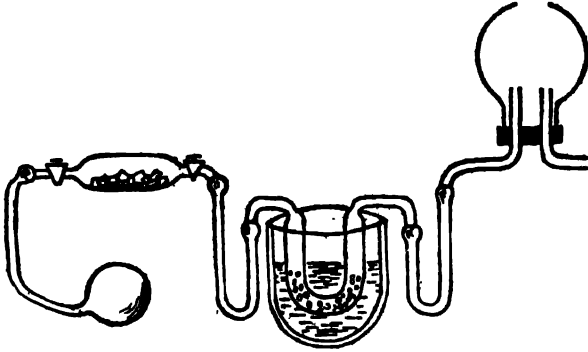
থাকে। তার ঔজ্জ্বল্য রেডিয়ামের কাছে আনা উইলেমাইটের ঔজ্জ্বল্যের সমানই। সবটি গ্যাস বা বাতাসকে বার করে দিলে কিন্তু উইলেমাইট নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। রাদারফোর্ডের নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল যে, রেডিয়াম সর্বক্ষণই এক তেজস্ক্রিয় গ্যাস উদ্গীর্ণ করে চলেছে। তিনি ওর নাম দিয়েছিলেন রেডিয়াম ক্ষরণ (radium-emanation)।

রাদারফোর্ড এবং সডি এই ক্ষরণটিকেই তরল করতে চেয়েছিলেন। প্রথমে তাঁরা নলের দু' দিককার স্টপ্ কক্ খুলে একদিক থেকে যখন রবার-বল টিপতে টিপতে নলের বাতাসকে ঠেলে দিতে লাগলেন, তখন দেখা গেল যে, সবটা গ্যাস বেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও শেষের পাত্রের জিঙ্ক-সাল্ফাইডে কোনো ঔজ্জ্বল্য দেখা দিচ্ছেনা। তার কারণ, রেডিয়াম-ক্ষরণ অতিরিক্ত শীতল U-নলের মধ্যে এসে তরল হয়ে পড়ায় আর ঐ শেষের পাত্রটি পর্যন্ত পৌছতে পারেনা। শুধুমাত্র বাতাসটিই ঐ পাত্র দিয়ে বেরিয়ে চলে যায়। অথচ দেখা যায়, U-নলকে তুলে একটু উত্তপ্ত করে দিলেই ঐ তরলটি যখন গ্যাস হয়ে ছড়িয়ে পড়ে তখন আপনাআপনিই জিঙ্ক-সালফাইড জ্বল জ্বল করে উঠে। সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হল, তেজস্ক্রিয় হলেও বস্তুটি সাধারণ গ্যাসই, ঠাণ্ডায় তরল ও গরমে পুনরায় গ্যাস হয়ে উঠে। কিন্তু বিজ্ঞানীদ্বয় আরও দেখলেন যে ওর বিকিরণ দীর্ঘস্থায়ী হয়না। ঐ নলের মধ্যে দু দিকে স্টপ কক্ দিয়ে মুখ বন্ধ করে রেখে দিলে উইলেমাইটের ঔজ্জ্বল্য কমতে কমতে শেষে মাসখানেক বাদে একেবারেই শেষ হয়ে যায়।

ব্যাপারটি সামান্য হলেও এর তাৎপর্য অসীম। এই প্রথম ধরা পড়ল যে, তেজস্ক্রিয় বস্তুর তেজস্ফূর্তি অফুরন্ত নয়। তেজ বিলিয়ে যেতে যেতে সেও এক সময় ফতুর হয়ে যায়, জগতে কোনো কিছুই তার বিপুল ব্যয় সত্ত্বেও অব্যয় বা অক্ষয় থেকে যেতে পারে না। কিন্তু তাহলে তো আবার প্রশ্ন ওঠে : ওর তেজটি যদি নিঃসৃত হয়ে বেরিয়ে যায়, তাহলে ওর নিজের অর্থাৎ ওর নিজ ভরসত্তার পরিণতি হয় কিসে? আর কোন্ বস্তুতে ওর রূপান্তর ঘটে যায়? ১৯০৩ খ্রী.-এ র‍্যামজে এবং সডির গবেষণা থেকে তারও সদুত্তর মিলে গেল। কিন্তু তৎপূর্বে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাও ঘটে গেল।

১৮৭২ খ্রী.-এ মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্তোলেতভ (A. Stoletov) একটি ফ্লাস্ক্ থেকে বাতাস টেনে নিয়ে তার ভিতরের দু' দিককার দুটি ধাতব পাতের সঙ্গে তড়িৎ-ব্যাটারি সংযুক্ত করে পরীক্ষা করছিলেন। বাতাস টেনে নেওয়ার জন্য পাত্র মধ্যে কোনো বিদ্যুৎপ্রবাহ ঘটা সম্ভব ছিলনা। কিন্তু হঠাৎ পাতগুলির উপর পারদ প্রবাহের আলো এসে পড়ায় দেখা গেল যে, প্রবাহ চলতে শুরু করেছে। আলোটি সরিয়ে নিতেই প্রবাহটিও বন্ধ হয়ে গেল। স্তোলেতভ্ সিদ্ধান্ত করলেন যে, আলোক-সম্পাতের ফলেই বিদ্যুৎবাহক বস্তুর আবির্ভাব ঘটে উঠেছে। অল্পকালের মধ্যে যখন আবিষ্কৃত হল যে, ধাতু থেকে উদ্ভূত কণিকাবৃন্দই (ইলেক্‌ট্রন) বিদ্যুতের আসল পরিবাহক, তখন ঐ আলো, বা ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বানুযায়ী (পৃ. ১৪৫) ঐ বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গ যে কি করে একটি ধাতু থেকে ঐ রকম সব কণিকাকে উৎক্ষিপ্ত করে দিতে পারে, তা ধারণা করা শক্ত হয়ে উঠল। আশ্চর্য যে, দেখা গেল ঐ কণিকার উৎক্ষেপ ঘটাতে গেলে একটি বিশেষ ধাতুর জন্য নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট রশ্মির দরকার হয়। রশ্মির ঐ তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে গেলেই পাত্রস্থ বিদ্যুদ্বাহী কণিকার উৎক্ষেপ বন্ধ হয়ে গিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহটিও বন্ধ হয়ে যায়।

র‍্যামজে এবং সডির গবেষণার অল্পকাল পূর্বে ১৮৯৯ খ্রী.-এ টমসন্ এবং লেনার্ড পৃথকভাবে দেখিয়ে দিলেন যে, কোনো ধাতুর ওপর বেগনিপারের আলোরশ্মি (ultra-violet ray) ফেলতে থাকলে সেই আলো ক্রমে ক্রমে সেখান থেকে ঋণাত্মক ইলেক্ট্রন-কণিকাদের খসিয়ে দিতে থাকে। কিন্তু আলোক যদি তরঙ্গধর্মী হয়ে থাকে তাহলে সে কি করে একটি কণিকাকে ধাক্কা মেরে তার গাড্ডা থেকে তাকে ঠেলে তুলতে পারে? জলের উপর ঢেউ খেলে গেলে নৌকোটি নাচে। কিন্তু সে তো তাতে কোনোমতেই এগিয়ে চলতে পারেনা। কারণ, ঢেউ বলতে আসলে একটি ভঙ্গি। সুতরাং জলতরঙ্গ জলের অবস্থানের একটি ভঙ্গিমা মাত্র। সেই ভঙ্গিমা করার জন্য জলকে যে এগিয়ে চলতে হবে, এমন কোনো কথা নাই। সুতরাং জলতরঙ্গ বলতে জলের তরঙ্গ-ভঙ্গি। সেইরকম আলোতরঙ্গ বললেও আলোর তরঙ্গ-ভঙ্গিমা বোঝায়।

কিন্তু হাইজেন্‌সের চিন্তা অনুযায়ী (পৃ. ৮৪) সর্বব্যাপ্ত ইথার (পৃ ১৫)-তরঙ্গ ধরে যদি আলোকে এগিয়ে যেতে হয় এবং তারপর যদি সে ছুটে গিয়ে ঐভাবে ইলেক্ট্রনকে ধাক্কা মেরে তুলে, তাহলে নিজে কণিকাধর্মী না হলে কি করে সে তা পারে? ইথার-তরঙ্গকে অবলম্বন করে চলায় তার দেহে বা গতির মধ্যে না হয় একটি তরঙ্গ-ভঙ্গি প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু সে যদি নিজেই কোনো পদার্থসত্তা না হয়ে কেবল তরঙ্গ-ভঙ্গি হয়ে থাকে, তাহলে সে বড় জোর জলতরঙ্গের উপর নৌকা-বিলাসের মত পরমাণুর ওপর কোনো ইলেক্ট্রনের বিলাসভঙ্গি সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সে ইলেক্ট্রনকে উৎক্ষিপ্ত করবে কেমন করে? পর বৎসর ১৯০০ খ্রী.-এর ডিসেম্বর মাসে বিজ্ঞানী প্ল্যাঙ্ক্ (Max Karl Ernst Ludwig Planck 1858-1947) অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে আলোকের পরিমাণ (বা পারিমাণিক)-তত্ত্ব (quantum theory of light) উপস্থাপিত করে জানালেন যে, তেজের (energy-light) দেহটিই সমপরিমাণ অথচ পৃথক পৃথক স্বতন্ত্র সত্তা বা কণিকা দিয়ে গঠিত। ফ্যারাডের ভাবনার সঙ্গে ম্যাক্স্‌-ওয়েলের মতবাদকে সংগতিসম্পন্ন মনে করে হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্‌ ওয়েবারের যে বিদ্যুৎ-কণিকাবাদকে সমর্থন জানিয়েছিলেন (পৃ. ১৬৯), এভাবে প্ল্যাঙ্ক্ কর্তৃক তার তাত্ত্বিক ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

প্রাচীন দার্শনিক ডিমক্রিটাস এবং তৎশিষ্য এপিকিউরাস চলমান পরমাণু এবং তাদের গতির জন্য পরমাণুবৃন্দের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানের কল্পনা করেছিলেন (পৃ. ৪)। মধ্যযুগের দার্শনিক দেকার্তেও বস্তুর গতি এবং মধ্যবর্তী ইথারের কল্পনা করে নিয়েছিলেন (পৃ. ১৬)। কিন্তু প্রায় আধুনিক যুগে পৌঁছেই বিগত শতাব্দীর শেষভাগে এসে সেই গতি বা তেজ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ মিলেছিল। দেখা গিয়েছিল যে (পৃ. ৪৫), তরল বা গ্যাসের অণুগুলি বাস্তবিকই সদা চলমান, এবং পারস্পরিক ধাক্কার ফলে তাদের মধ্যে তেজ-বিনিময় চলছে। কিন্তু অব্যবহিত পরেই তেজের অন্য স্বরূপও প্রত্যক্ষীভূত হয়। সেটি হচ্ছে আমাদের পূর্বকথিত (পৃ. ১৫৮) তাপ-বিকিরণগত তরঙ্গ-তেজ। ঐ শতাব্দীর শেষপাদেই ম্যাক্স্‌ওয়েল, এবং তারপরে হার্জ্‌ আলোর বিকিরণকে বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গ বলে প্রমাণ করেছিলেন (পৃ. ১৪৫-৪৬)। সুতরাং তাপ-বিকিরণের মধ্যেও তরঙ্গধর্মগুলি বিদ্যমান থাকতে বাধ্য। তাই প্ল্যাঙ্ক্ যখন জানালেন যে, বিকিরণ-তেজটি কোনো অবিচ্ছিন্ন ধারা নয়, তার দেহটি পরমাণুর মত ছোট ছোট পরিমাণের বিচ্ছিন্ন এবং গোটাগুটি কণিকা দিয়ে গঠিত, এবং ল্যাটিন ভাষার কোয়ান্টাম (অর্থাৎ পরিমাণ)-শব্দটি প্রয়োগ করে তিনি যখন তাদেরকে আলোকের 'কোয়ান্টাম' বা 'কোয়ান্টা' (পরিমাণসমূহ) বলে ঘোষণা করলেন, তখন চতুর্দিকে রীতিমত চাঞ্চল্য দেখা গেল। প্ল্যাঙ্ক্ বললেন যে, আলোকের ঐ

খণ্ডাংশগুলি সব একপ্রকার নয়। বিভিন্ন বিকিরণের পরিমাণ-কণা বিভিন্ন। আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত ছোট হয় তার কম্পাঙ্কও (frequency—প্রতি সেকেণ্ডে তরঙ্গের কম্পন-সংখ্যা) ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। তেজাংশ-পরিমাণগুলিও তত বেশি হয়। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে, যে-কোনো আলোর ক্ষেত্রে হোক না কেন, তার কম্পাঙ্কের (v) সঙ্গে একটি বিশেষ সংখ্যাকে গুণ করে দিলেই ঐ আলোর এক একটি পরিমাণ কণিকার তেজ (E) সহজেই নির্ণীত হতে পারে। সেই বিশেষ সংখ্যাটির (h) মান হোল সেকেণ্ডে ৬·৬ × ১০^{-২৭} আর্গ্। আবিষ্কারকের নাম অনুযায়ী ঐ সংখ্যাটি 'প্ল্যাঙ্কের ধ্রুব সংখ্যা' বা 'প্ল্যাঙ্ক্ ধ্রুবক' (Planck's constant) নামেই পরিচিত হল। আর প্ল্যাঙ্কের মূল সূত্র বা সমীকরণটি তাহলে হল :

$$E = hv$$

সুতরাং প্ল্যাঙ্ক্-তত্ত্ব থেকে জানা গেল যে, তেজেরও বিকিরণ বা শোষণ একটানা ঘটেনা, দমকে দমকে বা লাফে লাফে অর্থাৎ ছাড়া ছাড়া ভাবে ঘটতে থাকে। এদিকে লেনার্ড্ও তাঁর ঐ পূর্ববর্তী গবেষণা চালিয়ে গিয়ে ১৯০২-তে প্রমাণ করলেন যে, আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য (অবশ্য ইথার-তরঙ্গ জনিত) এক থাকলে তার ঘনত্ব বা নিবিড়ত্বের (intensity) উপর নির্ভর করেই উৎক্ষিপ্ত ইলেক্ট্রনের সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে বটে। কিন্তু ইলেক্ট্রনের গতিবেগটি ঐ নিবিড়ত্বের উপর মোটেই নির্ভরশীল থাকেনা। সুতরাং এ থেকেও স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, একটানা তরঙ্গভঙ্গি যদি ইলেক্ট্রনের উপর প্রভাব বিস্তার করত, তাহলে রশ্মির নিবিড়তা বৃদ্ধির সঙ্গে ইলেক্ট্রনও প্রবলতর গতিবেগ প্রাপ্ত হয়ে ছুটে চলত। কিন্তু তা তো মোটেই হয়না। উৎক্ষিপ্ত ইলেক্ট্রনের গতিবেগের বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে যথাক্রমে আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের হ্রাস বা বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে যথাক্রমে তার তেজের হ্রাস বা বৃদ্ধির উপর নির্ভর করেই। আর সেইজন্য ঐ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করেই আমাদের চোখে এক এক রকমের অনুভূতি জাগে। ব্যাপারটিকে বিশদ্ করে বলা যেতে পারে (তুল.-, পৃ. ১৫৭-৫৮)।

ঝাড়-লণ্ঠনে যে-সব তিন-পিঠওয়ালা কাচ ঝুলতে থাকে, আলোর সামনে তুলে ধরলে তারা যে ঐ আলোরশ্মিকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে দ্রষ্টার চোখে বিভিন্ন বর্ণের অনুভূতি জাগিয়ে তুলে, একথা সকলেরই জানা। যে কোনো আলোরশ্মি চলবার সময় ঢেউ ধরে চলে। অর্থাৎ তার চলন-ভঙ্গিটি ঢেউয়ের মত। বিভিন্ন আলোকের বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ঢেউ। কিন্তু ঐ ত্রিপল-কাচ এমন একটি যন্ত্র যে, সে ঐ আলো-মধ্যস্থ রঙের সমারোহকে ভেঙে দিয়ে ওর হাঁড়ির খবর বার করে দেয়। ওর প্রত্যেকটি জুটিদারের ঝুটি ধরে টেনে আনে। এ থেকেই আঁচ করা যেতে পারে, স্পেক্ট্রোস্কোপ বা বর্ণালি-

বীক্ষণ যন্ত্রও কেমন করে একটি রশ্মিকে ভেঙে দেয় এবং তার ফলে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য (অর্থাৎ তার বিভিন্ন প্রকার তেজ) জনিত তার বিভিন্ন রঙ্‌গুলিও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় তার আসল সত্তাটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। একটি প্রিজ্‌মের একদিকে রশ্মি ফেললে অন্য দিক থেকে সে রশ্মি বিভিন্নবর্ণে বিশ্লিষ্ট হয়ে বেরিয়ে যায়। ওখানে একটি পর্দা পাতা থাকলে পর্দার ওপরে তখন তার সব কটি রঙ্‌ই দেখা যায় (পরে দ্রষ্টব্য)। কোনো কঠিন পদার্থকে প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত করলে যখন সে শুভ্রোত্তপ্ত হয়ে উঠে তখন তার ঐ বিচ্ছুরিত রশ্মিকে প্রিজ্‌ম বা অন্য এক প্রকার যন্ত্রের উপর ফেললেও পিছনের পর্দায় ঐ রকম রঙ্‌-বাহার দেখা যায়। তবে সূর্যরশ্মি বিশ্লেষণ করলে তার সাতটি বর্ণকে সনাক্ত করা গেলেও বর্ণগুলি যেমন পাশাপাশি একটানা বা অবিচ্ছিন্নভাবে প্রতিভাত হয়, এখানে তা হয়না। বর্ণগুলি যেন পাশাপাশি অবস্থান সত্ত্বেও পৃথক পৃথক সীমারেখা-যুক্ত হয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠে। তার রঙ্‌-সজ্জাও সূর্যকিরণের বর্ন-সমাবেশের মত হয়না। অর্থাৎ রামধনুতে সবুজ-হলদে-কমলা,—এভাবে পর পর থাকে ; কিন্তু একটি বিশেষ বস্তুর রশ্মিতে হয়ত দেখা যায় সবুজের পরই কমলা বা আসমানি। আবার অন্য বস্তুর রশ্মিতে হযত অন্য রকম। ওদের সেই বিচ্ছিন্ন বর্ণরেখামালার পাশাপাশি অবস্থানকে 'বর্ণালোকচিহ্নপাত' বা 'বর্ণলিপি' বা বর্ণালি (spectrum), এবং বর্ণবিচ্ছিন্নকরণ প্রণালিটিকে বর্ণালি-বিশ্লেষণ পদ্ধতি বলা হয়। উত্তপ্ত গ্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেখানে কয়েকটি মাত্র বিচ্ছিন্ন ও পৃথক বর্ণরেখা ফুটে উঠে। সেগুলি কৃষ্ণরেখ ব্যবধান দিয়ে বিচ্ছিন্ন। সেগুলির সমাবেশও ঐ গ্যাসের ধর্মের উপর নির্ভরশীল। যেমন, পটাসিয়াম গ্যাসের ক্ষেত্রে লাল, লাল, বেগনি ; কিংবা ক্যালসিয়ামের বেলায়, কয়েকটি লাল, তারপরে হলুদ, তারপরে সবুজ ইত্যাদি। ব্যাপারটি খুব সহজ হলেও এর গুরুত্ব কিন্তু প্রভূতই। পার্থিব এক একটি বস্তুর বর্ণালোকমালার সমাবেশ ভিন্ন ভিন্ন। পৃথিবীতে বিশুদ্ধ রঙের সংখ্যা হয়ত খুব কমই। কিন্তু ঐ কয়েকটি রঙের রৈখিক সমাবেশ অর্থাৎ বর্ণরেখাগুলির পর পর পাশাপাশি অবস্থান পদ্ধতি অসংখ্য। প্রত্যেকটি উপাদানের বর্ণচিত্র তাই ভিন্ন। লোহার বর্ণালিতে রঙ্‌গুলি যেভাবে ধরা পড়ে, তামারটিতে ঠিক সেভাবে না হয়ে হয়ত একটু ভিন্ন ভাবে সাজানো হয়ে থাকে। তাই এই বর্ণালি-বিশ্লেষণ থেকেই বলে দেওয়া যেতে পারে কোন্‌টি কোন্ বস্তুর বর্ণালি। তবে বিবরণ থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, এ প্রণালি প্রয়োগ করতে হলে বস্তুটিকে আগেই গালিয়ে গ্যাসে পরিণত করে নিতে পারলে ভাল হয়।

পূর্বেই আমরা দেখেছি (পৃ. ১৫৬-৫৭) ক্ষরণ-নলের মধ্য থেকে বাতপাম্প যন্ত্রের সাহায্যে ক্রমাগত গ্যাস টেনে নিয়ে যখন কোনো গ্যাসকে যথাসম্ভব পাতলা করে তোলা যায় তখন দুদিকের তড়িদ্দ্বারের সাহায্যে তার মধ্যে তড়িৎ পাঠিয়ে দিলে গ্যাসটি তার

প্রকৃতি অনুযায়ী কোনো বিশেষ বর্ণলাবণ্যে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠে। সুতরাং তখন যদি বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ওর বর্ণালি-বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, তাহলে সহজেই বোঝা যাবে গ্যাসটি কোন্ পদার্থের। ১৯০৩ খ্রী.-এ র‍্যামজে এবং সডি এভাবে একটি বর্ণালিবীক্ষণ নলকে রেডিয়াম-ক্ষরণ দিয়ে ভর্তি করে তার বর্ণালি-বিশ্লেষণ করে দেখলেন। বাতাসের সঙ্গে অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন থাকে বলে বর্ণালিতে তাদের সুপরিচিত বর্ণমালা ফুটে উঠল। কিন্তু বিস্মিত হয়ে তাঁরা দেখলেন যে ওর সাথে আরও এমন এক উজ্জ্বল বর্ণরেখ সমাবেশ ধরা দিয়েছে যার পরিচয় অজ্ঞাত। তাঁরা ওটিকে রেডিয়াম-ক্ষরণ নামক নবাবিষ্কৃত উপাদানটির বর্ণালি বলে ধরে নিতে বাধ্য হলেন। দিনের পর দিন ওঁরা ওটিকে লক্ষ্য করে দেখতে পেলেন যে ওর ঔজ্জ্বল্য ক্রমাগত কমে আসছে। রাদারফোর্ড্ এবং সডি আগে ঠিক এই ঘটনাই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু এঁরা একটি সম্পূর্ণ নতুন জিনিস দেখলেন যে, ঔজ্জ্বল্য কমতে থাকার সঙ্গে আর একটি নতুন বর্ণালি ধীরে ধীরে জানান দিচ্ছে। ক্ষরণের ঔজ্জ্বল্য যত ক্ষীণ হয়ে এল, নতুন বর্ণালির ঔজ্জ্বল্য ততই স্পষ্ট হয়ে উঠল। স্পষ্ট হয়ে উঠল কিন্তু সুপরিচিত হিলিয়াম রূপে। চোখের সামনেই রেডিয়াম-ক্ষরণের পরমাণু হিলিয়াম-পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। পরমাণু যে তাহলে কেবল আয়নে বিচ্ছিন্ন হয় তাই না। সে ভেঙে গিয়ে তাহলে আর এক আপাত-অক্ষয় পরমাণুতেও রূপ বদল করতে পারে!

ব্যাপারটির একটি হেস্ত নেস্ত হয়ে যাওয়ার দরকার। রাদারফোর্ড্ এবং রয়ড্স্ এমন একটি অতি সূক্ষ্ম পাতলা কাচের নলে রেডিয়াম-ক্ষরণকে পুরে রাখলেন যাকে ভেদ করে সহজশোষ্য আল্‌ফা-কণিকাও বেরিয়ে যেতে পারে। নলটিকে একটি বড় পাত্রে রাখা হল। পাত্রের একমাত্র মুখ একটি বর্ণালিবীক্ষণ নলের সঙ্গে লাগান থাকল। পাত্র এবং তৎসঙ্গে বীক্ষণ-নল থেকে এমনভাবে নিঃশেষ করে বাতাসকে টেনে নেওয়া হল যে, বীক্ষণ-নলের মধ্যদিয়ে আর বিদ্যুৎ চালানও সম্ভব হলনা। ফলে বিদ্যুৎ-ঝলক জনিত কোনো ঔজ্জ্বল্যও আর ওখানে দেখা গেলনা। দু'দিন পরে আল্‌ফা-কণিকাগুলি ভিতরের নল থেকে বেরিয়ে এসে বড় পাত্রে এবং বীক্ষণ-নলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে বলে মনে হল। তখন আবার বিদ্যুৎ পাঠান হল। ঝলক উঠল, দীপ্তি এল, বর্ণালিতে হিলিয়ামের উজ্জ্বল হলদে রেখাটির আবির্ভাব ঘটল। ক্রমে তার অন্যান্য অস্পষ্ট রেখাগুলিও ফুটে উঠল। সঠিকভাবেই জানা গেল যে, প্রকৃতির মহাযজ্ঞশালায় রেডিয়াম থেকে হিলিয়াম এবং রেডিয়াম-ক্ষরণের, আর এই ক্ষরণ থেকে পুনরায় হিলিয়ামের পরিবর্তন বিনা প্রচেষ্টাতে আপনাআপনিই ঘটে চলেছে। অথচ কিনা ল্যাভইসিয়ে-ড্যাল্টনের সময় থেকেও এই দীর্ঘকাল যাবৎ আমরা জেনে এসেছি পরমাণু অপরিবর্তনীয়!

রেডিয়াম-ক্ষরণ যদি তেজস্ক্রিয়-রশ্মি ও রেডিয়ামের মধ্যবর্তী কোনো অবস্থা না হয়ে, বাস্তবিকই একটি পৃথক মৌলিক বস্তু হয়ে থাকে, তাহলে তার রাসায়নিক পরিচয়, তার পারমাণবিক ওজন ইত্যাদিও নিশ্চয় থাকবে। নানা চেষ্টাতেও যখন সে আর কারও সঙ্গে মিশ খেতে চায়না, তখন তাকে ঐ হিলিয়াম ইত্যাদির মতই একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু তার পারমাণবিক ওজন যে আর কিছুতেই জানা যাচ্ছেনা। শেষে অনেক যত্নে অনেক কৌশলে র‍্যামজেই সে কার্য সমাধা করলেন। জানা গেল ওর পারমাণবিক ওজন ২২২। পরে অবশ্য নিখুঁত মাপে জানা গিয়েছে, ২২২·০৫। ওদিকে রেডিয়াম আর হিলিয়ামের ওজন আগে থেকেই জানা ছিল, যথাক্রমে ২২৬·০৫ এবং ৪। সুতরাং রেডিয়াম-ক্ষরণ আর হিলিয়ামেব ওজনের সমষ্টির সঙ্গে যখন রেডিয়ামের ওজনটি হুবহু মিলে গেল, তখন আর রাদারফোর্ডের অনুমান-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো কারণ রইলনা। তারও পূর্বের সিদ্ধান্তকে তাই বাতিল করে দিতে হল। রেডিয়াম-ক্ষরণ র‍্যাডন্ নাম গ্রহণ করে মেন্দেলিয়েভের পর্যায়িক ছকের মধ্যে তার যথার্থ স্থান অধিকার করে নিল।

১৯০৩-এই রাদারফোর্ড্ লক্ষ্য করলেন র‍্যাডনের রূপান্তর ঘটছে আর একটি তেজস্ক্রিয় বস্তুতে (এর ভর ২২২ – ৪ = ২১৮)। তার নাম দেওয়া হল রেডিয়াম-A। তা' থেকে আবার পাওয়া গেল বেডিয়াম-B (২১৮ – ৪ = ২১৪) এবং তার থেকেও রেডিয়াম-C (রেডিম-B থেকে বিটা-ক্ষরণের ফলে ওর উৎপত্তি হয় বলে ওর ভরটিও ২১৪-ই থেকে যায়, কিন্তু ইলেক্ট্রনের সংখ্যা কমে যায়)। পরবর্তী দু' বছরে রেডিয়াম-D, -E, -F-ও আবিষ্কৃত হল। দেখা গেল, রেডিয়াম-F-ই কুরি-আবিষ্কৃত পোলোনিয়াম ব্যতিরেকে অন্য কিছু নয়। ঠিক ঐ সময়ে রেডিয়াম-B আবিষ্কৃত না হলেও ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, রেডিও-উপাদানের রূপান্তরকরণের নিয়মানুযায়ী তা থাকতে বাধ্য। কিন্তু এসব থেকেই স্বাভাবিকভাবে স্বয়ং রেডিয়ামের সঙ্গে ইউরেনিয়ামের সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠল। ইউরেনিয়ামের খনি থেকেই যখন রেডিয়াম মিলছে তখন ইউরেনিয়ামের রূপান্তরপ্রক্রিয়া বশেই কি তার উৎপত্তি? তেজস্ক্রিয় বস্তু থেকে হিলিয়ামের উৎপত্তি ঘটে বলেই তো তেজস্ক্রিয় বস্তুর খনি মধ্যেই হিলিয়ামের অবস্থান দেখতে পাওয়া যায়! তাছাড়া ইউরেনিয়ামের ওজনও যখন রেডিয়ামের চাইতে বেশিই, তখন সেই বাড়তি ভার বা ভরটি তেজস্ক্রিয় প্রক্রিয়া বশে ক্ষয়ে গিয়ে তা থেকে রেডিয়ামের উৎপত্তি হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। বিশেষত রেডিও-উপাদানগুলির যা হাল, তাতে ঐটিই খুব সম্ভব বলে মনে হয়। ১৯০৫ সালে রাদারফোর্ড্ এবং বোল্ট্উড্ (**Bertram B. Boltwood—1870-1927**) সঠিক-ভাবেই ধরতে পারলেন যে, হিলিয়ামই রেডিয়ামের শেষ পরিণতি নয়। সীসাই সেই

শেষ ফল (end-product)। কারণ, ইউরেনিয়াম-রেডিয়ামের খনিতে সীসেও মিলে যাচ্ছে, অথচ ওর কোনো তেজস্ক্রিয়তা নাই। কিন্তু ১৯০৪ খ্রী.-এ সডি দেখিয়ে দেন যে প্রত্যক্ষভাবে ইউরেনিয়াম থেকে রেডিয়ামের উৎপত্তি ঘটছেনা। তবে যদি তাকে ইউরেনিয়াম থেকে আসতেই হয় তাহলে অন্য কোনো বস্তুর সোপান অতিক্রম করেই পৌঁছতে হবে। ১৯০৭ সালে ইয়েল (Yale)-বিশ্ববিদ্যালয়ের বোল্ট্‌উড্‌ কয়েক বছরের অনুসন্ধানের পর সে বস্তুটির সাক্ষাৎ পেলেন। নাম দেওয়া হল তার আয়োনিয়াম,—রেডিয়ামের জনক এবং ইউরেনিয়ামের সাক্ষাৎ বংশধর বটে। ক্রমেই থোরিয়াম এবং অ্যাক্টিনিয়ামেরও বংশধরদের সন্ধান পাওয়া গেল (বহুকাল পরে নবাবিষ্কৃত উপাদান নেপচুনিয়ামেরও বংশধারার সন্ধান মিলেছে)।

পরমাণু যে অবিভাজ্য, ড্যাল্টনের এই সিদ্ধান্তটিকে তাহলে বাতিল করতে হয়। কিন্তু আমরা দেখেছি যে ড্যাল্টনের সিদ্ধান্তের অন্তত এই অংশটি তাঁর কোনো নিছক মনগড়া কল্পনার ফল ছিলনা। রাসায়নিক-বিক্রিয়ার নিয়ম কানুন অবলম্বন করেই তিনি এ সম্বন্ধে অনুমান করেছিলেন। তাহলে আজ তাঁর এই তত্ত্বটি মিথ্যে হয়ে গেল কেন? কিন্তু আমরাই তো প্রত্যক্ষ করেছি, বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন ঘটনা কতবার ঘটে গিয়েছে। বয়্যাল, ভোল্টা, ডেভি প্রভৃতির মত কত বড় বড় বিজ্ঞানীর কত শ্রমযত্নার্জিত সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে পরিত্যক্ত হয়েছে (পৃ. ১৩২)। সত্য বটে, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করে প্রকৃতির রূপান্তর ঘটান হয়েছে। কিন্তু সেই রূপান্তর-সাধন প্রক্রিয়ার মধ্যেই আবার বিজ্ঞান চিন্তারও বিবর্তন বা রূপান্তর ঘটে গেছে।

বিজ্ঞানের আবিষ্কার চলতে থাকে। বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে তার প্রয়োগ ঘটলে মানুষ অতি সহজেই সে আবিষ্কারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠে। কিন্তু নতুন আবিষ্কারকে প্রত্যক্ষ করলেই মানুষের পুরানো ধারণাগুলি পালটে যায়না। কারণ, সত্যকে নিঃসন্দেহে জানা এবং অসংকোচে প্রকাশ করা এবং তাকে নির্ভীকভাবে কার্যকর করে তুলার পথে পূর্ব ধারণা বা প্রাচীন সংস্কারগুলি প্রচণ্ডতম বাধা সৃষ্টি করে। বহির্জাগতিক বস্তুধারা যেভাবে নিশ্চিত পথ ধরে নিশ্চিত অভিমুখে পরিবর্তিত হতে থাকে, মনের পরিবর্তন সেভাবে ঘটেনা। কারণ, মন এখনও কাঁচা বস্তু। বার বার এদিকে ওদিকে ভেঙে পড়ে। কিন্তু বহির্বস্তুধারাই মনকে সৃষ্টি ও রূপায়িত করে চলেছে বলে, বিলম্বে হলেও তাকে প্রাকৃতিক প্রবাহের অভিমুখে পরিবর্তিত হতেই হয়। তখন তার পক্ষে স্বীয় প্রবণতা বা ধারণাকে প্রকাশ করবার উপযুক্ত ভাষা সৃষ্টি করে নেওয়া কঠিন হয়না। আসলে মনের তুলতুলে অবস্থার জন্যই মতবাদের পরিবর্তন বা তত্ত্বের বিবর্তন ঘটতে বিলম্ব হয়ে যায়। তৎসত্ত্বেও বহির্জগতে যখন অনিবার্য ভাবেই বস্তু-

বিবর্তন ঘটে চলেছে, তখন ক্রমে ক্রমে মনের বিবর্তন বা ধারণার পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। সেই কারণেই দেখা যায় জগতে সকল বস্তুসংঘের মতই তত্ত্ব বা মতবাদেরও শৈশব, যৌবন এবং বার্ধক্য আছে। মতবাদের প্রথম যুগে পুরাতন চিন্তা প্রাণপণ বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু ক্রমেই সে পরাভূত হয়ে পড়ে। শৈশবের চাপল্যকে মানুষ ছেলেখেলা বলে অস্বীকার করতে চায়, অথচ যৌবন-চাঞ্চল্যকে মানুষ মেনে নিতে বাধ্য হয়, তাকে শ্রদ্ধা-সম্মান জানায়। আবার বার্ধক্যের অস্থিরতাকে মানুষ দৌর্বল্য বলেই উড়িয়ে দেয়। তখন, যে চিন্তাধারা একদা যৌবনদৃপ্ত ছিল, তা-ই সেই সময়ে বৃদ্ধ হয়ে পড়ে এবং সেই বার্ধক্য বা জীর্ণতার খোলস পরিত্যাগ করে প্রাচীন ভাবধারার মধ্য থেকেই আবার সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গিতে প্রগতিশীল মতবাদের অভ্যুদয় ঘটে। সে তার শৈশবাবস্থা। কিন্তু সে নিশ্চিত। তবুও তাকে গ্রহণ করতে মানুষের কত দ্বিধা। কিন্তু তার যৌবনাবস্থায় সে যখন একটি বিশেষ শক্তিতে পরিণত হয়, তখন মানুষের ধারণাও বদলে যায়। নতুন মতবাদের সাহায্য নিয়ে মানুষ তখন কত কাজ সেরে নেয়, ভাঙা ও গড়ার কত যন্ত্রপাতি বানিয়ে নেয়। আবার বস্তুজগৎ বিবর্তিত হয়ে নতুন রূপের ও তজ্জনিত নতুন ভাবের দ্যোতনা সৃষ্টি করলে আবার সেই শক্তিমান মতবাদটিরও বার্ধক্য এসে যায়। সে জীর্ণ ও পরিত্যাজ্য হয়ে উঠে। কিন্তু শক্তিমান কোনো কিছুকে সহজে হঠিয়ে দেওয়া যায়না। পুরানো ধারণাই সংস্কার হয়ে বাধা সৃষ্টি করে। প্রাচীনকালে ডিমক্রিটাস এই কথাটিকেই অতি সুন্দর ও সহজভাবে ব্যক্ত করেছিলেন (পৃ. ৪): "প্রথা অনুসারেই মধুর মধুর হয়, প্রথা অনুসারেই তিক্ত তিক্ত হয়···কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে···তাদেরকে এ রকমটি ভাবা প্রথা হয়ে গেলেও, তারা কিন্তু সত্য নয়।" বস্তুতপক্ষে, এই প্রথা বা সংস্কারই পরিবর্তনীয়কে অপরিবর্তনীয় সত্য বলে প্রতিভাত করতে থাকে এবং এভাবে নবীন আর প্রবীণের দ্বন্দ্ব উদ্যত হয়ে উঠে। এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই সকল প্রক্রিয়া বা সকল ব্যবস্থারই অগ্রগতি ঘটছে। সেই গতি যদি চিরন্তন ও সার্বজনীন হয়ে থাকে, তাহলে তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বটিও অনিবার্য ভাবেই চিরন্তন ও সার্বজনীন। বিজ্ঞানীবৃন্দের চিন্তাধারাও এই রীতির বহির্ভূত কোনো ব্যতিক্রম নয়। এইভাবেই সময় এলে, অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে, তাদেরও চিন্তাধারার পরিবর্তন বা মতবাদের বিবর্তন ঘটে যায়। আর এভাবেই পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সমাজের অগ্রগতির ধারা অক্ষুণ্ন থাকছে, ক্ষুদ্র-সত্য বা আংশিক সত্যের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর-সত্য ক্রমাভিব্যক্ত হয়ে চলেছে। ড্যাল্টনের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত সেই আংশিক-সত্যকে প্রকাশ করতে পেরেছে, যেমনভাবে গোষ্পদের মধ্যেও যে আকাশ ধরা দেয়, তা আকাশই, কিন্তু তা আকাশের অংশবিলাস মাত্র। আয়নতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার যুগে কিন্তু বোঝা যায়নি, সে তত্ত্ব পারমাণবিক অক্ষয়ত্বের তত্ত্ব-গর্ভে দিনে দিনে বেড়ে উঠে তাকেই আবার ক্ষয়

করতে চলেছে। কারণ, তখন শুধু জানা যাচ্ছিল যে, অক্ষয়-পরমাণুর সঙ্গে কেবল বিদ্যুৎ-আধান রূপ কোনো বিশেষ শক্তিমাত্রই যুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং মোটামুটিভাবে অক্ষয়ত্বের ধারণাটি ঠিকই ছিল। তবে সেই ধারণার উপর ভিত্তি করেই তার সঙ্গে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত আর একটি ধারণা জুড়ে দিয়ে নতুন তত্ত্ব স্থাপন করতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে আবার এই রকমের নতুন তত্ত্বেরও বার্ধক্য এসে গেল এবং সেই তত্ত্বের গর্ভ থেকেই আবার নবীনের আবির্ভাব ঘটল, পূর্বেকার সেই 'নতুন তত্ত্ব'কে অবলম্বন করেই ইলেক্ট্রনের আবির্ভাব হল। কিন্তু বিদ্যুৎরূপী স্বয়ং ইলেক্ট্রনও তার ভীম বেগ নিয়ে পরমাণুকে সম্পূর্ণরূপে ধূলিসাৎ করতে পারেনি। তা করতে এগিয়েছে তেজস্ক্রিয়তা বা তেজের আর এক নবীন তত্ত্ব। অথচ শেষ বিচারে ইলেক্ট্রন-তত্ত্বের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ নাই। প্রাচীন ও নবীন পরস্পর সম্পর্কিত। সুতরাং এসব বিচার করে পারমাণবিক অক্ষয়ত্বের তত্ত্বকে যদি আমরা পরবর্তী তত্ত্বগুলির সোপান বলে ধরে নিই তাহলেই তার সার্থকতা ধরা পড়ে যায়।

কিন্তু এসব থেকে নিম্নোধৃত কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য না করে পারা যায়না :

(১) আংশিক সত্য থেকেই বৃহত্তর সত্যের জন্মলাভ ঘটে থাকে ;

(২) পুরাতন থেকে সমুত্থিত হলেও কিন্তু সে সত্যটি সম্পূর্ণ নূতনরূপেই আবির্ভূত হয় ;

(৩) আর স্বভাবতই ১-নম্বর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, নূতন সত্যটিও একটি আংশিক সত্য মাত্র, পরবর্তী বৃহত্তর সত্যের সোপান বিশেষ ;

(৪) পূর্ণ বা শেষ সত্য বলে কিছু নাই। পূর্ণ সত্য শুধু বিবর্তিত হয়ে চলে। রেডিয়াম→(হিলিয়াম)+রেডিয়াম-A→(হিলিয়াম)+রেডিয়াম-B···এই প্রক্রিয়াতে কেবল এইটুকু প্রমাণিত হল যে, পরমাণুর অক্ষয়ত্বের ধারণার দিন ফুরিয়ে গেছে, ড্যাল্টনের তত্ত্বকে সংশোধিত করে আপাতত লমনসভের মত লিখতে হবে :

রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সমস্ত বস্তুর মোট ভর (**mass**), প্রতিক্রিয়ান্তে উৎপন্ন নূতন বস্তু বা বস্তুনিচয়ের ভরের সঙ্গে হুবহু এক থাকে (পৃ ২০)। অথবা লিখতে হবে,—সাধারণভাবে বস্তুজগতের ক্ষয় নাই, বস্তুকে নূতন করে সৃষ্টি করাও চলেনা, বিশ্বে বস্তুর মোট ভরপরিমাণ সুনির্দিষ্ট,—যেমন প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিকবৃন্দ ভেবেছিলেন। আপাতত লিখতে হবে বললাম এইজন্যে যে আপাতত তাই জানা যাচ্ছে। কিছুই জোর করে বলা চলছেনা। যখন দেখা গেল ঐ তেজের তত্ত্বটি কোথা থেকে হঠাৎ উড়ে এসে পরমাণুর তত্ত্বকে ভেঙে ফেলল, তখন ভর-তত্ত্বকেও সে যে আক্রমণ করবেনা, তা নিঃসন্দেহে বলা যায় কি করে? কারণ ভরতত্ত্ব অনুযায়ী, রেডিয়াম-পরমাণু ভেঙ্গে রেডিয়াম-ভর থেকে র‍্যাডন এবং হিলিয়ামের ভর

স্বাভাবিকভাবেই বেরিয়ে এলেও, ঐ তেজকণিকাগুলি যে কিভাবে কোথা থেকে এমন অবিচ্ছিন্ন ধারায় আর এমন উদ্ধত ভঙ্গিতে ক্রমাগতই দলে দলে ধেয়ে আসছে তা' এখনও জানতে পারা গেলনা। কিংবা একথা কি বলা যায় যে, প্রমাণের মধ্যে যাকে পাচ্ছি, যে ক্রমাগতই ক্ষয় পেয়ে চলেছে, অথচ কিনা যাকে প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছেনা—সেই ভর, আর মানুষের নয়নেন্দ্রিয়ে এসে যে ক্রমাগতই তার নিজ সত্তার জানান দিয়ে চলেছে—সেই তেজ, ওরা একই বস্তুসত্তা? যুক্তি তো নিশ্চিতভাবেই এই সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দিচ্ছে। কিন্তু শত শত বৎসর যাবৎ মানুষ যা জেনে এসেছে, যা তার সহস্র সহস্র বর্ষের সংস্কার, তার অনুশাসন যে ভিন্ন প্রকার! বৈজ্ঞানিক যুক্তি আর অবৈজ্ঞানিক সংস্কার, এদের দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

সে দ্বন্দ্ব যেন বাস্তব রূপই গ্রহণ করল। ভরতত্ত্ব আর তেজতত্ত্ব একেবারে মুখোমুখী এসে দাঁড়াল। আমাদের পার্থিব পদার্থ অনুসন্ধানের মূল প্রশ্নটিও তাই স্পষ্টরূপ নিয়ে জেগে উঠল। সমাধানের আশার আলো দিগন্ত ভেদ করে আভাসিত হল। খুব হুঁশিয়ার হয়ে চলতে হবে বিজ্ঞানীকে। একদিকে তাঁর ভরের বিপুল শৈলমালা—উত্তুঙ্গ, কঠোর। আর একদিকে তাঁর তেজের অকূল মহাসমুদ্র—উর্মিসংক্ষুব্ধ, ভয়াল। মহাজিজ্ঞাসার নিবৃত্তি-বাসরে আর এড়িয়ে চলা চলবেনা কাউকে। 'ক্ষুরধার নিশিত পথে' মহাযোগী বিজ্ঞানীর আবার যেন নতুন ভঙ্গিতে যাত্রা শুরু হল।

গামারশ্মি তেজরূপেই প্রকাশমান। তার ভরসত্তার পরিচয় মেলেনি। কিন্তু বিটা এবং আল্‌ফা তাদের ভর আর তেজসত্তা নিয়েই ধরা পড়েছে। অবিচ্ছেদ্য হলেও ওদের দুটি সত্তাই স্পষ্ট। কিন্তু বিটা (ইলেক্ট্রন)-কণিকার অনেকটা পরিচয়ই ইতিমধ্যে মিলে গেছে। তাছাড়া, তেজসত্তার দিক থেকে উভয়েই তুল্যমূল্য হলেও, ভরসত্তার দিক থেকে আল্‌ফারই অধিক গুরুত্ব। এদিকে তেজের চাইতে ভরটিই আমাদের কাছে স্পষ্টতর এবং সুনির্দিষ্ট। সুতরাং তাকে হয়ত আরও সহজে ধরা যাবে। বিজ্ঞানী তাই প্রথম থেকেই আল্‌ফা-কণিকাটিকে ধরবার চেষ্টা করলেন। তিনি তাদের এক একটিকে পৃথকভাবে বিচ্ছিন্ন করে এনে তাদের একক সত্তাগুলিকে গণনার মধ্যেই এনে দেখতে চান।

বিজ্ঞানী ক্রুক্‌স্ যেন মানস নেত্রে ওদের প্রত্যক্ষ করলেন। কিন্তু পূর্বেই বলেছি (পৃ. ২০৪, ২০৭) এ-দর্শন কোনো প্রাচীন যোগীর একক দর্শন নয়। দেখা মাত্রেই তিনি কাজে লেগে গেলেন;—আর একটি সার্বজনীন চক্ষু বানিয়ে তুলবেন। (স্পিন্থারিস্কোপ-) যন্ত্র বানিয়ে তিনি সকলকেই প্রতিপ্রভ-বস্তুর উপর আপতিত আল্‌ফা-কণিকার প্রত্যেকটিরই পৃথক দ্যুতি প্রত্যক্ষ করাতে পারবেন। অথচ কতনা সরল ঐ যন্ত্রটি,

আর কত সহজ তার তত্ত্বটিও। দণ্ডায়মান একটি পিতলের সিলিণ্ডারের ঊর্ধ্বমুখে একটি বিবর্ধক কাচ (magnifying glass—যে কাচের মধ্য দিয়ে কোনো বস্তুকে খুব বড় দেখায়), নিম্নমুখে প্রতিপ্রভ জিঙ্ক্ সালফাইড বা উইলেমাইটের একটি পর্দা। পর্দার কিছু ওপরে সিলিণ্ডারের মধ্যে ওরই সমান্তরাল একটি কাঁটা। কাঁটা বা কাচ,—
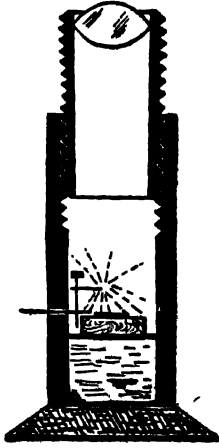
প্রয়োজনমত ওদের একটু করে ওপরে ওঠানো বা নিচে নামানোর ব্যবস্থা আছে। বাস্, আর কিছু না। এ যন্ত্র দিয়ে কাজ করা যায়ও অতি সহজে। একদা রেডিয়াম ঘটিত কোনো যৌগ যে পাত্রে ছিল, তার ভিতরের দেয়ালে এ কাঁটাটি শুধু একবার ঠেকিয়ে এনে সিলিণ্ডারের ওপরে পর্দার মধ্যে যথাস্থানে পরিয়ে দিতে হয়, আর কিছু না। তারপর যিনি আল্‌ফা-কণিকার খেলা দেখবেন, তিনি বেশ কিছুক্ষণ আঁধারে বসে রইবেন, যেন তাঁর চোখ দু'টি কিছু সময় যাবৎ আলোক-রশ্মির আঘাত থেকে বিশ্রাম পেয়ে অন্য কোনো সামান্যতম আলোরশ্মিকেও সনাক্ত করবার শক্তি সংগ্রহ করে নিতে পারে। এমন সময় যন্ত্রটিকে কাছে এনে বিবর্ধক কাচের ভিতর দিয়ে পর্দার দিকে দৃষ্টিপাত করলে যা দেখা যাবে, তার নয়নভোলানো সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হবে না কে? কণ্টকের অগ্রভাগ থেকে রেডিয়ামের বিকিরণ চলবে, আর প্রতিপ্রভ পর্দার ওপর আপতিত আল্‌ফা-কণিকার পীতাভ সবুজরূপ ঠিকরে পড়বে। আঁধার নিশীথিনীর তারাভরা আকাশের মাধুরী নিয়ে গৌরবিণী হয়ে উঠবে প্রতিপ্রভ পর্দা! এক একটি কণিকার এক একটি দ্যুতি। আর যেভাবে আমরা রেডিয়াম-পরমাণু সংগ্রহ করে এনেছি, তাতে একসঙ্গে অধিক পরিমাণ আল্‌ফা-কণিকার আপতনের কথাও নয়, যে তাদের কিছুতেই গুণে ফেলা যাবেনা। যদি একটু বেশি মাত্রায় আপতন হয়ও, কাঁটাটিকে একটু ওপরে তুলে দিলেই তো কতকগুলি কণিকা পর্দার বাইরে গিয়ে আঁধারে ডুবে যাবে। পর্দার ওপরের কণিকা সংখ্যা তাতে কমে যাওয়ায়, তখন তাদের গণনার কাজ সম্ভব হয়ে উঠবে। এভাবে বার বার গণনা করে একটু আধটু হিসেব কষে বিজ্ঞানীরা ঠিক করে ফেললেন যে এক গ্রাম রেডিয়াম থেকে সেকেণ্ডে প্রায় $৩\cdot৫ \times ১০^{১০}$-টি (৩৫০০০০০০০০০—৩½ হাজার কোটি) আল্‌ফা-কণিকা উঠে আসে। অর্থাৎ এক গ্রামের হাজার ভাগের এক ভাগ রেডিয়াম নিলেও প্রতি সেকেণ্ডে উৎক্ষিপ্ত অল্‌ফা-কণিকার সংখ্যাটি দাঁড়াবে ৩½ কোটি। কিন্তু মানুষ এই সর্বপ্রথম একটি স্বতন্ত্র কর্মলিপ্ত পরমাণুর কর্মকুশলতাকে প্রত্যক্ষ করতে পারল,—যে অকল্পনীয়

ক্ষুদ্র পরমাণুটির ওজন-পরিমাণ গ্রামের হিসাবে জানতে হলে কোনো একটি মাত্র অঙ্কের সংখ্যাকে ভাগ করতে হবে ১-এর পিঠে অন্তত ২৫-টি শূন্য বসিয়ে। তবুও যত ছোটই হোক না কেন, ওর যে অস্তিত্ব আছে, তার কোনো পরোক্ষ প্রমাণ নয়, ঐ স্পিন্থারিস্কোপ-চক্ষুটিতে তার একেবারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলে গেল। চক্ষুটি সার্বজনীন হয়ে গেল।

১৯০৩ সালে এ ঘটনা ঘটল। বছর পাঁচের মধ্যেই আর একটি শক্তিমান চক্ষুও বানিয়ে ফেললেন গাইগার (Hans Geiger)। কিন্তু তারও আগে ১৯০৫-এ কিন্তু আরও এমন কিছু ঘটনা ঘটল, যার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। শুধু বিজ্ঞানীমহল নয়, সারা মানবসমাজের চিন্তাজগতে যেন যুগান্তর এসে গেল। তেজস্ক্রিয়তার সঙ্গে যে বিদ্যুৎতত্ত্বটি জড়িয়ে আছে, এ আমরা বার বার প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ গামা-রশ্মি থেকে এটিও না মনে করে উপায় নেই যে, আলোকতত্ত্বটিও এদের সঙ্গে এক গভীর তাৎপর্যে যুক্ত হয়ে আছে। স্তোলেতভ্, টমসন্, লেনার্ড্ এবং প্ল্যাঙ্কের পরীক্ষাগুলি (পৃ. ২১০) থেকে সেকথা নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারা যায়। তবে প্ল্যাঙ্ক্ তাঁর তত্ত্বকে পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর আবিষ্কারের অল্পকাল পরেই ১৯০৫ খ্রী.-এ সুইস্ পেটেণ্ট্ অফিসের একজন অখ্যাত সভ্য কর্তৃক একটি জার্মান পত্রিকাতে একটি তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। তার মধ্যেই তিনি উক্ত বিজ্ঞানীবৃন্দের আলো-বিদ্যুৎ সম্পর্কিত জল্পনা-কল্পনার সুসংগত ব্যাখ্যা দান করলেন। ঐ সভ্যেরই নাম আলবার্ট আইনস্টাইন।

আইনস্টাইন প্রথমে ফ্যারাডে-ম্যাক্স্ওয়েল-হার্জের সূত্র ধরে বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গকে মাধ্যমনিরপেক্ষ অনন্যনির্ভর তরঙ্গ হিসাবে প্রতিষ্ঠা দান করেন। মাধ্যম বা ইথার-বস্তুটির ভৌতিক আকৃতি তখনও মাঝে মাঝে এসে বিজ্ঞানীবৃন্দের ভাবনাভূমিতে তার কৃষ্ণ ছায়া নিক্ষেপ করতে চাইছে। তিনি সেই বিপজ্জনক ছায়ামূর্তিটিকে অপসৃত করতে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু ইথারের সুদীর্ঘ-পোষিত সংস্কারের মেঘজালকে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করতে গিয়ে তাঁর অসমসাহসের পুরস্কার স্বরূপ তিনি যেন আর একটি অপূর্ব তত্ত্বের সন্ধান পেয়ে গেলেন। তারই সাহায্যে তিনি অসংখ্য সমস্যার সমাধান এনে দিলেন। চিন্তাজগতে যুগান্তর এসে গেল।

কিন্তু সত্যিই এবার ইথার-তত্ত্বেরও বার্ধক্য এসে পৌঁচেছে। তার বহু দিনের গুরুভার সত্ত্বেও সে আর টিকে রইতে পারলনা। প্রকৃতির অমোঘ বিধানকে অস্বীকার করবার শক্তি কারও নাই। যতই সে বহু-বিজ্ঞানীর সুদৃঢ় পোষিত দৃঢ় ধরেণা হক না কেন, এবং যতই সেই সম্মিলিত ধারণা একদা মহাশক্তিধর তত্ত্বরূপে বহু দুরূহ সমস্যারই সমাধান করে দিক না কেন, তাকে শেষ পরিণতির সম্মুখীন হতেই হয় একদা।

এই ইথার-তত্ত্বের বাল্যকালে হাইজেন্‌সের যুগে সে তত্ত্ব শত বিরোধিতা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল। তখন তার সামনে প্রচণ্ড বাধা। কিন্তু নিশ্চিত তার পদক্ষেপ। ক্রমেই সে ইয়ং-ফ্রেসনেলের যুগে যৌবনে পৌছল। তখন তার দোর্দণ্ড-প্রতাপ। কিন্তু তখনই আবার সে বহুবিধ সমস্যার সমাধান দিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে তার প্রৌঢ়ত্বকেও বরণ করে নিয়েছিল। তারপর মাইকেলসনের সময়ে এসে সে যেন কম্পমান হয়ে উঠল। তাকে তার জরাজীর্ণ অবস্থা থেকে বাঁচাবার জন্য যতই দ্বিতীয় নিউটনের আহ্বান আসুক (পৃ. ১৭৬) না কেন, সে তখন ম্রিয়মাণ। তখন সে নিশ্চিতভাবেই প্রবল গতিতে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছে। তাকে তার সেই মরণ-বরণের সহায়তা করার মধ্যেই তখন চিকিৎসার সার্থকতা। তা না হলে সে চিকিৎসক কেনই বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রাচীন নিউটন না হয়ে বিংশ শতাব্দীর আধুনিক নিউটন হতে পারবেন? মহামনীষী আইন্‌স্টাইন সেই চিকিৎসাই করলেন। গুরুভার ইথারের জগদ্দল প্রস্তরকে তিনি বিজ্ঞানীবৃন্দের শিরোদেশ থেকে নামিয়ে দিয়ে তাঁদেরকে নবোদ্ভূত তত্ত্বের নব ভার বহনে সমর্থ করে তুললেন। সে তত্ত্বই প্রকৃতি নির্দেশিত আধুনিক তত্ত্ব বা বিশেষ (বা পরিমিত—**restricted**) আপেক্ষিক তত্ত্ব (**special theory of relativity**) নামে প্রকাশ পেল।

মাইকেলসন্-মর্লির পরীক্ষা থেকে ইথার সমুদ্রকে যে পৃথিবীর সঙ্গে ভ্রাম্যমাণ মনে করতে হয়েছিল তার কারণ বিজ্ঞানীবৃন্দের ইথারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দৃঢ়বদ্ধ ধারণা। তা না হলে আলোর গতি যদি সবদিকেই সমান হয় এবং সে গতি যদি অন্য গতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে থাকে, তাহলে ইথারের অস্তিত্বের আর কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকেনা। ব্যাপারটি অনুধাবন করা যায়। যদি কারও অবস্থান-ক্ষেত্র বা আবাস-পিঞ্জরের সঙ্গে কোনো আলোকের উৎসটি শক্তভাবে বাঁধা থাকে তাহলে তার কাছে ঐ আলোর গতি হবে সেকেণ্ডে ৩ লক্ষ কি. মি.। কিন্তু অন্য কোনো পৃথক অবস্থান-ক্ষেত্র বা কাঠামো থেকে অন্য কোনো পর্যবেক্ষক যখন ঐ প্রথম দর্শককে গতিযুক্ত দেখে, তখন স্বভাবতই সে ঐ প্রথম দর্শকের সঙ্গে শক্তভাবে বাঁধা ঐ আলোকের উৎসটিকেও গতিশীল দেখবে। যদি সেই উৎস ও তার প্রথম দর্শকের সঙ্গে তাদের ইথার সমুদ্রটিও একত্রে গতিশীল থাকে তাহলে ঐ পর্যবেক্ষকটির মনে হবে যে, তার নিজের অবস্থান-ক্ষেত্র বা আবাস-পিঞ্জরের তুলনায় পূর্ববর্তী কাঠামো বা পিঞ্জরের আলোর গতিবেগটি ভিন্ন। প্রথম উৎসটি যদি দ্বিতীয় ব্যক্তির অভিমুখে ধাবিত হতে থাকে তাহলে নিশ্চয় ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে আলোর গতিবেগ আরও বেশি মনে হবে। যদি প্রথম পিঞ্জরটি বিপরীত মুখে ধাবিত হয় তাহলে ঐ গতিবেগকে আসল বেগের চাইতে কম মনে হবে। কিন্তু মাইকেলসন-মর্লির পরীক্ষা থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছে যে, আলোর উৎসটি

যেকোনো আবাস পিঞ্জরে অবস্থান করুক না কেন, এবং সে স্থির বা গতিশীল যাই থাকুক না কেন, তার গতিবেগ এক ও সুনির্দিষ্ট (পৃ. ১৭৫)। সে কোনও দিক বা অভিমুখের উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু আলোকরশ্মিকে ইথার অবলম্বন করে চলতে হলেই আলোকের দিক পরিবর্তনের সঙ্গে পর্যবেক্ষকের চোখে তার গতিবেগও পরিবর্তিত হয়ে যাবে। আলোকটি ঐ পর্যবেক্ষকের অভিমুখে এলে অধিকতর দ্রুত বেগসম্পন্ন এবং বিপরীত মুখে চললে অপেক্ষাকৃত কম বেগসম্পন্ন হবেই। কিন্তু তা তো ঘটছেনা। পর্যবেক্ষকের চোখে সকল অভিমুখেই তার গতিবেগ তো একই। কি করে তা সম্ভব হয়? সত্যই এক বিষম সমস্যা বটে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তার সমাধান এসে গেল। ১৯০৫ খ্রী.-এ জুরিচ্ থেকে আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ-আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রকাশ করলেন। তা থেকে জানা গেল, কোনো পৃথক কল্পিত মাধ্যম-পদার্থকে অবলম্বন করেই যে আলোক-রশ্মি ধাবিত হতে থাকে, তা মনে করবার বাধ্যবাধকতা নাই। ইথারের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের কোনো উল্লেখ না করেই তিনি প্রমাণ করলেন:

(১) শূন্যমার্গে আলোকের গতিবেগ সর্বদাই সুনির্দিষ্টভাবে এক এবং অপরিবর্তনীয়;

(২) দুটি কাঠামো বা পিঞ্জরের মধ্যে একটিব তুলনায় অন্যটি যদি সমবেগ-সম্পন্ন (of uniform velocity) হয় (অর্থাৎ সরল রৈখিক পথে একই বেগে এগিয়ে চলে), তাহলে উভয় পিঞ্জরেই প্রাকৃতিক ঘটনাবলী একই বিধান বা একই নিয়ম মেনে চলবে, এবং তাদের কারও পক্ষে কারও চূড়ান্ত বা পরম গতিটি কত তা বুঝে ওঠা সম্ভব হবেনা।

প্রথম সূত্রটির দ্বারা ইথারের শূন্য-সৌধটি চিরতরে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সুতরাং আলোর বা বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গের গতি মাধ্যম-নিরপেক্ষ এক অনন্যনির্ভর প্রচণ্ড শক্তিরূপে প্রতীয়মান হল।

কিন্তু এত শক্তি কার? শুধু মাত্র তরঙ্গের? ফ্যারাডের সেই বলরেখার কথা স্মরণ করতে হয় (পৃ. ১৪৭)। সেগুলি কি বলপদার্থ নয়? আর সেই বল বা শক্তি যে বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্র থেকে আবির্ভূত হয়ে উঠে (পৃ. ১৪৭-৪৮)! তাহলে নিশ্চয় বলা যায় যে উপরোক্ত ঐ শক্তি নিশ্চয় শুধুমাত্র তরঙ্গের নয়। সে শক্তি বিদ্যুচ্চৌম্বক পদার্থেরই, কিন্তু তা প্রকাশ পায় ঐ পদার্থেরই তরঙ্গভঙ্গি দিয়ে। সুতরাং বিদ্যুচ্চৌম্বক শক্তিটি নিশ্চয়ই পদার্থগত। অর্থাৎ আলোদেহটি নিছক তরঙ্গগত বা ইথার-তরঙ্গগত নয়। সে নিজেই পদার্থগত। তবে হয়ত সে পদার্থকে তেজপদার্থই বলতে হয়।

আইনস্টাইন প্ল্যাঙ্ক্-তত্ত্বের সমর্থন পেলেন। তিনি বিচার করলেন, আঁধারের মধ্যে ধাতু সন্নিহিত শূন্য-অঞ্চলে পরিবহণ চালাতে পারেনা, অথচ ধাতুর ওপর আলো

এসে পড়লে সেখান থেকে ইলেক্ট্রন উৎক্ষিপ্ত হয়ে ঐ অঞ্চলকে পরিবাহী করে তুলে (পৃ. ২১০),—এ থেকে ধরা যেতে পারে যে, ইলেক্ট্রনরা ধাতু সংলগ্ন অঞ্চলে সর্বদাই ঘুরে বেড়ায়না। ওরা ধাতুদেহে বদ্ধ হয়ে থাকে। এক একটি কণিকা নিশ্চয়ই এক একটি তেজ-বন্ধনে বাঁধা থাকে। তাকে ধাতু থেকে বিচ্ছিন্ন করে টেনে বার করতে হলে ঐ পূর্বোক্ত প্রকারের এক একটি তেজপরিমাণের, বা তেজপদার্থ-কণিকার দরকার হয়। আলোকের দেহটি নিশ্চয় সেই রকম এক একটি প্রয়োজনীয় তেজপরিমাণ দিয়ে গঠিত। তারাই এক একটি সম-পরিমাণের তেজবিশিষ্ট ইলেক্ট্রনকে ওভাবে ধাতু থেকে বন্ধনমুক্ত করে তুলতে পারে। আলোরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুব ছোট। এক সেন্টিমিটারের অযুত ভাগের চাইতেও ছোট। এই রকম একটি অতি ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে তার তেজটি সংহত হয়ে থাকে বলেই তার পক্ষে এক একটি অতি ক্ষুদ্র ইলেক্ট্রন-কণিকার গায়ে ধাক্কা মেরে তাকে সেখান থেকে ঠেলে তোলা সম্ভব হয়। রশ্মিতরঙ্গটি কণিকাধর্মী না হলে তার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব হতনা। প্ল্যাঙ্ক্ ঠিকই ধরেছিলেন,—ওকে কণিকা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? সুতরাং আইনস্টাইন বললেন, আলোর বিকিরণ ঘটনাটি আসলে তেজপরিমাণ বা তেজকণিকার ধারাপ্রবাহ ব্যতিরেকে অন্য কিছু নয়। এক রকমের আলোর অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রত্যেকটি তেজকণিকা হুবহু এক। তারা প্রত্যেকেই একই পরিমাণ তেজ বহন করে। এক একটি পরিমাণ যেন এক একটি তেজগুচ্ছ। প্ল্যাঙ্ক্-তত্ত্বের মূল নীতিকে বিকশিত করে তিনি বললেন, ঐ গুচ্ছ গুচ্ছ তেজপরিমাণের উল্লম্ফনের মারফতেই আলোকের বিকিরণ ঘটে। অনেক পরে ১৯২৬ খ্রী.-এ লিউই (Gilbert N. Leuis—1875-1946) ঐরূপ এক একটি তেজগুচ্ছ বা তেজপরিমাণ-সংঘের নাম দেন 'ফোটন'। আইনস্টাইন কিন্তু তার বহু পূর্বেই জানিয়ে রাখলেন যে, আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বড় হলে তার ঐ তেজসংঘের (ফোটনের) তেজ কমে যায়। ধাতুর গায় আটকা পড়া ইলেক্ট্রনরা স্বভাবতই ঝিমুতে থাকে, এবং তখন ঐ তেজসংঘটি ধাতুতে বদ্ধ একটি ইলেক্ট্রনকে ঝাঁকিয়ে তুলতে পারেনা। সেক্ষেত্রে আলোককে খুব জোরালো করে তুলতে নিক্ষেপক-ফোটনের সংখ্যা অবশ্যই বেড়ে যায়, কিন্তু তাতে কিছুই এসে যায়না। তাতে একটি মাত্র ফোটন একটি মাত্র ক্ষুদ্র ইলেক্ট্রনের গায়ে পৃথকভাবে লাগতে পারেনা। তবে আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ক্ষুদ্রতর হলে তার ফোটনের তেজ বেড়ে যায়। সে তখন তার ক্ষুদ্রত্বের জন্যই সহজে এক একটি ইলেক্ট্রনের গায়ে লেগে তার ঝিমুনি ভেঙে তাকে চাঙ্গা করে তুলে, তার ধাতু-বন্ধন ঘুচিয়ে দেয়। সেক্ষেত্রে কিন্তু আলোটি যত জোরাল হয়, প্রতি সেকেণ্ডে নিক্ষিপ্ত ফোটন সংখ্যা ততই বেড়ে যাওয়ায় তাদের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত ইলেক্ট্রন সংখ্যাও ততই বেড়ে যায়।

সুতরাং আইনস্টাইন ঘোষণা করলেন যে এই রকমের একটি তেজগুচ্ছ (বা ফোটন) ধাতুর উপর এসে পড়লে সেটি ঐ ধাতুতে শোষিত হয়ে গিয়ে একটি ফটো-ইলেক্ট্রনকে সেখান থেকে উৎক্ষিপ্ত বা বিচ্ছুরিত করে দিতে পারে। ফোটনের তেজ তখন ইলেক্ট্রনের গতিতেজে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তার ফলে ইলেক্ট্রনরা উৎক্ষিপ্ত হয়েই ছুটে চলতে থাকে। সেই গতিবেগ মেপে দেখা যায়। তার একটি সীমা আছে এবং উৎক্ষেপক-ফোটনটির তেজ বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যও একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত না পৌছলে তার দ্বারা ফটো-ইলেক্ট্রনের উৎক্ষেপণ সম্ভব হয়না। ঘটনাটি ফটো-বিদ্যুৎ ঘটনা (**Photo-electric effect**) নামে আখ্যাত হল।

কিন্তু জানা গেল যে, ভরাত্মক বস্তু বা তেজাত্মক বিদ্যুতের মত আলো বা বিকিরণ-তেজটিও কণিকাধর্মী। দেখা গেল যে, অবিমিশ্র বা সমসত্ত্বদেহ (যে রশ্মির মধ্যে বিভিন্ন রঙের রশ্মি-মিশ্রণ নাই) বেগনি রঙের আলো ধাতুর উপর গিয়ে পড়লে উৎক্ষিপ্ত ইলেক্ট্রন কণিকার মধ্যে সে যে গতিবেগ সঞ্চার করতে পারে, সমসত্ত্বদেহ লাল রঙের রশ্মি তা পারেনা। সে পারে ঐ বেগের অর্ধেক বেগ সৃষ্টি করতে। এ থেকে আবার বুঝতে পারা যায় যে, তেজপরিমাণ বা ফোটন-তেজটি নির্ভর করছে আলোর রঙের উপর। বা বলতে পারি, সমসত্ত্বদেহ এক একটি রঙের আলোর তেজফোটনগুলি সব একই প্রকার এবং বিকীর্ণ আলোর ফোটন-তেজের বা তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করেই আলোকের এক একটি বর্ণ ফুটে উঠতে থাকে। সূর্য-বর্ণালির যে সাতটি বর্ণ বা সাত প্রকারের তরঙ্গদৈর্ঘ্য মানুষের চোখে ধরা পড়ে, তার প্রান্তিক বর্ণ দুটির মধ্যে লাল রঙের আলোর তেজ বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যটি অন্য প্রান্তের বেগনি রঙের আলোর তেজ বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অর্ধেক মাত্র। তবে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে যেমন আলোকের তেজগুচ্ছ বা ফোটনগুলি ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে, বিদ্যুৎপরিমাণ জ্ঞাপক কণিকাগুলি (ইলেক্ট্রন) কিন্তু সে রকমের নয়। তারা সব সমপরিমিত।

তাহলে বিদ্যুতের মত আলোর দেহটিও সত্য সত্যই কণিকা দিয়ে গঠিত, যেমনটি মনে করেছিলেন মহাবিজ্ঞানী নিউটন? কিন্তু নিউটনের তত্ত্ব তো আজ আরও তাৎপর্য মণ্ডিত হয়ে উঠল। আলোক কেবল এক অশরীরী একটানা পদার্থধারা মাত্র নয়। আর পাঁচ দশটি বস্তুর মত তারও পরিমাণ আছে। তার কণাকাগুলিই তার সেই পরিমাণকে প্রকাশ করে দিচ্ছে। শুধু কি তাই? সে-পরিমাণেরও আবার কত প্রকার বিভিন্নতা বা বৈচিত্র্য! আমরা জানি ভরাত্মক পার্থিব বস্তুমাত্রেরই পরিমাণ থাকে। আবার দেখেছি, আল্‌ফা বা বিটা বিদ্যুৎকণিকাগুলিরও ভর আছে এবং পরিমাণও আছে। এখন দেখছি আলোরশ্মিরও পরিমাণ আছে। তাহলে তারও কি ভর আছে নাকি? ভর কি ঐ গামা-রশ্মিরও আছে?

জাগতিক সকল দ্রব্যেরই পরিমাপ থাকলেও সাধারণত দেখা যায় যে তাদের সে পরিমাণটি দু'ভাবে প্রকাশ পায়। জল বায়ু প্রভৃতি কতকগুলি বস্তুর পরিমাণ একটানা প্রবাহে পরিবর্তিত হয়ে নিজেদের পরিচয় দেয়। আবার জনসংখ্যা প্রভৃতি কতকগুলির পরিমাণ কাটা কাটা বা ছাড়া ছাড়া ভাবে পরিবর্তিত হয়ে স্বপরিচয় জ্ঞাপন করে,—তাদের ক্ষুদ্রতম সত্তাগুলিকে আর বিভক্ত করা যায়না। এই ক্ষুদ্রতম সত্তাগুলিকে এক একটি বিশেষ বস্তু-পরিমাণের এক একটি প্রথম বা প্রাথমিক পরিমাণ (**elementary quantum**) বলা চলে। কতকগুলি ভৌত পরিমাণ এযাবৎ-কাল একটানা প্রবাহের মারফতে নিজেদের জানান দিয়ে আসলেও, জানা যাচ্ছে যে তারাও আসলে প্রথম-পরিমাণগুলির সমষ্টি মাত্র। যেমন হাইড্রোজেন গ্যাস বা বিদ্যুতের প্রবাহ। এদেরও ভৌত পরিমাণ (পরমাণু ও ইলেক্ট্রন) বা তার পরিবর্তনগুলি একটানা প্রবাহে প্রকাশ পায়না। সে পরিবর্তন ওদের প্রথম-পরিমাণগুলির উল্লম্ফন রীতিতেই প্রকাশমান হয়। বিদ্যুতের প্রবাহ তো ঋণাত্মক ইলেক্ট্রন-কণিকার সমষ্টিমাত্র। সুতরাং বিদ্যুৎ-তেজও বিচ্ছিন্ন কণিকা দিয়ে গঠিত। সে তেজ-প্রবাহও তাহলে একটানা নয়, কাটা কাটা বা ছাড়া ছাড়া। কিন্তু বিদ্যুৎকণিকা এত ক্ষুদ্র যে মানুষের চোখে তার প্রবাহের অন্তর্বর্তী বিচ্ছিন্নতা ধরা পড়া কখনই সম্ভব নয়। এভাবে পরমাণু বা ইলেক্ট্রনের তত্ত্ব থেকে ধরা পড়ে যে, ভৌত পরিমাণগুলির পরিবর্তন একটানা নয়, ছাড়া ছাড়া, উল্লম্ফনজনিত। বর্তমানে আলোকতত্ত্বের মধ্যেও এই তত্ত্বটির সন্ধান মিলে যাওয়ায় তার কণিকা-ধর্ম সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। অর্থাৎ মনে করতেই হল যে ঐ কণিকাটিকে যতই তার তেজের পরিচায়ক বলে মনে করা যাক না কেন, সে তার ভর-পরিমাণও। মহামনীষী আইনস্টাইন তাঁর পূর্বগামী বিজ্ঞানীবৃন্দের দ্বারা প্রকাশিত তত্ত্বসূত্র ধরে এ সম্বন্ধেও নিশ্চিত অভিমত ব্যক্ত করলেন। তেজ আর ভরকে তিনি একেবারে অঙ্ক-সূত্রেই গ্রথিত করে দিলেন।

১৮৮১ খ্রী.-এ জে. জে. টমসন সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে একটি তড়িদাহিত পরিবাহী-গোলক কোনও সরলরেখা ধরে চলবার সময় এমন ভাব দেখায় যে মনে হয়, ঐ সময় ওর ভর একটু বেড়ে গিয়েছে, আর ঐ ভরটি (m) হয় ওর বিদ্যুৎক্ষেত্রের বিদ্যুৎশক্তির (E) $4/3c^2$-গুণ (c = আলোকের গতি)। অর্থাৎ $m = 4E/3c^2$, বা $E = \frac{3}{4} mc^2$। ১৯০০ খ্রী.-এ পয়েনকেয়ার (**Henri Poincaré—1854-1912**) লক্ষ্য করেন যে, বিদ্যুচ্চৌম্বক শক্তির মধ্যে সম্ভবত তেজ-ঘনাঙ্কের (**energy density**) $1/c^2$-গুণ ভর-ঘনাঙ্ক (**mass density**) লুকিয়ে থাকে। অর্থাৎ ঐ শক্তিকে E ধরলে সূত্রটিকে এভাবে লেখা যায়:

$$m = \frac{E}{c^2}, \text{ বা, } E = mc^2$$

পরের বছর ১৯০১-এ কাউফ্‌ম্যান (W. Kaufmann) একটি ইলেক্ট্রনের ভর এবং আধানের সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে দেখলেন, প্রচণ্ড গতির ক্ষেত্রে ওর ভর $m/\sqrt{1-w^2/c^2}$-সূত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে গতির সঙ্গেই বেড়ে চলে। ১৯০৪ সালে লরেঞ্জ্‌ (Hendrik Antoon Lorentz—1853-1928) ইলেক্ট্রনের গতিহীন এবং গতিশীল অবস্থার ভরকে যথাক্রমে m_0 এবং m ধরে ঐ সূত্রটিকে এভাবে বিকশিত করলেন : $m=m_0/\sqrt{1-(w/c)^2}$ - এ থেকে $c^2=m^2w^2/m^2-m_0^2=E/m$, অর্থাৎ $E=mc^2$ (m—গ্রাম ; c—সেন্টিমিটার) সূত্রটি বেরিয়ে আসে। ১৯০৫ খ্রী.-এ আইনস্টাইন ঘোষণা করলেন, যখন কোনো বস্তু বিকিরণের মারফতে তেজক্ষয় করে থাকে তখন তার হ্রাসপ্রাপ্ত ভর সত্যিসত্যিই শক্তির $1/c^2$-গুণ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ $E=mc^2$, এই সমীকরণটি কার্যকরী থাকে। তিনি আরও জানালেন যে, বিকিরণ মারফতেই যে শক্তিব্যয় ঘটবে এমন কোনো কথা নয়। পয়েনকেয়ারের সঙ্গে মতৈক্যে তিনি ব্যাপকভাবেই সিদ্ধান্ত করলেন, যেকোনো বস্তুর ভরই তদ্‌বিধৃত শক্তিপরিমাণের যথার্থ নির্দেশক। অর্থাৎ যদি কোনো বস্তু থেকে যে-কোনো ভাবেই হোক E-আর্গ পরিমাণ শক্তি ব্যয়িত হয়ে যায়, তাহলে তার ভরও E/c^2-গ্রাম কমে যাবে। ১৯০৮ সালে লিউইও বিকিরণ-চাপ তত্ত্বের সাহায্যে প্রমাণ করলেন যে এই সূত্র অনুসারেই দীপ্যমান-তেজ (radiant energy) শোষণ করেও বস্তুর ভর বেড়ে যায়। $E=mc^2$ সমীকরণ অনুসারেই যে, কোনো বস্তুর ভর তার অন্তর্গত বিধৃত তেজের পরিমাপক, এই মহাসত্যের তত্ত্বগত ভিত্তি স্থাপিত হল। অর্থাৎ ভর ও তেজের সম্বন্ধ শুধু নয়, আপাতত বলা চলে তত্ত্বের সাহায্যে ওদের একত্বও অনুমিত হল।

অ্যারিস্টট্‌ল্‌ বলেছিলেন (পৃ. ৭, ১৪) যে, শক্তি প্রয়োগ করলেই তবে কোনো বস্তু গতিবান হতে পারে। অর্থাৎ গতিবেগ সৃষ্টির জন্য বহিঃশক্তির প্রভাব অনিবার্য। দু' হাজার বছর পরে গ্যালিলিও অ্যারিস্টটলের ভাবাবেগের স্থলে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ প্রয়োগ করে জানিয়েছিলেন (পৃ. ১৫) যে, বস্তুমাত্রেই গতিশীল এবং এই গতি কোনও বহিঃশক্তির উপর নির্ভর করেনা ; বহিঃশক্তি কেবল তার ঐ গতিবেগটি পরিবর্তিত করে দেয়। নিউটন এ মতকে প্রতিষ্ঠিত করে (পৃ. ১৫) দেখিয়ে দেন যে, বহিঃশক্তির সঙ্গে গতিবেগের কোনো সম্বন্ধ নাই। বহিঃশক্তির সঙ্গে সম্পর্ক আছে গতিবেগের পরিবর্তনের সঙ্গে। মাটিতে পড়বার সময় ঢিলের যে গতিবেগ বৃদ্ধি ঘটে তার কারণ মহাকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। তবে এই বহিঃশক্তি কেবল গতিবেগটিকে নয়, গতির দিকটিকেও পরিবর্তিত করে দিতে পারে।

এ কথার সত্যতা আমরা অন্যভাবে বুঝতে পারি। মানব মস্তিষ্কে প্রাকৃতিক বিবর্তনের ধারায় বহিঃশক্তি প্রয়োগ করে অ্যারিস্টটল্ এক বিপুল পরিবর্তন সাধন করে দিয়েছিলেন। তার ফলে ভাবাবেগ-প্রাধান্য বিস্তার লাভ করায় মানব চিন্তার তথা মানব সভ্যতার গতি ব্যাহত হয়ে ভিন্ন মুখ ধরেছিল। কিন্তু প্রায় দু'হাজার বছর পরে পুনরায় বহিঃশক্তি প্রয়োগ করে গ্যালিলিও আবার সেই গতিবেগ এবং তার অভিমুখকে প্রাকৃতিক সত্যের অনুসারী করে পালটে দিয়ে নূতন ঝোঁক সৃষ্টি করে দিলেন। অ্যারিস্টটল্-মতবাদের বাধা অপসৃত হওয়ায় সভ্যতার ধারা যেন নববেগ বা প্রাকৃতিক আবেগ প্রাপ্ত হওয়ার পথে এগিয়ে চলল। প্রাকৃতিক সেই ঝোঁক বা আবেগ বশে নিউটন যেন সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেন। তাঁর কাছে দু'টি সত্য ধরা পড়ল যে (১) গতিবেগের পরিবর্তনটি বহিঃপ্রযুক্ত বলের উপর নির্ভর করেই ঘটে থাকে, বল বাড়ালে গতিবেগ বাড়ে; অর্থাৎ ঐ পরিবর্তনটি বলের সমানুপাতী; (২) দুটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণী শক্তি কাজ করে তা তাদের দূরত্বের উপর নির্ভর করেই করে, দূরত্ব দু'-গুণ বা তিন-গুণ বাড়লে আকর্ষণী শক্তিও যথাক্রমে চার-গুণ বা ন'-গুণ কমে যায়। অর্থাৎ ঐ শক্তি দূরত্বের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতী। প্রথম নিয়মটি গতির নিয়ম (**law of motion**), এবং দ্বিতীয়টি মহাকর্ষের নিয়ম (**law of gravitation**) নামে পরিচিত। একযোগে এ দু'টি দিয়েই তবে গতির নিশানা পাওয়া যায়। নিউটন বলেছিলেন যে,—পতনশীল প্রস্তর খণ্ড, কিংবা চন্দ্র গ্রহাদিরও যে গতি তা সবই বিশ্বজনীন মহাকর্ষ জনিত।

কিন্তু তাই বলে প্রথম তত্ত্বের বল এবং দ্বিতীয় তত্ত্বের মহাকর্ষ এক জিনিস নয়। সত্যের উজ্জ্বলতর প্রভা চোখে এসে লাগতে আরও তিন শ' বছর লেগে গিয়েছে। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন তাঁর বিপ্লবাত্মক আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করে সমগ্র মানবচিন্তা তথা মানব সভ্যতার প্রগতিতে যুগান্তর এনে দিলেন। তিনি স্পষ্টই ধরিয়ে দিলেন যে ঐ বলটি কিন্তু ভরের উপর নির্ভরশীল। একই বল প্রয়োগ করলে একটি স্থির খালি ও হালকা গাড়ি যতদূর এগিয়ে যেতে পারে, একটি স্থির ভর্তি ও ভারি গাড়ি ততদূর যেতে পারেনা। সুতরাং বোঝা যায় যে, ভর বাড়লে গতিবেগ কমে যায় এবং ভর কমলে তা বেড়ে যায়। মনে হতে পারে যে, যার ভর বেশি তার ওপর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব বেশি পড়ে বলে ঐ রকমটি হয়। কিন্তু গ্যালিলিওই পরীক্ষা করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে বিভিন্ন ভরের বস্তুকে একই উচ্চতা থেকে নিচে ফেলে দিলে মাটিতে পড়তে তাদের সময় লাগে একই। সুতরাং মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটি কোনো মতেই ভরের উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু তাহলে ভর বেশি হলে যে একটি জিনিসের ভার বেড়ে যায়, তার কারণ কি? তার কারণ বলা যেতে পারে যে, ভর দু'-রকমের,

—(১) মাধ্যাকর্ষণীয় ভর (**gravitational mass**) এবং (২) জাড্য ভর (**inertial mass**)। এ দু'টি ভর সমান বলেই প্রথমটি বাড়লে দ্বিতীয়টিও বেড়ে যায় এবং তার ফলে ওজন বা ভারও বেড়ে যায়। অথচ দু'টি ঠিক এক জিনিস নয় বলেই একই উচ্চতা থেকে বিভিন্ন ভরযুক্ত বিভিন্ন বস্তুর পতনকালটি একই থেকে যায়। বস্তুত, ভূমি না থাকলে কোনো বস্তুর উপর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবও থাকেনা এবং তার তজ্জনিত কোনো ভারও থাকেনা। তখন তার মাধ্যাকর্ষণীয় ভরও মূল্যহীন বা ব্যর্থ হয়ে পড়ে। অথচ তখনও কিন্তু তার জাড্য-ভরটি থেকে যায়। বাইরে থেকে প্রযুক্ত বল সেই জাড্য-ভরের উপর নির্ভর করেই প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বস্তুর মাধ্যাকর্ষণীয় ভর থাকার জন্যই পৃথিবী সকল বস্তুকেই সমানভাবে আকর্ষণ করে চলেছে। কিন্তু বস্তুর গতিবেগটি তার জাড্য-ভরের উপর নির্ভর করেই সংঘটিত হয়। অথচ একই উচ্চতা থেকে বিভিন্ন ভরযুক্ত পতনশীল বস্তুগুলির আপতন-কাল যখন একই লাগছে তখন ধরে নিতেই হয় যে, কোনো বস্তুর মাধ্যাকর্ষণীয় ভর আর জাড্য-ভর একই। সুতরাং দু'টি তত্ত্বকে এক যোগে নিয়ে বলা চলে যে মাধ্যাকর্ষণীয় ভরের বৃদ্ধি ঘটলে একটি পতনশীল বস্তুর ত্বরণ (গতিবেগ বৃদ্ধির হার) বেড়ে গেলেও, জাড্য-ভরের বৃদ্ধিতে সে বেগ কমেই যায়। অর্থাৎ এক প্রকারের ভর বৃদ্ধিতে যে-পরিমাণ গতিবেগ বাড়ার কথা, একই সঙ্গে অন্য প্রকারের ভরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় (উভয় প্রকার ভর এক বলে) তৎসঙ্গে সেই পরিমাণ গতিবেগ কমে গিয়ে হ্রাস ও বৃদ্ধি পরস্পরে কাটাকাটি হয়ে যায় এবং সকল বস্তুরই পূর্বোক্ত আপতন-কালটি একই থেকে যায়।

এইভাবে এ তত্ত্বের সাহায্যে ভরের সঙ্গে গতিবেগ বা গতিতেজের নিবিড় সম্পর্কটিও প্রকাশ হয়ে পড়ল। তাহলে যতদূর মনে হচ্ছে, ভর আর বিদ্যুৎতেজ যেমন একই তত্ত্ব, ভর আর গতিবেগও তেমনি অভিন্ন তত্ত্ব। অর্থাৎ ভর=বিদ্যুৎ, এবং ভর=গতি। বা, বিদ্যুৎ=গতি (তু., পৃ. ১৪৬-৪৯), বাস্তবিকই এখানে বিস্ময়ও যেন বিস্মিত হয়। ওদিকে আবার তাপতেজের সঙ্গেও যে গতিতেজের একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে তাও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি (পৃ. ৪৬)। কিন্তু এ প্রসঙ্গ আপাতত থাক। যতটুকু জানা যাচ্ছে, তাতে বেশ বোধ হচ্ছে, ভর আর তেজ কিছু পৃথক তত্ত্ব নয়।

ওরা তাহলে এক! আর ওরা বা ঐটিই তাহলে আমাদের সুচির-অনুসংহিত বা অনুসন্ধেয় একমাত্র পার্থিব পদার্থ! ভাবতেও সর্বাঙ্গে শিহরণ জাগে। কিন্তু ও তো কেবল তত্ত্বদর্শন; যদিও এক্ষেত্রে দার্শনিক যিনি, তিনি প্রথমতই বিজ্ঞানী। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সকল শ্রেণীর সকল মানুষের মন জুড়ে এক জগৎজোড়া অস্তিত্ব

নিয়ে বিজ্ঞানমানসের সুমহান অভ্যুত্থান ঘটে উঠতে পারেনি। সুতরাং ব্যক্তিগত বিজ্ঞানীর ভ্রান্তি-সম্ভাবনাও দূরীভূত হয়নি। আমরা জানি (তু., পৃ. ১৮২, পরে দ্রষ্টব্য) ১৯০৩ সালে টমসনের মত এতবড় বিজ্ঞানীও পরমাণুর গঠন সম্বন্ধীয় পরিকল্পনার মধ্যে কী রকম ভাবে ভুল করে বসলেন। একথা ঠিক যে, বিজ্ঞানীর সে ভুল বাস্তবতা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কোনো কল্পনাবিলাসীর ভুল নয়। পদার্থপ্রাণ প্রাকৃতিক জগতের সমস্ত দরজাগুলি এক সঙ্গে খুলে যায়না বলেই একক বিজ্ঞানীর অদূর কল্পনা সঠিক হওয়া সত্ত্বেও সুদূর কল্পনা অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্ত হয়ে যায়। অবশ্য ভ্রান্তিই সত্যের দিকে মানুষকে এগিয়ে দেয়। কিন্তু অনভিজ্ঞ ব্যক্তির ভ্রান্তি যেখানে সে পথকে দীর্ঘায়িত করে তুলে, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার ভ্রান্তি যেন সেখানে অচিরেই সত্যশৈলের সোপানে পরিণত হয়ে যায়। পারমাণবিক গঠন সম্বন্ধে যে টমসনের সত্যদর্শন ঘটেনি, তার কারণ তখনও প্রাকৃতিক ভাণ্ডারের কতকগুলি দরজা খুলে যেতে বাকি ছিল। কিন্তু তাঁর যুক্তিগুলিও নিছক কল্পনা বিলাস ছিলনা। তিনি ভেবেছিলেন (পৃ. ১৮২), সামগ্রিকভাবে পরমাণু যখন বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ, অথচ তার মধ্যে যখন ঋণ বিদ্যুৎ-ধর্মী ইলেক্ট্রন-কণিকার অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তখন ওর সমশক্তির ধন-বিদ্যুৎধর্মী আধানকেও ওখানে থাকতেই হবে। কিন্তু যদি ঐ বিদ্যুৎও কণিকারূপের মধ্যে সংহত হয়ে থাকে, তাহলে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক বিদ্যুতের দু'টি কণিকারূপী আধানের মিশ্র সমাবেশ একটি সুস্থির সমতা (stable equilibrium) বজায় রাখতে পারেনা। সুতরাং তিনি অনুমান করলেন যে ঐ ধনবিদ্যুৎটি পরমাণুর সারা দেহেই মেঘের মত ছড়িয়ে আছে ; আর ঋণাত্মক ইলেক্ট্রনগুলির অবস্থান ওরই মধ্যে, এবং তাদের মোট বিদ্যুৎ-পরিমাণ পরমাণুটির ধন-বিদ্যুৎ পরিমাণেরই সমান।

টমসনের এরূপ চিন্তার বিশেষ কারণ ছিল। পঁচিশ বছরেরও বেশি আগে হব্‌কেনের ষ্টিভেন্‌স্‌ ইন্‌স্‌টিটিউট্‌ অফ্‌ টেক্‌নলজির মেয়ার (Alfred Marshall Mayer) কতকগুলি সেলাই করার সূচের তীক্ষ্ণাগ্রভাগকে একই জাতীয় মেরুতে চুম্বকায়িত করে তাদের প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক সোলার ছিপিতে ফুঁড়ে জলে ভাসিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। সবগুলি সূচেরই তীক্ষ্ণাংশ জলের উপরের দিকে ভাসছিল। যেই একটি বড় চুম্বকের ভিন্ন মেরু ওদের ওপরের দিকে এনে ধরা হল, নিজেদের মধ্যে বিকর্ষণী প্রভাব (দ্র., পৃ. ১২৯) সত্ত্বেও ওরা অমনি কাছাকাছি এসে বড় চুম্বকের তলায় একটি বিশেষ সজ্জায় সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তিনটি সূচ হলে সমবাহু ত্রিভুজ, চারিটি হলে বর্গক্ষেত্র, পাঁচটি হলে সুষম পঞ্চভুজ অথবা একটিকে মধ্যে রেখে বর্গক্ষেত্র— এরকম সব ক্ষেত্রের কৌণিক বিন্দুর ওপরে এসে ওরা স্থির হয়ে দাঁড়াল। জলমধ্যে নিমগ্ন মেরুগুলি বেশ দূরে থাকায় ওদের উপর বড়-চুম্বকের প্রভাব তত পড়লনা। এ

দৃষ্টান্ত থেকে টমসন মনে করলেন যে, পরমাণুর ব্যাপারেও ক্ষুদ্রায়তন সমধর্মী ইলেক্ট্রন কণিকাগুলি একটি বৃহত্তর বিরুদ্ধধর্মী বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থান করছে। সংখ্যায় কম থাকলে ওরা কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী হয়ে একটি সুষম সন্নিবেশ বজায় রাখে, আর সংখ্যায় বেশি হলে ওরা সম্ভবত বৃত্ত বা গোলকের আকার ধারণ করে। কিন্তু পরমাণু-ব্যাপ্ত ধনাত্মক বিদ্যুৎক্ষেত্রে ভেসে বেড়াবার সময় ওরা ওর মধ্যে কাঁপন জাগায়। তাইতেই পরমাণু এমন বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে। আর সেই ঘটনার ফলেই আলোক-বিচ্ছুরণ ঘটে।

বস্তুত, বিজ্ঞানীর এ পরিকল্পনা ভ্রান্তিবিলাস ছিলনা বলেই এ থেকে কতকগুলি পরিচিত ঘটনার ব্যাখ্যাও মিলে গেল। ধাতু উত্তপ্ত হলে সেখান থেকে ইলেক্ট্রন নির্গত হয়। কিংবা গ্যাসের মধ্যে বিদ্যুৎক্ষরণের ফলে মুক্ত ইলেক্ট্রন দেখা যায়। এসব ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। কারণ, পরমাণুর মধ্যে ইলেক্ট্রন না থাকলে মুক্ত ইলেক্ট্রন কোথা থেকে আসবে? আবার টমসন যে বলেছিলেন, বহিঃক্রিয়ার ফলবশত পরমাণুর মধ্যে ইলেক্ট্রনের সংখ্যা কমতে বা বাড়তেও পারে, এর দ্বারা সেই ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়ন-গঠনের ব্যাখ্যাও মিলে যায়। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও কোথা থেকে আল্‌ফা-কণিকাগুলি ছুটে আসে,—তেজস্ক্রিয়তা সম্বন্ধে এখানে তার কোনো ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়না। ফলে অল্পকাল পরেই পারমাণবিক গঠন সম্বন্ধে যে টমসনের পরিকল্পনাটিকে বাতিল করে দিতে হয়েছিল, অচিরেই আমরা তা জানতে পারব। অথচ এই মহান বিজ্ঞানীর চিন্তাধারা অল্পকাল পূর্বেই পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে যেন যুগান্তর এনে দিয়েছিল। শুধু টমসনের নয়, ঐ ১৯০৩ সালেই আরও একটি পরিকল্পনা উপস্থাপিত হয়েছিল এবং তাও কোনো সমর্থন লাভ করতে পারেনি। ঐ বছরেই কিছু পরে কিয়েলের লেনার্ড্ (Philipp Lenard—1862-1947) একটি পরিকল্পনা দিয়েছিলেন—যার মূল মর্ম হল পরমাণুর মধ্যে কোনো বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-কণিকা নেই। আছে শুধু শূন্যে অবস্থিত কতকগুলি ডাইনামাইড। তারা প্রত্যেকে তবস্ত এক এবং তাদের প্রত্যেকের ভর সমান। প্রত্যেকের মধ্যেই দ্বিত্ব বিদ্যুতের এক একটি সমাহার বিদ্যমান। তাদের সংখ্যার কম বেশি হলেই পারমাণবিক ওজন কম বা বেশি হয়। —লেনার্ডের এ পরিকল্পনাও গৃহীত হয়নি। সুতরাং এসব থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, তত্ত্বচিন্তার দায় অনেক। প্রয়োগের দ্বারা সুপ্রমাণিত না হলে তার উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা চলেনা। বিশেষত, ভর তেজ সংক্রান্ত এমন একটি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আসল ব্যাপারটি জেনে নিতে হলে আরও পরীক্ষা, আরও বাস্তব প্রমাণ চাই। যুগান্তকারী এমন যে সিদ্ধান্ত, তাকে কি এক কথাতেই গ্রহণ করা চলে, বা বাতিল করে দেওয়া যায়? তাই পূর্বের মতই বিজ্ঞানীরা তাঁদের

সত্যসমুত্থিত বাস্তব সমস্যাকে ভাল করে আঁকড়ে ধরলেন। আল্‌ফা-বিটা রূপ ভগ্ন-তেজোময় কণিকামালা নিয়ে তাঁরা গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। প্রত্যেকটি আল্‌ফা-কণিকার স্বতন্ত্র গুণাবলী জানবার জন্য তাঁরা দৃঢ় পদেই এগিয়ে চললেন। ক্রুক্‌সের মত গাইগারও রাদারফোর্ডের সাহায্যে আল্‌ফা-কণিকার সুনির্দিষ্ট গণনা কার্য চালাবার জন্য একটি যন্ত্রের উদ্ভাবন করলেন। পরে ওর নাম হয়েছিল গাইগার-গণক।

১৯০৭ সালে রাদারফোর্ড্ ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যক্ষ হয়ে আসার পর, এখানে জার্মানীর অন্তর্গত আর্লাঙ্গেনের (Erlangen) তরুণ স্নাতক (graduate) গাইগারের সঙ্গে মিলিত হন, এবং তাঁরা উপরিউক্ত যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেন। একটি অনুভূমিক (ভূমির সমান্তরাল বা আড়াআড়ি, খাড়া নয়) ছোট
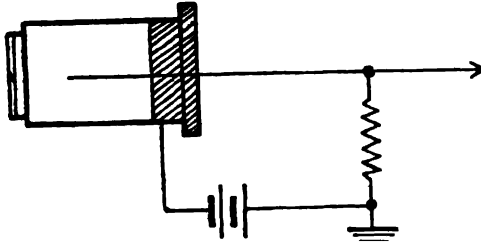
ধাতব সিলিণ্ডারের মধ্যে একটি ধাতব কাঁটা পাত্র-গাত্রের সমান্তরালভাবে লম্বালম্বি ঢুকান থাকে। কাঁটার বদ্ধ প্রান্তটি পাত্র থেকে অন্তরিত রাখা হয়। ঐ কাঁটা আর পাত্রগাত্রকে ব্যাটারির সঙ্গে পৃথকভাবে যুক্ত করে এবং ওদের মধ্যে খুব উচ্চ মানের বিভবপার্থক্য বজায় রেখে পাত্রমধ্যে জোরাল বিদ্যুৎক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়। অবশ্য লক্ষ্য রাখতে হয়, বিভবপার্থক্য যেন খুব বেশি হয়ে গিয়ে পাত্রের মধ্যে বিদ্যুৎক্ষরণ (discharge) না ঘটিয়ে দেয়। বিদ্যুৎক্ষরণ ঘটাবার জন্য যে বিভব-পার্থক্য দরকার, এখানে সে পার্থক্যটি তার চাইতে সামান্য কম রাখতে হয়। পাত্রমধ্যে বাতাস বা অন্য যে গ্যাস থাকে, তার অনেকটাই টেনে বার করে ভিতরের গ্যাসের চাপকে খুবই কমিয়ে ফেলতে হয়। কারণ, বিদ্যুৎক্ষেত্রের মধ্যে ছুটে চলবার সময় ইলেক্ট্রন-কণিকা তেজ সংগ্রহ করতে থাকে বলে গ্যাসের অণুগুলির সঙ্গে তার ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনাকে কমিয়ে আনা দরকার। ওদিকে কাঁটার মুক্ত প্রান্তের সামনে সিলিণ্ডারের মুখে খুব পাতলা অভ্র বা কাচ বা অ্যালুমিনিয়ামের একটি পর্দা রাখা হয়। সেই পর্দা ভেদ করেই বাইরের উৎস থেকে অল্প সংখ্যক আল্‌ফা-কণিকা ভিতরে ঢুকে বদ্ধ গ্যাসকে আয়নায়িত করে তুলে। বিদ্যুৎক্ষেত্রে বিচরণকালে আহিত কণিকা তেজ সংগ্রহ করতে পারে। ফলে আল্‌ফা-কণিকাগুলি

ভিতরের তড়িৎক্ষেত্রে এসে পড়ায় কাঁটা আর পাত্রগাত্রের মধ্যে আয়নায়ন আরও দ্রুত হয়, ক্রমবর্ধিত আয়নের ধাক্কা খেতে খেতে আয়নায়ন ক্রমাগত বেড়ে চলে। সেই সঙ্গে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়ন পরস্পরে বিপরীত দিকে ধাবিত হতে থাকে। তার ফলে শীঘ্রই পাত্রমধ্যে খুব সামান্য পরিমাণ একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি হয়। কিন্তু ঐ প্রবাহ স্থায়ী হতে পারেনা। কারণ, বর্তনীর মধ্যে একটি খুব বড় রকমের রোধক (resistence) লাগান থাকে। ফলে বর্তনীর মধ্যে যখন তড়িৎ প্রবাহ চলতে আরম্ভ করে, তখন কাঁটা আর গাত্রের মধ্যে বিভবপার্থক্য এত কমে যায় যে, পাত্রের মধ্যে আর বিদ্যুৎক্ষরণ চলা সম্ভব হয়না। আয়নায়ন জনিত প্রবাহের শক্তিটি (energy) তখন রোধের মধ্যে এসে ক্ষয়িত হয়ে যায়। পাত্রমধ্যস্থ সমস্ত আয়তনটি আহিত হয়ে পড়ে। অথচ তড়িৎক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। ফল হয় এই যে, ক্ষণিক-প্রবাহের মাত্রাটি সংশ্লিষ্ট ইলেক্ট্রোমিটার যন্ত্রে ধরা পড়ে যায়।

বর্তমানে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে প্রবাহটিকে বিবর্ধিত করে লাউড্-স্পীকার সাহায্যে ক্ষণিকের অতিথির (আল্‌ফার) আবির্ভাব-বার্তা যুগপৎ ঘোষণা করে দেওয়া হয়। বা, অন্য যন্ত্রের সাহায্যে তার প্রত্যেকটি পদচিহ্নকে অঙ্কিত করে রাখা হয়। সিলিণ্ডারের ডিজাইন ঠিক করে এবং তার রোধকের পরিমাণ ঠিক রেখে, মুহূর্তের প্রবাহটি ছিন্ন ভিন্ন করে দেওয়ার সময়কে যথাসম্ভব কমিয়ে দিয়ে যন্ত্রটিকে এমন পর্যায়ে সাজান যেতে পারে যে, প্রত্যেকটি আল্‌ফা-কণিকাকে ঠিকভাবেই গুণে রাখা সম্ভব হয়। পরবর্তীকালে গাইগার-গণক যন্ত্রটির এতই উন্নতি সাধন হয় যে তার দ্বারা ইলেক্ট্রন-এবং গামা-রশ্মিকেও গুণে ফেলা সম্ভব হয়। গণক-কাঁটাটি আরও দীর্ঘ করে সিলিণ্ডারের দৈর্ঘ্যের প্রায় সমান করে দেওয়ার জন্য মূলার (C. Müller) যে প্রস্তাব করেছিলেন, তা' গৃহীত হওয়ায় ঐরূপ যন্ত্র গাইগার-মূলার গণক-যন্ত্র নামে অভিহিত হয়। কিন্তু প্রথম যন্ত্র উদ্ভাবনের পরে রাদারফোর্ড্ এবং গাইগার গণনা ও হিসাব করে দেখলেন যে, এক গ্রাম রেডিয়াম থেকে সেকেণ্ডে যতগুলি আল্‌ফা-কণিকা বেরিয়ে আসে তার সংখ্যা $৩\cdot৫৭ \times ১০^{১০}$। বর্তমানে গৃহীত সংখ্যা পরিমাণ $৩\cdot৭ \times ১০^{১০}$। সংখ্যাটি রেডিয়ামের আবিষ্কারের নাম অনুযায়ী কুরি-সংখ্যা নামে অভিহিত হয়। কিন্তু তেজস্ক্রিয়তার একক হিসেবে কুরি-সংখ্যার তাৎপর্য আজ আরও ব্যাপক হয়ে গেছে। [সকল প্রকার কেন্দ্রক বিভাজনের (nucleur disintegration) ক্ষেত্রেই এই সংখ্যাটি নির্দিষ্ট থাকে। প্রতি সেকেণ্ডে বিভাজ্য কেন্দ্রকের সংখ্যাই এইটি।]

যন্ত্রটির সাহায্যে এক একটি আল্‌ফা-কণিকার আধান মাপা সম্ভব হল। এক একটি পৃথক আল্‌ফা-কণিকার আধান নির্ধারণ করা শক্ত হলেও কোনো নির্দিষ্ট সময়ের

মধ্যে বিক্ষিপ্ত সবগুলি আল্‌ফা-কণিকার মোট আধান জানা আর শক্ত নয়। সুতরাং ঐ মোট মাত্রাপরিমাণকে যদি নিক্ষিপ্ত আল্‌ফা-কণিকার সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে একক আল্‌ফার আধান পরিমাপ করা সহজ হয়। ১৯০৮ সালে দেখা গেল যে, পরম স্থিতিবৈদ্যুৎ এককে (absolute electrostatic units) প্রতি সেকেণ্ডে এক গ্রাম রেডিয়ামের সব আল্‌ফা-কণিকার দ্বারা পরিবাহিত আধান হয় ৩৩·২। একে $৩·৭ \times ১০^{১০}$ দিয়ে ভাগ করলেই জানা যায় যে, একটি আল্‌ফা-কণিকার আধান হয় ৯×১০^{-১০} আর এই আধানটি একটি ইলেক্ট্রনের আধানের ঠিক দ্বিগুণই। সুতরাং একটি আল্‌ফা-কণিকার আধান যে দু'টি প্রাথমিক আধানের (elementary charge) সমবায়ে সমাহৃত—রাদারফোর্ডের সেই অনুমানের সত্যতা সন্দেহাতীত ভাবেই প্রমাণিত হল। পরে ঠিক ভাবে জানা যায়, আল্‌ফা আর ইলেক্ট্রনের আধান যথাক্রমে $৯·৫৮ \times ১০^{-১০}$ এবং $৪·৭৮ \times ১০^{-১০}$। প্রথমটি দ্বিতীয়ের দ্বিগুণের প্রায় সমান বললেই চলে—সামান্য একটু কম।

এছাড়াও দেখা গেল যে, ফটো-প্লেটের ওপর গিয়ে পড়লে প্রত্যেকটি আল্‌ফা-কণিকা প্লেটের অতি সূক্ষ্ম প্রলেপের (emulsion) মধ্যে তার অনুপ্রবেশের চিহ্ন অঙ্কিত করে দেয়। ওদের কেউ কেউ প্রলেপের সূক্ষ্ম ও সুবেদী (sensitive) স্তরের মধ্য দিয়ে নিক্ষিপ্ত ও নির্গত হয়ে যায়। ছবিকে ডেভালাপ করলে দেখা যায়, তারা প্রত্যেকেই যেন অসংখ্য কৃষ্ণবিন্দু রচনা করে চলে গিয়েছে। অথচ আল্‌ফা-কণিকার বিচরণ-পথের দৈর্ঘ্য এত ক্ষুদ্র হয় যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাদের দেখতে হয়। তবে এজন্য তেজস্ক্রিয় পদার্থের কোনো অতি দুর্বল যৌগিককেই প্লেটের কাছে আনতে হয়। না হলে রশ্মিসংখ্যা একটু বেশি হয়ে গেলে ওদের পৃথক পৃথক চিহ্ন আর পাওয়া যায়না, সব একাকার হয়ে যায়। একটি কণিকা প্রলেপের মধ্য দিয়ে যেটুকু পথ অতিক্রম করতে পারে, তার দৈর্ঘ্যও যৎসামান্যই। বাতাসের মধ্যে সে যতটা যেতে পারে তার প্রায় হাজার ভাগের ভাগ। অর্থাৎ সে-দৈর্ঘ্য এক সেন্টিমিটারের সহস্রাংশের চাইতেও বেশ কম। এক একটি প্লেটে হাজার হাজার আল্‌ফা-কণিকার পথরেখা অঙ্কিত হয়ে যাওয়ায়, একটি মাত্র প্লেটের দ্বারাই মেঘায়ন-কক্ষের বিপুল পরিমাণ ফটোর কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রলেপের মধ্য দিয়ে এক একটি আল্‌ফা-কণিকার সারা বিচরণ-পথটিই আঁকা হয়ে যায়। ঐ বিচরণ-পথের দৈর্ঘ্যই তার তেজেরও পরিচয় দিয়ে দেয়। অর্থাৎ একটি কণিকাতে কতটা তেজ (বিদ্যুৎ) থাকলে প্রলেপের মধ্য দিয়ে অতটা পথ অতিক্রম করা যেতে পারে, তা জানা যায়। শুধু তাই না, ঐ পথের একটি নির্দিষ্ট অংশে প্রলেপের উপর কৃষ্ণবিন্দু সংখ্যা থেকে একটিমাত্র আল্‌ফা-কণিকা

কতগুলি আয়ন-জোড় সৃষ্টি করেছে তাও জানা যায়। তা থেকে কণিকাটির আয়নায়ন শক্তির পরিচয়ও মিলে যায়। এ থেকে আবার তার গতিবেগ এবং তার থেকে তার ভরটিও হিসাবের মধ্যে এসে পড়ে।

এইভাবে মানুষের বুদ্ধির কাছে প্রকৃতির সকল দুর্জ্ঞেয় রহস্য একের পর এক ধরা দিতে চলল। কিন্তু তার ইতিহাসটি এতটুকু নয়; বিরাট ও বিপুল। পঁচিশ বছরের যুবকের কাছে এখন থেকে চল্লিশ কি পঞ্চাশ বছরের পূর্বেকার সামাজিক অবস্থার ছবি তুলে ধরা অত্যন্ত শক্ত কাজ। এখনকার তুলনায় তখনকার সব কিছুই যেন তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়ে এখন থেকে তি ন চার শ' কি পাঁচ সাত শ' বছর পূর্বের ছবির দিকে যখন তাকাই, তখন যেন ফেলে-আসা জীবনের ওপর কেমন একটা মমতা জেগে ওঠে। কালিদাসের ক্ষেত্রকে তো স্বপ্নলোক বলেই মনে হয়। আর প্রথম বৌদ্ধ গ্রন্থগুলির বিবরণ কেবল যেন একটি অ-ধরা আনন্দের স্মৃতি জাগিয়ে যায়। আরও আগেকার গ্রন্থ বেদের বিবরণে যখন ভ্রাম্যমাণ পশুপালক যাযাবরদের কৃষিজীবন বরণের শত শত বর্ষব্যাপী অচেতন প্রচেষ্টার বিবরণ পাঠ করি, তখন শুধু একটি মিশ্রিত সংবেদন ছাড়া আর কিছু থাকেনা। আর তারও পূর্বের পর্বতগুহার ছবিগুলি তো কেবল দীর্ঘশ্বাস উচ্ছ্বসিত করে তোলে। কিন্তু সেও তো মাত্র পাঁচ সাত কি দশ পনর হাজার বছর আগেকার কথা। তারও পূর্বের লক্ষ বা নিযুত বর্ষের হিসাব রেখেছে কে? কিন্তু তারও হিসেব আছে। কোটি কোটি বছরের সেই ইতিহাস রচনা করে দিয়েছেন প্রকৃতি। বিজ্ঞানী জানিয়েছেন, এই মানুষের এমন মধুময় দেহ, আর তার এমন মহিমময় মস্তিষ্কটিই সেই সুস্পষ্ট উজ্জ্বল ইতিহাস। বিস্মৃত হলেও তার প্রত্যেকটি পৃষ্ঠাই যেন এক একটি বিস্ময়।

কিন্তু এই বিপুল ইতিহাসের ফলশ্রুতি আছে। মহাশিল্পীর শিল্প-প্রচেষ্টা যে কেবল রূপায়ণ-সার্থকতা লাভ করেছে তাই নয়। তার শিল্পপ্রবণতা আজ নরমস্তিষ্কে সংক্রমিত হয়েছে,—মানুষ আজ যন্ত্রশিল্পী। সাহিত্য-সংগীত তার প্রথম শিল্পপ্রেরণা কিনা জানিনা। কিন্তু তার নিশ্চিত ও সার্থক প্রথম শিল্পকর্মই তার আত্মরক্ষার জন্য উদ্ভাবিত পশুহননের প্রস্তর ফলক বা খাদ্যবস্তু সংগ্রহের কোনো শলাকা। আর সাহিত্যাদি শিল্প যদি পূর্ববর্তী হয়েও থাকে, তাহলে তার সার্থকতাও দার্শনিকের পূর্ব-দর্শনের মতই। সে-দর্শনের সত্যতা বা মিথ্যা প্রমাণ করে দেয় পরবর্তী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। কিন্তু জগতে সকল বস্তুরই যে রূপান্তর চলছে, তার মস্ত বড় প্রমাণ মিলে যায় ঐ মহাশিল্পীর নিজেরই রূপান্তরের মধ্যে। কোটি কোটি বছরের ' মস্তিষ্ক আজ গড়ে উঠল, বা বলতে পারি, যে মস্তিষ্করূপে প্রকৃতি স্বয়ং আজ রূপপ্রাপ্ত হল, সেই মস্তিষ্ক যেন

গুণগতভাবেই এক সম্পূর্ণ নূতন সত্তা হয়ে প্রকৃতিরই অদৃশ্য ভ্রূণ-প্রক্রিয়া থেকে জন্মলাভ করল। কিন্তু জন্মলগ্ন থেকেই ঐ মস্তিষ্ক বস্তুটি ক্রমে ক্রমে এমন সব বস্তু উদ্ভাবন করতে লাগল যা দিয়ে কিনা সে জেনে নেবে তার জনয়িত্রী প্রকৃতিরই গতিবিধি, নিয়ম-কানুন আর উদ্দেশ। সেই প্রাকৃতিক উদ্দেশই তার স্ব-প্রকৃতির চরম মানবিক উদ্দেশ্য। সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঐ যন্ত্রগুলিই আবার তার হাতিয়ার। তাই দিয়ে সে মূল প্রাকৃতিক বিবর্তনের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখবে। বিরোধী প্রকৃতিকে তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করবে। বিরোধের মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক বিবর্তন বা প্রকৃতিব অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। কিন্তু সেই বিপুল পরিবর্তন ধারার বিশেষ বিশেষ ক্ষণে যে নব নব বিরোধ উজ্জীবিত হয়ে উঠে তাকে অস্বীকার করে, তাকে দাবিয়ে, এবং তারপর তাকে পিছিয়ে দিয়েই মানব তার সামাজিক অগ্রগতিকেও অব্যাহত রাখতে পারে। সুতরাং বহিঃপ্রকৃতি বা মানবপ্রকৃতি, যেখান থেকেই উদ্ভূত হক না কেন, অগ্রগমনের কোনো বিশেষ পর্যায়ে সেই বিরোধকে জয় করবার প্রয়োজনীয় মুহূর্তে মানুষ তার মস্তিষ্ক-উদ্ভাবিত ঐ সব যন্ত্রপাতির সাহায্যে সেই বিরোধী প্রকৃতিকেই এমনভাবে পরিবর্তন করে ফেলবে যেন সে এখন থেকে মানবের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে আরম্ভ করে, যেন সে তার মানব-বিরোধী সংহার শক্তিকে সংহরণ করে নেয়, যেন সে তার মানববিকাশের অফুরন্ত সৃষ্টিপ্রতিভাকে চির সক্রিয় করে তুলে। মানবমস্তিষ্ক প্রকৃতিবিবর্তনের ইতিহাসে এক মহাবিপ্লব বটে।

বিপ্লব আরও এইজন্য যে, মস্তিষ্ক-গঠনের ব্যাপারে মহাশিল্পীর যে সময অতিবাহিত হয়েছে, সচেতনভাবে প্রকৃতির নিয়মাবলী অনুধাবন ও তার পরিবর্তনের জন্য মানুষের যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের কালটিকে সে তুলনায় কিছুই না বললেও চলে। ঐ মেঘায়ন-কক্ষ বা ঐ স্পিন্থারিস্কোপ, বা গাইগার-গণকযন্ত্র—এ সবের উদ্ভাবন ঘটে গেছে দশ পনর বছরের মধ্যেই। ঐটুকু সময়ের মধ্যে প্রকৃতির বহু রহস্যই উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেছে। প্রকৃতির রূপান্তর-সাধন ব্যাপারে তাদের ফলও হয়েছে সুদূরপ্রসারী। কিন্তু মানবমস্তিষ্ক বিপুল সক্রিয়তা লাভ করেছে। বহু বিজ্ঞানীর বিজ্ঞান-প্রচেষ্টার মিলিত ফলই মস্তিষ্কের সেই গুণ-নৈপুণ্য এনে দিয়েছে। তেজস্ক্রিয় বস্তুর উপাদাননিচয়ের গুণাবলীও যেন তাই একে একে এসে ধরা দিতে বাধ্য হয়েছে। আল্‌ফা-কণিকার আধান বা আবেগ শুধু নয়, তার গতিবিধিও জানা হয়ে গেছে। ১৯০৪ সালেও হেনরি ব্র্যাগ্ (**William Henry Bragg—1862-1942**) যে, আল্‌ফাকণিকা সম্বন্ধে বলেছিলেন, সকল প্রকার বস্তুর মধ্য দিয়েই সে তার সরলরৈখিক পথ ধরে এগিয়ে চলে, কয়েক বছরের মধ্যে যন্ত্রপাতি-গুলি আবিষ্কার হওয়াতেই বোঝা গেল যে ঠিক তা নয়। আসল ব্যাপারটি অচিরেই ফাঁস হয়ে গেল।

রাদারফোর্ড্ দেখতে পেলেন যে, কোনো খাঁজ বা গর্তের মধ্য দিয়ে ছুটে এসে আল্‌ফা-কণিকা যখন ছবি তোলার প্লেটে তার স্বাক্ষর এঁকে দেয়, তখন যে ঘটনা ঘটে, তা সব সময় একভাবে ঘটেনা। খাঁজ আর প্লেটের মধ্যবর্তী স্থানে কিছু না থাকলে খাঁজের ছবি বেশ সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়, মায় তার ধারাল পার্শ্বগুলি পর্যন্ত। কিন্তু উভয়ের মধ্যে মাত্র বায়ুকণার ব্যবধান থাকলেও খাঁজের ছবি পরিষ্কার ওঠেনা। তার আকৃতিটি বিস্তৃত আর পাশগুলি সব ভোঁতা হয়ে যায়। কারণ অনুসন্ধান করা কঠিন হলনা। নিশ্চয়ই বাতাসের অণুগুলির সঙ্গে ধাক্কা লাগায় আল্‌ফা-কণিকাদের কেউ কেউ পথ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। ধাক্কা-খাওয়া কণিকাদের কেউ কেউ তাদের গতিপথ থেকে হঠাৎ ছিটকে ভিন্ন পথে চলে যায়। কেউ মোটামুটিভাবে তার পথাভিমুখে থেকেই ছোট কোণ সৃষ্টি করে চলে, কেউ বা আবার বড় কোণের বাঁক নেয়। মোটের ওপর সকলেই যে সরলরেখা ধরে চলে, সে কথা ঠিক নয়। আল্‌ফারা ওভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় দেখে রাদারফোর্ড্ ঘটনাটির নাম দিলেন আল্‌ফা-কণিকার বিক্ষিপ্ত প্রতিধাবন বা আল্‌ফা-বর্ষণ বা আল্‌ফা-বিক্ষেপণ (২০৬-পৃষ্ঠার ৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

ছোট ছোট কোণে যেসব বিক্ষেপ ঘটে, গাইগার সে নিয়ে কাজ করতে রইলেন। আর রাদারফোর্ড্ তাঁর গবেষক-ছাত্র মার্স্‌ডেনকে (Effie Gwend Marsden) আল্‌ফা-কণিকার বৃহত্তর কৌণিক বিক্ষেপের (কোণ করে বিক্ষিপ্ত হওয়ার) ব্যাপারটি অনুধাবন করতে বললেন। উভয়ের গবেষণার ফল হল অদ্ভুত। দেখা গেল যে, বেশির ভাগ কণিকাই ছোট ছোট কোণ সৃষ্টি করে বিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু সংখ্যায় অল্প হলেও কেউ কেউ ৯০° কোণেই ছিটকে যায়। পাশেই সুবিধে মাফিক ভাবে খাটান প্রতিপ্রভ বস্তুর পর্দাতে গিয়ে তারা চমক লাগিয়ে দেয়। পর্দাকে এমনভাবে রাখা হল যেন একেবারে বিপরীত মুখে বিক্ষিপ্ত হলেও আল্‌ফা-কণিকারা সেখানে গিয়ে আশ্রয় পেতে পারে। দেখা গেল ঐ পর্দাতেও চমক লাগল। অবশ্য ওরকম মর্মান্তিকভাবে তাড়া-খাওয়া কণিকার সংখ্যা অত্যল্পই। কিন্তু এর পর ৯০° কোণের চাইতেও বড় কোণ করা কণিকাদের নিয়ে বিশেষ পরীক্ষা হল। জানা গেল যে, একই বেধবিশিষ্ট দুটি ধাতব পাতের ব্যবধান ভেদ করে যাওয়ার সময় ভারি ধাতুর ক্ষেত্রেই আল্‌ফা-কণিকাগুলির বড় কোণের সংখ্যা বেশি হয়। আর যে ধাতুর পারমাণবিক ওজন কম, তাকে ভেদ করবার সময় অত্যল্প সংখ্যক কণিকাই ওরকম কোণ করতে পারে। তবে একই ধাতুর বেধ বাড়িয়ে দিলেও ওরকম ঘটনার সংখ্যা বেড়ে যায়।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগল, কোনো কোনো আল্‌ফা-কণিকার এরকম কৌণিক বিক্ষেপ কেন? প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের পক্ষে পরমাণুর অভ্যন্তরেই

বিকর্ষণমূলক সমধর্মী অর্থাৎ হাঁ-ধর্মী (আলফার বিদ্যুৎ হাঁ-ধর্মী বলে) কোনও বিদ্যুদাধানের কল্পনা করা ছাড়া গত্যন্তর রইলনা। পূর্বে কুলম একটি সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন যে, দু'টি আধানের মধ্যে ক্রিয়াকালে যে বৈদ্যুৎ বল কাজ করে, তা ঐ আধানের সমানুপাতী হয়। অর্থাৎ আধান বাড়লে বল বেড়ে যায় এবং আধান কমলে বলও কমে যায়। তাছাড়া ঐ বলটি দূরত্বের সঙ্গেও এমনভাবে ব্যস্তানুপাত রক্ষা করে যে, আধানদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব দু'গুণ বাড়লে বল চার গুণ কমে যায়, দূরত্ব তিন গুণ বাড়লে বল নয় গুণ কম হয়। আবার ঐ দূরত্ব চার গুণ বাড়লে বলও ষোল গুণ কমে যায়। পূর্বে আল্‌ফা-কণিকার আধানের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। সুতরাং ঐ নিয়ম অনুযায়ী হিসাব করে দেখা গেল যে, আলফা-কণিকাকে একেবারে উল্টো অভিমুখে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বল তখনই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে, যখন আলফা-কণিকাটি তার নিজের উপর বল-প্রয়োগকারী ঐ আধানের $১০^{-১২}$ সেন্টিমিটার দূরত্বের (অর্থাৎ এক সেন্টিমিটারকে একের পর বারটি শূন্য বসিয়ে যা হয় তাই দিয়ে ভাগ করলে যে দূরত্ব পাওয়া যায়) মধ্যে এসে পড়ে। বোঝা যায় যে, ইলেক্ট্রনের মত কণিকা কখনও ঐ রকমের একটি সংহত শক্তির আধান (concentrated charge) হতে পারেনা। কারণ ইলেক্ট্রনের ভর আলফা-কণিকার ভরের প্রায় সাত হাজার ভাগের এক ভাগের মত। সুতরাং ইলেক্ট্রন ও আল্‌ফার মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে আল্‌ফা-কণিকাটি বড় জোর একটু আধটু নড়ে চড়ে যেতে পারে। কিন্তু কি করে তাতে ঐ ইলেক্ট্রনের পক্ষে তার নিজের চাইতে সাত হাজার গুণ ভারি একটি আল্‌ফা-কণিকাকে ঐ রকম বৃহৎ কোণে বা উল্টো মুখে ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব? কিন্তু দেখা গেল সত্যিই ও ঘটনা ঘটছে। সুতরাং অনুমান করে নিতে হয় যে ঐ পরমাণুর মধ্যেই ধনবিদ্যুৎ-আধানও নিশ্চয়ই $১০^{-১২}$ সেন্টিমিটার ব্যাসযুক্ত একটি আয়তনের মধ্যে কোথাও সংহত হয়ে আছে। এই রকম অবস্থাতেই একটি প্রচণ্ড বেগবান আল্‌ফা-কণিকার পক্ষে তার নিজের ভরের চাইতেও অনেক বেশি ভর সমন্বিত কোনো আধানের ঘা খেয়ে অমনভাবে ঘুরে আসা সম্ভব। আর তা যদি হয়, তাহলে ধরে নিতে হয় যে, পরমাণুর ভরটিও পরমাণুর সমগ্র আয়তন জুড়ে থাকেনা, আধানকে সঙ্গে নিয়েই সে পরমাণুর মধ্যে অতি ক্ষুদ্রায়তন কোনো স্থানে সংহত হয়ে থাকে। আর ঋণাত্মক ইলেক্ট্রন যখন ধনাত্মক আল্‌ফাকে ওভাবে ফিরিয়ে দিতে পারেনা, তখন ঐ সংহত মারাত্মক শক্তিটি যে নিজেই ধনাত্মক, তাতেও আর সন্দেহ থাকেনা। বস্তুত, ঋণাত্মক ইলেক্ট্রনের সঙ্গে সমশক্তিক ঐ ধনাত্মক আধানের সহবাসের ফলেই একটি পরমাণুর তথাকথিত নিরপেক্ষ ভাবটি বজায় থাকে, তার জন্যই সামগ্রিকভাবে একটি পরমাণু বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ রূপ ধারণ করে।

কিন্তু পরমাণুর কাঠামো সম্বন্ধে টমসনের পরিকল্পনাটিকে আর কোনো মতেই টিকিয়ে রাখা সম্ভব হলনা। পূর্বে মনে করা হত যে, কোনো বস্তু উত্তপ্ত হলে তার মধ্যস্থিত অনুগুলি ছোটাছুটি আরম্ভ করে দেয়। উত্তাপ বেড়ে চললে তারা প্রচণ্ড বেগে পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খায় এবং জোরে কাঁপতে থাকে। তারই ফলে সেখান থেকে আলো বিকীর্ণ হতে থাকে। তাই পারমাণবিক গঠন সম্বন্ধে টমসনের পরিকল্পনা (পৃ. ১৮১-৮২) থেকে স্বভাবতই মনে হয়েছিল যে ক্রমাগত উত্তপ্ত হতে থাকলে পরমাণুর অন্তর্গত ইলেক্ট্রনগুলিও ক্রমাগত গতিবান্ হতে থাকে। অথচ তখন পরমাণুর ধনাত্মক মেঘের দ্বারাও তাদের আকর্ষণ চলতে থাকায় অনিবার্যভাবেই ইলেক্ট্রনদের বেগ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হ্রাস পেতে থাকে। তারই ফলস্বরূপ তখন সেখান থেকে আলো-বিকিরণ আরম্ভ হয়ে ক্রমেই তা গতিবৃদ্ধি জনিত বাধাবৃদ্ধির সঙ্গেই বেড়ে চলতে থাকে। কিন্তু বাস্তবিকই যদি তাই হত, তাহলে তো তেজ-বিকিরণের ফলে ইলেক্ট্রনগুলি অচিরেই তেজহীন হয়ে পড়ত এবং পরমাণুর ধনাত্মক মেঘের মধ্যে সেগুলি কোথাও থেমে গিয়ে সেঁটে যেত। কিন্তু আসলে তা যখন হয় না এবং উত্তাপের ফলে যখন ক্রমাগত তাপ বিকিরণ চলতে থাকে, তখন পূর্ব পরিকল্পনাটিকে বাতিল করে দিতেই হয়। তাছাড়া আল্ফা-বিক্ষেপ সংক্রান্ত গবেষণা সম্পূর্ণ অন্য ভাষাতেই কথা বলছে।

এসব থেকে রাদারফোর্ড, ১৯১১-১২ খ্রী.-এ পরমাণুর গঠন-কাঠামো সম্বন্ধে কতকগুলি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এসে পৌছলেন। গাইগার ও মার্সডেন কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং ডারউইনও (C. G. Darwin—1887- ?) আল্ফা-বিক্ষেপণের আঙ্কিক তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করছিলেন। এঁদের সকলের পরীক্ষার ফলই রাদারফোর্ডকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করল। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে পরিব্যাপ্ত প্রাকৃতিক গোপন রহস্য সূত্রটিকে টেনে বার করবার শক্তি ছিল তাঁর অসাধারণ। তিনি পারমাণবিক কাঠামোর মূল তত্ত্বকে উপস্থাপিত করলেন: পরমাণুর কেন্দ্রাঞ্চলে থাকে একটি কেন্দ্রক (nucleus)। তাতেই পরমাণুর সমস্ত ধনাত্মক আধান এবং তার প্রায় সবটি ভরই সংহত হয়ে থাকে। তার যে ক্ষেত্র, তার ব্যাসার্ধ ৩×১০^{-১২} সে. মি. কিন্তু তার চতুষ্পার্শ্বস্থ সব জায়গাটিই একটি ঋণাত্মক বিদ্যুৎক্ষেত্র। এসব নিয়ে পুরো পরমাণুর ব্যাসার্ধটি দাঁড়ায় $১০^{-৮}$ সে. মি.। ঋণ বিদ্যুতের প্রথম কণিকার অর্থাৎ ইলেক্ট্রনের সংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে, কিন্তু তাদের মোট আধান কেন্দ্রকের ধনাত্মক মোট আধানের সমান হওয়ায় পরমাণুটি বিদ্যুৎনিরপেক্ষ রূপেই প্রতীয়মান হয়। তবে সমগ্র পরমাণুর তুলনায় তার কেন্দ্রকের আয়তন নগণ্যই। অর্থাৎ পরমাণুর গঠনটি যে... জগতের প্রতিরূপ ;—ধনাত্মক আধানযুক্ত, অথচ পরমাণুর প্রায় সমগ্র-ভর সমন্বিত একটি ক্ষুদ্রায়তন কেন্দ্রককে কেন্দ্র করে তার

চারধারে ১০$^{-৮}$ সে. মি. দূরে থেকে ঋণাত্মক ইলেক্ট্রন-কণিকাগুলি কেন্দ্র-সূর্যের চতুর্দিকস্থ ঠিক গ্রহপুঞ্জের মতই ঘুরে বেড়াচ্ছে। আল্‌ফা-কণিকা প্রচণ্ড আবেগে তারই পানে ধেয়ে আসে। প্রথমে তার ধাক্কা লাগল ছোট্ট ইলেক্ট্রনটির সাথে। একটি ঋণাত্মক আধান নিয়ে ইলেক্ট্রনটি ছিটকে পড়ল। পরমাণুর নিরপেক্ষতার মুখোশ খসে গেল। ধনাত্মক-আধানের মোট পরিমাণ পূর্বের মত একই থেকেও ঋণাত্মক আধানের তুলনায় তার জোর বেশি মনে হল, পরমাণুটি একটি ধনাত্মক-আয়ন হয়ে গেল। আর ধাক্কা খেয়ে যে ইলেক্ট্রন ছিটকে পড়ল, সে কিন্তু আঁধারে মিলিয়ে গেলনা। বাতাসের গায়ে গিয়ে লেগে রইল। লেগে রইল বাতাসের একটি অণুর সাথে, তার ও নিরপেক্ষতাকে সে ভেঙে দিল। অণুর ঋণাত্মক আধান গেল বেড়ে। ধনাত্মক আধানের পরিমাণ পূর্ববৎ একই থেকেও, ঋণাত্মক আধানের তুলনায় তার জোর কম মনে হল। অণুটি হয়ে গেল না-সূচক বা ঋণাত্মক-আয়ন। ওদিকে আল্‌ফা-কণিকা বাহিনীর মধ্যে সকলের পক্ষে আর পরমাণুর ঐ অতি ক্ষুদ্র কেন্দ্রকের নাগাল পাওয়া সম্ভব হলনা বলে তারা তার এদিক দিয়ে ওদিক দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু এতগুলির মধ্যে কেউ কি তার কাছে এসে পৌঁছবেনা! দৈবাৎ যেটি তার আওতায় এসে পড়ল, তার আর নিস্তার নাই। সে প্রচণ্ড মার খেল। তাকে তখন একেবারে উল্টো মুখে ছুটে পালাতে হল, না হয় বড় জোর বড় একটি কোণ করে। (দ্র., পৃ. ২০৬, ৩নং ছবি)।

যে পরমাণুকে নিয়ে শত শত মানুষ হাজার হাজার বছর যাবৎ স্বপ্ন রচনা করেছে, সেই পরমাণু-সৌধের সত্যিকারের বহির্গঠনটি এতকাল পরে আজ মানুষের কাছে ধরা পড়ল। বহির্গঠন বা বাইরেকার কাঠামো বলছি এই জন্য যে, হয়ত এর আভ্যন্তরীণ অজ্ঞাত কোনো নিপুণ সজ্জাও থাকতে পারে। আমরা ইট কাঠ দিয়ে যে অট্টালিকা নির্মাণ করি, সে ত বস্তুসংঘ মাত্র। আবার বস্তুগুলিও তো অণুসংঘ ছাড়া কিছু নয়। এই অণুগুলিকে বলতে পারি (পরমাণু, বা) আয়ন দিয়ে তৈরি অট্টালিকা। আবার দেখা যাচ্ছে, পরমাণুও ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-কণা দিয়ে গড়া সৌধ বিশেষই। সুতরাং ঐ ঋণাত্মক বা ধনাত্মক কণিকার মাঝেও যে আর কোনো পদার্থের নিপুণ সমাবেশ নেই, একথা বলা যায় কি করে? কিন্তু সে কথা এখন থাক। জানা যা গেল, তা ঐ পরমাণুরই সৌধ-ভঙ্গিমা বা তার বহির্গঠনের কথা। কিন্তু জানা গেল কতকালের স্বপ্ন আর কতকালের সন্ধানের পর! জানল একজন, বা ছোট্ট একটি গোষ্ঠী; কিন্তু জানল সকলেই। বিজ্ঞানী মহলে সাড়া পড়ে গেল! তাঁদের সকলেরই চোখের সামনে থেকে যেন প্রকৃতির নাট্যমঞ্চের একটি বিরাট কালো পর্দা সরে গেল। আপাতত যিনি তা উঠিয়ে দিলেন, সেই রাদারফোর্ড্‌ই কিন্তু কালোর মোহটিকেও

দর্শকের চোখ থেকে ঘুচিয়ে দেওয়ার জন্য পুনরায় উদ্‌যোগী হলেন। কণিকা-বিক্ষেপের নিয়ম-কানুনগুলিকেও তিনি সংখ্যাগত গণনার মধ্যে এনে ধরে দেখিয়ে দিতে চাইলেন। বিক্ষেপণের আঙ্কিক ভিত্তিও তিনি স্থাপন করে দিলেন। তিনি এমন সমীকরণ উপস্থাপিত করলেন, যা দিয়ে পরমাণু-কেন্দ্রকের মোট আধানও (z) সহজেই নির্ণয় করা গেল। গাইগার-মার্স্‌ডেনও তখন এমন যন্ত্র তৈরি করে দিলেন, যার দ্বারা পরীক্ষা মারফতেই সে তত্ত্বের সত্যতা মিলিয়ে নেওয়া গেল। তার ফলে কেন্দ্রক সহ পরমাণুর গড়ন সম্বন্ধীয় রাদারফোর্ডের নতুন অনুমানটি নির্ভুল প্রতিপন্ন হল। টমসনের পুরানো পরিকল্পনাটিকে (পৃ ১৮২,২৩৯) বাতিল করে দিতে হল। উক্ত সমীকরণের সাহায্যে বিভিন্ন ধাতুর পরমাণুসমূহের কেন্দ্রকীয় আধান সম্বন্ধে সঠিক পরিচয় সংগ্রহ করা সম্ভব হ'ল।

আল্‌ফা-বিক্ষেপণ ঘটনার বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধাতুর কেন্দ্রকগুলির আধানের গড়ন সম্বন্ধে পরিচয় পাওয়া যেতে লাগল। তার ফলে বিভিন্ন ধাতুর পরমাণু-কেন্দ্রকের তথা মেন্দেলিয়েভের পর্যায়িক ছকের মধ্যে এক একটি পরমাণুর আসনও বা কোথায় কি রকম হবে, তা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে তেজস্ক্রিয় বস্তু এবং তাদের বংশধারা সম্বন্ধে যেসব তথ্য সংগৃহীত হল, তাতে তাদের অভ্যন্তরীণ গঠনপদ্ধতি সম্পর্কেও নানাবিধ সংবাদ এসে গেল। ওদের বংশ বিবর্তনের ইতিহাস থেকেই নূতন প্রশ্ন উত্থিত হয়েছিল। কিন্তু ঐ বংশধরদের এমনভাবে সাজান যায় যে তাদের ঐ বংশলতিকা দেখেই তাদের বিবর্তন-ধারাটিও ভালভাবে বুঝতে পারা যায়। যেমন, ইউরেনিয়াম-রেডিয়ামের বংশ-লতিকাটিকে পরবর্তী পৃষ্ঠায় (পৃ ২৪২) অঙ্কিত চিত্র অনুযায়ী সজ্জিত করা যায়। [বৃত্তের মধ্যে রেডিও-উপাদানগুলির সংকেত-চিহ্ন (symbol) বসান হয়েছে। সংকেতের ওপরের সংখ্যা থেকে তার পরমাণুর ভর-পরিচয় মিলছে। ওটি ঐ বস্তুটির পারমাণবিক ভারেরও মূল্যমান নির্দেশক নিকটতম সংখ্যা। নিচের সংখ্যাটি বস্তুটির পারমাণবিক সংখ্যা, বা পর্যায়িক ব্যবস্থার মধ্যে তার অবস্থান-নির্ণয়কারী সংখ্যা, এ থেকে তার রাসায়নিক গুণাবলীরও পরিচয় পাওয়া যাবে। তীর-চিহ্ন থেকে ধরা যাবে কোন্ বস্তু থেকে তার উদ্ভব ঘটছে। তীরের পরবর্তী বস্তুটিই তীরচিহ্নের পূর্ববর্তী বস্তু থেকে প্রত্যক্ষভাবে উপজাত বা রূপান্তরিত। আল্‌ফা-বর্ণের অর্থ, আল্‌ফা-কণিকা ক্ষরণের দ্বারাই ওখানে রূপান্তর-সাধন ঘটছে। বিটারও অনুরূপ অর্থ। অর্থাৎ ওখানে ইলেক্ট্রন-কণিকার ক্ষরণের মারফতেই একটি উপাদান অন্য উপাদানে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। তীর চিহ্নের পাশের বা নিচের সংখ্যা থেকে পূর্ববর্তী বস্তুটির অর্ধায়ুর (পৃ. ২০৭-৮) পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। চতুষ্কোণ খোপের মধ্যে যারা আছে তাদের পারমাণবিক ভারাঙ্ক এবং রাসায়নিক গুণাবলী এক হওয়া সত্ত্বেও তাদের তেজস্ক্রিয় ধর্ম পৃথক।]
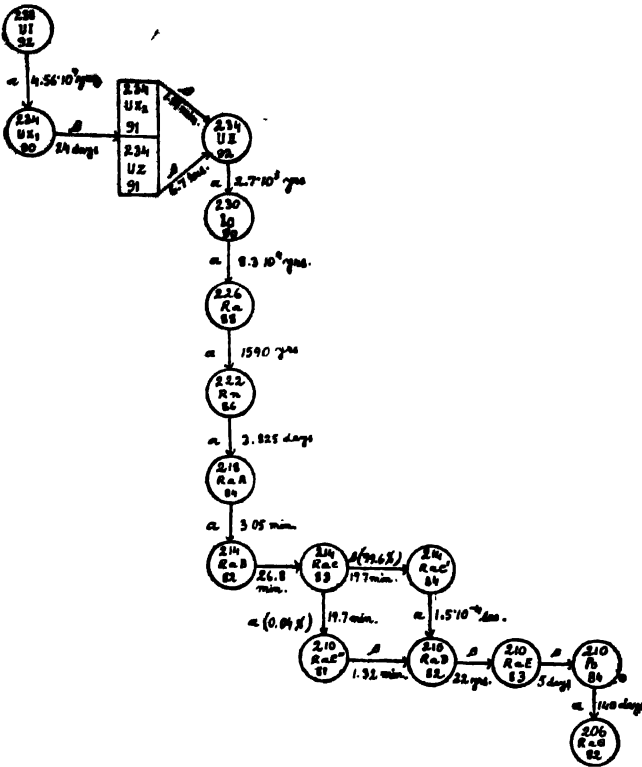
[Atomic Nucleus—p 52]

দেখা গেছে, বংশ-তালিকার অন্তর্গত কোনো বস্তুর সঙ্গে তার জনক-বস্তুটির কোনো রাসায়নিক সম্পর্ক নাই। রাসায়নিক গুণাবলীর দিক থেকে ওরা পৃথক। ওদের অর্ধায়ুও আলাদা এবং প্রত্যেকেরই অর্ধায়ুকাল সুনির্দিষ্ট। কিন্তু একটি ক্ষয়-প্রক্রিয়াতে নিক্ষিপ্ত কণিকামালার তেজই প্রকৃতপক্ষে বস্তুটির রূপান্তর- বা বিভাজন-প্রক্রিয়ার আসল প্রকৃতিটিকে স্থির করে দেয়। ঐ তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের জন্যই বস্তুটির গুণাবলীও সব পালটে যায়। বেশ দেখা যাচ্ছে যে, একটি আল্‌ফা-কণিকা নিক্ষিপ্ত হয়ে বেরিয়ে গেলে (দুই একক পরিমাণ আধান—পৃ. ২০৩—কমে যাওয়ায়) কোনো তেজস্ক্রিয় বস্তুর পারমাণবিক সংখ্যাও দুই একক কমে যায়। অথচ বিটা-ক্ষরণ হলে (এক একক পরিমাণ আধান বিশিষ্ট—পৃ. ২০৩—ইলেক্ট্রন কমে যাওয়া সত্ত্বেও) রূপান্তরিত বা নবোৎপন্ন বস্তুটির পারমাণবিক সংখ্যা এক একক বেড়েই যায়। পরে অবশ্য ১৯১৩ সাল নাগাৎ রাসেল (Alexander Smith Russell — 1888-?) এবং রাদারফোর্ডের আর এক ছাত্র ফাজান্‌স্ (Kasimir Fajans - 1887-?) এবং সডি

[স্থা]নান্তরের সূত্র (displacement laws) নামক সূত্রের মারফতে ব্যাপারটিকে ভাল [ক]রে বুঝিয়ে বললেন :

তেজস্ক্রিয় বস্তু থেকে আল্‌ফা-কণিকার ক্ষয় বা বিক্ষেপণ বা বিভাজন ঘটলে, নবোদ্ভূত উপাদানটি পর্যায়িক ছকের (Periodic Table) অন্তর্গত তার ঠিক দু'ঘর আগের (বাম পাশের) উপাদানের রসায়ন ধর্ম ও পারমাণবিক সংখ্যা নিয়েই আবির্ভূত হয়। আর বিটা-ক্ষরণের ফলে ওর উদ্ভব ঘটলে, ওর রাসায়নিক ধর্ম ও পারমাণবিক সংখ্যা হয় পর্যায়িক ছকের অন্তর্গত ওর ঠিক এক ঘর পরের (দক্ষিণের) উপাদানটিরই মত (পরে দ্রষ্টব্য, পৃ. ২৪৯)।

কিন্তু এও দেখা গিয়েছিল যে, আল্‌ফা-নির্গমের ক্ষেত্রে মূল উপাদান থেকে পারমাণবিক ওজনটি চার একক পরিমাণ কমে যায়। কিন্তু বিটা-নির্গমের ক্ষেত্রে মূল উপাদানের পারমাণবিক ওজন অবিকৃতই থাকে। অথচ কিনা তৎসত্ত্বেও তাদের রাসায়নিক গুণাবলী বদলে যায়।

কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, বিভিন্ন বংশলতিকার মধ্যে ঐরূপ তেজস্ক্রিয় রূপান্তর বশত এমন কতকগুলি উপাদানের উদ্ভব ঘটছে, যারা মূলত ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু হওয়া সত্ত্বেও রাসায়নিক গুণের দিক থেকে অভিন্ন। যেমন রেডিয়াম-A—Ra-A, রেডিয়াম-C′—Ra-C′, পোলোনিয়াম—Po ; থোরিয়াম-A—Th-A, থোরিয়াম-C′—Th-C′ ; অ্যাক্টিনিয়াম-A - Ac-A, অ্যাক্টিনিয়াম-C′—Ac-C′। তেজস্ক্রিয়তার দিক থেকে এরা প্রত্যেকেই আলাদা বস্তু। প্রথম তিনটি এক বংশের (ইউরেনিয়াম-রেডিয়াম বংশ)। তারপরের দু'টি আর এক বংশের (থোরিয়াম-বংশ)। এবং শেষ দু'টি যে আরও একটি পৃথক বংশের (অ্যাক্টিনিয়াম-বংশ) তা'ই কেবল নয়, এদের প্রথম উপাদানটি যেখানে আল্‌ফা-নিক্ষেপ করে চলেছে, দ্বিতীয়টি সেখানে নিক্ষেপ করছে বিটা-কণিকা। ওদের অর্ধায়ু-কালও পৃথক। আবার তৃতীয় বা চতুর্থ উপাদান উভয়েই আল্‌ফা-কণিকা পরিত্যাগ করতে থাকলেও একের আয়ুকাল অন্যের লক্ষ লক্ষ গুণ। অপর পক্ষে, ঐ সাতটি উপাদানের প্রত্যেকটির ভরও তাদের আয়ুকালের মত পৃথক। এসব দিক থেকে বিচারে এদের প্রত্যেককে ভিন্ন পরমাণু বলতেই হয়। অথচ আশ্চর্য এই যে ওদের সকলকারই রাসায়নিক গুণাবলী হুবহু এক এবং ওদের পারমাণবিক সংখ্যাও একই—৮৪। একারণে ওরা সকলেই পর্যায়িক ছকের একই ঘরে স্থান পাওয়ার যোগ্য। অথচ কিনা এযাবৎ পরমাণুর ওজনটিকেই তার রাসায়নিক গুণাবলীর মূল সূত্র বলেই জেনে আসা হয়েছে ! কিন্তু এখন স্পষ্টই জানা যাচ্ছে, বিভিন্নভাবের বহু বস্তুরই রাসায়নিক ধর্ম অভিন্ন। তেজস্ক্রিয় বংশাবলীতে এরকম দৃষ্টান্ত অন্তত পাঁচটি। আবার সর্বপ্রথম ১৯০৬ খ্রী.-এ আয়োনিয়াম এবং

থোরিয়ামের মধ্যে এ সম্পর্কটি ধরা পড়লেও পরে দেখা গেল যে, তেজস্ক্রিয় নয় এমন বস্তুও এদের সঙ্গে একাসনে স্থান পেতে পারে। যেমন তেজহীন সীসা তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম-G এবং থোরিয়াম-Dএর সঙ্গে সহবাসী রূপেই ছকের মধ্যে স্থান পেতে পারে। এসব থেকে বোঝা গেল যে, পৃথক ভৌতগুণ বা পৃথক পারমাণবিক ওজন বিশিষ্ট যেসব উপাদানের রাসায়নিক ধর্ম তথা পারমাণবিক সংখ্যা অভিন্ন, তাদেরও এক একটি পৃথক শ্রেণী নির্দিষ্ট হতে পারে। কিছু পরে সডি তাদের আইসোটোপ (আইসস্ অর্থাৎ সমান, টপস অর্থাৎ স্থান) বা সমস্থানিক বলে অভিহিত করেছিলেন (পরে দ্রষ্টব্য)। পরমাণুর সঙ্গে তাদের পার্থক্য এই যে, অস্থায়ী 'এই ক্ষীয়মাণ [দ্রষ্টব্য—পরমাণুর পরিণাম, ভরতেজের দ্বন্দ্ব-মিলন] পরমাণুগুলো তাদের নিঃসৃত তেজ দিয়ে তাদের নিজেদের গতিবিধি জানিয়ে দেয়, অথচ সাধারণ স্থায়ী পরমাণুগুলো থাকে নীরব ও অলক্ষ্য। তাছাড়া তেজস্ক্রিয় রশ্মির চমৎকার অন্তর্ভেদী ক্ষমতা আছে।' এদিকে আবার পারমাণবিক সংখ্যা এবং পারমাণবিক ওজন সংখ্যা এক হওয়া সত্ত্বেও যে, দু'টি বস্তু তেজস্ক্রিয় গুণের দিক থেকে পৃথক হতে পারে, এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল। যেমন. ইউরেনিয়াম-X_2 এবং ইউরেনিয়াম-Z। এদের নাম দেওয়া হয়েছিল আইসোমার।

শ্রেণীগুলি না হয় নামাঙ্কিত হল। কিন্তু কেন এমন হয়? কেন সব উপাদানই তেজস্ক্রিয় নয়? বা তেজস্ক্রিয় সব উপাদানের ক্ষয়-সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও ক্ষয়ের প্রকৃতি সকলের এক নয় কেন? কেন ওদের অর্ধায়ুগুলিও বা এক নয়? বা কেন তেজস্ক্রিয় বস্তুমাত্রেই কোনো না কোনো সমস্থানিক (isotope) দলে এসে পৌঁছল না? যারা সমস্থানিক হল তাদের ভৌত গুণাবলীর এত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাদের রসায়ন ধর্ম এক হয়ে গেল কেমন করে? শ্রেণী-বিন্যাসের অসাধারণ তাৎপর্যের কথা আমরা জেনেছি (পৃ. ৫২)। মৌলিক উপাদানমালার সেই-শ্রেণীবিন্যাসের মারফতেই পর্যায়িক ছক গঠিত হওয়ায় বস্তুজগতের অন্তরালবর্তী ক্রিয়মাণ মহাসত্যের পরিচয় বা দ্যোতনাই মানুষের কাছে এসে পৌঁচোচ্ছে। সত্যসন্ধানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীর একটি মস্তবড় হাতিয়ার এই শ্রেণীবিন্যাস। কিন্তু তেজস্ক্রিয় বস্তুর রাজ্যে এসে দেখা যাচ্ছে সব যেন উল্টা পাল্টা। শ্রেণীর অন্তর্গত শ্রেণীগুলিকে না হয় বোঝা গেল। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেও আবার শ্রেণী—যেমন ঐ আইসোটোপ। এর ব্যাখ্যা কি? না কি খেয়ালী প্রকৃতির অকারণ উদ্দাম নৃত্যে পদার্থ-তরঙ্গের যেখানে যেমন খুশি বস্তু-ফোয়ারা ফুটে উঠছে? এক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে না পেতে শত প্রশ্ন এসে পৌঁছোয় কোথা থেকে? কিন্তু সত্যসন্ধানের ইতিহাসে এইটিই আমরা বার বার দেখে আসছি। অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্যে সমস্যার অন্ত নাই। ঐ সমস্যা বা তত্ত্বসংখ্যার সীমাহীনতার জন্যই প্রকৃতি অসীম। এই রূপেই প্রকৃতি অর্থাৎ (যেমন আমরা

পূর্বে দেখেছি) পদার্থ-প্রকৃতি ছাড়া অন্য কোনোরূপ অসীমত্বের কল্পনা ভ্রমাদযুক্ত বা মিথ্যা হয়ে পড়ে। অন্য কোনো কিছুরই অসীমত্বকে প্রমাণ করতে গেলে সর্বপ্রথম এই প্রকৃতির সীমা নির্দেশ করে দিতে হয়। তবে সত্যই প্রকৃতির গতি যদি খেয়ালী প্রকৃতির অন্ধ গতি হয়ে থাকে তাহলে ঐ সীমানির্দেশ তো সম্ভব হয়না! সেক্ষেত্রে প্রকৃতির অসীমত্বও অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাহলে কি পূর্বোক্ত ঐ শ্রেণীগুলি সবই অর্থহীন, আকস্মিক ঘটনা শুধু?

কিন্তু এতো বৈজ্ঞানিক মনের সিদ্ধান্ত হতে পারেনা। বিজ্ঞানীর কাছে এক প্রশ্নের জায়গায় অসংখ্য প্রশ্ন এসে পড়ছে, একথা সত্য। তেমনি এ-সত্যও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে বিজ্ঞানী যখন প্রকৃতির একটি রহস্যকে উন্মোচিত করে দিতে পেরেছেন, তখন তাতে মানুষের অসংখ্য প্রশ্নের সমাধানও মিলে গিয়েছে। এক নীতি বা এক নিয়ম আপাতপ্রতীয়মান বহু অনিয়মের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিয়ে দিয়ে তাদের সকলকে মানুষেরই অধীনে এক নিশ্চিত বশ্যতা-সূত্রে বেঁধে দিয়েছে। অন্ধ আবেগের মধ্যে কোথা থেকে থাকবে এত সামঞ্জস্য, এত নিশ্চয়তা? তেজস্ক্রিয় বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে রাসায়নিক ধর্ম পরিবর্তনের মূল কারণ যে ঐ তেজক্ষয়, অর্থাৎ আল্‌ফা কিংবা বিটা কণিকার অপসারণ, একথা আমরা বুঝেছি (পৃ. ২৩২)। সুতরাং যাদের থেকে তেজক্ষয় চলছে, তারা যখন বিভিন্নই, তখন ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ঐ তেজস্খলনের রীতি বা হার বিভিন্ন না হলে সমধর্মের একস্থানিক উপাদানমালার উদ্ভব ঘটে কেমন করে? সুতরাং আইসোটোপ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি, বা গোটা বিশ্বটারই সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি, এ প্রশ্ন না উত্থাপন করলে সহজেই জানা হয়ে যায় যে ওদের উদ্ভবের কারণই হল ঐ অসমঞ্জস তেজক্ষয়। মূল উপাদানগুলির বিভিন্নতার জন্যই এই অসম ক্ষয়। সেই ক্ষয়ের বা ক্ষরণের ঐ প্রকার সকল অসামঞ্জস্যই আইসোটোপের মহাসামঞ্জস্যের দিকে অঙ্গুলি প্রসারণ করে রেখেছে। প্রকৃতির মধ্যে অন্ধত্বের লেশমাত্র কোথাও নাই। অজ্ঞানের জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা সে।

দ্বিতীয় পর্বঃ

প্রকৃতির মহাসামঞ্জস্যই বিজ্ঞানীর চরম আশা আর পরম ভরসা। তাই আজ তিনি সহস্র প্রশ্নের সম্মুখে এসেও আর ভীত সন্ত্রস্ত নন। মহাসত্যকে আবিষ্কার করার জন্য বিপুল ধৈর্য আর অনমনীয় দৃঢ়তা নিয়ে তিনি একের পর এক গ্রন্থি মোচন করে চলেন। তাঁর জানা আছে যে, পদার্থজগতের পরিবর্তন আর বিবর্তন ঘটছে বলেই সেখানে অসংখ্য নূতন প্রশ্নের আবির্ভাব ঘটবে। কিন্তু তৎসহ তাঁর মস্তিষ্কপদার্থও পরিবর্তিত এবং বিবর্তিত হয়ে চলেছে। সুতরাং সে-সমস্ত প্রশ্নের সমাধানও তিনি এনে

দিতে পারবেন। সম্মুখে তাঁর আলোর নীহারিকাপুঞ্জ। আর নক্ষত্র-শৈলমালার শিখর থেকে শিখরে তিনি এগিয়ে চলেছেন। তিনি অক্লান্ত। যেসব প্রশ্ন আজ তাঁর কাছে এসে পৌঁচেছে, তিনি জানেন, কাল তাদের সমাধানও এসে পৌঁছবেই। ঐ আল্‌ফা- বিটা- তেজ-কণিকার আলোকোৎসবে পরমাণু-জগতের কত নির্ঘোষ বজ্রের মত বেজে উঠছে! আল্‌ফা-কণিকার বিক্ষেপণ বিচার করেই তো পরমাণু-কেন্দ্রকের কত অমূল্য তথ্য তাঁর জানা হয়ে গেল! এমন কি, রাদারফোর্ডের সমীকরণ থেকে কেন্দ্রকীয় আধানের মাপ বা আকৃতিটি পর্যন্ত!

আল্‌ফা-বিক্ষেপণের বিশ্লেষণ থেকে যখন এক একটি পরমাণুর কেন্দ্রকীয় আধানের মাপ ধরা পড়ল তখন মনীষী মেন্দেলিয়েভের পর্যায়িক ছকের প্রকৃত তাৎপর্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। ছকের মধ্যে হাইড্রোজেনের সংখ্যা যে এক এবং অক্সিজেনের সংখ্যা যে আট, বা তামার সংখ্যা যে উনত্রিশ; এবং ঐ এক, আট বা উনত্রিশ যে যথাক্রমে ওদের পারমাণবিক সংখ্যা হিসেবে ছকের মধ্যে যথাক্রমে ওদের প্রথম, অষ্টম ও উনত্রিংশৎ ঘর বা অবস্থান-ক্ষেত্রকে স্থির করে দিচ্ছে,—জানা গেল যে তাদের মূল কারণ তাদের ঐ কেন্দ্রকীয় আধানের আকৃতিই। হাইড্রোজেনের অবস্থান ক্ষেত্র তথা পারমাণবিক সংখ্যা যে এক, তার কারণ ওর কেন্দ্রকে প্রাথমিক-আধানের আকৃতিটিও এক মাপের। অক্সিজেন-পরমাণু কেন্দ্রকের প্রাথমিক-আধানের আকৃতিটি আট এককের বলে তার পারমাণবিক সংখ্যা আট, আর তামার পরমাণু-কেন্দ্রকের প্রাথমিক আধানের ঐ উন-ত্রিশ এককের আকৃতিটিই ছকের উনত্রিংশৎ স্থানে তার আসন নির্ণয় করে দিয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, সত্তাযুক্ত যত রকমের আধানের কথা জানা গিয়েছে, ইলেক্‌ট্রন বা বিটা-কণিকার আধান তাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম বলেই তাকে প্রথম বা প্রাথমিক-আধান বলে ধরে নিতে হয়েছে। তাহলে তাকেই আধানের প্রথম একক ধরলে অন্য সকল প্রকার স্বতন্ত্র অস্তিত্বযুক্ত আধানকে তারই কোনো গুণিতক ধরে নিতে হয়। সুতরাং আল্‌ফা-বিক্ষেপণের বিশ্লেষণ-প্রণালি থেকে যখন কেন্দ্রকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির আধানের সংবাদ এসে পৌঁছল তখন তাদেরকে ঐ প্রাথমিক-আধানের একক দিয়ে প্রকাশ করার সুন্দর পদ্ধতিটিও প্রয়োগ করা হল। দেখতে পাওয়া গেল যে, কোনো উপাদানের পারমাণবিক সংখ্যার মূল মর্মই হল তার ঐ কেন্দ্রকীয় আধানের মাপটি। ভারের গুরুত্ব অনুযায়ী যে পরমাণুগুলি ছকের মধ্যে তাদের স্ব স্ব স্থানে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছে, এ কথাটির মধ্যে সত্য আছে এইজন্য যে, প্রায়ই দেখা যায় ঐ আধান-বৃদ্ধির সাথে সাথে ওদের ভারও বেড়ে চলেছে। কিন্তু প্রায় অসম্ভব হলেও যদি এমন বিষয় কল্পনা করা যায় যে, দু'টি উপাদানের মধ্যে একটির আধান বেশি হওয়া সত্ত্বেও অন্যটির চাইতে তার ভার কম, তাহলে ঐ আধানের গুরুত্ব-সূত্র অনুযায়ী সে তার লঘুত্ব সত্ত্বেও

ছকের মধ্যে ঐ গুরুতর ভার যুক্ত অন্য উপাদানটি অপেক্ষাও গৌরবময় পরবর্তী স্থানটি দখল করবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা প্রত্যক্ষও করেছি (পৃ. ৭১) যে, ছকের মধ্যে তিনটি জায়গাতেই মেন্দেলিয়েভ স্বয়ং ঐ কাজ করে দিয়েছেন। আর্গন-পটাসিয়াম, কোবাল্ট-নিকেল এবং টেলুরিয়াম-আয়োডিন,—এ তিনটি ক্ষেত্রেই তিনি লঘু উপাদানটিকে তার গুরুতর সঙ্গীটির দক্ষিণেই আসন করে দিয়েছেন। গোষ্ঠীর (group) নিয়মকে রক্ষা করতে গিয়েই যে তিনি তাঁর স্ব-গৃহীত ওজনের নিয়মকে নিজেই ভেঙে ফেলেছিলেন, সে কথা আমরা সেইস্থানে আলোচনা করেছি। কিন্তু এখন আল্ফা-বিক্ষেপণের বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেল যে ঐ যুগলত্রয়ের মধ্যে যাদের ভার কম তারা যে দক্ষিণে এসে বসেছে তার কারণ তাদের আধানের আকৃতি। তাদের প্রত্যেকেরই আধান তার পূর্ববর্তী অধিকতর ভারবিশিষ্ট উপাদানের চাইতে অধিক বলেই তাদের ঐ অধিকতর সম্মান। সুতরাং পর্যায়িক ছকের মধ্যে ঐ তিনটি ক্ষেত্রকে যে ব্যতিক্রম বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, আসলে ওগুলি কোনো ব্যতিক্রম নয়। একই অবস্থায় পার্থিব পদার্থের সর্বব্যাপ্ত সর্বাঙ্গে একই মহাসত্য বা তত্ত্ব-নিয়ম পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে। সেই কারণেই উপযুক্ত পদার্থ-সন্নিবেশ থেকে উদ্ভূত একটি যথোপযুক্ত মস্তিষ্কপ্রক্রিয়ার মধ্যেও তার তরঙ্গভঙ্গি ধরা দিতে বাধ্য। যে মানুষের মধ্যে ঐ রকমের মস্তিষ্কপ্রক্রিয়ার আবির্ভাব ঘটেছে, তাকেই আমরা বলি সত্যদ্রষ্টা। তাঁর প্রজ্ঞা কোনো বিশেষ কালে জগৎব্যাপ্ত পদার্থতরঙ্গের একটি বিশেষ ছন্দবন্ধনে ধরা পড়ে বলেই তিনি দার্শনিক বা মনীষী। সেই মনীষাবলেই মেন্দেলিয়েভ বুঝতে পেরেছিলেন যে, পরমাণু জগতের মধ্যে সর্বত্রই এক মহাসত্য আভাসিত হচ্ছে। সে সত্য যে ঐ আধান-পরিমাণের সত্য, সেকথা সচেতনভাবে তাঁর বোঝা সম্ভব ছিলনা। তার কারণ, তখনও প্রকৃতি থেকেই নির্দেশ এসে পৌছোয়নি বলে ঐ প্রাথমিক-আধানের বিষয় প্রমাণিত হওয়া তো দূরের কথা, তার অস্তিত্ব-কল্পনাও সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাই বলে তাঁর পূর্বোক্ত মহা-সিদ্ধান্তটির কারণ হিসাবে তাঁর কোনো দিব্যদর্শনও ঘটেনি। প্রকৃত দার্শনিক বা প্রকৃত বিজ্ঞানীর ভবিষ্যৎদৃষ্টির মধ্যে কোনো-না-কোনো ভাবেই যুক্তিসূত্র থাকতে বাধ্য। মেন্দেলিয়েভের যুক্তি একটি মাত্র সংকীর্ণ খাত ধরে প্রবাহিত হয়নি বলে ঐ গোষ্ঠীর (group) যুক্তিটি তাঁর ভবিষ্যৎদর্শনের একটি সূত্র হতে পেরেছিল।

কিন্তু তাহলে এখন বোঝা গেল যে, কেন্দ্রকীয় প্রাথমিক-আধানের মাপটিই পারমাণবিক সংখ্যা বা ছকের মধ্যে পরমাণুর স্থান নির্ণয়েরও আসল মাপকাঠি। তাহলে আবার একটি প্রশ্ন এসে পৌছায়। ঐ ভর বা ভার—যাকে অবলম্বন করেই মেন্দেলিয়েভ তাঁর পর্যায়িক ছকের মূল পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন, তার সঙ্গে কি তাহলে ঐ আধান বা বিদ্যুৎ বা তেজের কোনো সম্পর্ক নাই? বিরানব্বইটি উপাদানের

মধ্যে ঐ তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া আর সব ক্ষেত্রে তো বরং ভর-তেজের নিবিড় সম্পর্কের কথাই প্রমাণিত হচ্ছে। তাহলে নিশ্চয় ওখানে আরও কোনো গভীরতর রহস্য লুকিয়ে আছে। বিজ্ঞানী জানেন যে সে রহস্যের মর্মটিও এক সময় উদ্‌ঘাটিত হবে। তা যদি না হয়, তাহলে ভর ও তেজ সম্বন্ধে সমস্ত জল্পনা-কল্পনাও ব্যর্থ হতে বাধ্য। পার্থিব উপাদান অনুসন্ধানের সকল আশাকেই তাহলে নির্মূল করে দিতে হবে। বিজ্ঞানচিন্তার নির্বাসন দিয়ে তাহলে এক অকল্পনীয় মহাতমিস্রার মধ্যে একমাত্র অদৃষ্টকেই সম্বল করে বিলীন হয়ে যাওয়া ছাড়া পথ থাকবেনা। কিন্তু বিজ্ঞানীর সেরকম কল্পনাবিলাসের সময় কোথায়? গবেষণার মাল মশলা মেলাই এসে পড়েছে। অনেক সত্যের অনেক আলোই যে তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

একটি বিশেষ সত্য তাঁর কাছে ধরা পড়ল। তিনি বুঝেছেন যে, পরমাণুর মধ্যে ধন- ও ঋণ-বিদ্যুতের পরিমাণ সমান বলেই ওরা পরস্পর কাটাকাটি হয়ে যাওয়ায় পরমাণু বিদ্যুৎনিরপেক্ষভাবে অবস্থান করে। সুতরাং এক ধরনের বিদ্যুতের সঙ্গে শক্তিসাম্য রক্ষা করার জন্যই আর এক ধরনের বিদ্যুৎ সর্বদা প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। কিন্তু সব সময় তা সম্ভব হয়না বলেই মাঝে মাঝে পরমাণু তার নিরপেক্ষতা বর্জন করে আয়নরূপ গ্রহণ করে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে আবার এও দেখা যাচ্ছে যে, একটি ইলেক্‌ট্রনের বিদ্যুৎ-পরিমাণটিই প্রাথমিক-আধান বা বিদ্যুতের আধান মাপবার একটি ক্ষুদ্রতম একক। হাইড্রোজেন-পরমাণু ছাড়া অন্য সর্বত্র কেন্দ্রকীয় আধানের পরিমাণ এই একক-আধানের চাইতে বেশি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন। তাহলে একথা না মনে করে পারা যায়না যে, ঐ অতিকেন্দ্রকীয় (extra nuclear—কেন্দ্রকের অতিরিক্ত বা কেন্দ্রক বহির্ভূত) ঋণাত্মক ইলেক্‌ট্রনরাই তাহলে নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে বা কমিয়ে কেন্দ্রকীয় ধনাত্মক আধানপরিমাণের সঙ্গে শক্তিসাম্য রক্ষা করে চলে। কারণ, আধানের একক বলেই একটি ইলেক্‌ট্রনের মধ্যে প্রাথমিক-আধানের অতিরিক্ত তেজ থাকতে পারেনা; এবং তাহলে পরমাণুর ঋণাত্মক আধানবৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি একটি করে ইলেক্‌ট্রন বৃদ্ধির দ্বারাই আধানের ঐ মোট বৃদ্ধিটি ঘটা সম্ভব হয়। সুতরাং ধরা যেতে পারে যে, ধনাত্মক কেন্দ্রকীয় বিদ্যুৎপরিমাণটিই তাহলে স্থির ও নির্দিষ্ট, এবং কোনো কারণে অতিকেন্দ্রকীয় ইলেক্‌ট্রন সংখ্যা থেকে এক বা একাধিক ইলেক্‌ট্রন কমে গেলেই পরমাণুটির ধনাত্মক বিদ্যুতের আধান কার্যকরী হয়ে উঠে এবং পরমাণুটি ধনাত্মক আয়ন রূপে নিজেকে জাহির করে। আবার কোনো কারণে ইলেক্‌ট্রন সংখ্যা বেড়ে যেতেও পারে। তখন বিপরীত ঘটনা ঘটে।

কিন্তু ওদিকে আবার তেজস্ক্রিয় উপাদানের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ওর কেন্দ্রক থেকে দুই প্রাথমিক-আধান যুক্ত ধনাত্মক বিদ্যুৎকণাই বেরিয়ে আসে। তাহলে বুঝতে

াারা যায়, যে-কারণেই হোক না কেন, সেক্ষেত্রে তার কেন্দ্রক থেকেই দু'টি প্রাথমিক-াাধানের পরিমাণ কমে যাওয়ার জন্য পরমাণুর মূল তেজ-গড়নটিই পালটে যায়। কারণ ্র্বেই দেখেছি যে ঐ কেন্দ্রকীয় আধানের মোট পরিমাণ বা সমগ্র আধানের গড়নটিই তার বিশেষ পারমাণবিক মর্যাদার মূল কারণ। সেই মর্যাদার বলে সে পর্যায়িক ছকের াধ্যে একটি বিশেষ পরমাণু হিসেবেই বিশেষ আসন পায়। সুতরাং কেন্দ্রকীয় ব্যবস্থা থকে দুই প্রাথমিক-আধান যুক্ত ধনাত্মক কণিকা বিভাজিত বা বিশ্লিষ্ট হয়ে চলে গেলে পরমাণুটি স্বভাবতই তখন দুই-ধনাত্মক-আধান বিযুক্ত কেন্দ্রকবিশিষ্ট পরমাণুর সহিতই রাসায়নিক সকল গুণাবলীর দিক দিয়ে সমমর্যাদা সম্পন্ন হয়ে পড়ে। ফলে স্থানান্তরের সূত্র (displacement law—পৃ. ২৪২) অনুসারে সে পর্যায়িক ছকের মধ্যে দু' ঘর বাঁ-দিকেই সরে যায়। অথচ ঐ কেন্দ্রক থেকেই যখন একটি বিটা-কণিকা উৎক্ষিপ্ত হয়ে বেরিয়ে যায়, তখন ঐ কেন্দ্রকীয় ব্যবস্থা থেকে একটি প্রাথমিক ঋণাত্মক আধান স্খলিত হয়ে পড়ায় কেন্দ্রকের পক্ষে আর-একটি মাত্র ধনাত্মক প্রাথমিক-আধানের বল কার্যকরী হয়ে উঠে,—অর্থাৎ পরমাণুটির পূর্বাবস্থার চাইতে তখন তার কেন্দ্রকে একটি ধনাত্মক-আধানের বৃদ্ধি ঘটে যায়। ফলে সে যে একটি ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয়ে যায় কেবল তাই না, বাড়তি এক-প্রাথমিক ধনাত্মক-আধানের কেন্দ্রকবিশিষ্ট পরমাণুর সহিতও তখন সে রাসায়নিক ধর্মের দিক দিয়ে সমমর্যাদা সম্পন্ন হয়ে উঠে। ফলে ঐ একই স্থানান্তরের সূত্রানুসারে পর্যায়িক ছকের মধ্যে এক ঘর ডান দিকেই তার নতুন অবস্থান ঘটে।

উল্লেখযোগ্য যে, কেন্দ্রকের বহিস্থ বা অতিকেন্দ্রকীয় ইলেক্ট্রন সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হলে এরকম ঘটনা ঘটতে পারেনা। কারণ পূর্বেই দেখেছি, কেন্দ্রকীয় আধান-প্রকৃতির পরিবর্তনের মধ্যমেই পর্যায়িক ছকের পারমাণবিক সজ্জা, অর্থাৎ পদার্থসমুদ্র থেকে বিভিন্ন পরমাণু-বুদ্বুদের উৎপত্তি। কিন্তু অতিকেন্দ্রকীয় সন্নিবেশের পরিবর্তনের ফলে পরমাণু তার মূল ও স্থির গঠনপদ্ধতিটি বজায় রেখে আয়নে পরিবর্তিত হয়ে যায় মাত্র। আশ্চর্য মনে হয় যে, অতিকেন্দ্রকীয় ক্ষেত্র থেকে প্রাথমিক ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-কণিকাটি (ইলেক্ট্রন) সরে গেলে পরমাণু আয়নে সাজ পালটে ফেলে, অথচ কেন্দ্রকীয় তন্ত্র থেকেই সেই প্রাথমিক ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণিকাটি (বিটা) সরে গেলে আয়নের সাজ পালটানর সঙ্গে সঙ্গে সেই পরমাণুটিই দেহত্যাগ করে নতুন সব রসায়ন ধর্ম নিয়ে অন্য একটি পরমাণুরূপে পুনর্জন্ম লাভ করে। হয়ত 'ইলেক্ট্রন' আর 'বিটা' নামের পিছনে আপাতত এই ইতিহাসটুকু লুকিয়ে আছে। কিন্তু তাহলে দেহটি কি শুধু তেজ-ধারণের একটি কৌশল মাত্র, নিজেকে জানান দেওয়ার জন্য তেজের একটি পদ্ধতি? জড়কে অবলম্বন করে তেজ নিজেকে প্রকাশ করবে, ভাবতেও শিহরণ জাগে! যাকে স্বপ্রকাশ আর জ্যোতির্ময় জেনে এসেছি, জড়-রূপী ঐ জড়-জরতটি ছাড়া সে

অচল? আর এও এক পরমাশ্চর্যের বিষয় যে, কেউ যদি বাইরে থেকে চেষ্টা করে তার ইচ্ছানুরূপে ঐ পরমাণু-কেন্দ্রকটির পরিবর্তন সাধন করে দিতে পারে, তাহলে সেও তার প্রয়োজনীয় বস্তুর পরমাণুকেই যোগাড় করে নিতে পারবে! বিজ্ঞানীর সামনে আজ এ কী বিপুল সম্ভাবনার জগৎ এসে হাজির হয়ে গেল! পরমাণু তথা সমগ্র বস্তুজগতের প্রকৃতিকে তাহলে ইচ্ছামত কোনো বিশেষ ভঙ্গিতেই রূপান্তরিত করা চলবে! আর সেই কথার সত্যতা জানিয়ে দিচ্ছেন প্রকৃতিই স্বয়ং! আহা, যে-রূপটি বাস্তবিকই প্রকৃতির আর এক ভঙ্গি, অথচ তা মানুষেরও কত না প্রয়োজনের, মানুষ যদি তার অসংগত বাসনাবিলাস ত্যাগ করে পরিণতিসম্ভব সেই বিশেষ রূপ বা প্রকৃতির মত তার নিজের প্রকৃতিটিকেও একবার কোনো রকমে স্বেচ্ছায় রূপান্তরিত করে ফেলতে পারে!!

কিন্তু এসব বিপ্লবাত্মক চিন্তার পূর্বে তাদের মূলস্বরূপ বাদারফোর্ডের ঐ আল্ফা-বিক্ষেপণের বিশ্লেষণ-তত্ত্বটিকে বাজিয়ে দেখা দরকার। প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্য দিয়ে তার সত্যতা যাচাই না হলে চলবে কেন? রঞ্জেন-রশ্মিজাত বর্ণালি দিয়ে সেই কাজ নিপুণ ও সুনিশ্চিতভাবে সুসম্পন্ন হল। বর্ণালি-বিশ্লেষণ মারফতে কোনো বস্তুকে সনাক্ত করার পদ্ধতির কথা আমরা আগেই জেনেছি (পৃ ২১২-১৩)। ঐ পদ্ধতির এতটা উন্নতি সম্ভব হয়েছে যে তাতে কেবল বর্ণসমাবেশই নয়, রশ্মিমালার অনুরূপ তরঙ্গদৈর্ঘ্যও ধরা পড়ে যায়। প্রত্যেকটি রঙেরই পৃথক পৃথক তরঙ্গদৈর্ঘ্য (পৃ. ২২৫)। সেই দৈর্ঘ্য ছোট বা বড় হলে প্রতি সেকেণ্ডে তরঙ্গদের উদ্ভবসংখ্যাও বেশি বা কম হয়ে গিয়ে আমাদের নয়ন-মণিতে তারা এসে বিভিন্ন রং-বাহার খুলে ধরে। পৃথক রশ্মির ক্ষেত্রে ঐ সংখ্যা বা কম্পাঙ্ক (frequency) পৃথক। অসংখ্য বস্তুর রশ্মিমালার অসংখ্য ধরণের কম্পাঙ্ক। তাদের সবগুলিকেই যে মানব চক্ষু ধরে নিতে পারে, তা নয়। এখনও সে চোখ এত নিপুণ হয়নি। বেগ্‌নি থেকে লাল পর্যন্ত রামধনুর সাতটি রঙের তরঙ্গ বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যই মানুষের চোখে অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারে। রঞ্জেন-রশ্মি বা অতিবেগনি (ultra violet) প্রভৃতি আলোর রশ্মি—যাদের কম্পাঙ্ক সেকেণ্ডে ১০[১৫]-এর চাইতে বেশি, তাদের দৈর্ঘ্য এত ছোট যে তা আমাদের চোখে সাড়া জাগাতে পারেনা। ফলে আমাদের কাছে তা অদৃশ্যই থেকে যায়। বা, লাল-উজানী (infra-red) প্রভৃতি আলোর রশ্মি, যাদের কম্পাঙ্ক সেকেণ্ডে ৪ × ১০[১৪]-এর চাইতেও কম, তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য এত বড় যে তাকেও আমাদের চোখ ধরে ফেলতে পারেনা। তাই তারাও আমাদের কাছে অদৃশ্য হয়ে চলে। ঐ দু'টির মধ্যবর্তী কোনো কম্পাঙ্ক বা ঢেউ তুলে যারা এসে পৌঁছল, তাদের সকলকেই আমরা দেখতে পেলাম। যারা তাদের বাইরে পড়ে রইল, তারা দুর্ভাগা। মানুষের চোখে তাদের কোনো পরিচয় নাই। গামারশ্মিরও খুব উচ্চ কম্পাঙ্ক। অর্থাৎ সেও অতিক্ষুদ্র

তরঙ্গের দৃশ্য রশ্মি। কিন্তু রশ্মিদের মধ্যে একটি স্বাধর্ম্য আছে। তারা প্রত্যেকেই যে-তরঙ্গ সৃষ্টি করে, তার প্রকৃতি বা স্বরূপই বিদ্যুচ্চৌম্বক। কেবল তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা কম্পাঙ্কের দিক থেকেই তাদের যা পার্থক্য,—সা-রে-গা-মা প্রভৃতি সুরের মধ্যেও যেমন পার্থক্যটি কেবল শব্দ-তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বা কম্পাঙ্কের। আসলে ওরা সকলেই একই ধ্বনিশক্তির বৈচিত্র্যানুসারী প্রকাশ ব্যতিরেকে আর কিছু নয়।

কিন্তু মানুষের চোখে অদৃশ্য হলেও রঞ্জেন-রশ্মিরা মানুষের কাছে ব্যর্থ নয়। ঐ রশ্মি থেকেই যে মানুষ কত কাজ আদায় করে নিচ্ছে, তা আমরা প্রতিনিয়তই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তার কাছ থেকে আরও কাজ আদায়ের জন্য বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করতে লাগলেন। আমরা দেখেছি (পৃ. ১৭৩) যে ইলেক্ট্রনরা কঠিন পদার্থের উপর এসে আছাড় খেয়ে পড়লে ঐ রশ্মির উৎপত্তি ঘটে। ১৯১২ সালে জার্মান পদার্থবিদ্ মিউনিকের জুনিয়ার লেক্‌চারার ল' (Max Von Laue - 1879-?) এমন এক প্রকার বর্ণালি-বীক্ষণ ব্যবস্থার তত্ত্ব উদ্ভাবন করলেন, যাতে প্রায় সকল বস্তুরই এক্‌স্-রশ্মি-জাত বর্ণালি (X-ray spectra) পাওয়া সম্ভব। কোনো বিশেষ বস্তুর এক্‌স্-রশ্মি বর্ণালি পেতে গেলে ইলেক্ট্রন-কণিকাধারাকে যে অ্যাণ্টিক্যাথোডের (এক্‌স্-রশ্মি নলের ভিতরেই বিশেষ স্থানে স্থাপিত অন্য ক্যাথোড্—দ্র., পৃ. ১৭৩) উপর ছুঁড়ে মারতে হবে সেই ক্যাথোডটিকে ঐ বস্তু দিয়েই তৈরি হতে হবে। প্লাটিনাম ধাতুর উপর ঐ বস্তুর বিশেষ কোনো যৌগিকের প্রলেপ দিয়েও ঐ অ্যাণ্টি-ক্যাথোডটি তৈরি হতে পারে। বর্ণরেখাচিত্র পরীক্ষার জন্য অন্যদিকে ফটোগ্রাফিক প্লেট থাকে, পরে ওটিকে ডেভালাপ করাতে হয়। দেখা যায় যে, এক একটি উপাদানের বর্ণালিতে কতকগুলি রেখা বা রেখাগুচ্ছ সৃষ্টি হয়, এবং বিভিন্ন উপাদানের ক্ষেত্রেও তাদের একরূপতা বজায় থাকে। তাদেরকে R-, L- বা M-শ্রেণীতে নির্দেশিত করা হয়। রশ্মিবিচ্ছুরক পদার্থের প্রভাবই বর্ণালি-রেখাগুলির তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্দেশ করে দেয়। গ্যাসীয় পদার্থের বর্ণালির চাইতে এই এক্‌স্-রশ্মি বর্ণালি অনেক সরল ও সুন্দর হয়। ১৯১৩ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে রাদারফোর্ডের গবেষণাগারে কাজ করার সময় ব্রিটিশ বিজ্ঞানী মোজ্‌লে (Henry Gwyn Jeffreys Moseley- 1887-1915) ক্যালসিয়াম থেকে নিকেল পর্যন্ত উপাদানের প্রত্যেকটিকেই একটি এক্‌স্-রশ্মি নলের অ্যাণ্টি-ক্যাথোড হিসাবে ব্যবহার করে তার উপর ক্যাথোড্-রশ্মি (ইলেক্ট্রন) নিক্ষেপ করে পরীক্ষা করেন। দেখা গেল যে তাদের এক্‌স্-রশ্মি বর্ণালির মধ্যে প্রধানত দু'টি উজ্জ্বল রেখা (K- এবং M-রেখা) ফুটে উঠেছে। তখন তিনি পূর্বোক্ত ল'-এর উদ্ভাবিত একটি পদ্ধতির (কেলাস-পদ্ধতি—crystal method) সাহায্যে তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় করলেন। ধরা পড়ল যে, উপাদানের পারমাণবিক সংখ্যা (পৃ. ২৪৬-৪৭) বেড়ে চলার সাথে সাথে

প্রত্যেকটি শ্রেণীর (K-, M-) অন্তর্গত বর্ণরেখামালার কম্পাঙ্কও বেড়ে চলেছে। অর্থাৎ পর পর ওদের তরঙ্গদৈর্ঘ্যও কমে আসছে এবং পারমাণবিক সংখ্যার সঙ্গে তার ঐ দৈর্ঘ্যের বেশ একটি সম্পর্ক আছে। পারমাণবিক সংখ্যা দু'গুন বাড়লে তরঙ্গদৈর্ঘ্য চার গুণ কমে যায়। ঐ সংখ্যা তিন, চার বা পাঁচগুণ বাড়লে দৈর্ঘ্যও যথাক্রমে নয়, ষোল বা পঁচিশ গুণ কমে যায়। সুতরাং এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, উপাদানের পারমাণবিক সংখ্যাটি যে কেবল পর্যায়িক ছকের মধ্যে তার স্থানটি নির্দেশ করে দিচ্ছে তাই নয়, সেটির দ্বারা একটি পরমাণুর আধানের পরিমাপ তথা তার রাসায়নিক ধর্ম বা গুণাবলীও নির্দেশিত হয়ে যাচ্ছে। পরমাণু যখন বিদ্যুৎনিরপেক্ষ, তখন আধানের ঐ মাপটিই ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আধানের প্রত্যেকেরই পরিমাপ, এবং ইলেক্ট্রনই আধানমাপের একক হওয়ায় ঐ মাপক সংখ্যাটি পরমাণুর ইলেক্ট্রন সংখ্যাও বটে। কিন্তু পূর্ববর্তী আলোচনা অনুযায়ী (পৃ. ২৪৬-৪৭) যদি এক একটি মাপের কেন্দ্রকীয় ধনাত্মক আধানের বৃদ্ধির সঙ্গে পর্যায়িক ছকের পারমাণবিক সংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে, তাহলে তৎসঙ্গে ইলেক্ট্রনের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলতে থাকবে। অথচ দেখা গেছে যে (পৃ. ২৩৯-৪০), ইলেক্ট্রনগুলি কেন্দ্রক থেকে কিছু দূরেই অবস্থান করে। সুতরাং তারা যদি পরমাণু মধ্যে কোথাও দাঁড়িয়ে থাকত, তাহলে তারা নিশ্চয়ই কেন্দ্রকীয় ধনবিদ্যুতের টানে কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছত এবং পরমাণুটি তাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হত। বা, তার সমগ্র অঙ্গেই তখন একটি নিরপেক্ষ ভাব বিরাজ করত। ফলে আর আল্‌ফা-কণিকার বিক্ষেপণই ঘটতে পারতনা। সুতরাং আকর্ষণ থেকে মুক্ত থেকেও স্বক্ষেত্রে তাদের থাকতে হলে সূর্যের চতুর্দিকে প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণ্যমান গ্রহবৃন্দের মত ইলেক্ট্রনদেরও এক একটি কক্ষে সর্বক্ষণ প্রচণ্ড বেগে ঘূর্মিান থাকতে হয়। তা নাহলে তারা কেন্দ্রকের বিপরীত বিদ্যুতের টানকে কিছুতেই রুখতে পারবেনা। কিন্তু তাদের বেগ এমনভাবে পরিমিত হওয়া চাই যেন তারা আবার পরমাণু থেকে দূরেও পালিয়ে যেতে না পারে। কিন্তু তাতেও আবার প্রশ্ন আসে, তাহলে ইলেক্ট্রন-সংখ্যা বৃদ্ধির ফলেও সবগুলি ইলেক্ট্রনেরই কক্ষপথ বা কেন্দ্র-পরিক্রমার পথ কি একই থাকে? অর্থাৎ হাইড্রোজেন থেকে ইউরেনিয়াম পর্যন্ত বিরানব্বইটি উপাদানের সকলেরই ইলেক্ট্রন কি একই কক্ষপথে ঘুরতে থাকে—হাইড্রোজেনের কক্ষপথে মাত্র একটি আর ইউরেনিয়ামের কক্ষপথে ঠাসাঠাসি করে বিরানব্বইটি? না ভিন্ন ভিন্ন ইলেক্ট্রনের কক্ষপথ সব আলাদা? ঐ ১৯১৩ সালেই জুলাই মাসে এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন ঐ ম্যাঞ্চেস্টারেই গবেষণারত রাদারফোর্ডের আর এক ডেনমার্কীয় ছাত্র নীলস বোর (Niles Bohr—1885-196 ?)

রাদারফোর্ডের পারমাণবিক গঠনের তত্ত্বানুযায়ী উপরোক্ত কারণেই সিদ্ধান্ত করতে

হয়েছিল যে, পরমাণুর মধ্যে ইলেক্ট্রনগুলির উপর দু'রকমের শক্তি কাজ করে—(১) কেন্দ্রানুগ শক্তি, যা তাকে সর্বদাই কেন্দ্রের দিকে টানছে, (২) কেন্দ্রাতিগ শক্তি, প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণনের ফলে যা তাকে সর্বদাই বাহিরের দিকে ঠেলে রাখছে। দ্বিতীয়টির দ্বারা প্রথমটির প্রভাব কেটে যাওয়ায় একটি ইলেক্ট্রন কক্ষানুবর্তন করতে সমর্থ হচ্ছে। নচেৎ, কেন্দ্রকের আকর্ষণে সে তার উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে পরমাণুটি আর পরমাণু হয়ে টিকে থাকতে পারতনা। পূর্ব হিসাব মত (পৃ. ২৪০) কেন্দ্রক থেকে $১০^{-৮}$সে. মি. অর্থাৎ এক সেন্টিমিটারের দশ কোটি ভাগের একভাগ দূরে থেকে তাকে ঐভাবে ধাবমান থাকতে হলে সেকেণ্ডে হাজার হাজার মাইল গতিবেগ দরকার। বেগটি প্রচণ্ড। ইলেক্ট্রনের ঐ দ্রুত পরিক্রমাটি যেন তার কম্পনের মত—যা থেকে বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গ সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু ঐ বেগের ক্রমবৃদ্ধি আছে। সুতরাং ঐ বিদ্যুচ্চৌম্বক বিকিরণের তেজহ্রাসও আছে। নাহলে বর্ধিত বেগ নিয়ে ইলেক্ট্রনটি দূরে পালিয়ে যেত। আবার তেজহ্রাসের ফলে সে কেন্দ্রকেও গিয়ে পৌঁছে পরমাণুর বিলয় ঘটিয়ে দেয়না। পরমাণু তো এক দীর্ঘস্থায়ী সত্তা। তাহলে কি করে সম্ভব যে, শান্ত বা সাধারণ (শীতল) অবস্থায় সে কেন্দ্রক থেকে দূরে পালাবেনা, কেন্দ্রকের কাছেও আসবেনা, নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরেই বেড়াবে, অথচ তেজ বিকিরণ করবেনা? অথচ আবার ওদিকে জানা যাচ্ছে যে উত্তপ্ত হলেই যেকোনো বস্তু তেজ ছিটিয়ে চলে। বাহান্ন বছর আগে বানসেনও দেখেছিলেন (পৃ. ১৫৭-৫৮), উত্তপ্ত হলে সোডিয়াম তার হলুদ রঙ্ ছড়াতে থাকে। ইলেক্ট্রনই যদি ঐ রঙ্ ছড়িয়ে চলে, তাহলে তো ক্রমে ক্রমে সব ক'টি তরঙ্গদৈর্ঘ্য জনিত বর্ণালির সব ক'টি রঙই সোডিয়াম-বর্ণালিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। কিন্তু সে বর্ণালি তো সূর্যরশ্মির বর্ণালির মত সব ক'টি রঙের সমাহারমূলক অবিচ্ছিন্ন বর্ণবিভব নয়! তাহলে উত্তপ্তাবস্থায় ইলেক্ট্রনরা বেগে ঘোরে অথচ বাইরে ছুটে পালায়না, আলোর রঙ্ ছিটায় অথচ কেন্দ্রকেও গিয়ে পড়েনা—এ কি করে সম্ভব হয়?

সুতরাং অন্তত এ ব্যাপারে রাদারফোর্ডের তত্ত্বকে গ্রহণ করা চললনা। কিন্তু তাই বলে তাঁর পারমাণবিক কাঠামোর তত্ত্বটিকে যে বর্জনীয় হতে হবে, এমন কথা নাই। এ অবস্থায় তাঁর সুযোগ্য ছাত্র বোর, প্ল্যাঙ্ক-উদ্ভাবিত (পৃ. ২১১-১২) এবং আইন্স্টাইন্ কর্তৃক বিকশিত (পৃ. ২২১-২৫) পরিমাণ বা পারিমাণিক তত্ত্বের সাহায্যে রাদারফোর্ডের তত্ত্বকে বর্ণালি দৃশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুললেন। বোর অনুমান করলেন যে, ঘূর্ণমান ইলেক্ট্রনের বেগবৃদ্ধি ঘটেছে বলেই যে তাকে সর্বদা আলো বিলিয়ে চলতে হবে, এমন কি কথা আছে? অবশ্য তারা এলোমেলোভাবেও ঘুরে বেড়ায়না, নির্দিষ্ট কক্ষপথেই আবর্তন করে। কিন্তু আলো-তেজ না ছেড়ে দিয়েও যদি তারা দীর্ঘকাল

যাবৎ ঘুরে চলতে সমর্থ হয়, তাহলে যেভাবেই হোক না কেন ধরে নেওয়া যাক যে তারা সর্বদা আলো বিকিরণ করেনা। কারণ, পরিমাণ-তত্ত্ব অনুযায়ীও তো দীপ্যমান বা বিকীর্যমাণ তেজ (radiant energy) অবিচ্ছিন্ন ধারায় বহির্গত হয়ে আসেনা বা শোষিত হয়না ! কিন্তু কেন এমন হয়, বোরের অনুমান থেকেই পরবর্তীকালে তার সুসংগত ব্যাখ্যা মিলল। আমরা জানি কোনো গ্যাসের বর্ণালিতে যে পৃথক পৃথক বর্ণরেখা পাওয়া যায় (পৃ. ১৫৭-৫৮, ২১২-১৩, ২৫০) সেগুলির প্রত্যেকটির বর্ণই এক এক প্রকার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিচয় দেয়। একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্য আবার একটি মাত্র নির্দিষ্ট তেজেরই পরিচায়ক। সুতরাং একটি মৌলিক উপাদানের গ্যাসের ইলেক্ট্রন থেকেই ঐ ফোটনগুলি বেরিয়ে এসে (পৃ. ২২৪-২৫) একটি মাত্র নির্দিষ্ট বর্ণরেখা অঙ্কন করলে প্রমাণ হয় যে, নির্দিষ্ট উপাদানের পরমাণু একটি মাত্র নির্দিষ্ট তেজের ফোটনকেই বিকীর্ণ করে থাকে ; এবং বিকিরণের পূর্বে পরমাণুটি যে উচ্চ তেজস্তরগ্রস্ত থাকে, বিকিরণের পরে তার তেজ কমে যাওয়ায় তা থেকে পৃথক আর একটি তেজস্তরের উদ্ভব ঘটে,—এই রূপান্তর-ঘটনাটিই ফোটন-বিকিরণের দ্বারা প্রকাশ পায়। কিন্তু দেখা যায় যে, বর্ণালিতে একাধিক রেখাও ফুটে উঠে। অর্থাৎ একটি পরমাণু থেকে ভিন্ন ভিন্ন তেজের ফোটন বিনির্গত হতে পারে। অর্থাৎ একটি পরমাণুতেই বিভিন্ন তেজস্তর বিদ্যমান। তবে একটি বিশেষ উপাদানের বর্ণালিতে যেকোনো তরঙ্গদৈর্ঘ্য মেলে না বলে ধরে নিতেই হয় যে, তার তেজস্তরগুলি সর্বপ্রকারের হতে পারেনা। এক প্রকারের উপাদান বা এক প্রকারের পরমাণুতে কয়েকটি মাত্র নির্দিষ্ট তেজস্তরই বিদ্যমান থাকে। তাদের একটি স্তর থেকে অন্য স্তরে উদ্ভবের কালে যে ধরনের তেজবিশিষ্ট ফোটনের নির্গমন-ঘটে, বর্ণালিতে তদনুরূপ বর্ণরেখাই ফুটে উঠে। কিন্তু রেখাগুলির মধ্যে ফাঁক থাকায় বুঝা যায় যে, পরমাণুর ইলেক্ট্রনগুলি একটানা প্রবাহে ফোটন বিকিরণ করে চলেনা। অর্থাৎ আমাদের চোখে তেজ-বিকিরণ ঘটনাটি একটি একটানা প্রবাহ মনে হলেও আসলে মোটেই তা নয়। তাই পরমাণু-তত্ত্ব অনুযায়ী, সে কোনো বস্তু থেকে পৃথক পৃথক কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম নির্দিষ্ট অংশে বিভক্ত হয়ে উঠে আসে, অথচ আসে দলগত ভাবে। অর্থাৎ তেজের এক একটি পরিমাণ (quantum) যেন কোনো বস্তু থেকে লাফে লাফে ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে আসে ; সে পরিমাণটি সুনির্দিষ্ট। তার আংশিক আবির্ভাব অসম্ভব। তবে সেই তেজপরিমাণের মানটি নির্ভর করে বিকীর্ণ তেজের কম্পনের ওপর। কম্পন সংখ্যা বাড়লে পরিমাণের মানও বেড়ে যায়। যত গুণ বাড়ে সে সংখ্যাটিও স্থির করা হয়েছে এবং সে সংখ্যাটি (৬.৬২৪ × ১০$^{-২৭}$ আর্গ × সেকেণ্ড) প্ল্যাঙ্কের ধ্রুব সংখ্যা (Planck Constant—h) নামেই পরিগণিত হয়েছে (পৃ. ২১২)। আবার বিকীর্যমাণ এক একটি তেজপরিমাণের (quantum—তেজাংশ ; একে

তেজকণিকা বলা যেতে পারে) কতকগুলি নিয়ে এক একটি সংঘ গড়ে উঠে। তাকেই তেজসংঘ (photon) বলা যায়। এসব থেকে বোর কয়েকটি বিষয়কে স্বতঃসিদ্ধ বলেই ধরে নিলেন। অনেকটা ঝুঁকি নিয়েই তাঁকে ওরকম অনুমান করতে হয়।

তিনি বললেন যে, কেন্দ্রক-পরিক্রমা কালে কোনো ইলেক্ট্রন কোনো সুনির্দিষ্ট পথ ধরে চলেনা। তবে ঐ পরিমাণ-তত্ত্বের সঙ্গে সংগতি সম্পন্ন কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্ত তাকে মেনে চলতে হয় এবং এইভাবে সে কক্ষ পরিক্রমা চালিয়ে যায়। সেই কক্ষপথ-গুলিকে সুস্থির কক্ষ (stable quantum orbit) বলা যেতে পারে। কিন্তু সম্ভাব্য কোনো সুস্থির কক্ষে বিচরণকালে ইলেক্ট্রন কোনমতেই তেজ বিকিরণ করে চলেনা। বোর অনুমান করলেন যে, ইলেক্ট্রনের কক্ষ বা পরিক্রমা পথ অসংখ্য। যে ইলেক্ট্রনকে কেন্দ্রকের কাছের পথ ধরে চলতে হয়, স্বভাবতই তার ওপর কেন্দ্রকের টান খুব বেশি-ভাবেই পড়ে। ফলে টাল সামলাবার জন্য সেখানে তাকে দূরবর্তী কক্ষের ইলেক্ট্রনের চাইতে আরও জোরে ঘুরতে হয়। অর্থাৎ কেন্দ্রক থেকে যত দূরে যাওয়া যায় ততই কেন্দ্রকের আকর্ষণ কমতে থাকে। সুতরাং ইলেক্ট্রনের ঘূর্ণন-বেগও অনুরূপ ভাবে কমে এলে চলে। অবশ্য দূরত্বটি এখানে প্রধান বিষয় নয়, ইলেক্ট্রনের তেজ অনুযায়ী তাদের কক্ষপথ নির্ণীত হয়। এবং যতক্ষণ একটি ইলেক্ট্রন একটি বিশেষ পথ ধরে চলতে থাকে, ততক্ষণ সে কোনো আলো বিতরণ করেনা। কিন্তু বোর আবারও অনুমান করলেন যে, একটি ইলেক্ট্রনও সর্বদা একই পথে তার পরিক্রমা চালায়না। আমরা জানি যে, মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের আওতায় এসে পৌঁছলে একটি প্রস্তর খণ্ড কোথাও বাধা না পেলে মাটির টানে ক্রমশই দূরতর বা উচ্চতর মণ্ডল থেকে নিকটতর বা নিম্নতর ভূ-মণ্ডলের দিকে ছুটে আসতে থাকে। কোথাও বাধা না পাওয়া পর্যন্ত তার এই অঞ্চল পরিবর্তন চলতে থাকে। বাধা না পেলে ইলেক্ট্রনও এভাবে অঞ্চল বা স্তর পরিবর্তন করে। কিন্তু সে তেজ-কণিকা। সুতরাং তেজধর্মানুসারেই তার সেই পরিবর্তনটি ঘটে তেজের উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তরের দিকেই। মাঝে মাঝে সে নিম্নতর তেজস্তরেই নেমে আসে। কিন্তু কিছুটা তেজ না ছেড়ে দিলে তার পক্ষে তা সম্ভব হবে কেমন করে? তাই তখন তাকে তেজ বিকিরণ করতে হয়। কিন্তু সে যখন ঐ তেজ ত্যাগ করে কেন্দ্রকের টানে নিচে নেমে আসে তখন বিরুদ্ধধর্মী তেজবিশিষ্ট কেন্দ্রকের কাছাকাছি এসে যাওয়ায় তাকে টাল সামলাবার জন্য আরও জোরে ছুট লাগাতে হয়। কিন্তু ততক্ষণে তার ঐ পরিত্যক্ত তেজটি এক একটি তেজাংশপরিমাণের কণা বা ফোটন রূপ ধরে বিভিন্ন পরমাণুর ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে শেষে আমাদের চোখে এসে পৌঁছায়, প্রিজমের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ফটো-প্লেটের ওপর তার বর্ণ পরিচয় দিয়ে দেয়। তবে প্লেটের উপর স্বীয় কৃষ্ণবর্ণ প্রতিচ্ছবিটি এঁকে দেওয়ার পূর্বে ঐ ফোটন-

তেজটিকে বহুবারই রূপান্তরিত হয়ে আসতে হয়। এসব সিদ্ধান্ত এবং অনুমানকে আশ্রয় করে ১৯১৩ সালেই ইলেক্ট্রন নিয়ে বোর একটি রীতিমত মতবাদ গড়ে তুললেন।

কতকগুলি ইলেক্ট্রন যেন এক একটি গোষ্ঠী রচনা করে এবং এক একটি থাপ বা স্তরের মধ্যে থেকে তারা কেন্দ্রকপরিক্রমা চালিয়ে যায়। কেন্দ্রক ঘিরে প্রথম যে থাপ, তার নাম দেওয়া হল কে-থাপ। কেন্দ্রক থেকে আরও দূরে কে-থাপের বহিঃসীমান্তে এল-থাপ কে-থাপকে ঘিরে রয়েছে; এল-থাপের পর এম-থাপ। এভাবে থাপের সংখ্যা হবে সাতটি। হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম, এই দু'টি মাত্র পরমাণু এক-থাপওয়ালা। ঐ একটি থাপের মধ্যেই হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটি মাত্র নিঃসঙ্গ ইলেক্ট্রন, আর হিলিয়াম-পরমাণুতে একটি ইলেক্ট্রন-জোড় অবিরাম গতিতে ছুটে চলছে। তারপর ৩-সংখ্যার লিথিয়াম থেকে ১০ সংখ্যার নিয়ন পর্যন্ত আটটি উপাদানের প্রত্যেকটিরই দু'টি করে থাপ। এদের সব পরমাণুতেই প্রথম থাপে দু'টি করে ইলেক্ট্রন নির্দিষ্ট। কিন্তু লিথিয়াম-কেন্দ্রকের প্রাথমিক-আধানের তিন-মাপের সঙ্গে সাম্য রক্ষার জন্য হিলিয়ামের দু'টি ইলেক্ট্রন সংখ্যার চাইতে যেই আর একটি ইলেক্ট্রন বেশি (অর্থাৎ মোট তিনটি ইলেক্ট্রন) দরকার হয়ে পড়ল; অমনি আর একটি থাপ বা তেজক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গেল এবং তার মধ্যেই ঐ বাড়তি ইলেক্ট্রনটি ঠাঁই পেয়ে ঘুরতে লাগল। বেরিলিয়ামের বেলায় ঐ নতুন থাপে আর একটি ইলেক্ট্রন বাড়ল, বোরনের বেলায় আরও একটি। এভাবে ইলেক্ট্রন বেড়ে চলতে লাগল বটে, কিন্তু ওদের সকলেরই বিচরণক্ষেত্র বজায় রইল ঐ দ্বিতীয় থাপ বা তেজস্তরটি। কিন্তু নিয়নে পৌঁছে ঐ দ্বিতীয় স্তরে যেই আটটি ইলেক্ট্রন এসে গেল, অমনি তার পরের আর একটি নবাগত ইলেক্ট্রনকে ঠাঁই দেওয়ার জন্য আর একটি তৃতীয় তেজস্তর খুলে গেল। সেখানে একাদশ সংখ্যক একটি ইলেক্ট্রন ঘূর্ণমান হওয়ার সুযোগ পেয়ে আর একটি নূতন পরমাণুর উদ্ভব ঘটে গেল। সেটি সোডিয়াম-পরমাণু, তার পারমাণবিক সংখ্যা এগার। তৃতীয় স্তরেও পর পর মোট আটটি ইলেক্ট্রন ঠাঁই পেল। কিন্তু পরবর্তী চার, পাঁচ, ছয় কি সাত থাপ যুক্ত উপাদানগুলির ইলেক্ট্রনের স্তরবিন্যাস একটু জটিল প্রকৃতির। মোটামুটি বিন্যাসটি ধরিয়ে দেওয়ার জন্য বোর একটি সমীকরণ উপস্থাপিত করলেন:

$$N = 2n^2$$

এর দ্বারা বোর দেখিয়ে দিলেন যে, যত সংখ্যক (n) স্তরকে নেওয়া হচ্ছে, সেই সংখ্যার বর্গকে দুই দিয়ে গুণ করলেই ঐ স্তরের মোট ইলেক্ট্রন সংখ্যা (N) কত পর্যন্ত হতে পারে তার সীমাটি মিলে যাবে। অর্থাৎ ঐ সংখ্যার চাইতে আর বেশি ইলেক্ট্রন ঐ স্তরে আঁটবেনা। তবে প্যালাডিয়ামের ক্ষেত্র ছাড়া আর কোথাও শেষ স্তরে কখনও ৮-এর বেশি এবং তার ঠিক পূর্বের স্তরে কখনও ১৮-এর বেশি ইলেক্ট্রন থাকেনা।

আবার তেজস্তর বা বিদ্যুৎক্ষেত্রগুলি পর পর কেন্দ্রক থেকে দূরাবস্থিত হওয়ায় ইলেক্ট্রনগুলির সকলের উপরে কেন্দ্রক-শক্তির টানটি সমান হয়না। কাছের K-খাপের ইলেক্ট্রন দু'টির ওপর ওর জুলুম সর্বাধিক। সে তুলনায় এল-খাপের ইলেক্ট্রনগুলির উপরে ওর আকর্ষণের জোর একটু কম। এভাবে পর পর ওর আকর্ষণ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় শেষের বা সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী স্তরের ইলেক্ট্রনের উপর ওর টানটি খুব কমই থাকে। এর ফলটি কিন্তু হয় বেশ মজার। স্বীয় কক্ষপথে থেকে টাল সামলাবার জন্য প্রথম স্তরের ইলেক্ট্রনগুলির তুলনায় এই শেষ স্তরের ইলেক্ট্রনগুলির অনেক কম জোরে ঘুরলেই চলে যায়। সুতরাং সে কারণে তাদের গতিতেজও কম ব্যয়িত হয়। তার ফলে তাদের নিজ নিজ তেজ কিন্তু বজায় থাকে সর্বাধিক। সে তুলনায় তাদের পূর্ববর্তী স্তরের উপর কেন্দ্রক-শক্তির টান আরও বেশি বলে সেখানকার ইলেক্ট্রনদেরকে টাল সামলাবার জন্য আরও জোরে ঘুরতে হয়, তার ফলে তাদের গতিতেজটি আরও ক্ষয়ে যায়, তারা কিছু কমতেজী হয়ে পড়ে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে নিচের স্তরে নেমে এলে প্রথম বা কে-খাপটিতে এসে দেখা যায় যে ওর ইলেক্ট্রনরা কেন্দ্রকের কৃপাকৃষ্ট হয়ে প্রবল বেগে ঘুরতে ঘুরতে একেবারে প্রায় বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। সেখানে ওরা প্রায় নিস্তেজ। এ ব্যাপারের ফলটি আরও মজার। যদি ঐ সর্বনিম্ন তেজস্তর থেকে কোনো ইলেক্ট্রনকে সরাতে হয়, তাহলে সেটি হবে বেশ শক্ত কাজ। কারণ, সেই ইলেক্ট্রনটি এখন প্রায় পরবশ। অথচ বহিস্তম বা উচ্চতম তেজস্তর সম্বন্ধে ব্যাপারটি একেবারেই বিপরীত। ওখানকার ইলেক্ট্রনের ওপর কেন্দ্রকের প্রভাব সব চাইতে কম বলে সে ওখানে নিজের তেজে প্রায় ভরপুর হয়ে থাকে। অতি সহজেই সে ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। তাই সামান্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই পরমাণুর বহিস্তম স্তর থেকে ইলেক্ট্রনরা সরে যাওয়ার ফলে একটি পরমাণু একটি ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয়ে যায়। [বস্তুত একটি পরমাণু থেকে একটি ইলেক্ট্রন সরিয়ে দিয়ে ওকে একটি আয়নে পরিণত করবার জন্য যে পরিমাণ শক্তি বা তেজ ব্যয়িত হয়, সেইটিই পরমাণুতে ইলেক্ট্রনের বন্ধন-শক্তি বা যোটন-তেজের (binding force) পরিমাপও (পৃ. ২৬১, ২৭৬)]।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ঐ বহিস্তরের ইলেক্ট্রনরাই রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করে। কারণ ওরাই পরমাণু থেকে সহজে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। তখন কোনো উপাদানের যেসব বিশেষ বিশেষ পরমাণুর বহিস্তরে ইলেক্ট্রন সংখ্যা বেশি আছে, তারাও অতি সহজেই ঘাটতি কোনো উপাদানের বহিস্তরের অভাব মিটিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়ে যৌগিক গঠন করে ফেলতে পারে। সুতরাং প্রকারান্তরে ঐ বাইরের ফটকের অধিবাসীরাই পরমাণুর রাসায়নিক গুণাবলীর কারণ

হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু একটি বহিস্তরে সর্বাধিক পরিমাণ ইলেক্ট্রন এসে পৌঁছলে তখন তারা এমন একটি সুদৃঢ় ব্যবস্থা ফেঁদে ফেলে যে তখন সেখান থেকে ইলেক্ট্রন সরিয়ে নেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে। যেমন হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপ্টন, জেনন আর র্যাডনের ক্ষেত্রে। প্রথম বা কে-স্তরে সর্বাধিক ইলেক্ট্রন সংখ্যা হতে পারে ($২ \times ১^২ =$) দুই। হিলিয়ামের ক্ষেত্রেই সেই ঘটনাটি ঘটেছে। তাই সেই কারণে হিলিয়ামের ঐ প্রথম বা বহিস্তর থেকে আর কোনো ইলেক্ট্রন সরিয়ে ফেলা সহজ হয়না বলে ঐ গ্যাসটিকে আয়নে পরিণত করা যায়না। আমরা পূর্বেই দেখেছি রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে পরমাণুর নয়, আয়নেরই। সুতরাং ঐ হিলিয়াম-পরমাণুবৃন্দ নিষ্ক্রিয় স্বভাবের একটি গ্যাস মাত্র হয়ে থাকে। নিয়নের অবস্থাও তাই। কারণ, দ্বিতীয় বা দু'য়ের স্তরে সর্বাধিক ইলেক্ট্রন-সংখ্যা হতে পারে $২ \times ২^২ = ৮$, এবং যে উপাদানের দ্বিতীয় বা এল-স্তরে আটটি ইলেক্ট্রনের সমাবেশ ঘটেছে, তারই নাম দেওয়া হয়েছে নিয়ন। ফলে ঐ নিয়নের বহিস্তরে সর্বাধিক পরিমাণে ইলেক্ট্রন-সন্নিবেশ ঘটায় ওরও বহিস্তরটি বেশ সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে। ওখান থেকে কোনো ইলেক্ট্রনকে সরিয়ে দিয়ে ওকেও আয়নে পরিণত করে ওর দ্বারা রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটান সহজ হয়না। পর্যায়িক ছকের ওপর-নিচে সাজান ঐ যে হিলিয়াম থেকে র্যাডন পর্যন্ত উপাদানগুলি একটি গোষ্ঠী রচনা করে রয়েছে, ওদের সকলেই এক একটি বহিস্তরের ইলেক্ট্রন সংখ্যাকে সমাপ্ত করে দিয়ে এক একটি পর্যায়ের প্রান্তিক উপাদান রূপে দাঁড়িয়ে থাকায় ওদের প্রত্যেকেরই বহিস্তর সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে। ফলে ওদের কারও বহিস্তর থেকে ইলেক্ট্রনরা সরে যেতে চায় না। তাই ওদের সকলেরই রাসায়নিক গুণও এক ধরনের হয়ে উঠেছে। সে গুণটি ওদের ঐ নিষ্ক্রিয়তা। ওরা সকলেই তাই নিষ্ক্রিয় গ্যাস। আবার এই ভাবে ওদের ঠিক পরবর্তী উপাদানগুলিও যে-গোষ্ঠী রচনা করেছে, তারাও সমধর্মী। যেমন ধরা যাক ওদের মধ্যে হিলিয়ামের পর লিথিয়াম, নিয়নের পর সোডিয়াম এবং আর্গনের পর পটাসিয়াম। ওদের প্রত্যেকটি দিয়েই এক একটি নূতন থাপ বা নূতন পর্যায় আরম্ভ হয়েছে বলে ওদের প্রত্যেকেরই শেষ বা বহিস্তরে একটি করে সঙ্গীহীন ইলেক্ট্রন ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই নিঃসঙ্গ পথিককে তাই স্বল্পতম প্রয়াসেই বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায়। রাসায়নিক প্রবণতার দিক থেকেও তাই ওরা সব সমধর্মী—সকলেই ক্ষারীয় ধাতু। পর্যায়িক ছকের অন্যান্য গোষ্ঠীর উপাদানগুলি যে রাসায়নিক প্রবণতার দিক থেকে সমধর্মী (পৃ ৬৪-৭১) তার কারণও ঐ একই বহিস্তরীয় ইলেক্ট্রন-বিন্যাস।

কিন্তু জগতের সকল প্রকার শক্তির মত বিদ্যুৎশক্তিও সর্বদাই উচ্চ স্তর থেকে নিম্নতম স্তরের দিকে প্রবাহিত হতে চায় বলে ঐ বহিস্থ ইলেক্ট্রনগুলির সর্বদাই নিম্নতম কে-স্তরে গিয়ে পৌছবার জন্য একটি ঝোঁক থাকে। কিন্তু ১-সংখ্যক থাপে বা

কে-স্তরে দুই (২ × ১² = ২)-এর বেশি ইলেক্ট্রনের স্থান হতে পারেনা বলে বাকি ইলেক্ট্রনগুলিকে বাধ্য হয়ে ২-সংখ্যার এল-স্তরে ঠাঁই খুঁজতে হয়। কিন্তু সেখানেও আট (২ × ২²)-এর বেশির জন্য জায়গা নেই। ফলে পরমাণুতে দশ (প্রথম স্তরের ২ + দ্বিতীয় স্তরের ৮)-এর বেশি ইলেক্ট্রন হলেই সেগুলিকে বাধ্য হয়ে তৃতীয় - বা এম-স্তরে জায়গা দেখতে হয় এবং এভাবে স্তরবিন্যাস ঘটতে থাকে। ফলে এম-স্তরের কোনো ইলেক্ট্রন সরিয়ে পরমাণুটিকে আয়নে পরিণত করতে গেলে, যে-শক্তি প্রয়োগ করতে হয়, এল-স্তরের ইলেক্ট্রন সরাবার জন্য শক্তি লাগে তারও বেশি। কে-স্তরের ক্ষেত্রে কিন্তু ঐরূপ ঘটনা ঘটাবার জন্য ঐ শক্তিকে আরও বাড়াতে হয়। কিন্তু যদি কে-স্তর থেকে ইলেক্ট্রনকে একেবারে পরমাণুর বাইরে না পাঠিয়ে কেবল এল - বা এম-স্তরে সরিয়ে দিতে হয় তাহলে নিশ্চয়ই ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ ততটা হয়না। এইভাবে কোনো ইলেক্ট্রনকে তার স্বীয় ক্ষেত্র থেকে অন্য কোনো বহিস্তরে সরিয়ে দিলে পরমাণুটি আয়নে পরিণত হয়ে যাবেনা সত্য, কিন্তু তখন ঐ পরমাণুর স্বাভাবিকত্বও আর বজায় থাকবেনা। কারণ, নিজ স্তর ছেড়ে বহিস্তরে আসায় ইলেক্ট্রনের তেজও তখন কিছুটা বেড়ে যায়। কিন্তু সে তেজ কতটা? বা, কোথা থেকে তা সংগৃহীত হতে পারে?

মনে করা যেতে পারে যে, কেন্দ্রকের টানে সব ইলেক্ট্রনই যদি ক্রমে ক্রমে কেন্দ্রকের কাছাকাছি গিয়ে পৌছতে থাকে, তাহলে শেষ-পর্যন্ত তারা তো তাদের সমস্ত বিকিরণ-তেজই হারিয়ে ফেলবে। সেক্ষেত্রে পরমাণু অর্থাৎ পরমাণুগঠিত যে-কোনো বস্তুই চিরতরে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কিন্তু তা' যখন হয়না, তখন ধরে নিতে হয়-যে, ইলেক্ট্রনরা কেবল অন্তস্তরেই তলিয়ে যায়না। তারা বহিস্তরেও ভেসে আসতে পারে। কিন্তু সেজন্য নিশ্চয় তাদের নতুন করে তেজ পেতে হবে। সংলগ্ন তেজস্তরে উঠে আসতে গেলেও অন্ততপক্ষে ঐ দু'টি স্তরের অন্তরফলের সমমানের তেজ চাই। পরমাণুবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ ঘটলে তাদের গতিতেজ থেকে সেই তেজ আহরণ করা সম্ভব। কিন্তু ঐ গতিতেজের প্রয়োজনে সংঘর্ষটি ঘটান যাবে কোন্ তেজ দিয়ে? এর উত্তর—তাপীয় তেজ দিয়ে। অর্থাৎ, হাজার হাজার ডিগ্রির উষ্ণতার দ্বারা ঐ তাপীয় গতি-তেজ সৃষ্টি করা যেতে পারে। কোনো বস্তু ঐ রকমের উষ্ণতা প্রাপ্ত হলে তার ইলেক্ট্রনগুলিও সেই থেকে প্রচণ্ড তেজ প্রাপ্ত হয়ে বহিঃকক্ষগুলিতে ছুটে যায়। কিন্তু কেন্দ্রকের আকর্ষণটিও সর্বদাই বর্তমান থাকে। তার ফলে আবার তাদেরকে নিম্নস্তরে নেমে আসতে হয়। তখন সেই অভ্যন্তর প্রদেশে ঝাঁপিয়ে পড়বার সময় তারা পূর্ববর্ণিত কারণে আলো ছিটিয়ে আসতে বাধ্য হয়। তাপ-তেজই তখন গতি-তেজের মারফতে আলো-তেজে রূপান্তরিত হয়ে গিয়ে আমাদের চোখে এসে ধরা দেয়। কিন্তু

তাপ-তেজের উন্মাদনা পেয়ে আবার ঐ ইলেক্ট্রনরা তেজবান হয়ে বহির্দ্বারে ছুটে যেতে চায়। এভাবে পরমাণুর মধ্যে যেন এক বিপ্লব ঘটে উঠে। বিজ্ঞানীরা তার তখনকার সেই বাড়তি তেজযুক্ত অবস্থার নাম দিয়েছেন উত্তেজিত (**excited**) অবস্থা।

পরমাণুর বহিস্তর থেকে ইলেক্ট্রন খসে গেলে আয়নায়িত পরমাণু তার ঐ ক্ষতস্থান পূরণের জন্য অন্য কোনও মুক্ত ইলেক্ট্রন খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু উত্তেজিত পরমাণুর ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রন সংখ্যা যথোপযুক্ত থাকায় সে অন্য কোনো ইলেক্ট্রনকে খুঁজে বেড়ায় না। তবে তার ঐ বর্ধিততেজ ইলেক্ট্রনটিও উচ্চমানের তেজস্তরে স্থির হয়ে থাকতে পারেনা। আয়নের চাইতে আরও ক্ষিপ্র গতিতে সে নিম্নস্তরে নেমে এসে পরমাণুটিকে স্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। উত্তেজিত অবস্থার ঐ পরমাণুতে ইলেক্ট্রনরা যেন উন্মত্ত উল্লম্ফন শুরু করে দেয়। এক এক লাফে তখন তাদের পক্ষে এক বা একাধিক দূর দূরান্তর কক্ষে হঠাৎ আবির্ভূত হওয়া মোটেই শক্ত হয়না। তার ফলও হয় বিচিত্র। নীল্‌স্ বোর বললেন, তখন তারা যে বাড়তি তেজটি পরিত্যাগ করে যায় সেই তেজই আলো-শক্তিরূপে বিকীর্ণ হয়ে পড়ে। ঐ শক্তি-পরিমাণই এখন প্রাথমিক তেজসংঘ বা এক কোয়াণ্টাম আলো নামে পরিচিত। কিন্তু ইলেক্ট্রনরা এভাবে অভ্যন্তর-প্রবেশকালে একলাফে একাধিক তেজস্তর অতিক্রম করার জন্য যেসব ফোটনের জন্ম দিয়ে আসে, তারাও সব উচ্চ থেকে উচ্চতর তেজ-বিশিষ্ট হয়ে উঠে। তাদের কম্পাঙ্কও ক্রমবর্ধিত হতে থাকায় তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ক্রমক্ষুদ্র হয়ে আসে। বিকীর্ণ আলো তখন উজ্জ্বল লোহিতাভা থেকে উজ্জ্বলতর হতে হতে ক্রমেই বেগনি সীমার দিকে চলে যায়।

কিন্তু কোন্ আলোর প্রকৃতি কি হবে? অর্থাৎ বহুবিধ আলোক-রশ্মির (পৃ ২১২-১৩ মধ্যে কোনটি কোন্ শ্রেণীভুক্ত হবে? বোর বললেন যে সেটি নির্ভর করবে স্বাভাবিক অবস্থায় পরমাণুটির মোট তেজ (w_0) এবং তার উত্তেজিত অবস্থার তেজ (w_1), এই উভয়ের পার্থক্য($w_1 - w_0$)-এর উপর। কারণ, ঐটিই হয় পরমাণুর তথা উচ্চ তেজস্তরে আগত ইলেক্ট্রনের বাড়তি তেজ,—যার সবটুকুই সে তার পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়ার সময় বিকীর্ণ করে যায়। উত্তেজনা জনিত তেজ যতই বেশি হবে, উপজাত আলোর কম্পাঙ্কও ততই বাড়বে। আর আমরা জানি যে (পৃ ২৫০-৫৩), আলোর প্রকৃতি (বর্ণ) তার কম্পাঙ্কের উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠে। ঐ কম্পাঙ্ক (ν) নির্ণয়ের জন্য বোর পূর্বোক্ত প্ল্যাঙ্কের তত্ত্বটি গ্রহণ করলেন এবং প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক (**h**—পৃ ২৫৪)-এর সাহায্য নিয়ে তিনি একটি সমীকরণও উপস্থাপিত করলেন:

$$\nu = \frac{w_1 - w_0}{h}$$

এর মধ্যে h-এর মান তো পূর্ব থেকেই স্থির করা আছে (পৃ. ২১২)। সুতরাং বাড়তি তেজের পরিমাণও ($w_1 - w_0$) মাপা হয়ে গেলে কম্পাঙ্কটিও (ν) সহজেই পাওয়া যায়। আর এ থেকে আলোর প্রকৃতিটিও জানা হয়ে যায়। বস্তুত ঐ বাড়তি তেজ বা ($w - w_0$), বা νh-ই এক কোয়াণ্টাম আলো রূপে বিদিত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, একবার যখন একটি ফোটন তার পারমাণবিক বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে মানব-নয়নালিঙ্গনে ধরা দেয়, তখন সেই পরমাণুর অভ্যন্তর লোক থেকে সে কত বার্তাই না চুরি করে এনে দেয়। প্লেটের ওপর তার পরিচয়-রেখার অবস্থান ও তার মাপ থেকে ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য অর্থাৎ পরমাণুর অন্তর্গত দু'টি তেজস্তরের (দু'টি সীমার) অন্তর্গত দূরত্ব মিলে যায়। ফোটনের ঐ তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে আবার কম্পাঙ্কও (ν) পাওয়া যায়। এর সঙ্গে প্ল্যাঙ্ক-ধ্রুবকটি (h) গুণ করে দিলেই ফোটনের তেজ-পরিমাণটিও ($w_1 - w_0 = E$) সহজে পাওয়া যায়। এই তেজপরিমাণটি আবার পরমাণুর অন্তর্গত ইলেক্ট্রনের পুরাতন কক্ষ ও নতুন কক্ষের তেজস্তরদ্বয়ের পার্থক্যটিকেই জানিয়ে দেয়। ওদিকে ফটোপ্লেটে বর্ণালি-রেখার কৃষ্ণত্বটিও ফোটন-সংখ্যার নির্দেশ দিয়ে দেয়। কৃষ্ণত্ব বাড়লে বোঝা যাবে ফোটনও বেশি পরিমাণে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে, সুতরাং বস্তুটির ঔজ্জ্বল্যও অধিক। আবার কোনো বস্তুর পরমাণুগুলি সব সমান বলে ধরে নেওয়া যায় যে তার সবগুলি ইলেক্ট্রন একই অবস্থা বা পরিবেশের মধ্যে বর্তমান থাকায় একটি কক্ষ থেকে নিকটবর্তী কক্ষটিতে লাফিয়ে পৌঁছবার সময় তারা যে-ফোটনদের উৎক্ষিপ্ত করে দেয় তারাও সব সমানই। সুতরাং তারা সকলে মিলেই শেষ পর্যন্ত বর্ণালিতে একটি মাত্র বর্ণোজ্জ্বল রেখা ফুটিয়ে তোলে। কিন্তু পরমাণুর মধ্যে তেজস্তর মাত্র দু'টি নয়, অসংখ্য। সুতরাং ইলেক্ট্রনের কক্ষ-পরিবর্তন জনিত ফোটন-তেজ বা ফোটনের কম্পাঙ্কও বহুবিধ হতে পারে। সে কারণে ফটো-প্লেটে শীর্ণ বর্ণালি-রেখার দল তৈরি হয়ে যেতে পারে। বস্তুত সোডিয়ামের মত একরেখ সরল ধরনের বর্ণালি খুব কম বস্তুরই দেখা যায়। এক একটি বর্ণালিতে অসংখ্য রেখার সমাবেশ দেখা যেতে পারে (পৃ ২৫৩-৫৪)। তাদের সমাবেশ-পদ্ধতিও জটিল। কিন্তু বিশেষজ্ঞের পক্ষে বর্ণালি দেখেই বস্তুটিকে সনাক্ত করা সহজ হয়।

মোজ্‌লের এক্স্‌-রশ্মি বর্ণালি থেকে আমরা যে জেনেছি (পৃ ২৫১-৫২) উপাদানের পারমাণবিক সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটলে সেই সঙ্গে প্রত্যেকটি শ্রেণীর (কে-, এল-, এম-) অন্তর্গত বর্ণরেখামালার কম্পাঙ্কও বেড়ে যায়, বোরের তত্ত্ব থেকে তার বেশ সুন্দর ব্যাখ্যা মিলে যায়। দেখা যায় যে, যখন পরমাণুকে কয়েক সহস্র ডিগ্রি উষ্ণতায় উত্তপ্ত করে খুব সামান্যভাবেই উত্তেজিত করা যায়, তখন বর্ণালিতে যেসব আলো-রশ্মির কম্পাঙ্ক

পাওয়া যায়, তারা খুব নিম্নমাত্রার প্রাথমিক তেজসংঘ (**low energy quanta**)। ওরা প্রায়ই লাল-উজানী আলো প্রভৃতি দৃশ্য আলোর পর্যায়ভুক্ত। সামান্য কিছু অতি-বেগনি রশ্মিও থাকতে পারে। কিন্তু যখন কয়েক অযুত ইলেক্ট্রন-ভোল্ট্ শক্তি-সমন্বিত ইলেক্ট্রন খুঁজে পরমাণুকে অতিমাত্রায় উত্তেজিত করা যায়, তখন সেখান থেকেও কয়েক অযুত ইলেক্ট্রন-ভোল্ট্ শক্তির তেজসংঘ বিশিষ্ট অতিক্ষুদ্র তরঙ্গের অদৃশ্য এক্স্-রশ্মির বিকিরণ ঘটতে থাকে। বোর-তত্ত্ব থেকে জানা যায় যে ঐরূপ উত্তেজনার কারণ, কোনো ইলেক্ট্রনের স্বীয় তেজস্তর থেকে অন্য উচ্চ মাত্রার তেজস্তরে উৎক্ষেপণ। আবার বোর এও বলেছিলেন যে, পরমাণুতে একটি ইলেক্ট্রনের বন্ধন-শক্তি (পৃ. ২৫৭, ২৭৬) নির্ভর করে তার কক্ষপথ-পরিধির ব্যাসার্ধের উপর, এবং ব্যাসার্ধ (দু'-গুণ বা তিন-গুণ বা চার-গুণ এরকম) বাড়লে তার আসক্তি বা ফোটন-তেজ অর্থাৎ **binding energy**-ও (যথাক্রমে চার-গুণ, বা ন'-গুণ, বা ষোল-গুণ এরকমভাবে) কমে যায়। তাহলে বুঝা যায় যে, একটি ইলেক্ট্রন যত বেশি পরিমাণে দূরোৎক্ষিপ্ত হবে ততই তার আসক্তি কমে গিয়ে আসল তেজটিই প্রকাশ পাবে। সুতরাং কোনো ইলেক্ট্রনকে তার কক্ষথেকে দূরে সরিয়ে দিলে সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্য তৎক্ষণাৎ বহিস্তর থেকে কোনো পূর্বোৎক্ষিপ্ত ইলেক্ট্রন ওখানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। স্বস্থান পরিত্যাগ করে বহির্মহলে যাওয়ার জন্য যে বাড়তি তেজ সে সংগ্রহ করেছিল, আবার অন্দর মহলে প্রবেশের সময় সেই তেজটুকুই সে পরিত্যাগ করে আসবে। তখনই তার ঐ উল্লম্ফনের নৃত্য-ছন্দে আলো ঠিকরে পড়বে তালে তালে দলে দলে। যখন সে কেন্দ্রকের কাছের স্তরে গিয়ে পৌছবে, তখন আলো তরঙ্গের মধ্যে যে কাঁপন জেগে উঠবে তা কী সূক্ষ্মই না হয়ে উঠে ! রণ্জেন-রশ্মির রূপ নেয় সে !

ঐ এক্স্-রশ্মির পরীক্ষায় মোজ্‌লে দেখলেন যে, কোনো ইলেক্ট্রন বাইরের কোনো কক্ষ থেকে কে-থাপের মধ্যে এসে পড়লে সে যে-রশ্মিমালা বিকির্ণ করে আসে, তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য বর্ণালির পূর্বোক্ত কে-শ্রেণীর রেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠে। বিশেষত, কোনো ইলেক্ট্রন যদি এল-স্তর থেকে কে-স্তরে এসে পৌছায় তাহলে বর্ণালির কে-শ্রেণীতে তার বিকীর্ণ আলোর পরিচয়টি সব চাইতে নিবিড় হয়ে উঠে। পরিচয়জ্ঞাপক সেই রেখাটিকে কে-আল্‌ফা ($K\alpha$)-রেখা নামে অবিহিত করা হল। মোজ্‌লে এই $K\alpha$-রেখাটি নিয়ে বিশেষভাবে পরীক্ষা করলেন। স্বভাবতই যেসব ইলেক্ট্রন সরে গিয়ে বর্ণালিতে কে-শ্রেণী সৃষ্টি করে, তারা থাকে কেন্দ্রকের সব চাইতে কাছের কক্ষে। সেখানে কেন্দ্রকের টান হয় সর্বাধিক। অথচ ওখানকার ইলেক্ট্রন যখন কেন্দ্রক-শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তখন অন্য ইলেক্ট্রনদের বিভিন্ন কার্যাবলীর জন্য আর তেজহ্রাসের কোনো সম্ভাবনা থাকেনা। সুতরাং ঐ কে-স্তরের ইলেক্ট্রনের সঙ্গে কেন্দ্রক-শক্তির

সম্পর্কটি সর্বাধিক সুদৃঢ় ও অক্ষত থাকে। তাই ঐসব ইলেক্ট্রনের গতিবিধি বা তাদের তেজের প্রকাশরীতিই প্রকারান্তরে (তাদের সঙ্গে সুদৃঢ় বন্ধনবদ্ধ) কেন্দ্রক-শক্তিটিরও পরিচয়জ্ঞাপক হয়ে উঠবে। বোর তাত্ত্বিকভাবেই ব্যাপারটিকে বিশেষভাবে অনুধাবন করে দেখিয়ে দিলেন যে, $K\alpha$-রেখার কম্পাঙ্ক কেন্দ্রকের আধান-পরিমাপের উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য। কেন্দ্রকের আধান বাড়লে $K\alpha$-র কম্পাঙ্কও বাড়বে। তিনি পূর্বের মত কম্পাঙ্ককে ν ধরে এবং কেন্দ্রকীয় মোট আধানকে Z ধরে আর একটি সমীকরণ উপস্থাপিত করলেন :

$$\nu = R(Z-1)^2$$

R-এর মান স্থিরীকৃত হল $৩\cdot২৯ \times ১০^{-২৫}$ সেকেণ্ড$^{-১}$। মোজলে তখন বিপুল শ্রম প্রয়োগ করে বিভিন্ন উপাদানের $K\alpha$-রেখার কম্পাঙ্কগুলি পরিমাপ করে দেখলেন। দেখা গেল যে, উপাদানের পারমাণবিক সংখ্যা বাড়তে থাকার সাথে এক্স্-রশ্মির কম্পাঙ্কও ঐ সমীকরণের সঙ্গে অদ্ভুতভাবেই সামঞ্জস্য রক্ষা করে বাড়তে বাড়তে এগিয়ে চলেছে। নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, রাদারফোর্ডের তত্ত্বানুযায়ী, মেন্দেলিয়েভের পর্যায়িক ছকের পারমাণবিক সংখ্যাগুলি তাদের অনুরূপ পরমাণুর কেন্দ্রকীয় আধান-পরিমাপের সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সংসক্ত হয়ে আছে। কেন্দ্রকীয় আধানবৃদ্ধির সঙ্গে অনুপাত রক্ষা করেই পারমাণবিক সংখ্যারও বৃদ্ধি ঘটছে। ফলে বর্ণালিতে K-স্তরে ফিরে আসা ইলেক্ট্রনের রশ্মি-তরঙ্গের ছাপ থেকেই কেন্দ্রকীয় আধানের আকৃতিটিও জানা হয়ে যায়। জানা হয়ে গেল যে, পর্যায়িক ছকের যে-কোনো পরমাণুর কেন্দ্রকীয় আধানই তার পূর্বগামী সঙ্গীর কেন্দ্রকীয় আধানের চাইতে এক প্রাথমিক-আধানের বাড়তি-আধান নিয়েই আবির্ভূত, এবং আসন-প্রতিষ্ঠা ছকের মধ্যে সর্বত্রই এই রীতি প্রবর্তিত। ঐ ছকের রাজ্য, তথা পরমাণুর জগৎ, তথা পার্থিব প্রকৃতির মধ্যেও তাই সর্বত্রই এক সুমহান সুশৃঙ্খলা।

এই শৃঙ্খলাই কি তাহলে পার্থিব মূল পদার্থেরই শৃঙ্খলা? যত সব বস্তু মানুষের ইন্দ্রিয়ের কাছে ধরা পড়ে, তাদের সকলেরই মূলে আছে কয়েক প্রকার পরমাণু। আবার ঐ কয়েক প্রকার পরমাণুর মধ্যেও দেখা গেল, ঋণাত্মক ইলেক্ট্রন আর ধনাত্মক কেন্দ্রক,—এই দুই ধরনের বিদ্যুদাধান মাত্র। এদের মধ্যে আবার ইলেক্ট্রনগুলি কেন্দ্রকের দ্বারা শাসিত। কেন্দ্রকের আধানের উপর নির্ভর করেই ওদের সংখ্যা-সন্নিবেশ। কিন্তু তা' সত্ত্বেও ওরা যখন পৃথক অস্তিত্ব নিয়েই বিরাজমান, তখন ওদেরকে হয়ত পৃথক দু'টি উপাদান ধরা যায়। কিন্তু যখন ওদেরও মূলে রয়েছে ওদের ঐ তেজটুকুই, তখন ওদের গুণ যাই হক না কেন, ওদের উভয়কেই তেজসত্তা বলা ছাড়া উপায় নাই। তাহলে কি পার্থিব মূল পদার্থ ঐ তেজটুকুই? যেহেতু

কেন্দ্রকীয় তেজের আধান-পার্থক্যের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর সৃষ্টি? বিচিত্র পরিস্থিতি কোনো বস্তুর উপাদান বলতে আমরা বুঝি, বস্তুটি যা দিয়ে তৈরী তাই। শব্দ, তাপ, আলো আর বিদ্যুতের মত অত্যল্প কয়েকটি জিনিস ছাড়া আর যা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে ধরা পড়ে, তাদের সকলেই গুরুভার না হলেও তাদের প্রত্যেকেরই যে ভর আছে, এ আমরা সুদীর্ঘকাল যাবৎ জেনে এসেছি। সুতরাং বস্তুর উপাদান যে ভরমূলক, এইটিই আমাদের দৃঢ় প্রতীতি। কিন্তু পার্থিব পদার্থের উপাদান অনুসন্ধান করতে গিয়ে তেজটিই কোথা থেকে বিপুল তেজে ধেয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। যত ক্ষুদ্রই হোক, ওকে তো চিনি। সুতরাং ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, ওকেও স্বীকার করে নিতে হল উপাদান বলেই। ভরের সঙ্গে সমান আসনে ঠাঁই পেল ও। দু'জনকে পাশাপাশি রেখেই কাজ চালিয়ে যেত হল। কিন্তু কিছু দূর যেতে-না যেতেই দেখা যাচ্ছে যে, সন্ধান-পথের সামনে এসে ও দাঁড়াতে চায় সম্পূর্ণ পথরোধ করে। যাকে চিরকাল বিদেহী বলে মেনে এসেছি, আলাদিনের দৈত্যের মত বিপুলায়তন হয়ে গেল সে! আমাদের বোধের জগতে যে ছিল যৎসামান্য, বস্তুর জগতে সেই কিনা আজ হয়ে উঠল অসামান্য! তাহলে লক্ষ লক্ষ বছরের মনুষ্যজীবন এতকাল ধরে শিখেছে কী!

শিক্ষা আর শিক্ষণের জন্য তাই নতুন মানসসত্তার দরকার হল। দরকার হল নতুন যুগের নতুন মানুষের। বিজ্ঞানী তার নাম। নামটি নতুনই বলতে পারি। মানব-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানমানসের উল্লেখযোগ্য প্রকাশ নতুন বৈকি! একদিন ভরের জগতে আটকা পড়েছিল পুরাতন যুগের পুরানো মানুষ। নানান্ কারণে মুখে 'ভাব' 'ভাব' করে অলৌকিক কোনো ভাবের জন্য চিৎকার করলেও, তার বোধের জগৎটি ছিল প্রায় ভরের জগৎকে অবলম্বন করেই। কিন্তু আর একদিন মানুষ যখন সত্যিসত্যিই বুঝল যে, জগৎটা ভরসর্বস্ব নয়, সেখানে ভাবও আছে, তখন তার কাছে ভাবটি আর অলৌকিক হয়ে রইলনা। মানুষ মোটামুটিভাবে তেজরূপেই তাকে প্রত্যক্ষ করল। বিজ্ঞানমানসের বিকাশ ঘটতে থাকল তখন থেকেই। তখন সে ঐ ভাব বা তেজকে কেবল প্রত্যক্ষ করে চুপ করে বসে রইলনা। তাকে দিয়ে সে তার সব লৌকিক কাজগুলিও একে একে সেরে নিতে চাইল। বাস্তবিকপক্ষে, বিজ্ঞানমানসে ধরা পড়েই তখন তার মিথ্যে অলৌকিকত্বের বন্ধন খসে যেতে লাগল। ভাবের বন্ধনমুক্তি ঘটল। কিন্তু বিজ্ঞানমানসের মহিমা এইখানে যে, ভাবের ঐ মুক্তি ঘটাতে গিয়ে তাই বলে সে নিজে ঐ ভাববন্ধনে বা তেজবন্ধনে নিজেকে জড়িয়ে ফেললনা। মানুষ একদা এ পৃথিবীকে ভরসর্বস্ব মনে করেছিল। বিজ্ঞানী কিন্তু সে ভুলের সংশোধন করতে গিয়ে পৃথিবীকে তেজসর্বস্ব মনে করে নিয়ে পুনরায় ভুল করে বসলেননা। তিনি বুঝলেন, তেজের মধ্যেও যে ভরটি লুকিয়ে থাকবেনা তার সংগত কারণ কি? ভর সম্বন্ধেও তাঁকে সতর্ক হতে হল।

বহু পূর্বেই কোনো উপাদানের গ্রাম-আণবিক বা গ্রাম-পারমাণবিক ওজন থেকে একটি পরমাণুর ভার গ্রামের হিসেবেই কত হবে তা স্থির করা হয়েছিল (পৃ. ৪৮)। সেই ওজনকেই তার ভর হিসাবেও গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু গ্রাম-পারমাণবিক ওজন এবং তার মধ্যে পরমাণুর সংখ্যা কত, তা একেবারে সঠিকভাবে জানা দুরূহ। তেমনি একথাও সঠিকভাবে জানা যায়নি যে, কোনও উপাদানের সব পরমাণুরই ভর হুবহু এক। বিশেষত, তেজস্ক্রিয় বস্তুর আইসোটোপগুলি (পৃ. ২৪৩) থেকে জানা যাচ্ছে যে তারা একই রাসায়নিক গুণবিশিষ্ট একই উপাদানের পরমাণু হওয়া সত্ত্বেও তাদের ভর কিন্তু পৃথক (এবং ক্রমেই জানা গেল যে, অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রেও আইসোটোপ ব্যাপার সম্ভব)। সুতরাং পূর্ব-নির্ধারিত পারমাণবিক ভারটিই যে ঐ পরমাণুর ভর হবে, একথা মনে করা চলেনা। আয়নের আধান-পরিমাপ জানা থাকলে অবশ্য টমসনের সেই বিদ্যুচ্চৌম্বকীয় পদ্ধতির (পৃ. ১৯৯) সাহায্যে ওর e/m স্থির করে নিলে পর ওর ভরটি সহজপ্রাপ্য হয়ে উঠে। ঐ পদ্ধতি অনুযায়ী আয়নমালাকে একই অভিমুখী বিদ্যুৎ- আর চৌম্বক-ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে পাঠাতে হয়। তাদের পরবর্তী যাত্রাপথের ওপরে কোনো প্রতিপ্রভ পর্দা বা ফটো-প্লেট পেতে রাখা হয়। আয়নগুলি তার ওপরে পড়ে তাদের ছাপ রেখে দিতে পারে। আয়নগুলির ভর পৃথক হলে তারা সকলেই প্লেটের কোনো একটিমাত্র নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পড়বেনা। আবার তাদের আধান এক থাকলে তারা এলোমেলোভাবেও যেখানে সেখানে গিয়ে পড়বেনা। ভিন্ন পথে ধাবিত হয়েও নিশ্চয় তারা প্লেটের ওপর একটি রেখার সৃষ্টি করবে। যাদের ভর এক হবে, তাদের বিক্ষেপ নির্ভর করবে তাদের গতিবেগের ওপর। কিন্তু বৈদ্যুৎ বা চৌম্বক এই দু'টি ক্ষেত্রে তাদের সেই বিক্ষেপের ফল দেখা দেবে বিভিন্নরূপেই। টমসন দেখিয়ে দিলেন যে, আয়নগুলির ভর আর আধান (অর্থাৎ e/m) যদি এক থাকে এবং তাদের গতিবেগ যদি পৃথক হয়, তাহলে তাদের ছবির আকৃতি হয়ে উঠবে অধিবৃত্তের (parabola—ডিম্বাকৃতি) মত। যদি ভর বা আধান পৃথক হয় তাহলে যত রকমের ভর বা আধান থাকবে, অধিবৃত্তের সংখ্যাও তত হবে। সেই অধিবৃত্তের পরিসীমা (সীমারেখার মোট দৈর্ঘ্য) মেপে আয়নের e/m পাওয়া যাবে এবং তা' থেকে তার ভরও মিলবে। ১৯১৩ সালের আগস্ট মাসের পূর্বেই টমসন এই অধিবৃত্ত-পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেখতে পেলেন যে, নিয়ন-গ্যাসের পারমাণবিক ভর কেবলমাত্র কুড়ি নয়, বাইশও (পরে জানা গেছে একুশও)। অবিলম্বে অ্যাস্টনের (Francis William Aston—1877-1945) পরীক্ষা থেকেও এর সমর্থন পাওয়া গেল এবং জানা গেল যে, পর্যায়িক ছকের একটিমাত্র ঘরে যারা স্থান পাওয়ার যোগ্য, তাদের মধ্যে পূর্ব থেকেই যেটিকে স্থান দেওয়া হয়েছে তার ভরটিই যে ওদের মধ্যে সর্বাধিক তা নয়। কিন্তু

ভর-বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের রাসায়নিক ধর্ম এক বলে সডি তাদের নামকরণ করলেন— আইসোটোপ (পৃ. ২৪৪)।

কিন্তু পরমাণুর ভর আর ভারকে তাহ্‌লে এক বলা চললনা। ভার দিয়ে সব ক্ষেত্রে ভরের কাজ চালান যাবেনা। কারণ, নিয়নের ওজন বা ভারটি আসলে ২০ বা ২২ (বা ২১) বা তাদের গড়ও নয়। ওর ওজন ২০'১৮৩। আশ্চর্য যে, ভরগুলি যেখানে গোটাগুটি সংখ্যাতেই প্রকাশ পাচ্ছে, ভারটি সেখানে ভগ্নাংশমূলক মিশ্র-সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু টমসন যখন দেখতে পেলেন যে, ২০-ভরযুক্ত আইসোটোপের শতকরা ৯১ ভাগ এবং ২২-ভরযুক্ত আইসোটোপের শতকরা ৯ ভাগ মিশিয়েই ঐ ২০'১৮৩ ওজনটি পাওয়া যাচ্ছে, তখন পুনরায় ভর ও ভারের মধ্যে একটি ঐক্য খুঁজে পাওয়া গেল। টমসন তখন এই সিদ্ধান্ত না করে পারলেননা যে, নিয়ন উপাদানটি দু'টি ভিন্ন ভরের আইসোটোপের একটি সংমিশ্রণ মাত্র। ব্যাপারটির সত্যতা যাচাই করতে হলে আইসোটোপ দু'টিকে মিশ্রণ থেকে পৃথক করা দরকার। কিন্তু ঐ মিশ্রণটির সঙ্গে অন্য কোনো বস্তুর রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে যে একটি আইসোটোপকে মিশ্রণ থেকে সরিয়ে দেওয়া যাবে, তার উপায় নাই। কারণ, দু'টিই তো একই পরমাণুর আইসোটোপ। সুতরাং ওদের রাসায়নিক ধর্ম এক। ফলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে একটি সরে গেলে অন্যটিও যাবেনা কেন? বা একজন থেকে গেলে দু'জনেরই না থাকার কারণ নাই। এই কারণে ইতিপূর্বে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলির মিশ্রণ থেকেও ওদের প্রত্যেককে পৃথক করার কাজ অত্যন্ত শক্ত হয়েছিল; ওদের কেউই অন্য কোনো বস্তুর সঙ্গে না মিশতে চাইলে ওদের মাত্র একজনকেই বা কি করে মিশ্রণ থেকে সরান যায়? সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানী এক অদ্ভুত পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। সামান্য কাদামাটির দেয়ালে ওদের ঘিরে ফেলেই সে কাজ করা সম্ভব হয়েছিল। মাটির দেয়ালে খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। জানা আছে যে, কোনো নির্দিষ্ট গ্যাসের প্রত্যেকটি অণুর ক্রিয়মাণ বা গতিশক্তি (kinetic energy) সমান। সুতরাং তাদের অন্তর্গত যে-পরমাণুর ভার (বা ভর) বেশি, একই উষ্ণতার মধ্যে কোনো হাল্কা পরমাণুর চাইতে তার গতিবেগও কম হতে বাধ্য। ফলে হাল্কা পরমাণুই মাটির ছিদ্র ভেদ করে আগে বেরিয়ে যাবে। সুতরাং কোনো মিশ্রণ থেকে কিছুটা গ্যাস কাদার দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে গেলে বুঝতে হবে যে সেই বেরিয়ে-আসা এবং তারপর ছড়িয়েপড়া গ্যাসের মধ্যে হাল্কা ওজনের উপাদানই বেশি পরিমাণে বিদ্যমান। যে গ্যাসের পরমাণুর ওজন বেশি, তার গতি তথা ভেদ-শক্তি কম। তা' ঐ মৃত্তিকা-দুর্গ ভেদ করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে পারবেনা। সুতরাং পিছনে পড়ে থাকা গ্যাসের মধ্যে ভারি উপাদানটিরই আধিক্য ঘটবে। এই ভেদন ও প্রসারণ পদ্ধতি অবলম্বন করে অ্যাস্টনও নিয়ন গ্যাসকে প্রথমে দু' ভাগে বিভক্ত করায় তাদের এক একটি ভাগ এক একটি ভরের

আইসোটোপে সমৃদ্ধ হল। কিন্তু সেই পৃথকীকরণ খুব উল্লেখযোগ্য হবেনা বলে ওদের একটি অংশকে নিয়ে আবার ভাগ করা হল। তাদেরও একাংশ নিয়ে আবারও ভেদন-প্রসারণ চলল। এভাবে কয়েকবার পৃথকীকরণের মারফতে আইসোটোপগুলিকে পৃথক করে জানা গেল যে, বাস্তবিকই টমসনের অনুমান ঠিক। নিয়ন-উপাদানটি সমভর বিশিষ্ট পরমাণু-সমূহের সমষ্টি নয়। ওটি ভিন্নভর বিশিষ্ট আইসোটোপসমূহের মিশ্রণই।

কিন্তু ভার ও ভরের মধ্যে ঐক্য থাকলেও, পারমাণবিক ওজনটি যে জটিল ও মারাত্মক জিনিস তা বেশ বোঝা গেল। আসলে ভর থেকেই ওর উৎপত্তি। সুতরাং ভরটিকেও আর কিছুতেই উপেক্ষা করা চলেনা। তেজেরই মত ওটিও দেখা যাচ্ছে আয়ন এবং কেন্দ্রকীয় ও অতিকেন্দ্রকীয় কণিকাগুলির সকলেরই এক অনিবার্য উপাদান। বস্তুত **e/m** (তেজ/ভর) কথাটির তাৎপর্য বা আসল তত্ত্ব এইখানে। কিন্তু যে নিদারুণ জগতে অসত্যই মূল তত্ত্ব হয়ে উঠে হাজার হাজার বছর জগৎ শাসন করতে পারে, সেখানে আসল তত্ত্ব অত সহজে সত্যের মর্যাদা লাভ করতে পারেনা। অপ্রমেয়ের প্রমাণ কেউ চায়না। কিন্তু যে বিজ্ঞানী বলেন অপ্রমেয় বলে জগতে কিছুই নেই, তাঁর যুক্তি যতই সুযুক্তি হক না কেন, তা কেউ স্বীকার করবেনা। কিন্তু বিজ্ঞানীর তাতে ক্ষোভ বা শঙ্কা না থাকারই কথা। অপ্রমেয়কেও যিনি দাঁড়ি পাল্লায় ঝুলিয়ে যাচাই করতে চান, তাঁর সাহস আছে। তিনি ঐ ভর-তেজের আসল তত্ত্বকে প্রমাণ করতে ভীত হবেন কেন? কিন্তু তার জন্যে আর একটু সময় চাই। আপাততঃ সে প্রসঙ্গ একটু থাক।

তবে ভরের তাৎপর্যটি অচিরেই আরও ভালভাবে ধরা পড়ল। অধিবৃত্ত-পদ্ধতির উন্নতি সাধন করে ক্রমেই বিজ্ঞানীরা বিপুল শ্রম ও যত্ন প্রয়োগ করে জানতে পারলেন, কেবল তেজস্ক্রিয় বস্তুরই আইসোটোপ আছে তা নয়, বেশির ভাগ সুদৃঢ় (stable) উপাদানেরই আইসোটোপ আছে। কিন্তু এক অতি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যাদের মাত্র একটি করে আইসোটোপ থাকে, তাদের সকলেরই পারমাণবিক ওজনও পূর্ণসংখ্যার দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে। ঐটিই তাহলে ওর ভর-প্রকাশক সংখ্যা। কিন্তু বেশির ভাগ উপাদানই একাধিক আইসোটোপের মিশ্রণ। তাদের প্রত্যেকেরই পারমাণবিক ওজনের সংখ্যাটি এক একটি ভগ্নাংশ মূলক মিশ্র সংখ্যা। অথচ তাদের প্রত্যেকেরই এমন একটি করে আইসোটোপ থাকে, যার পারমাণবিক ওজনের সংখ্যাটি পূর্ণ সংখ্যাই। তাহলে মনে করা যেতে পারে যে, প্রত্যেকটি উপাদানের ক্ষেত্রে ঐ পূর্ণ সংখ্যাটিই তার প্রকৃত পারমাণবিক ওজনের সংখ্যা। কিন্তু মিশ্র সংখ্যাগুলিও যে পাওয়া যাচ্ছে, তার কারণ তাদের মধ্যে বিভিন্ন ভরের আইসোটোপের মিশ্রণ। তাহলে ঐ পূর্ণসংখ্যাগুলির তাৎপর্য গ্রহণ করলে প্রাউটের মত (পৃ. ৫১) একথাও কি বলা চলেনা যে প্রত্যেকটি

উপাদানের পারমাণবিক ওজন যখন হাইড্রোজেন-পরমাণুর একক ওজনের দ্বারা বিভাজ্য হচ্ছে, তখন সব পরমাণুর গঠনই হাইড্রোজেন-পরমাণু-ঘটিত ? সুতরাং তাদের কেন্দ্রকগুলিও হাইড্রোজেন-কেন্দ্রকের সমাহারমূলক, এবং প্রত্যেকটি পরমাণু-কেন্দ্রকের ভর হাইড্রোজেনেরই কতকগুলি পরমাণু-কেন্দ্রকের ভর দিয়ে তৈরি ? হাইড্রোজেনের পরমাণু-কেন্দ্রকের ধনাত্মক-আধানের আকৃতিটি এক-মাপের (অর্থাৎ একটি ইলেক্ট্রনের বা এক প্রাথমিক-আধানের তুল্য) দেখে রাদারফোর্ড প্রথমে মনে করেছিলেন যে ঐ কেন্দ্রকটি বুঝি একটি ধনাত্মক-ইলেক্ট্রন হবে। কিন্তু কেন্দ্রকের ভরটি ইলেক্ট্রনের চাইতে বহু গুণ বেশি হওয়ায়, অর্থাৎ প্রায় পুরো পরমাণুটিরই ওজনের তুল্য হওয়ায়, ইলেক্ট্রনের সঙ্গে তার পার্থক্য বোঝাবার জন্য ১৯২০ সালে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েসানের কার্ডিফ (Cardiff)-সভায় তিনিই হাইড্রোজেনের পরমাণু-কেন্দ্রকের একটি নাম দিয়ে দিয়েছিলেন—প্রোটন। গ্রীক ভাষার এই শব্দটির অর্থ হল 'প্রথম'। তাহলে পূর্বোক্ত অনুমান অনুযায়ী একথা কি বলা চলেনা যে, উপাদান নির্বিশেষে প্রত্যেকটি পরমাণুর কেন্দ্রকই প্রোটন দিয়ে তৈরি ? কিন্তু এ অনুমানের একটু অসুবিধে এই যে, পর্যায়িক ছকে যখন হাইড্রোজেনের পরেই হিলিয়ামের স্থান, এবং ওর পারমাণবিক সংখ্যাও দুই, তখন নিশ্চয় বুঝতে হবে যে ওর কেন্দ্রকে দুই-মাপের ধনাত্মক আধান বা দু'টি প্রোটন আছে। কিন্তু আসলে ওর পারমাণবিক ওজন প্রায় চার। সুতরাং বাস্তবে যখন ওজনটি চার হয়েছে, তখন ধরে নিতে হয় ওখানে চারটি প্রোটন আছেই। কিন্তু তবুও যে ওর আধানটি কেন দু'-মাপের, তারও কারণ অনুমান করা যেতে পারে। খুব সম্ভবত ওর কেন্দ্রকে চারটি প্রোটনের সঙ্গে দু'টি ইলেক্ট্রনও যুক্ত হয়ে থাকায় দু'টি ধনাত্মক-আধান দু'টি ঋণাত্মক-আধানের সঙ্গে কেটে গিয়ে নিরপেক্ষ হয়ে গেছে। অন্যান্য সকল পরমাণুর ক্ষেত্রেও নিশ্চয় এ ব্যাপার ঘটে থাকবে। সেজন্য তাদের ক্ষেত্রেও সর্বত্রই পারমাণবিক ওজন আর পারমাণবিক সংখ্যার মধ্যে আপাত-অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত, প্রত্যেকটি উপাদানের আইসোটোপের ভর-সংখ্যাটিই তার কেন্দ্রকের প্রোটন সংখ্যা। কিন্তু বিদ্যুতের আধানের দিক থেকে একটি পরমাণু নিরপেক্ষ। একটি প্রোটন বা একটি ইলেক্ট্রনের আধানও এক-প্রাথমিক-মাপের ; সুতরাং বোঝা যায় যে ঐ কেন্দ্রকীয় প্রোটন সংখ্যাই পরমাণুর মোট ইলেক্ট্রন সংখ্যাও। তবে ইলেক্ট্রনগুলির সকলেই কেন্দ্রকে থাকেনা, ওদের কতকগুলি কেন্দ্রকের চারদিকে ঘুরতে থাকে। পারমাণবিক সংখ্যা যত, কেন্দ্রকীয় মুক্ত প্রোটনের সংখ্যাও তত হওয়ায় ঐ অতি কেন্দ্রকীয় ইলেক্ট্রন সংখ্যাও ততই। বাদ বাকি ইলেক্ট্রনগুলি কেন্দ্রস্থ থেকে বাকি প্রোটনগুলির আধানকে কাটিয়ে দিয়ে তাদের নিরপেক্ষ করে দেয়, নিজেরাও নিরপেক্ষ হয়ে যায়।

কেন্দ্রকের মধ্যে সমসংখ্যক স্তিমিত শক্তির প্রোটন-ইলেক্ট্রন এবং পারমাণবিক সংখ্যার

সমান সংখ্যক মুক্ত প্রোটন থাকলেও একটি প্রোটনের জায়গায় এক জোড়া প্রোটন বা একটি আল্‌ফা-কণিকাকেও যে কেন্দ্রকের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা চলে তা আমরা ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করেছি। কারণ, তেজস্ক্রিয় বস্তুর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেখান থেকে অবিরতভাবে ঐ আল্‌ফা কণিকাই বিনির্গত হয়ে চলেছে। রাদারফোর্ড্ ওদের বলেছিলেন দু'বার আয়নায়িত হিলিয়াম-কেন্দ্রক (পৃ. ২০৩), বা বর্তমান মতে একজোড়া প্রোটন। সুতরাং তেজস্ক্রিয় বস্তুর পরমাণু-কেন্দ্রে প্রোটনরাই আল্‌ফা-কণিকারূপে জোড় বেঁধে থাকে। তা যদি হয়, তাহলে প্রোটনকেই আল্‌ফা-কণিকার তথা পরমাণু-কণিকারই একটি উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে নিতে কোনও বাধা থাকেনা।

ঐ আল্‌ফা-কণিকার বিক্ষেপণ দেখেই রাদারফোর্ড্ পরমাণুর অন্তর্গত ধনবিদ্যুৎযুক্ত কেন্দ্রক-শক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু পরে তিনি দেখতে পেলেন যে, ভারি উপাদানের কেন্দ্রকের কাছে গিয়ে পৌছলে তাঁর পূর্ব-নির্ধারিত তত্ত্ব অনুযায়ী আল্‌ফা-কণিকার বিক্ষেপণ ঠিক ঠিক ভাবে ঘটে, অথচ হাল্কা উপাদানের ক্ষেত্রে কিন্তু বিক্ষেপণটি আর সে নিয়ম মেনে চলেনা। কারণ অনুমান করা গেল যে, ভারি উপাদানের কেন্দ্রকে প্রোটনের সংখ্যাধিক্য থাকায় ধনাত্মক আধানের তেজটি এতই প্রচণ্ড হয়ে উঠে যে, সমধর্মী ধনাত্মক আল্‌ফার পক্ষে আর ওর কাছে যাওয়াই সম্ভব হয়না। অতি প্রবল বিকর্ষণ-প্রভাবে দূর থেকেই ওকে তাড়া খেয়ে সবেগে পিছু হটতে হয়। কিন্তু হাল্কা উপাদানের ক্ষেত্রে অল্প সংখ্যক কেন্দ্রকীয় প্রোটনের তেজ কম থাকায় দ্রুতগতি আল্‌ফা বিক্ষিপ্ত হতে না হতেই ওর খুব কাছেই এসে পৌছায়। এমন কি হয়ত এও হতে পারে যে, প্রচণ্ড গতি নিয়ে সে এসব ক্ষেত্রে কেন্দ্রক ভেদ করেই চলে যাবে। এরকম অনুমান করে রাদারফোর্ড্ ঘটনাটির সত্যতা বিচার করবার জন্য পরীক্ষা আরম্ভ করে দিলেন। ১৯১৯ খ্রী.-এ তিনি কেম্ব্রিজের পদার্থবিদ্যার ক্যাভেণ্ডিস্ অধ্যাপক হিসাবে জে. জে. টমসনের স্থানাধিষ্ঠিত হয়ে ঐ বছরেই বিশেষ গবেষণা চালিয়ে এ বিষয়ে সাফল্যও লাভ করলেন।

রেডিয়াম-C′ থেকে নিক্ষিপ্ত আল্‌ফা-কণিকাকে তিনি নিক্ষেপক বলে গ্রহণ করেছিলেন। কারণ, ওর গতি প্রচণ্ড। লক্ষ্যবস্তু হিসাবে নিয়েছিলেন নাইট্রোজেন। কারণ, নাইট্রোজেন বেশ হাল্কা ধরনের পরমাণু, ওর কেন্দ্রকের ধনাত্মক-আধানের মিলিত শক্তি খুব বেশি হবেনা। যে যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষার কাজ চালান হল, তাও বেশ সরল প্রকৃতির। নাইট্রোজেন-গ্যাসে ভরা একটি অনুভূমিক (অর্থাৎ ভূমির উপর খাড়া নয়, ভূমির সমান্তরাল ও আড়াআড়ি—horizental) আয়তাকার কক্ষের মধ্যে মাঝামাঝি কোনো জায়গায় একটি চাকতি খাড়াভাবে পাতা আছে। চাকতিতে রেডিয়াম-C′ জনিত তেজস্ক্রিয় পদার্থ মাখান থাকে। কক্ষের দৈর্ঘ্যের দিকের দু'টি প্রান্তের একদিক পুরাপুরি

বন্ধ। আর একটি দিকও বন্ধ, কিন্তু তার মাঝামাঝি জায়গায় একটি ফাঁক। খুব সূক্ষ্ম একটি রৌপ্য নির্মিত পাত দিয়ে সেই ফাঁকটি এমনভাবে বন্ধ,—যেন ফাঁক দিয়ে একটুও
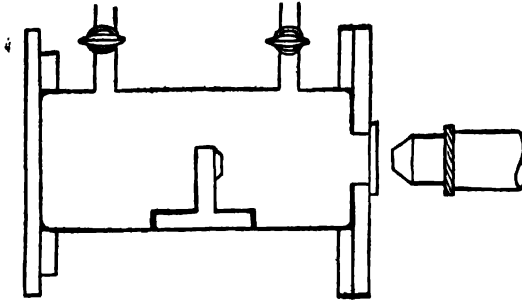
বাতাস ভিতরে ঢুকতে না পারে। বাইরে থেকে ফাঁকের ওপরে একটি জিঙ্ক্-সাল্ফাইডের পর্দা আটকান থাকে। ভিতর থেকে আল্ফা-কণিকা রূপোর পাত ভেদ করে এসে পৌঁছলে তার গায়ে লেগে দ্যুতি সৃষ্টি করতে পারবে। অবশ্য চাকতি থেকে যে আল্ফা-কণিকা আসবে, সে আশা নাই। কারণ, কক্ষটির আকৃতি এমনভাবে বড করা হয় এবং ভিতরে গ্যাসের চাপও এমন রাখা হয় যে খুব দ্রুতশক্তির আল্ফা-কণিকাও এতটা পথ পেরিয়ে আসতে আসতে মধ্য পথেই শোষিত হয়ে যায়। ফাঁকের সামনে মাইক্রোস্কোপ পাতা থাকে, জিঙ্ক্-সালফাইড্ পর্দায় কোনো রকম দ্যুতি সৃষ্টি হলেই সেই মাইক্রোস্কোপ দিয়ে তা লক্ষ্য করা যায়। কক্ষের ওপরের আড়াআড়ি তলে আরও দু'টি ছিদ্র থাকে,—একটি দিয়ে ভিতরের সব বাতাস টেনে বার করা যায়, অন্যটি দিয়ে নাইট্রোজেন বা পরীক্ষণীয় অন্য কোনো গ্যাস কক্ষ মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। পরীক্ষা চলতে থাকে আঁধারে।

রাদারফোর্ড্ প্রথমে নাইট্রোজেন-গ্যাস ঢুকিয়ে দেখলেন যে, প্রতিপ্রভ পর্দায় দ্যুতি সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু ঐ দ্যুতি কি নাইট্রোজেন সংক্রান্ত, না রেডিয়াম-নিক্ষিপ্ত আল্ফা-কণিকার অভিঘাতজনিত, তা জানবার জন্য তিনি তারপর অক্সিজেন এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নিয়েও পর পর পরীক্ষা করে দেখলেন। কিন্তু কোনো বারেই আর সে দ্যুতি দেখা গেলনা। বোঝা গেল যে, দ্যুতির কারণটি প্রত্যক্ষভাবে তেজস্ক্রিয় বস্তুর আল্ফা-কণিকা নয়। নিক্ষিপ্ত আল্ফা-কণিকার দ্বারা নাইট্রোজেন-পরমাণুর কেন্দ্রক অভিঘাত-বিধ্বস্ত হলে তখন তা থেকে উৎক্ষিপ্ত অন্য কোনো উচ্চশক্তি সম্পন্ন কণিকাই প্রতিপ্রভ পর্দার ওপরে আছড়ে পড়ে ওরকম দ্যুতি সৃষ্টি করে। রাদারফোর্ড্ বিদ্যুৎ এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে ঐ কণিকাগুলিকে পাঠিয়ে (পৃ. ১৮২-৮৪, ১৯৯, ২০২) ওদের ভর এবং আধানের মাপ নিয়ে দেখলেন যে ওগুলি প্রোটন অর্থাৎ হাইড্রোজেন-কেন্দ্রকই।

তিনি বুঝলেন যে, নাইট্রোজেন-পরমাণুর কেন্দ্রক ভেঙেই হাইড্রোজেন-পরমাণুর কেন্দ্রক (অর্থাৎ প্রোটন) উঠে আসছে। [প্রোটনের ধাবন-পাল্লা (range) মেপে তিনি দেখতে পেলেন যে ওর তেজ-পরিমাণ প্রায় ৬০০০০০০ (৬০ লক্ষ) ইলেক্ট্রন-ভোল্ট্ (পৃ. ২০১)। কিন্তু নিক্ষিপ্ত আল্ফা-কণিকার তেজ ছিল ৭৭০০০০০ (৭৭ লক্ষ) ই. ভো। সুতরাং বোঝা গেল যে, একটি প্রোটনকে তার কেন্দ্রক থেকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তেজ ব্যয়িত হয়েছে প্রায় ১৭×১০^{৫} (৭৭ লক্ষ – ৬০ লক্ষ = ১৭ লক্ষ) ই. ভো.।]

পরমাণু বিধ্বস্ত হয়ে গেল। কেবল তত্ত্ব দিয়ে নয়, যন্ত্র দিয়ে। সুতরাং তত্ত্বটি কেবল পারমাণবিক নয়, পরম তত্ত্বও। পরমাণুকে ভাঙা যায়না বলে গ্রীক দার্শনিকেরা ওর নাম দিয়েছিলেন অ্যাটম অর্থাৎ অ-ভঙ্গুর, বা অ-বিনাশী। অবশ্য সেটিও ছিল একটি অনুমান করা তত্ত্ব। কিন্তু সেটি যে কোনো পরম তত্ত্ব নয় তার কারণ এই যে, তা যদি হত, তাহলে যন্ত্র দিয়ে আজ পরমাণুকে ভেঙে ফেলা সম্ভব হতনা। কিন্তু পরম তত্ত্ব না হলেও যদি এটি একটি তত্ত্ব হতে পারে, তাহলে কি তার কোনো তাৎপর্য নাই? নিশ্চয় আছে। এবং তা' যে আছে তার প্রমাণ ঐ প্রায় সমসাময়িক কালের দার্শনিক অ্যারিস্টটলের উপস্থাপিত তত্ত্বের সঙ্গে ওর তুলনা করলে তা সহজেই বোঝা যায়। পৃথিবীর উপাদান-কারণ (material cause) সম্বন্ধে তিনি যে প্রথম বা প্রাথমিক পদার্থের (prima materia বা initial matter) কল্পনা করেছিলেন, তার সত্তা অপ্রমাণিত হয়নি। কিন্তু উপাদান-কারণের সম্বন্ধে তিনি যে চার প্রাথমিক গুণের (উত্তাপ-শীতলতা, শুষ্কতা-আর্দ্রতা) তত্ত্বকে যেভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন (পৃ. ৬), তার বিরুদ্ধ প্রমাণ উপস্থিত থাকায় তাঁর ঐ মতবাদ ভুল প্রমাণিত; সুতরাং ঐ মতবাদ তত্ত্বের পর্যায়ে উঠতে পারেনি। অন্যদিকে ভারতীয় দার্শনিক কণাদও পরমাণুর কথা বলেছিলেন। কিন্তু পরম তত্ত্ব (বা ঈশ্বর তত্ত্ব) সম্বন্ধীয় আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ঐ কথা বললেও পরমাণু সংক্রান্ত তাঁর অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলির (পৃ. ১-২) বিরুদ্ধ প্রমাণ হাজির হওয়ায় তাঁর মতবাদও পরমতত্ত্ব হওয়া দূরের কথা, তত্ত্বই হতে পারেনি। ডিমক্রিটাস প্রভৃতি দার্শনিকবৃন্দের পরমাণু সম্বন্ধীয় মতবাদ যে একটি তত্ত্বই, তার কারণ তৎকল্পিত পরমাণুর বাস্তব অস্তিত্ব যে প্রমাণিত হয়েছে কেবল তাই নয়, ঐ অস্তিত্ব বা সত্যকে অবলম্বন করেই তবে অন্য প্রকার অস্তিত্ব বা সত্যকে স্পর্শ করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু যে-পরমাণুর পরিকল্পনা ওঁরা করেছিলেন, তার বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে। তাহলে বলতে পারি যে ওঁরা আড়াই হাজার বছর এগিয়ে ছিলেন। প্রকৃত দর্শনের সার্থকতা এই যে, সে ভবিষ্যতের, এমনকি কয়েক হাজার বছরের পরের ঘটনাকেও প্রত্যক্ষ করতে পারে। অথচ ভ্রান্ত বা বিকৃত দর্শনের ফলে মানুষ হাজার হাজার বছর

পিছিয়ে যায়। কিন্তু আড়াই হাজার বছরের আরও পরবর্তী ঘটনা বা তৎসংক্রান্ত সত্যকে যে দর্শন করা সম্ভব হলনা তার কারণ, যে মনশ্চক্ষু দিয়ে তত্ত্বদর্শন সম্ভব হয় সেই মনশ্চক্ষু বা মানবমনটি তখনও পর্যন্ত খুব উচ্চশক্তি সম্পন্ন হয়ে ওঠেনি। কিন্তু মন ক্রমাগতই উচ্চতর শক্তি লাভ করে চলেছে। আড়াই হাজার বছর পরে যখন সত্যিই পরমাণুর আবিষ্কার সম্ভব হল, তখন মানুষের কাছে এক নূতন জগৎ প্রত্যক্ষীভূত হয়ে তার চিন্তাশক্তির মধ্যেও এক বিপ্লব ঘটিয়ে দিলে। নব-প্রকাশমান পরমাণু-জগৎ তখন তার উদ্ভাবনী শক্তির এক অভাবনীয় বিকাশ সাধন করে দিল। পূর্বদৃষ্ট পরমাণু-তত্ত্বকে প্রমাণ করতে যেখানে আড়াই হাজার বছর লেগে গিয়েছে, নব নব যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করে ইলেক্ট্রন-প্রোটনের তত্ত্বকে প্রমাণ করে দিতে তার শতাব্দীও লাগলনা। সে যখন বুঝতে পারল যে, পরমাণু-শৃঙ্গের পারে দাঁড়িয়ে ইলেক্ট্রন-প্রোটনের আকাশচুম্বী শৃঙ্গ তাকে আহ্বান জানাচ্ছে, সে আহ্বানে সাড়া দিতে তখন তার মুহূর্তও বিলম্ব হলনা। এক সত্য থেকে তখন সে আর এক ব্যাপকতর সত্যে উঠে গেল। মানবমস্তিষ্কে বৃহত্তর সত্যের বিবর্তন ঘটল। রাদারফোর্ড্ যখন আল্ফা-কণিকা নিক্ষেপ করে নাইট্রোজেন-পরমাণুর কেন্দ্রকে আঘাত হানলেন, তখন যে কেবল পরমাণু-কেন্দ্রকই অভিঘাতবিধ্বস্ত হল তাই নয়, নবোদ্ভাসিত বস্তুসত্তার অভিঘাতে মানব-মানসজগতের একাংশ থেকে পারমাণবিক অবিনশ্বরতার দৃঢ়প্রোথিত সংস্কারটিও ধ্বসে পড়ে গেল।

তৃতীয় পর্ব:

পরমাণুর অস্তিত্বের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ যখনই মিলুক না কেন, তার জটিল-গঠন সংক্রান্ত আভাসটি পাওয়া গেছে ইলেক্ট্রনের বা X-রশ্মির আবিষ্কারের পরে। কিন্তু সে সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয় শক্তি প্রত্যক্ষীভূত হওয়ার পর। তখন থেকেই পরমাণুর অভ্যন্তর জগৎ থেকে বিভিন্ন সংবাদ এসে পৌঁছতে থাকায় বিস্ময়ের পর বিস্ময় সৃষ্টি হয়ে চলেছে। কখনও সংবাদ এসেছে যেন হঠাৎ আচমকা। আবার কখনও বিজ্ঞানীদের এগিয়ে গিয়ে সে তথ্য আহরণ করতে হয়েছে। প্রকৃতি আর মানুষের এমন সহযোগিতার মত সুমহান দৃষ্টান্ত জগতে আর কিছু নেই।

প্রকৃতির রাজ্যে ছড়িয়ে আছে সত্য। না, কথাটি ঠিক হলনা। সত্য ছড়িয়ে আছে বললে সেখানে অসত্যেরও স্থান আছে স্বীকার করতে হয়। বস্তুতপক্ষে, প্রকৃতির রাজ্যই সত্যের রাজ্য। প্রাকৃতিক সত্য ব্যতিরেকে অন্য সত্য বলে কিছুই নাই। তৎসত্ত্বেও বলা যায় যে, মানুষ যেমন হাতে তুলে কোনো বস্তু দান করে, প্রকৃতি সে রকম স্বামুক্তি

রীতিতে কোনো বস্তুকে হাতে তুলে দেননা। কিন্তু প্রাকৃতিক রীতিতেই প্রকৃতি মানুষের জন্য গড়ে দিয়েছেন তার ইন্দ্রিয়, তার মন। আর তাকে দিয়েছেন তার এই হাত দু'টি। সে হাত দিয়ে মানুষ তার মানবিকভাবেই প্রকৃতির দানকে গ্রহণ করে নিতে পারে, ইন্দ্রিয় আর মন দিয়ে প্রাকৃতিক জগৎ থেকে সত্যকে সংগ্রহ করে নিতে পারে। আল্ফা-কণিকা রয়েছে ইউরেনিয়াম প্রকৃতির মধ্যে নিষ্ক্রিয় নয়, সক্রিয় ভাবেই। প্রাকৃতিক জগৎ থেকে যেদিন সে সংবাদ এসে পৌঁছল, মানুষও সেদিন আর চুপ করে বসে রইলনা। এগিয়ে গিয়ে যেন দু'হাত পেতেই গ্রহণ করল তার সেই বিপুল ক্রিয়াশক্তিকে, হাতে তুলে নিল দুর্ভেদ্য পরমাণু-কেন্দ্রককে, ভেদনের নিপুণ অস্ত্রটিকে।

সেই অস্ত্র নিক্ষেপ করে বিজ্ঞানী একটির পর একটি পরমাণু-কেন্দ্রক জয় করে যেতে লাগলেন। ১৯২১ খ্রী.-এ রাদারফোর্ড্ চ্যাড্উইকের (Sir James C. Chadwick—1891-?) সাহায্যে নাইট্রোজেন ছাড়াও বোরন, ফ্লোরিন, সোডিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম এবং ফসফরাসেরও কেন্দ্রক বিধ্বস্ত করতে সমর্থ হলেন। কিন্তু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই দেখা গেল যে, অভিঘাতের জন্য নিক্ষিপ্ত আল্ফা-কণিকার চাইতে নবোৎক্ষিপ্ত প্রোটনের দৌড় বা ধাবন পাল্লা (range) বেশি। অবশ্য কমতেজী প্রোটন আছে কিনা তা জানা শক্ত ছিল। কারণ, ওরকম প্রোটনকে সনাক্ত করতে হলে প্রতিপ্রভ পর্দাটিকে রেডিয়াম সংশ্লিষ্ট চাকতিটির খুব কাছে এনে রাখতে হয়। অথচ তা করা হলে আল্ফা-কণিকারাই হয়ত পর্দায় গিয়ে দ্যুতি সৃষ্টি করতে থাকবে। রাদারফোর্ড্ এবং চ্যাড্উইক পূর্বোক্ত যন্ত্রের উন্নতি সাধন করে পর্দাটিকে এমনভাবে স্থাপন করার ব্যবস্থা করলেন, যাতে আল্ফা-কণিকা ওখানে গিয়ে পৌঁছবেনা, অথচ প্রোটনরা গিয়ে ওকে আঘাত করতে পারে। চাকতিটিকেও ইচ্ছামত পর্দার কাছে বা পর্দা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকল। তারপর ওঁরা তখন ঐ যন্ত্র দিয়ে হিলিয়াম, লিথিয়াম, বেরিলিয়াম, কার্বন এবং অক্সিজেন ছাড়া পটাসিয়াম পর্যন্ত অন্য সকল উপাদানকেই বিধ্বস্ত করতে সমর্থ হলেন। উনিশটি উপাদানের মধ্যে ঐ পাঁচটির গঠন খুব সুদৃঢ় বলে ওরা দুর্ভেদ্য হয়ে রইল। কিন্তু পটাসিয়ামের পরবর্তী আর সব উপাদানও অক্ষত থেকে গেল। তার কারণ বোঝা যায়, ওদের কেন্দ্রকের ধনাত্মক আধানের প্রোটনাধিক্য। দুই-প্রোটনের ধনাত্মক আল্ফাকে বহুসংখ্যক ধনাত্মক প্রোটনের মিলিত আধান সহজেই হটিয়ে দিতে পারে। পৃথিবীর উত্তর মেরুতে যদি এক গ্রাম এবং দক্ষিণ মেরুতে যদি আর এক গ্রাম প্রোটন রাখা যায়, তাহলে এতটা দূর পেরিয়ে ওদের মধ্যে যে চাপ সৃষ্টি হবে তা যদি সভির হিসাব অনুযায়ী ছ' শ' মণের ধাক্কার সমান হয়, তাহলে কি করে সেকেণ্ডে মাত্র ২০ হাজার কিলোমিটার গতিবেগ নিয়ে জোড়-প্রোটন আল্ফার পক্ষে গিয়ে ওরকম সব প্রোটন-সংঘের একেবারে মর্মভেদ করা সম্ভব হয়?

কিন্তু প্রশ্ন হল, কেন্দ্রক-বিধ্বস্ত হওয়ার পর সেখান থেকে প্রোটন-কণিকা ছিটকে বেরিয়ে গেলেও আল্‌ফা-কণিকার নিজের দশাটি কি হয়? কোথায় যায় সে? সমাধান দিলেন ব্ল্যাকেট (P. M. S. Blackett—1897-?)। মেঘায়ন কক্ষে তিনি ওদের সব ফটো তুললেন। তাঁর অনুমান ছিল যে প্রোটনের দৌড়-পাল্লা বেশি হলে তৎসৃষ্ট মেঘরেখা আল্‌ফাসৃষ্ট মেঘরেখার চাইতে দীর্ঘতর হবে, অথচ আল্‌ফারা একক প্রোটনের চাইতে বেশি আয়ন সৃষ্টি করতে পারে বলে আল্‌ফার মেঘরেখা হবে অধিকতর প্রশস্ত ও নিবিড়। কিন্তু গোল বাধল ফটো তোলার ব্যাপারেই। হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ আল্‌ফা-কণিকা ছুঁড়ে মারলে তবেই একটি কি দু'টি কেন্দ্রক বিদ্ধ করা যায়। তাহলে কি করে অত সময় ও শ্রম ব্যয় করে অত ফটো তোলা সম্ভব? বিষম সমস্যা। কিন্তু সত্যকে পেতে গেলে থামলে তো চলবেনা। ব্ল্যাকেট এবং চ্যাড্‌উইক তখন ফটো তোলার যন্ত্রেরই উন্নতি সাধন করে এমন ব্যবস্থা করলেন যে অনায়াসে মিনিটে পাঁচ ছ'টি করে ফটো উঠে যেতে লাগল।

পুনরায় নাইট্রোজেন-কেন্দ্রক বিদ্ধ করা হল। ছবিতে ব্ল্যাকেট দেখলেন যে, প্রায় ভাগ আল্‌ফা-রেখাই দ্বিশাখ কণ্টকের (fork, দু' ফাঁকড়া-ওয়ালা কাঁটা) ন্যায়। কিন্তু আল্‌ফার মেঘরেখা যখন কিছু দূরে গিয়েই দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে তখন দেখা যায় যে, শাখা দু'টির কোনোটিই তার পূর্বের মত থাকেনা। একটি শাখা সূক্ষ্মতর হয়ে প্রায় কক্ষগাত্র পর্যন্ত এগিয়ে যায়, আর অন্যটি স্থূলতর হয়ে অল্প একটু গিয়েই থেমে পড়ে। ব্ল্যাকেট বুঝলেন যে, সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ রেখাটি নিশ্চয় প্রোটনের, আর হ্রস্ব রেখাটি অবশিষ্ট কেন্দ্রকেরই হবে। তা নাহলে ওটি অত স্থূল হবে কেন? কিন্তু পুনর্বার ছবিতে আল্‌ফার দেখা মিললনা। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে আল্‌ফা-কণিকাটি হ্রাসপ্রাপ্ত কেন্দ্রকের মধ্যেই সেঁটে গিয়েছে।

তাহলে কেন্দ্রকটি বিধ্বস্ত হল, না দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল? এক ভাগে পড়ল প্রোটন, আর অন্য ভাগে রইল আল্‌ফাযুক্ত কেন্দ্রকাবশেষ? আর তা যদি হয়, তাহলে দ্বিতীয় ভাগের স্বরূপটিই বা কি রকম দাঁড়াল? নাইট্রোজেন-কেন্দ্রকের ভর ছিল ১৪, আর পারমাণবিক সংখ্যা অর্থাৎ আধান সংখ্যা ৭। লেখা যেতে পারে: $_{৭}N^{১৪}$। আল্‌ফা-কণিকার পূর্ব রূপটিকেও ঐভাবে লিখলে হয়: $_{২}H^{৪}$। আর প্রোটনের রূপ হয়: $_{১}H^{১}$। সুতরাং কেন্দ্রক থেকে প্রোটন না বেরিয়ে গেলে আল্‌ফাযুক্ত নাইট্রোজেন

কেন্দ্রকটি হত : $_{৯}N^{১৮}$। কিন্তু প্রোটন চলে যাওয়ার জন্য ওর রূপ হবে : $_{৮}N^{১৭}$-এর মত। কিন্তু ওরকম ভঙ্গি নাইট্রোজেনের নয়। ওটি অক্সিজেনেরই ভঙ্গি। কারণ, অক্সিজেন-কেন্দ্রকেরই আধান সংখ্যা ৮। তবে অক্সিজেনের ভর-সংখ্যা ১৭ নয়, ১৬। কিন্তু একটি পরমাণু কোন্ উপাদানের হবে, তা নির্ভর করে তার কেন্দ্রকীয় আধানের উপর। সুতরাং ওটি মূলত অক্সিজেন-কেন্দ্রকই। তবে ভরসংখ্যা পৃথক বলে ওটি তার একটি পৃথক সজ্জা, অর্থাৎ তার আর একটি আইসোটোপ। তাহলে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার (পৃ. ৩৬) মত কেন্দ্রকীয় প্রতিক্রিয়াটিকে সাজিয়ে লিখলে এরকম হয় :

$$_{৭}N^{১৪} + _{২}H^{৪} = _{৮}O^{১৭} + _{১}H^{১}$$
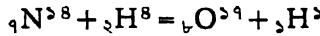
সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, নাইট্রোজেন-কেন্দ্রক ঠিক বিধ্বস্ত হয়নি। কেবল সাজ পালটে একটি অক্সিজেন-কেন্দ্রকে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। ঝাড়-পোছ করার সময় একটি হাইড্রোজেন-কেন্দ্রক ওখান থেকে বেরিয়ে গেছে, এই যা।

অন্যভাবেও দেখা গেল যে, নাইট্রোজেন-কেন্দ্রক থেকে যা পাওয়া গেল, তা অক্সিজেন-আইসোটোপের কেন্দ্রকই। কিন্তু একটি অদ্ভুত জিনিস দেখা গেল যে, নিক্ষিপ্ত আল্‌ফার ক্রিয়মাণ (গতি-) শক্তি যখন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল, তখন তার খানিকটা যেন কোথায় উবে গেল। আল্‌ফার ক্রিয়মাণ শক্তি যা ছিল (৭৭ লক্ষ ই. ভো.), নতুন কেন্দ্রক আর প্রোটন এই উভয়ের মোট ক্রিয়মাণ শক্তি হল তার চাইতে ১২০০০০০ (১২ লক্ষ) ই. ভো. কম। অর্থাৎ N-১৪ যখন O-১৭-তে রূপান্তরিত হল, তখন ঐ পরিমাণ শক্তি কোথায় যেন হারিয়ে গেল। কিন্তু ঐ একই ভাবে আল্‌ফা-কণিকা পাঠিয়ে যখন অ্যালুমিনিয়াম-কেন্দ্রককে (Al-২৭) সিলিকন-কেন্দ্রকে (Si-৩০) রূপান্তরিত করা হল ($_{১৩}Al^{২৭} + _{২}He^{৪} \rightarrow _{১৪}Si^{৩0} + _{১}H^{১}$), তখন দেখা গেল একেবারে উল্টো ব্যাপার। ৩০ লক্ষ ই. ভো. পরিমাণ ক্রিয়মাণ শক্তি বাড়তি এসে গেল কোথা থেকে! তাজ্জব ব্যাপার! কিন্তু বিজ্ঞানীরা এতে না ঘাবড়ে গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় বসে ভাল করে মাপ জোখ হিসেব কষে দেখলেন যে দু'টি ঘটনাই আলাদা। অক্সিজেন-১৭ তৈরির সময় নাইট্রোজেন এবং আল্‌ফা-কণিকার পূর্বেকার মোট ভরের চাইতে পরে উৎপন্ন অক্সিজেন এবং প্রোটনের মোট ভরটি বেড়ে গিয়েছে [(১.২৮×১০^{-৩})-এককের পারমাণবিক ওজন]। অথচ সিলিকন-৩০ প্রস্তুতের বেলায় পূর্ববর্তী অ্যালুমিনিয়াম্ এবং আল্‌ফা-কণিকার মোট ভরের চাইতে পরে উৎপন্ন সিলিকন এবং প্রোটনের মোট ভরটি কমে গিয়েছে [(৩.৫২×১০^{-৩})-এককের পারমাণবিক ওজন]। অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে ভর যখন বেড়ে গেল, তখন পাওনা তেজেরও কিছুটা লুকিয়ে গেল। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভর যখন কমে গেল, তখন কিছু বাড়তি তেজও অপ্রত্যাশিতভাবে এসে হাজির হয়ে গেল। তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে ঐ তেজটি কি অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল, না, ভরের মধ্যে লুকিয়ে

গিয়েছিল? আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভরটিও কি লুপ্ত হয়ে গেল, না লুকিয়ে থেকেই এসে গেল তেজের আড়াল দিয়ে?

সুতরাং আমাদের পুরানো মূল প্রশ্নটি এবার সত্যিই জোরদার হয়ে উঠল। ভর-তেজ সম্পর্কের কোন জটিলতা আর নয়। তাদের মধ্যেকার সে সম্পর্ক নিশ্চিত এবং সুনিবিড়। অন্য দিক থেকেও তার প্রমাণ মিলল। খোদ আলোতেজের সঙ্গেই তাদের যোগাযোগের কথা ঘোষণা করে দিলেন রাদারফোর্ডেরই আর এক সহযোগী। আমেরিকাবাসী কম্প্‌টন (Arthur Holly Compton) ১৯২২ খ্রী.-এ দেখতে পান যে, রঞ্জেন-রশ্মির বিক্ষেপকালে তার ফোটন অন্য কোনো পরমাণুর ইলেক্ট্রনের মধ্যে স্বীয় তেজ আর ভর সংক্রমিত করে দেয়। তখন সেই ইলেক্ট্রনটিও পুনরায় সেই তেজের পুরোটাই কোনো বিশেষ অভিমুখে বিকীর্ণ করে দেয়। সেই বিকীর্ণ তেজ গতিতেজরূপে প্রকাশ পায়। সেই তেজকে মেপে বুঝতে পারা যায় যে, রঞ্জেন-রশ্মির ফোটনটি তাকে ঐ পরিমাণ তেজ দিয়ে দিয়েছে। এর ফলে ওদিকে ঝাঁকুনি-মারা ফোটনটির তেজও তখন ঐ পরিমাণে কমে যায়। অর্থাৎ তার প্রথম তেজ থেকে ঝাঁকুনি-খাওয়া ইলেক্ট্রনের ঐ গতিতেজটি বাদ দিলেই যা অবশিষ্ট থাকে, সেইটিই তখন ঐ মূল ফোটনটির অবশিষ্ট মূলধন হয়ে দাঁড়ায়।

কম্প্‌টন বর্ণালি-বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে হাল্কা উপাদানসমূহের রশ্মিবিক্ষেপ বিশ্লেষণ করে একটি জিনিস দেখতে পেলেন। বর্ণালির মধ্যে যে বর্ণের প্রকাশ ঘটছে, তা প্রাথমিক রশ্মিগুলির (primary rays) বর্ণপাতের ন্যায়। কিন্তু এই রকমেরই আরও এমন কতকগুলি বর্ণরেখা মিলছে, যারা দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অভিমুখী। বিক্ষেপ-কোণের বৃদ্ধির সঙ্গে তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পার্থক্যও বেড়ে যায়। এ ঘটনা কম্প্‌টন-প্রভাব (Compton effect) নামে অভিহিত হল। এর দ্বারা জানা গেল যে, ইলেক্ট্রনকে প্রায় মুক্ত কণিকাই বলা চলে। ধাক্কা মারা ফোটনের তেজের তুলনায় পরমাণু-কেন্দ্রকের সঙ্গে এর বন্ধন এত ক্ষীণ যে সেই বন্ধন-তেজকে (binding energy—পৃ. ২৫৭, ২৬১; ২৭৪ পরে দ্রষ্টব্য) নগণ্যই বলা চলে। কিন্তু রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুব ছোট হলে বা উপাদানের পারমাণবিক সংখ্যা বেশি হলে (অর্থাৎ ভারি উপাদানের ক্ষেত্রে), আপতিত ফোটনের তুলনায় তার ঐ বন্ধন বা ফোটন-তেজকে তখন আর উপেক্ষা করা যায়না। তখন দু' রকমের ঘটনা ঘটতে পারে। যদি ধাক্কা-মারা ফোটনের তেজটি ইলেক্ট্রনের মধ্যে সংক্রমিত হয়ে যায়, তাহলে ফটো-বৈদ্যুৎ প্রভাব (পৃ. ২২৫) প্রত্যক্ষীভূত হয়। নাহলে ঐ ফোটন যদি তার স্বীয় তেজকে না খুইয়ে দিয়ে কেবল তার অভিমুখ পালটে ফেলে তাহলে কেবল সাধারণ বিক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই হয়না।

কিন্তু এ ঘটনার বিপুল তাৎপর্য ধরা পড়ল। যে-পরিমাণ তেজ পুঞ্জিত হয়ে একটি

দৈর্ঘ্য-পরিমাপকে প্রকাশ করতে পারে, তার নাম হল কম্প্‌টন-তরঙ্গদৈর্ঘ্য। তার পরিমাপ ·০২৪২ × ১০⁻⁸ সে. মি.। জানা গেল যে, এই পরিমাণ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তেজ-পরিমাণের ভর হল একটি ইলেক্ট্রনের ভরের অনুরূপ। অর্থাৎ একটি বিশেষ দৈর্ঘ্যের মধ্যে ধরা দিলে তেজেরও ভর-ভাবটি প্রকাশ পায়। আলো-তেজটি তখন নিশ্চিত ভরবিশিষ্ট বিদ্যুৎকণিকা (ইলেক্ট্রন) বা পরমাণুর একটি অংশ রূপে, বা বলতে পারি ভরপ্রধান বস্তুরূপেই ফুটে উঠে। ভারতীয় বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোসের (১৮৯৪-) আবিষ্কার থেকে এতৎসম্পর্কিত তত্ত্বটি যেন সুনির্দিষ্ট তথ্যের রূপ প্রাপ্ত হল। তিনি অনুমান করলেন, যে সব ফোটন দিয়ে আলোদেহটি গঠিত, পরস্পর থেকে তাদের পৃথক করা যায়না। তারা কয়েকটি মিলে যেন এক একটি পৃথক্‌সত্ত্ব অস্তিত্ব। এক একটি একক-আয়তনের মধ্যে কতকগুলি ফোটন থাকে, তাদের মোট সংখ্যাটি নির্দিষ্ট না হলেও মোট তেজপরিমাণটি সুনির্দিষ্ট। কিন্তু ঐ রকম এক একটি আয়তন দিয়েই আবার এক একটি স্থান- বা দেশ-পর্যায় (phase-space) ঘটিত হয়। একটি বিশেষ পর্যায়সীমার (frequency-range) মধ্যে কতকগুলি কোষ বা প্রকোষ্ঠ থাকে। তিনি তার সংখ্যা নির্ণয় করে দেখান যে তার মধ্যে কতকগুলি কোষ খালি পড়ে থাকতে পারে। কতকগুলিতে একটি, কতকগুলিতে আবার দু'টি বা তিনটি ইত্যাদি সংখ্যার ফোটনের বিদ্যমানতার বিষয়ও কল্পনা করা যায়। এভাবে কত রকমের বণ্টন ব্যবস্থা সম্ভব, তা স্থির করবার উপায়গুলি, এবং তা থেকে পর্যায়সীমার অন্তর্গত ফোটন-সংখ্যা নির্ণয়ের পন্থাও তিনি উদ্ভাবন করেন। এভাবে তিনি দেখান যে, প্ল্যাঙ্কের বিকিরণ-তত্ত্বকে দাঁড়িয়ে থাকতে হলে ফোটন সংক্রান্ত সম্পূর্ণ নূতন ধরনের এই বিভিন্ন সম্ভাবনাযুক্ত বিভিন্ন পরিসংখ্যান তত্ত্বকে (statistics) স্বীকার করে নিতেই হয়। তেজপরিমাণ সংক্রান্ত সমগ্র পরিকল্পনাটি এভাবে একটি সুনির্দিষ্ট আঙ্কিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মহামনীষী আইনস্টাইন তৎক্ষণাৎ এর গুরুত্বের (এবং ব্রগলি-তত্ত্বের—পরে দ্রষ্টব্য—সঙ্গে এর সম্পর্কের) কথা ঘোষণা করলেন। তিনি এ তত্ত্বকে বিকশিত করে তুলেন এবং এক-পরমাণুওয়ালা গ্যাসের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করেন। সত্যেন্দ্রনাথের ফোটন এবং তাঁর গ্যাস-কণিকার মধ্যে কিছু পার্থক্য ছিল। তাছাড়া সত্যেন্দ্রনাথ যেখানে ফোটন-সংখ্যার চাইতে তাদের মোট তেজপরিমাণের নির্দিষ্টতার উপর জোর দিয়েছিলেন, তিনি সেখানে ঐ ফোটন-সংখ্যার নির্দিষ্টতার উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কিন্তু সম্ভাবনা সন্ধানের মূল পরিকল্পনাটি তার দ্বারা এতটুকুও পরিবর্তিত হয়নি। তার সাহায্যেই নির্দিষ্ট পরমাণুযুক্ত তেজদেহের উপাদান রূপ কণিকা-সংখ্যার গড়টি নির্ণয় করা সম্ভব হল। এভাবে তেজতত্ত্বটি সুনিশ্চিতভাবেই পরিমাণতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তার ভর-রূপের যথার্থ সন্ধানটি মিলে গেল।

কিন্তু সুদীর্ঘপোষিত আলোকের তরঙ্গ-তত্ত্বের দিকেও দৃষ্টিপাত না করে উপায় নাই।

কারণ ইতিপূর্বে আমরা বার বারই আলোকের তরঙ্গধর্ম সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছি। কিন্তু তার সবচেয়ে জোরাল প্রমাণ বোধকরি অপবর্তন (পৃ. ৮৬) ঘটনাকে অবলম্বন করেই প্রত্যক্ষীভূত হয়। সেই ঘটনাতে দেখা যায় যে, পিন দিয়ে ফুটো করা একটি অতিসূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট পর্দার উপর একটি সমসত্ত্বদেহ উজ্জ্বল রশ্মি ফেললে পিছনের কালো পশ্চাৎপটে সেই রশ্মিকে কেন্দ্র করে পর পর কয়েকটি আঁধার এবং আলোর বলয় (বালা) গঠিত হয়। আলোরশ্মি কণিকাদেহ এবং তার পথ সরলরৈখিক হলে এরকম তো হতে পারতনা। আবার দেখা গেল যে, যদি পর্দায় বা কালো কাগজে খুব কাছাকাছি অত্যন্ত ক্ষুদ্র দুটি ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ঐ রকম রশ্মি পাঠান যায়, তাহলে পশ্চাৎপটের ছবির চেহারাটি একেবারেই পালটে যায়। মোটামুটিভাবে তার ভঙ্গিটি হয় ছিদ্রদ্বয়ের আকার-বিশিষ্ট। কিন্তু সেটিকে দেখায় যেন একটিই একটানা ছবি—তবে তার মাঝামাঝি জায়গার ওপর প্রান্ত থেকে নিচপ্রান্ত পর্যন্ত যেন কতকগুলি আলো এবং আঁধারের ডোরা দেখতে পাওয়া যায়। আলোর রশ্মি তরঙ্গধর্মী বলেই দুটি ছিদ্র পার হয়ে যাওয়ার পর দুটি তরঙ্গের দুটি চূড়া বা দুটি খাত বেঁকে এসে এক জায়গায় মিলিত হলে তার আলো আরও উজ্জ্বল হয়ে পশ্চাৎপটে গিয়ে লাগে। অথচ যদি একটি তরঙ্গ-চূড়া অন্য একটি তরঙ্গের খাতে গিয়ে পড়ে যায় তাহলে তারা কাটাকাটি হয়ে যাওয়ায় পশ্চাৎপটে পৌঁছে আলোর সাড়া জাগাতে পারেনা। ফলে যেখানে সে আলো এসে পড়তে পারত, সে জায়গাটি আলোকাভাবে কালো থেকে যায়। ঐ আলো এবং আঁধারের মাপ এবং দূরত্ব প্রভৃতি থেকে হিসেব কষে এক এক রকমের রঙের আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যও নির্ণয় করা সহজ হয়। দেখা যায় যে লাল এবং বেগনি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য হয় যথাক্রমে ·০০০৮ ও ·০০০৪ সে মি.।

কিন্তু ঐ আলো আঁধারের বলয়গুলির ব্যাখ্যা পাওয়া শক্ত হয়ে উঠল। পিনের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যদি কোনো সাধারণ দৃশ্যমান রশ্মির ফোটন পেরিয়ে যেতে পারে, তাহলে সে পিছনের পর্দায় পড়ে তাকে ঐ পতন বিন্দুতে আলোকিত করবে। আর পিন-ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সে বেরিয়ে যেতে না পারলে পর্দায় কোনো আলো জাগবেনা। কিন্তু এতগুলি আলোআঁধারী বলয় সৃষ্টি হবে কেন ? আর যদি কোনো অজ্ঞাত কারণে তা ঘটেই থাকে, তাহলে পাশাপাশি দু'টি ছিদ্র থাকলে ঐ একই রকমের দু'টি চিত্র না হয়ে, একটি ডুরে কাটা ছবি দেখা যায় কেন ? তাছাড়া প্রাথমিক কণিকার গুণসম্পন্ন একটি অবিভাজ্য ফোটন তো আর দু'ভাগ হয়ে দু'টি ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারেনা। সুতরাং ফোটন-কণিকা যদি একটি ছিদ্রই পেরিয়ে যায়, তাহলে সে কি করে বলয়ের বদলে ডুরে তৈরি করে ? তাহলে ঐ ফোটন-রূপী প্রথম আলো পরিমাণটি আসলে কণিকাধর্মী না তরঙ্গধর্মী ? ফটো-বৈদ্যুৎ ঘটনাদির মত এক্ষেত্রে তাকে পরিমাণ-কণা না ধরে নিলে ঐ ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়না। আবার তাকে তরঙ্গধর্মী মনে করলেই যেন আলো-আঁধারী বিশ্লেষণরূপ

অপবর্তন ঘটনাটির একটু হদিশ মেলে। অথচ আলো সম্বন্ধীয় দুটি মতবাদই তার সরলরৈখিক গতির ব্যাখ্যা দিয়েছে। তাহলে ঐ ফোটন কি কণিকাধর্মী ও তরঙ্গধর্মী দুইই? এবং কোথাও তার কণিকাধর্ম এবং আর কোথাও তার তরঙ্গধর্ম প্রকাশ পাচ্ছে? ঘটনাকে অস্বীকার না করে মনীষী আইন্‌স্টাইন দুঃসাহসিকভাবেই অনুরূপ কল্পনা করে নিলেন। কিন্তু ব্যাপারটি অনুধাবনযোগ্য বটে।

রঞ্জেন-রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রায় $১০^{-৮}$ সে. মি.-এর মত। অর্থাৎ এর ফোটন-তেজ দৃশ্যমান রশ্মিগুলির (সাতটি) ফোটন-তেজের চাইতে হাজার হাজার ভাগ কম। সুতরাং এত ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ফোটনকে দিয়ে অপবর্তন প্রক্রিয়া ঘটাতে গেলে প্রয়োজনীয় ছিদ্রের পক্ষে উপরোক্ত পিন-ছিদ্রের চাইতেও হাজার হাজার ভাগ ক্ষুদ্র হওয়া দরকার। কোথায় পাওয়া যাবে এত সূক্ষ্ম ছিদ্র? প্রকৃতি এসে বিজ্ঞানীকে সাহায্য করল।—বস্তুর পরমাণুগুলি যখন এক একটি পৃথকসত্তা, তখন যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, কোনো বস্তুর পরমাণুগুলির মধ্যে কিছু কিছু ফাঁক থাকা সম্ভব। জানা গেল, রঞ্জেন-রশ্মির ফোটন এত ক্ষুদ্র যে মাত্র কতকগুলি দানাদার বস্তুর দানা বা কেলাসের (crystal) অন্তর্গত পরমাণুর ফাঁক দিয়ে গিয়েই তার পক্ষে কোনো পশ্চাৎপটে আলো-আঁধারী ছবি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। সেই ছবি থেকে তখন রঞ্জেন-রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যও মেপে ফেলা যায়। ১৯১২ খ্রী.-নাগাৎ জার্মান বিজ্ঞানী ল' (Laue) রঞ্জেন-রশ্মির দ্বারা সৃষ্ট অপবর্তন ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করলেন।

একটি বিষয় বিচার করে দেখা দরকার। আমাদের কাছে কত ঘটনাই তো কত ভাবে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু যা কিছুই আমাদের মনে হয়, তা কি সব সময় ঠিক হয় নাকি? পাখাটি যদি প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে থাকে, আর তার ব্লেডগুলি যদি ধবধবে সাদা হয়, তাহলে তো দূর থেকে মনে হয়, সাদা রঙের একটি থালা দাঁড়িয়ে রয়েছে। অথচ একটি আসল থালা যতটা জায়গা জুড়ে থাকে, ব্লেডগুলি তার কতটুকু অংশই বা অধিকার করে আছে! সুতরাং দূর থেকে একটি ঘূর্ণমান পাখা আর ঐ রকম আয়তনের একটি সত্যিকার থালা দেখলে কোন্‌টি সত্যিকারের পাখা, তা কে বলে দিতে পারে? কে ঠিক করে বলবে কোন্‌টি দাঁড়িয়ে আছে, আর কোন্‌টি ঘুরে চলেছে? ফোটন তো একটি আলোকগুচ্ছ, বা আলোপরিমাণের একটি কণিকা। সে যখন কোমর দুলিয়ে রঙ্‌ ছড়িয়ে নেচে নেচে এগিয়ে যায়, বুঝতে পারি তার তেজ আছে বটে—গতিতেজ। কিন্তু আর কোনও পরিমাণ-কণা যদি রঙ্‌ ছড়াতে না পেরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাচতে থাকে, তাহলে কি তাকে নিস্তেজ বলতেই হবে? এগিয়ে যাওয়া বা দাঁড়িয়ে থাকা তো একটি ঢং মাত্র। কোনো উঁচু জায়গা থেকে একটি লম্বা সোজা ইস্পাতের পাতলা পাতের একটি প্রান্ত ধরে দুলিয়ে দিলে তার ঢেউ শূন্য মার্গ দিয়ে ওপর থেকে নিচের মুক্ত প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে যায়। তাই বলে পাতটা কি এগিয়ে যায় নাকি? আবার একটি বীণা যন্ত্রের দু'দিক-বাঁধা একটি

তার ধরে টেনে ছেড়ে দিলে তারও ঢেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাচতে থাকে। দু'টিই তো তরঙ্গ বা ঢেউ, দু'টিই তো ঢং মাত্র। কিন্তু আসলে বস্তু দু'টি তো হচ্ছে ইস্পাতের পাত আর লোহার তার। ঐ আসল বস্তু দু'টি না থাকলে ঢং আসত কোথা থেকে? সুতরাং তেজ-ঢং দেখে যদি একজনকে পদার্থ-কণিকা বলে ধরে নিতে হয়, তাহলে নিস্তেজ-ঢং দেখে আর একজনকে পদার্থ-গৌরব দেবনা কেন? আর তেজ যদি পদার্থের একটি ঢং হয়ে থাকে তাহলে তার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাচার ঢংটিকে ভর-ঢং বলা যাবেনাই বা কেন?

অর্থাৎ যদি তেজ-কণিকার তরঙ্গভঙ্গ থাকে তাহলে ভর-কণিকারও তরঙ্গভঙ্গি আছে। ১৯২৪ খ্রী -নাগাৎ ব্রগলি (Prince Louis Victor P. R. de Broglie—1892-?) নামে এক অখ্যাত ফরাসী পদার্থবিদ্ সেই কায়দাটি ধরে ফেললেন। তিনি অনুমান করলেন পৃথিবীর সব বস্তুই যেন নক্ষত্রের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাচছে। ওদের ঐ দপদপানিটি আমাদের চোখে ধরা পড়ে না বটে, কিন্তু সে-বস্তু নিস্তেজ বা ভরধর্মী যাই হোক না কেন, তার তরঙ্গভঙ্গি আছে। ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে 'ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন' নামক একটি সাময়িক পত্রে তিনি এই বস্তু-তরঙ্গের কথা ঘোষণা করলেন। পূর্ববর্তী অন্যান্য প্রকার তরঙ্গ-কল্পনার তুলনায় এর বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেকটি বস্তুরই তরঙ্গ, এ এক অভাবিতপূর্ব কল্পনা বটে। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি (পৃ. ২১০-১১) যে জল-তরঙ্গে নৌকোটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাচে, কিন্তু সে এগিয়ে যায়না। কারণ জল-তরঙ্গের অর্থ জলের এগিয়ে যাওয়া নয় ওটি জলের একটি ঢং মাত্র। কিন্তু নৌকো যখন এগিয়ে চলে, তাকে তখন তরঙ্গের ওপর দিয়েই এগিয়ে যেতে হয়। ঐ রকম বায়ু বা জল প্রভৃতির মত কোনো মাধ্যম-বস্তুর তরঙ্গকে আশ্রয় করেই শব্দও এগিয়ে চলে। আমরা ওকেই শব্দ-তরঙ্গ বলে কাজ চালাই। কিন্তু বস্তু-তরঙ্গের জন্য যখন কোনো মাধ্যম লাগেনা, তখন তাকে কোনমতেই শব্দ-তরঙ্গের মত যান্ত্রিক তরঙ্গ সদৃশ বলা যায়না। আবার বিদ্যুৎ-আধান নাই, এমন সব বস্তুরও যখন তরঙ্গ আছে, তখন তাকে বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গও বলা চলেনা। সুতরাং ওকে শুধু ঐ বস্তুদেহতরঙ্গ ছাড়া আর কি-ই বা বলা চলে? সেকেণ্ডে ২০ থেকে ১৬০০০ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দ-তরঙ্গ এবং ১।২৫০০০ সে. মি. বা এর দ্বিগুণ দীর্ঘ আলো-তরঙ্গও মানুষের ইন্দ্রিয়ে (যথাক্রমে কর্ণ ও চক্ষুতে) ধরা দিয়ে তাদের অস্তিত্বের পরিচয় জানিয়ে যায়। কিন্তু ঐ বস্তু-তরঙ্গ তো মানুষের ইন্দ্রিয়াতীত। মন নামক ইন্দ্রিয়টিই কি তাকে ধরবার মত নিপুণ নাকি? এই তো সবে দু' শ' কোটি মানুষের মধ্যে একটিমাত্র মানুষের মনশ্চক্ষুতে ঐ কাঁপন ধরা পড়ল। সুতরাং এ তরঙ্গ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা কি? কিন্তু তবুও বিজ্ঞানী এই বস্তুতরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরিচয়টি পর্যন্ত জানিয়ে দিতে এগিয়ে এলেন। ব্রগলি জানালেন যে 'প্ল্যাঙ্ক-ধ্রুবক'কে ($h = ৬.৬ \times ১০^{-২৭}$,

পৃ. ২১২) বস্তুর ভরবেগ (= ভর × বেগ = mv) দিয়ে ভাগ করলেই বস্তুতরঙ্গদৈর্ঘ্য (λ) মিলে যাবে :

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

সহজ হিসাব। প্রস্তরখণ্ডের ওজন বা ভর (m) যদি ১ কিলোগ্রাম এবং বেগ যদি সেকেণ্ডে ১ কিলোমিটার হয়, তাহলে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য হবে $(৬\cdot৬ \times ১০^{-২৭}) \div (১০০০ \times ১০০০০)$। এভাবে পৃথিবীর তরঙ্গদৈর্ঘ্য $= ৩\cdot৬ \times ১০^{৬১}$ সে. মি. ($m = ৬ \times ১০^{২৭}$, $v = ৩ \times ১০^{৬}$) এবং একটি সাধারণ ইলেক্ট্রনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য $= ১০^{-৭}$ সে. মি. ($m = ১০^{-২৭}$ গ্রা., $v = ৬ \times ১০^{৭}$, অর্থাৎ, ১ ভোল্টের বিভব পার্থক্য বিশিষ্ট বিদ্যুৎক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ ইলেক্ট্রনের বেগ)। ব্রগলির উপরোক্ত সূত্র থেকে অবশ্য একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, লবের সংখ্যাটি যখন নির্দিষ্ট ($৬\cdot৬ \times ১০^{-২৭}$) থাকছে, তখন হরের অন্তর্গত সংখ্যাদ্বয়ের বা তাদের যে কোনো একটির বৃদ্ধি ঘটলেই ভাগফলটি হ্রাসপ্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ কোনো বস্তুর ভর বা বেগ বা উভয়েই বেড়ে গেলে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যও কম হবে। সে যেন তখন ক্রমাগতই আপনার মধ্যে সংকুচিত হয়ে এসে তার কণিকা ধর্মটি প্রকাশ করতে থাকে। আবার ওদের কেউ শূন্য হয়ে গেলেই তরঙ্গদৈর্ঘ্য অসীম বা শূন্যতার নামান্তর হয়ে যেতে পারে। তখন তরঙ্গ আর তরঙ্গ থাকবেনা।

আইনস্টাইন ফোটনের তরঙ্গ এবং কণিকা এই উভয় ধর্মের কথা বলেছিলেন। দ্য ব্রগলি কণিকাধর্মী সর্বপ্রকার বস্তুরই তরঙ্গধর্মের কথা ঘোষণা করলেন। বস্তুর সব

১। রঞ্জেন-রশ্মি অপবর্তন
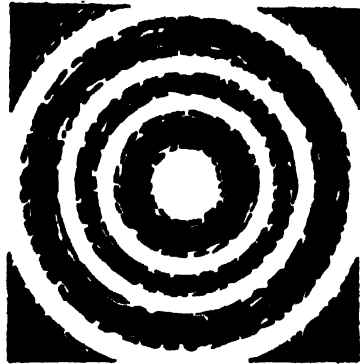
২। ইলেক্ট্রন অপবর্তন

চাইতে ক্ষুদ্রতম সত্তা একটি ইলেক্ট্রন। সেটি নিশ্চিতভাবেই একটি কণিকা। সুতরাং ইলেক্ট্রন যদি তরঙ্গধর্মী হয়ে থাকে তাহলে আর সব বস্তু যখন ইলেক্ট্রন দিয়ে গঠিত, তখন সব বস্তুই তরঙ্গান্বিত অস্তিত্ব বহন করে চলবে। কিন্তু এই ইলেক্ট্রনের মধ্যে তরঙ্গ থাকলে

সেও তো নিশ্চয় কেলাসের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে পশ্চাৎপটে আলো-আঁধারী ছবি জাগিয়ে তুলবে। বিশেষত সে-ই এই পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম কণিকা বলে তার ওপর অন্য কোনো কণিকার প্রভাব পড়ার ভয় নাই। দেখা গেল যে, যে-ইলেক্ট্রন বহিস্থ বিদ্যুৎ বা চুম্বক-ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই কণিকা-রীতি প্রদর্শন করে, সে-ই কেলাসের ফাঁকে ফাঁকে এগিয়ে গিয়ে আলো-আঁধারী চিত্র নির্মাণ করে দিয়ে তার নিশ্চিত তরঙ্গধর্মের পরিচয়-পত্র লিখে দেয়। তেজকণিকারূপী ফোটনের বেলাতেও আমরা একই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছি।

তাহলে ফোটন আর ইলেক্ট্রন, ওরা উভয়েই (পরিমাণ- বা) তেজ-কণিকাধর্মী এবং ভরধর্মীও। কিন্তু জানা গেল যে এ দু'টি ধর্ম আসলে দুটি প্রকাশ-ভঙ্গিমা বা অবস্থান-রীতি। 'যদি ওদের মধ্যে পারস্পরিক রূপান্তর ঘটে থাকে তাহলে একথাও বলা যায় যে, ঐ দু'টি অবস্থান-রীতি তাহলে একই মূল পদার্থের অবস্থান-রীতি। একই মূল পদার্থ কখনও তার ভর-রীতিতে আবার কখনও তার তেজ-রীতিতে নিজেকে জানান দিয়ে চলেছে। কখন যে সে কোন্ রীতি গ্রহণ করে, তার নিয়ম আজও অনাবিষ্কৃত। তবে সে-রীতি একবার প্রকাশ পেলেই যে তা' একেবারে বর্বর-নীতি হয়ে, সব কিছুর সীমা লঙ্ঘন করে যায়, তা নয়। সর্বদাই সে যে তার সীমা রক্ষা করে, তা আমরা বুঝে নিতে পারি। তার জন্যে আমাদের পূর্ব কথিত (পৃ. ২২৯) মাধ্যাকর্ষণীয়-ভর এবং জাড্য-ভরের সম্পর্ক-জনিত বিবরণটিকে একবার বাজিয়ে নিতে হয়ঃ

মাধ্যাকর্ষণীয়-ভর = জাড্য-ভর (আসল ভর)

মাধ্যাকর্ষণীয়-ভর বৃদ্ধি = জাড্য-ভর বৃদ্ধি

মাধ্যাকর্ষণীয়-ভর জনিত বেগ বৃদ্ধি = জাড্য-ভর জনিত বেগ হ্রাস

মাধ্যাকর্ষণীয়-ভর জনিত বেগের শূন্যতা = জাড্য-ভর জনিত বেগের সীমাহীনতা

বস্তুর ওজনশূন্যতা = পদার্থবেগের সীমাহীনতা

কিন্তু সর্বাধিক বেগবিশিষ্ট পদার্থের (আলোর) বেগ সেকেণ্ডে ৩ লক্ষ কি. মি. দ্বারা সীমাবদ্ধ। সুতরাং জাড্য-ভর জনিত বেগ অসীম হয়ে গিয়ে বস্তুর মাধ্যাকর্ষণীয়-ভরকে কখনও শূন্য বা অস্তিত্বহীন করে দিতে পারেনা। অর্থাৎ আলোর মত বস্তুরও জাড্য-ভর এবং মাধ্যাকর্ষণীয় ভর দুইই থাকতে বাধ্য। তাই আলোও একটি সুনিশ্চিত পদার্থ। এবং পদার্থ মাত্রেরই বেগ এবং মাধ্যাকর্ষণ দুইই বর্তমান। তবে ভর যেখানে আলো-ভর প্রাপ্ত হয় সেখানে তার মাধ্যাকর্ষণ সব চাইতে কম। সে যেন তখন প্রায় 'বাধাবন্ধহারা'। সে অবস্থাকে আর ভর-প্রধান বলা যায়না। সে তখন তেজ-প্রধান। তবে আলো-পদার্থের ক্ষেত্রে সে কেবল তেজ-প্রধান পদার্থ নয়। ভরযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সে যতদূর পৌছতে পারে প্রায় ততদূর গিয়ে পৌচেছে বলে পদার্থের অবস্থান বা প্রকাশভঙ্গির এটিই একটি সীমা (তেজ-সীমা)। পদার্থের অবস্থান-ভঙ্গির অন্য সীমাটি (ভর-সীমাটি)

তখন তার মধ্যে উপস্থিত থেকেও যেন আচ্ছন্ন বা আত্ম-সংবৃত। (এই অবস্থায় ভরকে তাই সাধারণভাবে শূন্যভরও বলা যেতে পারে)। অথচ আশ্চর্য এই যে, কণিকা-সীমায় ধরা দিয়েও ভর বা তেজ উভয়েই এমন আচরণ করতে থাকে যেন ওরা কত না স্বাধীন। আমরা দেখেছি যে, ভর-রীতির কণিকাও আছে, আবার তেজ-রীতিরও কণিকা আছে। এবং বার বার পরীক্ষা চালিয়ে গেলে দেখা যায় যে ওরা উভয়েই ছিদ্রপথে এগিয়ে গিয়ে আলো-আঁধারী চিত্র রচনা করে দেয়। একটি ছিদ্র হলে বলয়, দু'টি হলে ডোরা। নিশ্চয় বোঝা যায় যে, যেখানে অধিক সংখ্যক কণিকা গিয়ে আছড়ে পড়ে সে জায়গাটি উজ্জ্বল হয়। যে জায়গাটিতে কালো ডুরে দেখা যায় সেখানে ধাক্কা-দেওয়া ইলেক্ট্রনের সংখ্যা অত্যল্পই থাকে। ঘন কৃষ্ণ হলে বুঝতে হবে সেখানে কোনো কণিকাই এসে লাগছেনা। সব কণিকাই যে একটি ছিদ্রপথ বেয়ে এগিয়ে চলে তা বলা যায়না। কারণ তা যদি হত, তাহলে একটি ছিদ্রকে ঢেকে ফেলা হোক বা না হোক, তাতে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হতনা। কিন্তু একটি ছিদ্রকে ঢেকে দিলে বলয় হচ্ছে, অথচ দু'টিই খোলা থাকলে ডোরা দেখা যাচ্ছে কেন? একটি কণিকা যেকোনো একটি ছিদ্র দিয়েই তো যেতে পারে। কিন্তু একটি ছিদ্রপথে নির্গমনকালে কি করে সে বুঝতে পারে যে, পাশেই আর একটি ছিদ্র আছে, আর অমনি পশ্চাৎপটে গিয়ে তার পতন-সন্নিবেশকে সে ভিন্ন করে ফেলে? প্রাথমিক কণিকা যখন বিভাজ্য নয়, তখন একথাও বলা যায়না যে, একই কণিকা দু'টি ছিদ্রপথ দিয়েই নিষ্ক্রান্ত হওয়ার ফলে দু'টি ক্ষেত্রে দু'রকমের ছবি উঠছে। তবে এমন যদি হয়ে থাকে যে, কণিকাগুলির কেউ একটি দিয়ে এবং আর কেউ অন্যটি দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে, তাহলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু কেনই বা একজনে একটি ছিদ্র পছন্দ করে নেবে, এবং অন্য জনে অন্যটি? তেজস্ক্রিয় বস্তুর পরিমাণগুলি যখন ভাঙতে থাকে তখন সবগুলি তো একসঙ্গে ভাঙেনা। কেনই বা তখন একটি পরমাণু একটি বিশেষ মুহূর্তকে বেছে নেয় এবং অন্য পরমাণু অন্যটি? বিজ্ঞানী এ 'কেন'র সদুত্তর দিতে পারেননি। একদিন দেবেন নিশ্চয়। কিন্তু একথা বেশ ভালভাবেই জানা গেল যে, একটিমাত্র নির্দিষ্ট কণিকার বিশেষ আচরণের তাৎপর্যটি অজ্ঞাত থাকলেও তারা অনেকে মিলিত হলে সমষ্টিগতভাবে সমগ্র দলটি যে কাণ্ডই ঘটিয়ে তুলুক না কেন, তার স্বরূপটি ঢেকে রাখা যাবেনা। আর সেই সূত্রে ব্যষ্টিগতভাবে একটিমাত্র কণিকার পক্ষে কি রকম আচরণ প্রদর্শনের 'সম্ভাবনা' আছে, তাও বেশ বলে দেওয়া যাবে। অবশ্য এ সম্ভাবনা যে সব সময় এক থাকবে, এমন কোনো কথা নাই। এ বিশ্বে সবই যখন পরিবর্তনশীল, কেনই বা সম্ভাবনারও পরিবর্তন থাকবেনা? থাকবেনা তার উত্থান-পতন—'সম্ভাবনা তরঙ্গ'?

ব্যাপারটি অনুধাবন করার যোগ্যই। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, একটি ইলেক্ট্রনের ব্যাস যেখানে মাত্র $১০^{-১৩}$ সে. মি., সেখানে পূর্ব বিবরণ-অনুযায়ী একটি উচ্চ বেগসম্পন্ন

ইলেক্ট্রনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য যথেষ্ট কম হওয়া সত্ত্বেও তা প্রায় ১০$^{-১৭}$ সে. মি.। অর্থাৎ ইলেক্ট্রনের দেহতরঙ্গটি তার নিজ দেহের ব্যাসেরই প্রায় দশ লক্ষ গুণ বেশি। বস্তুর দেহের চাইতেও তার তরঙ্গ বা দেহভঙ্গবিলাস আরও বড়!! বিজ্ঞানীরও এমন আজগবী কল্পনা! তাহলে কোন্‌টি কার? কণিকাটি তরঙ্গের, না তরঙ্গটি কণিকার? ব্রগলির তত্ত্বানুযায়ী তাহলে ধরে নিতে হয় কণিকাটি যেন এক তরঙ্গগুচ্ছ। কিন্তু শব্দ যেমন তার মাধ্যমের তরঙ্গ-চূড়ার ওপর দিয়ে এগিয়ে চলে, ইলেক্ট্রনটিও সেইরূপ তার নিজ দেহ থেকেই তরঙ্গ সৃষ্টি করে নিজেই নিজের তরঙ্গশীর্ষ ধরে এগিয়ে যায়। কিন্তু যতই ক্ষুদ্র আর ঘন সন্নিবদ্ধ হক না কেন, বস্তুহীন তরঙ্গভঙ্গিমাত্র কি করে বস্তুসত্ত্ব-কণিকার রূপ ধারণ করবে? ১৯২৭ খ্রী.-এ ব্রুসেল্‌সে অনুষ্ঠিত সল্‌ভে কংগ্রেসে পদার্থবিজ্ঞানীরা তাই এ তত্ত্বকে নাকচ করে দিলেন। কিন্তু তা করতে গিয়েই হাইসেনবার্গ্ (Werner Heisenberg—1901-?) এবং শ্রডিংগার (Erwin Schrödinger) নামক তরুণ জার্মান বিজ্ঞানীদ্বয় এতৎসংক্রান্ত আলোচনাকে যেন এক নূতন খাতে প্রবাহিত করে দিলেন। বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে নূতন-ভাবে চর্চা শুরু করলেন।

ফলও চমৎকার হল। অপবর্তন ব্যাপারটিতে অল্পসংখ্যক ইলেক্ট্রন নিক্ষেপ করে দেখা গেল যে তারা ফটো-প্লেটে গিয়ে এলোমেলোভাবে বিদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু নিক্ষিপ্ত
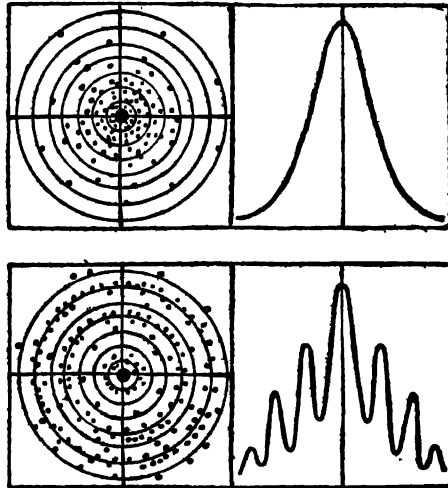
[চিত্রের একটি অঙ্কে লক্ষ্যস্থল ও বলয়গুলির দূরত্ব, এবং অন্যটিতে ছুটি ... বর্তী বিন্দুস্থল-গুলির সংখ্যা সূচিত হয়েছে।]

কণিকার সংখ্যা বাড়তে থাকলে ক্রমেই শৃঙ্খলা দেখা দেয়,—যেন একা একা ওরা খুব স্বাধীন অথচ দলের মধ্যে বেশ শৃঙ্খলাপরায়ণ। অপূর্ব সে শৃঙ্খলা! একটি কেন্দ্রকে বেষ্টন করে

কিছু দূরে দূরে অবস্থিত কতকগুলি ক্রমবৃহৎ পরিধি বরাবর ওরা বেশ সাজিয়ে যায়। সে পরিধি-সজ্জারও কী বাহার! কেন্দ্রের কাছের ছোট্ট পরিধিটিতে যতগুলি, তার পরেরটিতে তার চাইতে কিছু কম। তার পরেরটিতে আবার বেশি, তারপরে আবার কম,—এভাবে যেন তরঙ্গ সৃষ্টি হয়ে চলেছে। কিন্তু আরও আশ্চর্য যে, প্রথম বেশির চাইতে পরের বেশি অধিকতর, তার পরের বেশি আরও বেশি। এভাবে ধাপে ধাপে আর দলে দলে ঐ কণিকা-পতন সন্নিবেশ এগিয়ে চলে—যেন তরঙ্গেরও তরঙ্গ-ভঙ্গিমা। তারপর আবার ওরা তরঙ্গভঙ্গে নেমে আসে।—স্বয়ং ব্রগলিও কি অমন তরঙ্গবিলাসের কথা ভাবতে পেরেছিলেন? ইলেক্ট্রনদের অমন উর্মিলালসার কথা? সুতরাং বাস্তব ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করেই বর্ণ (Max Born) ইলেক্ট্রনদের এ লীলা-তরঙ্গের নাম দিলেন সম্ভাবনা-তরঙ্গ বা উর্মিসম্ভব (probability waves)।

• কিন্তু নিশ্চয় ওরা বস্তুতরঙ্গই। যে বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গ অপবর্তন এবং তরঙ্গসংগম (interference) প্রভৃতি ঘটনার মাধ্যমে নিজেদের তরঙ্গধর্ম প্রকাশ করে থাকে, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আরও ছোট হয়ে এলে তারাও কি কণিকাধর্ম প্রকাশ করেনা? ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ তো গামা-রশ্মির। সে কি বস্তু থেকে তার ইলেক্ট্রন-কণিকাকে উৎক্ষিপ্ত করে দিয়ে স্বীয় কণিকাধর্মের পরিচয় জ্ঞাপন করেনা? ফটোবৈদ্যুৎ ঘটনায় আমরা দেখেছি কী? কিন্তু তাই বলে বস্তুতরঙ্গের সম্ভাবনার মূল্যটিও তুচ্ছ হবে কেন? পূর্বকালের নিউটন-যুগের বলবিদ্যা অনুযায়ী কোটি কোটি বর্ষ যাবৎ বসে বসে কোটি কোটি কণিকার গতিবিধির হিসাব রেখে তারা প্রত্যেকেই কোথায় গিয়ে আঘাত করবে, তা' হয়ত নিশ্চয় করে বলে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু সব না হলেও, প্রায়-সব কণিকার পক্ষেই মোটামুটি কোন্ জায়গা গুলিতে এসে তাদের মিলন তৃষ্ণা মিটিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা, তা' জেনে নেওয়ার মূল্যটিই বা কম কিসে? আর তা জানা তো খুবই সহজ। কারণ স্বাধীন হলেও ইলেক্ট্রনরা তো স্বেচ্ছাচারী নয়!—যতই কেননা তাদের ঈশ্বর-দত্ত স্বাধীনতার কথা প্রচার করে তাদের ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কে বিজ্ঞানের ব্যর্থতাকে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করা হক! বরং ঐ সম্ভাবনার কথাই সমগ্রসত্যের সীমাহীনতার সম্ভাবনার কথাও জানিয়ে দিয়ে সেই দিকেই মানবজীবনধারাকে গতিবান বা অব্যাহত রাখে, তাকে সর্বজ্ঞতার বন্ধ্যাদশা, বা স্থিতিজাড্যের মৃত্যুদশা থেকে মুক্ত রেখে চলে।

সুতরাং বিজ্ঞানী ভেবেছেন, কণিকার ঐ উত্থান-পতনের সম্ভাবনা অবশ্যই আছে, সে-পরিবর্তন আছে বলেই বিভিন্ন ঘটনা বা প্রক্রিয়া বা প্রকাশভঙ্গির মধ্যেও বিভিন্নতা বা পরিবর্তনশীলতা প্রত্যক্ষ করা যায়। পদার্থের অবিচ্ছিন্ন প্রবহমাণ মহাতরঙ্গে ভর আর তেজের রীতি-প্রকাশের সম্ভাবনাটি চিরন্তনভাবেই উঠা-নামা করে চলেছে। একই পদার্থের অদ্বৈত-তত্ত্বটি কেবল প্রকাশাবেগ বশতই ভর আর তেজের দ্বৈত-তত্ত্বরূপে

সম্ভাবিত হয়ে উঠছে। পদার্থের সেই সম্ভাবনা-তরঙ্গটি হয়ত উত্থানকালে এক বিশেষ রীতি অবলম্বন করে উঠে যাচ্ছে, আর নেমে যাওয়ার সময় হয়ত তার আর এক রীতি। অনেক উঁচুতে উঠে গেলে পদার্থ যেমন ইন্দ্রিয়াতীত বা আবিষ্কৃত যন্ত্রের অনধিগম্য হয়ে উঠে, অনেক নিচে নেমে গেলেও তাই ঘটে। পদার্থের ধারা তখন আমাদের কাছে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বস্তুপরিমাণের প্রবাহে তখন মাঝে মাঝে ফাঁক পড়ে যায়। সব যেন ছাড়া ছাড়া মনে হয়, আমরা সূত্র হারিয়ে ফেলি। কিন্তু আবার যে সে ফিরে এসে আমাদের নয়ন মন ভোলাবে, আমাদের উদ্ভাবনকে বা যন্ত্রকে সার্থক করে দেবে, সে সম্ভাবনাও আছে। কিন্তু যখনই একজন চলে যায়, তখনই তো আর একজন এসে পৌঁছোয়। প্রকৃতি-মা আমাদের কতো মমতাময়ী! আর তার মানবসন্তানও কি কম কৃতী! এরই মধ্যে বিপুলদেহ তরঙ্গের কতটাই না সে দেখতে শিখে গেছে!

কিন্তু এসব চিন্তার জন্য পূর্ববর্ণিত সেই পারস্পরিক রূপান্তরের (নিম্নরেখ) 'যদি'র (পৃ. ২৮২) প্রশ্নটির উত্তর দিতে হয়! ভর আর তেজ কি সত্যই পরস্পর-রূপান্তরশীল? পূর্বালোচিত প্রশ্নের একটি স্থূল দিকও তাই এসে উপস্থিত হয়। এবার শুধু জেনে নেওয়া যে, তেজটিই ভর-এ এবং ভরটিই তেজ-এ রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে কিনা। অর্থাৎ এই বেলায় হিসেব কষে দেখে নিতে হবে (অক্সিজেন উৎপাদনের ক্ষেত্রে—পৃ. ২৭৫) কতটা তেজ কতটা বাড়তি ভরে পরিণত হয়, আর (সিলিকন উৎপাদনের ক্ষেত্রে—পৃ ২৭৫) কতটা ভরই বা কতটা তেজে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ব্যাপারটি জানা হল তখন, বিজ্ঞানী যখন প্রায় সব কাজটিই নিজ হাতে গ্রহণ করলেন। ধনাত্মক আল্‌ফা-কণিকা যে প্রবল বিকর্ষণী শক্তির প্রভাব সত্ত্বেও ধনাত্মক কেন্দ্রকের মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে পারে, তার কারণ, ওর প্রচণ্ড গতিবেগ। এই গতিবেগটি সে নিয়ে আসে তেজস্ক্রিয় উপাদানের পরমাণু-কেন্দ্রক থেকে। তাই কেন্দ্রক-রূপান্তরের মারফতে কোনো উপাদানের রূপান্তর ঘটিয়ে প্রয়োজন মত উপাদান পেতে হলে যখন নিক্ষেপক হিসেবে আল্‌ফাকেই ব্যবহার করতে হয়, তখন ঐ তেজস্ক্রিয় বস্তুর সাহায্য ছাড়া উপায় থাকেনা। অথচ ঐ বস্তুটিকে খুঁজে এনে নানাবিধ বিধি ব্যবস্থার বেড়া ডিঙিয়ে আল্‌ফা-কণিকা সংগ্রহ করা, এবং ঐ কণিকাটিকেও নানাপ্রকার পাকে ফেলে তার দ্বারা কাজ সেরে নেওয়া প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠে। প্রয়োজনীয় গতিবেগ সমন্বিত আলফা-কণিকা যোগাড় করা যে অত্যন্ত শক্ত কাজ শুধু তাই নয়, এ হেন দুষ্প্রাপ্য কণিকা লক্ষ লক্ষ ছুঁড়ে মারলে তবে যদি একটি কেন্দ্রকের রূপান্তর ঘটে। অথচ যা জানা গেছে, তাতে আলফা-কণিকা তো প্রোটন-জোট্ মাত্র। সুতরাং দুষ্প্রাপ্য আল্‌ফা বা প্রোটন-জোটের বদলে যদি সহজপ্রাপ্য প্রোটন বা আয়নাম্বিত হাইড্রোজেন দিয়ে কাজ চালান যায় তাহলে ব্যাপারটি সহজতর হয়ে উঠে। তাছাড়া প্রোটনের আধান আল্‌ফার চাইতে কম হওয়ায় ওর ওপরে কেন্দ্রকের বিকর্ষণ প্রভাবটিও

কম হবে। ফলে আল্‌ফার মত ওর অতটা গতিবেগেরও দরকার হবেনা। তেজস্ক্রিয় বস্তু থেকে সেকেণ্ডে যে পরিমাণ আলফা-কণিকা বেরিয়ে আসে তার চাইতে অনেক বেশি হলে, কিংবা ঐ পরিমাণ কণিকারই ক্রিয়মাণ্ শক্তি আরও বেশি হলে হয়ত মন্দ হতনা। কিন্তু পরের দেওয়া জিনিসে অত সব চাইলে চলবে কেন? তাই বিজ্ঞানী ঠিক করলেন, হাইড্রোজেন থেকে প্রোটন সংগ্রহ করেই তিনি ওকাজ সারবেন। কিন্তু তাতে মুস্কিল এই যে, পঞ্চাশ, ষাট বা সত্তর ইলেক্ট্রন-ভোল্টের আলফা দিয়ে যে কাজ চলত, সেখানে অন্তত পাঁচ ছয় লক্ষ ইলেক্ট্রন-ভোল্টের প্রোটন না হলে চলেনা। অথচ তা পাওয়া যাবে কোথায়?

কক্রফ্‌ট্ (Cockroft) এবং ওয়াল্টন (Walton) এ সমস্যার সমাধান করে দিলেন। তৎপ্রযুক্ত তত্ত্বটি কঠিন ছিলনা। এখানে আর একবার আমাদের তেজ-কণিকার স্তর পরিবর্তনের রীতির কথাটি (পৃ. ২৫৪-৫৫) মনে করতে হয়। মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের আওতার মধ্যে এসে পৌঁছলে প্রস্তর খণ্ড ক্রমাগতই মাটির দিকে নামতে থাকে। কিন্তু যতই সে নেমে আসে ততই তার গতিবেগ বা ক্রিয়মাণ শক্তি বেড়ে চলতে থাকে। ঠিক ঐভাবে, বিদ্যুৎ-কণাও বিদ্যুৎক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে উচ্চতর বিভব থেকে নিম্নতর বিভবের দিকে নামতে থাকে। তখন তারও গতিবেগ বা ক্রিয়মাণ শক্তি ক্রমাগত বেড়ে চলতে থাকে (পৃ. ২৫৫)। আমরা জানি যে, কোনো বিদ্যুৎক্ষেত্র সৃষ্টি করতে হলে তার দু'দিকে বিদ্যুৎ-বিভবের বৈষম্য সৃষ্টি করা দরকার হয়। ঐ বৈষম্য যতই বাড়ান যায়, বিদ্যুৎ ক্ষেত্রটিও তত জোরাল হয়। আবার ঐ ক্ষেত্রের প্রভাব যতই জোরাল হবে, অধিকতর নিম্নমানের বিভবের দিকে নামার সময় বিদ্যুৎকণিকাটিও ততই শক্তি অর্জন করতে থাকবে। অবশ্য নিক্ষিপ্ত কণিকাটি যদি বায়ু-কণিকা বা অন্য কিছুর দ্বারা ঐ ক্ষেত্রের মধ্যে বাধা প্রাপ্ত না হয়।—বিজ্ঞানীদ্বয় এ তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে প্রোটনের গতিশক্তিকে বাড়িয়ে তুলতে চাইলেন। কিন্তু অত বিভব-বৈষম্যই বা সৃষ্টি করা যাবে কেমন করে? পরিবর্ত্যমান-প্রবাহমুখ (A. C.—Alternating Current) বিদ্যুতের সাহায্যে (অর্থাৎ যে ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ-প্রবাহের অভিমুখকে নিমেষে নিমেষে পরিবর্তিত করা যায় সেই ব্যবস্থার সাহায্যে) ওরকম অবস্থা সৃষ্টির উপায় পূর্বেই উদ্ভাবিত হয়েছিল। কিন্তু এখানে চাই একমুখী প্রবাহ (D. C.—Direct Current)। পরিবর্ত্যমান প্রবাহকে অবশ্য একমুখী প্রবাহে পরিবর্তিত করা যায়। কিন্তু তার হরকতও মেলাই। তাছাড়া প্রোটনকে পাঠাতে হবে বাধাহীন বা শূন্য কক্ষের মধ্য দিয়েই। ক্ষরণ-নল থেকে সব বাতাস টেনে নিয়ে দু'টি বিদ্যুৎ-দ্বারের সাহায্যে তার মধ্য দিয়ে যেমনভাবে বিদ্যুৎ-ঝলক পাঠান হয় (পৃ. ১৫৪) সেই ভাবেই প্রোটনকেও পাঠাতে হবে। তবে ক্ষরণ-নল এখানে খুব দীর্ঘ হওয়া দরকার। কিন্তু তাতেও যথেষ্ট অসুবিধে আছে। কারণ নলকে ইচ্ছামত

বড় করা যায়না। দৈর্ঘ্যবৃদ্ধি ফলপ্রদ হওয়ার শেষ সীমা দু'লক্ষ ভোল্ট্। দু'লক্ষ ভোল্ট্ বিদ্যুৎ পাওয়ার পর আর দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে কিছু লাভ হয়না। বিজ্ঞানীদ্বয় সেইজন্য একটি অভিনব পন্থা আবিষ্কার করলেন। এক জোড়ার বদলে তাঁরা পাঁচ জোড়া তড়িদ্দ্বার ব্যবহার করলেন। সেগুলিকে তাঁরা এমনভাবে সাজিয়ে রাখলেন যে, প্রথম ও দ্বিতীয় দ্বারের মধ্যে যে দু' লক্ষ ভোল্টের বৈষম্য সৃষ্টি হবে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের মধ্যে তার দু' লক্ষ ভোল্টের সঙ্গে সেটি যুক্ত হয়ে প্রথম আর তৃতীয় দ্বারের মধ্যে ব্যবধানটি চার লক্ষে উঠে যায়। কারণ, এভাবে বিভববৈষম্য বেড়ে বেড়ে গেলে দেখা যাবে যে, প্রথম আর পঞ্চম দ্বারের মধ্যে আট লক্ষ ভোল্টের ব্যবধান হয়ে গিয়েছে। বায়ুমুক্ত ক্ষেত্রটির মধ্য দিয়ে যখন হাইড্রোজেন-আয়নমালা (প্রোটন) দৌড় দিতে লাগল তখন সত্যিই দেখা গেল যে, প্রোটনরা শেষ পর্যন্ত বাঞ্ছিত শক্তি লাভ করছে। [পরে ইলেক্ট্রনকে বিদ্যুৎক্ষেত্রের মধ্যে ফেলে প্রায় আলোকের বেগ সম্পন্ন করাও হয়েছে।]

প্রোটন-বিদ্ধ করবার জন্য খুব হাল্কা উপাদান হিসাবে পর্যায়িক ছকের তিন নম্বর উপাদান লিথিয়ামকেই বেছে নেওয়া হল। দূরে জিঙ্ক্-সাল্ফাইডের প্রতিপ্রভ পর্দা পেতে রাখা হল,—প্রোটনের আঘাত থেকে বাঁচিয়েই। বর্ধিত গতির প্রোটনরা লিথিয়াম-পাতের উপর পড়ে ওর কেন্দ্রকগুলিকে বিভক্ত করতে থাকল। পর্দার উপর দ্যুতিও ঠিকরে পড়ল। কিন্তু ঐ প্রভা প্রোটন-জনিত কিনা জানবার জন্য বিজ্ঞানীদ্বয় লিথিয়াম এবং পর্দার মধ্যে বিভিন্ন বেধের অভ্রখণ্ড ঢুকিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। তা থেকে তারা পর্দায় পৌছান কণিকাগুলির বায়ুভেদ কবার পাল্লাও নির্ধারণ করে দেখলেন। তারা প্রায় ৮'৪ সে. মি. বায়ুস্তর ভেদ করে যেতে পারে। অথচ প্রোটনরা যেতে পারে বড় জোর ৩ সে. মি.। লিথিয়ামের বদলে তাম্রকেও লক্ষ্যবস্তু হিসাবে রেখে একই ফল প্রত্যক্ষ করা গেল। সুতরাং পর্দায় পড়া কণিকাগুলিকে তখন আল্ফা-কণিকা মনে করতেই হল। তেজস্ক্রিয় বস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকেও প্রোটন পাঠিয়ে একটি উপাদানকে অন্য একটি উপাদানে রূপান্তরিত করা সম্ভব হল।

আল্ফা-কণিকা ছিল মানুষের হাতে তুলে দেওয়া প্রকৃতির দান। একটি কার্যকরী অস্ত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই থেকেই মানুষ বানিয়ে ফেলল পরমাণু-বিজয়ের আর একটি অস্ত্র। এইভাবেই আদিম-যুগের মানুষও আত্মরক্ষার্থ জীবজন্তু-বিজয়ের অভিযানে সুন্দর সুন্দর সব প্রস্তরাস্ত্র বানিয়ে ফেলেছিল। তবে তাদের প্রেরণা এসেছিল কোনও তেজস্ক্রিয় কণিকার বিদ্ধ করার ক্ষমতা দেখে নয়। সে প্রেরণা তারা পেয়েছিল হয়ত পড়ে-যাওয়া একটি ভগ্ন প্রস্তরের সূচ্যগ্রভাগ বা তীক্ষ্ণতার উপযোগিতা দেখে। বস্তুত, প্রস্তর-পতনের মত, আল্ফা-বিচ্ছুরণও যেমন প্রাকৃতিক ঘটনা, প্রস্তরের মত প্রোটন-কণিকাও তেমনি প্রাকৃতিক উপাদানই। মানুষের কৃতিত্ব, প্রাকৃতিক ঘটনা থেকে লাভ করা ঐ প্রাথমিক

সত্যকে অবলম্বন করে নিজের প্রয়োজন বা ইচ্ছামত প্রাকৃতিক উপাদানেরই রূপান্তর-সাধন। এছাড়া মানুষের আর করণীয় কিছু নাই। প্রাকৃতিক সত্যের অনুকূল নয়, তার এমন কোনো প্রকার ইচ্ছারও কোনো সার্থকতা নাই। কিন্তু **প্রকৃতি বা সত্যকে অনুসরণ করেই ইচ্ছামত** ঐ উপাদানমালার যে রূপান্তর-ঘটন, এর মহিমা কি সামান্য ? অসংযত বিশৃঙ্খল বাসনা তো পশুরই। সে তো অসভ্যতারই পরিচয়। মানুষ যখন সেই সব কামনাকে এক মহাসত্যের সূত্রে এনে বাঁধল, তখন সেই বাসনা বা ইচ্ছাশক্তি ক্রমে ক্রমে সত্যার্পিত হয়ে বিপুল শক্তি অর্জন করল। আর সেই শক্তি যেন ক্রমশ প্রাকৃতিক মহাশক্তিরও দোসর হতে চলল। এর চাইতে তার বড় কাম্য, বড় গৌরব আর কী হতে পারে ? প্রকৃতির চাইতে শক্তিমান আর কে ?

আল্‌ফা-কণিকারূপ প্রকৃতির দান গ্রহণ করেই যে মানুষ পরমাণুর কেন্দ্রকে প্রবেশের শক্তি অর্জন করেছে, সেটা তার গৌরবের। কারণ, তাই দিয়ে সে নাইট্রোজেন-কেন্দ্রক ভেঙে নিজেই প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করেছে। কিন্তু যখন সে **সেই সংকেত অনুসরণ করে** প্রোটনরূপ প্রাকৃতিক উপাদানটিকে স্বহস্তে বেগবান করে নিয়ে, তার সাহায্যে লিথিয়াম-কেন্দ্রকটিকে ভেঙে দু'টি হিলিয়াম-কেন্দ্রক তৈরি করে ফেলল, তখন তার ইচ্ছাশক্তির মহিমা তার পাশবিক লালসাকে ধ্বংস করে তার বিজয়োদ্ধত শিরে মুকুট পরিয়ে দিলে। বিজয়গর্বে আবার তার অগ্রগমন চলল। কিন্তু তার আগে সেই কেন্দ্রক-প্রতিক্রিয়াটিকে আরও ভাল করে দেখে নেওয়া হল। প্রতিক্রিয়ার আকার হল তাহলে :

$$_3Li^7 + _1H^1 \longrightarrow _2He^4 + _2He^4$$
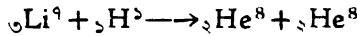
কিন্তু বলবিদ্যার নিয়মানুযায়ী, প্রোটন গিয়ে লিথিয়াম-কেন্দ্রককে দু'টি হিলিয়াম-কেন্দ্রকে রূপান্তরিত করে ফেললে ওরা বিপরীত মুখেই ছুটতে থাকবে। এখানে তার সত্যতা যাচাই করতে হলে মেঘরেখা সৃষ্টি করে ওদের ফটো নিতে হয়। অথচ মেঘায়ন-কক্ষে জলীয় বাষ্প না রাখলে মেঘরেখা সৃষ্টি হবে কেমন করে ? কিন্তু আগেই দেখেছি যে, প্রোটনের গতিপথকে শূন্য রাখতে হবে। সুতরাং আবার এক সমস্যা। কিন্তু এরও সমাধান দিয়ে দিলেন ডী এবং ওয়াল্টন। শূন্য নল এবং মেঘায়ন-কক্ষের মধ্যে তাঁরা পাতলা অভ্রের এমন একটি ব্যবধান রেখে দিলেন যার মধ্য দিয়ে আল্‌ফা-কণিকা সহজেই মেঘায়ন-কক্ষে পৌছে নিজেদের গতিপথের ঠিকানা দিয়ে দেবে, অথচ যার মধ্য দিয়ে মেঘায়ন-কক্ষ থেকে বাতাস বা জলীয় বাষ্প শূন্য নলের মধ্যে এসে পৌছতে পারবেনা। ছবি নিয়ে দেখা গেল যে, দ্বিধাস্পষ্ট লিথিয়াম-কেন্দ্রক বা দু'টি হিলিয়াম-কেন্দ্রক সত্যই বিপরীত পথ ধরেছে। ওদের প্রত্যেকের তেজ মেপে দেখা হল—৮৮ লক্ষ ই. ভো.। সুতরাং তাদের সম্মিলিত ক্রিয়মাণ শক্তি হল ওর দ্বিগুণ। অর্থাৎ ১৭৬ লক্ষ ই. ভো.। অথচ নিক্ষিপ্ত প্রোটনের ক্রিয়মাণ শক্তি ছিল ৮ লক্ষ ই. ভো.। ১৬৮ লক্ষ ই. ভো. শক্তি

কোথা থেকে অপ্রত্যাশিতভাবেই আবির্ভূত হয়ে হিলিয়াম-কেন্দ্রক দু'টিকে প্রচণ্ডভাবে বেগবান করে তুলল! এও তো এক তাজ্জব ব্যাপার! কিছুনা থেকেই এত তেজের জন্ম! ঘটনাটি অলৌকিকেরই মত। না, একি প্রকৃতির কোনো কৌতুক?

কিন্তু কৌতুকের দিন বুঝি ফুরিয়ে এল। মানবমনের এত আকূতি, বিজ্ঞানীর এত প্রয়াস এত নিষ্ঠার কাছে রহস্যের মেঘজাল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে লাগল। হিসাব কষে বিজ্ঞানী দেখলেন, আবির্ভাব আর তিরোভাব একত্রেই কাজ করে চলেছে। তেজের যে আবির্ভাব ঘটল, তা' কিন্তু ভরের তিরোভাব ঘটিয়েই। হাইড্রোজেন, লিথিয়াম, হিলিয়াম, কেউ আর অজানা জিনিস নয়। সকলেরই ভর জানা আছে। পরমাণুর সারা দেহের তুলনায় ইলেক্ট্রনের ভর অকিঞ্চিৎকর বলে ওর হিসাব না ধরলেও চলে। তাছাড়া হাইড্রোজেনের বা লিথিয়ামের যেমন ইলেক্ট্রন আছে, ওদের থেকে উৎপন্ন হিলিয়ামেরও তো তেমনি ইলেক্ট্রন আছে। সুতরাং (অক্সিজেনের তুলনায়—পৃ. ২৪) একটি হাইড্রোজেন-পরমাণুর ১'০০৮১৩-একক যুক্ত ভরটি যখন একটি লিথিয়াম-পরমাণুর ৭'০১৮১৬-একক যুক্ত ভরের সঙ্গে গিয়ে যুক্ত হল, তখন মোট ভরটি হয়ে দাঁড়ান উচিত ৮'০২৬২৯। এদিকে একটি হিলিয়াম-পরমাণুর ভর ৪'০০৩৮৬ বলে উৎপন্ন হিলিয়াম-কেন্দ্রকদ্বয়ের মোট ভর হয়েছে ৮'০০৭৭২। অর্থাৎ যা হওয়া উচিত ছিল তার চাইতে ০'০১৮৫৭-একক কম। সুতরাং এই পরিমাণ ভরেরই তিরোভাব ঘটেছে। তাহলে এই ভরটিই কি ঐ ১৬৮ লক্ষ ই. ভো. তেজের জন্ম দিয়েছে? এর উত্তর দেবে কে?

কিন্তু উত্তর বহু পূর্বেই দেওয়া হয়ে আছে। প্রায় পঁচিশ বছর আগে টমসন-পয়েনকেয়ার-কাউফ্‌ম্যান-লরেঞ্জের তত্ত্ব-সূত্র ধরে আইনস্টাইন ব্যাপকতর ক্ষেত্রে যে অতি সরল একটি ছোট্ট সমীকরণের ($E = mc^2$) প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন (পৃ. ২২৬), তদনুযায়ী $১'০৭ \times ১০^{-৩}$ একক যুক্ত ভর $১০^৬$ (১০ লক্ষ) ই. ভো. তেজের তুল্য হয়। এ থেকে হিসেব কষলে দেখা যায় যে লিথিয়াম-কেন্দ্রকের হিলিয়াম-কেন্দ্রকে পরিণত হওয়ার সময় '০১৮৫৭-এককের যে ভরটি কমে গিয়েছে তার তেজ-প্রতিরূপ হয় প্রায় ১৭৪ লক্ষ ই. ভো.। উৎপন্ন হিলিয়াম-কেন্দ্রকদ্বয়ের মধ্যে যে গতিশক্তি বা ক্রিয়মাণ-শক্তি লক্ষ্য করা গিয়েছিল, তার পরিমাণও প্রায় ঐরূপই। অর্থাৎ প্রায় ১৭৬ লক্ষ ই. ভো.। হিসাবজনিত ছুট বাদ দিলে দু'টি প্রায় মিলেই গেছে বলা চলে। অর্থাৎ লিথিয়াম-কেন্দ্রক রূপান্তর ঘটনায় যে ভরটি অন্তর্হিত হয়েছে সেটি যে তেজেই রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে, সেকথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

কিন্তু একটি বিষয় না লক্ষ্য করে পারা যায়না যে, ভর-তেজের সূত্রটি বহু পূর্বেই বিঘোষিত হয়েছিল,—ভর-তেজের পারস্পরিক রূপান্তর ঘটনা প্রত্যক্ষ করে ঐ সূত্রটি তৈরি করা হয়নি। তত্ত্বদর্শনের জন্য যেটুকু সূত্রের দরকার, তখন তা' ছিল নিশ্চয়। কিন্তু তত্ত্ব

আর ঘটনার মধ্যে যে একটি অবিচ্ছেদ্য নিবিড় সম্বন্ধ চির-বিরাজমান, প্রথম দৃষ্টিতেই সর্বসাধারণে তার তাৎপর্যটি বুঝে উঠতে পারেনা। স্থূল ঘটনাটি চোখ বা অন্য কোনো বহিরিন্দ্রিয়ে ধরা পড়ে। সেই ইন্দ্রিয়-নৈপুণ্য মোটামুটিভাবে মানুষমাত্রেরই অর্জিত। কিন্তু সূক্ষ্ম তত্ত্বটি ধরা দেয় মনে বা অন্তরিন্দ্রিয়ে। সেই তত্ত্বদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় নৈপুণ্য সকলের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয়নি। একটি বিশেষ তত্ত্বস্পন্দন বহুব্যাপ্ত মানবমনের কোনো একটি স্থানে বা একটি অনুকূল স্তরে এসে আঘাত করে। বিশেষ কোনো স্পন্দনকে ধরতে পারে বলে ঐ স্তরটিও বিশেষ হয়ে উঠে। এক বা একাধিক মন দিয়ে হয়ত সেই স্তরটি গড়ে উঠে। কিন্তু ব্যাপারটিকে অন্য কথায় সহজভাবে বলা যায়। সকল মানুষের বোঝার পূর্বে যে-মানুষ প্রথম ঐ সূক্ষ্ম তত্ত্বটিকে অনুভব করতে পারেন, তিনি বিশেষ। মহান প্রকৃতি তাঁর মহান সন্তানের জন্য তত্ত্ব দান করে চলেছেন। মহামানবের প্রতিভূ হিসাবে একজন তাকে প্রথমে হাত পেতে গ্রহণ করলেন বলে আবিষ্কারক বা প্রথম বোদ্ধা হিসেবেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তিনি গ্রহণ করেন সকলেরই হয়ে। তাই গ্রহীতা হলেও তিনিই একমাত্র তত্ত্বভোক্তা নন। তত্ত্বামৃতের ভোক্তা সর্বমানব বা মহামানবই, কোনো বিশেষ মানুষ নন। তাই মহামানব নামটি এখানে বিশেষ মানুষ হিসাবে সার্থক নয়, সর্বমানব সম্পর্কিত হয়েই সার্থক। কিন্তু যিনি স্থূল ঘটনারও বহু পূর্বে সূক্ষ্ম ঘটনাভাস থেকেই সূক্ষ্ম তত্ত্বটির প্রকৃত তাৎপর্য ধরে ফেলতে পারেন, নিশ্চয়ই তিনি অগ্রদ্রষ্টা বা দার্শনিক। সেই কারণে ভরতেজ-রূপান্তর ঘটনার দীর্ঘকাল পূর্বে, ঘটনাভাস থেকেই যে বৈজ্ঞানিকবৃন্দ ভর-তেজ সম্বন্ধীয় সূক্ষ্ম তত্ত্বটি দর্শন করতে পেরেছিলেন, তাঁরাই পূর্বদ্রষ্টা বা প্রকৃত দার্শনিক। পূর্বদ্রষ্টা বলেই তাদের অনুভূত তত্ত্বগুলি অনিবার্যভাবেই বাস্তব সত্যেরও মর্যাদা পেয়ে গেল। সত্যটি অবশ্য একটি মনকে অবলম্বন করেই বাস্তব হয়ে উঠল। কারণ তত্ত্ব- সত্য- বা জ্ঞান-ময় ব্রহ্মাণ্ডে মানবের অনুভবযোগ্য প্রথম জ্ঞানময় সত্তাই হল একটি মন। সে যেন চিন্ময়তার একটি একক। তাই একটি মনের মধ্যে এসে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেই মানবের কাছে কোনো বিশ্বতত্ত্ব বা বিশ্বসত্য বাস্তব সত্যে পরিণত হতে পারে। কিন্তু তত্ত্ববিবর্তনের ফলে এক অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া বশত তত্ত্বদেহেরও বিবর্তন ঘটে চলে। আমরা দেখতে পাচ্ছি তত্ত্বদেহরূপী সেই মনেরও ক্রমবিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। ক্রমেই বহু মন একত্রিত হয়ে উঠছে, বা একসূত্রে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে। তবে সেই একত্রিত মনটি হয়ত পূর্বোক্ত কারণে একটি মনের মাধ্যমেই বাস্তব হয়ে উঠে। নাহলে কোথা হতে ফ্যারাডে-ম্যাক্স্‌ওয়েল-হার্জের, স্তোলেতভ-টমসন-প্ল্যাঙ্কের, টমসন-পয়েন্‌কেয়ার-কাউফ্‌ম্যান-লরেঞ্জের, মাইকেলসন আর মর্লের সব প্রজ্ঞাধারা দুর্বার স্রোতে ছুটে এসে এক মহাসমুদ্রে হারা হয়ে গেল, আর অমনি একটি মনকে অবলম্বন করেই বিশ্বতত্ত্ব বাস্তব সত্য হয়ে ফুটে উঠল!

জগতে ছড়িয়ে থাকা তত্ত্বকে অনুভব করলেন ঋষি, জ্ঞান বা বেদকে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন। তাঁর সেই বেদোদ্ধার সংহিতা-মন্ত্রে ফুটে উঠল $E = mc^2$-রূপে। পঞ্চবিংশ বর্ষের ওপারে গিয়ে সে মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠল লিথিয়াম-রূপান্তর ঘটনায়। তত্ত্ব আর ঘটনার মহামিলন প্রত্যক্ষ করল মানুষ। সেই মিলনের নামই তো সত্য। মানুষের সত্যদর্শন ঘটল। বা, বলতে পারি মহামানবত্ব অর্জনের মহাযজ্ঞে পুনরাহুতি হল। আর অমনি বাজনা বেজে উঠল চারদিকে। তত্ত্বের স্পর্শমাত্রে বীণাযন্ত্রের সমস্ত তারগুলি ঝংকৃত হয়ে উঠল। কত ধ্বনি, কত না মন্দ্র! শুধু কি লিথিয়ামের রূপান্তর! ঐ যে আগে দেখলাম (পৃ. ২৭৫, ২৮৬) নাইট্রোজেন থেকে অক্সিজেন ঘটে ওঠার সময় তেজটি কোথায় উবে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে ভরটি কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল, অথচ অ্যালুমিনিয়াম থেকে সিলিকন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে, হাত-পা গুটিয়ে ভর গেল আঁধারে তলিয়ে, আর সাথে সাথে তেজ উড়ে এল পাখনা মেলে—এসব ঘটনা শুধু ঘটে ওঠা নয়, এক সুরে বাঁধা হয়েই রণিত হয়ে উঠল। প্রত্যেকটি ধ্বনি আর ঝংকারের হিসাব নিয়ে দেখলেন ওস্তাদ, সুর আর লয় তাল ফেলে চলেছে। তত্ত্ব আর ঘটনা এক মহাসামঞ্জস্যে মিলিত হয়ে আছে। পার্থিব প্রত্যেকটি ঘটনার ক্ষেত্রেই ভর আর তেজ ঐ মূল সূত্রকেই মেনে চলছে। একই মহামন্ত্র, কিন্তু ঘটনা অসংখ্য। সত্যলগ্ন হয়ে আছে ঘটনার ধারা, সবই ওরা তত্ত্বলীন।

পর্যায়িক ছক অনুযায়ী পরমাণু-জগতের প্রথম উপাদান হাইড্রোজেন, আর তার পরেরটি হিলিয়াম। দু'টি পৃথক উপাদান রূপেই ওদের পৃথক আসন। বহু পূর্বে মেন্দেলিয়েভেরই তত্ত্ব অনুযায়ী আমরা জেনেছি (পৃ. ৫৯, ৭১), যতই কেননা ওদের পার্থক্যটি প্রতীয়মান হোক, একই ভর-সূত্রে ওরা গ্রথিত। সেইটিই ওদের মিলন-তত্ত্ব বা একত্ব। কিন্তু আবারও আমরা দেখেছি (পৃ. ২৪৬-২৬৩) যে কেন্দ্রকীয় আধানের পরিমাণ সূত্রেও ওরা বাঁধা হয়ে আছে। তাহলে সত্যটি কোথায়? তবে দু'টি ক্ষেত্রেই একটি সাধারণ সত্য লক্ষ্য করা যায় যে, ভরের বা আধানের, যারই হক না কেন, কেবল পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ফলেই নূতন উপাদানের আবির্ভাব ঘটল। পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলেই বিপ্লবটি ঘটে গেল গুণগত পরিবর্তন রূপে।

কিন্তু তাহলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কি ভ্রান্ত হয়ে গেল? দু'টিই তো বিজ্ঞানীর আবিষ্কার! না কি, যেমন আমরা আগেও দেখছি, এখানেও একটি পূর্ণতর সত্যের মধ্যে আর একটি খণ্ড সত্য লগ্ন হয়ে আচ্ছন্ন হয়ে আছে? না কি, ক্রমাগত বিবর্তিত একটি সমগ্র সত্যের মধ্যে ওরা প্রত্যেকেই আত্মসমর্পণ করেছে? সত্যের স্বরূপই ব্যাপক বা সামগ্রিক। হয়ত দু'টি তত্ত্বই এক ব্যাপক সত্যের দু'টি দিক মাত্র। কোথাও একটি বিরাট রহস্য লুকিয়ে আছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে তারই সমাধান হয়ে গেলে আমাদের মূল প্রশ্নেরও সমাধান হয়ে যাবে। আঁধার ফিকে হয়ে আসছে। হয়ত আমরা কূলেরই কাছে

এসে পৌচেছি ; আর একটু কষ্ট করে চলা শুধু। শ্রান্তিহীন সত্যসন্ধানী পথিকের কাছে কতবার কত আলোই তো এসে পৌচেছে আচমকা। সুতরাং প্রশ্নটি ক্ষণমাত্র স্থগিত রেখে ব্যাপারটি একটু তলিয়ে দেখা যাক না কেন।

রাদারফোর্ড্ হাইড্রোজেন-পরমাণুর একটি কেন্দ্রককে, অর্থাৎ একটি ইলেক্ট্রনের সমপরিমাণ আধানযুক্ত অথচ বিপরীত সূচক বিদ্যুৎকে, প্রোটন নামে নামাঙ্কিত করেছিলেন। আমরা একদা ধরে নিয়েছিলাম (পৃ. ২৬৮) যে হাইড্রোজেনের ঠিক পরের উপাদান হিলিয়ামের পারমাণবিক ওজন যখন প্রায় চার, তখন ওর কেন্দ্রকে নিশ্চয় চারটি প্রোটন বিদ্যমান থাকবে। বস্তুত এখানে ভরেরই বৃদ্ধি। অথচ হিলিয়ামের পারমাণবিক তথা কেন্দ্রকীয় ধনাত্মক আধান-সংখ্যা হাইড্রোজেনের কেন্দ্রকীয় একমাত্র আধানের চাইতে এক একক বেশি, অর্থাৎ দুই। বস্তুত এখানে আধানেরই বৃদ্ধি। সুতরাং নিশ্চয় ঐ কেন্দ্রকে অন্য দু'টি ইলেক্ট্রনও উপস্থিত থেকে দু'টি প্রোটনের আধানকে কাটিয়ে দিচ্ছে। বাকি দু'টি মুক্ত প্রোটনের আধান কাটিয়ে দিচ্ছে দু'টি অতিকেন্দ্রকীয় ঘূর্ণমান ইলেক্ট্রন। তাহলে হিলিয়াম-পরমাণুর মোট প্রোটন সংখ্যা হল চার এবং ওর ইলেক্ট্রন সংখ্যাও ঐ চারই। অথচ একটি হাইড্রোজেন-পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা এক, এবং ইলেক্ট্রন সংখ্যাও ঐ একই। তাহলে স্বভাবতই হিলিয়ামের ওজন হাইড্রোজেনের ওজনের চতুর্গুণ। অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন যখন ১·০০৮১৩, তখন হিলিয়াম-পরমাণুর ওজন হওয়া উচিত ৪·০৩২৫২। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে ঐ পারমাণবিক ওজন ৪·০০৩৮৬। অর্থাৎ যা হওয়া উচিত ছিল তার চাইতে ০·০২৮৬৬-একক কম। তাহলে এই পরিমাণ ভরটি কোথায় গেল? পূর্বদৃষ্ট উদাহরণগুলি থেকে এখন অবশ্য ধরে নিতে কষ্ট হয়না যে ওটি নিশ্চয় তেজ হয়ে উড়ে গেছে। কিন্তু তাহলে নূতন প্রশ্ন জাগে, কেন এমন হল? কারণ কি তার?

বিজ্ঞানী এর একটি চমৎকার উত্তর দিলেন,—অভাবিতপূর্ব। পুরাণো রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার তত্ত্বটি তাতে নতুন অর্থে তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠে। জলকণা-সৃষ্টির অতিপরিচিত রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টান্তটি এক্ষেত্রে সহজবোধ্য হতে পারে। [দুটি হাইড্রোজেন-পরমাণু আর একটি অক্সিজেন-পরমাণু প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে যে জলের একটি অণুর সৃষ্টি করে, একথা বহু পূর্বেই জানা হয়েছে। উভয় উপাদানের এক একটি অণুতে দু'টি করে পরমাণু থাকায় এবং একই অবস্থার মধ্যে প্রত্যেকটি অণুরই আয়তন এক বলে আমরা বলতে পারি যে] দু'ভাগ আয়তনের হাইড্রোজেন, আর এক ভাগ আয়তনের অক্সিজেন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে দু' ভাগ আয়তনের জলীয় বাষ্প উৎপন্ন করে। একথা আমরা জানি। আবার একথাও আমরা জানি যে, দু' ভাগ হাইড্রোজেন আর এক ভাগ অক্সিজেন, একসঙ্গে মিশিয়ে দিলেই দু' ভাগ বাষ্প তৈরি হয়ে যাবেনা। বস্তুত, রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে উত্তাপের একটি সম্পর্ক জড়িয়ে থাকে। কোনো প্রতিক্রিয়াতে

তাপ লাগে, কোনো প্রতিক্রিয়াতে আবার অংশগ্রহণকারী উপাদানগুলি তাপ পরিত্যাগ করে। এক্ষেত্রে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলিত হওয়ার সময় ওদের থেকে কিছুটা তাপ বেরিয়ে যায়। অর্থাৎ এখানে বিভিন্ন উপাদানের পরমাণুগুলি যখন মিলিত হয়ে একটি নূতন বস্তুর অণু সৃষ্টি করছে, তখন যোটবদ্ধ হয়ে নতুন ঘরকরণার জন্য ওদের কিছু কিছু প্রাথমিক খরচা লাগছে। একেই আমরা এককালে বেশ পরিবর্তনের আক্কেল-সেলামি বলেছিলাম (পৃ. ১১০)। বিজ্ঞানীরা তাঁদের ভাষায় একে বললেন বন্ধন-শক্তি বা binding energy (পৃ. ২৭৬), অর্থাৎ একত্র মিলিত বা বদ্ধ হওয়ার জন্য ব্যয়িত খরচা। যেখানে খরচা বেশি করা হয়, অর্থাৎ তাপ-তেজটি বেশি পরিমাণে ব্যয়িত হয়, সেখানে মিলন-বন্ধনটিও বেশ সুদৃঢ় হয়। সেসব ক্ষেত্রে তাদের ঐ বন্ধন ছিন্ন করতে হলে তাই বেগ পেতে (অর্থাৎ দিতে) হয় প্রচুর। ঐ পরিমাণ তাপ বা তেজ কোথাও থেকে সংগ্রহ করে এনে ওদের সেই প্রাথমিক খরচাটি পুরিয়ে দিলে তবে ওরা অণুর বন্ধন ছেড়ে নিজেরা নিজেদের স্বরূপে ফিরে যেতে পারে। অণু-গঠনের এই তত্ত্বটি পরমাণু-গঠনের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হতে পারে।

কতকগুলি কণিকা দলবদ্ধ হয়ে কেন্দ্রক গঠন করে। তখন সে হয় এক নতুন সৃষ্টি। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ঘুচিয়ে তখন যেন তারা একটি সমষ্টিগত সত্তার অভিব্যক্তি ঘটিয়ে তুলে। তারই নাম গুণগত নূতন সত্তা। কিন্তু সেই অভিনব সৃষ্টির জন্য তাদের ত্যাগ করতেই হয় কিছুটা। প্রত্যেকেরই কিছুটা করে ভর কমে যায়। কিন্তু যখন একজনের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ওটি বেরিয়ে গেল, তখন ঐ ভরটি তেজে রূপান্তরিত হয়ে গেল। যখন একজনের ছিল তখন ওর নাম ছিল ভর, তখন ওটি ভর-ভারই। যখন ওটি বিশ্বের হয়ে গেল তখন ওর নাম হয়ে গেল তেজ, তখন ওটি তৈজৈশ্বর্য। প্রকৃতি এমনই; ঐশ্বর্যরূপা, বদান্যস্বরূপা।

কিন্তু যেমন তাপ-শক্তি ত্যাগ করেই পরমাণুগুলি মিলিত হয়ে অণু সৃষ্টি করতে পারে, ঠিক সেই রকমই তড়িৎ-তেজটুকু ছেড়ে দিয়েই আধান-কণিকাগুলিও সংবদ্ধ হয়ে কেন্দ্রক গড়ে তুলে। এখানেও সেই নতুন ঘরকরণার জন্য ওদের কিছু শক্তি ব্যয় করতে হয়। প্রকারান্তরে ঐ ব্যয়িত তেজটুকুই ওদের এমন ভাবে যোট বেঁধে থাকবার সুযোগ দিয়ে চলে যায়। সুতরাং ওটিকে বলতে পারি কেন্দ্রক বা কেন্দ্রকীয় কণিকার যোটন-তেজ (binding energy)। আধান-মিলনের বা কেন্দ্রক-গঠনের ওটি একটি শর্তই। হাইড্রোজেন-কেন্দ্রকগুলি যদি তাদের নিঃসঙ্গ একাকিত্ব বর্জন করে নতুন ব্যবস্থায় সম্মিলিত হয়ে হিলিয়াম-কেন্দ্রক, রচনা করতে চায় তাহলে তাদেরও ঐ প্রাকৃতিক শর্তটুকু পূরণ করে দিতে হবে বৈকি। ঐ যে ওদের প্রায় '০২৮৬৬-একক পরিমিত ভর খোয়া গিয়েছে, ওটিই সেই শর্ত।

নিশ্চিতভাবেই জানা গেল যে, ভরটি তেজেই পরিবর্তিত হয়ে যায়। সুতরাং পর্যায়িক

ছকের পরমাণুবৃন্দ, ভর বা তেজ যেকোনো তত্ত্ব সূত্রেই গ্রথিত হয়ে থাকনা কেন, সেটি মূলত একই ব্যাপক তত্ত্বের দুটি ভেদ ব্যতিরেকে অন্য কিছু নয়। অর্থাৎ ভর বা তেজ তাহলে মূলত একই পদার্থ এবং সেইটিই মূল পার্থিব পদার্থ। তা যদি সত্য হয় তাহলে কি একথা বলা চলে না যে সেই মূল পদার্থ দিয়েই আর আর সব মূল বা প্রাথমিক কণিকা-গুলিরও উদ্ভব ঘটছে? হয়ত তা ঘটছে। কিন্তু এত দিনের এত শ্রমসাধ্য অনুসন্ধানের পর যাকে আজ পাওয়া গেল, সেকি সত্যই আমাদের সেই প্রার্থিত বস্তুটি? না সেই আসল বস্তুর আর কোনো ছলনা? ঐ ভর-তেজের অন্তরালবর্তী সেই মূল পদার্থ টির স্বরূপই বা কি; তা না জেনে কি কেবল প্রাপ্তির আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলা যায় যে, ঐ পদার্থ টিই নিশ্চিতভাবে ইলেক্ট্রন-প্রোটনের জন্মদাতাই? সত্য কথা, ইলেক্টনেরও ভর-তেজ আছে। কিন্তু তার প্রকৃত পরিচয় কি? ব্রগলি অনেকটা সেই পরিচয়ের সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন (পৃ. ২৮০-২৮১)। তারই সাহায্যে একবার তার স্বরূপ সন্ধানে অগ্রসর হতে হয়। ব্রগলি-তত্ত্বানুযায়ী ইলেক্ট্রনের দেহভঙ্গি সম্বন্ধে নবলব্ধ জ্ঞান নিয়ে সেই স্বরূপ সন্ধান করতে গেলে পরমাণু-দেহে তার গতিবিধির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হয়।

বিভিন্ন কক্ষপথে কেন্দ্রক-পরিক্রমা করে চলেছে ইলেক্ট্রন। ব্রগলি-তত্ত্ব অনুযায়ী, ইলেক্ট্রন স্থির হয়ে গেলে (অর্থাৎ $v=0$ হলে) তার তরঙ্গবিস্তার (λ) অসীম হয়ে যাবে। তখন তাকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে খুঁজে পাওয়াই সম্ভব নয়। আবার ইলেক্ট্রনের গতি (v) যখন প্রচণ্ড হয়ে উঠে তখন তার তরঙ্গও সংকুচিত হয়ে এসে ক্রমেই তার কণিকাধর্মকে ফুটিয়ে তুলে। কিন্তু ব্রগলি-সূত্রানুযায়ী তখনও তো দেহের চাইতে তার দেহতরঙ্গটি লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি থেকে যায়। অর্থাৎ ধরে নিতেই হয় যে তার দেহটি স্বীয় দেহতরঙ্গের মধ্যেই যেন বিলেপিত হয়ে থাকে। কিন্তু তখন তাহলে তাকে একটি ইলেক্ট্রন না বলে একটি ইলেক্ট্রন-মেঘ, বা আরও ঠিকভাবে ইলেক্ট্রনেরও উপাদান-মেঘ বলা সংগত। তবে আপাতত তাকে আমরা বিশেষ অর্থেই ইলেক্ট্রন-মেঘ ধরে নিয়ে কাজ চালাতে পারি। কিন্তু মেঘের আবার কক্ষপথ কি? সুতরাং ধরা যাক কেন্দ্রক ঘিরে যে প্রথম কক্ষপথ, তা আসলে একটি মেঘলোকই—মেঘময় কে-থাপ। তবে তার যেসব বিন্দুতে মাঝে মাঝে ইলেক্ট্রন-মেঘের প্রচণ্ড বেগজনিত ঘনায়ন এবং তজ্জনিত কণিকাধর্মটি ফুটে ওঠার সম্ভাবনা, সেই বিন্দুগুলির সংযোজক রেখাকে মোটামুটিভাবে ইলেক্ট্রনের ফুটে ওঠার পথ বা কক্ষপথ বলেই আপাতত ধরে নেওয়া যেতে পারে। ঐভাবে একটি থাপ বা আকাশ যেন এক একটি মেঘলোক, যেন ইলেক্ট্রনের এক এক রকমের দেহবিলাস দিয়ে ভরা। রকম বলতে আর কি; প্রথম থাপে একটি, দ্বিতীয় থাপে দুটি এবং তৃতীয়টিতে তিনটি ব্রগলি-দেহতরঙ্গ; এভাবেই রকম-ফের হচ্ছে। তবে থাপগুলির আকৃতি সব একরকম নয়। কারণ, এক একটি থাপে ইলেক্ট্রনের সংখ্যা মাত্র একটি নয়।

একাধিক ইলেক্‌ট্রন হলেই তাদের বিদ্যুৎ-প্রকৃতির সমধর্ম (ঋণাত্মক) বশত তারা পরস্পরকে দূরে ঠেলে দিতে চায়, অথচ কেন্দ্রকের বিপরীত প্রকৃতির বিদ্যুৎ তাদের সকলকেই নিজের কাছে টানছে। এভাবে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলে তাদের বিভিন্ন সংখ্যায় সমাবেশজনিত কক্ষপথের আকৃতিও বিভিন্ন এবং বিচিত্র হয়ে উঠছে। কোনোটি বল বা গোলকের মত, কোনোটি বা ডাম্বেলের মত, কোনোটি হয়ত দু'মুখ সরু চুরুট বা নবজাত বোলতার মত। হাইড্রোজেন-পরমাণুতে যেখানে মাত্র একটি ইলেক্‌ট্রন, সেখানে ইলেক্‌ট্রন আর প্রোটনের ক্রিয়া সম্পূর্ণতই তাদের সমদূরত্বের উপর নির্ভরশীল। তাই ঐ পরমাণুর ঐ ইলেক্‌ট্রন-মেঘের ক্ষেত্র বা কে-খাপটি গোলাকৃতি হয়। কিন্তু খাপের মধ্যে এসে লীলা-বিহার করতে হলে ও ইলেক্‌ট্রনদের কতকগুলি রীতি মেনে নিতে হয়। তারা একেবারে স্বেচ্ছাবিহার চালিয়ে যেতে পারেনা। অষ্ট্রীয়ার (ভিয়েনা) বিজ্ঞানী পাউলি (Wolfgang Pauli—1900-?) সর্বপ্রথম সেই রীতির পরিচয় লাভ করেছিলেন। তদনুযায়ী জানা যায়, ঐ সব অতিকণিকার রাজ্যে, তেজের একটি বিশেষ অবস্থায় বা এক একটি নির্দিষ্ট তেজলোকে একটির বেশি কণিকা স্থান পেতে পারেনা। অর্থাৎ যেন এক একটি কণিকা-তরঙ্গ দিয়েই এক একটি তেজলোক গড়ে উঠে। অন্তত পরমাণুর মধ্যে ইলেক্‌ট্রনের বিহার রীতি এই রকমই। কিন্তু ইলেক্‌ট্রনের ঘোরার কৌশলের মধ্যেও বেশ অভিনবত্ব আছে। সে যে কেবলমাত্র একটি কৌণিক ভরবেগ (angular momenturn—বৃত্তপথে ঘোরার জন্য যে ভরবেগ সৃষ্টি হয়) নিয়ে কেন্দ্রক পরিক্রমা চালিয়ে যায়, মোটেই তা নয়। ১৯২৫ খ্রী.-এ তরুণ পদার্থবিদ উলেনবেক (G. E. Uhlenbeck) এবং গাউড্‌স্মিট্‌ (S. Goudsmit) জানালেন যে, ইলেক্‌ট্রনের আরও একপ্রকারের বেগ থাকে। সে তার ঘূর্ণি (spin) জনিত আবেগ।

সূর্য পরিক্রমাকালে পৃথিবী তার নিজের অক্ষের (কোন গোলকের মধ্যরেখাকে অক্ষ বলে। বর্তুলের এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় বাস্তব বা কল্পিত দণ্ড) চারদিকেও ঘুরতে থাকে। লাটিমও তার অক্ষদণ্ডের চারদিকে ঘুরতে থাকে। কিন্তু সূক্ষ্মাদপি-সূক্ষ্ম ইলেক্‌ট্রনের আবার অক্ষ বা মেরুদণ্ড কি? সে ঐ লাটিমের অতি সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণাগ্রটির মতই যেন নিজের চারদিকেই ঘুরতে থাকে। সুতরাং ওটিকে বলতে পারা যায় ঐ ইলেক্‌ট্রনেরই দেহ-ঘূর্ণি (spin),—তার অস্তিত্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত তার দেহপ্রক্রিয়া। অসীম আকাশে যখন সে সম্পূর্ণ মুক্ত, তখনও যেমন ঐ ঘূর্ণিটি তার দেহের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, পরমাণুর বহিঃকক্ষে যখন সে শ্লথবিন্যস্ত বা অর্ধমুক্ত, তখনও ঐ ঘূর্ণি তার সঙ্গে সেইভাবেই থেকে যায়। আবার যখন সে পরমাণুর অভ্যন্তর প্রদেশে বন্দী, তখনও তার ঐ ঘূর্ণি-সত্তাটি তাকে সেখানে সত্তাবান করে রাখে। শুধু তাই নয়। ইলেক্‌ট্রনের কোনো অবস্থাতে ঘূর্ণিবেগের কোনো পার্থক্য নাই। সর্বত্রই ইলেক্‌ট্রনের সঙ্গে ঐ সমমানের ঘূর্ণিটি যেন এক

অভিন্ন সত্তা হয়ে বিরাজ করে। অর্থাৎ বলা যায়, উপাদান-পদার্থসহ এক বিশেষ রীতির ঐ পদার্থ-ঘূর্ণির নামই যেন ইলেক্‌ট্রন। তবে ঘূর্ণির পাকটি (direction) নিশ্চয় দু'রকম হতে পারে। একটিকে যদি দক্ষিণাবর্ত বা উধ্বর্মুখী পাক বলা যায়, অন্যটিকে তাহলে বামাবর্ত বা নিম্নমুখী পাক নিশ্চয় বলা যাবে। আবার বোঝা যায় যে কণিকার পরিক্রমা আর ঘূর্ণি যদি এক পাকে বা একমুখে চলে, তাহলে ঐ ঘূর্ণিটি যেমন তার কৌণিক ভরবেগের সঙ্গে যুক্ত (যোগ) হয়ে যায়, তেমনি পরিক্রমা যে অভিমুখে চলে, ঘূর্ণির পাক যদি তার বিপরীতমুখী হয়ে থাকে তাহলে স্বভাবত ঐ ঘূর্ণিটি তার কৌণিক ভরবেগ থেকে বিযুক্ত (বিয়োগ) হয়ে যায়। তবে তাতে ইলেক্‌ট্রনের মোট ভরবেগের কোনো পার্থক্য ঘটে যায়না। কেবল তার ঘূর্ণি-রীতির বিভিন্নতা বা ভিন্ন পাকটিই ধরা পড়ে। ফলে বহিঃশক্তির দ্বারা প্রভাবিত না হলে পরমাণুর মধ্যে তাদের তেজটিও একই থেকে যায়। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট তেজস্তরে দু'টি পৃথক পাকের ঘূর্ণি সমন্বিত দু'টিমাত্র ইলেক্‌ট্রনই বর্তমান থাকতে পারে। স্বভাবতই দু'রকম পাকের জন্য ওরা বিপরীতমুখী গতি নিয়ে ঘুরতে থাকে এবং একটি তেজস্তরের মধ্যে বিপরীত দু'টি পাকের যোগফল শূন্য হয়ে যায়। এভাবে ওরা যোড়ে যোড়ে থেকে এক একটি তেজস্তরকে যেন পাকমুক্ত করে চলে। তবে কেন্দ্রক পরিক্রমা ছেড়ে ইলেক্‌ট্রনরা বাইরে চলে এলে কৌণিক ভরবেগের পার্থক্যবশতঃ ওদের মধ্যে যৎসামান্য তেজবিভিন্নতাও ঘটে যেতে পারে। কিন্তু যাই ঘটুক না কেন, জানা যাচ্ছে যে, ইলেক্‌ট্রনের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ বলতে যা কিছু, তা তার ঐ ঘূর্ণিবেগটি। বস্তুতপক্ষে ঐটিই তার আভ্যন্তরীণ কার্যগতি, বা তার প্রকৃতি, বা গুণ, বা ধর্ম। একটি পুরো ইলেক্‌ট্রনের বাহ্য গতিবেগ দ্রুত বা ধীর যাই হোক না কেন, তার ঐ ঘূর্ণিবেগ বা কার্যগতিটি কিন্তু সর্বদাই এক থেকে যায় এবং সে গতিটি আলোগতিরই তুল্য। কিন্তু ঐ ঘূর্ণি-গতি ইলেক্‌ট্রন-কণিকার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গই। বা ইলেক্‌ট্রনকে অঙ্গ বললে, সে তার অপরিবর্তনীয় অঙ্গধর্ম বা গুণ। তার একটু এদিক ওদিক হলেই এক ধরণের কণিকা অন্য ধরণের কণিকা হয়ে উঠে। আবার ইলেক্‌ট্রনের বাহ্য গতিবেগ যতই আলোর গতিবেগের নিকটবর্তী হতে থাকে, ততই তার ঘূর্ণির দিকটিও তার গতিবেগের নিকটবর্তী হয়। কিন্তু বিপরীত আধানাত্মক কণিকার (ধনাত্মক পজিট্রন—পরে দ্রষ্টব্য) ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সম্পূর্ণতই পৃথক হবে। তার গতিবেগ দ্রুত হলে তার ঘূর্ণি তার গতিবেগের দিকের প্রায় বিরুদ্ধ বা বিপরীত হয়ে উঠে। অথচ আমরা জানি যে, বিদ্যুতের গতিমুখের উপর নির্ভর করেই-চৌম্বক বলরেখার অভিমুখ নির্ধারিত হতে থাকে। ফলে তখন ঐ কণিকাটির আধান সংশ্লিষ্ট চৌম্বক ভরের (magnetic moment) দিকটি বিপরীত হয়ে যায়। তার ফলও বিচিত্র হয়ে উঠে।

বিগত শতাব্দীর শেষভাগে দেখা গিয়েছিল যে, কোনো বস্তু চৌম্বক ক্ষেত্রে থাকলে তার বর্ণরেখা কতকগুলি সূক্ষ্মতর রেখাগুচ্ছে ব্যবধানযুক্ত হয়ে উঠে। পরে জানা যায় যে

এরকম অবস্থায় সব উপাদানের পরমাণুরই এই দশা ঘটে। কিন্তু কেন? ১৯২৫খ্রী.-এ পূর্বোক্ত বিজ্ঞানীদ্বয় ঘূর্ণিতত্ত্বের নির্দেশ দিয়ে বললেন যে, ইলেক্‌ট্রনের আভ্যন্তরীণ ঘূর্ণাগতিও যখন বৃত্তগতি (অর্থাৎ বৃত্ত-পথে ঘোরার গতি), তখন তারও কৌণিক বেগ আছে। আমরা জানি যে বিদ্যুৎপ্রবাহের অর্থই ইলেক্‌ট্রন প্রবাহ। সুতরাং একটি ইলেক্‌ট্রনই একটি প্রাথমিক বিদ্যুৎ-কণা। আবার বিদ্যুৎ-প্রক্রিয়াটি চুম্বক-প্রক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত (পৃ. ১৪৬-৪৯)। সুতরাং এক একটি-ইলেক্‌ট্রন এক-একটি ক্ষুদে চুম্বক ছাড়া আর কি? সুতরাং অন্য কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রে এসে পড়লে তার দু'টি চরম দশা ঘটতে পারে। হয় তার গতিটি চৌম্বক বলরেখার সমান্তরাল হয়ে যাবে, না হয় তার লম্ব হয়ে উঠবে। স্বভাবতই প্রথম ঘটনায় সে চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাবে, তখন সে চিরস্থির, তার স্থিতিশক্তি সর্বনিম্ন। দ্বিতীয় ব্যবস্থায়, বিদ্যুৎ-প্রবাহের কাছে চুম্বক-সূচী এনে ওর্স্টে'ড্ যা দেখেছিলেন (পৃ. ১২৮), তাই ঘটবে। অর্থাৎ সেখানে সে বিরুদ্ধ ক্ষেত্রের সঙ্গে একীভূত হয়ে চরম অস্থিরভাবে বিরাজ করবে, তখন তার শক্তিও সেখানে চূড়ান্ত। কিন্তু যেকোনো গুণ-পার্থক্য যখন তার পরিমাণগত পার্থক্যেরই ফলস্বরূপ, তখন এখানেও ইলেক্‌ট্রনের ঐ তেজ-পার্থক্য পরিমাণগতভাবেই ধরা পড়বে। পরমাণুর যেসব ইলেক্‌ট্রনের ঘূর্ণি চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুকূলে এবং যেগুলি তার প্রতিকূলে থেকে বিরাজ করছে, তাদের দুই প্রকার ফোটনমালার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পার্থক্য হিসাবেই তা জানান দেবে। সুতরাং স্বভাবতই পরমাণুর বর্ণরেখাটি চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুকূল এবং প্রতিকূল এই দুইপ্রকার ইলেক্‌ট্রন সমষ্টির পরিচয় বহন করে লম্বালম্বি দু'টি ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। কিন্তু ঘূর্ণি-গতি ছাড়াও ইলেক্‌ট্রনের কেন্দ্রক-পরিক্রমা জনিত পৃথক গতি এবং তজ্জনিত পৃথক চুম্বকত্ব আছে। অর্থাৎ সে একটি দ্বি-চুম্বক। সুতরাং এই দ্বি-চুম্বকত্বই একটি চৌম্বক ক্ষেত্রে তার নানা প্রকার অবস্থা এনে দিতে পারে। সেইসব তেজাবস্থার এক-একটি থেকে অন্যান্য অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়ার সময় তাই তাকে মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে তারপর উল্লম্ফন দিতে হয়। তখন এক একটি উল্লম্ফনকালে এক এক প্রকারের নিদিষ্ট তেজ বিকীর্ণ হয়ে আসে। বর্ণালিতে গিয়ে তারা তারপর ভিন্ন ভিন্ন সূক্ষ্ম রেখা অঙ্কন করে দেয়। রেখার রেখাদল-বিচ্ছিন্নতার সংখ্যা সেই তেজাবস্থা-রূপান্তর সংখ্যার পরিচয় দিয়ে দেয়। পরমাণু মধ্যস্থ ইলেক্‌ট্রন-চুম্বকের এরকম ভিন্ন ভিন্ন সজ্জাকে বিজ্ঞানীরা দেশ-কণিকায়ন (**space-quantization**) বলে থাকেন।

কিন্তু সে যাই হোক না কেন, কেন্দ্রক পরিক্রমাকালে ইলেক্‌ট্রনরা জোড়ায় জোড়ায় অথচ বিপরীত পাকে ঘুরতে ঘুরতে কেন্দ্রকের চারদিকে বিভিন্ন আকৃতির মেঘলোক রচনা করে চলে। হাইড্রোজেনের সেই গোলকাকৃতি থাপ বা আকাশটিতে একটি ইলেক্‌ট্রন ঘুরে চলছে। আবার ঐ একই প্রকার একটি ক্ষেত্রের মধ্যে বিপরীত পাকে আরও একটি

ইলেক্‌ট্রন ঘূর্ণায়মান থেকে হিলিয়াম-পরমাণুর মেঘলোকটি সৃষ্টি করছে। হিলিয়ামের পর লিথিয়ামের বেলায় ঐ প্রথম থাপকে ঘিরে আর একটি গোলক, এবং তাতে এক পাকের একটি ইলেক্‌ট্রন। অথচ বেরিলিয়ামের সময় ঐ রকম একটি গোলকের মধ্যেই বিপরীত পাকের দু'টি ইলেক্‌ট্রন ঘূর্ণায়মান। কিন্তু তারপর এভাবে চললে ৯২-সংখ্যক উপাদানের জন্য অন্তত ৪৬-টি গোলকের দরকার হয়। অথচ কেন্দ্রক থেকে ইলেক্‌ট্রনরা বড় একটা কাছে থাকেনা। হাইড্রোজেন-পরমাণুর কেন্দ্রক যদি একটি মোটর দানার মত হয়, এবং তা যদি কলকাতায় বসে থাকে, তাহলে প্রায় ৩০ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট তার ইলেক্‌ট্রনটি পুরী ও গয়ার ওপাশ দিয়ে, বারানসীর কাছ ঘেঁষে, দার্জিলিং এবং শিলং-এর ওপর দিয়ে ঘুরে চলবে। সুতরাং স্থান সংকোচের ব্যবস্থা চাই। সেজন্য পরবর্তী দ্বিতীয় আকাশে অর্থাৎ এল-থাপের মধ্যে কেবল একটি গোলক মাত্র নয়, সেখানে কয়েকটি মেঘলোকই রচনা করতে হয়েছে। পাঁচ-সংখ্যক উপাদান বোরনের বেলায় দেখা যায়, একটি নবজাত বোলতার আকৃতিবিশিষ্ট আর একটি মেঘলোক কেন্দ্রকটিকে স্বীয় ক্ষেত্রের মাঝখানে রেখে যেন দু'টি গোলককে ফুঁড়ে এপাশে ওপাশে বেরিয়ে গেছে। ৬-সংখ্যক উপাদান কার্বনের ক্ষেত্রেও ঐ হাল; শুধু পার্থক্য এই যে, ঐ মেঘলোকের মধ্যে দু'টি পাকের দু'টি ইলেক্‌ট্রন ঘুরছে। কিন্তু এই দ্বিতীয় আকাশের মধ্যেই নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের জন্য আরও একটি বোলতাকৃতির মেঘলোক যেন পূর্ববর্তীটির সঙ্গে সমকোণে বিরাজ করছে। ৯-সংখ্যক ফ্লোরিন এবং ১০-সংখ্যক নিয়নের জন্যও আর একটি একই আকাশের মেঘলোক। এবারে তিনটিই পরস্পরের সঙ্গে সমান কোণ করে দুটি গোলক ভেদ করে এপাশ ওপাশ বেরিয়ে গেছে, প্রত্যেকেরই মাঝখানে ঐ কেন্দ্রক। এভাবে দ্বিতীয় আকাশে একটি গোলক, এবং তিনটি বোলতাকৃতি সিলিণ্ডারে, মোট চারটি মেঘলোক বা তেজস্তরে ৮টি, এবং প্রথম আকাশের একটি গোলকে দু'টি, এই মোট দশটি ইলেক্‌ট্রন নিয়ে নিয়ন-পরমাণুটির আবির্ভাব। আবার ১১-টি ইলেক্‌ট্রন বিশিষ্ট সোডিয়ামের সময় একাদশ ইলেক্‌ট্রনটির জন্য আর একটি আকাশ আরম্ভ হল। এর কোনো বৈচিত্র্য নেই, দ্বিতীয়টির মতই একটি মূল গোলক ও তিনটি অন্তর্বিদ্ধ সিলিণ্ডার নিয়ে মোট চারটি মেঘলোকে পর পর মোট আটটি ইলেক্‌ট্রন ভ্রমণরত থেকে (১০+৮=) ১৮-সংখ্যক উপাদান আর্গনকে আশ্রয় দিয়ে এই আকাশের কাজ শেষ হয়েছে। বোর-তত্ত্ব ($N = 2n^2$) অনুযায়ী এই তৃতীয় আকাশে $২ \times ৩^২ = ১৮$-টি ইলেক্‌ট্রন স্থান পেতে পারে। কিন্তু এটিও দ্বিতীয়টির মত ৮-টিতে শেষ হয়েছে। তত্ত্বানুযায়ী, চতুর্থ আকাশে $২ \times ৪^২ = ৩২$-টি ইলেক্‌ট্রন স্থান পেতে পারে; কিন্তু সেখানেও বিভিন্নতা দেখা যায়।

তাই বলে বোর-তত্ত্বটি কিন্তু ভুল নয়। কারণ, ঐ তত্ত্বটি কোন্ আকাশের মধ্যে কতকগুলি ইলেক্‌ট্রন স্থান পেয়েছে সে সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়নি, শুধু সংখ্যাগুলির শেষ সীমাটি:

অর্থাৎ একটি আকাশের মধ্যে মোট কতগুলি ইলেক্‌ট্রন স্থান পেতে পারে, সেইটিই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সব আকাশে যে ইলেক্‌ট্রনগুলি সেই সীমা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি তার কারণ, এক একটি আকাশ ভরে উঠতে না উঠতেই পরবর্তী আকাশে ইলেক্‌ট্রন সমাবেশ আরম্ভ করে দিতে হয়েছে। তা না হলে পরমাণুটি সুস্থির থাকবেনা, হয়ত শক্তিসাম্য বা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে। আসলে তো ঐ আকাশ এবং তাদের মেঘলোকগুলির কোনো সীমানা প্রাচীর থাকে না যে, এক একটি মেঘলোক বিভিন্ন আকাশের বিভিন্ন লোকগুলিকে ভেদ করে এদিক ওদিক হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন লোকের ইলেক্‌ট্রনদের মধ্যে পারস্পরিক বিকর্ষণ সম্ভাবনা ঘটবেনা। সুতরাং কি করে তারা তাদের নির্দিষ্ট পথ ধরে সুস্থির হয়ে চলতে পারবে? বিশেষত যেখানে স্থান সংকুলান বশত বিভিন্ন আকাশ এবং তদন্তর্গত মেঘলোকগুলির সমাবেশ বিচিত্র হয়ে উঠছে, আকৃতিও সংকীর্ণ রূপ ধারণ করছে? পারস্পরিক বিকর্ষণ বশত পরমাণুর আভ্যন্তরীণ (বা সুপ্ত) শক্তি (potential energy) বেড়ে যায়, এবং তা বেড়ে গেলে তার দৃঢ়বদ্ধতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তাই যে-পরমাণুর আভ্যন্তরীণ শক্তি সব চাইতে কম, সে পরমাণুই সব চাইতে দৃঢ়বদ্ধ। সেই দৃঢ়তা রক্ষার জন্যই তাই ইলেক্‌ট্রনের বিকর্ষণ জনিত আভ্যন্তরীণ শক্তিকে কম রাখার প্রয়োজন হয়। তা করতে গেলে, যাতে ইলেক্‌ট্রনরা পরস্পর-ছেদী অধিক সংখ্যক মেঘলোকে ভিড় জমানোর ফলে অধিক সংখ্যক ছেদস্থলে এসে পারস্পরিক বিকর্ষণের সম্ভাবনাকে অধিকতরভাবে বাড়িয়ে তুলতে না পারে, সে ব্যবস্থা রাখতে হয়। এক একটি আকাশে ইলেক্‌ট্রনরা তাদের সীমা সংখ্যায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই তাদের জন্য তাই উর্ধ্বলোক রচনা করে সেখানেই তাদের সন্নিবিশিষ্ট করে দিতে হয়। পরমাণু যাতে শক্তিসাম্য বা ভারসাম্য হারিয়ে না ফেলে, তার জন্যই প্রকৃতির এমন সতর্ক সুনিপুণ ব্যবস্থা। সেইজন্যই দেখা যায়, পর পর ছয়টি আকাশের ইলেক্‌ট্রন সংখ্যাকে ২, ৮, ১৮, ৩২, ৫০, ৭২-এর বদলে যথাক্রমে ২, ৮, ৮, ১৮, ১৮, ৩২ সংখ্যায় শেষ করতে হয়েছে। কিন্তু এত সত্ত্বেও আর সম্ভব হলনা। সপ্তম গগনে এসে সাম্য ভেঙে পড়ল। তাই সে আকাশে কয়েকটি মাত্র পরমাণুকে ফুটিয়ে তুলেই পার্থিব রচনাটি সাঙ্গ করে দিতে হল। অপার্থিব অন্য কোনো সূর্যলোক রচনায় স্থপতির আর কি শিল্প-নির্দেশ, তা আমরা আজও ভাল করে জানতে পারিনি।

কিন্তু ঐ ৯২-টি পরমাণুতেই আমরা সন্তুষ্ট। এ থেকেই আমরা লক্ষ কোটি বস্তু পেয়ে গিয়েছি। রূপে গুণে তাদের যে বৈচিত্র্য, আমাদের কাছে তা অসীম। প্রকৃতি মাতা ঐ ৯২-টি পরমাণু দিয়ে আমাদের কেবল মন ভোলাবার চেষ্টা করেননি। ওদের মাঝ-খানেই এমন সব গোপন ব্যবস্থা রেখে গিয়েছেন যা দিয়ে আমরা নিজেরাই অসংখ্য বস্তুসম্পদ রচনা করে নিতে পারি। সে সমৃদ্ধির স্রষ্টা আমরাই। পরমাণুর অন্তর্গত প্রকৃতির

সেই দাক্ষিণ্যপূর্ণ ইলেকট্রন-সন্নিবেশ ব্যবস্থাই যে আমাদের রচনার প্রথম প্রেরণা হয়ে আছে, সৃষ্টি-গর্বে আমরা আজ তা ভুলে যেতে বসেছি। কিন্তু একবার যদি আমরা একটু স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করে দেখি, তাহলে ব্যাপারটি বুঝতে না পারার কারণ নাই।

আমাদের সব কিছু রচনার মধ্যেই ভাঙা আর গড়া ব্যতিরেকে আর কি আছে? আমরা কাঠ কাটি, পাথর ভাঙি, মাটি ছানি। তারপর আবার সেগুলিকে জোড়া দিই—হয়ে ওঠে অট্টালিকা, মন্দির, প্রতিমা। যে সব কাঠ কুটা আর রঞ্জক দ্রব্য দিয়ে আমরা কলম আর কাগজ আর কালি বানিয়ে তাদের সাহায্যে লিখে চলি, সেসব উপাদানকে ভেঙে বিশ্লেষণ করে এবং আবার ইচ্ছামত একত্রে জোড়া দিয়ে বা সংশ্লেষণ করে তবেই ঐ কলম কাগজ বা কালি তৈরি করে নিই। কিন্তু ঐ ভাঙা গড়া কি করে সম্ভব হত, যদি মাতা-প্রকৃতি তাঁর দেওয়া ঐ ৯২-টি উপাদানের মধ্যে ভেঙে যাওয়ার বা জোড়া দেওয়ার জন্য ফাঁক না রেখে যেতেন? পরমাণুর একেবারে বাইরের আকাশেই তিনি তাই সেই ফাঁকগুলি রেখে গিয়েছেন। প্রথম আকাশে দুটি মাত্র পরমাণু—গড়নের আদিম অবস্থা। কিন্তু দ্বিতীয় আকাশেই সেই ব্যবস্থা সুস্পষ্ট। পর পর আটটি উপাদান। শেষের উপাদান নিয়ন পর্যন্ত আসতে গিয়ে একটি গোলক আর তিনটি দুমুখ-সংকীর্ণ নবজাত বোলতার মত সিলিণ্ডার বানিয়ে নিতে হয়েছে। পূর্ব-বর্ণিত কারণে সিলিণ্ডারগুলি গোলকটিকে বিদ্ধ করেছে এবং নিজেরাও বিদ্ধ হয়েছে। তার ফলে অবশ্য বিদ্ধ স্থানগুলিতে ইলেকট্রনের পারস্পরিক বিকর্ষণের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, এবং তাতে পরমাণু-দেহের ভারকেন্দ্রে বিপর্যয়ের সম্ভাবনাও আসতে পারে। কিন্তু পরমাণুগুলি যতটা দূরে দূরে থাকে এবং তাদের অবস্থান-ক্ষেত্রগুলিকেও যেভাবে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে, তাতে এখনও পর্যন্ত সে সম্ভাবনা দেখা দেয়নি। আরও এগিয়ে গেলে হয়ত সে সম্ভাবনা আসতে পারে। অবশ্য শুধু আটটি কেন, এ পৃথিবীর আবহাওয়ায় ত্রিশ বত্রিশটি ইলেকট্রনকেও একটি খাপের আকাশের মধ্যে বেশ কায়দা করে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু ঐ আট-ইলেকট্রনী খাপটি বেশ একটি সুদৃঢ় ও স্ট্যাণ্ডার্ড্ (প্রমাণ) খাপ। সুতরাং ভিতরের খাপগুলিতে যে-রকমের ঝুঁকি নেওয়া হক না কেন, বাইরের খাপটিতে ঐ ব্যবস্থাকে অতিক্রম করে সেখানে নয়, দশ প্রভৃতি সংখ্যার বরাদ্দ করা সমীচীন নয়। অথচ ৯২-টি পরমাণু দিয়ে বিচিত্র সৌন্দর্য্য সম্ভার বা গুণপনা দেখাতে গেলে বিভিন্ন পরমাণুকে কেবল আলাভাবে পাশে পাশে বসিয়ে দিলে চলবেনা। তারা যাতে নিবিড় প্রণয়ে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে নিজেদের ব্যক্তিসত্তাকে গোপন করে সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা বিশিষ্ট পৃথক পৃথক বস্তুসন্নিবেশ মারফতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে চলতে পারে সে ব্যবস্থাও রাখা দরকার। সুতরাং অষ্টম পরমাণুর ঐ সুদৃঢ় ব্যবস্থাটি ব্যতিরেকে আর বাকি সাতটির ক্ষেত্রে সর্বত্রই সেই ফাঁক রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই সাতটির প্রত্যেকটিতেই সেই ফাঁকটুকু ঘুচিয়ে

দেওয়ার অনন্ত প্রেরণা আর অনির্বাণ বাসনা। যার একটি মাত্র ইলেক্‌ট্রন তার পক্ষে সাতের মত এত বড় ফাঁক পূরণ করে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই সে চাইছে কি করে সে স্থায়িত্ব লাভ করে। অথচ সাতটি যার, সেও একটিকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাকে গ্রহণ করে সে তার বাইরের থাপটিকে আট-ইলেক্‌ট্রনে পূর্ণ করে সুদৃঢ় হয়ে উঠবে। তাই ওদের সঙ্গে দেখা শোনা করিয়ে দিলেই ওরা জুড়ে গিয়ে এক হয়ে যাবে। শেষাবস্থিত তৃতীয় থাপটির কথাই ধরা যাকনা কেন। এক ইলেক্‌ট্রনের সোডিয়াম, সাত ইলেক্‌ট্রনের ক্লোরিনের সঙ্গে নিবিড় বা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে যুক্ত হয়ে যায় (সেজন্য খুব বেশি তাপ লাগে—পৃ. ১২৬-২৭), যৌথ ব্যবস্থায় নতুন করে বাসা ফাঁদে, দুর্ভেদ্য নীড় রচনার জন্য আট-ইলেক্‌ট্রনী সুদৃঢ় প্রাচীরও রচনা করে নেয়। সে প্রাচীরটি কারও একার সম্পত্তি নয়। সেটি ঐ দু'জনারই অপ্রতিহত মিলনের রক্ষা ব্যবস্থা। তাই মিলিত হওয়ার পর ওরা আর দ্বিসত্ত্ব পরমাণু নয়, একাত্ম অণু। এমনি করে, যার বাইরের থাপে দুটি মাত্র ইলেক্‌ট্রন তার পক্ষেও ছয়ের ফাঁক পূরণের চাইতে দু'টিকে ত্যাগ করে ফাঁকটিকে অবলুপ্ত করে দেওয়ার আগ্রহ। ওদিকে যার বাইরের থাপে ছ'টি ইলেক্‌ট্রন, সে তো তার ফাঁক পূরেণের জন্য দু'টি ইলেক্‌ট্রনকেই খুঁজছে, তাই ওরা দুজনাতেও স্থায়িত্ব কামনায় গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জোড় বেঁধে অণু সৃষ্টি করে নিতে পারে। যার তিনটি ইলেক্‌ট্রন, তার অতগুলিকে ছাড়তে বড় মায়া। তাই সে সহজে তাদের ছাড়তে চায়না। কিন্তু উপায় কি? পাঁচ-ইলেক্‌ট্রনওয়ালার সঙ্গেই তাকে অগত্যা সন্ধি স্থাপন করতে হয়। অর্থাৎ পর্যায়িক ছকের বামদিকের দূরবর্তী অ-ধাতব অধিবাসীবৃন্দ ছকের ডান দিকের দূরবর্তী ধাতব অধিবাসীবৃন্দের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে যৌগ গঠনের জন্য সর্বাধিক সক্রিয়। ক্রমে যতই ছকের মাঝামাঝি জায়গার দিকে যাওয়া যায়, ততই তাদের সে সক্রিয়তা কমে যায়। তার ফলেই তাদের যৌগ-গুলিতে বন্ধনশৈথিল্য প্রকট হতে দেখা যায়। একেবারে মাঝামাঝি চতুর্থ গোষ্ঠীর অধিবাসী যারা, তাদের পরমাণুর বাইরের থাপে চারটি করে ইলেক্‌ট্রন থাকায় তারা গ্রহণ করবে, না বর্জন করবে, তা স্থির করতে পারেনা। তাদের পক্ষে চারটিকে ছাড়তে আরও মায়া। অথচ একজনকে চারটি পেতে গেলে অন্য একজনকে চারটি ছাড়তেই হয়। কিন্তু তারও তো মায়া আছে, সে তা ছাড়বে কেন? এ কারণে এদের যৌথ ঘর-করণার সংস্থান থাকলেও এরা বড় অলস প্রকৃতির হয়ে উঠে। অথচ বাইরের থাপে যাদের আটটি করে ইলেক্‌ট্রন, ছকের একেবারে ডান দিকের সেই শূন্য গোষ্ঠীর অন্তর্গত হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপ্টন, জেনন, র‍্যাডনের মত এরা একেবারে নিষ্ক্রিয়ও নয়। শূন্য গোষ্ঠীর পরমাণুগুলির বাইরের থাপই পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় তারা সুদৃঢ় ব্যবস্থা গঠন করে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে, ফাঁক পূরণ করে সুদৃঢ় হওয়ার জন্য আর কারও সঙ্গে তাদের ভাব জমানর দরকার বা অবকাশ কিছুই নাই বলে তারা নিষ্ক্রিয়, অন্য কোনো পরমাণুর সঙ্গে তারা

মিশবেনা। কিন্তু চতুর্থ গোষ্ঠীর ওদের সে দরকার আছে, সে সুযোগও আছে। তাই শেষ পর্যন্ত ওদের টেক বজায় থাকেনা। কপট মান ভেঙে গেলে তখন ওরা মিলনের সহস্র রকমের ঢঙ্ দেখায়। কিন্তু রঙ্ দেখায় আট নম্বর গোষ্ঠীর পরমাণুগুলি। অক্সিজেনের তুলনায় ওদের যোজন-শক্তি আট বলে অষ্টম গোষ্ঠীতে স্থান হয়েছে বটে। কিন্তু ওদের বাইরের থাপে একটি কি দুটির বেশি ইলেক্ট্রন নাই, প্যালাডিয়ামের ক্ষেত্রে তো ইলেক্ট্রন নাইই। এ-কারণে এই গোষ্ঠীকে অষ্টম গোষ্ঠী না বলাই সংগত। যাদের বাইরের থাপে আটটি করে ইলেক্ট্রন, সেই নিষ্ক্রিয় পরমাণুগুলিকে অষ্টম গোষ্ঠীর অন্তর্গত ধরে নিয়ে তার পরের গোষ্ঠীতে শূন্য, এক এবং দুই লিখে তার নিচেই এই অষ্টম গোষ্ঠীর পরমাণুগুলির স্থান করা উচিত। সত্যই এই পরমাণুগুলির রাসায়নিক সংযোগ শক্তিও বিচিত্র। এদের যোজন-শক্তি তাই সর্বক্ষেত্রে এক নয়। এরা বিভিন্ন পরমাণুর সঙ্গে মিশে যৌগ গঠনের সময় বিভিন্ন যোজন-শক্তির পরিচয় দেয়। অবশ্য অন্যান্য গোষ্ঠীর পরমাণুতেও এরকম আচরণের অভাব দেখা যায়না। তা সত্ত্বেও ছকের মধ্যে গোষ্ঠীর ওপরের সংখ্যাগুলি মোটামুটিভাবে ফ্লোরিন বা হাইড্রোজেনের তুলনায় তাদের যোজন ক্ষমতারই পরিচয় দেয়। একদিকে যেমন তারা পর্যায়ভুক্ত শেষ সারির পরমাণুগুলির বাইরের থাপের ইলেক্ট্রন-সংখ্যা নির্দেশ করে দিচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি তারা একটি ফ্লোরিন বা হাইড্রোজেন পরমাণুর তুলনায় তাদের যোজন-শক্তির নির্দেশও দিয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু এ তো সব গেল বাইরের থাপের বা পরমাণুরূপ বিশ্বের বহিরাকাশলোকের কথা। অন্তর্লোকগুলিতে প্রকৃতি যে ১৮- বা ৩২-এর ঝুঁকি নিয়েছেন, তার ফল কি হল? সর্বস্রষ্টা প্রকৃতি। তিনি মহান স্রষ্টা। তাঁর সর্বপ্রকার সৃষ্টিতেই সার্থকতা। অন্তর্লোকে ইলেক্ট্রনের শক্তি বা ভারসাম্য সব সময় ঠিক থাকছেনা সত্য। কিন্তু সত্যিই কি ওরা ইলেক্ট্রন, না ইলেক্ট্রন-মেঘলোক? প্রচণ্ড বেগে আকাশময় দাপাদাপি করে ছুটে বড়াচ্ছে। আর নভলোক তো ওখানে একটি নয়, কয়েকটিই। তাদের কেউ কেউ গোলকের মত। দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে স্তব্ধ মহিমায়। একজন আর একজনকে ঘিরে ধরে আছে। খুব কাছে ওরা। তবু অনন্ত ব্যবধান। কেউ কেউ আবার বিচিত্র ভঙ্গিতে তাদের ভেদ করে চলে গেছে, পরস্পরে পরস্পরকেও ভেদ করেছে। কিন্তু সে যেন ভেদ করা নয়, সে তো সেতু নির্মাণ। আকর্ষণ আর বিকর্ষণের তাণ্ডব চলছে পরমাণু-বিশ্বের সকল ভুবন সকল গগন জুড়ে। এক একটি আকাশের এক একটি মেঘলোক উদ্দাম হয়ে উঠছে। কেন্দ্রকের টান ওদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। কে জানে, কখন কোথায় কোন্ সেতুর কাছে হয়ত একটি মেঘলোকের ইলেক্ট্রন জেগে উঠবে, আর ওপারের বিকর্ষণী ইলেক্ট্রনটি হয়ত তখন ভেসে বেড়াবে অনেক অনেক দূরে। সুযোগ পেয়ে দূরের আকাশ থেকে কেন্দ্রকের কাছের আর এক আকাশে অমনি মেঘ ঠিকরে আসবে কণিকা হয়ে, আর পিছনে বর্ষণ করে আসবে

এক বিন্দু অশ্রু—নিজেরই দেহসম্ভব ফোটন। কিন্তু কোন্ আকাশ থেকে কোন্ আকাশে যে মেঘ-বিদ্যুৎ ঠিক্‌রে যাবে, সে কথাই বা কে জানে? তাই জানিয়ে দিয়ে যায় সে নিজেই। যত দূরে সে ছুটে যায়, তত সূক্ষ্ম কম্পাঙ্ক নিয়ে ফোটন তার তত বেশি বেগে ধেয়ে এসে প্রিজ্‌ম্ পেরিয়ে তত উজ্জ্বল বর্ণরেখা এঁকে দেয়। সার্থক প্রকৃতির রচনা!

তাহলে ইলেক্‌ট্রনের আসল স্বরূপটি কি? কী তার উপাদান? একদিকে সে মেঘ থেকে ঘনীভূত হয়ে উঠছে। আর একদিকে সে ফোটন বর্ষণ করছে। আমরা জানি, সে-ফোটন আর কিছু নয়, সে আলো-কণিকা মাত্র। তাহলে উপাদান সংক্রান্ত সন্ধানে ইলেক্‌ট্রনের নিজের আর কোনো মূল্যই রইলনা। তারও উপাদান ঐ ফোটন বা ইলেক্‌ট্রন-মেঘ। কিন্তু ইলেক্‌ট্রন-মেঘ বললে বহু ইলেক্‌ট্রন দিয়ে গঠিত মেঘও বোঝাতে পারে। অথচ আমাদের উদ্দিষ্ট মেঘের উপাদান ইলেক্‌ট্রন নয়, ইলেক্‌ট্রনেরও উপাদান। কিন্তু ইলেক্‌ট্রনের উপাদান বলে আবার পৃথক কোনো পদার্থকে পাওয়া যায়নি। তার ঐ বিলেপিত দেহই তার দেহোপাদান। সুতরাং ঐ মূল মেঘদেহকেই মূল পার্থিব উপাদান বা মূল পদাথ বলা ছাড়া উপায় কি? অথচ ইলেক্‌ট্রনের দেহ থেকেই যখন ফোটন-কণিকার উৎপত্তি অবধারিত, তখন ঐ মেঘরূপী মূল পদার্থকে ফোটনরূপী রশ্মি-কণিকারও উপাদান বলা ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা। কিন্তু ইলেক্‌ট্রনের মত প্রোটনও তো এক প্রাথমিক কণিকা। তারও কি উৎপত্তি ঐ মেঘদেহ মূল-পদার্থ থেকে? কিন্তু সে কথার উত্তর দেবে কে? সে তো আর এক সমস্যা। যখন মোটামুটি প্রায় সব সমস্যারই সমাধান হয়ে এল, তখন কোথা থেকে এ আবার এক নতুন সমস্যা এসে হাজির হল? তাহলে ফোটন আর প্রোটন, এই উভয়েরই অবস্থানভূমিতে গিয়ে পৌছলে কি এর উত্তর মিলবে? তেজস্ক্রিয় স্ফোরণের মধ্যে যখন প্রোটন (আল্‌ফা), ইলেক্‌ট্রন (বিটা), আর ফোটন (গামা) —এদের সকলেরই সমাবেশ ঘটেছে, তখন তাদেরই অবস্থান বা উদ্ভব ক্ষেত্র থেকেই কি আমাদের ঈপ্সিত সমাধানের সংবাদটি এসে পৌছতে পারেনা? কিন্তু কোথা থেকে ঐ তেজস্ক্রিয় রশ্মিমালার অভ্যুদয় ঘটছে? নিশ্চয় পরমাণু থেকে। পরমাণুর কেন্দ্রক বা তার মেঘবেষ্টনীর কোথাও না কোথাও থেকে, বা সর্বত্র থেকেই হয়ত তাদের আবির্ভাব ঘটছে। রাদারফোর্ডের পরীক্ষা ও তত্ত্ব, কিংবা ব্রগলির তত্ত্বানুযায়ী মেঘাবরণীর স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের যে পরিচয় ঘটেছে তাতে সেখান থেকে তো কোনো প্রোটনের অস্তিত্ব মেলা ভার। তাহলে কেন্দ্রক বা তৎসন্নিধান থেকেই নিশ্চয় এর একটা হদিশ মিলতে পারে। কেন্দ্রকাভিযানের সেই দুরূহ পথ ধরে বিজ্ঞানী তাঁর নতুন যাত্রা আরম্ভ করবার জন্য উদ্‌যোগী হলেন। কিন্তু আপাতত সে প্রসঙ্গও একটু থাক। কারণ, ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানীর সামনে প্রকৃতির জগৎ থেকে যে বিপুল পরিমাণ শক্তির আভাস এসে পৌচে গেছে, তার সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন থাকতে পারলেননা।

চতুর্থ পর্ব :

পরমাণু গঠনকালে কণিকাবৃন্দের ভর কেন কমে যায়, বা তেজ কেন ছাড়া পায়, তার সন্তোষজনক কৈফিয়ত পাওয়ার (পৃ ২৯৪) পর নিঃসংশয়িতভাবে জানা হয়ে গিয়েছিল যে, ভর থেকেই ঐ বিপুল পরিমাণ তেজের উৎপত্তি ঘটে থাকে। অথচ আমরা কিনা ভরের জগতে বাস করেও তেজ বা শক্তির অভাবে শুকিয়ে বা পারস্পরিক সংঘর্ষ ও রক্তপাত করে বিধ্বস্ত হয়ে যাব? তাছাড়া পরমাণু-রূপান্তর প্রক্রিয়ায় যে শক্তি ছাড়া পেয়ে যায়, সে কি শুধু অপব্যয়ের নামান্তর মাত্র? মানুষ কি তাকে তার নিজের কাজে লাগিয়ে দিতে পারেনা? বিজ্ঞানীর কাছে এই সমস্যা এখন অত্যাবশ্যক মনে হল।

জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য তো বিপুল পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন। অথচ একটি পরমাণুর রূপান্তর ঘটাতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা যেখানে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন, অসংখ্য পরমাণুর রূপান্তর ঘটান সেখানে কি করে সম্ভব? তাছাড়া সব উপাদান তো রূপান্তরিত হয়না। আমরা দেখেছি (পৃ ২৭৩) হিলিয়াম, কার্বন ও অক্সিজেনের মত হাল্কা উপাদানেরও কেন্দ্রকগুলির ফোটন-তেজ আল্‌ফা-কণিকার তেজের চাইতে ঢের বেশি। তার ফলে তারা এত সুদৃঢ় হয় যে, প্রচণ্ড গতিবান্ আল্‌ফা-কণিকার কাছেও তা দুর্ভেদ্য থেকে যায়। তাই ক্ষিপ্রগতির আল্‌ফা পাঠিয়েও রাদারফোর্ড কোনোক্রমেই তাদের ভেঙে ফেলতে পারেননি। সুতরাং অল্প কয়েকটি উপাদানেরই কেন্দ্রক-ভাঙনের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যে কয়েকটির সে সম্ভাবনা আছে, তাদের কাছ থেকে তো বিপুল পরিমাণ তেজ পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ যার ফোটন-তেজ যে পরিমাণ, রূপান্তরিত ক'রে তাদের কাছ থেকে মাত্র সেই পরিমাণ তেজই সংগ্রহ করা যেতে পারে। সুতরাং ঐ তেজ যাদের প্রভূত, তাদেরকেই কাজে লাগাতে পারলে অধিক প্রাপ্তি সম্ভব হয়। কিন্তু তাদের যোটবদ্ধ হওয়ার তেজটি বেশি লেগেছে বলেই তো তাদের মিলনবন্ধনটিও খুব সুদৃঢ়। তাদের মধ্যে পরিবর্তন আনতে গেলে দুরন্ত গতির আল্‌ফা-কণিকা চাই। কোথায় পাওয়া যাবে তা? রেডিয়াম C'-এর আল্‌ফা-কণিকা খুবই বেগবান। তবুও তো সে হিলিয়াম-কেন্দ্রক থেকে প্রোটন উৎক্ষিপ্ত করে দিতে পারেনা!

কিন্তু চতুর বিজ্ঞানী সন্দেহ করে বসলেন, নাই বা উঠে এল প্রোটন। আল্‌ফা-কণিকা প্রেরণের ফলে কেন্দ্রকের তো অন্য কোনো প্রকার রূপান্তর ঘটতে পারে! হয়ত ওখান থেকে অন্য কোনো রকমের কোনো কণিকাও বেরিয়ে আসে, যা এতদিন ধরা পড়েনি! আল্‌ফা-কণিকার অভিঘাতে নাইট্রোজেন-কেন্দ্রক থেকে প্রোটনের বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে হয়ত ওখান থেকে বিটা বা গামারশ্মির মত এমন অন্য কোনো প্রকারের তেজ-কণিকা বিকীর্ণ হয়, জিঙ্ক্-সাল্‌ফাইডের প্রতিপ্রভ পর্দা যাদের সনাক্ত করে দিতে পারেনা!

১৯৩০খ্রী. নাগাদ জার্মানীতে বোটে (W. Bothe) এবং বেকার (J. A. Becker) ব্যাপারটি অনুধাবন করলেন।

পোলোনিয়ামকে তেজস্ক্রিয় উপাদান হিসেবে বেছে নেওয়া হল। পোলোনিয়াম-নিক্ষিপ্ত আল্‌ফা-কণিকার গতিবেগ যদিও রেডিয়াম C′-এর আল্‌ফা অপেক্ষা কম, তৎসত্ত্বেও ঐটি বেছে নেওয়ার কারণ এই যে, পোলোনিয়াম থেকে বিটা বা গামা-রশ্মি বিকীর্ণ হয়না। সুতরাং লক্ষবস্তুর কেন্দ্রকে একমাত্র আলফা-কণিকারই অভিঘাত জনিত ফলাফলটি লক্ষ্য করা সম্ভব। একটি রূপার পাতে পোলোনিয়াম যৌগিক মাখিয়ে নিয়ে তার সামনে লক্ষ্যবস্তুটি রাখা হল। তারও সামনে (অন্যদিকে) থাকল বিভিন্ন বেধ বিশিষ্ট সীসার পাত। ওগুলি ছাঁকুনির কাজ করবে। আল্‌ফার অভিঘাতের ফলে লক্ষ্যবস্তুর কেন্দ্রক থেকে উৎক্ষিপ্ত প্রোটনগুলি এসে ঐ সীসার পাতেই শোষিত হয়ে যেতে পারে। তারপর সীসারও পরে রইল গাইগার-মূলার গণক-যন্ত্র। পূর্বোক্ত কারণে এবার আর কোনো প্রতিপ্রভ পর্দা রাখা হলনা। তার বদলেই ঐ গণক-যন্ত্র। কারণ, প্রোটন ছাড়া অন্য কোনো প্রকার কণিকা সীসক ভেদ করে বেরিয়ে গেলে ঐ যন্ত্রে তার আবির্ভাবের নিশ্চিত প্রমাণ থেকে যাবে। সত্যিই প্রমাণ থাকল। লক্ষ্যবস্তু হিসাবে ব্যবহৃত বেরিলিয়াম, লিথিয়াম বোরন, এরা সকলেই একে একে সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে গেল। দেখা গেল প্রত্যেকেরই কেন্দ্রক থেকে এমন রশ্মি নির্গত হল, যারা সীসা ভেদ করে গিয়েও গণক-যন্ত্রে সাড়া জাগায়। বেরিলিয়ামের ক্ষেত্রে সাড়া জাগল সর্বাধিক। কিন্তু ঐ রশ্মির ভেদ-ক্ষমতা কী প্রচণ্ড! দুই সেণ্টিমিটার পুরু সীসাকে ভেদ করার সময় ওর আটভাগের সাত ভাগই স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে চলে যায়। অতটা ভেদ ক্ষমতা একমাত্র গামা-রশ্মি ছাড়া আর কারও নাই। বিজ্ঞানীদ্বয় ভাবলেন ওরা তাহলে গামা-রশ্মিই। এ রকম চিন্তার অন্য কারণও ছিল।

বোঝা যাচ্ছে যে, আল্‌ফা-কণিকার অভিঘাতের ফলে বেরিলিয়াম-কেন্দ্রকের রূপান্তর ঘটেছে। বেরিলিয়াম-কেন্দ্রকের পরমাণুর ভর ৯ এবং আধান ৪। আল্‌ফার ভর ৪, আধান ২। সুতরাং নতুন উপাদানের ভর হবে ১৩ এবং আধান ৬। তাহলে ওর পারমাণবিক সংখ্যাও ৬। অর্থাৎ পর্যায়িক ছক অনুযায়ী ওটি কার্বন। বা আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে কার্বনের একটি আইসোটোপ। কিন্তু তাহলেও সাধারণ কার্বন-১৩ আইসোটোপের সঙ্গে ওর একটু পার্থক্য আছে। নতুন সৃষ্ট আইসোটোপের তেজ একটু বেশি। কতটা বেশি, তা নির্ভর করে নিক্ষিপ্ত আল্‌ফা-কণিকার গতিশক্তির উপর। কিন্তু তাহলে এই বাড়তি তেজটি যায় কোথায়? রাদারফোর্ড-চ্যাডউইক ভালভাবেই পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে, আল্‌ফা-অভিঘাতের সাহায্যে বেরিলিয়াম-কেন্দ্রক ভাঙা যায়না (পৃ. ২৭৩), বা সেখান থেকে কোনো প্রোটনকে টেনে তোলা সম্ভব হয়না। সুতরাং

অন্যান্য ভঙ্গুর কেন্দ্রকগুলির ক্ষেত্রের মত উৎক্ষিপ্ত প্রোটনকে গতিবান করেই যে ঐ বাড়তি তেজটি খেয়ে যাবে, সে সম্ভাবনা নাই। একমাত্র সম্ভাবনা, যদি ওখান থেকে গামা-রশ্মি নির্গত হয়ে থাকে, তাহলে তাতেই ঐ বাড়তি তেজটি বিকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। একটি ধনাত্মক কেন্দ্রক যে বহিরাগত একটি ধনাত্মক আল্‌ফা-কণিকাকেও বরণ করে নিয়ে নিজেকে বিভক্ত না করেও নতুন একটি কেন্দ্রকে পরিণত হয়ে যেতে পারে, এ পরীক্ষায় তার প্রথম প্রমাণ মিলল। কিন্তু ঐ গামা-রশ্মির কথাটিও জেনে নেওয়ার দরকার হল। কেবলমাত্র অনুমান নিয়ে বিজ্ঞানের কাজ চলতে পারেনা। গামা-রশ্মির গুনাবলীর পরিচয় তো আগেই জানা হয়ে গেছে। তার সঙ্গে মিলিয়ে নিলেই আসল ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যায়।

কোনো বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবেশের ক্ষমতা অর্থাৎ তাকে ফুঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা থেকেই কোনো কণিকা বা রশ্মির তেজের পরিমাপ পাওয়া যায়। সুতরাং বেরিলিয়াম-বিকিরণকে গামা-রশ্মি ধরলে তার সীসা প্রভৃতি ভেদ করার শক্তি মেপে ঐ রশ্মির একটি প্রাথমিক তেজসংঘের (quantum) মানটিও নির্ধারণ করা চলে। দেখা গেল যে, ঐ মান ৭×১০^৬ (৭০ লক্ষ) ই ভো.। কিন্তু ফরাসী বিজ্ঞানী জোলিও (Fre´de´ric Joliot-Curie—1900- ?) এবং তৎপত্নী পিয়ের-কুরীর কন্যা ইরিনের (Ir`ene Curie —1897) গবেষণা থেকে এ সম্বন্ধে অদ্ভুত খবর পাওয়া গেল। একই পরীক্ষাতে তাঁরা গাইগার-মূলার গণক-যন্ত্রের পরিবর্তে একটি আয়নায়ন-কক্ষ ব্যবহার করে দেখছিলেন। কিন্তু দেখা গেল যে এক্ষেত্রে বোটে-অনুমিত বেরিলিয়াম-বিকিরণের আয়নায়ন ক্ষমতা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। কক্ষের মধ্যে বিভিন্ন বস্তু রেখে পরীক্ষা করতে করতে তাঁরা ক্রমেই বুঝতে পারলেন যে, হাইড্রোজেন ঘটিত কোনো বস্তুকে ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে ঐ ব্যাপারটি আরও জোরাল হয়ে প্রবাহটিকে বাড়িয়ে তুলে। বিজ্ঞানী-দম্পতী এর ব্যাখ্যা দিলেন যে, গামা-রশ্মি প্রভূত পরিমাণে তেজসম্পন্ন হওয়ায় তারা হাইড্রোজেন-পরমাণুর উপর পড়ে তাদের গতিবেগ ওর মধ্যে সংক্রমিত করে দেয়। ফলে হাইড্রোজেন-কেন্দ্রক অর্থাৎ প্রোটন বেগবান হয়ে উঠে ; এবং গামা-রশ্মির এক একটি প্রাথমিক তেজসংঘের (quantum) তুলনায় এক একটি প্রোটনের আয়নায়ন ক্ষমতা প্রভূত বলে তাদের মাত্র অল্প কয়েকটিই বেরিলিয়াম-বিকিরণের মত আয়নায়ন চালিয়ে যায়। কিন্তু ঐ তেজসংঘগুলির এক একটির ভর অত্যন্ত কম। সুতরাং বলবিদ্যার নিয়মানুসারে স্বল্প-পরিমিত ভরবিশিষ্ট একটি প্রোটনের সঙ্গে সংঘাতের ফলে সে যে-পরিমাণ তেজ সংক্রমিত করে দিতে পারবে, অন্য কোনো উপাদানের অধিক ভরবিশিষ্ট কেন্দ্রকের সঙ্গে সংঘাতে তা পারবেনা। কেন্দ্রকের ভর যত বেশি হবে তার সঙ্গে অনুপাত রক্ষা করে সংক্রমিত তেজ-পরিমাণও তত কমে যাবে।

মেঘায়ন-কক্ষ থেকে প্রোটনগুলিকে আরও ভাল করে সনাক্ত করা গেল এবং তাদে

মেঘরেখার ছবি নিয়ে তাদের দৌড় পাল্লাও মেপে দেখা হল। যে-গামারশ্মি ওদেরকে এমনভাবে বেগবান করে তুলছে তাদের তেজটিও কি রকম, তা থেকেই তার হিসাব পাওয়া গেল। জোলিওর হিসাব মত সেটি প্রায় ৫৫×১০^{৬} (৫½ কোটি) ই. ভো -এর মত। সীসক-ভেদ ক্ষমতা থেকে আগে তা জানা হয়েছিল কিন্তু ৭×১০^{৬} (৭০ লক্ষ) ই. ভো.। আশ্চর্য ঘটনা! যে-আলফাকণিকা দিয়ে বেরিলিয়াম-কেন্দ্রককে আঘাত করা হয়েছিল তারই তো তেজপরিমাণ মাত্র ৫×১০^{৬} (৫০ লক্ষ) ই. ভো.! এই বিপুল পরিমাণ তেজ কোথা থেকে এসে গেল!

চ্যাডউইক কিন্তু বেরিলিয়াম-বিকিরণের সামনে হাইড্রোজেনের পরিবর্তে নাইট্রোজেন এবং আর্গন এনে ধরলেন। ফল দেখে তিনি বিস্ময়ে হতবাক্। নতুনসৃষ্ট কণিকাদের পাল্লার হিসাব নেওয়া হল। তা দেখেও পুনরায় গামা-রশ্মির তেজ পরিমাপ করা হল। দু'বার দু'রকম ফল। নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে গামা-রশ্মির তেজ হল ৯×১০^{৭} (৯ কোটি) ই. ভো.। আর আর্গনের ক্ষেত্রে সে তেজ হয়ে গেল কিনা ১৫×১০^{৭} (১৫ কোটি) ই. ভো.!

চ্যাড্উইক বুঝলেন বিজ্ঞানীরা কাণা-গলিতে পড়েছেন। তা নাহলে একই ৫২৫×১০^{৪} (৫২½ লক্ষ) ই. ভো. তেজের আল্ফা-কণিকার সাহায্যে উৎপন্ন একই গামা-রশ্মির তেজ একবার ৭০ লক্ষ, অন্যবার ৫½ কোটি, কখনও বা ৯ কোটি, আবার কখনও বা ১৫ কোটি ই. ভো. হয়! অনেক ভাবনা চিন্তার পর, তিনি ওকে আর গাম-রশ্মি বলে মেনে নিতে পারলেননা। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, নিশ্চয় ওটি কোনো অজ্ঞাত কণিকার প্রবাহ। তার ভর যদিও মোটামুটি প্রোটনের মত, আধানটি কিন্তু একেবারেই কিছুনা। আদপে ঐ কণিকা **neutral** বা আধান-নিরপেক্ষ। চ্যাড্উইক ওর নাম দিলেন নিউট্রন বা নিরপেক্ষ কণিকা। নিরপেক্ষ বলেই ওরা বিভিন্ন প্রকার উপাদানের পরমাণু ভেদ করে সহজেই বেরিয়ে যেতে পারে। যদি ওরা কোনো উপাদানও হয়ে থাকে, তাহলে ওদের মধ্যে বিদ্যুৎ আধানের বালাই মাত্র না থাকায় কেন্দ্রকীয় প্রোটন বা অতিকেন্দ্রকীয় ইলেক্ট্রনও ওদের নাই। ফলে অন্য কোনো উপাদান যেমন ওদের সঙ্গে কোনো রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারেনা, তেমনি অন্য কোনো পরমাণুর কোনো বিদ্যুৎক্ষেত্রেও ওরা কিছুতেই আবদ্ধ হয়ে পড়েনা। তার ফলে কেউই ওদের গায়ে হাত লাগাতে পারেনা, অথচ ওরা কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে সকলেরই অলিন্দ (বারান্দা) দিয়ে অন্দর পেরিয়ে স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে যেতে পারে। এরকম অমিতশক্তির অধিকারী বলেই আলফা-কণিকার অভিঘাতের ফলে বেরিলিয়াম-কেন্দ্রক থেকে ওরা প্রবল বেগে উৎক্ষিপ্ত হয়ে সামনের সীসক বাধা ভেদ করে সহজেই বেরিয়ে যায়। তারপর ওরা হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি উপাদানের পরমাণুতে গিয়ে ধাক্কা মেরে তাদের মধ্যেও প্রচণ্ড তোলপাড় সৃষ্টি করে। পরমাণুর জগতে ওরকম

কেউ যে কোথাও চুপিসাড়ে লুকিয়ে থেকে বিজ্ঞানীর চোখে ধূলি দিয়ে বেড়াচ্ছে, ১৯২০ সালেই রাদারফোর্ড সেটি অনুমান করতে পেরেছিলেন। যখন জানা যায় যে, একই উপাদানের বিভিন্ন পরমাণুতে বিভিন্ন ভরের কেন্দ্রক বা আইসোটোপ থাকা সম্ভব, তিনি তখন হিসেব কষে বুঝতে পারেন যে, ঐ ভরগুলির মধ্যে যে পার্থক্য, তা প্রায় হাইড্রোজেন-পরমাণুর ওজন বা তার কোনো গুণিতকের সমান। সুতরাং নিশ্চয় ঐ রকম কোনো কণিকার অস্তিত্ব সম্ভব। কিন্তু তিনি তাকে ধরতে পারেননি। ১২ বছর পরে ১৯৩২ সালে তাঁর শিষ্যের কাছে কিন্তু তাকে আত্মপ্রকাশ করতেই হল।

বলবিদ্যার সূত্র ধরেই চ্যাড্‌উইক এগিয়েছিলেন। বলবিদ্যার একটি সাধারণ তত্ত্ব এই যে, একটি বস্তু ধাক্কা মেরে অন্য একটি বস্তুর মধ্যে স্বীয় তেজ সংক্রমিত করতে সমর্থ হলেও ঐ সংক্রমিত তেজপরিমাণ সর্বদা এক রকমের হতে পারেনা। ধাক্কা-মারা বস্তুটির (projectile) ভর ধাক্কা-খাওয়া বস্তুটির ভরের সমান হলে তবেই সর্বাধিক পরিমাণ তেজ চালান করে দেওয়া সম্ভব হয়। সুতরাং বর্তমান ক্ষেত্রে তাহলে ধাক্কা-মারা অজ্ঞাত কণিকার ভরকে মোটামুটিভাবে ধাক্কা-খাওয়া প্রোটন-কণিকারই ভরবিশিষ্ট হতে হয়। চ্যাড্‌উইক সেই অনুমানই করে নিলেন। নাহলে কোথা থেকে এত অধিক পরিমাণ তেজ আসতে পারে? বলবিদ্যার আরও একটি তত্ত্ব এই যে, একটি মুখোমুখী সংঘর্ষে যে তেজ বা বেগটি ধাক্কা-মারা বস্তু থেকে ধাক্কা-খাওয়া বস্তুতে চালান হয়ে যায়, তা ঐ উভয় বস্তুরই মোট ভরের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতী হয়, অর্থাৎ ওদের ভরসমষ্টি বেড়ে গেলে, ঐ সংক্রমিত তেজটি তার সঙ্গে অনুপাত রক্ষা করেই কমে যায়। চ্যাড্‌উইক দেখেছিলেন যে ঐ অজ্ঞাত কণিকাটির দ্বারা ধাক্কা খেলে ১৪-ভর বিশিষ্ট নাইট্রোজেন-কেন্দ্রক যে ভর অর্জন করে, ১-ভর বিশিষ্ট হাইড্রোজেন-কেন্দ্রক বা প্রোটন-কণিকা তার ৭-গুণ বেগ অর্জন করে। সুতরাং অজ্ঞাত কণিকার ভবকে M ধরলে নাইট্রোজেন-কেন্দ্রকের অর্জিত বেগ তাহলে (M + ১৪)-এর সঙ্গে, এবং, হাইড্রোজেন-কেন্দ্রক বা প্রোটনের অর্জিত বেগ তাহলে (M + ১)-এর সঙ্গে ব্যস্তানুপাতী হয়। এর অর্থ, প্রথম ক্ষেত্রে সংক্রমিত বেগ ১/(M + ১৪)-এর সঙ্গে, এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সে বেগ ১/(M + ১)-এর সঙ্গে অনুপাত রক্ষা করে চলে। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রের এই বেগটি প্রথম ক্ষেত্রের এই বেগের ৭ গুণ। সুতরাং

$$\frac{১}{M+১৪}\times ৭ = \frac{১}{M+১} \quad \text{অর্থাৎ,} \quad M = \frac{৭}{৬} = ১\cdot১৬$$

সুতরাং এ থেকে বোঝা যায় যে; অজ্ঞাত-কণিকার ভরটি প্রোটনের ভরের (১-ভরের) চাইতে মাত্র শতকরা ১৬ বেশি। (পরে জানা গেছে ওটি আরও কম।)

এভাবে নিউট্রন ধরা পড়ল তার প্রধান দু'টি বৈশিষ্ট্য নিয়েই। প্রথম, তার আধান-নিরপেক্ষতা; দ্বিতীয়, তার প্রচণ্ড গতিশীলতা। অথচ এই দু'টি গুণের জন্যই

বেরিলিয়াম-বিকিরণটি গামারশ্মি বলেই চলে যাচ্ছিল। কারণ, গামারশ্মিও নিরপেক্ষ আর প্রচণ্ড বেগসম্পন্ন। কিন্তু নিউট্রন তার আর যে একটি গুণের জন্য শেষ পর্যন্ত ধরা দিতে বাধ্য হল, সেটি তার ভর। বেগের সঙ্গে ভর যুক্ত হয়ে গিয়ে যে ভরবেগ, সেই ভরবেগের দিক থেকে গামার সঙ্গে ওর কী বিপুল পার্থক্য! আসলে সেই থেকেই ওকে ধরে ফেলা সম্ভবও হল। কিন্তু ঐ ভরটি নিয়েই ও আবার প্রোটনের সঙ্গে গা-ঢাকা দিয়ে চলে যেতে চেয়েছিল। কারণ, ও-ভরটি প্রোটনের ভরের মতই, সামান্য কিছু বেশি; ঐটুকু আধিক্য সহজে ধরা পড়েনা। গামারশ্মির সঙ্গে ওর বেগের পার্থক্য থাকা সত্বেও গামারশ্মির সঙ্গেও সে ঐভাবে মিশে যেতে চেয়েছিল।

কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী বিজ্ঞানীরা বাস্তব প্রমাণের মাধ্যমে তত্ত্বকে যাচাই করে দেখিয়ে দিতে না পারলে তো তত্ত্বটি সার্বজনীন হয়ে উঠেনা। তাঁরা তাই গামারশ্মির সঙ্গে নিউট্রনের গুণাবলী ভাল করে মিলিয়ে দেখতে ছাড়লেননা। বিভিন্ন বেধের সীসার পাতের মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে তুলনা করে দেখতেই আল্‌ফা-, বিটা-, গামা- ও একস্‌-রশ্মি – এদের সকলের সঙ্গেই ওর তেজপার্থক্যটি জানা গেল। কিন্তু ভরের দিক থেকেও যে গামা আর নিউট্রনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে, বিজ্ঞানীরা একেবারে ছবি তুলেই সেটিও প্রত্যক্ষ করতে চাইলেন। গামারশ্মির প্রাথমিক তেজসংঘের (quantum) ভর অত্যন্ত কম বলে বলবিদ্যার নিয়মানুসারে গুরুভর কেন্দ্রকের উপর অভিঘাতকালে সে খুব কম তেজই তার মধ্যে চালান করে দিতে পারে। সুতরাং মেঘায়ন-কক্ষে গামারশ্মির সঙ্গে পরমাণুর সংঘাতজনিত ছবিতে দ্রুতগতি (fast) ইলেক্‌ট্রনের কৃশ পথরেখাটি বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার কথা; অথচ কেন্দ্রকটি ধীরগতি হওয়ার জন্য ঐ ঘটনায় তার পথচিহ্নটি অস্পষ্ট হয়ে পড়বে। কিন্তু নিউট্রন দিয়ে কেন্দ্রক-অভিঘাতের ক্ষেত্রে ঠিক এর উল্টো জিনিসই দেখা যাবে। কারণ, নিউট্রনের ভরটি হাল্কা পরমাণুর কেন্দ্রকীয় ভরের প্রায় সমানই। তাই সে তার অনেকটা তেজ দিয়েই তাদের কেন্দ্রককে গতিবান করে তুলে। অথচ সে-তুলনায় ইলেক্‌ট্রনের ভর নগণ্য বলে তার যৎসামান্য ভরই সে ইলেক্‌ট্রনকে দিতে পারে। ফলে ক্ষীণতেজ ও হীনগতি জনিত ইলেকট্রনের ছবি অস্পষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া নিউট্রন কণিকা আধান-নিরপেক্ষ। ক্ষুদ্রায়তন তড়িৎকণা ইলেক্‌ট্রন পরমাণুর অত্যল্প স্থানে বিদ্যমান থাকায় উভয়ের যোগাযোগের সম্ভাবনাও অত্যল্প। সেজন্য নিউট্রন ইলেক্‌ট্রনের উপর প্রভাব বিস্তার করে তেমন আয়নায়নের কাজ চালিয়ে যেতে পারবেনা। অথচ প্রায় সমভরের প্রোটনের মধ্যে সে তার বেশির ভাগ তেজই চালিয়ে দিতে পারায় প্রোটন তখন খুব বেগবান হয়ে তার বিশেষ আয়নায়ন ক্ষমতার প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। ফলে ছবিতে ইলেক্‌ট্রনের ঘন কুয়াশার মধ্যে তার স্থূল পথরেখাটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।— বাস্তবিকই পরীক্ষা ক্ষেত্রে মেঘায়ন-কক্ষে এসব জিনিস ঘটে গেল। কক্ষের ছবি থেকে

গামারশ্মি ও নিউট্রনের পার্থক্যটি সুপ্রমাণিত হল। নিউট্রনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহের কোনো কারণ রইলনা।

সুতরাং যে নিয়ে সমস্যার সূত্রপাত (পৃ. ৩০৬) সেই বিষয়েরও সমাধান খুঁজে পাওয়া গেল। আল্‌ফা-কণিকার সংঘাতে বেরিলিয়াম-বিকিরণের তত্ত্বটি স্পষ্ট হয়ে উঠল। বেরিলিয়াম কেন্দ্রকের ভর সংখ্যা ৯ এবং আধান সংখ্যা ৪। সুতরাং ৪-ভর ও ২-আধানের আল্‌ফার সংযোগের ফলে ঐ কেন্দ্রকের ভর সংখ্যা ১৩ এবং আধান সংখ্যা ৬ হওয়ার কথা। আধান সংখ্যা অর্থাৎ পরমাণু সংখ্যা ৬ হলে পর্যায়িক ছক অনুযায়ী নতুন কেন্দ্রকটি হবে কার্বনেরই। কিন্তু নিক্ষিপ্ত আলফা-কণিকার গতিশক্তিও যখন নতুন কেন্দ্রকে এসে বর্তাচ্ছে, তখন তারও একটি বহিঃপ্রকাশ থাকা চাই। তাছাড়াও প্রশ্ন আছে যে, এই অভিনব ব্যবস্থায় যখন ধনাত্মক পুরো আল্‌ফা-কণিকাটিই ধনাত্মক পুরো কেন্দ্রকটির সঙ্গে মিলন-বন্ধনে বাঁধা পড়ছে, তখন ওদের যোটন-তেজটি বা যাবে কোথায়? সুতরাং এই দু'টি মিলিত শক্তির সুষ্ঠু বিলি ব্যবস্থা সম্ভব হতে পারে একমাত্র এই ব্যবস্থায় যে, সেই শক্তির বলেই নিউট্রন-কণিকাও ভীমবেগে কেন্দ্রক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং কেন্দ্রক প্রতিক্রিয়াটিকে এভাবে লেখা হল :

$$ {}_{৪}Be^{৯} + {}_{২}He^{৪} \rightarrow {}_{৬}C^{১২} + {}_{0}N^{১} $$
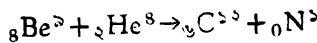
একটু জটিল হলেও, নিউট্রন-উৎপাদক লিথিয়াম- এবং বোরন-কেন্দ্রকের রূপান্তর প্রক্রিয়াটিও এভাবে সাজান সম্ভব হল। বোরনের ভরটি ঠিকভাবে নির্ধারিত থাকায় তার রূপান্তর প্রক্রিয়াটিকে ভালভাবে যাচাই করে দেখা হল। এভাবেই তজ্জনিত মুক্ত নিউট্রনের গতিশক্তির পরিমাপ করে চ্যাড্‌উইক নিউট্রনের ভরটি স্থির করে ফেললেন। হিসাবে যে সামান্য ভুল ছিল, তা দূরীভূত করে ওর আসল ভরটি জানা গেল—১'০০৮৯৩-একক। অর্থাৎ প্রায় প্রোটনেরই মত। প্রোটনের ভর—১'০০৭৫৮-একক। তবে মুক্ত নিউট্রন স্বল্পায়ু। কেন্দ্রকের বাইরে গড়ে তাদের 'আয়ু মিনিট সতেরোর মত। তারপরেই তারা প্রোটনে পরিণত হয়।'

কিন্তু সমাধানই শেষ নয়। তা যদি হত, জগতে আর গতি বলে কিছু থাকতনা। গতিস্বরূপ জগৎ-ব্যাপারের মধ্যে তাই দেখি একটি সমস্যার সমাধানের সঙ্গে সঙ্গেই অন্য একটি সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এক একটি সমাধান যেন এক একটি দিগন্ত রেখা, মানুষ যতই তার পানে এগিয়ে যায়, ততই সে দূর থেকে দূরে সরে যায়।

Yet all experience is an arch wherethro'
Gleams that untravelled world, whose margin fades
For ever and for ever when I move.

প্রকৃতির জগতেও তাই। আর প্রকৃতির প্রাণোদ্ভূত মনোজগতেও তাই। সর্বত্র সেই একই গতির চিরন্তন স্পন্দন। তারই ফলে মানুষ বৃহত্তর সমস্যার মধ্যে গিয়ে পৌঁছবার প্রেরণাতেই ক্ষুদ্রতর সমস্যার সমাধান করে ফেলে। কিন্তু সমাধান বা শান্তিও কখনই তার শেষ প্রাপ্য নয়। শান্তি তার অশান্ত-আবেগের ভাষা শুধু, অশ্রান্ত প্রাণশক্তির ছলনাবিলাস মাত্র। প্রজ্ঞাহীন মানুষের কাছেই তার কলাচাতুর্য। কিন্তু যিনি প্রজ্ঞাবান্, তিনি চির অশান্ত। একটি প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেলেই তিনি আর একটি প্রশ্নকে জাগিয়ে তুলেন। প্রশ্নটি যেন সেই জাগ্রত মানুষের চোখে আপনিই জেগে ওঠে। তাঁর পক্ষে তাই সমাধানের গর্ভেই সমস্যার জন্ম। যে-নিউট্রন সমস্যার সমাধান করে দেয়, সেই-নিউট্রনই যেন কেমন করে সেই প্রজ্ঞাবান বিজ্ঞানীর কাছে নতুন সমস্যা রূপে আবির্ভূত হয়। নিউট্রনের অজ্ঞাত গুণাবলী একটি সমস্যার সমাধান দিতে গিয়েই বিজ্ঞানীর চোখে জ্ঞাত হয়ে উঠল। আর অমনি তাঁর মনে অগ্রগতির সমস্যা জেগে উঠল, কি করে ঐ গুণাবলীকে কাজে লাগান যায়। প্রকৃতির সঙ্গে মানবের যে-দ্বন্দ্বের ফলে প্রকৃতির বিপুল ঐশ্বর্যের ক্রম-পরিস্ফুরণ আর মানবমনের ক্রমবিকাশ ঘটে চলেছে, সেই দ্বন্দ্বই এখানে জেগে উঠল সমস্যা হয়ে ;—প্রকৃতি সম্বন্ধীয় নবাবিষ্কৃত তত্ত্বের উপর পদস্থাপনা করে সমগ্র সমাজ কি করে প্রকৃতিকে জয় করার পথে এগিয়ে যেতে পারে? কেন্দ্রক-জয়ের অভিযানে আল্‌ফা-বা প্রোটন-কণিকা এক একটি অস্ত্র। বিকর্ষণী বিদ্যুৎশক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা যদি কেবলমাত্র গতিশক্তির জোরেই কেন্দ্রকের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারে, তাহলে নিউট্রনের নিরপেক্ষতা আর ক্ষিপ্রতর গতি তো এ ব্যাপারে আরও বেশি ফলপ্রদ হয়ে উঠবে। বরঞ্চ এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ নিউট্রনের পক্ষে তার দ্রুতগতির চাইতে তার ধীরগতিই অধিকতর উপযোগী হতে পারে (দ্র, পরমাণুর পরিণাম)। কারণ, পারিমাণিক বলবিদ্যা (Quantum Mechanics) অনুযায়ী আমরা জেনেছি যে, ইলেক্‌ট্রনের মত প্রাথমিক কণিকার তরঙ্গদৈর্ঘ্যটি তার গতিবেগের উপরই নির্ভরশীল হয়। প্রাথমিক কণিকা নিউট্রনেরও গতিবেগ প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমে যায় এবং তখন সে কণিকা-ধর্ম লাভ করে। তখন সে ক্ষুদ্র হয়ে গিয়ে একটি পরমাণু-দৈর্ঘ্য ($১০^{-৮}$ সে. মি.) কেন, একটি কেন্দ্রক-দৈর্ঘ্যের ($১০^{-১২}$ সে. মি.) মধ্যেও স্থান পেতে পারে। অথচ অপরপক্ষে, তার গতিবেগ হ্রাসপ্রাপ্ত হলে সে পদার্থের কণিকাধর্ম বা ভর-ভঙ্গিটি পরিত্যাগ করে, এবং তখন সে পদার্থের তরঙ্গভঙ্গি নিয়েই প্রকাশ পায়। বস্তুতপক্ষে, সে তখন আলো বা শব্দতরঙ্গে পরিণত হয়ে যায়। সুতরাং কেন্দ্রককে বিদ্ধ করবার জন্য একদিকে যেমন নিউট্রনের পক্ষে বেগবান হয়ে কণিকা-ধর্ম গ্রহণ করার দরকার হয়, অন্যদিকে তেমনি অত্যন্ত ক্ষুদ্রায়তন কেন্দ্রকটিকে নাগালের মধ্যে পাওয়ার জন্য তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যেরও কিছুটা বৃদ্ধি ঘটার দরকার হয়। আর সেই কারণেই তখন তার

গতিহ্রাসেরও প্রয়োজন হয় [তবে গতিবেগ খুব বেশি কমে গিয়ে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অতিবৃদ্ধি ঘটলেও কেন্দ্রকটি নাগাল বহির্ভূত হয়ে যেতে পারে]।

সুতরাং নিউট্রন দিয়ে কি আরও সহজে আরও ভালভাবে সেই কেন্দ্রক-রূপান্তর ঘটনাটিকে ঘটিয়ে তুলা যায়না? আল্‌ফা-কণিকার বৈদ্যুতিক প্রতিকূলতার জন্যই গড়ে প্রায় দশ লক্ষ নিক্ষিপ্ত আল্‌ফা-কণিকার মধ্যে একটিমাত্র কণিকার পক্ষেই ঐ কাজ করা সম্ভব হয়। ধনাত্মক প্রোটন-যোট যুক্ত কেন্দ্রকের কাছে গিয়ে ধনাত্মক কোনো কণিকাকে প্রচণ্ড তাড়া খেয়ে ফিরতে হয়। তাছাড়া পরমাণুর প্রায় সবটা অংশই শূন্য পড়ে থাকায় অল্পায়তন কেন্দ্রকটির নাগাল পাওয়াও তার পক্ষে যেন একটি আকস্মিকের ব্যাপার হয়ে উঠে। অধিকন্তু, অসংখ্য পরমাণুর অসংখ্য ইলেক্‌ট্রন স্তর তাকে পার হতেই হয়। তাতে করে ঐ অসংখ্য ইলেক্‌ট্রনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ না ঘটলেও তাদের সেই বিপরীত বিদ্যুৎক্ষেত্রকে বা আকর্ষণী প্রভাবকে বার বার এড়িয়ে যেতে যেতে ক্রমে ক্রমে সে শক্তি হারিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং ইলেক্‌ট্রন-স্তরগুলি ভেদ করে যাওয়ার সময় তাকে স্বভাবতই কিছু তেজ খোয়াতে হয়। ফলে বিকর্ষণী প্রভাবযুক্ত কেন্দ্রকের সঙ্গে মিলিত হওয়া তার পক্ষে হয়ত তখন আর সম্ভবই হয়না। কিন্তু নিউট্রন-কণিকার কোনো বিদ্যুৎ-আধান না থাকায় ওভাবে তার তেজ হারানোর প্রশ্নই ওঠেনা। সুতরাং এখন হোক তখন হোক, এখানে হোক ওখানে হোক, ছুটতে ছুটতে গিয়ে কোনো না কোনো কেন্দ্রককে সে ধাক্কা দিয়ে তার প্রোটনকে ঠেলা মেরে তুলবেই। আল্‌ফা-কণিকার তুলনায় তার সংখ্যা যদি কমও হয়, পরোয়া কিসের?

মেঘায়ন-কক্ষের মধ্যে বিভিন্ন গ্যাসের ওপর নিউট্রন নিক্ষেপ করা হল। শুধু লিথিয়াম বেরিলিয়াম বা বোরন বা নাইট্রোজেন নয়। আল্‌ফা-কণিকা যাদের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারেনি, সেই কার্বন অক্সিজেনরাও সব একে একে এসে দাঁড়াল। রেহাই পেলনা কেউ। মেঘায়ন-কক্ষ সকলেরই কেন্দ্রকরূপান্তরের ইতিহাস লিখে দিল। মানুষই প্রকৃতির অন্তর্লোক থেকে প্রকৃতি-রূপান্তরের আর একটি মহাস্ত্র চুরি করে আনল। তার পুনরাভিযান নতুনভাবে শুরু হল। সে অভিযান দেখতে দেখতে যেন সর্বমানবিক হয়ে উঠল। সে ইতিহাস জয়োদ্ধত। সে গল্প উল্লাসফেনিল। কর্ণধার বিজ্ঞানীর পক্ষেও তার তরঙ্গবিক্ষুব্ধি সহ্য করা শক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু তিনি হাল ধরে রইলেন তবুও।

কিন্তু 'জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য' তেজসংগ্রহের আসল কাজকেই (পৃ. ৩০৫) স্থগিত রাখতে হল। যে-কেন্দ্রক থেকে তেজ সংগ্রহের আয়োজন হয়েছিল, সেই কেন্দ্রক সম্বন্ধে সম্যক পরিচয়টি দরকার হয়ে পড়ল। তেজস্ক্রিয় রশ্মির মর্মোদ্ঘাটন বা তার জন্মরহস্য উদ্ঘাটনের বিষয়টি তাই অনিবার্য হয়ে উঠল। পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে রাদারফোর্ডের (এবং বোরের) বিবরণ থেকে এক রকম নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছিল যে, কেন্দ্রকই তেজস্ক্রিয়

রশ্মির একমাত্র উৎস। এই কারণে তেজস্ক্রিয় রশ্মির মর্মোদ্ঘাটনও অপরিহার্য হয়ে উঠল।

তেজস্ক্রিয় রশ্মির যে তিনটি ভাগ, তা আমরা জানি। তন্মধ্যে আল্‌ফা-ভাগটিই প্রোটন নিয়ে আসে। অথচ কেন্দ্রক ছাড়া পরমাণুর বাকি অংশটির সবই ইলেক্‌ট্রনের রাজ্য। সুতরাং একমাত্র কেন্দ্রক থেকেই প্রোটনের উদ্ভব সম্ভব হয়। রশ্মির আর এক ভাগ তার বিটা-বা ইলেক্‌ট্রন-কণিকা। স্বভাবত পরমাণুর ইলেক্‌ট্রন অঞ্চল থেকেই তার উদ্ভবের যথেষ্ট সম্ভাবনা। কিন্তু সেখান থেকে একটিমাত্র বিটা-কণিকা নিঃসৃত হয়ে গেলেও পরমাণুটি আয়নায়িত হয়ে পড়বে। বিটা-ক্ষরণ ঘটা সত্ত্বেও তা যখন হয়না, তখন ধরে নিতেই হল যে, বিটা-কণিকার উৎপত্তি স্থলও ঐ কেন্দ্রকই। এদিকে জানা গেল যে, কেন্দ্রকের বহির্দেশে ইলেক্‌ট্রন-নৃত্যের ফলে যে দৃশ্য-রশ্মি এবং রঞ্জেন-রশ্মির ফোটনদের পাওয়া যায়, তেজস্ক্রিয় রশ্মির তৃতীয় ভাগের অর্থাৎ গামা-ফোটনের তেজ তাদের চাইতে বহুগুন বেশি। সুতরাং সব দিক থেকে বিচার করলে তেজস্ক্রিয় রশ্মিকে কোনো প্রকার কেন্দ্রক-প্রতিক্রিয়ার ফল বলে ধরে নিতেই হয়। কিন্তু কেন্দ্রক থেকে এই অফুরন্ত তেজোদ্ভবের কারণ কি?

বোঝা যায় যে, কেন্দ্রকটি বেশ দৃঢ়বদ্ধ ও সুগঠিত। তা নাহলে সেখান থেকে অত শত তেজস্ক্রিয় কণিকা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার পরেও সে বেশ বহাল তবিয়তে থাকে কেমন করে? আর এও জানা যাচ্ছে যে, ভারি পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা নিশ্চয় বহু। কিন্তু কি করে কেন্দ্রকের ছোট্ট জায়গাটিতে এতগুলি ধনাত্মক কণিকা এক সঙ্গে জোট বেঁধে থাকতে পারে? তাই প্রথমের দিকে ধরে নেওয়া হয় যে হয়ত ঐ ইলেক্‌ট্রনরাই তাদেরকে জোড়া দেওয়ার জন্য সিমেণ্টের কাজ করছে। কিন্তু ইলেক্‌ট্রনের অবয়বটি এত বড় যে, ক্ষুদ্রায়তন কেন্দ্রকের মধ্যে তার দেহটি আঁটতে পারেনা। তাকে সেখানে আঁটতে হলে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যটি আরও অনেক ছোট হওয়া দরকার। আর প্ল্যাঙ্কের তত্ত্ব অনুযায়ী সেজন্য তাকে অত্যুচ্চ বেগসম্পন্ন হতে হয়। কিন্তু ইলেক্‌ট্রনের পক্ষে কেন্দ্রকের মধ্যে সেই পরিমাণ তেজযুক্ত হওয়া অসম্ভব, তাছাড়া প্রোটনের তুলনায় ইলেক্‌ট্রনের ওজন প্রায় কিছুই নয়। সুতরাং হাল্কা কেন্দ্রকের ক্ষেত্রে সে অনুমান খাটলেও ভারি কেন্দ্রকের ক্ষেত্রে তা অচল। ভারি কেন্দ্রকগুলি নির্দিষ্ট-সংখ্যক প্রোটন এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইলেক্‌ট্রনের মোট ভারের চাইতেও ঢের বেশি ভারি। সুতরাং ঐ ইলেক্‌ট্রনই ঠিক জোড়া দেওয়ার কাজ করছে কিনা, সে সম্বন্ধে খটকা থেকে যায়।

১৯৩২ খ্রী.-এ চ্যাড্‌উইক নিউট্রন আবিষ্কার করলে (পৃ. ৩০৮) ঐ বছরেই হাইসেনবার্গ্‌ এবং আইভানেঙ্কো (D. D. Ivanenko) এবং তাম্‌ম্‌ (I. E Tamm) আঙ্কিক তত্ত্বের বলে অনুমান সিদ্ধান্ত করলেন যে, কেন্দ্রকগুলি একমাত্র প্রোটন আর নিউট্রন,

দিয়েই গঠিত। দেখা গেল যে, উপাদানগুলিতে প্রোটনের সংখ্যা বাড়তে থাকলে নিউট্রন-সংখ্যাও সমানভাবে বাড়তে থাকে, কিন্তু প্রায় এই সমান সমান বৃদ্ধিটি চলে ২০-সংখ্যক উপাদান ক্যালসিয়াম পর্যন্ত। তারপর ২১-সংখ্যার স্ক্যাণ্ডিয়াম থেকেই ভারি উপাদানগুলির ক্ষেত্রে প্রোটন সংখ্যার চাইতে নিউট্রন সংখ্যার বৃদ্ধি অধিকতর হতে থাকে। ছকের শেষ অর্থাৎ ৯২-সংখ্যক উপাদান ইউরেনিয়াম। সেখানে দেখা যায় প্রোটন সংখ্যা ৯২ হওয়া সত্ত্বেও নিউট্রন সংখ্যা ১৪৬-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মধ্যবর্তী উপাদানগুলির কোনো কোনটিতে বৈচিত্র্য দেখা যায়। একই উপাদানের পরমাণুতে ভিন্ন সংখ্যার নিউট্রন সন্নিবিষ্ট থাকায় পরমাণুর বিভিন্ন আইসোটোপ সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু একটি তড়িৎবিহীন নিরপেক্ষ কণিকা যে কি করে প্রোটনগুলিকে একত্রে জোড়া লাগিয়ে রাখতে পারে তা বোঝা শক্ত হল। ধনাত্মক প্রোটনদের মাঝে ঋণাত্মক ইলেকট্রন বিদ্যমান থাকলে হয়ত সে কাজ সম্ভব হত। বাস্তবিকই কেন্দ্রকটি একটি অত্যন্ত সুগঠিত দৃঢ়বদ্ধ সত্তা। কোনো প্রকার রাসায়নিক বা বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করে তাকে ভেঙে ফেলা সম্ভব হয়নি। যেসব শক্তি তথাকথিত 'অভঙ্গুর' পরমাণুর অন্তর্গত কেন্দ্রক বহির্ভূত ইলেকট্রনকে খসিয়ে আনে, তারাও কোনোমতেই কেন্দ্রকটিকে বিন্দুমাত্রও টলিয়ে দিতে পারেনা। সুতরাং সত্যই সে এক দুর্ভেদ্য সত্তা। কিন্তু সে যে বিদ্যুদাদি কোনো শক্তির পরোয়া করছেনা, তার কারণই বা কি? জানা আছে যে, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন প্রভৃতি প্রত্যেকটি উপাদানের পরমাণুদ্বয় নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক শক্তি বিনিময়ের মাধ্যমেই একত্রে জোট বেঁধে এক একটি অণুসত্তারূপেই নিজেদের জানান দেয়। এখানে কেন্দ্রকের বেলাতেও তাহলে কি ঐ প্রকারের কোনো শক্তি-বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমেই সমধর্মী প্রোটনরাও একত্রে জোট বেঁধে থাকতে পারছে? ১৯৩৪ খ্রী.-এ সোভিয়েত বিজ্ঞানী তাম্‌ম্‌ এবং জাপানী পদার্থবিদ্ য়ুকাওয়া (Hideki Yukawa) অনুমান করলেন যে নিশ্চয় এখানেও ঐ রকমের একটি বিনিময় প্রথার মাধ্যমে একটি অতি প্রচণ্ড কেন্দ্রকীয় শক্তির উদ্ভব ঘটছে। তারই ফলে প্রোটনদের বিদ্যুৎশক্তিও তার কাছে হার মেনে যাচ্ছে। কিন্তু বিনিময়ের সে বস্তুটি কি? ইলেকট্রন কি? তাম্‌ম্‌ হিসাব কষে দেখালেন যে, ইলেকট্রনের জোড় লাগানর শক্তি ঐ বিপুল শক্তির তুলনায় অনেক কম হয়ে যায়। সুতরাং বলতেই হয় যে, প্রোটন আর নিউট্রন কণিকাদের যতই বিভিন্ন দেখাক না কেন, মূলত ওরা একই কণিকার দু'টি ভিন্ন রূপ। একই কণিকা কেবল বারে বারে সাজ বদল করে চোখে ধুলো দিচ্ছে। ইতিপূর্বে এরকম প্রাথমিক কণিকার পারস্পরিক রূপান্তরশীলতার কোনো দৃষ্টান্ত মেলেনি। সুতরাং ওদের মধ্যে যদি বিনিময় চলতেই থাকে তাহলে আর একটি অনুমানও অপরিহার্য হয়ে উঠে। যে-বস্তুটি প্রোটন থেকে বেরিয়ে গেলে প্রোটনটি নিউট্রনে পরিণত হয়ে যায়, সেই বস্তুটিই নিউট্রনের সঙ্গে

মুক্ত হয়ে আবার তাকেই প্রোটনে রূপান্তরিত করে তুলে। অথবা, বস্তুটি হয়ত নিউট্রন থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাকে ধনাত্মক প্রোটনে রূপান্তরিত করে আসে, এবং তারপর প্রোটনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় প্রোটনটি নিরপেক্ষ নিউট্রনে পরিবর্তিত হয়ে যায়। উকাওয়া দেখলেন (দ্র. পরমাণুর পারে) যে, ধনাত্মক বা ঋণাত্মক যাই হোক না কেন, সে বস্তুটির আধান-পরিমাণকে অবশ্যই প্রোটনের আধান-পরিমাণের সঙ্গে সমান হতে হবে। আর ইলেক্‌ট্রনের চাইতেও তাকে অনেক বেশি ভারি হতে হবে—প্রায় দু' তিন শ' গুণ। প্রোটন আর নিউট্রনের প্রত্যেকে যখন ইলেক্‌ট্রনের চাইতে প্রায় ১৮০০ গুণ ভারি, তখন ঐ বস্তুটি নিশ্চয় উভয়ের মধ্যবর্তী হবে। সুতরাং তার নাম দেওয়া হল 'মধ্যবর্তী', বা গ্রীক ভাষায় 'মেসন' (meson)। ধনাত্মক মেসন প্রোটন থেকে বেরিয়ে এসে নিউট্রনের সঙ্গে মিশে যায়, আর তার ফলে প্রোটন নিউট্রনে এবং নিউট্রন প্রোটনে পরিণত হয়ে যায়। অথবা ঋণাত্মক মেসন নিউট্রন থেকে উঠে এসে প্রোটনের সঙ্গে মিশে ঐ একই ফল ফলিয়ে দেয়।

কিন্তু ধনাত্মক বা ঋণাত্মক যাই হোক না কেন, কোথায় সে মেসন? তেজস্ক্রিয় রশ্মির মধ্যে তো তাকে খুঁজে পাওয়া যায়না! তাহলে? কিন্তু বিজ্ঞানীর অনুমান ব্যর্থ হলনা। ইতিমধ্যে জানা গিয়েছিল যে, প্রাথমিক কণিকাগুলির সব চাইতে সমৃদ্ধিবান উৎস হচ্ছে মহাজাগতিক রশ্মি (দ্র. পরমাণুর পারে)। সেখানে প্রবলভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে বিজ্ঞানীরা ঐ একই ১৯৩৪ খ্রী.-এ তার সন্ধান পেয়ে গেলেন। উকাওয়ার হিসাব মত তার ভরও জানা গেল,—প্রায় ২০০ ইলেক্‌ট্রন-ভরের মত। কিন্তু আশ্চর্য যে, প্রোটনের সঙ্গে বিশেষ শর্তে কোনোরকম সংযোগ স্থাপন করতে চাইলেও নিউট্রনের সঙ্গে সে কোনোমতেই ভাব করতে চাইলনা। বিজ্ঞানীরা বহু বছর যাবৎ চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলনা। নিউট্রনের কাছে সে একেবারেই নির্বিকার হয়ে রইল। বছরের পর বছর কেটে গেল। কেন্দ্রকপ্রতিক্রিয়া ঘটান হল, পারমাণবিক বোমা তৈরি হয়ে গেল; মহাযুদ্ধও মিটে গেল। মেসনের ছলনা তবুও ধরা পড়লনা। কিন্তু এক যুগ পরে ১৯৪৭ খ্রী.-এ মহাজাগতিক রশ্মির খ্যাতনামা গবেষক পাওয়েল (Powell) আর এক মেসনের সাক্ষাৎ পেলেন। তার ভর কিছু বেশি। ২৭৩ ইলেক্‌ট্রন-ভরের মত। এবার আর ভুল নয়। নবাবিষ্কৃত পাই-মেসন সত্যই কেন্দ্রক-কণিকাগুলির সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে চলে। এমন কি, সে যদি কখনও অতি প্রচণ্ড বেগে কেন্দ্রক পরিত্যাগ করে চলে যায়, তার ফলে শক্তিসংহত কেন্দ্রকও বিদীর্ণ হয়ে যায়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের জানা সকল প্রকার শক্তির মধ্যে কেন্দ্রক-শক্তিই প্রচণ্ডতম; অণুর মধ্যে যে বিনিময় শক্তি কাজ করে চলে, তা আন্তঃপারমাণবিক দূরত্বেই (10^{-8} সে. মি.) কার্যকর থাকে। কিন্তু কেন্দ্রকের বিনিময় চলে এর হাজার হাজার ভাগ ক্ষুদ্র দূরত্বে। এত অল্প দূরত্বেও সে শক্তি প্রোটনগুলিকে একত্রে দৃঢ়বদ্ধ করে রাখতে

পারে। সাধারণ উষ্ণতায় কোনো পদার্থের যেসব অণু বিচ্ছিন্ন হয়ে গ্যাস হয়ে যায় তাদের যোটন-তেজ ১ ই. ভো.-এর শতাংশ মাত্র। এরকম অণুর বন্ধন খুলে তাদের পরমাণুগুলিকে পৃথক করে দিতে হলে পরমাণু পিছু ১০ ই. ভো., বা হাজার হাজার ডিগ্রির উষ্ণতা লাগে। কিন্তু কেন্দ্রকের সঙ্গে কেন্দ্রকবহির্ভূত এক একটি ইলেকট্রনের অবস্থান-সম্বন্ধের তেজ দশ থেকে সহস্র সহস্র ই. ভো. পর্যন্ত হতে পারে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, কেন্দ্রকের নিকটবর্তী কোনো কোনো ইলেকট্রনকে শুধু পরমাণু থেকে ছিনিয়ে আনার তেজই লক্ষ লক্ষ ডিগ্রি হয়ে যেতে পারে। এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে যে, কেন্দ্রকীয় কণিকাগুলির যোটন-তেজই যদি লক্ষ লক্ষ বা কোটি ই. ভো. হয়, তাহলে কেন্দ্রকীয় শক্তি কত প্রচণ্ড। জগতের আর কোন্ শক্তি তার তুল্য?

কিন্তু আসলে কেন্দ্রকীয় কণিকা বলতে ঐ প্রোটন বা নিউট্রনই। ওরা পরস্পর-রূপান্তরশীল। তাই কল্পনা করা যেতে পারে যে, একজাতীয় মূল কণিকা থেকেই ওদের উভয়েরই উৎপত্তি। বিজ্ঞানীরা সেই মূল কণিকার নামকরণ করেছেন কেন্দ্রক-কণিকা বা নিউক্লিয়ন। সুতরাং কেন্দ্রকীয় কণিকা মূলত একমাত্র নিউক্লিয়নই। ওদের মধ্যে পার্থক্য শুধু এই যে ওদের কতকগুলি ধনাত্মক (প্রোটন) এবং বাকিগুলি নিরপেক্ষ ও ঈষৎ-বর্ধিত ভরযুক্ত (নিউট্রন)। কিন্তু ওদের ক্রিয়াক্ষেত্রটি এত ক্ষুদ্র যে সে ক্রিয়াশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তি বলা যায়না। কারণ বিদ্যুৎশক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধীয় কুলমের প্রাথমিক নিয়মটিই (পৃ. ২৩৮) সেখানে অচল হয়ে পড়ে। তাছাড়া ৩×১০^{-১৩} সে. মি. দূরে তার কোনো প্রভাবই আর থাকেনা (তুলনীয়,পৃ. ২৩৯-৪০)। ওদিকে কণিকাগুলিও এতই ক্ষুদ্র যে ওদের ওপরে ভারাবর্তন (gravitation) শক্তিও কাজ করছে বলা চলেনা। সুতরাং কেন্দ্রকস্থ কণিকাগুলির ঐ শক্তিকে একমাত্র কেন্দ্রকীয় শক্তি ছাড়া আর কিছু বলা যায়না। অর্থাৎ এ-শক্তি যেন আর কোনো এক পার্থিব তৃতীয় শক্তি; প্রচণ্ডতায় তুলনাহীন। অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যাসের এক একটি কণিকা যেন এক একটি ঘূর্ণিপাকের কেন্দ্রে বসে লাটিমের মত ঘুরপাক খাচ্ছে। স্মরদিনস্কি দেখেছেন প্রোটনের ব্যাস আসলে তার আভ্যন্তরীণ শক্তির ক্রিয়া-ক্ষেত্রের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। কিন্তু এদের ঐ যে ঘূর্ণি, সামান্য একটু দূরেই সে ঘূর্ণিশক্তির কোনো প্রভাব থাকেনা। সেইজন্যই এরা অত আঁটসাঁট। কিন্তু যখন কোনো কণিকা কেন্দ্রক থেকে দূরে চলে আসে তখন সে তার অস্তিত্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ঐ ঘূর্ণিটিকেও সঙ্গে নিয়ে আসে। সেজন্য পূর্বে কণিকাটিকে তার ঘূর্ণি থেকে পৃথকভাবে দেখে তার স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব ছিলনা। তার ফলে ঘূর্ণি সমেত ঐ কণিকা বা প্রোটনটিকেই প্রোটনের আসল অবয়ব বলে মনে হত।

কিন্তু উপরোক্ত অমিতশক্তি প্রভাবে যেসব পরমাণুর কেন্দ্রক যত সুদৃঢ় হয়, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরে তারই স্থায়িত্ব তত বেশি হয়। তাই এ জগতে সেই পরমাণুর

প্রচুর্যও তত বেশি হতে বাধ্য। দেখা গেছে, যাদের কেন্দ্রকে নিউট্রন এবং প্রোটনের সংখ্যা ২, ৮, ২০, ৫০ প্রভৃতির মত হয়, এ পৃথিবীর আবহাওয়ায় তাদেরই প্রাচুর্য বেশি। দু'টি নিউট্রন আর দু'টি প্রোটনের সংযোগে যে কেন্দ্রকটি গড়ে উঠে, তার দৃঢ়তাই সর্বাধিক। তার কারণ সম্ভবত এই যে, কেন্দ্রকীয় শক্তির বৈশিষ্ট্য বশত একটি কণিকার এই শক্তি কেবলমাত্র তার সন্নিহিত কণিকাগুলিতেই বর্তাতে পারে। তার চাইতে বেশি দূরে সে যায়না। তাই দু'টি প্রোটন এবং দু'টি নিউট্রন যুক্ত একটি জোটের মধ্যেই সে ঘটনার সম্ভাবনা সর্বাধিক। সেখানে কণিকাগুলির প্রত্যেকটিই অন্য সবগুলির সঙ্গে সংলগ্ন থাকতে পারে। তাই সেখানে ঐ শক্তির বিকাশও ঘটে সর্বাধিক। ফলে আল্‌ফা-কণিকা এত দৃঢবদ্ধ হয়। সেজন্য এই কণিকা-চতুষ্টয়কে কেন্দ্রকশক্তি সম্পৃক্ত (ভরপুর—পৃ. ২০৫) বলে ধরা হয়। হিলিয়াম-কেন্দ্রক এত সম্পৃক্ত যে একে যেমন ভাঙাও যায়না, তেমনি এর মধ্যে অন্য কোনো প্রোটন বা নিউট্রন কণিকাও কোনমতে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়না। তাই প্রকৃতির মধ্যে পাঁচ ভরের (অর্থাৎ পাঁচ প্রোটন-ভরের) কেন্দ্রক বিশিষ্ট কোনো পরমাণুও পাওয়া যায়না। সত্যিই কেন্দ্রকশক্তি এক অভিনব রহস্যময় শক্তি বটে। তার প্রচণ্ড শক্তির প্রভাবে এসে পৌঁছলে শুধু দু'টি নিউট্রন বা একটি প্রোটন-নিউট্রন যোট কেন, দু'টি প্রোটনও এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে।

কিন্তু আরও আশ্চর্য যে ওদের মধ্যে নিশ্চয় কিছু বিকর্ষণী শক্তিও কাজ করে চলেছে। নাহলে তো ওরা একত্র মিশে গিয়ে একসত্তা হয়ে উঠত। আবার ওদের মধ্যে আকর্ষণ আছে বলেই এক একটি কেন্দ্রক-কণিকার অবয়ব-পরিমাণ যা, তার বেশি দূরেও ওরা কেউ কাউকে পালিয়ে যেতে দিচ্ছেনা। অথচ মজার ব্যাপার এই যে, হাল্কা কেন্দ্রকগুলিতে মোটামুটিভাবে প্রত্যেকটি কণিকারই প্রত্যেকের উপর টান থাকায় ওদের মিলন-বন্ধন সুদৃঢ় হয়ে উঠে। হিলিয়াম-কেন্দ্রকে যেমন, প্রায় সকলেই সকলের গায়ে লেগে থাকায় সে এক দৃঢ়তম ও প্রায় অভেদ্য সত্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কণিকা চতুষ্টয়ের সম্পৃক্তাবস্থার মূল রহস্যই সম্ভবত এইখানে। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও কেন্দ্রক-দৃঢ়তার জন্য ঐ একই কারণ বশত সাধারণভাবে প্রোটন আর নিউট্রনের সংখ্যা সমান হওয়া চাই। তাতে মোটামুটিভাবে ওদের শক্তি আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যেই ব্যাপৃত হয়ে থাকে। তবে তখন আর ওদের মধ্যে তেমন বাড়তি তেজ থাকেনা। ফলে সামগ্রিকভাবে ঐ কেন্দ্রকগুলি তখন কমতেজী হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রোটন আর নিউট্রনের সংখ্যা-পরিমাণের মধ্যে যত পার্থক্য ঘটে, ততই বাড়তি কণিকাগুলির তেজ অনিযুক্ত থেকে যায়। সেই তেজের পক্ষে তখন বাইরের দিকে অন্য কোনও কাজে লেগে যাওয়ার সুযোগ ঘটে। ফলে ঐ সংখ্যা-পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য বাড়তে থাকলে সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রকের বহিঃপ্রকাশক বা অন্য কোনো বাইরের কাজে নিযুক্ত হওয়ার তেজও ক্রমাগত বেড়ে চলে। তখন আবার

স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই উচ্চতর তেজের কেন্দ্রক নিম্নতর তেজবিশিষ্ট কেন্দ্রকের দিকে নেমে আসতে চায়। স্বভাবতই, প্রোটনের সংখ্যা নিউট্রনের চাইতে বেশি হলে একটি প্রোটন একটি নিউট্রনে পরিবর্তিত হতে চায়। তখন প্রোটন থেকেই একটি পজিট্রন (পরে দ্রষ্টব্য)-কণিকা ছিটকে বেরিয়ে যায়। পক্ষান্তরে, কেন্দ্রকের মধ্যে নিউট্রনের সংখ্যা প্রোটনের চাইতে বেশি হলেও একটু ভিন্নভাবে ঐ একই প্রক্রিয়া ঘটতে থাকে। তখন নিউট্রন থেকেই বিটা-কণিকা ছিটকে যায়। হাল্কা উপাদানগুলিতে অর্থাৎ যেসব কেন্দ্রকে নিউক্লিয়নের সংখ্যা কম, সেগুলিতে প্রোটন আর নিউট্রনের সংখ্যা সমান হলেই বহিঃপ্রকাশক সামগ্রিক শক্তির বিশেষ বিকাশ ঘটতে পারেনা। কিন্তু ভারি উপাদানের ক্ষেত্রে অর্থাৎ কেন্দ্রকের নিউক্লিয়ন সংখ্যা বেশি হলে, প্রোটনাধিক্যবশত কেন্দ্রক মধ্যস্থ বিদ্যুৎশক্তি অধিকতর সক্রিয় হয়ে উঠে। দ্বৈতচরিত্র (কেন্দ্রকীয় আকর্ষণীশক্তি এবং বিদ্যুৎজনিত বিকর্ষণীশক্তি সমন্বিত) প্রোটনগুলির মধ্যে তখন বিকর্ষণী ক্রিয়াটি প্রবলতর হয়ে উঠে। সুতরাং সেক্ষেত্রে প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা সমান হলে কেন্দ্রক তত দৃঢ় হতে পারেনা। বরং সেখানে যদি নিউট্রনের সংখ্যা একটু বেশি হয় তাহলে কেন্দ্রকীয় শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় কেন্দ্রকের দৃঢ়ত্বও বর্ধিত হতে পারে। সুতরাং প্রোটনের সংখ্যা যত বাড়তে থাকে, কেন্দ্রকটিকে দৃঢ় রাখার জন্য ততই অধিকতরভাবে বাড়তি নিউট্রনের দরকার হয়। সেখানে প্রোটন-কণিকা কেন্দ্রকীয় আকর্ষণী এবং বৈদ্যুৎ বিকর্ষণী—এই দ্বৈতশক্তি সমন্বিত হলেও, নিউট্রন কণিকার একটিমাত্র শক্তি অর্থাৎ কেন্দ্রকীয় আকর্ষণী শক্তিটি বিদ্যমান থাকে। তার ফলে নিউট্রনের সংখ্যা অর্থাৎ কেন্দ্রকের আকর্ষণী শক্তিটি, প্রোটনজনিত কেন্দ্রকীয় বিকর্ষণী শক্তি অপেক্ষা অধিক হলে কেন্দ্রকের বিকর্ষণী শক্তিটি স্তব্ধ হয়ে থাকে। অবশ্য মনে রাখার দরকার যে, কেন্দ্রকীয় শক্তির বৈশিষ্ট্যবশত কেবল বিপরীতধর্মী নয়, সমধর্মার কণিকাগুলিও পরস্পরকে আকর্ষণ করতে পারে। অর্থাৎ একটি প্রোটন অন্য প্রোটনকে এবং একটি নিউট্রন অন্য নিউট্রনকে কাছে টেনে রাখে। তার ফলেও ঐ স্বল্প পরিসর ($১০^{-১৩}$ সে. মি.) কেন্দ্রক-জগতের মধ্যে যেন প্রোটনদের পারস্পরিক বিকর্ষণী প্রভাবটি প্রায় অবশ হয়ে থাকে এবং একটি প্রোটন অন্যটি থেকে অনিবার্যভাবেই ছুটে পালিয়ে যায়না। কতকটা যেমন, এক ফোঁটা জলের মধ্যে অকল্পনীয় সংখ্যার অণুবৃন্দের প্রত্যেকটির উপর ভারাবর্তনেরও (gravitation) পৃথক প্রভাবটি অবশ হয়ে থাকে, এবং অণুগুলি পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে, কেউ তার ভার সত্ত্বেও সন্নিহিত অণুটিকে ছেড়ে ছুটে পালাতে পারেনা। কিন্তু উত্তপ্ত করলে ঐ জলবিন্দুর অণুগুলির মতই কেন্দ্রকীয় কণিকাগুলিও একে একে উড়ে পালাতে থাকে। অবশ্য সেজন্য কোটি কোটি ডিগ্রীর উষ্ণতা দরকার হয়।

তবে ভারি উপাদানগুলির ক্ষেত্রে উপরোক্ত আকর্ষণী শক্তিটি খুব ব্যাপক হতে পারেনা।

কারণ ওখানে প্রত্যক্ষভাবে সকলের সঙ্গে সকলে যুক্ত থাকতে পারেনা। তাই যেন কয়েক জনের সঙ্গে কয়েক জনে, এভাবে পর পর সকলে এক বন্ধন-শৃঙ্খলে আটকা পড়ে থাকে। শুধু তাই নয়, একদিকের একটি প্রোটন কণিকা হয়ত অন্য দিকের একটি প্রোটন কণিকা থেকে এতটা দূরে পড়ে যায় যে, তখন ওদের জাতিগত বিদ্বেষটি সহজেই প্রকাশিত হয়ে উঠে। তখন ওরা পরস্পর পরস্পরকে দূরে ঠেলে ফেলতে চায়। কিন্তু অনেকের সঙ্গে একত্রে থেকে তারা এমন এক সামাজিক চক্রে পড়ে যায় যে, যা চায় তা তারা পায়না। কিন্তু তবুও তাদের নিঃশব্দ চুলোচুলি চলতে থাকে এবং কেন্দ্রক-কণিকার সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পায়, ততই তাদের সামাজিক মিলনশক্তির চাইতে ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারটিই বেড়ে যায়। তার ফলে কেন্দ্রক-বন্ধন ক্রমাগতই শিথিল হয়ে পড়ে। এরকম অবস্থায় কিছু কিছু কণিকা ভেঙে বেরিয়ে যেতে পারলেই মঙ্গল। যায়ও তাই। যায় কিন্তু সে অদ্ভুতভাবেই—তেজস্ক্রিয় রশ্মি হয়ে। তবে মাঝামাঝি-ভরের কেন্দ্রকেও যে এরকম তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিকিরণ ঘটে, তা কিন্তু এ রকমের স্বাভাবিক বিচ্ছুরণ নয়। বিজ্ঞানীরা বাইরে থেকে কেন্দ্রকের মধ্যে নিউট্রন-কণিকা ছুঁড়ে মারলে সেখানেও তখন এভাবে শক্তিসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বিকিরণের মারফতে সে-কেন্দ্রক টাল সামলাতে চায়। তার সুস্থির হওয়ার পথটি সেখানে এক প্রকার নয়, এবং বিকিরণান্তে কেন্দ্রকটিও সেখানে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসেনা। সুস্থির হওয়ার প্রবল প্রবণতা বশত অস্থির বেগে ইলেক্‌ট্রন আর গামাফোটন বিকিরণ করতে করতে শেষকালে ঐ কেন্দ্রকটি সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন কেন্দ্রকে পরিণত হয়ে সুস্থির হয়। এরকম প্রক্রিয়াকে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা বলা হয় (দ্র.—পরমাণুর পরিণাম)।

কিন্তু স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় প্রক্রিয়াতে যে প্রধানতই আল্‌ফা-কণিকার নির্গম ঘটে, তার কারণ কি? আল্‌ফা-কণিকা বা চতুষ্টয়-কণিকা একটি সর্বাধিক দৃঢ়বদ্ধ সংঘ। তার মধ্যে যে দু'টি প্রোটন এবং যে-দু'টি নিউট্রন থাকে, নিশ্চয় তাদের মধ্যে সর্বদাই লেন-দেন চলছে। ধরা যাক সেই প্রক্রিয়া বশত একটি নিউট্রন-কণিকা থেকে একটি ঋণাত্মক পাই-মেসন উঠে এসে তাকে প্রোটনে পরিণত করে তুলল। কিন্তু তারপরে ঐ মেসনটিও নিশ্চয় একটি প্রোটনকে একটি নিউট্রনে পরিণত করে তুলবে। কিন্তু এমন কি হতে পারে যে, সে তার নিজের চতুষ্টয়-সংঘ ছেড়ে পার্শ্ববর্তী অন্য একটি চতুষ্টয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে তার একটি নিউট্রনকে প্রোটনে পরিণত করে তুলবে? কিন্তু তাতে হবে কি? প্রথম চতুষ্টয়টিতে তিনটি নিউট্রন এবং একটি প্রোটন, এবং পরবর্তী চতুষ্টয়টিতে তিনটি প্রোটন এবং একটি নিউট্রন হয়ে যাবে। তাতেও বা কি হবে? হবে ডবল 'অপরাধ'। কেন? পাউলি-তত্ত্ব অনুযায়ী প্রোটন, নিউট্রন আর ইলেক্‌ট্রনের একই ঘূর্ণি। সুতরাং ইলেক্‌ট্রনের ক্ষেত্রে যেমন, এখানেও তেমনি। সে তত্ত্ব অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট তেজস্তরে একই পাকের একাধিক কণিকা অবস্থান করতে পারেনা (দ্র., ২৯৬-৯৭)। উক্ত চতুষ্টয়-কণিকার বিশেষ

সুদৃঢ়তার কারণ এই যে ওখানে দু'টি বিপরীত পাকের দু'টি প্রোটন একই নিম্নতম তেজস্তরে বর্তমান থাকে। এবং সেইটিই আবার নিউট্রনদ্বয়েরও তেজস্তর। কারণ, কখনও সেখানে চারটি আধানাত্মক কণিকা একত্র থাকছেনা। প্রতি মুহূর্তেই একটি প্রোটন এবং একটি নিউট্রন বাস্তবিকই যেন দু'টি ভিন্ন কণিকা হয়ে উঠায় সর্বদাই আধানাত্মক কণিকার সংখ্যা দুই থেকে যাচ্ছে। কিন্তু যদি চতুষ্টয়টিতে তিনটি প্রোটন বিদ্যমান হয় তাহলে তাদের একটিকে নিশ্চয় অন্য দু'টি বিপরীত পাকবিশিষ্ট প্রোটনের সাধারণ তেজ-ক্ষেত্রের উপরের কোনো তেজস্তরে উঠে যেতেই হবে। এর অর্থ, তখন তাহলে তার নিজস্ব তেজটি বেশি হয়ে যাওয়ার জন্য তার যোটন-তেজটিও কমে যেতে বাধ্য। কারণ, একটি মুক্ত কণিকার নিজস্ব সুনির্দিষ্ট তেজপরিমাণ থেকেই কিছু অংশ ক্ষয়ে গিয়ে সেইটি তার বদ্ধ অবস্থার যোটন-তেজে পরিণত হয়ে যায়। সুতরাং বদ্ধ অবস্থায় নিজস্ব তেজ আর যোটন-তেজের একটি বেড়ে গেলে অন্যটিকে কমে যেতেই হয়। এক্ষেত্রে যোটন-তেজটি কমে গেলে চতুষ্টয়-কণিকার দৃঢবদ্ধতাও তাই না কমে গিয়ে পারেনা।

কিন্তু কেন্দ্রক-কণিকারা নিম্নতেজস্তরে থেকে সুস্থির থাকতেই চায়। এবং অপরাধও তারা করতে চায়না। বরং তারা যেমনকে মুক্ত করে পার্শ্ববর্তী চতুষ্টয়গুলির সঙ্গে যোগ রক্ষা করে,—অবশ্যই পাউলি-তত্ত্বকে অস্বীকার করে নয়। কিন্তু ভারী কেন্দ্রকের মধ্যে চতুষ্টয়ের সংখ্যা খুব বেশি বেড়ে গেলে ঐ যোগাযোগ ব্যবস্থা সুকঠিন হয়ে উঠে। ভারি বা বৃহৎ বৃহৎ কেন্দ্রকের বহির্ভাগ বা বহিস্তলের (একেবারে বাইরের বা ওপরের তলের অন্তর্গত) কণিকাগুলির পক্ষে সংলগ্ন অল্পতর সংখ্যক কণিকার সঙ্গে ভাব জমান ছাড়া উপায় থাকেনা। তাই সীমান্ত কণিকাগুলি বহিঃসীমাতল বরাবর ঐ রকম সব চতুষ্টয় গঠন করে নিতে বাধ্য হয়। তাতে কেন্দ্রকের কাঠামো বা বহিরাকৃতিটিও বেশ দৃঢ় থাকে। অবশ্য এই দৃঢ়তার কারণেই আবার ব্যক্তিগতভাবে ওদের নিজেদের তেজস্তর খুব নিম্ন থাকায় কেন্দ্রক-তেজও ওদেরকে আর তেমনভাবে টেনে ধরতে চায়না। সে তেজ বরং ধরে রাখতে পারে, যারা নিজেদের তেজ দিয়ে কেন্দ্রককেও আঁকড়ে ধরতে পারে সেইসব বিচ্ছিন্ন কণিকাকে। কিন্তু কে জানে, হয়ত এইসব কারণের জন্যই তেজস্ক্রিয় ক্ষোরণের মাধ্যমে কেন্দ্রক-সাম্য রক্ষার দিনে ঐ বহির্মহলের চতুষ্টয়-অধিবাসীবৃন্দেরই সর্বপ্রথম আত্মাহুতির আহ্বান আসে।

কেন্দ্রকের চতুষ্টয়-কণিকার দু'টি বিপরীত পাকের প্রোটন-জোড় এবং নিউট্রন-জোড় একই তেজস্তরে বিদ্যমান থাকে। পরবর্তী আর একটি চতুষ্টয় হয়ত আর একটি উচ্চ তেজস্তর নিয়ে থাকে এবং তৃতীয়টি হয়ত কোনো উচ্চতর তৃতীয় তেজস্তর বিশিষ্ট। এভাবে ভারী কেন্দ্রকগুলির তেজস্তর ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং তার ভঙ্গিটিও অনেকটা বিভিন্ন তেজস্তর যুক্ত বিভিন্ন থাপওয়ালা ইলেকট্রন-কাঠামোটির মতই হয়ে যায়। প্রোটন

নিউট্রন সংখ্যার কম বেশি হলে, বা তাদের মোট সংখ্যাটি চার সংখ্যাটির দ্বারা বিভাজ্য না হলে নিশ্চয় কোনো কোনো কেন্দ্রকে চতুষ্টয়গুলি সব পূর্ণ হয়ে উঠতে না পারায়, অপূর্ণ ইলেক্‌ট্রন-খাপের মত এখানেও কিছু কিছু অপূর্ণ তেজস্তর থেকে যায়; বাকিগুলি পূর্ণ, বদ্ধ ও সুদৃঢ় হয়ে উঠে। আবার ইলেক্‌ট্রন-খাপগুলির বিশেষ সমাবেশের জন্য ২, ১০, ১৮, ৩৬, ৫৪ এবং ৮৬—এই বিশিষ্ট সংখ্যার ইলেক্‌ট্রনযুক্ত পরমাণুগুলি নিষ্ক্রিয় বা সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে। সেইরূপ দৃঢ়তার জন্য ২, ৮, ২০, ৫০, ৮২ এবং ১২৬ সংখ্যার কেন্দ্রকগুলিও বিশিষ্ট হয়ে গেছে। প্রোটন ও নিউট্রনের এই সংখ্যাগুলি তাদের ঐ অপূর্ব বৈশিষ্ট্যের জন্য জাদু-সংখ্যা (magic numbers) নামে পরিগণিত হয়েছে।

কিন্তু ইলেক্‌ট্রন-কাঠামোর সঙ্গে কেন্দ্রকের এই সাদৃশ্য থেকে একটি বিষয়ের দিকে নজর না দিয়ে পারা যায়না। কেন্দ্রকের তেজ ঐভাবে স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকার জন্য ইলেকট্রন-খাপগুলির ইলেকট্রনমেঘ-বিনিময়ের মত ওখানেও কি কোনো রকমের তেজ-বিনিময় ঘটেনা—যার ফলে ফোটন-কণিকার বিনির্গম ঘটতে পারে? অবশ্য আমরা দেখেছি যে উত্তেজিত হয়ে উঠলে কোনো ইলেক্‌ট্রন-কণিকা ভিন্ন খাপে এসে পৌছানর পর যখন আবার সে তার স্বাভাবিক স্থির অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য তার পূর্ববর্তী নিজস্ব খাপের মধ্যে ফিরে যায়, কেবল তখনই সে ঐ ফোটন-কণিকা নিক্ষিপ্ত করে আসে। কিন্তু যখন কেন্দ্রক-সাম্যও বিচলিত হয়, তখন তো নিশ্চয় তারও ঐ উত্তেজনাময় অবস্থা। সেই সময়ে সেও তো সুস্থির অবস্থায় ফিরে যাওয়ার জন্য তার দেহ থেকে তেজস্ক্রিয় কণিকাবৃন্দকে উৎক্ষিপ্ত করে চলতে পারে। যতদূর মনে হয় ঐ সব কণিকা নিঃসরণের ফলে যদিও নতুন কেন্দ্রকটি সুদৃঢ় হতে থাকে, তবুও তাতে ঠিক সুনির্দিষ্ট স্থিরতা আসতে পারেনা বলে সে তার কণিকা-দেহ থেকেও মাপ মত কিছু কিছু গামারশ্মি ক্ষইয়ে দেয়। তাহলে তো সন্দেহ থাকেনা যে, কোনও কারণে উচ্চস্তরে আগত উত্তেজিত অবস্থা থেকে কেন্দ্রকটি যখন নিম্নতর সুস্থির অবস্থায় ফিরে যায় তখনই তার দেহ-কণিকা থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মির গামা অংশটির উদ্ভব ঘটে। গামারশ্মির বর্ণালিতেও নির্দিষ্ট সব তেজের ভিন্ন ভিন্ন রেখা থেকে গামা-ফোটনের পরিচয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। বৈদ্যুৎ শক্তির চাইতে কেন্দ্রকীয় শক্তি লক্ষ লক্ষ গুণ জোরাল বলেই আলোর ফোটনের চাইতে গামা-ফোটনও লক্ষ লক্ষ গুণ জোরাল হয়। তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যও তাই লক্ষ লক্ষ গুণ ক্ষুদ্র হয়ে যায়। বর্ণালিতেও তারই পরিচয় সুস্পষ্টভাবে লিখিত হতে থাকে। কেন্দ্রকের বাড়তি উত্তেজনা-তেজ কোনো কোনো সময় আবার ইলেক্‌ট্রন-মেঘলোকে এসে পৌছে তাকে মুহুর্মুহু কম্পিত করে তুলে। কাঠামোটি টিকে রইলেও কোনো কোনো ইলেক্‌ট্রন ভীমবেগে প্রধাবিত হয়। এরই নাম আভ্যন্তরীণ রূপান্তর (internal inversion)।

কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে আবার কেন্দ্রক সম্পর্কে এই খাপের তুলনাটি ঠিক যুক্তসই

হয়না। বিশেষ করে ভারি কেন্দ্রকের ক্ষেত্রে। তাদের কেন্দ্রক-কণিকারা দলবদ্ধভাবে কোনো কেন্দ্রবিন্দুকে ঘিরে থাকেনা। তাদের খাপ বা তদন্তর্গত কণিকা সংখ্যারও কোনো নির্দিষ্টতা নাই। তাছাড়া কেন্দ্রক-কণিকাগুলিও সব এক জাতের নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিজ্ঞানীরা কেন্দ্রকগুলিকে অনেকটা জলবিন্দুর মত (পৃ. ৩১৯) বলে মনে করেছেন। তার কারণ, জলবিন্দুর মত তার কণিকাগুলি সর্বদাই বিক্ষিপ্ত চঞ্চল চলমান। সীমাবদ্ধ, কিন্তু সে সীমা তরল আর পরিবর্তনশীল, অথচ বেশ টান টান। জলবিন্দুর অন্তর্গত কণিকাগুলির মত কেন্দ্রক-কণিকাগুলি তার মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণে বাঁধা হয়ে থাকে, পরিবেশ-প্রভাবে ভেঙে পড়েনা। বন্ধনটি অবশ্য বেশি, আর ভরও। কেন্দ্রকটি একটি সত্যিকারের জলবিন্দুর আকৃতিবিশিষ্ট হলে তার ওজন হত কোটি খানিক টন। সুতরাং জলবিন্দুর চাইতে তার ঘনত্বও অবশ্য কোটি কোটি গুণ বেশি।

কিন্তু তবুও আর একদিক থেকেও তুলনা চলবে। সরু কাচদণ্ডে এক ফোঁটা পারা নিয়ে ঝাঁকানি দিলে কি হয়? সর্বাঙ্গে কাঁপন জাগে, তল-তরঙ্গ মেতে ওঠে, টলমল করে। শেষে ওর গায়ে আঘাত দিলে কয়েকটি খণ্ডে ভেঙে গিয়ে সেগুলি থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে গড়িয়ে পড়ে। এসব ভেবে বোর আর ফ্রেঙ্কেল পৃথকভাবেই অনুমান করলেন যে, নিউট্রন-কণিকা দিয়ে কেন্দ্রককে আঘাত করা হলে তার ভাগ্যেও ঐ দশা ঘটে। নিউট্রন-কণিকা দিয়ে আঘাত করার সুবিধে এই যে, প্রোটন-কণিকার মত সে তার ইলেক্‌ট্রন দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে আটকে পড়বেনা, বা কেন্দ্রকের কাছে গিয়ে পৌঁছলে কেন্দ্রকের প্রোটন দলের সমবেত বিকর্ষণী প্রভাব দ্বারা প্রচণ্ডভাবে মার খেয়ে সরে পড়বেনা। কিন্তু নিউট্রন গিয়ে যুক্ত হলে কেন্দ্রকটি যে অতিভার সহ্য করতে না পেরে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে, তা মোটেই নয়। ২৩৫-ভরের ইউরেনিয়ামের কথাই ধরা যাক না কেন। প্রকৃতিতে যখন ইউ-২৩৮ প্রচুর পরিমাণেই বিদ্যমান, তখন বেশ বোঝা যায় যে, ইউ-২৩৫-এর কেন্দ্রকের মধ্যে আরও তিনটি নিউট্রনকে অতি সহজেই খাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং আর একটিমাত্র নিউট্রনের ভর যোগ হলে তার আদৌ ভেঙে পড়ার কথা নয়। তাছাড়া নিক্ষিপ্ত নিউট্রনটিকেও যে খুব বেগবান হতে হয় তাও মোটেই নয়। বরং তাকে খুব লঘুগতির হতেই হয় (পৃ. ৩১২)। কেন্দ্রকের সুস্থিত অবস্থা এবং উত্তেজিত অবস্থার মধ্যে যতটুকু তেজ-পার্থক্য, সেই তেজের অনুরূপ গতিবেগ সমন্বিত একটি নিউট্রন গিয়ে তার তেজটি দিয়ে কেন্দ্রকটিকে উত্তেজিত অবস্থায় তুলে দিলেই কাজ সারা হয়ে যায়। কিন্তু হাল্কা কেন্দ্রকের ক্ষেত্রে যে অভিপ্রেত ফল পাওয়া যায়না তার কারণ, উত্তেজিত অবস্থায় এসে কেন্দ্রকটি সাধারণ তেজস্ক্রিয় পদ্ধতির দ্বারা স্থির অবস্থায় ফিরে আসতে আরম্ভ করে। কিন্তু ইউ-২৩৫-এর কেন্দ্রক খুব বড় আর ভারী হওয়ার জন্য পূর্ববর্ণিত কারণে (পৃ. ৩২১) ব্যক্তিগত কণিকাগুলির পরিবর্তে সেখান থেকে কেন্দ্রকের চতুষ্টয়-কণিকাগুলিই সহজে আগে বেরিয়ে

আসতে পারে। ইউ ২৩৫-এর ক্ষেত্রে কেন্দ্রকের টেনে রাখার ক্ষমতা কম বলে বড় বড় খণ্ডগুলির সামনে, ভেঙে বেরিয়ে আসার কোনো বিশেষ বাধাও (potential barrier) থাকেনা। উত্তেজিত হলে কেন্দ্রকটি পারদবিন্দুর মতই থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে কয়েকটি খণ্ডে ভেঙে যায়। বহিঃশক্তির প্রভাবে একটি অণুও অতি সহজেই পরমাণু সমষ্টিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে এইভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু একটি অণু থেকে পৃথকভাবে একটি ইলেক্‌ট্রন খসিয়ে আনা ঢের শক্ত কাজ,—যেজন্য রসায়ন প্রতিক্রিয়ায় অণুগুলি ইলেট্রনে বিচ্ছিন্ন হতে চায়না, অথচ পরমাণু বা আয়ন-সংঘে (radicals) বিভক্ত হয়ে যায়। এভাবে ইউ ২৩৫-কেন্দ্রক থেকে কণিকাগুলি বাষ্পীভবনের মত উড়ে বা উবে না গিয়ে কেন্দ্রকটি কয়েকটি বড় বড় খণ্ডে ভেঙে যায়। ইউ-২৩৮-এর ক্ষেত্রেও ঠিক এরকম ঘটে। কিন্তু সেখানে তার কেন্দ্রকের সুস্থির অবস্থা আর তার উত্তেজিত অবস্থার মধ্যে তেজপার্থক্য অনেক বেশি বলে কয়েক লক্ষ ইলেক্‌ট্রন-ভোল্ট্ তেজ লেগে যায়। তার জন্যে নিক্ষিপ্ত নিউট্রনকে বহুগুণ তেজযুক্ত অর্থাৎ গতিবান না হলে চলেনা।

কেন্দ্রক যত ভারি (অর্থাৎ অধিক সংখ্যক নিউক্লিয়ন-কণিকাযুক্ত) হয় তার দৃঢ়তাও তত কমে যায়। তবুও বাড়তি কণিকার ক্ষরণ ঘটিয়ে সুস্থির হয়ে ওঠার ব্যাপারে, সবচেয়ে ভারি যে উপাদান, সেই ইউরেনিয়ামেরও কোটি কোটি বছর লেগে যায়। অথচ ১৯৪০ খ্রী.-এ পদার্থবিদ্ ফ্লেরভ (Flerov) এবং পেত্‌র্ঝক (Petrzhak) জানালেন যে, নিউট্রন-নিক্ষেপণ ছাড়াও কেন্দ্রকের স্বতোবিভাজনও ঘটে। ইউরেনিয়ামের ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা প্রায় কিছুই না হলেও মানুষের হাতে গড়া ৯৮-সংখ্যক উপাদান ক্যালিফোর্ণিয়ামের পক্ষে সে সম্ভাবনার কাল কয়েকটি বছর মাত্র। তবে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, মানুষ যতই কৌশল অবলম্বন করুক না কেন, হাতে গড়া অ-প্রাকৃতিক উপাদানের সীমা ৯২ থেকে এগিয়ে গেলেও ১২০-তে গিয়ে থেমে যেতে বাধ্য; এ পৃথিবীতে ১২১-টি প্রোটনযুক্ত কেন্দ্রকের পক্ষে সত্তাবান্ হওয়া সম্ভব নয়। কেন্দ্রক-বিভাজন বিষয়ে কেন্দ্রকের প্রোটন সংখ্যাই প্রকৃতপক্ষে চূড়ান্ত হয়ে দাঁড়ায়। ১২১-টি প্রোটন একত্র হলে কেন্দ্রকের সীমান্ত প্রোটনগুলি পরস্পর থেকে এত দূরে পড়ে যাবে যে তাদের মাঝে আর কেন্দ্রকশক্তি কাজ চালাতে পারবেনা, নিউট্রনগুলিও তখন পেছনে তলিয়ে যাবে। বিদ্যুৎতেজের বিকর্ষণ-শক্তি তখন সেখানে প্রবল হয়ে উঠে প্রচণ্ড বেগে বিভিন্ন প্রোটন-সংঘ সহ কেন্দ্রকটিকে খণ্ডিত করে দেবে। এ থেকে কণিকাগুলির যুগল প্রতিক্রিয়া ছাড়াও তাদের সমবেত প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিও বুঝতে পারা যায়। কিন্তু কেন্দ্রককে তরল বিন্দুর মত ধরে নিলেই সেটি বেশ সুন্দর ভাবেই বোঝা যায়। অথচ ওদিকে তার মধ্যে থাপের কল্পনা করে নিলে তার স্থির ও শান্ত অবস্থার কথাটিও বেশ ভাল বোঝা যায়। আসলে দু'টি অনুমানই সত্য। সত্যকে কেবল বিভিন্ন দিক থেকে দেখে তার পূর্ণতর বা সমগ্র পরিচয়টি নেওয়ার চেষ্টা

করা মাত্র। এজন্য কিছুকাল পূর্বে নীল্‌স্‌ বোরের পুত্র খ্যাতনামা পদার্থবিদ্‌ ওগ বোর (Oge Bohr) একটি মিলিত বা মিশ্রিত মডেলের পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছেন।

কিন্তু ঐ নিউট্রনই আমাদের কাছে কেন্দ্রক সম্বন্ধে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য তথ্য এনে দিয়েছে। কেন্দ্রকের চাইতে ঘন বস্তু জগতে আর কিছু নাই। তার আকৃতি একটি পরমাণুর দশ-সহস্রাংশের এক ভাগের মত। অর্থাৎ অন্য বস্তুর তুলনায় তার ঘনত্ব প্রায় $১০^{১২}$ গুণ। সুতরাং ধরা হয়েছিল যে, একটি খুব দ্রুত-গতির নিউট্রনের পক্ষে কেন্দ্রক ভেদ করে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু প্রচণ্ড বিস্ময়ের বিষয় হলেও, কয়েক বছর আগে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঐ নিউট্রনই তরঙ্গধর্ম গ্রহণ করে কেন্দ্রক ভেদ করে চলে যায়। অথচ সেক্ষেত্রে কেন্দ্রকের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়াই ঘটেনা। অর্থাৎ কেন্দ্রক যেন আংশিকভাবে হলেও নিউট্রন-তরঙ্গের কাছে স্বচ্ছ পদার্থের ন্যায় আচরণ করে। অবশ্য কোনো কোনো নিউট্রন আবার কেন্দ্রক কর্তৃক শোষিত হয়ে যায়। সুতরাং কেন্দ্রকটি ওদের কাছে ঠিক যে পরিষ্কার কাচের মতই স্বচ্ছ, এ কথাও বলা যায়না। সে যেন অনেকটা মেঘলা কাচের ('cloudy' glass) মতই। এ কারণে কেন্দ্রককে একটি মেঘলা স্ফটিক-স্বচ্ছ বল (cloudy crystal ball) বলেই অনুমান করা হয়। বর্তমানে এ অনুমান আরও দৃঢ়ভিত্তিক হয়েছে। তবে ধরা হয় যে তার আকৃতিটি ঠিক গোলকাকৃতি নয়। সেটি ডিম্বাকৃতি।

পরমাণুর পারে

শতাব্দীর প্রান্তে বসে কুরি দম্পতী যখন পরমাণুর অন্তঃপুরে প্রবেশের পথ খুঁজছিলেন, তখনই বোধকরি পরমাণুপারের অশ্রুত কল্লোল বিজ্ঞানীর শ্রবণ দুয়ারে এসে তাঁদের জাগাতে চাইছিল। বিজ্ঞানী তা শুনতে পেয়েছিলেন কিনা কে জানে! কিন্তু স্বতোদীপ্তিমান পদার্থের তেজসঞ্চারণকে চোখ দিয়ে দেখবার জন্য তাঁরা যে যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন তাতেই সেই দূর জগতের অজানা তরঙ্গ এসে মৃদু মৃদু আঘাত করে যাচ্ছিল। তাঁদের সেই আধান নির্দেশক ইলেক্‌ট্রোস্কোপ যন্ত্রটিতে স্পন্দন জাগছিল। কিন্তু এত মৃদু সে কম্পন যে তখন সে-ঘটনা তাঁদের অজ্ঞাতেই থেকে গেল। ঐ যন্ত্রকে বিদ্যুদাহিত করলে তার স্বর্ণপত্রদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়। কাছে আনা তেজস্ক্রিয় বস্তুর তেজকণিকা তার মধ্যবর্তী বায়ুকে তখন আয়নায়িত করে তুলে। তার ফলে পত্রদ্বয় আধানহীন হয়ে ভারাবর্তন বশত নিচের দিকে ঝুঁকে পরস্পরের কাছে এসে সেই ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয় (পৃ. ১৯২)—আর তখনই জানা হয়ে যায়, কাছে আনা ঐ বস্তুটি সত্যিই তেজস্ক্রিয়। এই ছিল মেরি কুরির তেজস্ক্রিয় বস্তুর ক্রিয়মাণতা লক্ষ্য করে সে বস্তুর স্বরূপ চিনে নেওয়ার মূল নীতি। কিন্তু ক্রমে ধরা পড়ল, ও-রকমের কোনো তেজস্ক্রিয় বস্তুকে কাছে না আনলেও স্বর্ণপত্রের ব্যবধান আপনা-আপনিই ঘুচে যায়। তবে সে ঘটনা অত্যন্ত ধীর গতিতে ঘটে থাকে।

তাহলে কি খুব সামান্যভাবে হলেও তেজস্ক্রিয় কণিকারা আকাশে ছড়িয়ে থাকে? আর তাদের থেকে অতি সূক্ষ্ম গামারশ্মি বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে? তাদের স্পর্শে বাতাস আয়নায়িত হয়, স্বর্ণপত্রের আধান ছুটে যায়, ব্যবধান ঘুচে যায়? অনুসন্ধান চলতে লাগল। ১৯১০-খ্রী. নাগাৎ ধরা পড়ল যে, পৃথিবী থেকে দূরে সরে গেলে গামার ঐ আয়নায়ন ক্ষমতা কমে যায়। তখন আধান-মাপক যন্ত্রের আধান-কৃশায়ন হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু বছর দু'য়ের মধ্যেই অন্য ঘটনাও প্রত্যক্ষীভূত হল। জার্মান পদার্থবিদ্ হেস (Victor F. Hess) প্রায় বার দশেক বেলুনে উড়ে দেখলেন যে, একটু বেশি দূরে গিয়ে পৌঁছলেই আবার আয়নায়ন বাড়তে থাকে। পৃথিবীর উপরে যেকোনো দিক ধরে উড়ে গেলে এই একই ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং বোঝা গেল, ঐ গামারশ্মিরা কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আসেনা। পৃথিবীর সর্বদিক থেকেই ওরা ধেয়ে আসছে, দিনরাত সর্বক্ষণই অবিরতভাবে। হেস ঐ রশ্মির নাম দিলেন মহাজাগতিক রশ্মি (cosmic ray)। তিনি অনুমান সিদ্ধান্ত করলেন যে, মহাজগৎ থেকে পৃথিবীতে ঝরে পড়ার সময়ই পার্থিব বায়ুপরিমণ্ডলটি পেরিয়ে আসতে আসতে সে রশ্মিধারাও অনেকাংশে কৃশায়িত হয়ে পড়ে।

মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে রীতিমত গবেষণা চলল। সমুদ্রের গভীর তলদেশে পরীক্ষা হল। আকাশের বিভিন্ন উচ্চতায় ভাল করে ওর প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। নতুন নতুন সংবাদ এসে পৌছতে লাগল। দেখা গেল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২২ কিলোমিটার উঁচুতে ওর আয়নায়ন ক্ষমতা সর্বাধিক। তারপর সে ক্ষমতা একটু হ্রাস পায়, কিন্তু ৫০ কি. মি. পেরিয়ে গেলে ওর আর পরিবর্তন দেখা যায়না। আরও জানা গেল যে, একই ক্ষেত্রফল যুক্ত তলের উপর একই ওজনের যে কোনো বস্তু যতটা উঁচু হয়ে দাঁড়াতে পারে, মহাজাগতিক রশ্মি সেই উচ্চতাকে ভেদ করার সময় ঐ সকল প্রকার বস্তু দ্বারাই সমান পরিমাণে শোষিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য যে, উচ্চ ক্ষমতা যুক্ত সকল প্রকার রশ্মির, এমন কি গাম-রশ্মির চাইতেও এ রশ্মি কম পরিমাণে শোষিত হয়। তাহলে তো বিজ্ঞানীর জানা সকল প্রকার রশ্মির মধ্যে এর তেজটিই সর্বাধিক! যদি এর গড়নটিকে গামারশ্মির মতই ধরে নেওয়া যায়, তাহলে এর এক একটি তেজ-সংঘ বা তেজ-পরিমাণের (quantum) মান হবে প্রায় ৩×১০৭ (তিন কোটি) ই. ভো.। বিপুল শক্তি! বিজ্ঞানী হিসাব করে দেখলেন, চারটি প্রোটন আর দু'টি ইলেকট্রন দিয়ে হিলিয়াম-কেন্দ্রক গঠনেরও তেজ ঠিক এই রকম। পদার্থবিদ মিলিকান (Robert A. Milikan—1868-1953) অনুমান করলেন পৃথিবীর চার দিক ঘিরে দূর আকাশে হিলিয়াম-কেন্দ্রকের উৎপাদন চলছে। তারই ফলে ঐ বিপুল পরিমাণ বিপুলতেজা মহাজাগতিক রশ্মিও ছাড়া পেয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

বোটে এবং কোলহর্স্টারের (Werner Kolhörster) পরীক্ষার পর কিন্তু এ মত পরিত্যক্ত হয়। গাইগার-মূলার গণকযন্ত্র দিয়েই ওঁরা ঐ রশ্মির তেজ-পরিচয় পেতে চাইলেন। দুটি গণক-যন্ত্রকে এমনভাবে ওপর নীচ করে বসান হল, যেন তাদের মধ্যে ভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন বেধবিশিষ্ট পাত ঢুকিয়ে রাখা যায়। ঐ পাত সহ যন্ত্র দু'টিকে একত্রে খুব পুরু লোহা এবং তারপর সর্বশুদ্ধ খুব পুরু সীসার চাদর দিয়ে এমন ভাবে ঢেকে দেওয়া হল যেন বাইরের কোনো তেজস্ক্রিয় রশ্মি ওর মধ্যে ঢুকতে না পারে। এমন ব্যবস্থা রাখা হল, যার দ্বারা দু'টি গণক যন্ত্রের হিসাবই এক সঙ্গে ধরা হয়ে যায়। যন্ত্রদ্বয়ের মধ্যে বহুবার বহু প্রকারের শোষক পদার্থ রেখেও দেখা গেল যে, যন্ত্রদ্বয়ের উপর যেন যুগপৎ একটি মহাজাগতিক কণিকার প্রভাব গিয়ে পড়ছে। এ রশ্মির গড়ন যদি এক্স্-রশ্মির মত হত, তাহলে ত এ রকম হতে পারতনা। এক্স্-রশ্মির প্রত্যেকটি তেজপরিমাণ একটি করে বিপুল তেজবিশিষ্ট ইলেকট্রন উৎপন্ন করতে পারে। কিন্তু সেই দ্বৈতীয়িক বা পরবর্তী উৎপন্ন দ্রুতগতি কণিকাগুলি (fast electrons—পৃ. ৩১০) কখনও একেবারে একই সঙ্গে দু'টি গণক যন্ত্রের উপর পদক্ষেপ করতে পারেনা। একই তেজ বিশিষ্ট একটি মাত্র প্রাথমিক কণিকা বা ইলেকট্রনের পক্ষেই তা সম্ভব হতে পারে।

সুতরাং ঐ রকমের কণিকা মহাজাগতিক রশ্মির ধাক্কা খেয়ে গণক-যন্ত্রের গাত্র থেকে উদ্ভূত কোনও দ্বৈতীয়িক কণিকা হতে পারেনা; সুতরাং ধরে নিতে হয়, ঐ নবাবিষ্কৃত রশ্মির দেহটিই প্রচণ্ড বেগবান এমন সব আধান-কণিকা দিয়ে গড়া, যারা ৪'১ সে. মি. বেধের সোনার পাতকেও ভেদ করে গিয়ে দু'টি গণক-যন্ত্রের মধ্যেই যুগপৎ প্রবেশ করতে পারে। কণিকাগুলি যন্ত্রদ্বয়ের মধ্যে আয়নায়ন চালায় এবং তাদের কৃশায়ন চলতে থাকে। কিন্তু দেখা গেল যে সেই কৃশায়ন হার, আর ঐ মহাজাগতিক রশ্মির পূর্ব নির্ধারিত শোষণ পরিমাণের হার একই। বিজ্ঞানীদ্বয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, রশ্মিদেহ আধানযুক্ত কণিকা দিয়ে গঠিত। সে কণিকার তেজ ১০⁸ (দশ কোটি) ই. ভো.-এর চাইতেও বেশি। বিজ্ঞানী রসি (Rossi) যখন তিনটি গণক-যন্ত্রের সাহায্যে এ পরীক্ষা আরও ভালভাবে করে দেখলেন, তখন আর এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইলনা। কিন্তু তাঁর গবেষণার ফলে আরও একটি নূতন তথ্য জানা গেল যে, মহাজাগতিক রশ্মি সমসত্ত্বদেহ (homogeneous) নয়। এটি দ্বৈতাঙ্গ। কোমলাঙ্গটি ৫ থেকে ১০ সে. মি. সীসার মধ্যে শোষিত হলেও অন্য অঙ্গটি বেশ কঠোর। ১০ সে. মি. সীসার মধ্যে পড়লেও তার বড় একটা এসে যায়না। তার তেজ $১০^৯$ (১০০ কোটি) ই. ভো.-এর বেশি।

রুশ বিজ্ঞানী স্কোবেল্ৎসিনের (D. V. Skobeltsyn) পরীক্ষা থেকে ব্যাপারটি বাস্তবভাবেই সমর্থিত হল। জানা ছিল যে, চৌম্বক ক্ষেত্রে পড়লে ইলেক্ট্রনরা বৃত্ত-পথে চলতে থাকে এবং ওদের মধ্যে যার তেজ যত বেশি তার বৃত্তের ব্যাসার্ধও তত বড় হয়ে উঠে। কিন্তু স্কোবেল্ন্ৎসিন চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যেই মেঘায়ন-কক্ষকে স্থাপন করে তার মধ্যে গামারশ্মির দ্বারা উৎপন্ন ইলেক্ট্রন পাঠিয়ে ছবি তুললেন। দেখা গেল যে, ইলেক্ট্রনগুলি সরলরেখা ধরে চলেছে। যেন তারা বাঁক নিতে চায়না। তিনি অনুমান করলেন যে, ইলেক্ট্রনগুলি সম্ভবত খুব উচ্চতেজ সম্পন্ন। তজ্জন্য তদঙ্কিত বৃত্তগুলি খুব বড় হয়ে উঠছে বলে স্বল্পপরিমিত জায়গায় তাদের পরিধি-অংশগুলি প্রায় সরল রেখার মতই দেখতে হয়েছে। তাছাড়া কণিকাগুলির আয়নায়ন নৈপুণ্য দেখলে ওদেরকে ইলেক্ট্রন বলেই মনে করতে হয়। শেষে তিনি নিপুণ প্রচেষ্টায় রেখাগুলির বাঁক মেপে স্থির করলেন যে, ইলেক্ট্রনগুলির এক একটির তেজ $১০^৯$ (১০০ কোটি) ই. ভো.-এর কম হবেনা। এক অকল্পনীয় তেজ! কিন্তু ওগুলি তাহলে নিশ্চয় তেজস্ক্রিয় বস্তুর গামারশ্মি জনিত নয়। কারণ সে-রশ্মির তেজ এত নয়। সুতরাং এবিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি তখন মেঘায়ন-কক্ষ থেকে তেজস্ক্রিয় সব বস্তু দূরে সরিয়ে ফেললেন এবং শূন্য কক্ষ থেকে ফটো নিতে লাগলেন। ইলেক্ট্রন জনিত মেঘরেখার মতই সব ছবি উঠতে থাকল। আশ্চর্যের বিষয় নিশ্চয়। কিন্তু আরও আশ্চর্য এই যে, একই সঙ্গে

দু'টি, তিনটি বা চারটি করে এমন সব রেখা পাওয়া গেল, যাদের পথচিহ্ন ধরে ক্রমশ পিছিয়ে এলে দেখা যায় যে, একটি মাত্র বিন্দু থেকেই তাদের উদ্ভব ঘটছে এবং সে বিন্দুটিও কক্ষ থেকে খুব দূরাবস্থিত নয়। অর্থাৎ কিনা মহাজাগতিক রশ্মির উৎপত্তি স্থল এই পৃথিবীই! তাহলে কি করে তাদের আর মহাজাগতিক বলা চলে? বা এমনও কি হতে পারে যে, মহাজাগতিক রশ্মি এসে ভূ-পৃষ্ঠের কোনো বস্তুকে আঘাত করার ফলে সেখান থেকে ও-রকম কণিকার উৎপত্তি ঘটছে! তাহলে গামারশ্মি জনিত ইলেক্‌ট্রনের চাইতে হাজার হাজার গুণ বেগ সম্পন্ন ঐ নূতন ইলেক্‌ট্রনগুলির উৎপাদন হচ্ছে এই পৃথিবীতেই! তা যদি হয়, তাহলে মূল মহাজাগতিক রশ্মিও তো গামারশ্মির চাইতে হাজার হাজার গুণ বেগবান! কিন্তু পরীক্ষা করে যখন আবার দেখা যাচ্ছে যে, ২২ কি. মি.-এর বেশি উচ্চতায় মহাজাগতিক রশ্মির আয়নায়ন ক্ষমতাটি নিম্নোচ্চ অঞ্চলের রশ্মির ঐ ক্ষমতার চাইতে কম, তখন অনুমান করা চলে যে ঐ রশ্মির কিয়দংশ জনিত ইলেক্‌ট্রন বা দ্বৈতীয়িক কণিকার জন্মও এ পৃথিবীতেই। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, মহাজাগতিক রশ্মিগুলি নিজেরাই ইলেক্‌ট্রনের মত আধানাত্মক কণিকা বলে ভূ-পৃষ্ঠে অন্য বস্তুর উপর পতিত হয়ে সেখান থেকে দ্বৈতীয়িক কণিকা বা ইলেক্‌ট্রন উৎপন্ন করে তুলে, এবং স্কোবেল্‌ৎসিনের তোলা ছবিগুলিতে হয়ত মূল মহাজাগতিক কণিকারই কিছু কিছু ছাপ পড়ে গিয়েছে।

পার্থিব পদার্থের সন্ধান করতে করতে বিজ্ঞানীর সামনে কোথা থেকে এক অপার্থিব মহাজাগতিক পদার্থসত্তা হঠাৎ এসে পৌছল! কে জানে, ঐ পদার্থ দিয়েই দূর নীহারিকা আর দূরতর নক্ষত্রপুঞ্জের দেহসম্ভার আবর্তিত হয়ে উঠছে কিনা! কিন্তু ওরা যে আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রহটিরও নিজের জিনিস নয় তা তো বোঝা যাচ্ছে। তবুও তো ওরা অবিরত ধেয়ে আসে, আর আমাদের এই ছোট্ট পৃথিবীর বা পার্থিব পদার্থের মিলন চায়। শুধু কি তাই? সে মিলনে কোথা দিয়ে কী যেন হয়ে যায়! দেখা দেয় এমন সব সত্তা, যাদেরকে চিনে নিতে এতটুকু কষ্ট হয়না—ওরা আমাদেরই। কিন্তু দূরদেশী অতিথির সঙ্গে সম্পর্কিত বলে ওরা কি একমাত্র-আমাদেরই নয়? তাহলে কি ভূপদার্থ আর মহাজাগতিক রশ্মির মিলনটিও দ্বন্দ্বাত্মক? পার্থিব আর অপার্থিব দু'টি ভিন্ন সত্তার দ্বন্দ্ব-মিলন? যার ফলে দূর বিশ্বের একত্ব, আর এ-পৃথিবীর বৈচিত্র্য সবই একই মহাসত্যে গ্রথিত হয়ে রয়েছে? এতদিনে আমরা তাহলে আমাদের প্রথম প্রশ্নটির (পৃ. ১) কাছে এসে হাজির হয়েছি। কিন্তু একই মহাসত্য যে সমগ্র বিশ্বসংসারকে গ্রথিত, বিধৃত করে রেখেছে,—একেও বা সে প্রশ্নের সমাধান বলে কি করে মেনে নিই? প্রথম প্রশ্ন থেকে ক্রমে ক্রমে যে মূল প্রশ্নটির উদ্ভব ঘটেছিল, ভর-তেজ বিষয়ক সে প্রশ্নটি কি তাহলে অহেতুক, অবান্তর? আর তা যদি না হয়ে থাকে তাহলে ঐ অপার্থিব

মহাজাগতিক রশ্মির আসল পরিচয়টিও আমাদের জেনে নিতেই হয়। বিজ্ঞানী সেই পথই অনুসরণ করে চললেন।

মূল মহাজাগতিক রশ্মির প্রকৃতিটি সত্যসত্যই আধানাত্মক কিনা জানা দরকার। কারণ, তা না হলে মেঘায়ন-কক্ষে ওর আয়নায়ন জনিত মেঘরেখা উৎপন্ন হচ্ছে কেমন করে? সুতরাং ঐ রশ্মির উপর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব দেখেই সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হয়। দেখা গেছে, কোনও আধান-কণিকা একটি শক্তিশালী চৌম্বক গোলকের নিকটবর্তী সংলগ্ন চৌম্বক ক্ষেত্রে এসে পৌঁছলে সে ঐ চুম্বকের মেরুর দিকেই বাঁক নিতে থাকে। পৃথিবী একটি বিরাট চৌম্বক গোলক। তার উপরের কোনো নির্দিষ্ট স্থানের চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি অবশ্য নগণ্য। কিন্তু পৃথিবীর উপরিস্থিত বিপুল উচ্চতাযুক্ত মোট চৌম্বক ক্ষেত্রটির কথা ধরলে বোঝা যায় যে, কোনও কণিকাকে যদি এই সারা পথটি পেরিয়ে পৃথিবীতে নেমে আসতে হয় তাহলে তার উপর পার্থিব চৌম্বক ক্ষেত্রের মোট প্রভাবটি বিপুলই হবে। কারণ চৌম্বক ক্ষেত্রে কোনো বিদ্যুৎ-কণিকার বিক্ষেপটি (দিক-পরিবর্তন) নির্ভর করে ক্ষেত্রের চৌম্বক শক্তি এবং কণিকার অতিক্রান্ত পথ, এই উভয়ের গুণফলের উপরই (তু.,পৃ. ১৮২-৮৩)। সুতরাং এ দু'টির একটি বৃদ্ধি পেলেই গুণফলটিও বেড়ে যায়। বর্তমান ক্ষেত্রে অতিক্রান্ত পথটি সুদীর্ঘ বলেই মহাজাগতিক রশ্মি যখন তার মধ্য দিয়ে নামতে থাকে তখন ভূ-গোলকের চৌম্বক প্রভাবে পড়ে সে নিশ্চয় বিশেষভাবেই বিক্ষিপ্ত হয়ে ভূ-মেরুর দিকে বাঁক নিয়ে সরে যায়। বহুবার বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখলেন, ভূমধ্য- বা বিষুব-রৈখিক অঞ্চলের চাইতে পৃথিবীর উত্তর বা দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে মহাজাগতিক বিকিরণের পরিমাণ ও গুরুত্ব (ঘনত্ব) অনেক বেশি। সুতরাং এ বিষয়ে আর সন্দেহ রইলনা যে, মহাজাগতিক রশ্মিরা নিজেরাই বৈদ্যুৎ পদার্থ এবং তজ্জন্য তাদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই স্কোবেল্‌ৎসিনের পরীক্ষাকালে মেঘায়ন-কক্ষে মেঘরেখা উৎপন্ন করেছে।

ঐসব রশ্মি-কণিকার সঠিক পরিচয় লাভ করবার জন্য কাঞ্জে (Kunze) এবং অ্যাণ্ডার্সন্ (Carl D. Anderson) একটি মস্ত বড় কুণ্ডলীর সাহায্যে প্রায় ২০, ২৫ হাজার ওর্স্টেডের এক বিপুল শক্তিমান চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে তার মধ্যে পূর্ববর্তী পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তাঁরা দেখলেন যে, যে-সব ইলেক্‌ট্রনের পথরেখার মধ্যে বক্রতা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলনা, তাদেরও বক্রতা ধরা পড়ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, কণিকাগুলির ভঙ্গি ইলেক্‌ট্রনের মত হলেও তাদের মাত্র কতকগুলি একদিকে বাঁক নিচ্ছে, অথচ অন্যগুলি যেন বিপরীত দিকেই ঘুরে যাচ্ছে। দু'রকম কণিকারই আয়নায়ন-ক্ষমতা এক হওয়া সত্ত্বেও ওঁরা মনে করলেন, পূর্বোক্তগুলি যদি ঋণাত্মক হয়ে থাকে, অন্যগুলি তাহলে ধনাত্মক,—সুতরাং প্রোটন। বক্রতা পরিমাপ করে দেখা গেল, ওদের সকলের তেজ কিন্তু এক নয়,—কারও প্রায় $১০^{৯}$ (১০০ কোটি) ই. ভো., কারও বা তার চাইতে

অনেক বেশি। অ্যাণ্ডারসন ব্যাপারটিকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলেন। তাঁর সন্দেহ হল যে প্রথমে কণিকাগুলির অভিমুখ ঠিক করতে না পারলে তো বোঝা যাবেনা, তাদের কে কোন্ দিকে বাঁক নিচ্ছে। কারণ, দু'টি ভিন্নধর্মী কণিকা যদি পরস্পর বিপরীত মুখে চলতে থাকে তাহলে ফটোর মধ্যে তাদের বাঁকগুলি তো একই দিকে মনে হবে! সুতরাং অভিমুখ ঠিক করাই এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু অ্যাণ্ডার্সন একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। মেঘায়ন-কক্ষের মধ্যে মহাজাগতিক রশ্মির পথে তিনি একটি পুরু (½ সে. মি.) সীসার পাত পেতে রাখলেন,—রশ্মির কিছু অংশ সীসার পাতে শোষিত হওয়ার পর যখন বিপরীত দিকে ফুঁড়ে বার হবে, তখন হ্রাসপ্রাপ্ত শক্তি নিয়ে সে নিশ্চয়ই পূর্বের চাইতে বেশি বেঁকে যাবে। সুতরাং তখন সীসার পাতের দু'দিকের দু'টি ছবির বক্রতা থেকে রশ্মিটির অভিমুখ, অর্থাৎ কোন্ দিক থেকে সে কোন্ দিকে ধাবিত হচ্ছে, তা জানা যাবে। রশ্মি দু'টি ভিন্নধর্মী কিনা, তাদের অভিমুখ অনুযায়ী তাহলে তাও ঠিক করে নেওয়া যাবে।
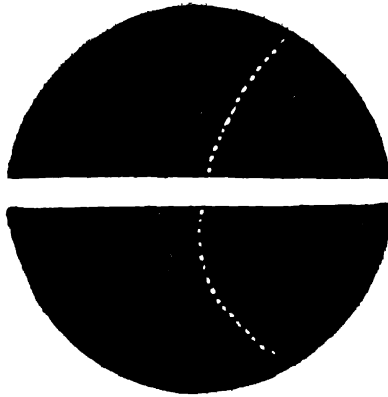
১৯৩২ খ্রী.-এ বাস্তবিকই ও রকমের একটি ছবি পাওয়া গেল। সীসকখণ্ডের দু'দিকে কম ও বেশি দু'রকমের বক্রতা ফুটে উঠল, কণিকাটির অভিমুখ সহজেই স্থির হয়ে গেল। চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি ও অভিমুখ তো আগেই জানা ছিল। হিসাব কষে জানা গেল কণিকাটি ধনাত্মক, অ্যাণ্ডার্সন্ প্রথমে ওটিকে প্রোটন বলেই মনে করলেন। তারপর কণিকাটির ভর এবং তদঙ্কিত বৃত্তের ব্যাসার্ধ এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের চৌম্বক শক্তির মাত্রা থেকে তুলনা করে বোঝা গেল যে ঐ কণিকা কিছুতেই প্রোটন হতে পারেনা। কারণ, তা যদি হত তাহলে সীসক ভেদ করে যাওয়ার পর তার তেজমাত্রা হতে পারত বড় জোর ৩×১০^{৫} (৩ লক্ষ) ই. ভো.। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ওটি হয়েছে ২৩×১০^{৬} (২ কোটি ৩০ লক্ষ) ই. ভো.। তাছাড়া প্রোটন হলে তার পাল্লা হয় বড় জোর ½ সে. মি.। কিন্তু আসলে হচ্ছে ১০ সে. মি.-এর চাইতেও বেশি। ঐ রকম তেজযুক্ত প্রোটনের

আয়নায়ন-ক্ষমতা প্রচণ্ড হওয়ায় পথরেখাটিও যথেষ্ট নিবিড় এবং স্থূল হয়ে উঠল। কিন্তু যে-মেঘরেখা দেখা গিয়েছে, আয়নায়ন ক্ষমতার দিক থেকে তা ইলেক্‌ট্রনেরই তুল্য। আয়নায়ন ক্ষমতা, বক্রতা দৈর্ঘ্য (length of its trajectory) এবং পরিক্রমা-বৃত্তের ব্যাসার্ধ প্রভৃতি ভাল করে তুলনা করে অ্যাণ্ডার্সন দেখলেন যে ঐ ধনাত্মক কণিকার ভরও প্রায় ইলেক্‌ট্রনেরই মত। সুতরাং তিনি এই নবাবিষ্কৃত কণিকার নামকরণ করলেন, ধনাত্মক ইলেক্‌ট্রন (positive electron) বা পজিট্রন। সীসার পাত ভেদ করার পূর্বে ওর তেজ ছিল ৬৩ × ১০^{৬} (৬ কোটি ৩০ লক্ষ) ই. ভো., ভেদ করার পর সেটি হয়ে দাঁড়াল ২৩ × ১০^{৬} (২ কোটি ৩০ লক্ষ) ই. ভো.।

ইলেক্‌ট্রনের বিপরীত-কণিকা হিসাবে পজিট্রনের আবিষ্কার হওয়াতে একটি বিশেষ তত্ত্ব সমর্থিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। প্ল্যাঙ্ক্, আইনস্টাইন প্রভৃতি বিজ্ঞানীর দৌলতে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদে পারিমাণিক বলবিদ্যা (Quantum Mechanics) বেশ জোরদার হয়ে উঠেছিল। ঐ পাদের একেবারে শেষ দিকে তরুণ বিজ্ঞানী ডিরাক (Paul Adrien Maurice Dirac—1902- ?) অভিমত প্রকাশ করলেন যে, অতি-কণিকার ক্ষেত্রে পদার্থবিদ্যার পুরাণো নিয়মকানুন কিছুটা কার্যকরী থাকলেও তার বহুবিধ নিয়মকানুনকে পরিবর্তন করে না নিলে নতুন বিদ্যা যথেষ্টভাবে ফলপ্রসূ হবেনা। ইতিপূর্বে কে কখন ভাবতে পেরেছিল যে, কোনো পার্থিব সত্তা প্রতি সেকেণ্ডে হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ কি. মি. গতিবেগ নিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে লক্ষ লক্ষ বার কক্ষ পরিক্রমা চালিয়ে যেতে পারে ? সুতরাং ঐ সব সত্তা বা অতি-কণিকার রীতি-নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভাবধারার পরিবর্তন করা দরকার। প্রাচীন পদার্থতত্ত্বকে আইনস্টাইনের আধুনিক তত্ত্ব বা আপেক্ষিকতাবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে পরিবর্তিত করে নিতে হবে।

সম্ভবত সেই কার্যে অগ্রসর হয়ে ডিরাক শ্রডিংগার-সমীকরণের উন্নতি বিধান করে ইলেক্‌ট্রনের গতিবেগের অভিমুখের তুলনায় তার ঘূর্ণির পরিমাপ করতে সমর্থ হলেন। কিন্তু তাঁর হিসাব মত তিনি মনে করলেন যে, ইতিবাচক ইলেক্‌ট্রনের মত নেতিবাচক তেজ-বিশিষ্ট ইলেক্‌ট্রন কণিকাও বিদ্যমান থাকতে বাধ্য। তার ভঙ্গি হবে আয়নাতে প্রতিফলিত ইলেক্‌ট্রনেরই প্রতিরূপ তুল্য। তবে সেই মুকুর (আয়না)-প্রতিফলিত ধনাত্মক ইলেক্‌ট্রনটি শূন্যের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে আছে। বলতে কি চাই, সমগ্র শূন্যই মুকুর-প্রতিসম ইলেক্‌ট্রন দিয়ে ভর্তি—একেবারে কানায় কানায়। কোনো যন্ত্রের সাহায্যে তাকে ধরা যায়না। কারণ, ঐ শূন্যটি এত ভরপুর যে, যন্ত্রপ্রভাবও সেখানে প্রবেশ করতে পারেনা। সারা বিশ্বই এভাবে সংখ্যাতীত তেজস্তরযুক্ত অসংখ্য ইলেক্‌ট্রনে ভরা। অবশ্য প্রত্যেক স্তরেই দু'-পাকের দু'টি করে ইলেক্‌ট্রন থাকতে পারে। তার বেশি না। তবে কোনো অচিন্ত্য কারণে

কোনো একটি ইলেক্‌ট্রন বিশেষ তেজ লাভ করে সেখান থেকে লাফ দিয়ে উঠে পড়লে সে তখন ইতিবাচক বা অস্তিত্বসম্পন্ন হয়ে উঠে। কিন্তু তখন তার পূর্ববর্তী অবস্থান-গর্তটি ঐ ইলেক্‌ট্রনের সম-মানের ধনাত্মক তেজযুক্ত হয়ে থেকে যায়। অর্থাৎ তখন শূন্যতাগত অস্তিত্বহীনতা থেকে ঐ ইলেক্‌ট্রনের এবং তার গর্তের,—এই উভয়েরই অস্তিত্ব প্রকট হয়। তারপর ইলেক্‌ট্রনটি মহাবিশ্ব পাড়ি দিয়ে শেষকালে আবার তার শূন্যতায় ফিরে আসে। অর্থাৎ সে তখন একটি গর্তের মধ্যে ঢুকে শূন্য হয়ে যায়। শূন্যতা থেকে যখন সে উঠেছিল, তখন সে নিশ্চয় প্রচণ্ড তেজ প্রাপ্ত হয়েছিল, নাহলে ঠাসা শূন্যতা থেকে সে লাফ দিয়ে উঠল কেমন করে! কিন্তু আবার শূন্যতায় লীন হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে সে সেই তেজটি ছেড়ে দেয়। সে তেজ তখন সর্বাধিক প্রচণ্ড তেজযুক্ত গামা-ফোটন হয়ে উড়ে যায়। ইলেক্‌ট্রন আর তার গর্তের পাক দু'টি দু'রকম বলেই কাটাকাটি করে তাদের মোট ভরবেগ শূন্য হয়ে যায়। সুতরাং গামা-ফোটনকেও দু'টি বিপরীত ভরবেগ বিশিষ্ট দু'টি কণিকায় পরিণত হয়ে যেতে হয়। তবে যদি ঘটনাস্থলে কোনো তৃতীয় সত্তা বিদ্যমান থাকে, তাহলে সে ঐ তেজের কিছুটা হরণ করে নিতে পারে। তখন একটি ফোটনই দেখা যাবে।

পজিট্রন আবিষ্কারের পর ঐ কল্পিত গর্তের সন্ধান মিলল। অর্থাৎ ঐ পজিট্রনই প্রথম আবিষ্কৃত বিষম বা বিপরীত অতিকণিকা। সুতরাং ডিরাক কল্পিত বিপরীত অতিকণিকার তত্ত্ব বা মুকুর-প্রতিসাম্য তত্ত্ব সম্ভাবনাযুক্ত হল। ধরা যেতে পারে যে ঐ গর্ত আর উদ্ভূত সত্তা,—ওদের যে কোনো একজনই ইলেক্‌ট্রন এবং অন্যজন পজিট্রন। কিন্তু একটি বিষয়ে সন্দেহ জাগল। তাহলে এ-বিশ্বে মোট ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা তো মোট পজিট্রন সংখ্যার সমান হবে। কিন্তু পজিট্রন কতই বা, সবই ইলেক্‌ট্রন দেখি কেন? উত্তর মিলে গেল, আমাদের এই ইলেক্‌ট্রনের পৃথিবীতে অত সব পজিট্রন এসে পাছে তাকে শূন্য করে ফেলে, সেজন্য দয়াময়ী প্রকৃতি সেগুলিকে বিশ্বের আর এক টেরে কোথাও সরিয়ে নিয়ে গিয়ে এই পৃথিবীর একটি মুকুর-প্রতিসম জগতের সৃষ্টিকার্যে লাগিয়ে দিয়েছেন,—এ রকম কল্পনা করে নিলেই তো গোল চুকে যায়। কিন্তু এ না হয় ইলেক্‌ট্রনের কথা গেল। প্রোটনাদি যেসব কণিকা আবিষ্কৃত হয়েছে, আর যারা এখনও হয়নি, তাদের বেলায় কি হবে? ইলেক্‌ট্রনের অসীম শূন্যতা, প্রোটনের অসীম শূন্যতা, নিউট্রনের অসীম শূন্যতা…!! আর প্রত্যেক শূন্যতা থেকে ঐ অচিন্ত্যভাবে উল্লম্ফন! অত সব কল্পনা অচিন্ত-নীয়ই বটে! মুকুর-প্রতিসম জগৎ নমস্কার গ্রহণ কর।

কিন্তু মানবিক চিন্তায় যা বোঝা গেল, তাতে জানা গেল যে, আর একটি নূতন পার্থিব পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেল। তবে ভাবগতিক দেখে অবশ্যই মনে হতে পারে, এভাবে তো আরও বহু পার্থিব কণিকার সন্ধান মিলে যেতে পারে। তাহলে কি পার্থিব উপাদান অসংখ্যই?—ইলেক্‌ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, পজিট্রন, ওরা সকলেই? ওদের বৈচিত্র্য দেখলে.

হয়ত সেই কথাই বলতে হয়। কিন্তু আমরা তো বার বারই লক্ষ্য করেছি যে ওদের যা কিছু বৈচিত্র্য, সবই ওদের ঐ ভর আর দুই ধরনের তেজের পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যেরই ফল মাত্র। সকলেরই মূল উপাদান ঐ ভর, আর দুই ধরনের দু'টি তেজ। সুতরাং ঐ ভর আর তেজদ্বয়কে মূল পার্থিব-উপাদান হিসাবেই ধরে রাখতে হয়। অথচ ঐ কণিকাগুলিও প্রকৃতির জগৎ থেকে এসে একে একে এমন ভাবে ধরা দিচ্ছে যে, অণু বা পরমাণুর মত ওদের গঠনের মধ্যে যে আর কোনো জটিলতা আছে, তাও আপাতত মনে হয়না। বিশেষত, পরমাণুর মত কণিকারা এক একটি 'সামগ্রিক সত্তা' হিসাবে নিজেদের 'নিশ্চল ভর'কে নিজে থেকেই তেজে পরিণত করে ফেলতে পারেনা। অথচ এই কণিকাগুলি কিন্তু তা পারে। সূর্য বা তেজস্ক্রিয় পদার্থের কেন্দ্রক থেকে যখন তেজ নিঃসৃত হতে থাকে তখন ভরটি ক্ষয়ে যায় প্রকৃতপক্ষে এদেরই। ওদিকে তেজ-কোয়াণ্টাম বা ফোটনরা কণিকাধর্মী হলেও তাদের কোনো নিশ্চল ভর নাই। সুতরাং একদিকে অণু, পরমাণু, আয়ন প্রভৃতি অন্য সব নশ্বর ও জটিল গঠনের কণিকা, এবং অন্য দিকে ফোটন রূপী তেজ-কণিকা,—এদের উভয়ের থেকেই প্রোটনাদি কণিকা যে বিশিষ্ট, তাতে সন্দেহ নাই। সে-সব বৈশিষ্ট্য দেখেই বিজ্ঞানীরা তাদের নামকরণ করলেন প্রাথমিক (priliminary) বা ঔপাদানিক (elementary) কণিকা। কারণ, ওরাই হয়ত প্রাকৃতিক জগতের প্রথম কণিকা ; ওদের দিয়েই আর সব পার্থিব বস্তু গঠিত হয় বলে ওরা এক বিশেষ অর্থেই ঔপাদানিক কণিকাও। নবাবিষ্কৃত পজিট্রনও এই রকমের একটি প্রাথমিক কণিকা।

১৯৩২ খ্রী.-এ অ্যাণ্ডার্সন পজিট্রন নামক নূতন পার্থিব কণিকাটির সন্ধান পেলেন। কিন্তু অচিরেই জানা গেল, সেটি যে কেবল মহাজাগতিক রশ্মির অন্তর্ভুক্ত হয়েই পৃথিবীতে এসে পৌচাচ্ছে তাই না। এই পৃথিবীতেও সে জন্মলাভ করছে। তেজস্ক্রিয় পদার্থের গামারশ্মি থেকেও তার উদ্ভব ঘটে। এক একটি তেজসংঘের তেজবত্তা ছাড়া গামা-রশ্মির সঙ্গে এক্স্-রশ্মির কোনো পার্থক্য না থাকায় বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, এক্স্-রশ্মি যে নিয়মে অন্য বস্তুর মধ্যে শোষিত হয়ে থাকে, সেই একই নিয়ম-কানুন ধরে গামা-রশ্মিও অন্য বস্তুতে শোষিত হয়। বস্তুত ১০^{৬} (১০ লক্ষ) ই. ভো-এর গামারশ্মির ক্ষেত্রেও এ অনুমানের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু আরও বেশি তেজসম্পন্ন রশ্মির বেলায় ঐ রীতির ভিন্নতা দেখা গেল। তখন উল্টোপাল্টা ব্যাপার দেখা দিল ;—তেজ বাড়ার সঙ্গে কোথায় তার ভেদ ক্ষমতা আরও বেড়ে যাবে, না হয় সে আরও অধিক পরিমাণে শোষিত হতে থাকে। তাছাড়া শোষক বস্তুর পারমাণবিক ওজন বাড়ার সঙ্গে দেখা যায় যে, বিশৃঙ্খলা যেন আরও বেড়ে চলেছে। কারণটি বোঝা গেল তখন, যখন ধরা পড়ল যে, বস্তুভেদ কালে গামা-রশ্মির কিছুটা অংশ পজিট্রনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ছবি দেখে

বোঝা গেল, চৌম্বক ক্ষেত্রে অবস্থিত মেঘায়ন-কক্ষের মধ্যবর্তী কোনো স্থানে পেতে রাখা সীসার পাতের উপর যখন রেডিয়াম C"-এর ২৬ × ১০^৫ (২৬ লক্ষ) ই. ভো. সমন্বিত গামা-রশ্মির বিকিরণ এসে পড়তে থাকে, তখন তার ফলে যে-সব কণিকার উদ্ভব ঘটে তারা পজিট্রনই। কিন্তু কতকগুলি ছবিতে আবার দেখা গেল যে, একই বিন্দু থেকে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক দু'টি কণিকারই উদ্ভব ঘটছে, এবং জন্মলাভের পর তারা দু'দিকে বাঁক নিয়ে চলে যাচ্ছে। তাদের আয়নায়ন ক্ষমতা থেকে জানা গেল যে তাদের ভরও একই, অর্থাৎ ইলেক্ট্রনের ভরের তুল্য। সুতরাং তারা যে গামা-রশ্মি থেকে উদ্ভূত এক জোড়া ইলেক্ট্রন-পজিট্রন, এ বিষয়ে আর সন্দেহ রইলনা। সন্দেহ রইলনা যে, গামা-রশ্মি থেকে ইলেক্ট্রনের অনিবার্য সঙ্গী হিসাবে এই পৃথিবীতেই পজিট্রন-কণিকারও উদ্ভব ঘটছে। এছাড়াও জানা গেল যে, ইলেক্ট্রন থেকেও পজিট্রনের উদ্ভব ঘটে।

যাই হোক, পথের বক্রতা ইত্যাদি মেপে দেখা গেল যে, উপরোক্ত যুগল কণিকার মোট তেজ প্রায় ১৬ × ১০^৫ (১৬ লক্ষ) ই. ভো.। এর সঙ্গে ওদের প্রত্যেকের ভর জনিত ব্যক্তিগত তেজ প্রায় ৫ × ১০^৫ (৫ লক্ষ) ই. ভো., অর্থাৎ এদের উভয়ের মোট ১০^৬ (১০ লক্ষ) ই. ভো.-এর হিসাব ধরলে দেখা যায় যে, থোরিয়াম-C" থেকে প্রাপ্ত গামা-রশ্মির তেজসংঘ জনিত পুরো তেজটি (২৬ লক্ষ ই. ভো.) ইলেক্ট্রন-পজিট্রনের মধ্যেই সংক্রমিত হয়ে যায়। ১৬ × ১০^৫ (১৬ লক্ষ) ই. ভো. তেজ রূপান্তরিত হয়ে যায় কণিকাদ্বয়ের গতিশক্তিতে। বাকি ১০^৬ (১০ লক্ষ) ই. ভো. তেজ জুটে দু'টি কণিকা-দেহকে ফুটিয়ে তুলে। সুতরাং ১০ লক্ষাধিক ই. ভো.-এর গামা-তেজসংঘ যখন কোনো বস্তুর মধ্যে শোষিত হতে থাকবে, তখন কি করে তা ১০ লক্ষ ই. ভো -এর কম তেজযুক্ত গামা-রশ্মির বা এক্স্-রশ্মির শোষিত হওয়ার নিয়মকানুনকে মেনে চলতে পারে ? তাছাড়া, দেখা গেছে যে, গামা-রশ্মি থেকে ইলেক্ট্রন-প্রোটন যুগলের উদ্ভব ঘটবার জন্য কোনো পরমাণু-কেন্দ্রকের উপস্থিতি প্রয়োজন। ঐ কেন্দ্রকের আধান-শক্তি যত বেশি হবে, গামা-রশ্মি থেকে ঐ যুগল-কণিকার উদ্ভব সম্ভাবনাও তত বৃদ্ধি পাবে। তাতে অবশ্য কেন্দ্রকের কোনো পরিবর্তন ঘটেনা। কিন্তু এই কেন্দ্রকীয় আধান অর্থাৎ আধান-কণিকা তথা পারমাণবিক ওজন বৃদ্ধির সঙ্গে যে ঐরূপভাবে শোষিত হওয়ার নিয়ম-কানুনের মধ্যে আরও বিশৃঙ্খলা দেখা যাবে তাতে আর সন্দেহ কি ?

কিন্তু পৃথিবীর বুকেই ঐ পজিট্রন-কণিকার উদ্ভব ঘটলেও, তার জীবৎকাল অত্যল্পই। যতক্ষণ তার ঐ বিপুল পরিমাণ গতিশক্তি বজায় থাকে, মাত্র ততক্ষণই কোনো বস্তুর মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পর তার গতিবেগ থেমে যায়। ১৯৩২ খ্রী.-এই জানা গেল যে, ইলেক্ট্রনের সঙ্গে পজিট্রনের সংগম ঘটামাত্রেই তারা উভয়েই অন্তর্হিত হয়ে যায়। আর তার জায়গায় আবার দু'টি গামা-তেজসংঘ ভেসে উঠে। তাদের প্রত্যেকেরই তেজ

৫ × ১০⁵ (৫ লক্ষ) ই. ভো.-এর মত। দু'দিকে তারা থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে চলে যায়।

তাহলে পজিট্রন বা ইলেকট্রন, ওরা অপার্থিব মহাজাগতিক রশ্মির অঙ্গীভূত দু'টি পৃথক সত্তা হক বা না হক, তাতে কিছুই এসে যায়না। পার্থিব বস্তুর গামা-রশ্মি থেকেও তাদের আবির্ভাব ঘটছে। আর সে আবির্ভাবের অর্থটিও কোনো বিশেষ আবরণের আড়াল থেকে কোনো অবিকৃত সত্তার বেরিয়ে আসা নয়। একেবারে গামা-রশ্মির দেহ-বিলুপ্তির মধ্য দিয়েই তাদের উৎপত্তি। অর্থাৎ সেই উৎপত্তি কালে গামা-রশ্মিরই দেহান্তরপ্রাপ্তি বা পুনর্জন্ম লাভ ঘটে। অথচ কি আশ্চর্য যে, একই ধর্মের একই দেহ থেকে একই শক্তি পরিমাণ নিয়ে জন্মলাভ করা সত্ত্বেও ওদের তেজ ভিন্নধর্মী? না কি, দু'টি ভিন্নধর্মী কণিকা দিয়েই গামা-রশ্মির দেহটিও পরিস্ফুটিত, যার ফলে ওরা পৃথক হয়ে বেরিয়ে পড়লেই গামা-রশ্মির দেহ-প্রতারণা বা রূপ-ছলনা ধরা পড়ে যায়, সে তখন দেহহীন হয়ে পড়ে? কিন্তু এ ও তো আবার দেখা গেল যে, পৃথিবীর বুকে ভূমিষ্ঠ হলেও পজিট্রন-কণিকার আয়ু অত্যল্প। পার্থিব ইলেক্ট্রনের সঙ্গে মিলনের জন্যই যেন ওর জীবন-স্পন্দন। ওর গতি বা তেজটি একটু মাত্র কমে গেলেই মুহূর্তে সে-মিলন ঘটে যায়। আর তখনই ওদের কারও কোনো পৃথক সত্তার পরিচয় থাকেনা। রশ্মি-পরিচয়ই তখন ওদের একমাত্র পরিচয় হয়ে উঠে।

তাহলে কোন্ দেহটি সত্য? ঐ রশ্মি-দেহ, না ঐ কণিকা-দেহ? না কি ঐ দু'টিই দেহাবস্থিতির দু'টি ভঙ্গিমা মাত্র, একই পদার্থদেহের দু'টি দেহবিলাস শুধু? রশ্মিরূপ আর কণিকারূপ, বা তেজবিলাস আর ভরবিলাস? না কি ভর-তেজের মিলিত- বা সংগম-লীলার নামই পদার্থ? রশ্মি যদি তেজরূপক হয়ে থাকে, আর কণিকা যদি ভররূপক হয়, তাহলে আবার আমাদের সেই মূল প্রশ্নটি এসে পৌছায়,—সত্য কে? ভর, না তেজ? রশ্মি আর কণিকা উভয়েরই দেহের কথা যখন উঠেছে, তখন ঐ দেহ-ভরকেই প্রাথমিক সত্য বলে স্বীকার করে নিতে হয়। আবার দু'টি কণিকার মিলন ঘটনার শর্তও দেখেছি,—তেজহ্রাস। সুতরাং তেজটিও এক অনিবার্য প্রাথমিক সত্য। অথচ এও দেখেছি যে, একটি কণিকার ভর কমে গিয়ে তেজরূপেই তা রূপান্তরিত হয়ে যায়, বা তার হ্রাসপ্রাপ্ত তেজটিও ভররূপে কোথাও ফুটে উঠে। সুতরাং দু'টি প্রাথমিক সত্য যে একই মহাসত্যের দু'টি পৃথক দিক মাত্র তাতেও তো আর কোনো সন্দেহ থাকে না (পৃ. ১)। কিন্তু মানসজগতে কী প্রচণ্ড বিপ্লব ঘটিয়ে দিলে এই মহাজিজ্ঞাসা!

অবিনশ্বর বস্তু বলে তাহলে জগতে আর কিছুই নাই। পরমাণু তো দূরের কথা, প্রাথমিক কণিকা বলে আমরা কিছু পূর্বেই যাদের সনাক্ত করতে চেয়েছি, তারাও তাদের মহামূল্যবান বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও আর অক্ষয়ত্বের দাবি করতে পারলনা। ইলেক্ট্রন

বা পজিট্রনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাদের স্থানে জেগে ওঠে গামা-রশ্মি। আর ঐ গামা-রশ্মিও কিছু চিরন্তন বস্তু নয়। তার ঐ বিকিরণও ইলেক্ট্রন-পজিট্রন যুগলের মধ্যে বাঁধা পড়ে যায়। ভর থেকে তেজ, আর তেজ থেকে ভর,—পার্থিব সকল ঘটনার এইটিই প্রকৃতি। শর্তটি বোধকরি ঐ গতি, বা আবেগ (ঘূর্ণি-বেগ)। এবং সব কিছুই হয়ত একক পার্থিব পদার্থের।

কিন্তু অনুসন্ধানের অভিযান পর্বে আরও কয়েকটি তথাকথিত প্রাথমিক কণিকা এসে কাকলি সৃষ্টি করল। বস্তু-ঘটনের দিক থেকে কেউ ওরা নগণ্য নয় বলে ওদের হিসেবটুকু নিতেই হয়। গামা- বা মহাজাগতিক-রশ্মির সূত্র ধরেই যেন ওরা একে একে কোথা থেকে এসে হাজির হয়ে গেল। ঐ রশ্মির কোমলাঙ্গটি যে ৫ বা ১০ সে. মি. সীসার মধ্যে চলতে গিয়েই শোষিত হয়ে যায়, এ আমাদের জানা। তবুও ওর ইলেক্ট্রন-পজিট্রনের ক্রিয়মাণ তেজটি $১০^{৮}$ (১০ কোটি) ই. ভো-এর কম নয়। কিন্তু ওর কঠোরাঙ্গটি স্বচ্ছন্দেই এক মিটার পুরু সীসার তালকে ভেদ করে এগিয়ে যায়। ওর পরিমাণ-কণিকাগুলির গতিশক্তি আরও অনেক বেশি। প্রায় $১০^{৯}$ (১০০ কোটি) ই. ভো.। চৌম্বক ক্ষেত্রে এদের বিক্ষেপ ঘটে সামান্যই। কিন্তু পরমাণু-সংঘাতের ফলে উচ্চশক্তি-সম্পন্ন কণিকাও নানাভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। কখনও ঐ কোমলাঙ্গের কোনো ইলেক্ট্রন পরমাণুর কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান কোনো ইলেক্ট্রনকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে পরমাণুটিকে আয়নায়িত করে তুলে এবং এভাবে এক একটি পরমাণুকে আয়নায়িত করতে করতে তার তেজ ক্রমশ ক্ষয়ে আসতে থাকে। কখনও আবার ঐ প্রাথমিক ইলেক্ট্রনটি কক্ষ-পথের ইলেক্ট্রনকে প্রয়োজনাতিরিক্ত জোরে ধাক্কা দিয়ে তার মধ্যে এমন তেজ সংক্রমিত করে দেয় যে ঐ পরবর্তী ইলেক্ট্রনটিও কিছুকাল যাবৎ অন্যান্য পরমাণুকে ধাক্কা দিয়ে তাদের আয়নায়িত করে তুলে। এই রকম তেজী ইলেক্ট্রন বা ডেল্টা-রশ্মি সৃষ্টির ব্যাপারেও প্রাথমিক ইলেক্ট্রনটি যথেষ্টভাবেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়। আয়নায়ন জনিত ক্ষয়ের মত আবার কখনও কখনও ইলেক্ট্রনদের বিকিরণ জনিত ক্ষয়ও চলতে থাকে। সে সম্ভাবনা অবশ্য অত্যন্ত কম। কিন্তু যখন কোনো প্রাথমিক ইলেক্ট্রন কোনোক্রমে পরমাণুর কক্ষ পেরিয়ে একেবারে তার কেন্দ্রকের কাছে গিয়ে পৌছায়, তখন তার মধ্যে প্রতিক্রিয়াটি হয় সর্বাধিক। কেন্দ্রকস্থ মিলিত আধানের জোরটি কক্ষান্তর্গত বিচ্ছিন্ন ইলেক্ট্রনগুলির জোরের চাইতে বেশি। তেমনি অন্যদিকে কেন্দ্রকের মধ্যেই পরমাণুর প্রায় সবটা ভরই সংহত হয়ে থাকে। এসব কারণে প্রাথমিক ইলেক্ট্রনটি ওখানে গিয়ে পৌছলেই তাকে তার বিপুল পরিমাণ তেজ খোয়াতে হয়। সেই তেজটি তখন তড়িচ্ছ্বকীয় বিকিরণ হিসাবে তেজসংঘদল বা ফোটন-রূপ ধরেই বেরিয়ে যায়। প্রাথমিক ইলেক্ট্রনের তেজ যত বেশি

হয়, তার ক্ষয়ও হয় তত বেশি। ফলে উৎপন্ন ফোটনের তেজও সেই পরিমাণে বেড়ে যায়।

কিন্তু আমরা এও দেখেছি যে গামা-রশ্মি খুব উচ্চশক্তি সম্পন্ন হলে অন্য বস্তু ভেদ করার সময় ইলেক্‌ট্রন-পজিট্রন জোড় সৃষ্টি করতে পারে। বস্তু-সংঘাতের ফলেই ঐ রশ্মির এক একটি সংঘদল বা ফোটন ঐ রকমের জোড় সৃষ্টি করে। তখন বস্তু-সংঘাতের ফলেই বস্তুভেদকালে রশ্মির উচ্চতেজ তাতেই ব্যয়িত হয়ে যায়। তখন ইলেক্‌ট্রন বা পজিট্রনের ভেদ জনিত ক্ষয়ের মারফতে যেমন গামা-তেজসংঘ বা ফোটনের উৎপত্তি ঘটে, তেমনি আবার ফোটন থেকেও ঐ জোড়-কণিকার সৃষ্টি হতে থাকে। পরমাণু-কেন্দ্রকের খুব কাছে এসে একটি প্রচণ্ড বেগবান ইলেক্‌ট্রন বা পজিট্রন গামা-রশ্মির যে ফোটনটিকে বিকীর্ণ করে দেয়, তার বেগ আর অভিমুখ হয় প্রায় ঐ প্রাথমিক কণিকার মতই। তখন ঐ ফোটনও আবার তার প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে একজোড়া কণিকার (ইলেক্‌ট্রন-পজিট্রনের) আবির্ভাব ঘটিয়ে দেয়। এভাবে এক থেকে দুই, দুই থেকে চার, তারপর আট, ষোল, বত্রিশ—ক্রমশ কণিকার সংখ্যা বেড়ে চলতে থাকে। একই সঙ্গে ফোটন, ইলেক্‌ট্রন, পজিট্রন—ওদের সকলের তেজও ক্রমাগত ক্ষয়ে চলে। তারপর একসময় কণিকার আয়নায়ন জনিত ক্ষয়-প্রক্রিয়াটি বিকিরণ-জনিত ক্ষয়ের চাইতে
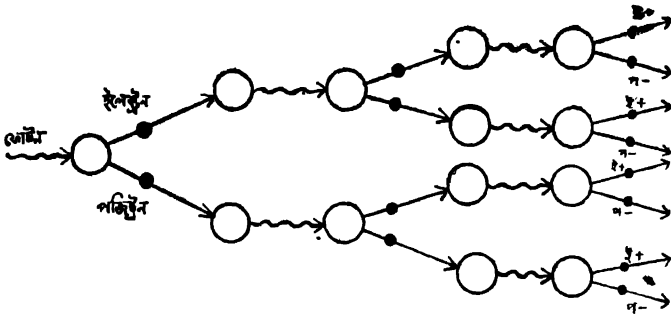
বেশি হয়ে উঠে। বিকিরণের মাধ্যমে কণিকাসৃষ্টির প্রক্রিয়াটি তখন স্তব্ধ হয়ে যায়। কণিকারা তখন তার বস্তু-ঘাত মারফতে ফোটনকে ফুটিয়ে তুলতে পারেনা। ইলেক্‌ট্রনের তেজ তখন মাত্র কয়েক কোটি ই. ভো.-এ নেমে আসে। শত শত কোটি ই. ভো.-এর কণিকাও যখন মহাজগৎ থেকে পাড়ি দিয়ে পার্থিব আবহমণ্ডলের মধ্য দিয়ে কণিকা বর্ষণ করতে করতে এদিক পানে ধেয়ে আসে, তখন তাদেরও সকলের পক্ষে ঐ বিপুল আবহ-রাজ্যটি অতিক্রম করে এখানে এসে পৌছান সম্ভব হয়না। আর যদিও বা তাদের কেউ কেউ কোনো রকমে নেমে এসে জননী বসুন্ধরার বক্ষে আশ্রয় খুঁজে নেয়, তখন তারা প্রায় পার্থিবই হয়ে পড়ে, তাদের সে অপার্থিব তেজ আর থাকেনা।

দেখা গেছে পৃথিবীতে ইলেক্‌ট্রন বংশকে ছড়িয়ে দিতে গেলে আদি পিতামহ প্রাথমিক-ইলেক্‌ট্রনটির তেজকে হতে হবে অন্তত $১০^{১৩}$ (১০ লক্ষ কোটি) ই. ভো.। এরকম ইলেক্‌ট্রন থেকে উৎপন্ন ফোটন, বা তার থেকে উৎপন্ন কণিকা-যুগল—এরা সকলেই যে ঠিক একই অভিমুখে অর্থাৎ একটি মাত্র সরলরেখা ধরে এগিয়ে চলে, তা নয়। ওরা পরস্পরের সঙ্গে ছোট ছোট কোণ করে চলে। তার ফলে ক্রমেই ওদের বংশধরেরা হাজার হাজার বর্গমিটারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সেই অঞ্চলের মাপ থেকেও নানা রকমের হিসাব করে প্রাথমিক-কণিকাটির তেজের পরিমাপ পাওয়া যেতে পারে। এভাবে এমন কণিকারও সংবাদ পাওয়া গিয়েছে যার প্রাথমিক তেজটি ছিল অবিশ্বাস্য রকমেই বিপুল—প্রায় $১০^{১৬}$ (১০০ কোটি কোটি) ই. ভো।

তেজের ঐ বিপুল বর্ষণটিকে মানুষ স্বচক্ষেই তার মেঘায়ন-কক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে। বাতাসে সেখানে ওরা শত শত মিটার পথ ধরে ছড়িয়ে যায়। কিন্তু সীসার মধ্যে তার বিস্তার চলে অত্যন্ত অল্প দূরত্বে। যেখানে জলের মধ্যে ওদের আয়নায়ন জনিত তেজক্ষয়ের চাইতে বিকিরণ জনিত ক্ষয়কে অধিক রাখতে হলে ওদেরকে অন্তত $১০^{৯}$ (১০০ কোটি) ই. ভো.-এর তেজসম্পন্ন হতে হয়, সেখানে সীসার মধ্যে ঐ একই ফলপ্রাপ্তির জন্য ওর দশ ভাগের এক ভাগ তেজ হলেও চলে যায়। তাছাড়া ধাতুটি খুব গুরু বলে তেজক্ষয়ের ক্ষেত্রটিও খুব ছোট হয়। সুতরাং ক্ষুদ্রায়তন হলেও মেঘায়ন-কক্ষের মধ্যেই মাঝে মাঝে সীসার পাত পেতে রাখলে তাদের ভেদ করে যাওয়ার সময় ওদের যে বর্ষণ-প্রক্রিয়া চলতে থাকে, বাইরে তার প্রভাবটি স্পষ্ট হয়ে ছবিতে তা প্রকট হয়ে উঠে।—কিন্তু বর্ষণ বা কণিকা-প্রপাতের যে রকম শোষণ চলে, তা ঠিক মহাজাগতিক রশ্মির কোমলাঙ্গ-শোষণের মতই। সুতরাং ঐ রশ্মির একাংশের পরিচয়ই এ প্রক্রিয়ার মধ্যে স্পষ্টভাবে সূচিত হয়। কিন্তু ওর কঠোরাংশের পরিচয় পাওয়া যায় ভিন্ন রূপে। ইলেক্‌ট্রন বা পজিট্রন উচ্চশক্তি সম্পন্ন হলেই অনিবার্যভাবে বর্ষণ প্রক্রিয়া শুরু করে। কিন্তু ছবিতে এমন কণিকার সন্ধান পাওয়া গেল, যারা ঐ রকম কণিকাপ্রপাত সৃষ্টি করেনা। সুতরাং তারা কিছুতেই ইলেক্‌ট্রন বা পজিট্রন বা ফোটন হতে পারেনা। সুতরাং মনে করা হল ওরা নিশ্চয় মহাজাগতিক রশ্মির কঠোর ভাগটির দেহ-সংঘটক হবে। সব দিক বজায় রাখবার জন্য ১৯৩৪খ্রী.-এ জাপানী পদার্থবিদ্‌ উকাওয়া অনুমান করলেন (পৃ. ৩১৬) যে ওগুলি এক প্রকারের মাধ্যমিক কণিকা, ওদের ভর প্রোটন আর ইলেক্‌ট্রনের ভরের মধ্যবর্তী, ইলেক্‌ট্রনের ভরের প্রায় একশ দু'শ গুণ বেশি।

পূর্বেই জানা হয়েছিল যে কণিকার বিকিরণগত ক্ষয়টি ওর ভরের উপরেই নির্ভর করে। সামান্য একটু ভর বেড়ে গেলে ক্ষয়ের হারটি খুবই কমে যায়, আধানযুক্ত ভরের কয়েক

সহস্র ভাগের ভাগ। অর্থাৎ কণিকাটির স্বল্প পরিমাণ ভর বৃদ্ধি হলেই তার তেজ-বিকিরণ প্রভৃত পরিমাণেই কমে যায়। ফলে কোনো ইলেক্‌ট্রন জাতীয় কণিকার ভর যদি দু'শ গুণ হয়, তাহলে তার বিকিরণগত ক্ষয়টি হবে একই তেজসম্পন্ন সাধারণ ইলেক্‌ট্রনের বিকিরণগত ক্ষয়ের ১০০ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। পরিমাণটি এতই নগণ্য যে সহজেই ওর হিসাবটিকে বাদ দিতে পারা যায়। সুতরাং বস্তুর মধ্যে পরিভ্রমণ কালে উপরোক্ত ভারি ইলেক্‌ট্রনের যে তেজ ক্ষয় হয়, সেটি প্রধানত আয়নায়নগতই। অথচ কোনো কণিকা খুব উচ্চশক্তি সম্পন্ন হলে তার আয়নায়ন সম্ভাবনা খুবই কমে যায়। ফলে ঐ রকম ভারি ইলেক্‌ট্রনের পক্ষেই যথেষ্ট পরিমাণ বস্তুবেধ অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব হয়। তাছাড়া ওদের বিকিরণগত ক্ষয়টি প্রায় কিছুই না হওয়ায় ওদের পক্ষে আর কণিকাপ্রপাত ঘটান সম্ভব হয়না। সুতরাং এসব কথা বিবেচনা করলে মহাজাগতিক রশ্মির কঠোরাংশটি ঐরূপ ভারি ইলেক্‌ট্রনেরই গুণসম্পন্ন হয় বটে। ঐ কণিকার ভর সম্বন্ধে সঠিক পরিচয় পাওয়ার জন্য তাই প্রচলিত সকল প্রকার পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেখা হল। দৌড়-পাল্লা ঠিক করা গেল, চৌম্বক বিক্ষেপ লক্ষ্য করা হল, সীসার পাতের মধ্যে তেজক্ষয়ের সঙ্গে ফটোগ্রাফের প্লেট এবং মেঘায়ন-কক্ষের ছবি ও চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিধিবক্রতা প্রভৃতির সাহায্যে প্রাপ্ত আয়নায়ন ক্ষমতার তুলনা করে দেখা গেল। সর্বপ্রকার অনুসন্ধানের মারফতে জানা গেল যে ওর ভর-পরিমাণটি বাস্তবিকই একশ' দু'শ'-এর মতই। প্রোটন আর ইলেক্‌ট্রনের মধ্যবর্তী ভরবিশিষ্ট বলে ওর নামকরণ করা হল মাধ্যমিক কণিকা বা 'মেসন'। মেঘায়ন-কক্ষের মধ্যেই ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আধানযুক্ত দু'রকমের মেসনের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়লেও অনেক পরে ক্যালিফোর্নিয়ার বার্ক্‌লিতে (Berkeley) লরেন্স্ (Ernest O. Lawrence) উদ্ভাবিত (১৯৩১) বিপুলাকার সাইক্লোট্রন যন্ত্রটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৪৮ খ্রী.-এ সর্বপ্রথম তাতে নিরপেক্ষ মেসন উৎপন্ন হওয়ায় তার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ হওয়া গেল। পর বৎসর উকাওয়া তাঁর আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। কিন্তু যাই হক না কেন, উপরোক্ত সকল প্রকার মেসনই অত্যন্ত ক্ষীণজীবী। ধীরগতি মেসনেরই অর্ধায়ু $২\cdot১৫ \times ১০^{-৬}$ সেকেণ্ডের মত। যখন ধ্বংস হয়ে যায় তখন ওদের তেজ আর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কিন্তু ওরকম স্বল্পায়ু নিয়ে কোনো মেসন মহাজাগতিক রশ্মির অঙ্গলগ্ন হয়ে মহাকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত এসে পৌছতে পারেনা। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় প্রাথমিক মেসনগুলি সবই ধ্বংস হয়ে যায়। পৃথিবীর বুকে আবার ওদের নবজন্ম ঘটে, মহাজাগতিক রশ্মির কঠোরাঙ্গ হয়ে তখন ওরা পার্থিব হয়ে পড়ে।

ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন ভরের মেসন পাওয়া গেল—৩০০,৬০০, ৯০০। তাদের মধ্যে ২০০ আর ৩০০ ভরের মেসনকে দু'টি গ্রীক বর্ণের নাম অনুযায়ী যথাক্রমে মিউ- ও পাই-মেসন

নামে অভিহিত করা হয়েছে। এদের প্রত্যেকেরই ধন- বা ঋণ-বিদ্যুৎযুক্ত আধানের কণিকা আছে এবং নিরপেক্ষ পাই-মেসনের সন্ধানও মিলেছে। কিন্তু আধানাত্মক পাই-মেসনের একটি মস্তবড় গুণ এই যে, আল্‌ফ- প্রোটন- বা নিউট্রন-কণিকার মত প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে ওরাও কেন্দ্রক বিদ্ধ করতে পারে। তখন ওরা কেন্দ্রকলগ্ন হয়ে যায়। কিন্তু কেন্দ্রক থেকে তখন প্রোটন, নিউট্রন বা আল্‌ফা-কণিকার অনেককেই সরে যেতে হয়। কার্বন, নাইট্রোজেন বা অক্সিজেনের মত হাল্কা কেন্দ্রকগুলি তখন বিপর্যস্ত হয়ে গিয়ে কতকগুলি পৃথক পৃথক কণিকায় পরিণত হয়ে যায়। এই কারণেই পাই-মেসনকে কেন্দ্রক-সক্রিয় কণিকা বলা হয়। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় যে ওদের মধ্যে যারা ধনাত্মক, তাদের পক্ষে ধনাত্মক কেন্দ্রকের বিকর্ষী তেজ ঠেলে সেখানে পৌঁছতে গেলে স্বভাবতই প্রবল বেগ-সম্পন্ন হওয়ার দরকার। অথচ ঋণাত্মক পাই-মেসনের সুবিধে এই যে তারা ধনাত্মক কেন্দ্রকের দ্বারা আকৃষ্টই হয়ে থাকে। ফলে কেন্দ্রক-প্রতিক্রিয়া ঘটাবার জন্য অল্প তেজেও তাদের চলে যায়। বা বলতে পারি, একই গতিশক্তির ঐ দু'রকম পাই-মেসনের মধ্যে ঋণাত্মক কণিকাগুলিই অধিকতর সক্রিয় হয়ে উঠে। কিন্তু পাই-মেসনরা নিজেরাই যেমন কেন্দ্রক-রূপান্তর ঘটিয়ে তুলতে পারে, তেমনি প্রায়ই দেখা যায় যে, প্রোটন বা আল্‌ফা-কণিকার দ্বারা কেন্দ্রক বিদ্ধ হলেও সেখান থেকে পাই-মেসনের আবির্ভাব ঘটে। সুতরাং ওরা বাস্তবিকই কেন্দ্রকসক্রিয় কণিকা, এবং কেন্দ্রক-শক্তির পরিস্ফুরণে ওদের কার্যকারিতা না স্বীকার করে উপায় নাই (পৃ. ৩১৬)। সে তুলনায় মিউ-মেসনকে কেন্দ্রক-নিষ্ক্রিয় বলতেই হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এরা যে পৃথিবীর নিকটবর্তী অঞ্চলে পুনরুৎপন্ন দ্বৈতীয়িক মহাজাগতিক রশ্মির প্রত্যঙ্গ হয়ে বিশেষভাবেই দেখা দেয়, তার কারণ, ভূপৃষ্ঠ থেকে বহুদূরে পাই-মেসন থেকেই ওদের জন্ম ঘটে। অনেক উঁচুতেই মহাজাগতিক রশ্মির প্রাথমিক কণিকাগুলি কেন্দ্রক-বিপর্যস্ত করে তার থেকে পাই-মেসন উৎপন্ন করতে থাকে। কিন্তু তারা অত্যন্ত অল্পায়ু, পৃথিবী পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পারেনা। তবে তাদের ধ্বংসপ্রাপ্তি মাত্রেই ঐ মিউ-মেসন আবির্ভূত হয়। আর তার সঙ্গে দেখা দেয় আর এক রকমের নিরপেক্ষ কণিকা—নিউট্রিনো। ধনাত্মক পাই-মেসন থেকে যেমন ধনাত্মক মিউ-মেসন, এবং ঋণাত্মক পাই-মেসন থেকে যেমন ঋণাত্মক মিউ-মেসন উৎপন্ন হতে থাকে, তেমনি ঐ দুই প্রকার মিউ-মেসনের তিরোভাবের মধ্য দিয়েও যথাক্রমে একটি করে পজিট্রন এবং একটি করে ইলেক্‌ট্রনের আবির্ভাব ঘটে; তখন ওদের সঙ্গে দেখা দেয় আরও দু'টি করে নিউট্রিনো (দ্র., পৃ. ৩৪৯—৫২)।

প্রকৃতির বিরাট সংগ্রহশালা থেকে এভাবে বহুবিধ নতুন কণিকা একে একে বেরিয়ে এলো। তারা নিশ্চয় আমাদের এই পৃথিবী আর তার বিচিত্র বস্তুরাজি গঠন করে চলেছে। সেই দিক থেকে তারা প্রত্যেকেই পার্থিব বস্তুর উপাদান। তাহলে এই

পৃথিবী কি অসংখ্য উপাদান দিয়ে নির্মিত ? আমাদের এত শ্রমময় অনুসন্ধান সবই কি তাহলে ব্যর্থ ? কিন্তু এ আশঙ্কা অমূলক। কারণ, ঐ কণিকাবৃন্দেরও প্রত্যেকেই ভর-তেজের মিলিত সত্তা বই নয়। সুতরাং ভর-তেজই তাদের মূল উপাদান। কিন্তু তাহলে নিশ্চিতভাবে জানতে হয় ওরা সকলেই কি ভর-তেজাত্মক পদার্থ মহাসমুদ্র থেকে উদ্ভূত ? মনে আছে, বহু পূর্বে বিদ্যুচ্চৌম্বক শক্তি অনুসন্ধানের বেলায় আমরা ঐ রকম এক মহাসমুদ্রের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলাম (পৃ. ১৪৮-৪৯)। তাকে আমরা বলপদার্থ-ধারারূপেই প্রত্যক্ষ করেছি। বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছিলেন বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্র। তাঁরা আরও একটি ক্ষেত্রের কথা বলেছিলেন—মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র। কিন্তু জীবদেহের এক একটি কোষ যেমন তার জীবন বা প্রাণপদার্থের এক একটি সত্তাবান একক, তেমনি ইতিপূর্বে (পৃ. ২৯১) আমাদের এও অনুমান করতে হয়েছে যে, মানুষের মনও যেন এক একটি চিন্ময়তার একক মাত্র। অর্থাৎ বিদ্যুচ্চৌম্বক বা মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের মত এ জগৎ একটি প্রাণ ক্ষেত্র এবং একটি চিন্ময়- বা জ্ঞান- ক্ষেত্রও। আবার আমরা এও দেখেছি (পৃ ৩০৪) যে, ইলেক্‌ট্রন-মেঘ থেকে ইলেক্‌ট্রন-কণিকা উদ্ভূত হয়ে চলেছে। সেই ইলেক্‌ট্রনই প্রথম বস্তু-কণিকা। কিন্তু সে নিজেই আবার যে-ফোটনরাজিকে ছড়িয়ে দেয়, তাদের আর বস্তু-কণা বলা চলেনা। গুণ তার বস্তুমুখী, তাই সে কণিকা ; কিন্তু রূপ তার মেঘময়, তাই সে মেঘধারা। বিজ্ঞানী তাকে তাই বলতে চান মেঘ-কণিকা বা ক্ষেত্র-কণিকা।

কিন্তু আজ আবার বিজ্ঞানীর কাছে নতুন ক্ষেত্র এসে হাজির হল। ঐ সব নবাবিষ্কৃত মেসনরা কোথা থেকে একে একে উঠে আসছে ? কোন্ ক্ষেত্র থেকে ? পরমাণু-কেন্দ্রকের অভ্যন্তরে যে বিপুল শক্তি কাজ করে চলেছে, সে কেবল বৈদ্যুৎ শক্তি নয়, সে কেন্দ্রক-শক্তিও। তার তুলনা নেই। এত অমিততেজ সে। তাহলে সেই তেজেরও উৎস হিসাবে কেন্দ্রকীয় ক্ষেত্রের কল্পনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। আবার ফোটন-কণিকার মত সেও নিশ্চয় তার ক্ষেত্র-কণিকা গঠন করে আপনাকে প্রকাশ করে। প্রকাশমানতাই যদি বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্রের ধর্ম হয়ে থাকে, তহেলে কেন্দ্রকীয় ক্ষেত্রেরও সে ধর্ম থাকবেনা বা কেন ? বস্তুত, প্রকাশমানতা যে ক্ষেত্রধর্মই তার প্রমাণ ঐ মেসন-কণিকা। কারণ, ফোটন-কণিকা যেমন বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রতিভূ হয়ে আমাদের কাছে তার ক্ষেত্রপরিচয় বা মেঘবার্তা নিয়ে এসে হাজির হয়েছে, পাই-মেসনও তেমনি আজ কেন্দ্রকীয় ক্ষেত্রের প্রথম দূত হয়ে তারই বার্তা বহন করে এনে উপস্থিত হল। তাই দেখতে পাই, তাকে অবলম্বন করেই কেন্দ্রক-প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত। কিন্তু ফোটনের মত সে-কণিকা শূন্যভর (ভরশূন্যপ্রায়) নয়। ইলেক্‌ট্রনের চাইতেও অনেক ভারি। তাই তার গতিও আলোর মত হতে পারেনা। আর সেইজন্যই হয়ত তাকে ক্ষেত্র-কণিকা বলে ধরে নেওয়াও শক্ত

হয়ে উঠে। কিন্তু কেন্দ্রকীয় ক্ষেত্রের কল্পনা যদি অবশ্যম্ভাবী হয়ে থাকে, তাহলে তার ক্ষেত্র-কণিকার অস্তিত্বও নিশ্চিত হয়ে দাঁড়ায়। সে কণিকাও নিশ্চয় পরিমাণ-নির্ভর। অর্থাৎ তার ক্ষেত্র-পরিমাণ তার মধ্যে সংহত হয়ে থাকছে। কিন্তু সে যেন বস্তু আর ক্ষেত্রের মধ্যে মিলন-বিন্দু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার ভর আছে, তাই সে বস্তু। আবার সে ঘূর্ণিবিহীন, তাই সে ক্ষেত্র-কণিকা। তবে ক্ষেত্র-কণিকার সঙ্গে বস্তু-কণিকার নিশ্চিত পার্থক্য আছে। দৃশ্যত সে-পার্থক্য তার ভরে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা তার মূল পার্থক্যটি জেনে ফেলেছেন। সে তার ঘূর্ণিতে। বস্তু-কণিকার ঘূর্ণি-পরিমাণ প্ল্যাঙ্ক-ধ্রুবক ($h/2\pi$)-এর অর্ধেক। কিন্তু ক্ষেত্র-কণিকার ঘূর্ণি শূন্য অথবা প্ল্যাঙ্ক-ধ্রুবকের কোনো পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ পায়। তাছাড়া পাউলি সূত্রানুযায়ী একই তেজস্তরের মধ্যে দু'টি করে ইলেক্‌ট্রন, বা প্রোটন, বা নিউট্রন, বা অর্ধঘূর্ণি বিশিষ্ট কোনো কণিকাই বর্তমান থাকতে পারেনা। কিন্তু ক্ষেত্র-পরিমাণ কণিকার বেলায় সে নিয়ম অচল। সেখানে একই কম্পাঙ্ক এবং একই ঘূর্ণিপাক(direction)-বিশিষ্ট অসংখ্য কণিকা অবস্থান করতে পারে। একই অবস্থায় বা তেজস্তরে তাই ফোটনের সংখ্যাও পরিমিত হওয়ার দরকার হয়না। এসব কারণেই অর্ধঘূর্ণিবিশিষ্ট হওয়ায় মিউ-মেসনকে একটি ক্ষেত্র-কণিকা বলা যায়না। অথচ শূন্য-ঘূর্ণি বিশিষ্ট হওয়ায় সব পাই-মেসনই কেন্দ্রকীয়-ক্ষেত্রকণিকা হিসাবে গণ্য হতে পারে। তবে আশ্চর্যের কথা এই যে তাদের স্থিতি-ভর (rest mass) আছে। ইলেক্‌ট্রন-ভরের তুলনায় নিউট্রন, প্রোটন এবং পাই-মেসনের স্থিতি-ভর যথাক্রমে ১৮৩৯, ১৮৩৬, ২৭৩।

পরমাশ্চর্যের বিষয় যে, নিউট্রন-প্রোটনের পারস্পরিক রূপান্তরকালে নিউট্রন থেকে পাই-মেসন (ঋণাত্মক) বেরিয়ে গেলে তার মাত্র তিন ভর কমে যায় এবং সেটি তখন প্রোটনে পরিণত হয়। অপর পক্ষে পাই-মেসনের অতটা (২৭৩) ভর প্রোটনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে যখন সে নিউট্রনে রূপান্তরিত হয়, তখন তার ঐ পরিমাণ ভর বৃদ্ধি ঘটেনা। অথচ ওদের মধ্যে বার বার ঐ ২৭৩-ভরের পাই-মেসনই ওদের একজনের থেকে বিযুক্ত এবং অন্য জনের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে। কেন্দ্রক-বহির্ভূত কোনো মুক্ত নিউট্রন অস্থায়ী, সেও প্রোটনে পরিণত হয়। কিন্তু তখন সে ১-ভরের ইলেক্‌ট্রন ত্যাগ করে। অধিকন্তু, সে তখন একটি ইলেক্‌ট্রন আর একটি নিউট্রিনোর (দ্র., পৃ. ৩৪৯-৫২) মধ্যে একটি ইলেক্‌ট্রনের দ্বিগুণ তেজ সংক্রমিত করে দেয়। এইভাবেই তার পক্ষে সেখানে একটি প্রোটনে পরিণত হওয়া সম্ভব হয়। সুতরাং সেখানে ভর-তেজ 'সমতুলতা'র (equivalence) ব্যত্যয়ের কোনো প্রশ্ন ওঠেনা। কিন্তু এখানে? জানা আছে যে স্থিতি-ভরের চাইতে কম হলে কোনো প্রাথমিক কণিকাই তার নিজ সত্তা বজায় রাখতে পারেনা। অথচ এখানে নিউট্রন-কণিকা মেসন-ভর ত্যাগ করার পর কি করে অনেক কম ভরবিশিষ্ট

(১৮৩৯-২৭৩=১৫৬৬) হওয়ার সম্ভাবনা সত্বেও একটি ১৮৩৬-ভরের প্রোটন-সত্তায় পরিণত হতে পারে ? সত্যই এ এক মহাবিস্ময়ের ঘটনা। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখানে বলেছেন, পরিমাণ-কণিকার ব্যাপারই আলাদা। এক্ষেত্রে এমন সব কাণ্ড ঘটে যায়, যা মূলত সত্য হলেও তা অনধিগম্য (virtual) সত্য। তাকে যেন বোধগম্য বাস্তব ঘটনা বলতে পারা যায়না।

দেখা গেছে যে, পারমাণবিক মেঘমালার মধ্যে ২০০-ভরের মিউ-মেসনও ইলেক্‌ট্রনের কাজ চালিয়ে যেতে পারে। সেও দু'টি পরমাণুর মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে তাকে একটি অণুতে পরিণত করে তুলে। তবে তার ভর অনেক বেশি। তাই তার সম্ভাবনা-মেঘও কেন্দ্রকের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারে। ফলে ঐ সংঘটিত অণুটি আরও ছোট হয়ে যায়। কিন্তু তবুও এ ঘটনা কেন্দ্রক-প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত নয়। কেন্দ্রকীয়-ক্ষেত্র-কণিকারূপী পাই-মেসনের ক্রিয়াবিধির সঙ্গে এর পার্থক্যও বিপুল। বস্তুত পাই-মেসনের ক্রিয়াটি বোধগম্য বা বাস্তব সত্য না হয়েও মূলত এটি একটি অনধিগম্য (virtual) সত্য। হাইসেন্‌বার্গ-তত্ত্বানুযায়ী এই প্রকার অতিকণিকার তেজাদি সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ, যন্ত্রের যে-প্রভাব প্রয়োগ করে সেই জ্ঞান লাভের চেষ্টা করা হবে, সেই প্রভাব (যেমন যন্ত্রপ্রেরিত রশ্মি অর্থাৎ ফোটনের প্রভাব) তার উপর প্রযুক্ত হওয়ামাত্রেই ঐ কণিকার মধ্যে যুগপৎ কোন না কোন প্রতিক্রিয়া বা পরিবর্তন ঘটে যাবে। তখন তার ক্রিয়া বা ক্রিয়াগত আসল রূপটি সম্বন্ধে কোনো নিশ্চয়তা লাভ করা আর সম্ভব হবেনা। তাহলে এখানে পাই-মেসনের কেন্দ্রক-প্রক্রিয়াটি (পৃ. ৩১৬) কিভাবে ঘটছে ? নিউট্রন থেকে ঋণাত্মক পাই-মেসন বেরিয়ে গেল, নিউট্রনটি কৃশ হয়ে প্রোটন হয়ে উঠল। কিন্তু ঐ উৎক্ষিপ্ত ঋনাত্মক কণিকাটি-গ্রহণ করে ধনাত্মক প্রোটনটি স্থূল হয়ে নিরপেক্ষ নিউট্রনে পরিণত হল। কিংবা, ধনাত্মক প্রোটন থেকে একটি ধনাত্মক পাই-মেসন বেরিয়ে গেল, প্রোটনটি নিরপেক্ষ নিউট্রনে পরিণত হল। সে কৃশ হয়ে গেলেও পূর্ববর্তী নিরপেক্ষ নিউট্রনটি ঐ উৎক্ষিপ্ত ধনাত্মক কণিকা গ্রহণ করে স্থূল হয়ে উঠল। সুতরাং এক অকল্পনীয় ক্ষুদ্রপরিসর-সীমিত স্থানমধ্যে এই যুগপৎ স্থূলীভবন ও কৃশায়ন প্রক্রিয়াতে কণিকাবৃন্দের ভর বা তেজের যেকোনো একটি সম্পর্কিত আমাদের জ্ঞানের নিমেষ-মাত্র অনিশ্চয়তাটি যে সেই মুহূর্তে অন্যটি সম্পর্কেও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করছেনা, সে কথাই বা কে বলবে ? যত অল্প সময়ের জন্য হক না কেন, যতক্ষণ আমাদের মনে একটি সম্বন্ধে সে অনিশ্চয়তা বর্তমান থাকবে, ততক্ষণে বাস্তব জগতে কিন্তু অন্যটির প্রভাব এসে ঘটনাটিকে আক্রান্ত করে ফেলবে। কতক্ষণ ঐ অনিশ্চিত অবস্থা থাকতে পারে এবং সেই ক্ষণ মধ্যে পাই-মেসনের অগ্রগমণ পথের সীমাটি কি হতে পারে, হাইসেন্‌বার্গের সূত্র দিয়ে তা নির্ধারণ করে নিলে দেখা যায় যে, কেন্দ্রকতেজের ক্রিয়াক্ষেত্র-সীমার সঙ্গে তা অদ্ভুত

ভাবেই মিলে যায়। সুতরাং কেন্দ্রকীয় ক্রিয়াক্ষেত্রের মধ্যে পাই-মেসনের প্রকৃত ক্রিয়াটি আমাদের নিকট অনধিগম্য থাকতে বাধ্য। তাই তাকে আমরা সেখানে স্বেচ্ছাচারী সত্তা হিসাবেই দেখতে পাই। একটি ইলেক্‌ট্রনকেও তার আপন তেজসীমা মধ্যে ঐ রকমই মনে হয়, সেখানে তার অবস্থাগত নির্দিষ্ট পরিচয়টি যেন কিছুতেই লাভ করা যায়না। অথচ পাই-মেসনের ক্ষেত্রে, আমাদের মানস পরিমাপক যন্ত্রটি মেসন-বিনিময় কালে প্রোটন এবং নিউট্রনের তেজকেও এমনভাবে বাড়িয়ে দেয় যে তার ফলে ঐ বিনিময়টি যেন বাস্তব ভাবেই ঘটে যায় (মনে হয়)।

কেন্দ্রকীয় ক্ষেত্রপরিমাণ-কণিকাটি (ইলেক্‌ট্রনের মত) শূন্য-স্থিতিভর বিশিষ্ট নয়। তার আসল ভর আছে। (তার সেই ভরের জন্যই) কেন্দ্রকীয় ক্রিয়াক্ষেত্রটি সীমাযুক্ত হয়েছে। সেই সীমার মধ্যে ক্রিয়ারত অবস্থায় পাই-মেসনটি তার দৃঢ় চরিত্রের পরিচয় প্রকাশ করে। কিন্তু কেন্দ্রকের বাইরে এলেই সে প্রায় সেকেণ্ডের ১০ কোটি ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে তার ধনাত্মক বা ঋণাত্মক গুণ সহ অনুরূপ মিউ-মেসনে রূপান্তরিত হয়ে যায়, সে প্রক্রিয়াতে একটি নিউট্রিনো উৎক্ষিপ্ত হয়। আর এক প্রকারের পাই-মেসন পাওয়া গিয়েছে। সেটি তেজনিরপেক্ষ এবং অন্য প্রকার পাই-মেসনের ১০০ কোটি ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। তাতে দু'টি গামা-ফোটনের উদ্ভব ঘটে। তাদের তেজ ইলেক্‌ট্রন-পজিট্রনের মিলনোদ্ভূত গামা-ফোটনের চাইতে বহুগুণ বেশি। ক্ষেত্র-কণিকারূপী ফোটনরা তেজকে রূপান্তরিত করে বস্তুকণিকার মধ্যে স্বীয় সত্তাকে ঢেকে ফেলতে পারে। কিন্তু তারা নিজেরা কখনও চিরলুপ্ত হয়ে যায়না, বা ক্ষুদ্রতর কণিকায়ও বিভক্ত হয়ে পড়েনা। কিন্তু ক্ষেত্রকণিকারূপী পাই-মেসন যেন বস্তুকণিকা আর ক্ষেত্র-পরিমাণ-কণার দ্বিমুখী সংকর।

কিন্তু বিভিন্ন ভরের স্বল্পায়ু গুরু-মেসনের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে—কারও ভর ৫০০-এর কাছাকাছি, কারও ৮০০-এর (থিটা-মেসন,) কারও বা ৯৭০-এর (টাউ-মেসন), আবার কারও বা ১২৫০-এর (চাই-মেসন, কাপ্পা-মেসন)। ভর-বিভিন্নতার জন্য ওদের গুণ বা ক্রিয়া-বিভিন্নতাও ঘটেছে। কিন্তু এমন ভারি কণিকারও সন্ধান মিলেছে, যার ভর প্রোটনের ভরের চাইতেও বেশি। তাকেও মাধ্যমিক কণিকা বলা চলে এই জন্য যে, তার ভরটি প্রোটন (১৮৩৬) এবং ডিউটেরনের (এক প্রোটন-এক নিউট্রন জোটের—৩৬৭২) মধ্যবর্তী। তার নাম দেওয়া হয়েছে হাইপেরন। মেসনের মতই স্বল্পায়ু কণিকা, জীবৎকাল $১০^{-১০}$ (১।১০০০ কোটি) সেকেণ্ডের মত। রূপান্তরিত হলে দর্শন মেলে একটি প্রোটন বা নিউট্রনের, আর সঙ্গে একটি পাই-মেসনেরও। ওদেরও কত রকম শ্রেণী: নিরপেক্ষ হাইপেরন (২১৮০,) আধানযুক্ত হাইপেরন (২৩৩০) কাসকেড্ হাইপেরন (২৫৮০)। আবার ধনাত্মক,

ঋণাত্মক ও নিরপেক্ষ কাস্কেড্-হাইপেরন। মহাজাগতিক রশ্মি থেকেই এদের উদ্ভব ঘটলেও আধুনিক কালে যন্ত্রের সাহায্যে প্রোটন কণিকামালাকে ১০^{৯} (১০০ কোটি) ই. ভো. তেজে বেগবান করে তার সাহায্যে গুরু-মেসন বা হাইপেরন উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এরকম যন্ত্রের সাহায্যে ১৯৫৫ খ্রী-এ (ডিসেম্বর) এক অত্যাশ্চর্য কণিকারও অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা গেছে। ঠিক প্রোটনের মতই ওর ভর। আধান কিন্তু ঋণাত্মক। সেই থেকে ওদের অ্যান্টি-প্রোটন বা বিপরীত প্রোটন নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রোটনের সঙ্গে এই বিপরীত বা বিষম-প্রোটনের সংঘাত-মিলন ঘটলে ওরা দুজনেই অন্তর্হিত হয়ে যায়। তার জায়গায় জেগে ওঠে কতকগুলি মেসন। আশ্চর্যের অবধি রইলনা, যখন ১৯৫৭ খ্রী.-এ অ্যান্টি-নিউট্রন বা বিপরীত-নিউট্রনেরও সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। নিউট্রনের সঙ্গে বিপরীত-নিউট্রনের দ্বন্দ্ব-মিলনেও ঐ রকম সব কণিকার জন্ম ঘটে। ওরা সত্যিই যেন জনয়িত্রী কণিকাদ্বয়ের দেহাত্মজ। উৎপাদক-কণিকা দু'টির দেহাত্মদানের মধ্যেই ওদের জন্ম। ওদের আবির্ভাবে মূল কণিকা দু'টির প্রাচীন অস্তিত্ব আর থাকেনা।

পজিট্রন-ইলেক্ট্রন, প্রোটন-বিপরীত প্রোটন, নিউট্রন-বিপরীত নিউট্রন—প্রাথমিক কণিকাবৃন্দের এ-রকম যুগল অবস্থান যে প্রকৃতির এক প্রাথমিক সত্যকে নির্দেশ করে দিচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নাই। ভর বা তেজের পরিমাণের দিক থেকে ওরা এক। কিন্তু গুণের দিক থেকে ওরা এতই ভিন্ন যে, একটিকে নিঃসন্দেহে অন্যটির বিরুদ্ধ কণিকা বলা চলে। সুতরাং ওদের মিলনকেও বিরোধাত্মক বা দ্বন্দ্বাত্মক মিলন বলা চলে। কিন্তু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, ঐ প্রকার দ্বন্দ্ব-মিলনের পরিণামটি হচ্ছে নতুন সৃষ্টি। যেন নতুন সৃজনের ঐটিই একমাত্র শর্ত। আবার বিচ্ছেদের মধ্যে ওদের দ্বন্দ্বটি যেমন অনিবার্য, মিলনের মধ্যেও তেমনি সর্বাঙ্গমিলনটি ঐকান্তিক। যখন ওরা দূরে থাকে তখন ওরা যেন অত্যন্ত দূরের। যেন পরস্পর পরস্পরের প্রচণ্ড শত্রু, সর্বদাই যুদ্ধং-দেহি ভাব। অথচ যখন ওরা কাছে আসে, তখন ওরা এতই কাছের, যেন এমন মিত্রতা আর জগতে নাই, পরস্পরের পৃথক অস্তিত্বটুকুও ওরা স্বীকার করবেনা—যেন ওরা একসত্তা। বিরহে দেহপ্রাধান্য ও আত্মসর্বস্বতা, মিলনে দেহবিরাগ ও আত্মাবলুপ্তি। গতি-তেজময় গামা-রশ্মির সর্বাঙ্গ ছেনে ইলেক্ট্রন-পজিট্রনের সৃষ্টি। কিন্তু জন্মের পর থেকে আমৃত্যুই ওদের গুণগত দ্বন্দ্ব। তারপর প্রবল গতিতে ছুটতে ছুটতে যখন ওদের দেখা হয়ে যায়, তখন সেই মিলনেই ওদের ধ্বংস, তারপরেই আবার গামা-রশ্মির পুনরাবির্ভাব। সৃষ্টির পর দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বের পর মিলন, মিলনের পর বিনাশ, বিনাশের পর সৃষ্টি।

...→সৃষ্টি (স্ফুটন)→দ্বন্দ্ব→মিলন→বিলয় (বিলেপন)→সৃষ্টি (স্ফুটন)→দ্বন্দ্ব→...

এভাবেই পদার্থনভ থেকে উদ্ভূত হয়ে প্রাথমিক কণিকাগুলি এগিয়ে চলেছে।

—তেজকণা—ভরকণা—তেজকণা—ভরকণা—তেজকণা—

এভাবেই ভাব থেকে রূপে এবং রূপ থেকে ভাবে পদার্থধারার 'অবিরাম যাওয়া আসা' চলছে।

জ্বলিছে নিভিছে যেন খদ্যোতের জ্যোতি,
কখনো বা ভাবময় কখনো মূরতি।

কিন্তু পার্থিব ব্যবস্থাকে রক্ষা করছে ওরাই। সুতরাং তার সকল প্রকার ব্যবস্থাতেই একই তাৎপর্য। **সৃষ্টির ফলই দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বের সমাপ্তি মিলনে, মিলনের পরিণামই ধ্বংস, আবার সৃষ্টি ধ্বংসেরই অনিবার্য পরিণতি। একই অপরিহার্য গতিসূত্রেই ঐ প্রক্রিয়া বা তত্ত্বগুলি গাঁথা হয়ে আছে।** সে গতি নিশ্চয়ই পার্থিব পদার্থের। আপাতত ঐসব তেজ-বা প্রাথমিক-কণিকার। তেজসংঘ-কণিকা বা ফোটনের এবং ইলেক্‌ট্রন-প্রোটন-নিউট্রন, পজিট্রন-মেসন-হাইপেরন, বিষম-প্রোটন আর বিষম-নিউট্রনের।

এখানেও আমরা আবার সেই মহাসত্যকেই (পৃ. ১৪৮) প্রত্যক্ষ করতে পারি। সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঐ কণিকাগুলির উদ্ভব ঘটছে। কিন্তু ওরা উঠে আসছে বিশ্বব্যাপ্ত ক্ষেত্র থেকেই। আর উঠে আসছে আইনস্টাইনের মতে (শেষ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) সেই ক্ষেত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাকে পরিবর্তন করেই। তাহলে প্রত্যেকটি কণিকার সঙ্গে তার পরিবেশের সূত্রে প্রত্যেকটি কণিকারই অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বর্তমান। আবার ঐসব কণিকা দিয়েই যখন জগতের প্রত্যেকটি বস্তুরই উৎপত্তি, তখন যতই বিচ্ছিন্ন মনে হক না কেন, প্রত্যেকটি বস্তু বা প্রক্রিয়াই প্রত্যেকটি বস্তু বা প্রক্রিয়ার সঙ্গে, এবং প্রত্যেকটি বস্তু বা প্রক্রিয়াই তার পারিপার্শ্বিক বস্তু বা প্রক্রিয়ার সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত। এ বিশ্বে বিচ্ছিন্ন একক-বস্তু বা একক-প্রক্রিয়া বলে কিছুই নাই। সমস্ত কিছুই পরস্পর-সাপেক্ষ এবং পরস্পরযুক্ত।

কিন্তু কেবল বিষম-নিউট্রন নয়, ক্ষুদে-নিউট্রনও কোথা থেকে বেরিয়ে এলো। সেই পূর্বোক্ত নিউট্রিনোরা। এত ছোট ওরা যে, ইলেক্‌ট্রন বা বিটা-কণিকার সঙ্গেই ওদের তুলনা চলে। আর বাস্তবিকই ইলেক্‌ট্রনের সঙ্গে ওরা এমনভাবে মিশে থাকে যে চেনাই দায়। কিন্তু বিজ্ঞানীর চোখও ক্রমেই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে। নিপুণ চোখের কাছে একদিন ওদের ধরা দিতেই হল।

ঐ ইলেক্‌ট্রন বা বিটা-রশ্মির উৎস সন্ধানে গিয়েই প্রথম সন্দেহ জাগে। বেশির ভাগ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপই আল্‌ফা-কণিকার বদলে নিঃসন্দেহে বিটা-কণিকা নিঃসরণ করে চলে। অথচ জানা হয়েছে যে, আল্‌ফা এবং গামা-রশ্মির উৎস পরমাণু-কেন্দ্রকই। তাহলে কেন্দ্রক থেকেই কি বিটা-কণিকারও উদ্ভব ঘটছে? কিন্তু সর্বাধিক তেজবিশিষ্ট অর্থাৎ

সর্বনিম্ন ব্রগলি-তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ইলেক্‌ট্রনের দৈর্ঘ্যও যে কেন্দ্রকের চাইতে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি (পৃ. ২৯৫)! তাছাড়া ইলেক্‌ট্রনের ঘূর্ণিকে কেন্দ্রকযুক্ত ধরলে কেন্দ্রকের মোট ঘূর্ণি-মাপটিও ঠিক থাকেনা। ইলেক্‌ট্রন-কণিকা যদি স্বীয় তেজ আর তার অবিচ্ছেদ্য দেহঘূর্ণিটি সঙ্গে নিয়ে কেন্দ্রক থেকে বেরিয়ে আসত তাহলে কেন্দ্রকের ঘূর্ণিমাপ অব্যাহত থাকত কেমন করে? আবার কেন্দ্রকের যেকোনো প্রক্রিয়া যখন তার নির্দিষ্ট তেজস্তরের নির্দিষ্ট পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, তখন ওখান থেকেই বিটা-ক্ষরণ ঘটলে নিশ্চয় ওই কেন্দ্রকীয় তেজস্তরেও পরিবর্তন প্রকাশ পেত।

তেজস্ক্রিয় বস্তুর বিটা-রশ্মির বর্ণালি দেখে সন্দেহটি ঘনীভূত হল। একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সকল কেন্দ্রকই হুবহু এক। এমনকি তেজের দিক থেকেও। সেইজন্য ওদের থেকে উৎক্ষিপ্ত সব আল্‌ফা-কণিকার তেজও একই থাকে। অথচ বিটা-রশ্মির বর্ণালিতে দেখা যায় ইলেক্‌ট্রনদের তেজ আলাদা। শূন্য-তেজ থেকে একটি বিশেষ মান পর্যন্ত তারা পৌঁছতে পারে। এক একটি উপাদান বা আইসোটোপের বিটা-রশ্মির এক একটি সর্বোচ্চ মান থাকে। তার মধ্যেই ঐ বিশেষ আইসোটোপটির সকল ইলেক্‌ট্রনের তেজই সীমাবদ্ধ। কণিকা-ক্ষরণের পূর্বে কেন্দ্রকগুলি সমশক্তিরই থাকে। বিটা-ক্ষরণের অব্যবহিত পরেই যেসব আল্‌ফা-কণিকা কেন্দ্রক থেকে নিক্ষিপ্ত হয়, তারাও সমশক্তির। সুতরাং প্রশ্ন জাগল, বিটা-কণিকাগুলি কি করে ভিন্নশক্তির হতে পারে? এমনকি হতে পারে যে, উৎক্ষেপণকালে ইলেক্‌ট্রনদের তেজ এক থাকলেও একই সঙ্গে তাদের থেকে বিভিন্ন পরিমাণে তেজক্ষয় চলতে থাকে? বা, কোনো কোনো কেন্দ্রকের বেশি তেজ চলে যায় সহোৎক্ষিপ্ত গামা-রশ্মিতে, আর কোনো কেন্দ্রকের বেশিটা তেজ চলে আসে ইলেক্‌ট্রনের সঙ্গে? এলিস (Ellis) এবং উস্টার (Wooster) ব্যাপারটি নিয়ে বিশেষভাবে অনুধাবন করলেন।

রেডিয়াম E-এর বিটা-বর্ণালি থেকে ইলেক্‌ট্রন-তেজের সর্বোচ্চ মান পাওয়া গেল ১০৫×১০^{৪} (১০$\frac{১}{২}$ লক্ষ) ই. ভো.। একক সময়ের মধ্যে ঐ বস্তুর কেন্দ্রক থেকে কতগুলি করে বিটা-কণিকা উৎক্ষিপ্ত হয়, তা জানা ছিল। একই তেজযুক্ত বিটা-কণিকার সংখ্যাও নির্ণয় করা গেল। এভাবে তাঁরা নানা রকম হিসাব কষে এক একটি ইলেক্‌ট্রনের গড় তেজ-পরিমাণ স্থির করলেন ৩৯×১০^{৪} (৩ লক্ষ ৯০ হাজার) ই. ভো.। তারপর তাঁরা খুব পুরু দেয়াল বিশিষ্ট দু'টি হুবহু এক রকমের সীসার ক্যালরিমিটার (পৃ. ১১৮) তৈরি করে তাদের একটিতে রেডিয়াম-E আইসোটোপ এবং অন্যটি শূন্য রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওদের তেজপার্থক্য লক্ষ্য করলেন। ক্যালরিমিটারের গাত্র এমনভাবে পুরু রাখা হয়েছিল, যেন ক্ষয়-প্রক্রিয়াতে যতটা তেজ ছাড়া পায় তার সবটাই ঐ সীসক গাত্রে শোষিত হয়ে যায়, একটুও আর বাইরে বেরিয়ে যেতে না পারে। সুতরাং ক্যালরিমিটার

দু'টির তাপমাত্রার পার্থক্যই বস্তুতপক্ষে ঐ শোষিত তেজের মোট পরিমাণটি নির্ণয় করে দিল। কত সময়ের মধ্যে কতগুলি বিটা-কণিকা উৎক্ষিপ্ত হয়ে আসে তা জানা আছে। সুতরাং তা থেকেই একটি বিটা-কণিকার গড় তেজ পাওয়া গেল ৩৫ × ১০১৪ (৩½ লক্ষ) ই. ভো.। পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও হিসাবের অনিবার্য ভুলের কথা স্মরণে রাখলে ঐ পরিমাণটিকে পূর্বপ্রাপ্ত ৩ লক্ষ ৯০ হাজারের সঙ্গে প্রায় সমান বলেই ধরতে হয়। সুতরাং ইলেক্‌ট্রন-বাহিত তেজ-পরিমাণ বিটা-ক্ষরণ জনিত মোট তেজপরিমাণের সঙ্গেই যখন মিলে যাচ্ছে, তখন ক্ষয়-প্রক্রিয়াতে অন্যভাবে তেজব্যয়ের প্রশ্ন আর থাকলনা। কিন্তু তাহলে আসল প্রশ্নটিই থেকে গেল—ঐ বিটা-বর্ণালির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন তেজের ইলেক্‌ট্রন-কণিকার তাৎপর্য কি? সত্যিই ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠল। সমাধান করতে না পেরে নীল্‌স্ বোরের মত বিজ্ঞানীও বলে বসলেন, ভর-সমষ্টির নির্দিষ্ট পরিমাণের তত্ত্ব (পৃ. ২০) এক্ষেত্রে অচল। কারণ, বিটা-ক্ষয়ের পূর্বে এবং তার পরে যখন সমস্ত কেন্দ্রকের শক্তি একই থাকে, তখন প্রত্যেকটি ইলেকট্রনের উৎক্ষেপের সঙ্গে একই পরিমাণ তেজও উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে। কিন্তু কোনও কণিকা তার সবটি গ্রহণ করতে পারে, কোনোটি তা পারেনা। নিগৃহীত তেজটি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। —আশ্চর্য যে, বিজ্ঞানী ভাবলেননা, তাঁর অনস্বীকার্য মহামূল্যবান ইলেক্‌ট্রন সম্পর্কিত তেজ-সংঘের আলো-বিকিরণ তত্ত্বটি (পৃ. ২৫৬-৬৩) সুনির্দিষ্ট তেজপরিমাণ তত্ত্বের উপরেই দাঁড়িয়ে থেকে পদার্থতত্ত্বের সুমহান প্রাসাদটিকেই দৃঢ়ভাবে রক্ষা করছে।

বিজ্ঞানীর এরকম ভুল আমরা ইতিপূর্বেও বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। হয়ত আরও দীর্ঘকাল এরকম ঘটবেও। তার কারণ অত্যন্ত গূঢ়, এবং হয়ত তা সামাজিক। কিন্তু বিজ্ঞানমানসের উন্মেষ যখন ঘটেছে, তার বিকাশটিও অবশ্যম্ভাবী। সে বিকাশ একক বুদ্ধির অগ্রগতিতে নয়, সে বিকাশ সর্বমানবিক বিস্তৃতিতে। বিজ্ঞানমানস গঠনের সেই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া সংগোপনে ঘটে চলেছে। আর মানুষই তাতে হাত মিলিয়েছে। তাই উন্মেষকালের একাংশগত ভুল আর দীর্ঘকাল যাবৎ মানস-শাসন চালিয়ে যেতে পারেনা। একাংশের ভ্রান্তি যেন তখন অবিলম্বেই অন্যাংশের দ্বারা শোধিত হয়ে যায়। বোর যে ভুল করলেন, সেটি কিন্তু অ্যারিস্টটলীয় যুগের ভুল নয়। সুতরাং তাঁর নির্ভুল তত্ত্ব বৃহত্তর বিজ্ঞানমানসের কোথাও না কোথাও প্রতিফলিত হওয়ার ফলে সহজগ্রাহ্য ও সর্বমানিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আজ খুব বেশি। তেমনি তার ভ্রান্তিটুকুও সেইরূপ বৃহত্তর মানসের কোথাও না কোথাও ভ্রান্তিরূপেই ধরা পড়ে গিয়ে অপসারিত বা দূরীভূত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও আজ যথেষ্ট। বাস্তবিকই বিজ্ঞানমানসের অন্যাংশ থেকে অচিরেই বলিষ্ঠ ভাবনার দৃষ্টান্ত দেখা দিল।

বিজ্ঞানীরা যখন উক্ত বিটা-কণিকা নিয়ে নাজেহাল, তখন সুইজার্ল্যাণ্ডের পদার্থবিজ্ঞানী

পাউলি অপরিবর্তনীয় তেজপরিমাণ তত্ত্বের সম্বন্ধে অদম্য দৃঢ়তার পরিচয় দিলেন। তিনি সন্দেহ করলেন, বিটা-পাপিষ্ঠার একজন দুষ্কর্ম-সহচর আছে (তুলনীয়, পৃ. ৩৪১, ৩৪৩)। সে-ই তাকে আড়াল দিয়ে বার করে আনে। বিটা-অপরাধিনী যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসে তখন কেন্দ্রকে যে ধনাত্মক আধানের বৃদ্ধি ঘটে, তার মাপ বহিরাগত বিটার আধান-মাপেরই তুল্য। সুতরাং ধরা যায় তার সহচরটি বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ। কিন্তু তার ঘূর্ণি আছে,—ঠিক বিটারই তুল্য, তবে ভিন্ন পাকের। তাই কেন্দ্রকাবস্থানকালে তাদের একত্র-ঘূর্ণিটি পাকহীন থাকায়, তারা বেরিয়ে আসার পরে কেন্দ্রকের ঘূর্ণিতে আর রূপান্তর ঘটবার অবকাশ থাকেনা। আর তাদের পলায়নকালে তারা বিটা-কণিকাটির দ্বারা গ্রহণ করা সম্ভব সমস্ত তেজটিই বহন করে নিয়ে পালায়। সেটি নিশ্চয় তাদের চলে যাওয়ার পূর্ব ও পরবর্তী কেন্দ্রকীয় তেজস্তর দু'টির মধ্যবর্তী নির্দিষ্ট পরিমাণেরই জ্ঞাপক হবে। আবার হিসাব কষলে দেখা যায়, ঐ সহচরটির ভর প্রায় শূন্যই, সে তার বিটা-সঙ্গিনীর চাইতেও সহস্রাধিক গুণ হাল্কা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিটি ধরা দিতে বাধ্য হলেন।—তড়িৎবিহীন, অথচ তেজ আছে; ভর প্রায় শূন্য, তবুও ঘূর্ণি ছাড়বেননা। নিউট্রনেরই মত, তবে কয়েক লক্ষ ভাগ হাল্কা। সুতরাং নামকরণ হল ক্ষুদে-নিউট্রন বা নিউট্রিনো। ক্ষুদিরামটি কিন্তু বন্ বন্ করে ঘুরতে থাকেন, কেবল নিজের চারদিকে নয়, সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। ঘুরবেন না কেন? নিউট্রন ভদ্রলোক প্রোটনের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ঘটান বটে, কিন্তু সে কেন্দ্রকেরই স্বার্থে। আর ইনি? এই ক্ষুদিরামটি? প্রতিক্রিয়া ঘটাবেন কি করে? ইনি তো হাওয়া। লুকোচুরির পালা সাঙ্গ হলে পাই-মেসন ধরা দিয়েছিল প্রায় দশ বছর পরে। আর পাউলি-ফের্মির সন্দেহের পরেও এ মহাত্মা কিন্তু ভোজবাজি দেখিয়ে ডিগ্‌বাজি খেয়ে কেবল ঘুরেই বেড়ালেন পুরো পঁচিশটি বছর।

জানা গিয়েছিল যে, নিউট্রন একটি অস্থির কণিকা। কেন্দ্রক থেকে বেরিয়ে এলে সে প্রায় দশ বার মিনিটের মধ্যেই প্রোটনে পরিণত হয়ে যায়। তখন একটি ইলেক্‌ট্রন আর একটি নিউট্রিনোর উদ্ভব ঘটে (পৃ. ৩৪৩)। কিন্তু কেন্দ্রক মধ্যে নিউট্রন মুহূর্ত মাত্রও মুক্ত হতে পারেনা যে, ওখানেও এভাবে ওদের উদ্ভব ঘটবে। যেভাবেই হক না কেন, অস্থির বা উত্তেজিত হলেই যখন কোনো কেন্দ্রক বিটা-ক্ষরণ-ঘটাতে থাকে, তখন বোঝা যায় যে, অস্থির অবস্থা থেকে সুস্থির অবস্থায় আসার কারণেই সে ঐরূপ করে থাকে। কিন্তু কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে তাকে নিউট্রনবিদ্ধ করা হলে সে মুহূর্তকালও উত্তেজনা সইতে পারেনা, বিটা-ক্ষরণ চালিয়ে যায়। আবার কখনও বিদ্ধ হওয়ার পরে এবং বিটা-ক্ষরণের পূর্বে সে হাজার হাজার বছরও নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দেয়। কিন্তু কখনও কখনও আবার একটি অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায় যে, কেন্দ্রক থেকে ইলেক্‌ট্রনের বদলে যেন তার একটি মুকুর (আয়না)-প্রতিচ্ছবি উঠে পালিয়ে গেল। সে যেন ইলেক্‌ট্রনের

ঠিক বিপরীত-কণিকা। সবই এক, কেবল আধানটি বিপরীত। কিন্তু নিউট্রন থেকে তো ধনাত্মক ইলেক্ট্রনের (positive electron) উদ্ভব ঘটতেই পারেনা। প্রোটন থেকে তা সম্ভব হলেও প্রোটন-কণিকা নিউট্রনের মত অস্থির নয় বলে তা সম্ভব নয়। ব্যাপারটি যেন বিটা-ক্ষরণের চাইতেও রহস্যময়।

আমরা জানি ইলেক্ট্রন-কাঠামোতে একটি ইলেক্ট্রন একই কালে অন্য ইলেক্ট্রন দ্বারা বিকৃষ্ট হয় এবং কেন্দ্রক দ্বারা আকৃষ্ট হয়। অনেক সময় সে ভারি কেন্দ্রকের টান সইতে পারেনা। ইলেক্ট্রন-মেঘের কিছুটা তখন কেন্দ্রকের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কেন্দ্রক কর্তৃক সেরকম ইলেক্ট্রন-গ্রেপ্তার ঘটলে অবশ্যই কেন্দ্রকের আধান থেকে এক-মাপের আধান কম হয়ে যাবে। কিন্তু ইলেক্ট্রনের অংশবিশেষ প্রবেশ করায় তার ঘূর্ণির কোনো অদল-বদল হবেনা। তা যদি হয়, তাহলে ধরে নিতেই হয় যে, নিশ্চয় তখন কেন্দ্রকস্থ অন্য কোনো কণিকা ঐ ইলেট্রন দ্বারা আনীত ঘূর্ণিটি বহন করে নিয়ে হাওয়া হয়ে যায়। কিন্তু কে সে কণিকা ? সেই পুরানো অপরাধ-সঙ্গী নিউট্রিনো ছাড়া আর কে হবে সে ? কিন্তু আগের সেই ঘটনার সঙ্গে এ ঘটনার পার্থক্য কি ? এবারে কিন্তু সে আর তার অপরাধ-সঙ্গীনীটিকে সাথে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেনা। তাকে (তার ঘূর্ণিকে) কেন্দ্রকের মধ্যে অদৃশ্য করে দিয়ে সে যেন তার ছায়া হয়ে (অর্থাৎ তার ঘূর্ণিটি নিয়ে) সেখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। প্রায় দেহহীন একটি ঘূর্ণির অগ্রগতিকে ছায়া না বলে প্রেতাত্মা বলাই হয়ত ঠিক। কিন্তু পরমাণুর অন্তঃপুরের এমন পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের সে-ই একমাত্র সাক্ষী। সে কিন্তু আর একটি কেন্দ্রকে ঢুকে সেখানকার একটি প্রোটনকে একটি নিউট্রনে আর একটি ধনাত্মক ইলেক্ট্রনে পরিণত করে দেয়। এরই নাম বিপরীত বিটা-ক্ষরণ।

পাউলির অনুমান অনুযায়ী, নিউট্রিনোটি ইলেক্ট্রনের সঙ্গে জোড় বেঁধেই আসে। তার তেজও ওরা ভাগাভাগি করেই গ্রহণ করে। কখনও সমান সমান, কখনও বা কম বেশি। আবার কখনও একজনে পুরোটা, কিন্তু অন্য জনে কিছুই না। ইলেক্ট্রন-কণিকা যখন সবটা তেজ গ্রহণ করে, তখনই বর্ণালিতে সর্বোচ্চ মান চিহ্নিত হয়ে যায়। আবার যখন সে কিছুই নেয়না, তখন বর্ণালিতে তার মান শূন্যেই নেমে আসে। তবে তেজগ্রহণের দিক থেকে অজ্ঞাত কণিকাটিই বেশি সুবিধে ভোগ করে বলে ইলেক্ট্রনের গড় তেজটি তার সর্বোচ্চ তেজের অর্ধেকের কাছে পৌছতে পারেনা।—এভাবে বর্ণালিতে চিহ্নিত তেজ-পার্থক্যের তাৎপর্যটির ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও এলিস এবং উস্টারের পরীক্ষা সংক্রান্ত একটি বিষয়ের সঙ্গে বিরোধ বাধল। তাঁদের পরীক্ষাতে তো দেখা গিয়েছিল, ক্ষয়-প্রক্রিয়াগত সমস্ত তেজই সীসার ছাঁকুনিতে আটকা পড়েছিল এবং সে তেজের সবটাই যে বিটা-কণিকার তেজ, তাও ঐ বর্ণালির হিসাব থেকে ধরা পড়েছিল! পাউলি কিন্তু তাঁর পূর্ব অনুমান সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় থেকে বললেন যে, সে হিসাব ভুল হয়েছে, সবটা তেজ আটকা পড়েনি।

নবাবিষ্কৃত কণিকাদের পক্ষে ওরকমের বাধা ভেদ করে যাওয়া কিছুই না। ওদের কোনো আধান নেই ওরা নিরপেক্ষ। ওরা তাই বৈদ্যুৎ বা চৌম্বক ক্ষেত্রকে গ্রাহ্য করেনা। তাই বলে ওরা নিউট্রন হতেও পারেনা। কারণ, সামান্যভাবে হলেও নিউট্রনরা সীসার দ্বারা শোষিত হয়। নিউট্রনরা অত্যন্ত ভারি। কেন্দ্রক থেকে ওরা বেরিয়ে গেলে কেন্দ্রকের এমন পরিবর্তন ঘটে যায় যে, রীতিমত তার টের পাওয়া যায়। তাছাড়া, নিউট্রনরা অন্যান্য পরমাণুর কেন্দ্রককে ধাক্কা মেরে সহজেই নিজেদের অস্তিত্বের পরিচয় দিয়ে দেয়। নতুন কণিকাগুলির এসব গুণ নাই। সুতরাং নিরপেক্ষ হলেও ওরা নিউট্রন নয়। পাউলি ওদের নামকরণ করলেন 'নিউট্রিনো', এবং অনুমান করলেন যে ওদের ভর সম্ভবত ইলেক্ট্রনেরই তুল্য।

অত্যন্ত এক সাহসিক অনুমানের উপর নিউট্রিনো-তত্ত্বটি দাঁড়িয়ে রইল। ওর অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু পাওয়া গেলনা। কণিকাটিকে সনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব—আধান নাই, চৌম্বকগুণ নাই ; কেন্দ্রক বা ইলেক্ট্রনের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ঘটাবেনা, ধাক্কা মেরে ওরা তাদের মধ্যে কোনো তেজও সংক্রমিত করে দেবেনা, অথচ তাদের সকলের গা ঘেঁষে ছুটে পালাবে ; বড় জোর এক জোড়া আয়ন তৈরি করবে,—তাও অন্তত লাখ তিনেক মাইল দূরে দূরে গিয়ে।

১৯৩৪ সালে ফের্মি এ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তত্ত্ব উপস্থাপিত করলেন। পরের বছর সোভিয়েত বিজ্ঞানি লিপুনস্কি (A.I. Leipunsky) এর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য একটি উপায় বাতলে দিলেন। কামান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় কোনো গোলা ঐ কামানের ওপর একটি ঝাঁকুনি মেরে যায়। তেমনি কেন্দ্রক থেকে নিউট্রিনো উৎক্ষিপ্ত হলে কেন্দ্রকের গায়ে নিশ্চয় তার ধাক্কা লাগবে। (৩৯×১০^৪ অর্থাৎ ৩ লক্ষ ৯০ হাজার ই. ভো.-এর একক যুক্ত) ইলেকট্রন যে পরিমাণে ধাক্কা দিতে পারবে, তার সঙ্গে (৬৬×১০^৪ বা ৬ লক্ষ ৬০ হাজার ই. ভো.-এর) নিউট্রিনোর তেজটি যদি মিলিত হয়ে থাকে, তাহলে তার ধাক্কাটি নিশ্চয় ভিন্ন প্রকার হবে এবং তাতেই ঐ নিউট্রিনোর পরিচয়টি প্রত্যক্ষভাবে ধরা পড়বে। কিন্তু লিপুন্স্কি নিজে কোনো পরীক্ষার দ্বারা এ সমস্যার সমাধান দিতে পারেননি। দীর্ঘ সাত বছর পরে অ্যালেনের (Allen) পরীক্ষা থেকে এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া সম্ভব হল।

অ্যালেনের পরীক্ষাটি একটু জটিল ধরনের। ১৯৩৫-এই মূলার লক্ষ্য করেছিলেন যে, তেজস্ক্রিয় বস্তু থেকে পজিট্রন নিক্ষিপ্ত হলে যে রকমের কেন্দ্রক রূপান্তর ঘটে, কেন্দ্রকটি কোনো অতিকেন্দ্রকীয় ইলেক্ট্রন দখল করে নিলেও সেই রকম রূপান্তর ঘটবে। কারণ, কেন্দ্রক থেকে পজিট্রন চলে গেলে যেমন কেন্দ্রকীয় ভর ঠিক থেকেও তার এক মাত্রা আধান কমে যায় (ধনাত্মক পজিট্রন বিয়োগে), তেমনি কেন্দ্রকের মধ্যে একটি ইলেক্ট্রন এসে পৌছলেও কেন্দ্রকীয় ভর অবিকৃত থেকেও তার এক মাত্রা আধান হ্রাস প্রাপ্ত হয় (ঋণাত্মক ইলেক্ট্রন যোগে)। কিন্তু কেন্দ্রক থেকে কোনো কণিকা উৎক্ষিপ্ত হয়ে গেলে যেমন তার কেন্দ্রক-

বহিভূত ক্রিয়াকলাপ থেকেই বস্তুটির তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়, পরমাণুর কক্ষ থেকে কোনো ইলেক্‌ট্রন-কণিকা সেই পরমাণুরই কেন্দ্রকে গিয়ে প্রবেশ করলে তার সে রকম কোনো সংবাদ পাওয়া শক্ত হয়ে উঠে। কেন্দ্রক কর্তৃক ইলেক্‌ট্রন-দখলের পরিচয় কিভাবে পাওয়া যেতে পারে, সে নিয়ে আলভারেজ (Alvarez) বিশেষভাবে গবেষণা করলেন।

বোঝা যায় যে, কেন্দ্রক যে-ইলেক্‌ট্রনটিকে গ্রেপ্তার করে, সেটি নিশ্চয় তার নিকটতম কে-স্তরেরই (দুটির মধ্যে) একটি ইলেক্‌ট্রন হবে। তাহলে কে-গ্রেপ্তার প্রক্রিয়াতে কেন্দ্রকের আধান কমে গিয়ে যেমন তার রূপান্তর ঘটবে, তেমনি কেন্দ্রক-মিলনের জন্য কক্ষ ত্যাগ করে যাওয়ার সময়ও ইলেক্‌ট্রনটি তেজ বিকীর্ণ করে যাবে (পৃ. ২৬০-৬১)। সেই তেজ-বিকিরণ থেকেই কে-দখল প্রক্রিয়াটির মর্মও প্রকাশিত হতে পারে। আলভারেজ দেখলেন যে ২৩-আধান যুক্ত ভ্যানাডিয়াম-কেন্দ্রক যখন কে-দখল করে তখন সেটি ২২-আধানের টাইট্যানিয়ামে পরিণত হয়। কিন্তু একটি ইলেক্‌ট্রনের কক্ষ ত্যাগের ফলে সেখান থেকে টাইট্যানিয়ামের বিশেষত্ব মণ্ডিত এক্‌স্‌-রশ্মি বিকীর্ণ হতে থাকে। সুতরাং এ থেকেই বোঝা যায় যে, কেন্দ্রক-রূপান্তরটি ঘটছে পজিট্রন-ক্ষয়ের জন্য নয়, কে-দখলের জন্যই।

ক্রমেই অনেকানেক ক্ষেত্রে কে-দখল ঘটনাটি ধরা পড়ল। যেমন বিশেষত বেরিলিয়ামের ক্ষেত্রে। বেরিলিয়ামের একটি আইসোটোপের ভর ৭, এবং লিথিয়ামের একমাত্র সুস্থির আইসোটোপের ভরও ৭। অথচ লিথিয়ামের আধান সংখ্যা বেরিলিয়ামের চাইতে মাত্র এক কম। সুতরাং পজিট্রন-উৎক্ষেপণ বা কে-দখল মারফতে একটি আধান কমিয়ে দিয়ে অস্থিরপ্রকৃতি বেরিলিয়াম-৭-এর পক্ষে সুস্থিরপ্রকৃতি লিথিয়াম ৭ এ রূপান্তরিত হওয়ার ঝোঁক থাকাই স্বাভাবিক। দেখা গেল যে, বেরিলিয়াম-৭ পজিট্রন বিকিরণ করেনা। তাহলে ধরে নিতে হয় ওখানে একমাত্র কে-গ্রেপ্তারই চলতে পারে। বাস্তবিকই দেখা গেল লিথিয়াম৭-কেন্দ্রক উৎপন্ন হওয়ার সময় ৪৫ × ১০⁴ (৪½ লক্ষ) ই. ভো.-এর গামা-তেজসংঘ ওখান থেকে বিকীর্ণ হয়। সুতরাং বেরিলিয়াম-৭-এর তেজস্ক্রিয়তার পরিচয় পাওয়া গেল এবং জানা গেল যে, কে-গ্রেপ্তার প্রক্রিয়াটির দ্বারাই ওর লিথিয়াম ৭-এ রূপান্তরকরণ চলছে। দেখা গেল যে, পজিট্রন-ক্ষয় প্রক্রিয়াতে পজিট্রনের বর্ণালি, এবং বিটা-ক্ষরণ প্রক্রিয়াতে বিটার বর্ণালির প্রকৃতি একই প্রকার। সুতরাং অনুমান করে নিতে হয় যে, পজিট্রন বিকিরণের সঙ্গে একটি নিউট্রিনোরও উৎক্ষেপণ ঘটে এবং যদিও বেরিলিয়াম ৭-এর ক্ষেত্রে পজিট্রন-উৎক্ষেপ ঘটছেনা, তবুও ওখানে নিউট্রিনোর হস্তক্ষেপ আছেই। কারণ দেখা যায় যে, বেরিলিয়াম ৭-এর কেন্দ্রক আর লিথিয়াম ৭-এর কেন্দ্রকের তেজ সমান নয়। রূপান্তর প্রক্রিয়ায় ৮ × ১০⁵ (৮ লক্ষ) ই. ভো. তেজ ছাড়া পায়। তাহলে এই তেজ কোথায় যেতে পারে?

ওখান থেকে যে গামা-রশ্মি বিকীর্ণ হয়, তা কিন্তু বেরিলিয়াম ৭-এর লিথিয়াম ৭-এ রূপান্তরসাধনের পরেই। সুতরাং পজিট্রন বা গামা-রশ্মির মারফতে ঐ তেজ ব্যয়ের কোনও সম্ভাবনা না থাকায় নিউট্রিনোর মারফতে ঐ তেজ প্রয়াগের বিষয়টি অনুমান করে নিতেই হয়। কিন্তু এখানে আর ওর সঙ্গী হিসাবে কোনো বিটা-কণিকা নাই ওরা একান্তই একা। সুতরাং বেরিলিয়াম ৭-কেন্দ্রককে একমাত্র ওদেরই ধাক্কাটি অনুভব করা যেতে পারে। সোভিয়েত বিজ্ঞানী আলিখানভ (A. I. Alikhanov) ১৯৩ খ্রী.-এ বেরিলিয়াম ৭-এর এই অসাধারণ গুণটির তাৎপর্য অনুভব করেও দ্বিতী মহাযুদ্ধের বিপদের মধ্যে আর সেটিকে কাজে লাগাতে পারেননি। ১৯৪২ খ্রী.-এ অ্যালেন এ-তত্ত্বের সদ্ব্যবহার করলেন।

অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে অ্যালেন এমন একটি পন্থা আবিষ্কার করলেন, যার সাহায্যে কোনও পাত্রের ওপর এক-পরমাণু-ওয়ালা বেরিলিয়াম ৭-এর একটি প্রলেপ লাগান যায় প্রলেপযুক্ত পাতের সামনে একটি ঝাঁঝরি রাখা হল। তারও সামনে দ্বিতীয় একটি ঝাঁঝরি। তারপরে একটু দূরে আয়ন-গণকযন্ত্রের তড়িদ্দ্বার। নিউট্রিনো-উৎক্ষেপণের সময় কেন্দ্রককে যখন ঝাঁকুনি লাগে তখন তার আচরণটি অনেকটা আয়নের মত হয়। সেই আয়ন যাতে সহজে এগিয়ে যেতে পারে তজ্জন্য যন্ত্রটিকে যেমন একেবারে বায়ুশূন্য করা হল তেমনি ঐ পাত আর প্রথম ঝাঁঝরির মধ্যে এমন একটি বিদ্যুৎক্ষেত্র প্রস্তুত করা হল যাতে আয়নের (কেন্দ্রকের) গতিবেগটি বেড়ে যেতে পারে। ঝাঁকুনি-জনিত আয়নগুলিকে টেনে নেওয়ার ব্যাপারে ঐ ঝাঁঝরিটিও বেশ সাহায্য করে। এভাবে বর্ধিত বেগ নিয়ে কেন্দ্রকগুলি যখন প্রথম ঝাঁঝরি অতিক্রম করে যায় তখন তারা প্রথম ও দ্বিতীয় ঝাঁঝরির মধ্যবর্তী আর একটি বিদ্যুৎক্ষেত্রের মধ্যে গিয়ে পড়ে। এখানে এসে কিন্তু ওদের ঐ বর্ধিত বেগটি কমে যায়। এই ক্ষেত্রে এমন বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা রাখা হল যে, আয়নের উপর বিদ্যুৎপ্রভাবকে ইচ্ছামত কমিয়ে দেওয়া যায়, এবং তার ফলে একটি আয়ন এখানে এসে তার পূর্বার্জিত তেজের সঙ্গে ঝাঁকুনি-জনিত তেজটিও হারিয়ে ফেলায় যেন আর দ্বিতীয় ঝাঁঝরির কাছেও এসে পৌঁছতে না পারে। অবশ্য বিদ্যুৎপ্রভাবকে এতদূর না নামিয়ে একটি পরিমিত ব্যবস্থায় রাখা যায়। তাতে ঐ ঝাঁকুনি-খাওয়া কেন্দ্রকগুলি তাদের ঝাঁকুনি জনিত বেগ নিয়ে ঝাঁঝরি অতিক্রম করে চলে যায়। তারপর তখন তারা কয়েক সহস্র ভোল্টের একটি গতি-বিবর্ধক বিদ্যুৎক্ষেত্রের মধ্যে গিয়ে পড়ে এবং সেটি অতিক্রম করে শেষে গণকযন্ত্রে গিয়ে আঘাত করে। তখনই বুঝতে পারা যায় বাস্তবিকই কোনো আধানযুক্ত কণিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ঝাঁঝরির মধ্যবর্তী বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রটিকে অতিক্রম করে চলে এসেছে কিনা। দেখা গেল যে তারা এসেছে। অর্থাৎ ঝাঁকুনিটি তাহলে সত্য ঘটনাই। শেষের ক্ষেত্রটিতে এসে বেগটিকে কতটা বাড়ান গেল তার হিসাব রাখা হয়েছিল। তা থেকে

অ্যালেন হিসাব করে দেখলেন যে ঝাঁকুনি-লাগা কেন্দ্রকের তেজ ৮০ ই. ভো.। আশানুরূপ তেজই। কিন্তু ঝাঁকুনিটি যে গামা-রশ্মির উৎক্ষেপ-জনিত নয়, তাও অ্যালেন ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলেন। প্রমাণ হয়ে গেল যে, কে-দখল প্রক্রিয়ার মারফতে বেরিলিয়াম৭-এর লিথিয়াম৭-কেন্দ্রকে রূপান্তরকালে লিথিয়াম৭-কেন্দ্রকটি একটি ঝাঁকুনি খায়। তার কারণ, নিশ্চয়ই সেখান থেকে কোনো অজ্ঞাত কণিকার উৎক্ষেপণ। সুতরাং পাউলি-অনুমিত নিউট্রিনো-কণিকাই যে সেই অজ্ঞাত কণিকা হতে পারে, তাতে আর সন্দেহ রইলনা। কিন্তু ট্রিটনের (এক প্রোটন ও দুই নিউট্রনযুক্ত হাইড্রোজেন-কেন্দ্রক) বিটা-বর্ণালি বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে ওর ভরটি পাউলি-অনুমিত ভরের চাইতে অনেক কম, ইলেকট্রনের ভরের সহস্রাংশের চাইতেও বোধ করি কম।

বাস্তবিকই একটি নিউট্রিনোকে ধরা যায়না। তার ঝাঁককে ধরার চেষ্টা করতে হয়। বহু পরে কেন্দ্রক-প্রতিক্রিয়া-ঘটক যন্ত্রে সে কাজ সম্ভব হল। যন্ত্রটিতে অসংখ্য নিউট্রন-কণিকা উৎপন্ন হয়। তারা যন্ত্র-প্রাচীরে শোষিত হয়, এবং তখন সেখানকার উত্তেজিত কেন্দ্রকদের সঙ্গে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা ঘটাতে থাকে। তার নাম বিটা-তেজস্ক্রিয়া। যন্ত্রের মধ্যে যে সংখ্যাতীত নিউট্রিনোর উৎপত্তি ঘটেছিল তারা কিন্তু নিউট্রন আর গামা-রশ্মি ধারণের দুর্ভেদ্য ছাউনিকে ভেদ করে অক্লেশেই বেরিয়ে এসে প্রতিপ্রভ প্রভাগণক পাত্রে (scintillation counter) গিয়ে পড়ল। তাতে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন-কেন্দ্রক যুক্ত তরল পদার্থ ছিল, যেন তাতে গামা-ফোটন এসে পড়লে ঝলমল করে উঠে। নিউট্রন-গ্রেপ্তারের ফলে উদ্ভূত পজিট্রনগুলি তরলের পরমাণুর অন্তর্গত ইলেক্ট্রনের সঙ্গে দ্রুত মিলিত হয়ে উচ্চশক্তির গামা-ফোটন উৎপন্ন করল এবং তখনই প্রথম ঝকমকানি দেখা গেল। নিউট্রন-গ্রেপ্তারের সুবিধা সৃষ্টির জন্য ঐ তরলের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ ক্যাড্‌মিয়াম মেশানো ছিল। তার কেন্দ্রকে নিউট্রনগুলি শোষিত হয়ে যেতে পারে, এবং তার ফলেও গামা-ফোটন উদ্ভূত হয়ে ঝলমল সৃষ্টি করে। এভাবে অন্তত কয়েক ঘণ্টা পরে পরেও অত্যল্প কালের (সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়) ব্যবধানে যে দুবার ঝকমকানির সৃষ্টি হল, তা লিপিবদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু এ ঘটনাটির আর কি ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে—একটি প্রোটনের সঙ্গে একটি নিউট্রিনোর সংঘাতের ফলে একটি পজিট্রন আর একটি নিউট্রিনো কণিকার উৎপত্তি ছাড়া ? এভাবে পাউলির অনুমান সিদ্ধান্তটির ২৫ বছর পরে আর একটি অতি-কণিকাকেও সনাক্ত করা সম্ভব হল।

বর্তমান শতব্দীর পঞ্চাশোত্তর (১৯৫০-এর পরবর্তী) বছরগুলিতে নিউট্রনের চাইতে বহুগুণ ভারি যেসব কণিকার আবিষ্কার ঘটেছে, সেসব ভারি কণিকা বেরিয়ন (baryons) নামে আখ্যাত হয়েছে। তাদের ভর ১৮৩৬ (প্রোটন) থেকে আরম্ভ করে ২৫৮০ (জাই-হাইপেরন) পর্যন্ত উঠেছে। মাধ্যমিক কণিকাদের (mesons) ভর ২৭৩ (পাই-মেসন)

থেকে প্রায় ৯৭৫ (K-মেসন) পর্যন্ত। আর হাল্কা কণিকাদের (leptons) ভর শূন্য (ফোটন, নিউট্রিনো) বা এক (ইলেক্‌ট্রন, পজিট্রন)। ২০৬-ভর বিশিষ্ট দু'রকম আধানের দু'টি মিউ-মেসনকেও এদের দলভুক্ত ধরা হয়। এইভাবে বর্তমানে অতি-কণিকার সংখ্যা মোট তেত্রিশ। তবে বেশির ভাগ কণিকাই অস্থির প্রকৃতির। তাদের চপল জীবন। জীবৎকাল $১০^{-৬}$ (মিউ-মেসন) সেকেণ্ড্ থেকে $১০^{-১৬}$ সেকেণ্ড্ (পাই-শূন্য মেসন) পর্যন্ত।—এরা যেন সব এক একটি ক্ষেত্র-কণিকা। বিশেষ ক্ষেত্রপরিমাণ দিয়েই বিশেষ বিশেষ কণিকার দেহ গঠিত। যেমন, ফোটন একটি বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্র-কণিকা, আর পাই-মেসনের অধিকাংশই ক্ষেত্র-কণিকা। কিন্তু এই শেষোক্ত কণিকার সঙ্গে বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্র যুক্ত হলে তারা কেবল আধনাত্মক হয়ে উঠেনা। আধানের অবিচ্ছেদ্য ভরটিও তাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় তাদের ভরও বেড়ে যায়। তবে বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্র-কণিকার মত কেন্দ্রকীয় ক্ষেত্র-কণিকাগুলি স্থিতিভর (rest mass)-বিহীন (অর্থাৎ শূন্যভর) নয়। তাই স্থিতিভরহীন বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্র-কণিকা হিসাবে ইলেক্‌ট্রন, পজিট্রন এবং মিউ-মেসন-দ্বয় মাত্র দুই রকমের আধান নিয়ে দেখা দিলেও স্থিতিভরযুক্ত কেন্দ্রকীয় ক্ষেত্র-কণিকাগুলি তিন প্রকারের আধানাত্মক কণিকার রূপ পরিগ্রহ করে সমুপস্থিত হতে পারে। তবে কে-মেসনের ক্ষেত্রে এ নিয়ম অচল। তার কারণ সম্ভবত এই যে, আধানাত্মক কে-মেসনদের তুলনায় নিরপেক্ষ কে-মেসনরা বেশি ভারি। সম্ভবত এদের কেন্দ্রকীয় ক্ষেত্র থেকে বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্রটি বিযুক্ত হয়ে যায়। হাইপেরনদেরও উদ্ভব কেন্দ্রকীয় ক্ষেত্র থেকে, তারাও ত্রয়ী গঠন করতে পারেনা।

কিন্তু ১৯৫৫-তে বিপরীত-প্রোটন এবং তার পরের বছরে বিপরীত-নিউট্রনেরও সাক্ষাৎ মেলায় কেন্দ্রকস্থ চতুষ্টয়-কণিকার অস্তিত্ব স্বীকার্য হয়ে উঠে। কে-মেসনও চতুষ্টয়ী। হাইপেরনও। তবে ইলেক্‌ট্রন, প্রোটন, মিউ-মেসন প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিষম-কণিকাগুলির আবিষ্কারে ডিরাক-তত্ত্বের সত্যতা প্রতিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলেও, তাক লাগিয়েছে কিন্তু বিপরীত-নিউট্রন কণিকাই। যার কোনো আধান নাই, তারও বিপরীত-কণিকা!' ডিরাক-তত্ত্ব নির্ভুল হয়ে যায় বুঝি। তবে নিরপেক্ষ কণিকাগুলির ব্যাপার দেখে এদেরও আধানাত্মক অর্থাৎ নিরপেক্ষ আধানাত্মক মনে করে নিতে হয়। সুতরাং আধান তিন রকমের— ধনাত্মক, ঋণাত্মক ও নিরপেক্ষ। কণিকাদের ঘূর্ণিও তিন প্রকারের ধরা হয়— প্ল্যাঙ্ক্-এককের ($h/2\pi$) একগুণ, অর্ধগুণ ও শূন্যগুণ। আসলে নিরপেক্ষ-নিউট্রনের বৈপরীত্য তাদের চৌম্বক রীতি বা ঘূর্ণিজনিতই। আমরা জানি যে, একটি তেজস্তরে দুই বিপরীত ঘূর্ণিপাকের দু'টি ইলেক্‌ট্রন থাকতে পারে। তবে এই বিপরীত-পাকের জন্য শুধু তাদের বিপরীত গতিটিই বোঝায়। সেজন্য একটি কণিকা পজিট্রন হয়না। এভাবে একই কেন্দ্রকীয় তেজস্তরে দু'টি বিপরীত ঘূর্ণিপাকের দুটি নিউট্রন থাকতে পারে, তজ্জন্য একটিকে যে বিপরীত

নিউট্রন হিসাবে একটি সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের কণিকা বলতে হবে এমন কথা নাই। কিন্তু ইলেক্‌ট্রন আর পজিট্রন শূন্যভর হওয়ায় তাদের বৈপরীত্য বিশেষ অর্থযুক্ত হয়। একটি ইলেক্‌ট্রনের গতিবেগ ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে যতই আলোর গতির নিকটবর্তী হয়, তার ঘূর্ণির দিকটিও ততই তার গতিবেগের নিকটবর্তী হতে থাকে। অথচ বিপরীত আধানাত্মক পজিট্রনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ব্যাপার ঘটে। গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে তার ঘূর্ণিটিও সেই গতিবেগের দিকটির প্রায় বিরুদ্ধ হয়ে উঠে। তাতে ঐ কণিকা এবং বিপরীত-কণিকা (ইলেক্‌ট্রন ও পজিট্রন), এতদুভয়ে মুখামুখী হলে একের নিম্নমুখী বেগধারার সঙ্গে অন্যের উর্ধ্বমুখী ধারার সংগম ঘটে যাওয়ায় তারা অন্তর্হিত হয়ে ক্ষেত্র-পরিণতি ঘটিয়ে তুলে।

ওদিকে দেখা যায় যে, পাই-মেসন সরাসরি ইলেক্‌ট্রনে পরিণত হয়না। প্রথমে কেন্দ্রকীয় কণিকারূপী একটি পাই-মেসন বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্র-কণিকাতে অর্থাৎ ঋণাত্মক মিউ-মেসনে রূপান্তরিত হয়। তারপর মিউ-মেসনটির ইলেক্‌ট্রনে রূপান্তর ঘটে। কিন্তু ইলেক্‌ট্রনের পক্ষে মেসনের সমস্ত ভরটি গ্রহণ করা সম্ভব হয়না বলে অবশিষ্ট ভর সহ একটি নিউট্রিনোরও উৎপত্তি ঘটে। অবশ্য সে-ভরটির প্রায় সবটিই গতিতেজ হিসেবে নিউট্রিনোতে বর্তে যায়। কিন্তু 'ভর-তেজের সমতুলতা'র তত্ত্বানুযায়ী উৎপাদক-কণিকার ঘূর্ণি-পরিমাণটি উৎপন্ন কণিকাবৃন্দের মোট ঘূর্ণি-পরিমাণের সমান হওয়া চাই। অথচ এখানে উৎপাদক মিউ-মেসন এবং উৎপন্ন ইলেক্‌ট্রন ও নিউট্রিনোর সকলের ঘূর্ণিই অর্ধ-পরিমাণ ক'রে। এই কারণেই নিউট্রিনো (বা বিপরীত নিউট্রিনো)-কণিকার অর্ধ-পরিমাণ ঘূর্ণিকে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য তার ঠিক বিপরীত একটি কণিকার উদ্ভবও অনিবার্য হয়ে পড়ে। এভাবেই নিউট্রিনো এবং বিপরীত-নিউট্রিনোর উৎপত্তির কথা ভাবতে হয়েছে। কিন্তু পাই-মেসনের ক্ষেত্রে মাত্র কণিকাযুগলের উৎপত্তি ঘটে, তার কারণ এর ঘূর্ণি পরিমাণ ১। সুতরাং পাই-মেসন (ধনাত্মক বা ঋণাত্মক) থেকে উৎপন্ন মিউ-মেসনের (অনুরূপ আধানের) $\frac{1}{2}$ পরিমাণ ঘূর্ণিকে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য $\frac{1}{2}$ পরিমাণের একটি মাত্র নিউট্রিনো (অনুরূপ আধানের) হলেই কাজ চলে যায়। হাইপেরন থেকে প্রোটনের উৎপত্তি ঘটে। পাই-মেসনেরও। দু'টি রূপান্তর যেন দুই সীমান্তবর্তী ঘটনা। হাল্কা কণিকার ক্ষেত্রে ইলেক্‌ট্রন আর নিউট্রিনো, এবং ভারি কণিকার ক্ষেত্রে প্রোটন আর পাই-মেসনের উদ্ভব। এভাবে কণিকার উদ্ভবের মধ্য দিয়েই বিদ্যুৎ-তেজাধানের এবং ঘূর্ণিরও মোট পরিমাণটি চির অব্যাহত থেকে যায়।

এই রকম নানাভাবেই অতিকণিকাগুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হতে থাকে। তন্মধ্যে কেন্দ্রক-সংঘাতের ফলেই সব চাইতে জোরাল ক্রিয়া ঘটে যায়। তার জন্য প্রায় $১০^{-২৩}$ সেকেণ্ডের মত সময় লাগে। বিদ্যুচ্চৌম্বক প্রতিক্রিয়াটিও খুব জোরাল হয়। ইলেক্‌ট্রন ও

পজিট্রনের সংঘর্ষে দুটি গামা-ফোটনের উদ্ভব ঘটে। এ প্রক্রিয়াতে নিরপেক্ষ পাই-শূন্যমেসন গামা-ফোটনে পরিণত হয়। $১০^{-১৭}$ সেকেণ্ডের মত সময় লাগে। কিন্তু সব চাইতে দুর্বল ধরনের দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টান্তই বেশি। এই প্রক্রিয়ার মারফতেই নিউট্রন, হাইপেরন, মিউ-,পাই-, এবং কে-মেসনের ক্ষয় ঘটতে থাকে। সেজন্য প্রায় $১০^{-১০}$ সেকেণ্ড্ বা আরও বেশি সময় লাগে। হাইপেরন এবং কে-মেসনগুলি অন্যদের চাইতে ভিন্নভাবে এবং অদ্ভুতভাবেই দল গঠন করে। তাই তাদের অদ্ভুত-কণিকা বলা হয়। তাদের বিশেষ গুণ বা অদ্ভুতত্বের পরিমাণও স্থির করা হয়। কণিকাগুলি জোড়ায় জোড়ায় উদ্ভূত হয় এবং যুগলকণিকাদ্বয়ের মোট অদ্ভুতত্ব শূন্যই থাকে। খুব জোরাল বা বিদ্যুচ্চৌম্বক প্রতিক্রিয়াতেও তাদের অদ্ভুতত্বের পরিবর্তন ঘটেনা। সুতরাং মোট অদ্ভুতত্ব অপরিবর্তনীয় (conservation of strangeness) থাকে। কিন্তু দুর্বল প্রতিক্রিয়াতে এ নিয়ম খাটেনা। [মোট প্রতিরূপতার অপরিবর্তনীয়তার (non-conservation of parity) নিয়ম সেখানে অচল হয়ে পড়ে।] কে-মেসনের ক্ষেত্রে তার প্রমাণ মিলে যায়। ভরের কথা বাদ দিলে কে-মেসনের ত্রয়ী-বিন্যাস অন্য ত্রয়ী-কণিকাবৃন্দের মতই,—ধনাত্মক, ঋণাত্মক এবং নিরপেক্ষ কণিকা, সকলেরই ঘূর্ণি-পরিমাণ শূন্য। কেবল নিরপেক্ষ কণিকাদের ভর বেশি। আধানাত্মক কে-মেসন ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে দু'টি হাল্কা কণিকার উৎপত্তি ঘটে, তারা পাই-মেসন। অন্যান্য কণিকার অবলুপ্তির ফলে যেমন ঘটে, নিরপেক্ষ কে-মেসন থেকেও তদ্রূপ দু'টি করে কণিকার উৎপত্তি ঘটে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, নিরপেক্ষ কে-মেসন থেকে কখনও কখনও তিনটি পাই-মেসনেরও উদ্ভব হয়। এ-কারণে বিজ্ঞানীরা দু'রকমের নিরপেক্ষ কে-মেসনের বর্তমানতার কথা অনুমান করেছেন—টাউ-মেসন এবং থিটা-মেসন, যদিও ওরা হুবহু একই কণিকা। আশ্চর্য এই যে, একই কণিকা তাহলে একবার দু'টিতে এবং অন্যবার তিনটিতে পরিণত হচ্ছে! কিন্তু মোট তেজ এবং মোট ভর এবং মোট ঘূর্ণি পরিমাণের নিত্যতা যদি বজায় থাকে আশ্চর্যটি কোথায়?

উত্তেজিত পরমাণু থেকে যে ফোটন নির্গত হয়, তার কারণ দেখেছি বিভিন্ন তেজস্তরের ইলেক্ট্রন-মেঘদ্বয়ের পারস্পরিক পার্শ্ব-অনুপ্রবেশ। সে ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনের পক্ষে সন্নিহিত স্তরকে অতিক্রম করে দূরতর স্তরেও লাফিয়ে যাওয়া সম্ভব। ১৯২৪ খ্রী.-এ এ-সত্য পরীক্ষিত হয়। কিন্তু একে পরিমাণ-তত্ত্বের ভিত্তিভূমিতে আনবার জন্য পরবর্তীকালে তরঙ্গধর্ম বা তরঙ্গকৃত্যের প্রতিরূপতার (parity of the wave function) কথা অনুমান করতে হয়। কোনো বস্তুর প্রতিরূপ বলতে তার আয়নাতে প্রতিফলিত রূপ বা মুকুর-প্রতিসম রূপের কথা বুঝতে হবে। অর্থাৎ আয়নায় যেমন দক্ষিণ অঙ্গকে বাম অঙ্গ এবং বাম অঙ্গকে দক্ষিণ অঙ্গ বলে মনে হয়, সে রকম। ছবি তোলার ব্যাপারেও প্রথমে প্রতিচ্ছবিতে ঐ রকম ঘটে। কিন্তু তারও প্রতিচ্ছবি নেওয়া হলে ফটোতে ঐ ত্রুটি শুধরে যায়,

তখন আসল বস্তুটিকে তার যথার্থ ভঙ্গিতে পাওয়া যায়। শ্রডিংগার-সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে, পারমাণবিক ইলেক্ট্রনের ক্ষেত্রে নতুন তেজস্তরে উল্লম্ফনের মধ্য দিয়ে প্রতিরূপতার পরিবর্তন ঘটেনা। যদি ইলেক্ট্রনের তরঙ্গকৃত্য (wave function) প্রথমে সমরূপ (even) থাকে এবং তারপর অন্য তেজস্তরে উল্লম্ফনের পর সেটি বিষমরূপ (odd) হয়ে যায় তাহলে তার কারণ বুঝতে হবে যে উদ্ভূত ফোটনের তরঙ্গকৃত্যও নিশ্চয় বিষমরূপ হয়েছে। ইলেক্ট্রনের গতিবেগটি দক্ষিণাভিমুখী থাকলে তার ঘূর্ণির অভিমুখকে ঊর্ধ্বমুখ, এবং ইলেক্ট্রনের গতিবেগ বাম দিকে থাকলে তার ঘূর্ণির অভিমুখকে নিম্নমুখ ধরা হয়। আবার মুকুরের মধ্যে দক্ষিণ বামের পারস্পরিক পরিবর্তন প্রতীয়মান হলেও, ঊর্ধ্বকে ঊর্ধ্বই মনে হয়, নিম্ন নিম্নই থেকে যায়। সুতরাং দক্ষিণ-গতির কোনো ইলেক্ট্রন মুকুরে প্রতিফলিত হলে তাকে তার বাম-গতি সত্বেও ঊর্ধ্বমুখী মনে হবে। তাহলে আসল ইলেক্ট্রনটিতে প্রতিসম ইলেক্ট্রনটির ঘূর্ণিগত পাকটির কোনো অস্তিত্বই থাকছেনা। তা যদি সত্য হয়, তাহলে ইলেক্ট্রনটিকে একটি বিষমরূপী কণিকা বলতে হয়। কারণ, সে সমরূপী হলে তার মুকুর-প্রতিফলিত সত্তাটি ভিন্নরূপী হতে পারতনা। সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, মূল কণিকার প্রতিরূপতাটি, তা থেকে উৎপন্ন কণিকাবৃন্দের প্রতিরূপতার মোট ফলের সমান থাকে। অর্থাৎ মোট প্রতিরূপতার অপরিবর্তনীয়তার নিয়মটি সত্য। কিন্তু দু'টি পাই-মেসনের জন্মদাতা হিসাবে নিরপেক্ষ কে-মেসনটি (টাউ-মেসন) একটি সমরূপী কণিকা হওয়া সত্বেও যে তিনটি মেসনের জন্মদাতা হিসাবে (থিটা-মেসন) আবার কি করে একটি বিষমরূপী কণিকার ধর্ম প্রকাশ করতে পারে, সেইটিই এক আশ্চর্য বা রহস্যময় ব্যাপার।

তাহলে প্রকৃতির আয়নাটি কি নিখুঁত নয়? তাহলে কি দিক্‌সাম্য (equivalence of directions) বা সমসত্বদেশের (isotropy of space) পরিকল্পনাটি ভ্রান্ত? দু'জন তরুণ বিজ্ঞানী লি (Li) এবং ইয়ং (Young) সাহস করে বললেন যে, কে-মেসনের ক্ষয়প্রাপ্তি কিংবা পূর্বোক্ত অন্যান্য দুর্বল প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রতিরূপতা সম্বন্ধীয় অপরিবর্তনীয়তার তত্ত্ব ঠিক থাকতে নাও পারে। হিসাব মত বুঝা যায় যে, তা যদি হয় তাহলে কেন্দ্রকীয় বিটা-ক্ষরণ কালে ইলেক্ট্রনরা বেশির ভাগই কেন্দ্রকীয় ঘূর্ণির বিপরীত দিক ধরেই ছুটে যাবে। পরীক্ষায় সে সত্য প্রমাণিত হল। কিন্তু উক্ত বিজ্ঞানীদ্বয় এবং পৃথকভাবে সোভিয়েত বিজ্ঞানী ল্যাণ্ডাউ (L. Landau) জানালেন যে, তজ্জন্য দেশকে প্রকৃতির একটি বিকৃত মুকুর মনে করা যায় না। কারণ, যে-খুঁত ধরা পড়েছে, আসলে তা দেশের নয়, তা কণিকার। তাহলে আয়নাতে আমরা যে ইলেক্ট্রনের অস্তিত্বহীন ঘূর্ণিপাকটি লক্ষ্য করেছিলাম, আসলে তা অস্তিত্বযুক্ত। কোনো কণিকা আয়নাতে প্রতিফলিত হলে যা দেখা যায়, তা ঐ মূল কণিকারই প্রতিকণিকা বা বিপরীত-কণিকা (anti particle)। ইলেক্ট্রনের বিপরীত-কণিকা পজিট্রন, এবং নিরপেক্ষ কে-মেসনের

বিপরীত-কণিকা নিরপেক্ষ বিপরীত কে-মেসন। পরীক্ষাতে দেখা গেছে, নিরপেক্ষ কে-মেসন হচ্ছে দু'টি কণিকার এক মিশ্রণ। তারা হচ্ছে কে-শূন্য মেসন (K-Zero-meson) এবং তার বিপরীত-কণিকা। প্রথমটি বিষমরূপী (cdd) এবং দ্বিতীয়টি সমরূপী (even)। এইখানেই কে-মেসনের মূল রহস্য। সুতরাং কোনো কণিকার গতিবেগের অভিমুখ অনুযায়ী তার ঘূর্ণি সমাবেশ ঘটে, এবং তা ঘটে তার বিপরীত-কণিকার ঘূর্ণিপাকটির বিপরীতমুখেই। একটি ইলেক্‌ট্রন তার অক্ষের চতুর্দিকে ঘুরছে বলা যায়না। সে যেন একটি শঙ্খিল-সূত্র ধরে বামবর্তে নেমে চলেছে, আর তার বিপরীত-কণিকা অর্থাৎ পজিট্রনটি ঐ ভাবে দক্ষিণাবর্তে উঠে যাচ্ছে। সুতরাং কণিকাদ্বয়ের দক্ষিণাবর্ত বা বামাবর্ত, কিংবা উর্ধ্ব বা নিম্নাভিমুখ বা তাদের আবর্তাভিমুখই তাদেরকে বিপরীত কণিকাদ্বয়ে পরিণত করে দিচ্ছে।

পার্থিব প্রকৃতিতে বিপরীত-ইলেক্‌ট্রন বা পজিট্রনের অত্যল্পতা, এবং ইলেকট্রনের বাহুল্য ও তজ্জনিত সর্প-শঙ্খ-হৃৎপিণ্ডাদির বামাবর্ত লক্ষ্য করে, এবং বিশ্বের প্রতিরূপতা বা রূপতুল্যতার তত্ত্বের কথা চিন্তা করে কেউ কেউ অনুমান করেন যে, বিপুল বিশ্বের মধ্যে আবার এমন জগৎও থাকতে পারে যেখানে পজিট্রনেরই আধিক্য (তু., পৃ. ৩৩৩)। সেখানে বিপরীত-কেন্দ্রকযুক্ত বিপরীত-পরমাণুরই প্রাদুর্ভাব। সে কেন্দ্রক চতুর্দিকে ঘূর্ণ্যমান পজিট্রন নিয়ে বিপরীত-প্রোটন এবং বিপরীত-নিউট্রন দিয়ে তৈরী। পৃথিবীর জীবজন্তুর সব কিছুই সেখানে উল্টো বা মুকুর-প্রতিসম। সেখানকার আইন-কানুন সবই এখানকার মত। কিন্তু তার সব রূপই আমাদের রূপের বিপরীত-রূপ। তাই সে আমাদের সান্নিধ্যে এলেও তাকে দেখা বা বোঝা কখনও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এ জগৎ আর সেই বিপরীত-জগতের সীমান্ত অঞ্চলের সন্ধান মিলে যেতে পারে। সেখানে উভয় জগতের বিপরীত-কণিকা সংঘাতের ফলে কেবল ফোটন বা পাই-মেসন কণিকার উদ্ভব ঘটায় অঞ্চলটি নিশ্চয় এই দু'টি কণিকায় ভরপুর হয়ে থাকবে। কিন্তু সে অঞ্চলের সন্ধান আজও কোথাও মেলেনি।

কিন্তু এভাবেই প্রাথমিক কণিকাগুলি একে একে এসে বিজ্ঞানীর সামনে ভেসে উঠল। পৃথিবীর আওতায় ওদের জন্ম জন্মান্তর ঘটছে বলে ওদের আমরা পার্থিব না বলে পারিনা। ওদের নিয়েই তো আমাদের যা কিছু কারবার। আমাদের চারদিকে যারা রয়েছে তাদের বিষয় তো দূরের কথা, আমাদের এই অস্তিত্ব-প্রকাশক দেহটিরও প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু ওদের দিয়েই গড়া। এ দেহটিকে যদি পার্থিব বলতেই হয়, তাহলে ওদেরও পার্থিব না বলি কী করে! যুগ যুগ ধরে বহির্বিশ্ব থেকে বহুদূরে ধরিত্রী-জঠরে আজন্ম লুকানো রয়েছে যে সোনা আর মাণিক (পৃ. ১), তার দেহটিও যদি ঐ সব কণিকা দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে, তাহলে ওদের পার্থিব বলবনা তো পার্থিব বলব কাকে?

কিন্তু যে অসংখ্য অগণ্য কণিকার দল মহাজগৎ থেকে যাত্রা করে দূর দূরান্তর পাড়ি দিয়ে যুগযুগান্তর ধরে এই পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে, তাদেরও আমরা অপার্থিব না বলে পারি কি করে?—সেই সব পূর্ববর্ণিত মহাজাগতিক-রশ্মিকে? মানুষ ওদের উৎস সন্ধানে বহুদূরে উড়ে গিয়েছে। পৃথিবী থেকে বহুদূরে অপার্থিব জগতে। সর্বত্র ওদের গতিবিধি, ওদের বাস্তব অস্তিত্ব। কী করে তাহলে ওরা আমাদের একান্ত এ-ধরণীর ধন? তাহলে কি সত্যিই একই মহাসূত্রে গ্রথিত হয়ে রয়েছে এ পৃথিবী আর ঐ মহাজগৎ, গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকা? কিন্তু আজ আর এ প্রশ্ন সেই প্রথমবারের (পৃ ১) মত নয়। ক্রমেই বিশ্বজগতের ঐ সব উপাদান-কণিকার ইতিহাসমালা ধরা পড়ছে। মহাজাগতিক রশ্মির মূল জীবন-বৃত্তান্তটি ক্রমে ক্রমে জানা হয়ে যাচ্ছে। আর তারই সঙ্গে জানা হয়ে যাচ্ছে এই পৃথিবীর সাথে তার নিবিড় সম্পর্কটিরও গোপন কাহিনী। সে বৃত্তান্ত আরও বিশদ্‌ভাবে শোনা গেল আরও আধুনিক কালের বিজ্ঞানীর কাছে। আগেকার ধারণাকে তাই কিছুটা পালটাতে হবে বৈ কি!

এখন জানা যাচ্ছে যে, ইলেক্‌ট্রনরা মহাজাগতিক প্রাথমিক-কণিকা নয়। আগেই আমরা দেখেছি যে (পৃ. ৩৩০), আধানযুক্ত কণিকারা মহাজগৎ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসার সময় তাদের বেশির ভাগই ভূ-মেরুর দিকে বেঁকে যায়। কিন্তু যারা খুবই উচ্চতেজসম্পন্ন, তারা অবশ্য বিষুবরেখার দিকে চলে আসতে পারে। তবে তারা লম্বভাবে পৃথিবীতে পৌছায়না। তির্যকভাবে এসে পড়ে এবং তাদের অভিমুখ থেকেই তাদের আধানপ্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। দেখা গেছে যে, ধনাত্মক-কণিকা হলে তারা পশ্চিম থেকে পূর্ব অভিমুখে হেলে বিষুবরৈখিক অঞ্চলে এসে পড়বে। আর ঋণাত্মক-কণিকা হলে তাদের অভিমুখ হবে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। বিষুবরেখার বিভিন্ন অঞ্চলে ভের্ণভের (S N. Vernov) অনুসন্ধান থেকে জানা গিয়েছে যে, পূর্বোক্ত কণিকারা সব পূর্বমুখী, সুতরাং ধনাত্মক-কণিকা। সুতরাং ওদের পক্ষে ইলেক্‌ট্রন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। তাছাড়া, দূর আকাশ থেকে আবহমণ্ডল অতিক্রম করে কোনো প্রাথমিক ইলেক্‌ট্রন-কণিকাকে পৃথিবীপৃষ্ঠে এসে পৌছতে হলে তার তেজ হওয়া উচিত অন্ততপক্ষে ১০^{১৩} (১০ লক্ষ কোটি) ই. ভো.। ভের্ণভ্ দেখলেন যে, আবহমণ্ডলের উচ্চস্তরে ওরকম শক্তির ইলেক্‌ট্রন একেবারেই অনুপস্থিত। সুতরাং প্রাথমিক ইলেক্‌ট্রন-কণিকার পক্ষে মহাজগৎ থেকে পৃথিবীতে নেমে এসে কোনোপ্রকার দ্বৈতীয়িক কণিকা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। আবার প্রাথমিক-কণিকা হিসাবে ধনাত্মক পজিট্রন বা মেসনের পক্ষেও এতদূরে এসে পৌছান যে সম্ভব নয়, তার কারণ ওদের আয়ু অত্যন্ত অল্প। সুতরাং খুব সম্ভব যে, ঐ ধনাত্মক-কণিকাগুলি প্রোটনই। ভূ-পৃষ্ঠে মহাজাগতিক-বিকিরণের মধ্যে যে প্রোটন পাওয়া যায়না তার কারণ, নেমে আসার

সময় আবহমণ্ডলের মধ্যেই ওরা শোষিত হয়ে পড়ে। কিন্তু যতই ওপরে ওঠা যায়, ততই ওদের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়।

তবে প্রোটনই মহাজাগতিক-রশ্মির একমাত্র উপাদান নয়। সে রশ্মির চেহারাটি জটিল। পঞ্চাশ কিলোমিটার উঁচুতেই বায়ুস্তর এত হাল্কা হয়ে যায় যে, পদার্থ সংঘাতের ফলে মহাজাগতিক কণিকা থেকে বড় একটা দ্বৈতীয়িক কণিকার উদ্ভব ঘটতে পারেনা। এমনকি, ২২, ২৪ কি. মি. পেরিয়ে গেলেই এমন সব উচ্চশক্তি কণিকার সাক্ষাৎ মেলে, ফটোপ্লেটের প্রলেপ থেকে যাদের আধান বেশ বড় মাপের বলেই বোঝা যায়। ৩০ কি.মি. উঁচুতে দেখা যায়, তখনও ওদের মাটিতে নেমে আসার জন্য প্রবল ঝোঁক। এ থেকেও ওদের মহাজাগতিক প্রাথমিক-কণিকা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু নিচে নামার সময় ওদের তেজ কমতে থাকে এবং ওদের দ্বারা আয়নায়ন প্রক্রিয়া বেড়ে যায়। এসব কণিকার আধান দেখা গেছে, ছয় (কার্বন-কেন্দ্রক) থেকে চল্লিশ (জির্কোনিয়াম-কেন্দ্রক)- বা একচল্লিশ (নিওবিয়াম-কেন্দ্রক)- মাপের পর্যন্ত হতে পারে। আর এদের সঙ্গে থাকে প্রভূত পরিমাণ হিলিয়াম কেন্দ্রক। কিন্তু আশ্চর্য যে, লিথিয়াম, বেরিলিয়াম বা বোরনের কেন্দ্রককে এদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়না বললেই চলে। তেজক্ষয়ের সঙ্গে এই সব পৃথিবী-পারের কণিকা ক্রমে ক্রমে ইলেকট্রন দখল করতে থাকে এবং পার্থিব ইলেকট্রনগুলি তখন এদের পাশে যথাস্থানে হাজির হয়ে গিয়ে এক একটি থাপ বা তেজস্তর গঠন করে তুলে। এভাবে মহাজাগতিক-প্রোটনের সঙ্গে পার্থিব-ইলেকট্রনের অবস্থান-সন্নিবেশের মাধ্যমে পার্থিব বস্তুর পারমাণবিক উপাদান গড়ে উঠে। কিন্তু আশ্চর্য যে, মহাজাগতিক কণিকাগুলি দূর জগৎ থেকে যে-পরিমাণ আধান বহন করে আনে, তা তার তেজের সঙ্গে বিশেষ অনুপাত বা সামঞ্জস্য রক্ষা করে আসে। প্রত্যেকটি আধানের জন্য বরাদ্দ থাকে ২০০ বা ৩০০ কোটি ই.-ভো. তেজ।

একটি সোভিয়েৎ বিজ্ঞানীদলের অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, মহাজাগতিক প্রাথমিক-কণিকাগুলি যখন পৃথিবীর আবহাওয়ার মধ্যে এসে পৌছায় তখন পার্থিব পরমাণু-কেন্দ্রকের সঙ্গে তাদের ক্রমাগত সংঘাতের ফলে বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বহু প্রকারের কণিকাধারা প্রবল বেগে নিক্ষিপ্ত হয়ে চারদিকে ছুটে যায়। তাদেরও অনেকে আবার অন্য পরমাণু-কেন্দ্রকে আঘাত হেনে পুনর্বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তুলে, এবং এভাবে চতুর্দিকে কণিকাপ্রপাত চলতে থাকে। ইলেক্ট্রন বা উচ্চশক্তির গামা-তেজসঙ্ঘরা যেভাবে প্রপাত ঘটায়, তার সঙ্গে অবশ্য এ-রকম প্রপাতের মৌলিক পার্থক্য আছে। ইলেক্ট্রন-জনিত প্রপাত ঘটে কেন্দ্রকের পাশেই এবং তা ঘটে ইলেক্ট্রন, পজিট্রন আর গামা-তেজসংঘের। কিন্তু কেন্দ্রক-বিস্ফোরণের ফলে প্রপাতটি ঘটে কেন্দ্রকের মধ্যেই এবং তাতে বহু প্রকারের কণিকা-প্রপাত দেখা যায়। প্রোটন, নিউট্রন, ভারি-মেসন এবং

্াইপেরনের মত কেন্দ্রকীয় কণিকা তার সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে এবং তারাও আবার কেন্দ্রক-বিস্ফোরণ ঘটায়। আর দেখা যায় কেন্দ্রক-নিষ্ক্রিয় মেসন এবং মেসনের ক্ষয় প্রক্রিয়া-জাত ইলেট্রন ও পজিট্রন।

পার্থিব পরমাণু-জগতের ওপার থেকে মহাজগতের প্রাথমিক-কণিকাদল ভেসে আসে; আর আসে অপরিমেয় আলোকধারা। দূর মহাকাশ পাড়ি দিয়ে ওরা প্রচণ্ড বেগে অবিরত ধেয়ে আসে। আমাদের সংসারকে চালিয়ে চলেছে আমাদেরই আলো, আমাদেরই পরমাণু, আমাদেরই পার্থিব প্রাথমিক-কণিকা। তাদের মাঝেই ঠাঁই পায় দূরাগত অতিথির দল। কিন্তু তবুও ওরা বিদেশী—পরমাণুপারবাসী। চলন আর রীতি ওদের কেমন যেন আলাদা। ভিন্ন শ্রেণীর ওরা—হয়তো বা সত্যিই অপার্থিব; কিন্তু মহাজাগতিক। কিন্তু পৃথিবীর আবহমণ্ডল পেরিয়ে আসার সময় ওদের সে চলন, সে আবেগ আর ঠিক তেমনটি থাকেনা। এদেশের হাওয়া গায়ে লাগে—তেজ কমে যায়, কিছুটা এদেশী ওদের হতেই হয়। তবুও ওরা সবটা শ্রেণী-চরিত্র পালটাতে পারেনা। কিন্তু এখানকার প্রাথমিক-কণিকাশ্রেণীর সঙ্গে ভাব জমিয়ে বেশ এদেশী হয়ে পড়ে কোথাও কখনও। পরমাণুতে ঘর বাঁধে, পার্থিব হয়ে যায়। আবার কোথাও ওরা পৃথিবীর খুব কাছে এসেও পৃথিবীর পরমাণুকে সইতে পারেনা, আঘাতের পর আঘাত হেনে তার ঘর ভেঙে দেয়, নিজেদের মত তারও প্রাথমিক কণিকাদের যাযাবর করে তুলে। পদার্থের এই ভাঙা আর গড়া নিয়ে এদেশ আর ওদেশের সীমানা। সীমানাটি তাই স্থান বা দেশ সম্পর্কিত হতে পারেনা কিছুতেই; পদার্থলীলার চির সক্রিয় অবিচ্ছিন্ন ধারায় কালও ঠাঁই পায়না কোথাও।

পরমাণুর পরিণাম

প্রথম পর্ব

গল্পটি কোথায় হারিয়ে গেল! পজিট্রন-মেসনের ভিড় ঠেলে তাকে উদ্ধার করতেই হয়। পরমাণুর অন্তঃপুরে যে-কণিকা নিরপেক্ষ হয়ে লুকিয়ে থাকে, বিজ্ঞানীর হাতে ধরা দিয়ে সে ইতিহাস রচনা করল। কিন্তু তার ইতিহাসের সেই গল্পটি মানুষেরই হাতে গড়া। তার অনিবার্য পরিণামটি তাই মানুষেরই ভোগ্য হয়ে গেল। সেই লুকিয়ে থাকা নিরপেক্ষ-কণিকা যেদিন সূক্ষ্মতম অদৃশ্য পারমাণবিক জগৎ-বিজয়ের মহাস্ত্র হিসাবে বিজ্ঞানীর হাতে ধরা পড়ল, সেদিন থেকেই যেন মহামানবের ইতিহাস হয়ে উঠল অমানুষিক এক ভৌতিক গল্প। কার ভুল কে জানে! হয়ত বিজ্ঞানীর, নাহলে মানুষের জীবনে এত বড় বিপর্যয় ঘটবে কেন? নাহলে কেনই বা শান্তিকামী নিরাসক্ত বিজ্ঞানী তাঁর অনাসক্তির ঝোঁকে পশ্চাৎপদ আসক্ত মানুষের হাতে সে অস্ত্রটি তুলে দেবেন! বিজ্ঞানীর জীবনেতিহাসে অমন অবৈজ্ঞানিক কাজ আর কী ঘটেছে! পরিণামটি তাই সত্যিই হয়ে উঠল বিজ্ঞানী ও অজ্ঞান নির্বিশেষে সকল মানুষেরই 'নিঠুর' পরিণাম। প্রাকৃতিক বা বস্তুসত্যের পথ ধরেছিলেন বিজ্ঞানী। মহানতম মহামানবিক পথ। কিন্তু প্রকৃতির জগৎ বা বস্তুজগৎ থেকে যে নরসমাজ জেগে উঠল, তার মধ্যে যে প্রকৃতির বৃহত্তম সত্যটি বিবর্তিত হয়ে উঠেছে, সেদিকে তিনি তাঁর দৃষ্টি সজাগ রাখতে পারলেননা। আপনারই অজ্ঞাতে সূক্ষ্মতম জগতের সূক্ষ্মতম সত্যের অভিমুখে তাঁর ঝোঁক (inertia) এসে যেতে লাগল। নিরপেক্ষ বিজ্ঞানী 'নিরপেক্ষ' নিউট্রন-সূত্রে বাঁধা পড়ে গেলেন। চ্যাড্উইক সম্ভবত বুঝেছিলেন, (পৃ. ৩০৮) বিজ্ঞানীরা কাণা-গলিতে পড়েছেন। কিন্তু সমাজের বড় অংশটিই ক্রমে ক্রমে কাণা গলিতে পড়ে গেল। ইতিহাসটিও তাই যেন দেখতে দেখতে কেমন করে গল্পের মতই হয়ে উঠল।

এ গল্পের শুরু হল ঐ তথাকথিত 'নিরপেক্ষ' কণিকার আবিষ্কারের সামান্য একটু পরে, ১৯৩৩ খ্রী.-এর একেবারে শেষ এবং ১৯৩৪ খ্রী.-এর একেবারে প্রথম দিক থেকেই। শুরুতে এখানেও এ গল্প ছিল সত্যই একটি ইতিহাস। পূর্বের মতই সত্যানুসন্ধানের যথার্থ ইতিহাস এবং একটি সত্যকে পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে অন্য সত্যটি চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। মেরি কুরির কন্যা ইরিন এবং জামাতা ফ্রেডারিস জোলিও পরীক্ষা করে দেখছিলেন, কিভাবে আল্ফা-কণিকার আঘাতের ফলে বেরিলিয়াম-কেন্দ্রকের মত অন্যান্য উপাদানের কেন্দ্রক থেকেও নিউট্রন-কণিকা নিক্ষিপ্ত হয়ে বেরিয়ে আসে। অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি উপাদান নিয়ে তাঁরা পরীক্ষা করছিলেন। আগেই জানা হয়েছিল (পৃ. ২৭৫),

আল্‌ফা-কণিকা দিয়ে অ্যালুমিনিয়াম-কেন্দ্রক বিদ্ধ করা হলে সেটি সিলিকন-কেন্দ্রকে রূপান্তরিত হয়ে যায়। দেখা গেল যে, রূপান্তর-প্রক্রিয়াতে নিউট্রনের উৎক্ষেপ ঘটছে। কিন্তু ধনাত্মক ১৩-আধান যুক্ত অ্যালুমিনিয়ামের ($_{১৩}Al^{২৭}$) সঙ্গে ২-আধান যুক্ত আল্‌ফা-কণিকা যুক্ত হয়ে যখন ১৪-আধানের সিলিকন ($_{১৪}Si^{২৯}$)-কেন্দ্রক পাওয়া যাচ্ছে, তখন বেশ বোঝা যাচ্ছে যে ওখান থেকে ১-আধানের প্রোটন কণিকাও উৎক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। সুতরাং প্রতিক্রিয়ার ধরনটি হবে :

$$_{১৩}Al^{২৭}+{}_{২}Hi^{৪}={}_{১৪}Si^{২৯}+{}_{১}H^{১}+{}_{0}n^{১}$$
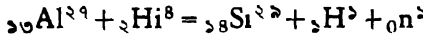
অ্যালুমিনিয়ামের অন্য কোনো আইসোটোপ থাকলে অন্য প্রকারের ব্যবস্থা হতে পারত। কিন্তু ওর আইসোটোপ ঐ একটিই। তবে প্রোটন-কণিকা উৎক্ষিপ্ত না হলে অবশ্য অন্য রকমের প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে। সে প্রতিক্রিয়ার ধরন হবে :

$$_{১৩}Al^{২৭}+{}_{২}Hi^{৪}={}_{১৫}P^{৩০}+{}_{0}n^{১}$$
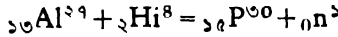
আসল ঘটনাটি কি, তা জানার জন্য জোলিও-দম্পতী অ্যালুমিনিয়ামকে মেঘায়ন-কক্ষের মধ্যে স্থাপন করে আল্‌ফা-কণিকা দিয়ে তার কেন্দ্রক বিদ্ধ করলেন। প্রোটনের মেঘরেখা প্রত্যক্ষীভূত হল। কিন্তু তাঁরা আর একটি রেখাচিহ্নও দেখতে পেলেন। সেটি ঠিক ইলেকট্রনের মত। তার আধান-ধর্ম ঠিক করার জন্য যখন সমগ্র কক্ষটিকে চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপন করে পরীক্ষা করা হল, তখন বোঝা গেল যে ওর আধান ধনাত্মক। অর্থাৎ এটি সদ্য-আবিষ্কৃত পজিট্রন। আশ্চর্য! তাহলে পজিট্রনের সম্পর্কটি কেবল মহাজাগতিক নয়, ওর ইহ-জাগতিক উদ্ভবও সম্ভব! বিজ্ঞানীরা তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেলতে চাইলেন কখন কিভাবে ওদের উদ্ভব ঘটছে। জোলিও লক্ষ্য করলেন যে মিলিতভাবে একটি নিউট্রন ও একটি পজিট্রনের আধান একটি প্রোটনেরই আধান তুল্য। আর তাদের মিলিত ভরও প্রায় প্রোটনের ভরের মত। সুতরাং এমন কি সম্ভব যে, আল্‌ফার আঘাতের ফলে অ্যালুমিনিয়াম কেন্দ্রক থেকে সিলিকন কেন্দ্রক উৎপন্ন হচ্ছে? আর তার সঙ্গে উৎপন্ন হচ্ছে শুধুমাত্র প্রোটন ($_{১৩}Al^{২৭}+{}_{১}Hi^{৪}\rightarrow{}_{১৪}Si^{৩০}+{}_{১}H^{১}$), বা প্রোটনের বদলে নিউটন আর পজিট্রন ($_{0}n^{১}+{}_{+১}e^{0}$)? কিন্তু অচিরেই জানা গেল যে, আল্‌ফা কণিকার অভিঘাত প্রক্রিয়া থামিয়ে দিলে প্রোটন বা নিউট্রনের উৎক্ষেপণ তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেলেও পজিট্রনের ক্ষরণ চলতে থাকে। অর্থাৎ ওখানে তেজস্ক্রিয় প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। ক্ষরণের হার ধীরে ধীরে কমে যায়; বা বিকীর্ণ বস্তুটি এখানে বিটা-কণিকা নয়, পজিট্রন-কণিকা। কিন্তু তবুও এ ঘটনাটি তো আপনাআপনি ঘটছেনা! নিশ্চয় এটি এক ধরনের তেজস্ক্রিয় প্রক্রিয়া। কিন্তু একে প্রকৃতির সংকেত বা প্রাকৃতিক দান বলা যায় কেমন করে? একে যে ঘটিয়ে তুলল স্বয়ং মানুষ!

ম্যাগনেসিয়াম আর বোরনের বেলাতেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটল। আল্‌ফার উৎসকে

সরিয়ে নেওয়ার পরেও পজিট্রন-বিকিরণ চলতে থাকে এবং তা ধীরে ধীরে কমে আসে। তাহলে প্রোটনের বদলে যে নিউট্রন আর পজিট্রনের উৎক্ষেপণ চলে, এ সিদ্ধান্ত আর গ্রহণ করা চললনা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য সিলিকনে রূপান্তর চলে এবং প্রোটন উৎক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু যেস্থলে নিউট্রন উৎক্ষিপ্ত হয়, সেখানে একই সঙ্গে নিশ্চয় পজিট্রন বিকিরণ ঘটেনা। প্রতিক্রিয়াটি হয় প্রথমে তাহলে নিম্নোক্ত রূপ :

$$_{১৩}Al^{২৭} + _{২}H^{৪} \rightarrow _{১৫}P^{৩০} + _{0}n^{১}$$
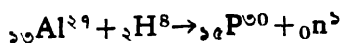
কিন্তু ফসফরাসের জানা আইসোটোপ মাত্র একটি—ফসফরাস-৩১। সুতরাং যদি উক্ত প্রতিক্রিয়া থেকে ফসফরাস-৩০ উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাহলে সেটিকে একটি সুদৃঢ় উপাদান বলা চলেনা। নিশ্চয় সেটি একটি দুর্বল ধরনের অস্থায়ী উপাদান। এ পৃথিবীর আবহাওয়ায় সে স্থায়ীভাবে টেকেনা, ক্রমেই নিজে থেকে ভেঙে পড়ে। কিন্তু ক্রমে সেখান থেকে সিলিকন-৩০ বেরিয়ে এসে স্থায়ী হয়ে টিকে যায় ($_{১৫}P^{৩০} \rightarrow _{১৪}Si^{৩০} + _{+১}e^{0}$)। তখন ১৫-আধানটি ১৪-আধানে নেমে আসে, এবং একটি ধনাত্মক আধান পজিট্রন ($_{+১}e^{0}$)-রূপে বিকীর্ণ হয়ে সার্বজনীন হয়ে যায়। আল্‌ফা-অভিঘাতের ফলে ম্যাগনেসিয়াম-কেন্দ্রক থেকেও এভাবে প্রথমে অস্থায়ী সিলিকন-২৭ এবং তা থেকে স্থায়ী অ্যালুমিনিয়াম ২৭-এর রূপান্তর ঘটে। বোরন থেকেও এভাবে অস্থায়ী নাইট্রোজেন-১৩ আইসোটোপ এবং তারপর তা থেকে স্থায়ী কার্বন ১৩-এর সৃষ্টি হয়, আর মধ্যবর্তী প্রতিক্রিয়ায় ঐ পজিট্রন-বিকিরণ ঘটনা। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঘটনাটি তাহলে স্থায়ী উপাদান অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম বা বোরনের নয়। সে ঘটনার জন্মদাতা ঐ অস্থায়ী ফসফরাস, অস্থায়ী সিলিকন ও অস্থায়ী নাইট্রোজেনই। কিন্তু যাদেরকে এতকাল তেজবিহীন শান্ত পদার্থ বলে জানা ছিল, তারাও তাহলে মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে, অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে হলেও, হয়ে উঠতে পারে তেজস্ক্রিয়! হোক না কেন তারা অস্থায়ী! অস্থায়ী কি রেডিয়াম নয়? বা ইউরেনিয়ামও? জোলিওকে অবশ্যই বাস্তবভাবে প্রমাণ করতে হয়েছিল, অ্যালুমিনিয়াম আর সিলিকনের মধ্যবর্তী বস্তুটি আর কিছু নয়, ফসফরাসই। তিনি অত্যন্ত জটিল রাসায়নিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সুনিপুণভাবেই সেটি প্রমাণ করেছিলেন। কিন্তু বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে চিরদ্বন্দ্বে আজ মানবপ্রকৃতি বা মানুষই সুনিশ্চিতভাবে জয়যাত্রা শুরু করে দিল। প্রকৃতির দানকে সে দু'হাত পেতে নিয়ে মাথায় তুলে ধরেছে। কিন্তু প্রকৃতির বদান্যতার দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে সে নিষ্ক্রিয় অলস হয়ে যায়নি। এক নবোদ্ভূত অপরূপ সত্তা সে। তাই নিজে সে এগিয়ে গিয়ে প্রকৃতির বজ্রমুষ্টি থেকে এক একটি অপূর্ব সম্পদ ছিনিয়ে আনতে ছুটে যায়। স্থায়ী কণিকার প্রকৃতি-রক্ষিত দুর্ভেদ্য অন্তঃপুরে যুগ যুগ ধরে যে তেজ লুকিয়ে থেকে নিথর হয়ে পড়েছিল, মানুষ আজ তার ঘুম ভেঙে দিয়ে তাকে জগৎ-সভায় এনে হাজির করল!

কিন্তু ইলেট্রনের আকর্ষণী ও কেন্দ্রকের বিকর্ষণী শক্তি ভেদ করে যে আল্‌ফা-কণিকার পক্ষে সর্বক্ষেত্রেই সফল অভিঘাত ঘটিয়ে তুলা সম্ভব হয়না, সেকথা আমরা আগেই জেনেছি। বিশেষ করে ভারি উপাদানগুলির কেন্দ্রকে প্রোটন সংখ্যা অধিক হওয়ায় সেখানে তো আল্‌ফা-কণিকা কোনো মতেই গিয়ে পৌছতে পারেনা। সুতরাং ১৯৩৪-এর জানুয়ারি মাসে যখন জোলিও এবং কুরির কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের বিষয় ঘোষিত হল, তখন হাল্কা ভারি নির্বিশেষে সমস্ত উপাদানেরই পরমাণু-কেন্দ্রক বিদ্ধ করার সম্ভাবনা দেখা দিল। ইটালীয় পদার্থ বিজ্ঞানী ফের্মি (**Fermi, Enrico—1901'-55**) তখনই সেই নবাবিষ্কৃত নিরপেক্ষ-নিউট্রন মহাস্ত্র নিয়ে পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন। কয়েকজন প্রতিভাবান পদার্থবিদ্ বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর যাত্রা আরম্ভ হল।

নিউট্রন সংগ্রহ করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় বস্তু থেকে সহজেই আল্‌ফা কণিকা পাওয়া যায়। কিন্তু নিউট্রন পেতে গেলে আল্‌ফা কণিকা দিয়ে প্রথমে কেন্দ্রক বিদ্ধ করা দরকার। অথচ প্রায় দশলক্ষ আল্‌ফার আঘাত থেকে হয়ত একটি মাত্র নিউট্রন মেলে। ফের্মি বেরিলিয়াম গুঁড়োর সঙ্গে রেডিরাম-জাত র‍্যাডন্ মিশিয়ে এ সমস্যার সমাধান করলেন। র‍্যাডন্ গ্যাসীয় পদার্থ, সহজেই উড়ে যায়। সুতরাং আধ ইঞ্চির চাইতেও ছোট যে শিশির মধ্যে বেরিলিয়াম গুঁড়ো রাখা হয়েছিল, তার নিম্নাংশটিকে তরল বাতাসের মধ্যে রেখে তার মধ্যে র‍্যাডন্ ঢেলে তাকে জমাট করে নেওয়া হল। তা সত্ত্বেও র‍্যাডন্ উড়ে যেত বলে সপ্তাহে একবার করে তাতে র‍্যাডন্ ঢালা দরকার হত। কিন্তু তেজস্ক্রিয়তা লক্ষ্য করবার জন্য মেঘায়ন কক্ষের বদলে ফের্মি একটি গাইগার-গণকযন্ত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন। যাতে র‍্যাডন্ থেকে বিকীর্ণ কোনো কণিকা গণক-যন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে, তজ্জন্য যন্ত্রটিকে রাখা হয়েছিল বহুদূরে। অথচ কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা স্বল্পস্থায়ী। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার আয়ু এক মিনিটের চাইতেও কম। সুতারাং গণক-যন্ত্রে তার প্রভাব লক্ষ্য করার জন্য নিউট্রন দিয়ে কেন্দ্রকাঘাত করার পর দূরাবস্থিত ঐ যন্ত্রটির কাছে খুব জোরে দৌড়ে যেতে হত। এভাবেই কাজ আরম্ভ হয়। প্রথমে হাইড্রোজেন, তারপর জল, তারপর লিথিয়াম, তারপর বেরিলিয়াম, বোরন, কার্বন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি নিয়ে পরীক্ষা হল। কিন্তু কোনো ফল পাওয়া গেলনা। জলের পরীক্ষা হয়ে যাওয়ায় পৃথকভাবে অক্সিজেনের পরীক্ষার আর দরকার হলনা। কিন্তু ফ্লোরিন পরীক্ষাতেই সুফল পাওয়া গেল। ফ্লোরিনের পরবর্তী উপাদানগুলিও একে একে একই পরিচয় প্রকাশ করে গেল।

কিন্তু তেজস্ক্রিয়তার পরিচয় প্রকাশ করে গেল কারা? নিউট্রনের আঘাতে কারা জেগে উঠল এতকালের ঘুম ভেঙে? উপাদানটির যতটা অংশ তেজস্ক্রিয় হয়ে উঠল,

তাকে যদি ঐ পুরো উপাদান থেকে পৃথক করে না আনা যায়, তাহলে তাকে কি করে সনাক্ত করা যাবে? সেও তো এক মস্ত শক্ত কাজ। রূপান্তরিত এত সামান্য পরিমাণ বস্তুকে সুনিপুণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া মারফতেও বিচ্ছিন্ন করে দেখা যে, প্রায় অসম্ভব বললেই হয়। একটি সহজ পথ আছে যে, যে-উপাদানের পরমাণুগুলি তেজস্ক্রিয় শক্তিকে জানান দিচ্ছে, সেই উপাদানকে যদি ওর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায়, তাহলেই ঐ ক্ষুদ্র ভগ্নাংশটি বিচ্ছিন্ন হয়ে আসতে পারে। কিন্তু সমস্যা তো সেই উপাদানটিকেই জানা। তবে জোলিওদের সিদ্ধান্ত থেকেই একটি হদিশ মিলল যে, নিউট্রন দিয়ে কোনো উপাদানের কেন্দ্রককে আঘাত করলে নতুন যে-উপাদানটির আবির্ভাব ঘটে, পর্যায়িক ছকে তাকে ঐ পূর্বোক্ত আঘাতপ্রাপ্ত উপাদানের খুব কাছেই দেখা যায়। সুতরাং ওর সঙ্গে পাশাপাশি উপাদানগুলি মিশিয়ে দেখা হতে লাগল। যেমন, ২৬-সংখ্যক উপাদান লোহার পরমাণুকে প্রথমে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে তাকে নাইট্রিক অ্যাসিডে গালিয়ে নিতে হল। তারপর তার সঙ্গে ২৪-সংখ্যক ক্রোমিয়াম, ২৫-সংখ্যক ম্যাঙ্গানিজ এবং ২৭-সংখ্যার কোবাল্ট্ মিশিয়ে সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া মারফতে তেজস্ক্রিয় বস্তুটিকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গণক-যন্ত্রের সাহায্যে তাকে বুঝে নেওয়া সম্ভব হল। দেখা গেল যে, ২৬-সংখ্যক উপাদান লোহার কেন্দ্রক ২৫-সংখ্যক উপাদান ম্যাঙ্গানিজের কেন্দ্রকে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এভাবে বিজ্ঞানীবৃন্দ প্রায় ৬০-টি উপাদানকে পরীক্ষা করে দেখলেন। যখন উপাদান-ছকের শেষ উপাদান ৯২-সংখ্যার ইউরেনিয়ামের কাছে গিয়ে হাজির হলেন, তখন তাঁরা দেখে বিস্মিত হলেন যে এক্ষেত্রে একাধিক বস্তুর উদ্ভব ঘটেছে। তাদের মধ্যে এমন একটি তেজস্ক্রিয় উপাদান জেগে উঠছে, যাকে ইউরেনিয়ামের নিকটবর্তী কোনো উপাদান বলে সনাক্ত করা অসম্ভব। তাহলে কি ৯৩-সংখ্যার কোনো নতুন উপাদান পাওয়া গেল, যা তার অস্থায়ী গড়নপ্রকৃতির জন্য পার্থিব আবহাওয়ায় টিকে থাকতে পারেনা।

চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। ইটালীতে তখন ফ্যাসীবাদীদের প্রবল প্রতাপ। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ইটালীয় ফ্যাসীবাদের বিজয় বার্তা ঘোষণার জন্য ফ্যাসী প্রচার যন্ত্রগুলি মুখর হয়ে উঠল। পৃথিবীর সর্বত্র তার ঢেউ গিয়ে পৌছল। কিন্তু তা দেখে শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানী ফের্মিকেও পুনর্ঘোষণা করতে হল যে ৯৩-সংখ্যক উপাদানের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব আছে কিনা, তা প্রমাণ করে দেখা দরকার। কিন্তু দীর্ঘ চার বছরের মধ্যেও সে রকম প্রমাণ কিছু পাওয়া গেলনা। তারপর ১৯৩৮-এর শেষ দিকে নিশ্চিত প্রমাণ মিলল যে, ৯৩-সংখ্যক উপাদানটির কথা একটি গল্পকথা মাত্র। কিন্তু আমাদের আসল গল্পটিও আরম্ভ হল তখন থেকেই। চার বছরেরও বেশি সময় লেগে গেল তার মাল-মশলা বা উপকরণ সংগ্রহ করতে।

১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে পূর্বোক্ত বিজ্ঞানীবৃন্দ যখন তাঁদের গবেষণার কাজ চালিয়ে চলেছেন, তখন একদিন একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল। যে উপাদানটিকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করা হবে, দু'জন গবেষক তাকে সিলিণ্ডারের আকৃতি দান করে তার মাপসই ফাঁপা অংশটিতে সেই বেরিলিয়াম-র‍্যাডনের ছোট্ট শিশিটি ঠিক খাপে খাপে ভরে দেখছিলেন। ওঁদের মধ্যে একুশ বছর বয়স্ক তরুণ গবেষক পন্তেকর্ভো (Bruno Pontecorvo) সর্বপ্রথম দেখতে পেলেন যে, রৌপ্যদেহ সিলিণ্ডারটিকে একটি সীসার বাক্সের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করলে তার আচরণও বিভিন্ন প্রকার হতে থাকে। ফের্মির পরামর্শ মত পাত্রটিকে বাক্সের বাইরে বিভিন্ন স্থানে রেখেও তার ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রত্যক্ষ করা গেল। তারপর শিশিটিকেই সিলিণ্ডারের বাইরে এনে এবং উভয়ের মধ্যে একবার ভারি উপাদান সীসা এবং অন্যবার হাল্কা বস্তু প্যারাফিনের ব্যবধান রেখে পরীক্ষা করা হয়। শেষের পরীক্ষার সময় দেখা গেল যে, নিউট্রনের প্রভাবটি প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে, গাইগার-গণকের কাছে আনামাত্রেই যন্ত্রের কাঁটা যেন প্রচণ্ড আঘাতে আঁৎকে উঠল। ফের্মি ব্যাখ্যা দিলেন যে, প্যারাফিনের অন্তর্গত প্রায় সমভরের হাইড্রোজেন-কেন্দ্রকের (অর্থাৎ প্রোটনের) ধাক্কা খেতে খেতে যাওয়ার সময় নিউট্রন-কণিকা তার গতিবেগ অনেকটা হারিয়ে ফেলে। তখনই ধীরগতি-নিউট্রনের পক্ষে রৌপ্য-কেন্দ্রক বিদ্ধ করে তার তেজস্ক্রিয়তাকে শতগুণ বাড়িয়ে তুলা সম্ভব হয়। হাইড্রোজেন-প্রধান জলের ব্যবধান সৃষ্টি করেও যখন ঐ প্রকার ফল প্রত্যক্ষীভূত হল, তখন এ বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা উৎপাদনের ক্ষেত্রে আল্ফা-কণিকার চাইতে ধীরগতি-নিউট্রনের উপযোগিতা যে বহুগুণ বেশি (পৃ.৩১২) তা প্রমাণিত হল।

ঠিক এক বছর পরে ইথিওপীয় যুদ্ধে ফ্যাসীবাদী ইটালী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ফ্যাসীবাদী অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায় ভেঙে পড়তে লাগল। আগে থেকেই তার প্রভাব বৈজ্ঞানিক গবেষণা-সৌধের ভিতকে ধ্বসিয়ে দিচ্ছিল। ক্রমেই সাধনা-প্রযত্ন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ল। সকলে যেন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। জবরদস্ত্ ফ্যাসীবাদীরাও দুঃস্বপ্নের ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ভিন্ন পথে চলতে চাইলেন। বিজ্ঞানীরাও অনেকে ফ্যাসীবাদের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ছুটে পালাতে চান। কিন্তু কোথায় গিয়ে পৌছবেন তাঁরা ? ফ্যাসীবাদের চাইতেও ভয়াবহ হিটলারী নাজিবাদের আতঙ্কে সারা ইউরোপ যেন তখন শিউরে উঠছে। ১৯৩৫ সালের মার্চ্ মাসে হিটলার ভার্সাই-চুক্তিপত্র অস্বীকার করে এক বছর পরে নিরস্ত্রীকৃত রাইন্ল্যাণ্ড্ দখল করে নিলেন। ইটালির অধিপতি মুসোলিনীর পক্ষে তখন তার দেড় বছর পরে রোম-বার্লিন অক্ষ স্থাপন করে হিটলারের সঙ্গে ভাব জমান ছাড়া গত্যন্তর রইলনা। কিন্তু ১৯৩৮ সালে অমন বন্ধুত্বকেও পদলুণ্ঠিত করে হিটলার অস্ট্রিয়া দখল করে নিয়ে তার ওপর মুসোলিনীর

স্বেচ্ছাকর্তৃত্বের অভিমানকে ধূলিসাৎ করে দিলেন। কিন্তু তখনও হিটলারের পদলেহন ছাড়া মুসোলিনীর আর দ্বিতীয় পথ রইলনা। হিটলারের ইহুদী (ইহুদী জাতীয় ব্যক্তিদের)-বিতাড়ন ও ইহুদী-নিধন যজ্ঞে তিনিও অংশ গ্রহণ করে তাঁর দেশ থেকেও সেমীয়দের (সেমাইট জাতীয়—শেম-এর বংশধরদের সোমাইট বলা হয়) উৎখাত করতে লেগে গেলেন। কিন্তু এসব উৎপাত কতদূর গিয়ে পৌছতে পারে বিজ্ঞানী ফের্মির পক্ষে তা অনুমান করা শক্ত হলনা। ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে সুইডেনের স্টকহোম থেকে নোবেল-পুরস্কার গ্রহণ করতে গিয়ে তিনি সেখান থেকে আর দেশে ফিরলেননা। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তিনি সপরিবারে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন ইউরোপ থেকে বহুদূরে আমেরিকায়। জানুয়ারি মাসের একেবারে প্রথমেই তিনি ওখানে পৌছে যান। হিটলারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ইতিপূর্বে আইনস্টাইনও সেখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। গল্প জমে উঠল ওখানেই। কিন্তু তার আগে আর একটু ইতিহাস আছে।

ফের্মির গবেষণা থেকে একটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। হাল্কা উপাদানগুলি যে তেজস্ক্রিয় উপাদানে পরিণত হয়ে যায়, তা সম্ভব হয় কেন্দ্রক থেকে প্রোটন কিংবা আল্‌ফা-কণিকার উৎক্ষেপণের ফলেই। অথচ ভারি উপাদানগুলির ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টির সময় কেন্দ্রক কর্তৃক নিউট্রন-গ্রেপ্তারের ফলেই তা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে ধীরগতির নিউট্রনই অধিকতর তেজের নিউট্রন অপেক্ষা বেশি কার্যকরী হয় (পৃ. ৩১২)। অথচ বোরন, ইট্রিয়াম, রেডিয়াম, ক্যাড্‌মিয়াম ও ইরিডিয়াম প্রভৃতির পরমাণু-কেন্দ্রক ধীরগতির নিউট্রন দখল করে নিয়েই স্থায়ী কেন্দ্রকযুক্ত আইসোটোপে পরিণত হয়ে যায় (পৃ ৩১১-১৩)। বিজ্ঞানীরা অবশ্য নিউট্রন এবং আল্‌ফা-কণিকা ছাড়াও বর্ধিত বেগের প্রোটন এবং ডিউটেরন (এক প্রোটন ও এক নিউট্রন যুক্ত হাইড্রোজেন-কেন্দ্রক)-কণিকা দিয়েও কেন্দ্রক-অভিঘাতের মারফতে বেশ সুষ্ঠু ভাবেই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উৎপন্ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় প্রক্রিয়ার মূল মর্মটি জেনে নিতেও তাঁদের বিলম্ব ঘটেনি। কেন্দ্রকের মধ্যে প্রোটন এবং নিউট্রনরা জোট বেঁধে থাকে। পর্যায়িক ছকের কোনো উপাদানের পরমাণুর সংখ্যা যত, কেন্দ্রকের ঐ প্রোটন সংখ্যাও (এবং অতিকেন্দ্রকীয় ইলেক্‌ট্রন সংখ্যাও) ততই, বাকিগুলি সব নিউট্রন। কিন্তু রূপান্তরকালে কেন্দ্রকের মধ্যে যে বাড়তি তেজের উদ্ভব হয়, তার ফলেই কেন্দ্রক-সংলগ্ন অঞ্চলে পজিট্রন ও ইলেক্‌ট্রনদেরও উদ্ভব ঘটে। ওরা কোনও জন্মমরণহীন পৃথক্‌সত্ত্ব কেন্দ্রকীয় কণিকা নয়। হাল্‌কা উপাদানগুলিতে আল্‌ফার অভিঘাতে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উৎপাদনের ক্ষেত্রে জোলিও-কুরি মেঘায়ন-কক্ষের মধ্যে ঐ পজিট্রন-কণিকার উদ্ভব প্রত্যক্ষ করেছিলেন (পৃ. ৩৩৫)। কিন্তু ঐ পজিট্রন-বিচ্ছুরণ ঘটনাটি আলোক-বিকিরণের তুল্যই। এদিকে

নিউট্রন নিক্ষেপ করে ফের্মি দেখেছিলেন ইলেক্‌ট্রন-কণিকা। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, কোনো ইলেক্‌ট্রন-কণিকা কেন্দ্রক থেকে বেরিয়ে গেলে কেন্দ্রকের তেজ এক-আধান পরিমাণে বেড়ে যায় এবং কোনো পজিট্রন-কণিকা ওখান থেকে সরে গেলে ওর তেজ এক আধান পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয় (দ্র., পৃ. ৩৫২)। এসব থেকে বুঝতে পারা যায় যে, কেন্দ্রকের মধ্যেই এমন এক প্রকার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়, যার ফলে তৎসন্নিহিত অঞ্চলে ঐ পজিট্রন বা ইলেক্‌ট্রনের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। পরমাণুটি উত্তেজিত হয়ে উঠলে তার বর্ধিত তেজটি আবার আলো-রশ্মিতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়ে সেখান থেকে আলোকের আবির্ভাবকে সম্ভব করে তুলে। নিউট্রন-কণিকা নিক্ষেপের ফলেই যখন ইলেক্‌ট্রনের উদ্ভব ঘটে গিয়ে কেন্দ্রকীয় তেজ এক-আধান পরিমাণে বেড়ে যায়, তখন ধরে নিতেই হয় যে, হাল্কা উপাদানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রকের নিউট্রন-কণিকারই কিয়দংশ খসে গিয়ে ঐ ইলেক্‌ট্রন-কণিকার অবির্ভাব ঘটছে এবং নিউট্রন-কণিকাটি তখন এক-আধানের প্রোটনে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ নিউট্রন-কণিকাটি একটি প্রোটন আর একটি ইলেক্‌ট্রনের সমষ্টি মাত্র। পক্ষান্তরে প্রোটন-নিক্ষেপের ফলেই যখন পজিট্রনের উদ্ভব ঘটছে এবং কেন্দ্রকের তেজ যা হওয়ার কথা, তার চাইতে এক-আধান পরিমাণে কমে যাচ্ছে, তখন বোঝা যায় যে, কেন্দ্রকের একটি প্রোটন-কণিকাই একটি নিউট্রন-কণিকায় রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার সময় ঐ পজিট্রন-কণিকার আবির্ভাব ঘটছে। অর্থাৎ প্রোটন-কণিকাটি একটি নিউট্রন আর একটি পজিট্রনের সমষ্টি মাত্র :

$${}_{1}H^{1} \rightarrow {}_{0}n^{1} + {}_{+1}e^{0}$$
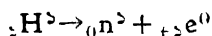
এ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, নির্গত পজিট্রন- বা ইলেক্‌ট্রন-কণিকাগুলি কেন্দ্রক-রূপান্তরের নিশ্চিত সংকেত রূপেই কাজ করে চলেছে। ইলেক্‌ট্রনের বিচ্ছুরণ দেখলেই বুঝতে হবে যে, নিউট্রন প্রোটনে রূপান্তরিত হয়ে গিয়ে উপাদানগুলিকে পর্যায়িক ছকের ডান দিকের ঘরে টেনে নিয়ে আসছে। এবং পজিট্রন নিক্ষিপ্ত হলে প্রতিক্রিয়াটি উল্টে যাচ্ছে। এ থেকেই স্থানান্তরের (displacement) সূত্রটিও (পৃ ২৪৩) বুঝে নিতে আর বিলম্ব ঘটেনা। তাহলে ঘটনা দু'টিকে সংক্ষেপে বলা চলে : প্রোটন দিয়ে কেন্দ্রক বিদ্ধ করলে প্রোটন থেকে একটি পজিট্রন-কণিকা খসে যায় এবং প্রোটনটি তখন নিউট্রনে পরিণত হয়। ফলে প্রোটন-যোগের পরে কেন্দ্রকটির যে পরিমাণ আধান হওয়ার কথা, তার চাইতে এক আধান কম হয়ে যায়। সুতরাং ছকের মধ্যে তাকে এক ঘর বাঁদিকেই বসতে হয়। অপর পক্ষে, নিউট্রন দিয়ে কেন্দ্রক বিদ্ধ করলে নিউট্রন থেকে একটি বিটা-কণিকা খসে পড়ে এবং নিউট্রনটি তখন প্রোটনে পরিণত হয়। ফলে কেন্দ্রকটির যে পরিমাণ আধান হওয়ার কথা, তার চাইতে তার একটি আধান বেড়ে যায়। তখন সে ছকের মধ্যে এক ঘর ডান দিকে সরে বসতে পারে।

ইলেক্‌ট্রন ও পজিট্রন রূপ প্রাথমিক কণিকাগুলি তাহলে অনাদিকাল থেকে বর্তমান কোনো কণিকা নয়। আবার প্রোটন বা নিউট্রন রূপ প্রাথমিক কণিকাগুলির মধ্যেও পারস্পরিক রূপান্তর ঘটে এবং তাদেরও আবির্ভাব তিরোভাব (একের আবির্ভাবে অন্যের তিরোভাব) সম্ভব হয়। বিনিময়-কণিকা হিসাবে মেসন-প্রক্রিয়ার অনধিগম্য (virtual) সত্যের কথা (পৃ. ৩৪৩-৪৪) তলিয়ে না দেখে আমরা বুঝতে পারি যে, একটি প্রোটন থেকে একটি পজিট্রন ধ্বসে গেলে যখন একটি নিউট্রনের উৎপত্তি ঘটছে, তখন বোঝা যায়, একটি নিউট্রন আর একটি পজিট্রনের (শূন্যপ্রায় ভরের) মিলনের ফলেই একটি প্রোটনের উদ্ভব ঘটেছিল। অথচ একটি প্রোটনের ভর কিন্তু তার ঐ উপকরণ দু'টির ভরের যোগফলের চাইতে কিছু কম। ঐ কমতি ভরটি প্রায় ১৮×১০^{৫} (১৮ লক্ষ) ই. ভো. তেজের প্রতিরূপ। এর অর্থ, প্রোটন উৎপত্তিকালে বা প্রোটন-কণিকাতে নব সন্নিবিষ্ট হওয়ার সময় একটি নিউট্রনকে এই পরিমাণ তেজই ব্যয় করতে হয়েছিল। সুতরাং প্রোটনটির মধ্যে এই পরিমাণ তেজ সংক্রমিত না করা পর্যন্ত সে আপনা আপনি কিছুতেই আর নিউট্রনে রূপান্তরিত হতে পারেনা। অথচ দেখা যাচ্ছে, একটি পৃথক নিউট্রনের ভর একটি প্রোটনের ভরের চাইতে বেশি। সুতরাং বোঝা যায় যে, নিউট্রনের প্রোটন-কণিকায় রূপান্তর কালে কিছু ভর বা ঐ ভরেরই প্রায় ৮×১০^{৫} (৮ লক্ষ) ই. ভো. তেজরূপ ওখান থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এ থেকেই আবার বুঝতে পারা যায় যে, নিউট্রনের বাড়তি-ভরের মধ্যে লুক্কায়িত বাড়তি-তেজটি কমতি-তেজযুক্ত প্রোটন কণিকাতেই নেমে এসে স্থায়ী হতে চায়। তারই ফলে নিউট্রন থেকে তার তেজব্যয় প্রক্রিয়া মারফতে তার ঐ প্রোটন-রূপান্তর ঘটনাটি অনিবার্যভাবেই আপনা আপনি ঘটতে থাকে। [বস্তুত, এই নিউট্রন-ক্ষয়ই সম্ভবত তেজস্ক্রিয় রূপান্তরের সরলতম প্রক্রিয়ারই দৃষ্টান্ত।] সুতরাং কেন্দ্রকীয় প্রভাবের বন্ধন থেকে মুক্তি পেলেই কোনো নিউট্রন তার বাড়তি-তেজটুকু বিকীর্ণ করে চলতে থাকে। তার ফলেই সে তখন হয়ে উঠে গতিশীল। কিন্তু তার ঐ তেজস্ক্রিয়তা স্থায়ী হতে পারেনা। এমনকি, ধীরগতির কোনো নিউট্রনও প্রায় সেকেণ্ডের দশ সহস্রাংশ ($১০^{-৪}$) সময়ের মধ্যেই আর একটি কেন্দ্রকের মধ্যে গিয়ে আটকা পড়েই যায়। দু'টি কেন্দ্রকের মধ্যে তার গতিপথের এই দূরত্বটিতেই বিটা-ক্ষরণ প্রক্রিয়ার মারফতে সে যা হয়ে উঠে জ্যোতির্ময়। সুতরাং তেজস্ক্রিয় প্রক্রিয়ার মর্মই হল প্রোটন ও নিউট্রনের পারস্পরিক রূপান্তর এবং তজ্জনিত বিটা ও পজিট্রন কণিকার ক্রম-ক্ষরণ। প্রোটন ও নিউট্রনের রূপান্তর ঘটে কেন্দ্রকে। কিন্তু তার ফলটি প্রত্যক্ষ করা যায় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে, সেখানেই পজিট্রন ইলেক্‌ট্রনের উদ্ভব ক্রিয়াটি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আমরা জানি আসলে ঐ পজিট্রন বা ইলেক্‌ট্রনরা কোনো কেন্দ্রকীয় কণিকাই নয়। কেন্দ্রকীয় কণিকা মূলত ঐ প্রোটন

ও নিউট্রন, বা এক কথায় নিউক্লিয়নই (পৃ. ৩১৭)। এক অচিন্তনীয় তেজবন্ধনে তারা কেন্দ্রকে আবদ্ধ হয়ে থাকে। সেই কেন্দ্রকীয় তেজের কাছে পার্থিব আর সকল প্রকার তেজই হার মেনে যায়। এমনকি, ভারাবর্তন আর বিদ্যুৎতেজও। সমধর্মীয় বিদ্যুৎ-কণিকা হওয়া সত্ত্বেও প্রোটনরাও দলবদ্ধভাবেই অবশ হয়ে থাকে। অথচ কেন্দ্রক কণিকাগুলিকে প্রভাবমুক্ত করে দিতে পারলে তাদের দ্বারা অসাধ্য সাধনও সম্ভব হয়। কিন্তু কেন্দ্রকীয় মহাশক্তিকে তুচ্ছ করে কে সেখানে গিয়ে তাদেরকে মুক্ত করে দিতে পারে ?

প্রোটন, আল্‌ফা আর নিউট্রন-কণিকাই সেখানে পৌঁছতে পারে। ঐসব কোনো কণিকা দিয়ে কেন্দ্রকাভিঘাতকালে বহির্নিক্ষিপ্ত কণিকাটি প্রচণ্ড বেগ নিয়ে কেন্দ্রকে পৌঁছে তার সমস্ত তেজই কেন্দ্রকীয় কণিকাগুলির মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। কেন্দ্রকের সর্বাঙ্গই শিহরণ-চঞ্চল হয়ে উঠে। তখন তার প্রমত্ত ভঙ্গি। এক-কণা বর্ধিত দেহান্তর তার বর্ধিত তেজ নিয়ে সে তখন উত্তপ্ত, উত্তেজিত। এ রকম অবস্থায় তার পক্ষে সবই সম্ভব। কিন্তু প্রকৃতির সকল সম্ভাবনার মধ্যেই অপরিবর্তনীয় নীতি বিদ্যমান। বহিরাগত অতিথির বেগ-সমৃদ্ধি বশেই তার আবেগের প্রকাশ ঘটে। বাড়তি-তেজ বা তার অংশবিশেষ গিয়ে হয়ত শেষ পর্যন্ত একটি বিশেষ কণিকার উপর ভর করে। তার ফলে কেন্দ্রক থেকে হয়ত তার নিজস্ব একটি প্রোটন-কণিকাকে বিদায় নিতে হয়, কখনও হয়ত তার সঙ্গে একটি নিউট্রনও চলে যায়। এসবের পরেও যদি বাড়তি তেজের কিছু বাকি থাকে, তাহলে হয়ত কখনও সে গামা-রশ্মি রূপে বিকীর্ণ হয়ে গেল। বা, অন্য একটি কণিকাকে ভর করবার পূর্বেই হয়ত কিছুটা তেজ ঐ গামা-রশ্মি হয়ে চলে গেল। তখন যেটুকু তেজ অবশিষ্ট থাকল, তা নিয়ে আর কোনো কণিকাকে উৎক্ষিপ্ত করে তোলা সম্ভব নয়। বহিরাগত নিউট্রন-কণিকাটি হয়ত কেন্দ্রকের কণিকা-সংখ্যা বৃদ্ধি করেই ওখানে থেকে যায়। প্রবেশকালে যদি নিউট্রনটির তেজ খুব কম থাকে তাহলে হয়ত সেই-স্বল্পমাত্র তেজে তেজীয়ান হয়ে অন্য কোনো কণিকার পক্ষে তার পুরাণো আবাস পরিত্যাগ করা সম্ভব হয়না। কিছু গামা-রশ্মি হয়ত বিকীর্ণ হয়ে যায়, আর কেন্দ্রকটি নিউট্রনটিকে গ্রেপ্তার করে নেয়। কিন্তু বহিরাগত নিউট্রনটি খুব উচ্চতেজ যুক্ত হলে একটি প্রোটন বা একটি নিউট্রন বা একটি আল্‌ফা-কণিকা ওখান থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে যাবেই। ঐ তেজ দশ কোটি ইলেক্‌ট্রন ভোল্টের ঊর্ধ্বে উঠলে কেন্দ্রকটি প্রচণ্ড উষ্ণতায় উত্তপ্ত হয়ে উঠে। তখন একটি নয়, কয়েকটি কণিকাই কেন্দ্রক ছেড়ে চলে যায়। একটু উত্তাপ বাড়িয়ে দিলেই যেমন এক ফোঁটা জলের সব অণুগুলিই উড়ে পালায়, তেমনি কেন্দ্রকটির উষ্ণতা শত কোটির কোঠায় পৌঁছলে তার সবগুলি কণিকাই তখন আকাশে উড়ে পালাতে বাধ্য হয়। কেন্দ্রক থেকে যারা উড়ে পালায়

তাদের বেশির ভাগই নিউট্রন। তার কারণ, আধানযুক্ত কণিকাগুলিকে বেরিয়ে যেতে গেলেই যথেষ্ট তেজ লাগে। নিরপেক্ষভাব ধারণ করায় নিউট্রনের সে বালাই নাই।

কিন্তু কণিকা দিয়ে কেন্দ্রকাভিঘাত ঘটিয়ে কেন্দ্রক-রূপান্তরের কলকাঠি মানুষের হাতে এসে পৌচেছে। আর কেন্দ্রক-রূপান্তরের অর্থই হল একটি উপাদানকে অন্য উপাদানে রূপান্তরিত করে তুলা। পৃথিবীতে কত শত বস্তুর প্রাচুর্য। হয়ত সেগুলি আমাদের তেমন কাজে লাগেনা। বা হয়ত তারা সহজলভ্য, জল-বাতাসের মতই। কিন্তু আজ মানুষের চাহিদা হয়েছে এমন সব বস্তুর, যারা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। সহজলভ্য বস্তু-নিচয়ের কেন্দ্রক-রূপান্তর ঘটিয়ে কি অতি প্রয়োজনীয় দুষ্প্রাপ্য বস্তুগুলিকে তৈরি করে নেওয়া যায়না? রাদারফোর্ড্ নাইট্রোজেন-কেন্দ্রকের রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন। জোলিও-কুরি কেন্দ্রক ভেঙে তাকে যে কেবল রূপান্তরিত করেছেন, শুধু তাই নয়, তাঁরা তার যুগযুগান্তরব্যাপী সুপ্ততেজের জাগ্রত ভঙ্গিমাকে আমাদের কাছে এনে দিয়েছেন। আর ফেমির দল তো পর্যায়িক ছকের শেষ ৯২-সংখ্যক উপাদান ইউরেনিয়ামের পরবর্তী এক ৯৩-সংখ্যক উপাদানের সম্ভাবনাকেও এনে হাজির করেছেন। বহুকাল পূর্বে মধ্যযুগে মানুষ একদা স্পর্শমণির সন্ধানে ব্যর্থ সাধনায় মাথা কুটে মরেছে। অ্যালকেমীয় বিজ্ঞানবিদ্যার প্রায় সবটা প্রেরণাই তাতে সে ব্যয়িত করে দিয়েছে। কতকাল কেটে গিয়েছে, কত প্রচেষ্টা নিঃশেষ হয়ে গেছে। কত মানুষের প্রাণান্ত ঘটেছে। ইতিহাস হলেও, প্রাকৃতিক বিবর্তন তথা মানবমানস-বিবর্তন জনিত সত্যের উদ্‌বর্তনের ইতিহাসে আজ তা গল্পকথা মাত্র। কিন্তু আজ আবারও নতুন উপাদান সন্ধানের জন্য খেপা বিজ্ঞানীর দল যে নতুন অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন, তাও আজিকার নিশ্চিত ইতিহাসই। কারণ, পরিণত বিজ্ঞানসাধনার যুগে আজ তাঁরা কেবল অন্ধের মত যেখানে সেখানে 'পরশ পাথর' সন্ধান করে বেড়াবেননা। আজ তাঁদের প্রাপ্তির আশাটি বাস্তবিকই সম্ভাবনাময় বলে একটি নির্দিষ্ট পথ ধরেই তাঁরা এগিয়ে চলেন। তাই একজন সেখানে ব্যর্থ হলেও নিকটবর্তী অন্য জন সেই সম্ভাবনাকে ঘটনাতেই রূপান্তরিত করে তুলেন। ইটালির ফের্মি তাই যে ঘটনাকে সম্ভব করে তুলেছিলেন, তাকে বাস্তব করে তুললেন প্রায় একই সঙ্গে নানা দেশের নানা বিজ্ঞানীর দল। কিন্তু প্রাকৃতিক সত্যের সন্ধান আর প্রকৃতি পরিবর্তনের সংঘটন পর্বে প্রকৃত সত্যের উদ্‌ঘাটনের সঙ্গেই মানব মস্তিষ্কেরও বিকাশ ঘটে গেল।

ফের্মিরা দেখেছিলেন (পৃ. ৩৬৮), নিউট্রন দিয়ে ইউরেনিয়াম-বিকিরণ ঘটাবার সময় কেন্দ্রক-রূপান্তরকালে যেন এক নূতন উপাদানের উদ্ভব ঘটছে। তাঁদের অনুসৃত প্রক্রিয়া মারফতে পাশাপাশি কোনো উপাদান ব'লে তাকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তাই মনে করার দরকার হয়েছিল যে সেটি নিশ্চয় ইউরেনিয়াম-উত্তর ৯২-সংখ্যার নতুন উপাদান হবে।

ফের্মি জানতেন, অন্য উপাদানগুলির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা তেজস্ক্রিয় উপাদানের উদ্ভব ঘটছে। তাই তিনি সম্ভবত মনে করলেন, ৯৩-সংখ্যার উপাদানটি কোনো তেজস্ক্রিয় বস্তু বলেই তার পক্ষে স্থায়ীভাবে টিকে থাকা সম্ভব হচ্ছেনা। যদি সত্যিই ঐ উপাদানটির অস্তিত্বকে প্রমাণ করা যায়, তাহলে হয়ত জানা যেতে পারে, ৯২-সংখ্যাতে পৌঁছেই বা পার্থিব পরমাণুগুলি কেন তাদের শেষ পরিণতি লাভ করছে। ১৯৩৪ খ্রী.-এ পদার্থবিদ্ ফের্মির পক্ষে কিন্তু জটিল সব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ইউরেনিয়াম-উত্তর কোনো পদার্থকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ব্যাপারটি নিয়ে যথেষ্ট আলোড়ন উঠল এবং রীতিমত গবেষণা চলতে লাগল। পদার্থ ও রসায়নবিদ্‌দের মিলিত প্রচেষ্টায় এ বিষয়ে নানাপ্রকার উপায়ও উদ্ভাবিত হল। প্রায় চার বছর পরে ১৯৩৮-এর শেষ দিকে বার্লিনের কাইজার উইল্‌হেল্‌ম্ ইন্‌স্টিটিউট্ ফর্ কেমিস্ট্রি-গবেষণাগারে এ ব্যাপার সম্বন্ধে একটি হদিশ মিলে গেল।

ত্রয়ী গবেষকের দু'জন ছিলেন রসায়নবিদ্—হান (Otto Hahn) এবং স্ট্রাসম্যান (Fritz Strassman)। আর পদার্থবিদ্ মাইট্‌নার (Lise Meitner) ছিলেন একজন ইহুদীজাতীয়া নারী। ইহুদী হওয়া সত্ত্বেও অস্ট্রিয়াবাসী বলেই তখনও তাঁকে জার্মানীতে কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অচিরেই তাঁকে নাজিবাদের দেশ থেকে বিতাড়িত হতে হয়; তাঁর আরব্ধ কাজকে তাঁর অন্য দু'জন সহকর্মী এগিয়ে নিয়ে চলতে থাকেন। কতকগুলি জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে তাঁরা স্থির করতে সমর্থ হন যে, ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রক অভিঘাতের ফলে যাদের দর্শন মিলেছিল, তাদের কেউ কেউ বেরিয়াম-পরমাণুরই কেন্দ্রক। অথচ বেরিয়ামের ভর মাত্র ১৩৭। ইউরেনিয়ামের ২৩৮-ভরের প্রায় অর্ধেক বললেই চলে। ইতিপূর্বে ধীরগতির নিউট্রন দিয়ে কেন্দ্রকাভিঘাতের ফলে, সেখান থেকে এক-ভরের প্রোটন বা নিউট্রন, কিংবা বড় জোর চার-ভরের আল্‌ফা-কণিকার নির্গমণ লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু এ-রকমের কেন্দ্রক-ভাগ তো কখনো দেখা যায়নি। ১৯৩৮-এর ডিসেম্বর মাসে মাইট্‌নার তখন সুইডেনের স্কটহোমে। তাঁরা তৎক্ষণাৎ সেই সংবাদ তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মাইট্‌নার তখন তাড়াতাড়ি ডেনমার্কের কোপেন্‌-হেগেনে গিয়ে তাঁর আত্মীয় জার্মান-বিতাড়িত বিজ্ঞানী ফ্রিসের (Otto Frisch) সঙ্গে দেখা করলেন। তারপর দু'জনাতে মিলে তাঁরা নীল্‌স্ বোরের কাছে গিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। বোর তখন আমেরিকায় যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন। মাইট্‌নার ব্যাপারটির ব্যাখ্যা করে ঘটনার তাৎপর্য-প্রকাশক নাম দিলেন—ইউরেনিয়াম-বিভাজন (fission)। ওঁরা এ নিয়ে তখন একটি নূতন তত্ত্ব গড়ে তুললেন যে, ধীরগতির নিউট্রন-নিক্ষেপের ফলে ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রক বড় বড় দু'টি দলায় ভাগ হয়ে যায়, আর তখন নিশ্চয়ই সেখান থেকে এক বিপুল পরিমাণ শক্তি (খণ্ডগুলির যোটন-তেজ)

মুক্তিলাভ ক'রে পিণ্ড-দু'টিকে প্রচণ্ড বেগে (সেকেণ্ডে ৬০০০ মাইলেরও বেশি বেগে) দু'দিকে ছুঁড়ে দেয়। এ তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য তাঁরা এক পরিকল্পনা ফাঁদলেন। ইউরেনিয়াম-বিভাজন প্রক্রিয়ায় ভরের জড়ত্ব থেকে কি পরিমাণ শক্তির মুক্তি ঘটে তার হিসাব পাওয়ার জন্যও তাঁরা উন্মুখ হলেন। কাজ আরম্ভ হল এবং অনুমিত তত্ত্বানুযায়ী সব ঘটনাই পরীক্ষা মারফতে প্রমাণিত হল। বোর ইতিমধ্যে আমেরিকা পাড়ি দিয়েছেন। আমেরিকায় পদক্ষেপ করে তিনি সে-বার্তা পেয়ে গেলেন। রাদারফোর্ড্ আরম্ভ করেছিলেন। তারপর বিলেত থেকে ফ্রান্স, ইটালি, জার্মানী ও ডেনমার্ক হয়ে ক্রমবিকশিত বিদেহী তত্ত্বটি মধ্যপথে দেহী ইউরেনিয়াম-পরমাণুটিকে সর্বাঙ্গে সম্পুটিত করে নিয়ে মহাযুদ্ধ থেকে বহুদূরাবস্থিত সুসভ্য আমেরিকা মহাদেশে প্রয়াণ করল।

নিউইয়র্কে পৌঁছেই বোর প্রিন্স্‌টনে চলে যান,—কিছুকাল আইন্‌স্টাইনের সঙ্গে কাটাবেন। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই ১৯৩৯ খ্রী.-এর জানুয়ারি মাসের ২৬-তারিখে ওয়াশিংটনে আমেরিকার ফিজিক্যাল সোসাইটির একটি সভায় তিনি উক্ত খবরটি প্রকাশ করলেন। প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। বোরের বক্তৃতা শেষ হওয়ার পূর্বেই কেউ কেউ নিজে পরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ করবার জন্য সভাস্থল ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। এন্‌রিকো ফের্মি তখন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে কাজ আরম্ভ করেছেন। ইউরেনিয়াম-বিভাজনের কথা শুনে বোরের ঐ ঘোষণার ন' দিনের মধ্যেই তিনি জার্মান-পরীক্ষাটির পুনঃপরীক্ষা করে নিশ্চিত হলেন। তিনি অনুমান করলেন, ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রকটি যখন দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় ক্রিপ্টন্, বেরিয়াম প্রভৃতি মাঝারি ভরের (অর্থাৎ ইউরেনিয়ামের প্রায় অর্ধেক ভরের) কেন্দ্রকগুলি উপজাত হচ্ছে, তখন ওখান থেকে কিছু বাড়তি নিউট্রন পাওয়ার কথা। কারণ, ক্রিপ্টন্ আর বেরিয়াম-কেন্দ্রকের প্রোটন-সংখ্যা (৩৬+৫৬=৯২) ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রকের প্রোটন-সংখ্যার (৯২) সমান হলেও, ওদের নিউট্রন-সংখ্যা (৫৫+৮৬=১৪১) ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রকের নিউট্রন-সংখ্যার (১৪৩) চাইতে দুই কম। এ ছাড়া পূর্ব-নিক্ষিপ্ত নিউট্রনটির হিসাব ধরলে বিভাজনের পর মোট মুক্ত নিউট্রনের সংখ্যাও (২+১=) তিন হবে। অবশ্য বিষয়টি অত সহজ না হতেও পারে। কারণ, ক্রিপ্টন বা বেরিয়ামের অন্য কোনো আইসোটোপও ঐ নিউট্রন তিনটিকে স্বীয় অঙ্কে আশ্রয় দিতে পারে। কিন্তু নানাবিধ হিসাব কষে ফের্মি তাঁর অনুমান-সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন।—নিউট্রন-সংঘাতের ফলে ইউরেনিয়াম-পরমাণুটি যে কেবল বিভক্ত হয়ে যায় তাই নয়, বিভাজনকালে খুব সম্ভবত ওখান থেকে আরও কিছু নিউট্রন-কণিকা ঠিকরে বেরিয়ে যায়। অবশ্য নিউট্রনের গতিবেগটি এখানে খুব বড় কথা নয়। এখানে ওর কেন্দ্রক-ভেদ ক্ষমতাটিই প্রধান বিষয়। আমরা জানি যে সেজন্যে

খুব উচ্চতেজের নিউট্রনের চাইতেও অপেক্ষাকৃত ধীরগতির নিউট্রনের উপযোগিতাই অধিকতর (পৃ. ৩৬৯, ৩৭৩)।

সুতরাং যদি একটি ধীরগতির নিউট্রন ইউরেনিয়াম-পরমাণুকে খণ্ডিত করে তুলবার সময় ওখান থেকে অন্তত দু'টি নিউট্রন মুক্ত হয়ে যায়, তারাও তাহলে আর দু'টি পরমাণুকে আঘাত করে তাদের থেকে চারটি নিউট্রন ছাড়িয়ে দেবে। তারপর চারটি থেকে আটটি, আটটি থেকে ষোলটি, এভাবে নিউট্রনের সংখ্যা ক্রমাগতই বেড়ে চলবে। এভাবে ক্রম-প্রক্রিয়া বা পরম্পরিত প্রতিক্রিয়ার (**chain reaction**) সাথে সাথে পরমাণুগুলিও অধিক সংখ্যায় বিভক্ত হতে থাকবে। তাহলে মাইটনার এবং ফ্রিসের হিসাব অনুযায়ী একটি পরমাণুর বিভাজনকালে যে প্রচণ্ড শক্তি (যোটন-তেজ) ছাড়া পেয়ে যায়, মুহূর্তের মধ্যেই তা বহুগুণিত হয়ে গিয়ে এক অকল্পনীয় তেজপরিমাণকে মুক্তি দিতে পারবে। একটিমাত্র পরমাণু থেকেই বেরিয়ে আসবে প্রায় ২০০০০০০০০ (২০ কোটি) ই. ভো. তেজ! আর পরমাণু তো সংখ্যাতীত। সুতরাং একটি মাত্র কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন নিউট্রন থেকে পরম্পর-প্রতিক্রিয়া বশত অসংখ্য নিউট্রন উৎপন্ন হওয়ায় পারমাণবিক বন্ধন থেকে বিপুল পরিমাণ তেজ মুক্তি পাবে। সেই তেজ দিয়ে মানুষ হয়ত তখন তার কত প্রয়োজনই না সিদ্ধ করে নিতে পারবে। হয়ত যুদ্ধের সময় কোনো পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করে ফেলতে পারলে তার দ্বারা যুদ্ধবাজ দুষ্টের দমনও সম্ভব হয়ে যাবে। ইউরোপে তো যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। জার্মানীর হিটলার ক্রমেই প্রচণ্ড বিক্রমে দেশের পর দেশ জয় করে চলেছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের কঙ্কাল-স্তূপে রাজ্যগুলি পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে। আর ইউরেনিয়াম-বিভাজন রূপ ঘটনাটিও তো ঘটে গেল সেই জার্মানীতেই। কে জানে, হিটলারের হাতে যদি ঐ পারমাণবিক অস্ত্রটি কোনো রকমে গিয়ে পৌঁছায়! কেঁপে উঠলেন বিজ্ঞানীদল। তাঁদের সমস্ত তত্ত্বচিন্তা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়কে তাঁরা চুক্তিবদ্ধ হয়ে চেপে গেলেন। বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে কখনও কোনো রাখ্‌ ঢাক্‌ ভাব ছিলনা। সে ইতিহাস ছিল যথার্থই আন্তর্জাতিক। তাই চিরকাল সকল গবেষণা, সকল আবিষ্কারই সেখানে অবিলম্বে বিঘোষিত হয়েছে। একজনের এতটুকু অগ্রগতিও অবিলম্বে সমগ্র বিজ্ঞানীসমাজকে এগিয়ে দিয়েছে। মুহূর্ত মধ্যেই তা সর্বমানবিক হয়ে যাওয়ায় বিজ্ঞানসাধনার গতি এত দ্রুত হতে পেরেছে। কিন্তু সে-সাধনার ইতিহাসে বোধকরি এই সর্বপ্রথম কলঙ্ক পড়ল। শক্তিমান মারণাস্ত্রটি যাতে দানবের হাতে গিয়ে না পৌঁছতে পারে সেজন্যই বিজ্ঞানীরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন, সত্য কথা। সুতরাং নিশ্চয় সেটি তাঁদের একটি পবিত্র চুক্তি। কিন্তু মানবিক কারণে বিশ্বজনীন প্রাকৃতিক সত্যকে বিশ্বজনের কাছে ঢেকে রাখবার ঝুঁকি নেওয়ার শক্তি তাঁদের ছিলনা। তাই তাঁদের স্বপ্নটা অনেকটা দুঃস্বপ্ন হয়ে গিয়েছে। ঠিক যেন গল্পের মতই শোনায় তা।

বোর এলেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, ফের্মির সঙ্গে দেখা করবেন। দেখা হয়ে গেল অ্যাণ্ডার্সানের (Herbert Anderson) সঙ্গে। প্রতিভাধর স্নাতকোত্তর ছাত্র, ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য ফের্মির অধীনে কাজ করবেন। বোর তাঁকে বিভাজনের কথা বললেন। তিনি চলে গেলে অ্যাণ্ডার্সান একান্ত আগ্রহ ও উত্তেজনা নিয়ে ফের্মির কাছে এসে অনুরোধ জানালেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইক্লোট্রন যন্ত্রের সাহায্যে তিনি যেন অবিলম্বেই গবেষণার কাজ আরম্ভ করে দেন। ফের্মির সংকোচ ছিল। কারণ, তিনি ইতিপূর্বে ও-যন্ত্র নিয়ে কাজ করেননি। কয়েক বছর আগে আধানাত্মক কণিকার বেগবৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ১৯৩১ খ্রী.-এ লরেন্স্ (Ernest O Lawrence) এ-যন্ত্রের আবিষ্কার করেছিলেন। এ রকম কণিকার বেগবৃদ্ধির জন্য পূর্বেই যে যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল তাতে নানা প্রকার অসুবিধে ছিল (পৃ ২৮৭-৮৮)। যেমন তাতে অনেকগুলি তড়িদ্দ্বার (electrodes) লাগত। কিংবা তেজ দিয়ে কণিকাগুলিকে ঈপ্সিতভাবে বেগবান করে তুলতে না তুলতেই তারা যেটুকু তেজ পেত, তাইতেই তারা সরলরেখা ধরে ধাবিত হওয়ার জন্য অত্যল্প কালের মধ্যেই নাগালের বাইরে ছুটে চলে যেত। লরেন্স্ তাই মাত্র দু'টি তড়িদ্দ্বারের মধ্যেই এমন একটি কম্পমান বিদ্যুৎক্ষেত্র সৃষ্টি করলেন, যার আকৃতিটি একটি সিলিণ্ডারের মত,—পাত্রটি যেন লম্বালম্বি দু'ভাগে ভাগ করা আছে। আসলে কোনো পাত্র নাই, শুধু তার আকৃতির বিদ্যুৎক্ষেত্রটি আছে। আবার পাত্রের অভ্যন্তরেও কোনো বিদ্যুৎক্ষেত্র নাই। তড়িদ্দ্বারসহ যন্ত্রটি একটি বিরাট চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকায় আধানাত্মক কণিকা এক তড়িদ্দ্বার থেকে অন্য তড়িদ্দ্বারে যাওয়ার সময় বর্ধিত বেগ প্রাপ্ত হয়ে পাত্রের মধ্যে বৃত্তাকার পথে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ বেগ সঞ্চয় করতে থাকে। অ্যাণ্ডার্সান জানালেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ প্রকার সাইক্লোট্রন যন্ত্রটির সাহায্যে আধানাত্মক কোনো কণিকাকে নিশ্চয় এমনভাবে গতিবান করে তুলা যাবে, যাতে সে বিশেষ পদার্থের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেখান থেকে নিউট্রন-কণিকার উৎক্ষেপ ঘটিয়ে দিতে পারবে। শেষ পর্যন্ত ওঁরা কাজ আরম্ভ করলেন। বুদাপেস্টের বিজ্ঞানী সিলার্দ্ (Leo Szilard) এবং কানাডার বিজ্ঞানী জিন (Walter H. Zinn) ফের্মি এবং অ্যাণ্ডার্সানের সঙ্গে যোগ দিলেন। সিলার্দ্ও তখন হর্তির হাঙ্গেরীয় ফ্যাসীবাদের পীড়ন থেকে পলাতক দেশান্তরী। আমেরিকার অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও এ নিয়ে গবেষণার কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। বোরও প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ পদার্থবিদ্ হুইলারকে নিয়ে কাজে নামলেন। যবনিকার অন্তরালে পারমাণবিক অস্ত্র-নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলল।

কিন্তু ইতিমধ্যে প্যারিসে ফ্রেডারিক জোলিও ঠিক একই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। ১৯৩৯-এর জানুয়ারি মাসেই তিনি তাঁর পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করলেন। জোলিও-

কুরি এবং ফের্মি প্রভৃতির পরীক্ষা থেকে জানা গেল যে, ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রক প্রায়শ ১৪০ এবং ১০০ ভরের দু'টি অসমান ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেও মাঝে মাঝে ওরা তিন বা চার ভাগেও বিভক্ত হয়। খণ্ডগুলি তখন অন্যান্য পদার্থের মধ্য দিয়েও বেশ কিছুটা এগিয়ে যেতে পারে। মেঘায়ন-কক্ষে তাদের গতিপথ রেখাঙ্কিত হয়ে যায়। জোলিওর পরীক্ষা থেকে দেখা গেল যে, তেজস্ক্রিয়তার নামগন্ধ নাই এমন বেকেলাইট (সেলুলয়েড বা প্লাস্টিক জাতীয়) প্লেটকেও তখন ইউরেনিয়ামের খুব কাছে রাখলে ঐ খণ্ডগুলির আঘাত খেয়ে তা' তেজস্ক্রিয় হয়ে উঠে। তিনি আরও দেখলেন যে, বাতাসের মধ্য দিয়ে ঐ খণ্ডগুলি প্রায় ২·১ সে. মি. পর্যন্ত এগিয়ে যায়। ওদিকে বোরের চাইতে বরং একটু আগেই সোভিয়েত পদার্থবিদ্ ইয়াকভ্ ফ্রেঙ্কেলও ঐ একই তত্ত্বকে স্বাধীনভাবে বিকশিত করে তুললেন। অল্পকালের মধ্যেই রুশ দেশের আর দু'জন তরুণ বিজ্ঞানী জেল্‌দভিচ্ এবং খারিতনও বিভাজন-প্রক্রিয়ার অন্তর্গত পরস্পর-প্রতিক্রিয়ার হিসাব নির্ণয় করলেন। দেখে আশ্চর্য লাগে যে, এক বছরের মধ্যে '৩৯ সালেই জোলিও এবং কুরির দলটি একটি তেজ-সঞ্চয়িতা পারমাণবিক ব্যাটারি গড়ে তুলতে সমর্থ হন। কিন্তু মানুষের সেবায় নিয়োজিত পৃথিবীর এই প্রথম শক্তিযন্ত্রটির সকল অধিকারই তাঁরা বৈজ্ঞানিক গবেষণার জাতীয় ইন্‌স্টিটিউটের হাতে তুলে দেন, ইতিপূর্বে যেমনভাবে কুরি-দম্পতীও তাঁদের বুকের রক্ত দিয়ে তিল তিল করে সংগৃহীত সমস্ত রেডিয়াম-সঞ্চয়কেই ফিজিক্স্ স্কুলের গবেষণাগারে তুলে দিয়েছিলেন। আরও আশ্চর্যান্বিত হতে হয় যে, একেবারে প্রায় যুদ্ধাগ্নির মধ্যেই বসে ১৯৪০ সালেই জোলিওর দল পারমাণবিক বোমা তৈরি না করে পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর (কেন্দ্রক-প্রতিক্রিয়া সংঘটক যন্ত্র) গড়ে তুললেন। জোলিও এবং কুরি তার নাম দিয়েছিলেন 'জোয়ে'। গ্রীক ভাষার এ শব্দের অর্থ 'জীবন'। অর্থাৎ ঐ যন্ত্রের কাজ হবে ধ্বংসসাধন নয়, জীবনেরই সেবা।

ফরাসী তত্ত্বাবধানে তখন নরওয়েতে একটি গুরুজলের (যার হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রকে প্রোটনের সঙ্গে নিউট্রন বিদ্যমান) কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। দ্রুতগতির নিউট্রনকে ধীরগতি করবার জন্য ঐ গুরুজলের প্রয়োজনটি তখন ঐকান্তিক ছিল। পাছে ঐ কারখানাটি নাজিদের হাতে গিয়ে পড়ে, সেজন্য সেটিকে শেষে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু ফ্রান্স্‌ও তখন নাজি-আক্রমণে টলমল করছে। অথচ সেই স্বদেশভূমিতে উপস্থিত থেকে ঐ ১৯৪০ সালেই জোলিও সমূহ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ঐ কারখানা থেকে সংগৃহীত অমূল্য জলসম্পদকে একটু একটু করে সরিয়ে ফেলেছিলেন,—নাজিরা যাতে তা' কিছুতেই হস্তগত করতে না পারে। এভাবে তিনি প্রায় ১৮০ লিটার মহার্ঘ গুরুজল ইংল্যাণ্ডে সরিয়ে দেন। কিন্তু তখন তিনি নিজে আর তাঁর সাধনার

নিরালা ক্ষেত্রে উদাসী হয়ে বসে থাকতে পারেননি। "নাজি বর্গীরা স্বদেশভূমি ছেয়ে ফেলতেই কুরি যোগ দিলেন প্রতিরোধ আন্দোলনে।...ফ্যাসিবাদের শত্রু থেকে তিনি হয়ে উঠলেন কমিউনিস্ট্।"

এদিকে ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসেই চ্যাড্উইক্ ইংল্যাণ্ডের ডিপার্ট্মেন্ট অফ্ সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড্ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল্ রিসার্চ্-এর কাছে তার করে জানিয়েছিলেন যে, বিভাজন ঘটনাটিকে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে উপযুক্ত অবস্থার মধ্যে তা থেকে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তুলা সম্ভব। মাস তিনেক পরে ১৯৪০-এর মার্চ্ মাসে ঐ ব্রিটেনে থেকেই অত্তো ফ্রিস এবং পিয়ের্ল্স্ (Rudolf Peierls) একটি স্মারক লিপি পেশ করেন। তাতে তাঁরা পারমাণবিক বোমার একটি নিখুঁত প্রাথমিক পরিকল্পনা (নীল নক্শা— Blue Print) লিপিবদ্ধ করে দেন। অচিরেই চ্যাড্উইক, ব্ল্যাকেট, কক্রফ্ট্ এবং টমসন প্রভৃতির মত বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের নিয়ে পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের সম্ভাবনা সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান সংস্থা গড়ে তুলা হল। এই সংঘটি মড্ (Maud) নামে পরিচিত হয়। মাইট্নার একটি তার পাঠিয়ে জানিয়েছিলেন যে তিনি নীল্স্ এবং মার্গারিতার (Margherita) সঙ্গে দেখা করেছেন, তাঁরা উভয়েই কুশলে থাকলেও অস্বস্তির মধ্যে কাল কাটাচ্ছেন; সংবাদটি যেন কক্রফ্ট্ এবং কেণ্ট্-এর মড্ রে (Maud Ray, Kent)-র কাছে জ্ঞাপন করা হয়। তিন বছর পরে নীল্স্ বোর বিলেতে এলে তাঁর কাছ থেকে জানা যায় যে, মড্-রে তাঁর ওখানকার একজন অভিভাবিকার নাম মাত্র। কিন্তু তিন বছর আগে বিজ্ঞানীরা তা জানতেননা। Maud কথাটির চারিটি বর্ণকে চারিটি শব্দের প্রথম চারটি বর্ণ মনে করে এ বিষয়ে নানা প্রকার জল্পনা কল্পনার পর শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে পূর্বোক্ত অনুসন্ধান সংস্থাটিকেই তাঁরা মড্ নামে নামাঙ্কিত করে দেন। মড্-সংস্থা কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। প্যারিস থেকে জোলিও এবং কুরির দলের কেউ কেউ এসে তার সঙ্গে যোগ দেন। জোলিওরা অবশ্য স্বদেশ ত্যাগ করেননি। কিন্তু যুদ্ধের ডামাডোলে পড়ায় ব্রিটিশ এবং ফরাসী বিজ্ঞানীদের গবেষণা ব্যবস্থাকেও শেষ পর্যন্ত কানাডায় স্থানান্তরিত করা হয়। সারা ১৯৪৩ সালটিতে আমেরিকা-যুক্তরাজ্যের সঙ্গেও প্রায় যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু ১৯৪০ থেকে ৪৫ পর্যন্ত পুরো পাঁচ বছর ধরে এক কঠোর গোপনতার মধ্যে আমেরিকাতে মারণাস্ত্র নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলতে থাকে। বিজ্ঞানীরা একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দিনে রাতে যে কাজ করে গিয়েছেন, তাঁদের সুশিক্ষিতা পত্নীদের পক্ষেও সে সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরে কিছুই জানা সম্ভব হয়নি। ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট্ যখন যবনিকা উঠল, তখন সারা পৃথিবীর মানুষ তা দেখে যেন বিস্ময়ে স্তম্ভীভূত হয়ে গেল। পাঁচ বছরের স্তব্ধ কাহিনী আচম্কা বিস্ফোরিত হয়ে সারা পৃথিবীর অরণ্যে-মরুতে, ভূধরে-সাগরে, আকাশে বাতাসে, দূরে

দূরান্তরে কী যেন এক দুর্বোধ্য কল্লোল জাগিয়ে তুলল। সে এক বিচিত্র গল্প-কাহিনী বটে।

ক্রমেই সংবাদগুলি একে একে এসে পৌঁছতে লাগল। প্রথম থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে, বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। সে অর্থ সম্পদ্‌স্রষ্টা বিজ্ঞানীর হাতে নাই, আছে সম্পদ্-ভোগের স্বেচ্ছাধিকারী সরকারের হাতে, যাঁরা রাজনৈতিক জ্ঞানেরও একমাত্র স্বেচ্ছাধিকারী। সুতরাং একমাত্র বিজ্ঞানসাধনার অধিকারীবৃন্দকে সরকার বা তৎস্থানীয় সংস্থার কাছেই ধর্ণা দিতে হল। পারমাণবিক শক্তির প্রচণ্ডতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় না হলেও ফের্মির সঙ্গে পরামর্শ করে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান তাই ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে নৌ-বিভাগের কাছে আবেদন জানালেন। তদনুযায়ী ফের্মিও অবিলম্বে নৌসেনাধ্যক্ষের (admiral) সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছে পারমাণবিক শক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে অর্থ সাহায্য চাইলেন। কিন্তু কল্পনাবিলাসী বিজ্ঞানীর কথায় ওঁরা বিশ্বাস করবেন কেন? ব্যর্থ হয়ে বিজ্ঞানীকে ফিরে আসতে হল।

সিলার্দ্‌ কিন্তু হাল ছাড়লেননা। তিনি জুলাই মাসে তাঁর স্বদেশবাসী বন্ধু বিজ্ঞানী ভিগনারকে (Eugene Wigner) নিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করলেন। ওঁরা বেশ বুঝতে পারলেন যে, ইউরেনিয়াম-বিভাজন যেখানে প্রথম ধরা পড়েছিল, খোদ হিটলারের সেই জার্মানীতে ইতিমধ্যে নিশ্চয় এ বিষয়ে অনেকটা কাজই এগিয়ে গিয়ে থাকবে, হিটলার কখনও এ ব্যাপারে চুপ করে থাকতে পারেননা। সুতরাং দুর্ধর্ষ হিটলারের জগৎজয়ের পূর্বেই আমেরিকার হাতে সে অস্ত্র এসে পৌঁছান দরকার। কিন্তু একথা তাঁরা ভেবে দেখার চেষ্টা করলেননা যে, যাঁরা তাঁদেরই দেশছাড়া করেছেন, তাঁরা হিটলার, মুসোলিনী, হর্তি বা বিশেষ কোনো নামধারী কোনো বিশেষ ব্যক্তি নন। তাঁরা একটি শ্রেণীই। তাঁদের দেশ কেবল জার্মানী, ইটালি বা হাঙ্গেরি নয়; আমেরিকাও। আর তাঁরা তাড়িয়েছেন কেবল আইন্‌স্টাইন, ফের্মি বা সিলার্দ্‌কে নয়। কল্যাণী বিজ্ঞান-চেতনার একাংশে ছুরিকা বসিয়ে দিয়ে তাঁরা তার সর্বাঙ্গেই ছুরিকাবিদ্ধ করেছেন। কিন্তু যে বিজ্ঞানীকে তাঁরা বিতাড়িত করেছেন, সে-বিজ্ঞানীও কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, যত বড় বিজ্ঞানী হোন না কেন সে ব্যক্তি। বাণবিদ্ধ বিজ্ঞানী সমাজ হয়ত তখনও জার্মাণীতে বসে কাঁদছে, আর কাঁদছে হয়ত ঐ আমেরিকাতে বসেই, কাঁদছে সারা পৃথিবীতেই।—কিন্তু অত শত ভাবনার সময় ছিলনা বুঝি। যেভাবেই হোক পূর্বোক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে আমেরিকা-সরকারকে অবহিত না করলেই নয়। সুকৌশলে পারমাণবিক বোমার রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্বের বিষয় জানিয়ে খোদ্ প্রেসিডেন্ট্ রুজ্‌ভেল্টের কাছেই একটি পত্র লেখা হল। আগষ্ট্ মাসের দু' তারিখে সেই পত্র তাঁর

কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। পত্রে স্বাক্ষর থাকল একমাত্র আইন্স্টাইনেরই। পত্রের মর্মার্থ :

ফ্রান্সে জোলিও এবং আমেরিকাতে ফের্মি ও সিলার্দের গবেষণার ফলে এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে, সরকারের সহযোগিতা পেলে অচিরেই ইউরেনিয়াম থেকে এমন এক বিপুল শক্তিকে মুক্ত করা যেতে পারে, যা' থেকে কেবল রেডিয়ামের মত বস্তুরই উদ্ভব ঘটবে তাই নয়, বিপুল শক্তির বোমাও তৈরি করা যাবে। সে-বোমা দিয়ে হয়ত সংলগ্ন অঞ্চল সহ একটি গোটা বন্দরকেই উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারবে। এদিকে জার্মানী তার অধিকৃত চেকোশ্লোভাকিয়ার খনি থেকে প্রাপ্ত ইউরেনিয়ামের বিক্রয় বন্ধ করে দিয়েছে এবং এ-বিষয়ে আমেরিকার কিছু কিছু কাজও বার্লিনে পরীক্ষা করে দেখা চলছে।

অক্টোবরের মাঝামাঝি রুজভেল্ট্ বিষয়টি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে অবিলম্বে তজ্জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে দিলেন। কিন্তু সমিতির কাজ চলল শম্বুক-গতিতে। বৎসরাধিক কাল যাবৎ অনেক সভা ও অনেক উপসমিতি গঠিত হল। কিন্তু আমেরিকা যখন শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবেই মহাযুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল, কেবল তখনই ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে পার্ল্ হারবার ঘটনার ঠিক পূর্বের দিন উপদেষ্টা-কমিটির সিদ্ধান্তগ্রহণ ত্বরান্বিত হয়ে উঠল এবং পারমাণবিক গবেষণার কাজটি সামরিক বিষয় বলেই ঘোষিত হল। ওদিকে পার্ল্ হারবার ঘটনার ঠিক পরের দিনই আমেরিকা-সরকার কর্তৃক পূর্বোক্ত বিজ্ঞানীবৃন্দও 'বৈদেশিক শত্রু' বলে ঘোষিত হলেন। পারমাণবিক গবেষণায় যাঁরা বিশেষ উদ্‌যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সকলেই বিদেশী। বৈদেশিক শত্রুদের কোনো ক্ষুদ্র তরঙ্গের রেডিও-সেট রাখা তো দূরের কথা, আমেরিকার এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য তাঁদের উড়োজাহাজে চড়াও বন্ধ হয়ে গেল।

এন্‌রিকো ফের্মির কার্যক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল চিকাগো। ওখানকার একটি গবেষণাগারে বিজ্ঞানীরা এসে একত্র হলেন। কিন্তু তৎপূর্বে তাঁরা চুপ করে বসেছিলেননা। তাঁরা কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েই কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পরম্পর-প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে তোলা তখন প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। প্রথমত, নিউট্রনগুলি খুব দ্রুতগতির হলে চলবেনা। কারণ, তা যদি হয় তাহলে ওদের কণিকা-ধর্ম প্রাধান্য লাভ করবে (পৃ. ৩১২, ৩৬৯) এবং তার ফলে কেন্দ্রক-শক্তিই ওদের ধরে ফেলে তাড়াতাড়ি গ্রেপ্তার করে নেবে। আবার নিক্ষিপ্ত নিউট্রনের সবগুলিই যাতে কাজে লেগে যায়—ইউরেনিয়াম-পরমাণু সমূহের শূন্যাঞ্চলের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে তারা বাতাসের মধ্যে গিয়ে না পৌঁছতে পারে, বা দু' চারটি নিউট্রন ফসকে পালিয়ে গেলেও বাকিগুলির দ্বারাই কাজ চলে যেতে পারে, তজ্জন্য ইউরেনিয়াম দিয়ে একটি মস্ত বড় স্তূপ (pile) বানিয়ে নেওয়া দরকার। তারপর

নিউট্রনগুলি যাতে লক্ষ্য-বস্তুর সঙ্গে মিশে-থাকা অন্য কোনো পদার্থের মধ্যে পড়ে শোষিত না হয়ে যায়, সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। জল দিয়ে ব্যবধান সৃষ্টি করে যে নিউট্রন-কণিকার গতিবেগ কমিয়ে দেওয়া যাবেনা, তা ওঁরা বুঝতে পেরেছিলেন। কারণ, জলের হাইড্রোজেন যথেষ্টভাবে নিউট্রন শুষে নেয়। এজন্য একটি বিশেষ দ্রব্যই খুব উপযোগী হতে পারে। সেটি হচ্ছে গ্রাফাইট্ (কার্বন)। গ্রাফাইট্ বস্তুটি নিউট্রনকে শোষণ করে নেয়না, কিন্তু তার বেগ কমিয়ে দেয়। একটি নিউট্রন একটি মাত্র কার্বন-কেন্দ্রকেই বহুবার ধাক্কা খায় এবং ধাক্কা মেরে ঐ কার্বন-কেন্দ্রককে তার অনেকটা তেজই চালান করে দেয়। তাতে তার নিজেরই গতি অনেক পরিমাণে কমে যায়। ফলে ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রক বিভাজনকালে উৎপন্ন নিউট্রনগুলির অধিকাংশই পুনর্বিভাজনের কাজে লেগে যেতে পারবে। সুতরাং নিউট্রনের গতিবেগ মন্থর করে দেওয়ার ক্ষমতার জন্য গ্রাফাইট্ (কার্বন) একটি ভাল মন্দন দ্রব্য (retarding agent—যা গতিবেগকে কমিয়ে আনে) হিসাবে গৃহীত হতে পাবে। সিলার্ড্ ও ফের্মি সেজন্য অনুমান করলেন যে, যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ কার্বন হলে ও-কাজ আরও ভালভাবে চলতে পারবে। কিন্তু একটুও খাত থাকলে সেই খাত নিউট্রনকে শোষণ করে নিতে পারে। সুতরাং ওঁরা ঠিক করলেন যে, গ্রাফাইট্ এবং ইউরেনিয়ামের স্তরকে পর পর সন্নিবিষ্ট করে রাখলে হয়ত ওরা পরম্পর-প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে তুলতে পারবে। কিন্তু এ কাজের জন্য ধাতুদ্বয়ের দ্বারা গঠিত যে স্তূপটি নির্মিত হওয়া দরকার তার আকৃতি কত বড় হবে, তা ঠিক করা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। নিশ্চয় সেটি একটি বিরাট জিনিস হবে। নাহলে নিউট্রনরা যে বাতাসে বেরিয়ে পড়বে। আসলে ঐ স্তূপটিই ছিল বর্তমান কালের নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর বা কেন্দ্রক-প্রতিক্রিয়া ঘটকযন্ত্রের অগ্রদূত। সেদিন সেটি ছিল বাস্তবিকই একটি স্তূপ মাত্র। একটি গ্রাফাইট্ স্তূপ, আর মাঝে মাঝে ইউরেনিয়ামের চাঁই। কিন্তু আধুনিক পারমাণবিক বোমার উপকরণের মত ঐ স্তূপেরও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে আকৃতিটি কয়েক ইঞ্চির ছিলনা। তা ছিল ১৫ ফুট। এর চাইতে কম হলে পরম্পর-প্রতিক্রিয়া ঘটবেইনা। তবে স্তূপটির আকৃতি সামান্যভাবে ঐ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে পরম্পর-প্রতিক্রিয়া ঘটবে সত্য কথা, কিন্তু তাতে বিস্ফোরণ ঘটবেনা। কারণ, ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর ক্ষেত্রে ঐ মাত্রা সামান্যভাবে ছাড়িয়ে গেলে পরম্পর-প্রতিক্রিয়াটি অত্যন্ত ধীরগতিতে বাড়তে থাকে। সে কথা মনে রেখেই স্তূপ নির্মাণের চেষ্টা হয়েছিল।

কিন্তু ঐ যুতসই (critical—ক্রান্তিমাত্রিক) ভরযুক্ত স্তূপের জন্য যে-পরিমাণ ইউরেনিয়াম আর গ্রাফাইট্ লাগবে, কোথা থেকে তা জোগাড় হবে? তার ওপর গ্রাফাইটকে সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ করে তোলা তো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার! সিলার্ড্ ছিলেন

দুর্দম। ইতিমধ্যে বছরের প্রথম দিকেই তিনি সেনা- এবং নৌ-বিভাগের কাছ থেকে ছ' হাজার ডলারের একটি প্রাথমিক সাহায্য আদায় করে তা' দিয়ে গ্রাফাইট্ কিনে সারা ঘর ভর্তি করে তুলেছেন। ঐ গ্রাফাইটের মধ্যে নিউট্রন পাঠিয়ে বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণার কাজ এগিয়ে নিয়ে চললেন। তারপর কিছু ইউরেনিয়াম জোগাড় হতে ওঁরা পরম্পর-প্রতিক্রিয়া ঘটাতে চেষ্টাও করলেন। কিন্তু সম্ভব হলনা। আরও বড় স্তূপ চাই। আর তার জন্য বৃহত্তর ঘরও চাই। অনেক চেষ্টাতেও ও-রকমের একটি ঘর পাওয়া গেলনা। এমন সময় উপদেষ্টা-কমিটির পূর্বোক্ত ঘোষণার পর ওঁরা চিকাগোতে উঠে গেলেন।

যে সাহায্য প্রথমে ৬০০০ ডলারে সীমাবদ্ধ ছিল, তিন বছরের মধ্যেই তা ২০০০০০০০০০ (২০০ কোটি) ডলারে উঠে গেল। গবেষণার কাজ সারা আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ল। কলম্বিয়া, চিকাগো, ক্যালিফোর্ণিয়া প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এক যোগে ইউরেনিয়াম-পরিকল্পনার কাজ চলতে লাগল। ফলও চমৎকার হল। ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মানুষের হাতে গড়া ইউরেনিয়াম-উত্তর উপাদান মিলে গেল—প্লুটোনিয়াম-২৩৯; চিকাগোতে পরম্পর-প্রতিক্রিয়ার পরীক্ষা সাফল্য লাভ করল। বিজ্ঞানীকে বহু বিপদ ও অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কারও হাত মুখ মারাত্মকভাবে পুড়ে গিয়েছে, কারও ফুসফুস প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত হয়েছে। ছিদ্রবহুল গ্রাফাইট থেকে নিউট্রন-শোষক বতাসকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য বিরাট স্তূপকে টিন দিয়ে ঢেকেও তার মধ্য থেকে বাতাস সরানো অসম্ভব হওয়ায় কার্বন-জাত বিস্ফোরক মিথেন গ্যাস দিয়ে কিছুটা বাতাস ঠেলে বার করবার ঝুঁকি নিতে হয়েছে। আবার কখনও বা বিরাট স্তূপকে ঘিরে ধরবার জন্য সেইরূপ আকৃতির রাবার-বেলুন বানিয়ে নিতে হয়েছে। চিকাগোর কাজ চলছিল ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ. এইচ. কম্প্টনের অধীনে। '৪২-এর শেষ দিকে প্রতিক্রিয়া ঘটাবার জন্য তিনি একটি উপযুক্ত জায়গা খুঁজে বার করলেন। চিকাগোর সেই স্কোয়াশ (টেনিস)-কোর্ট্টিতে প্রচণ্ড উদ্দম ও উদ্দীপনা নিয়ে প্রায় দু' মাস ধরে আয়োজনের কাজ চলল। সে এক এলাহি ব্যাপার। তারপর ডিসেম্বর মাসের দু' তারিখে পরীক্ষা, বা বলতে পারি খেলা শুরু হল। আমরা আগেই দেখেছি (পৃ. ৩৭০, ৩৭৩) বোরন, রেডিয়াম, ক্যাডমিয়াম প্রভৃতি ধাতু ধীরগতির নিউট্রনকে গ্রেপ্তার করে স্থায়ী কেন্দ্রকযুক্ত আইসোটোপে পরিণত হয়। অর্থাৎ ওরা সব নিউট্রনভুক্। সে-রকম কিছু ঘটলে ঐ-রকম সব ক্যাড্মিয়াম-দণ্ডকে স্তূপের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে, ওরাই তা থেকে কিছু নিউট্রন-কণিকা শোষণ করে নিয়ে পরম্পর-প্রতিক্রিয়াটি বন্ধ করে দিতে পারে। এ-কারণে বিপুলাকার স্তূপটির মধ্যে পূর্ব থেকেই কতকগুলি নিউট্রন-খাদক নিয়ন্ত্রক-দণ্ড ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল। ফের্মির নির্দেশে একটি ছাড়া বাকিগুলিকে সব টেনে বার করা হল। ঐ একটি মাত্র দণ্ডই নিউট্রন শুষে নিয়ে তাদের

পরস্পর-প্রতিক্রিয়ার কাজ বন্ধ করে দিতে সমর্থ। শেষে ফের্মির তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় প্রতিক্রিয়ার কাজ আরম্ভ হল। সেই শেষ ক্যাড্‌মিয়াম-দণ্ডটিকে একটু একটু করে টেনে বার করার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বঘোষিত ফল ঠিক হিসাব মতই ফলে যেতে লাগল। সেইসঙ্গে প্রতি মুহূর্তের স্তব্ধ বিস্ময়ে সারা ঘরখানিও থম্‌থম্ করছিল। আরম্ভের পর থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এ ভাবেই কেটে গেল। প্রচণ্ড উদ্বেগ-উত্তেজনা। অপ্রত্যাশিত অজ্ঞেয় ঘটনার আশঙ্কা। কিন্তু তারই মধ্যে, সেই সীমাহীন আশা আর বিস্ময়ের মধ্যেই খেলোয়াড়ের প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে অদৃশ্য নিউট্রন-বাহিনী সেই স্তূপাকৃতি ইউরেনিয়াম-ভরের মধ্যে বিদ্যুদ্‌বেগে প্রধাবিত হয়ে পৃথিবীতে সেই সর্বপ্রথম সার্থকভাবেই পরস্পর-প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে দিলে।

তিন চার মাস আগেই কিন্তু ইউরেনিয়াম-পরিকল্পনাটিকে সমরবিভাগ তার প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে নেয়। জেনারেল গ্রোভ্‌স্ (Leslie. R. Groves)-এর অধীনে সামরিক গুরুত্ব ও গোপনতার মধ্যে দ্রুতগতিতে কাজ চলতে থাকে। যাতে কোনোভাবেই কেউ না বুঝতে পারে, সেজন্য পরিকল্পনার নামকরণ হয় ম্যান্‌হাটন্ ডিস্ট্রিক্ট (Manhattan District)। কিন্তু সমস্যা ছিল মেলাই। একটি যেমন, ইউরেনিয়াম-বাছাই। খনিজ ইউরেনিয়ামের তিনটি আইসোটোপের (ইউ-২৩৪, ইউ-২৩৫, ইউ-২৩৮) মধ্যে বিভাজনের জন্য ইউ২৩৫-এর উপযোগিতাই সর্বাধিক (পৃ. ৩২৩)। অবশ্য ১৯৪১ খ্রী.-এ আবিষ্কৃত ইউরেনিয়াম-উত্তর উপাদান প্লুটোনিয়ামের উপযোগিতা বোধ হয় আরও বেশি। সেজন্য জাপানে যে বোমাটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, তা এই প্লুটোনিয়াম দিয়েই বোঝাই করা হয়েছিল। কিন্তু ইউরেনিয়াম নিয়ে গবেষণাকালে বিজ্ঞানীরা বুঝেছিলেন যে, ইউ ২৩৫-এর মধ্যে বিভাজন-প্রক্রিয়া যত সহজে সম্ভব হয়, ইউ-২৩৮-এর ক্ষেত্রে তা হয়না। তার কারণ, উভয় ক্ষেত্রেই প্রোটনের সংখ্যা একই (৯২) থাকলেও, প্রথমটির নিউট্রন-সংখ্যার (১৪৩) চাইতে দ্বিতীটির নিউট্রন সংখ্যা তিন বেশি। আমরা দেখেছি (পৃ. ৩১৯), ভারি উপাদানে প্রোটন দ্বৈতশক্তি (কেন্দ্রকীয় আকর্ষণী এবং বৈদ্যুৎ বিকর্ষণী শক্তি)-সম্পন্ন, হলেও নিউট্রনের শক্তিটি থাকে কিন্তু একমাত্র কেন্দ্রকীয় আকর্ষণী শক্তি। সুতরাং নিউট্রনের আধিক্যের জন্য প্রথমটির চাইতে দ্বিতীয়টিতে কেন্দ্রকীয় আকর্ষণের প্রভাবটিও বেশি হয় এবং প্রোটন জনিত বিকর্ষণের শক্তি প্রথমটির চাইতে দ্বিতীয়টিতে কম থাকে। সেজন্য ওর (ইউ-২৩৮) স্থায়িত্ব বেড়ে যাওয়ায় বিভাজনের সম্ভাবনাও হ্রাস পায়। কিন্তু খনিতে যে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় তাতে ইউ ২৩৮-এর ভাগ শতকরা ৯৯-এর চাইতেও বেশি। সম্ভবত নিউট্রন-সংঘাত জনিত পরস্পর-প্রতিক্রিয়ার ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক বিপদের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করবার জন্যই প্রকৃতির এই সুনিপুণ ব্যবস্থা। কিন্তু যাই হক না কেন, খনি মধ্যে ২৩৫-এর পরিমাণ

তারও ১/১৪০ ভাগ, এবং এরও প্রায় ১/১৪০ ভাগ থাকে ঐ ২৩৪-সংখ্যার ইউরেনিয়াম। সুতরাং মিশ্রণ থেকে ২৩৫-কে পৃথক করা এক বিরাট সমস্যা। তাছাড়া, ইউ-২৩৮ যে আবার নিজের দেহ থেকে আল্‌ফা-কণিকা নিঃসৃত করে ইউ-২৩৪ সৃষ্টি করে চলে! কিন্তু প্রধান কাজ ইউ-২৩৮ থেকে ইউ ২৩৫-কে পৃথক করা। অথচ ওদের বিদ্যুৎ-আধান এবং রাসায়নিক গুণাবলী সম্পূর্ণতই এক বলে কোনো রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ওদের পৃথক করা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং ওদের একমাত্র পার্থক্য যে ওজনের দিক থেকে, তাকেই অবলম্বন করে বিজ্ঞানীরা এ সমস্যার সমাধান করলেন।

ইতিপূর্বে আমরা নিয়ন-গ্যাসের আইসোটোপ দু'টিকে পৃথক করার ব্যাপারে ভেদন-প্রসারণ পদ্ধতির কথা জেনেছি (পৃ. ২৬৬-৬৭)। এ পদ্ধতিও অনেকটা সেই রকমের। ফ্লোরিনের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে প্রথমে ইউরেনিয়ামকে গ্যাসে পরিণত করা হয়, তারপর নিয়ন গ্যাসকে যেমন পর পর মৃত্তিকা নির্মিত কক্ষের মধ্য দিয়ে ছেঁকে নেওয়া হয়েছিল, এখানেও তেমনি ইউরেনিয়াম-গ্যাসকে পর পর এক একটি কক্ষ থেকে পাম্প্ করে চাপ দিয়ে ঠেলে অন্য কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। মাঝখানে থাকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত ছাঁকুনি। তাদের প্রতি বর্গসেন্টিমিটারেই (১ সে.মি. লম্বা ও ১ সে. মি. চওড়া জায়গায়) থাকে লক্ষ লক্ষ ছিদ্র। চাপের ফলে একটি কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে যাওয়ার সময় অপেক্ষাকৃত হাল্কা অণুগুলিই অধিকতর বেগবান হয়ে আগে বেরিয়ে যায়। সুতরাং প্রথম প্রকোষ্ঠে যেখানে ১৪১-টি অণুর মধ্যে একটি মাত্র হালকা অণু থাকে, সেখানে দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে তার শতকরা সংখ্যাটি বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। তারপর দ্বিতীয় কক্ষের মধ্যে গ্যাসটি হঠাৎ স্ফীত হয়ে যাওয়ায়, আবার তার অণুগুলি বেগবান হয়ে উঠে, এবং আবার তাকে চাপ দিয়ে তৃতীয় কক্ষে সরিয়ে দেওয়া হয়। তখন সেখানে হাল্কা অণুর সংখ্যা আরও বেড়ে যায়। এভাবে অসংখ্য ছাঁকুনির মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে যেতে ইউ-২৩৫ প্রায় পৃথক হয়ে পড়ে। ১৯৪৩ খ্রী.-এ টেনাসি-উপত্যকার ওক্-রিজ কারখানায় মরচেহীন ইস্পাতের বায়ুনিরুদ্ধ নল পেতে দেওয়া হল। তার দৈর্ঘ্য হয়ে গেল হাজার হাজার মাইল। আর তার ছাঁকুনির মোট ক্ষেত্রফলটিও হয়ে দাঁড়াল প্রায় দেড়শো বিঘের (৫০ একর) মত। সমগ্র কাজের মধ্যে শুধু এই অংশটিই এক বিস্ময়ের বস্তু। এছাড়া, আরও তো কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। রি-অ্যাক্টারকে ঠাণ্ডা করাও এক মস্ত সমস্যা। হান্‌ফোর্ডের রি-অ্যাক্টারকে ঠাণ্ডা করবার জন্য বিরাট কলম্বিয়া নদীর বিপুল জলস্রোত পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠে। যাই হক, ছাঁকুনি-পদ্ধতিতে ঐ ইউরেনিয়াম-পৃথকীকরণ ব্যাপারটি আমেরিকানদের একটি উচ্চস্তরের 'সামরিক গুহ্য তথ্য'। যুতসই ভরের ব্যাপারটিও একটি অতি গুহ্য তথ্য ছিল। আজ অবশ্য জানা যায় যে, উচ্চশক্তির রি-অ্যাক্টারে ইউ-২৩৫ এবং প্লুটোনিয়ামের জন্য ঐ ভরটি দরকার হয় যথাক্রমে ৪৯ ও ১৬½ কিলোগ্রাম। রি-অ্যাক্টারের সাহায্যে ঐ ভরকে

যথাক্রমে ১৬ এবং ৬ কি. গ্রা -এ নামিয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক যুগে ব্যাপারটির সমাধান ছিল সত্যই এক সমস্যার বিষয়। তাই তা' ছিল অত্যন্ত গুহ্য। কিন্তু আসল বোমা প্রস্তুতের বিষয়টি ছিল বোধকরি আরও গুহ্য ও গুরুত্বপূর্ণ।

সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটির পরিচালনা-ভার গ্রহণ করলেন ওপেনহাইমার (J.Robert Oppenheimer)। সহ-পরিচালক (Associate Director) রইলেন এন্‌রিকো ফের্মি। নিউ-মেক্সিকো প্রদেশের লস্‌ আলামস্‌ খাদে ওপেনহাইমার একটি অপূর্ব সুন্দর ও মনোরম স্থান খুঁজে বার করলেন। পাহাড়ের ঢালে উপত্যকার মধ্যে দেওদার-শোভিত মরু-চুম্বিত বালু-কংকরময় উচ্চভূমি। অত্যল্প কালের মধ্যেই ঘর বাড়ি, গবেষণাগার তৈরি হয়ে গেল। এসে পড়লেন পৃথিবীবিখ্যাত বিজ্ঞানীরা,—বোর, উরে (Harold Clayton Urey, 1893-), চ্যাড্‌উইকরা। ইংল্যাণ্ডের দলটি এসে যোগ দিল। অপূর্ব শহর গড়ে উঠল। সামরিক কারণে জায়গাটির নাম পালটে দেওয়া হল, এবং বক্‌স্‌-নম্বরে চিঠিপত্র পৌছতে লাগল। ইউরেনিয়াম প্রভৃতির মত কতকগুলি বস্তু এবং আর কতকগুলি বিষয় সামরিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় ওদেরও পৃথক নামকরণ হল। কাজ এগিয়ে চলল। কিন্তু এত বড় একটি প্রচণ্ড ব্যাপারের মধ্যে যেমন হয়ে থাকে, এক্ষেত্রেও তাই ঘটল। মাঝে মাঝে পরম্পর-প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে তার বিষাক্ত বিকিরণের দাপট প্রকাশ করতে লাগল, আর কয়েকটি অমূল্য প্রাণকে তার করাল গ্রাসে কবলিত করে ফেলল। কিন্তু দু' বছরের প্রচণ্ড সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত দানব-দমন মানবের কাছে তাকে নতশির হতে হল।

১৯৪৫ সালের জুলাই মাসের ১৬ তারিখে ভোর ৫½-টার সময় নিউ-মেক্সিকোর দক্ষিণাঞ্চলে পরিত্যক্ত বিমানবন্দর (air base) আলামোগর্দোয় (Alamogordo) একটি অদৃষ্টপূর্ব অতুলনীয় জ্যোতি শিউরে উঠল। মধ্যাহ্ন সূর্যের বহুগুণ সে আলোকের নাম হতে পারে বিশ্বজ্যোতি। নীল-বেগুনি-রক্তরাগ রঞ্জিত তার স্বর্ণবর্ণচ্ছটা। আ-শৃঙ্গ-গহ্বর শৈলমালার সূক্ষ্মতম কণিকাটিও তার আলোকে অচিন্তনীয় স্পষ্টতা নিয়ে সৌন্দর্যময় দেহসুষমা লাভ করল। আর এমনি প্রচণ্ড সে, যে তার অভাবিতপূর্ব ভীম গর্জনে সারা দেশ যেন মুহূর্তের মধ্যেই প্রলয়াশংকায় কেঁপে উঠল। সূর্যতেজের পরোয়া না করে মানুষ এই সর্বপ্রথম তার নিজের হাতেই যে বিপুল তেজপরিমাণকে মুক্ত করে দিল, তা যেমন সুন্দর, যেমন মহীয়ান, আবার তেমনি ভয়াবহ, তেমনি প্রলয়ংকর। নির্জন মরুপ্রান্তরে পরমাণু-বোমাটি যে জায়গায় পড়েছিল, ধ্বস নেমে সেখানে খাদ হয়ে উঠল। ব্যাস তার প্রায় আধ মাইল। সারা গহ্বরটি আলো-প্রভায় জল্‌ জল্‌ করতে লাগল। তার বালুরাশি মুহূর্তে গলে গিয়ে পাথরে পরিণত হল। হাওয়ার ধাক্কায় সংলগ্ন অঞ্চলে তুফান বয়ে গেল।

মহাযুদ্ধ তখন প্রায় খতম হয়ে এসেছে। কিন্তু তার ছিন্নশির জাপানী পুচ্ছটি তখনও আটলান্টিক অঞ্চল ধরে ক্রমেই ভারতমহাসাগরের দিকে এগিয়ে আসার জন্য যেন উন্মাদ-লোলুপ অঙ্গভঙ্গি নিয়ে শেষবারের মত ফুলে ফেঁপে ছটফটিয়ে উঠছে। প্রেসিডেন্ট্ রুজভেল্ট্ তখন লোকান্তরিত, মাত্র কিছুদিন আগে তিনি দেহত্যাগ করেছেন। এদিকে ট্রিনিটি (আলামোগর্দোর নতুন নাম)-পরীক্ষার পর এক মাসও পেরিয়ে যায়নি। আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ঘোষণা করলেন যে অচিরেই আকাশ থেকে জাপানীদের ওপর প্রলয় নেমে আসবে। আগস্ট্ মাসের ৬ তারিখে সকাল সওয়া আটটার সময় হিরোশিমার আকাশ থেকে সত্যিই সে প্রলয় নেমে এল। লক্ষ মানুষের ধ্বংস-ধ্বনিতে সারা জাপানের মিলিত আর্তনাদ সমগ্র পৃথিবীতে প্রতি-ধ্বনি জাগিয়ে তুলল। প্রায় গোটা মানুষ জাতটাই আতঙ্কে আঁৎকে উঠল। পরের দিন প্রেসিডেন্ট্ আবার ঘোষণা করলেন যে, প্রথম পরমাণু বোমাটি ছিল ২০ হাজার টন টি. এন্. টি-সমন্বিত। তিন দিনের মধ্যেই (৯ই আগস্ট) আবারও সেই বোমা ফেলতে দ্বিধাবোধ করলনা পরমাণুবোমার অধীশ্বর। মুহূর্তের মধ্যেই নাগাসাকিও খতম হয়ে গেল। কিন্তু হিরোশিমা নাগাসাকির প্রত্যন্ত অঞ্চল খতম হয়ে চলেছে সম্ভবত আজও। ক্লিষ্ট-গলিত-বিকলাঙ্গ মানুষের আর্তধ্বনি আজও তার 'নিশার গগন'কে কাঁদিয়ে চলেছে।

দ্বিতীয় পর্ব:

বোমার অধীশ্বর কিন্তু বিজ্ঞানী নন; যদিও নির্মিতি আর নিক্ষেপণ-পরিকল্পনাতে তাঁর হাত কাজ করে গিয়েছে নিশ্চিতভাবেই। পরমাণু-বোমাটি নিশ্চয় একটি সত্য। তার নিক্ষেপণ-বৃত্তান্তটিও একটি ঘটনা। কিন্তু ওটি একটি দুর্ঘটনা। যাকে আমরা প্রকৃতিক দুর্ঘটনা বলি, ঠিক সে রকমের না। ওটি একটি মানবিক বা মানসিক দুর্ঘটনা; বা বলতে পারি, বিজ্ঞানী মহামানসের মহাপ্রমাদ। তা না হলে পারমাণবিক অকল্পনীয় মহাশক্তির প্রথম দ্রষ্টা-বিজ্ঞানী মহীয়সী মহিলা মাইট্নার (পৃ. ৩৭৫) স্টক্হোমের রাজপথে চলতে চলতে সংবাদপত্রে উক্ত প্রলয় কাহিনীর সংবাদ পড়ে কেনই বা আর্তনাদ করে উঠবেন, "বোমা তৈরি হবে বলেই কি আমরা এ কাজ করতে গিয়েছিলাম? কিই বা প্রয়োজন ছিল তার?……দুটো শহরকেই ওরা নিশ্চিহ্ন করে দিলে! না, না, এ কিছুতেই চলবেনা?" কেনই বা তিনি তারপর তাঁর সাধ ও সাধনার বিজ্ঞান জগৎথেকে চির বিদায় নিয়ে সুদীর্ঘ ২৪ বৎসর যাবৎ অনুতাপদগ্ধ হতাশা বহন করে (আজ থেকে দু'দিন আগে ২৭।১০।৬৮-এ) জন্মভূমি থেকে বহুদূরে কেমব্রিজের এক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন? আর তা না হলে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীকুলের প্রতিভূ মহামনীষী যে-আইনস্টাইন স্বয়ং হস্তক্ষেপ করে পারমাণবিক

বোমা প্রস্তুতকে অচিরেই সম্ভব করে তুলেছিলেন, হিরোশিমা-ঘটনার পর সে সংবাদ শুনে তিনি 'নির্বাক হতাশায় ভুরু কুঁচকে মাথার রগ চেপে ধরে বসে' পড়বেন কেন? তা না হলে তিন মাস আগে জার্মান-যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার প্রায় কুড়ি দিন পরে পরমাণু-বোমা নির্মাণের বিশিষ্ট অধিকর্তা লিও সিলার্ড্ও কেনই বা প্রেসিডেণ্ট্ রুজভেল্টের কাছে পারমাণবিক শক্তির উপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের জন্যে আবেদন জানাবেন? আর তা না হলে দু'মাস আগেও কেনই বা ঐ রঙ্গমঞ্চের অভিনেতৃ-বিজ্ঞানীবৃন্দের একটি মহৎ অংশও তৎক্ষণাৎ ঐ আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন উত্থাপন করে, সাবধান-বাণী উচ্চারণ করবেন যে, জাপানে বোমা ফেলা হলে যুদ্ধ শেষে আমেরিকার পক্ষে হয়ত আর আন্তর্জাতিক প্রশ্নটি উত্থাপন করারও সুযোগ থাকবেনা? যুদ্ধ-প্ররোচক মানব-দানবকে রুখবার জন্য বিজ্ঞানীরা গায়ে পড়ে যার সঙ্গে ভাব জমিয়ে বসেছিলেন, তাকেই আর কিছুতে রুখা যাচ্ছেনা। সে হচ্ছে শান্তির মুখোশ পরা আর এক মানব-দানব। কিন্তু সত্য ঘটনা এই যে, দু'টি দানবিক প্রক্রিয়াই দু'বার বিজ্ঞানীর মাথাকে ঘুরিয়ে দিলে। যুদ্ধ একটি বহির্জাগতিক ঘটনা। ঘটে উঠা মাত্রেই তা বিজ্ঞানীদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। বহির্ঘটনার প্রতিফলনে তাঁদের মন বা মস্তিষ্ক-প্রক্রিয়ার রূপান্তর ঘটে গেল। পারমাণবিক শক্তির মধ্যে সত্য সন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা আর কিছু করলেননা, যুদ্ধকে অনতিবিলম্বে শেষ করবার জন্যই তাঁরা পরমাগ্রহে ঝুঁকে পড়লেন বোমা-নির্মাণের দিকে। হান্ আর স্ট্রাস্‌মানের পরীক্ষাটি ভাল করে অনুধাবনের জন্য হিটলার তখন প্রায় শ' দু'য়েক বিজ্ঞানীকে একত্র জড় করেছেন। সুতরাং পাছে আমেরিকার পূর্বেই জার্মানী সেই বোমা আবিষ্কার করে মানবজাতিকে এক ভয়াবহ পরিণতির মুখে ঠেলে দেয়, এই ছিল বিজ্ঞানীদের সর্বক্ষণের ভয় আর উদ্বেগ। কিন্তু যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে গেল, তখন বোমার অধিকারী মানব-দানবের ভণ্ডামিটি তাঁদের সামনে এসে বিকট বিকৃত মুখে হাঁ করে দাঁড়াল। বিজ্ঞানীসমাজের বহিভূত বহির্জাগতিক মানবসমাজের অংশবিশেষের হাতের পরমাণু-ভ্রূকুটি, বিজ্ঞানীর মস্তিষ্কে আবার প্রতিফলিত হয়ে তাঁর মানস-রূপান্তর ঘটিয়ে দিলে। বহির্বস্তু বা বহির্ঘটনাধারা এভাবে বার বার মানস-প্রক্রিয়াকে জন্ম জন্মান্তরে টেনে নিয়ে গিয়ে চেতনার ঐ ক্রমাভিব্যক্তি ঘটিয়ে তুলল। আন্তর্জাতিক মহামানবের হাতে তাই দানবকে ধরে এনে অর্পণ করে দিতে পারলে যেন তাপদগ্ধ বিজ্ঞানীর কিছুটা সোয়াস্তি, তাঁর মহাপ্রমাদের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত!

আমেরিকার প্রবুদ্ধচেতন বিজ্ঞানীসমাজের সাবধান-বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছে। কৃতকর্মের জন্য শোচনাটি কেবল মাইট্‌নার, আইন্‌স্টাইন্ বা সিলার্দের নয়। হিরোশিমা-ঘটনার পর লস্-আলামসের সেই অভিনেতৃ-বিজ্ঞানীসমাজের মনোজগৎ জুড়ে একটি দুশ্চিন্তা, শোচনা ও অপরাধের ভাবতরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে গেল। সারা সমাজটির মধ্যে

থেকে একটি প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব সমুত্থিত হল। ভাব, ধারণা ও মতবাদের দ্বন্দ্ব। বোমাটি একটি বস্তুপিণ্ডমাত্র হলেও আসলে ওকেই অবলম্বন করে সেই ভাবদ্বন্দ্ব। একটি ভাব হল: বোমাটি পারমাণবিক তেজের একটি প্রতীক মাত্র। প্রাকৃতিক বিপুল তেজের সত্যতাকে ওটি প্রকাশ বা প্রমাণ করে দিচ্ছে। আর একটি ভাব হল: বোমাটি একটি প্রচণ্ড ক্ষয়, ক্ষতি ও ধ্বংসের প্রতীক; সুতরাং এ থেকে দু'রকমের মত প্রকাশ পেতে পারে। প্রথম, তাহলে ঐ বোমা নিশ্চয়ই অন্যায়কে বা দানবকে ধ্বংস করে দিতে পারে। দ্বিতীয়, তাহলে বোমা দিয়ে মানুষের হাতে গড়া সৌন্দর্য এবং সভ্যতাও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আর একটি আপোসমূলক মিশ্রভাব হল: বোমা যদি সত্যকে প্রকাশ করতে পারে, এবং যদি সে আবার সৌন্দর্য ও সভ্যতাকে ধ্বংস করে ফেলতেও পারে, তাহলে, নিশ্চয় ওর অধিকার বা প্রয়োগ-দায়িত্বকে এমন একটি হাতে তুলে দেওয়া উচিত, যে-হাত সত্যকে যাচাই করবার সুযোগ দেয়, সৌন্দর্য ও সভ্যতাকে রক্ষা করে, অসত্য ও অসুন্দরকে বিনষ্ট করে ফেলে। কিন্তু বহির্বস্তু থেকে বস্তুতরঙ্গ উত্থিত হয়ে এসে মস্তিষ্কবস্তুতে আঘাত সৃষ্টি করায় যে বিভিন্ন ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি হল, তার কারণ যেমন বিভিন্ন মানুষের মস্তিষ্কপদার্থের বিভিন্নতা, তেমনি তার আর একটি মস্ত বড় কারণ, বহির্বস্তুর সঙ্গে মস্তিষ্কবস্তুরও একটি গুণগত বিভিন্নতা। যদি পারমাণবিক বোমাটিকে বহির্বস্তুর একটি প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করি, তাহলে মস্তিষ্কবস্তুর সঙ্গে ওর যোগ আছে। কারণ উভয়েই বস্তুসংঘ বিশেষ। সুতরাং উভয়েই পদার্থগত হওয়ায় উভয়ের মধ্যেই সাদৃশ্য আছে। আবার উভয়েরই মধ্যে পদার্থের ভিন্নপরিমাণ মূলক ভিন্ন বিন্যাস ঘটায় ওদের পার্থক্যও বিপুল, এবং সে পার্থক্য গুণগত।—একটি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটি হিলিয়াম-পরমাণু যেমন একই মূল পদার্থ দিয়ে তৈরি হলেও ওদের পদার্থ-পরিমাণ এবং পদার্থ-সন্নিবেশ পৃথক হওয়ায় ওদের মধ্যে গুণের পার্থক্যটি আকাশ-পাতাল। আবার বোমা ও মস্তিষ্কের মধ্যে বিভিন্নতার সাথে একটি সাদৃশ্যও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বলেই ওদের বিশেষ কোনো একটি, চিরকাল যাবৎ অন্যটির উপর একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করে চলেনা। বোমাটি যেমন বিজ্ঞানীসমাজের মস্তিষ্কের উপর অনিবার্য প্রভাব বিস্তার করে চলতে পারে, মস্তিষ্কও তদ্রূপ বোমার উপর নিশ্চিত প্রভাব প্রয়োগ করতে পারে। জগতের সকল বস্তুর মধ্যেই এই রকম পারস্পরিক প্রভাব চলছে। কেউ কারও থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এক অবিচ্ছিন্ন পদার্থধারায় সর্বজগৎ অনুস্যূত ও বিধৃত। আমরা এতকাল ধরে সেই মূল পদার্থটিরই স্বরূপ সন্ধান করে এসেছি। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্কও যে বোমার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তার প্রমাণ আমাদের ঐ উপরোক্ত তিনটি ভাবের মধ্যে আপোসমূলক মিশ্র ভাবটিতে সুন্দরভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। এই ভাবটি পূর্ববর্তী দু'টি ভাবের মত নিছক অমূর্ত ভাব না হয়ে প্রকাশাত্মক বলেই ওকে

মিশ্রভাব বলেছি। অর্থাৎ প্রয়োগের মাধ্যমে পূর্ববর্তী ভাবগুলি ওখানে প্রকাশ পেতে চাইছে। বোমাটির পারমাণবিক তেজের মধ্যে যে সৃষ্টি ও ধ্বংসের গুণ লুকিয়ে রয়েছে, সেই সত্যটি প্রমাণ-প্রয়োগের মাধ্যমে প্রকাশ পেতে চাইছে, এবং মানবমস্তিষ্কই সেই সত্যকে প্রযুক্ত বা প্রমাণিত করে দিতে পারে বলেই তার উপর মানবমস্তিষ্কের ঐ নিশ্চিত প্রভাব।

তাহলে দেখছি, মূল পদার্থটি প্রোটন ইলেক্‌ট্রন ইত্যাদির মত কোনো অতি ক্ষুদ্র কণিকা, বা গামা- ও মহাজাগতিক-রশ্মির মত কোনো সূক্ষ্মতর তেজসংঘ, যাই হক না কেন, তার একটি মস্ত বড় ধর্ম এই যে, সে রূপ (যেমন, বোমার) থেকে ভাবে (যেমন, বিজ্ঞানীর মস্তিষ্কপ্রসূত পূর্বোক্ত ধারণাগুলির) এবং পুনরায় ভাব থেকে রূপে (প্রযুক্ত প্রক্রিয়ায়) অবিরাম যাওয়া আসা করছে। অর্থাৎ সে চির-গতিশীল। অর্থাৎ আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পার্থিব পদার্থমাত্রেই যেমন ভর-তেজ গুণাত্মক, তেমনি তার আর এক নিশ্চিত ধর্ম তার ঐ প্রকাশমূলক চিরগতি। প্রোটনাদি তথাকথিত প্রাথমিক-কণিকা এবং অণু-পরমাণুর মধ্যে আমরা এতকাল যে গতি-তেজটি ক্রমাগতই লক্ষ্য করে এসেছি, এবং প্রকাশ পাওয়ার উদ্দেশ্যেই রশ্মি থেকে কণিকা (পজিট্রন-ইলেক্‌ট্রন), ও কণিকা থেকে রশ্মির মধ্যে যে পদার্থগতির আবর্তন লক্ষ্য করেছি, বৃহত্তর বস্তুসংঘ বা বৃহত্তর প্রক্রিয়ার মধ্যেও বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সেই একই গতি বা একই আবেগ প্রতিচ্ছন্দিত হয়ে চলেছে,—যুদ্ধ-প্রক্রিয়া থেকে বোমা-বস্তু এবং বোমা থেকে ধারণা ও মতবাদ রূপ ভাব-বস্তু, এবং মতবাদ থেকে আবার সৃষ্টি বা ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়াগুলি,—এভাবেই পদার্থগতি প্রকাশ পাচ্ছে ও বিচিত্র হয়ে উঠছে। কিন্তু বস্তুধারার এখানে একটু বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রকৃতির নবনির্মিত বিশেষ গুণসম্পন্ন চেতনাধর্মী মস্তিষ্ক রূপ বস্তুসংঘটির মধ্য দিয়েই সেই পদার্থপ্রবাহকে যাওয়া-আসা করতে হচ্ছে। বেগ তাই এখানে আবেগে রূপ নেয়, ভর-তেজ চেতনা হয়ে উঠে। তাই ঐ পূর্বোক্ত আপোসমূলক মিশ্র ভাবটি কেবল পদার্থগতি বা ভরতেজ প্রকাশক নয়, তা চেতনার অভিব্যক্তি-প্রকাশকও।

কিন্তু পদার্থধারার যেমন বিশেষ বিশেষ নিয়ম কানুন আছে, এবং সেগুলি নিয়ে তার বিজ্ঞানশাস্ত্র গড়ে উঠেছে, বস্তুবিজ্ঞানের অনুসারী হলেও চেতনারও তেমনি রীতিনীতি আছে এবং তারও বিজ্ঞানশাস্ত্র গড়ে উঠতে পারে। ব্যক্তির হিসাবে দেখলে তার নাম মনোবিজ্ঞান হতে পারে, কিন্তু সমষ্টির হিসাবে তাকে সমাজমানসবিজ্ঞান বলতে হয়। বহির্বস্তু থেকে মস্তিষ্কবস্তু বা মন, এবং বহু মানুষের চেতনাসমাহার থেকে সমাজমানস বা সমাজচেতনা বিবর্তিত হয়ে উঠেছে। সুতরাং সাধারণ বিচারে বুঝা যায়, মনোবিজ্ঞানীকে যেমন বস্তুতত্ত্বটি জেনে নিতে হয়, সমাজবিজ্ঞানীকেও সেইরূপ মনস্তত্ত্ব বা বস্তুতত্ত্ব উভয়ই জেনে নিতে হয়। কাজটি যে সুকঠিন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অপরপক্ষে,

এ-সবের ভিত্তিমূলক যে বস্তুতত্ত্ব বা প্রকৃতিবিজ্ঞান, তার কাজ অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। তাই প্রকৃতিবিজ্ঞানীবৃন্দ অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই প্রাকৃতিক শক্তির সম্যক্ পরিচয় লাভ করে তা দিয়ে স্বশক্তি-বশীভূত এমন বিপুল তেজবিশিষ্ট পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে সমর্থ হলেন। বস্তুত, প্রাকৃতিক সত্যানুসন্ধান ছিল তাঁদের সাধনা, এবং সে সাধনায় তাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছেন। কিন্তু সে সিদ্ধি যে আংশিক সিদ্ধি, তার প্রমাণ, ঐ পারমাণবিক বোমাটিকে তাঁরা ধরে রাখতে পারেননি। বোমার শক্তিকে তাঁরাই নিয়ন্ত্রণ করবার পূর্ণ অধিকারী হলেও বোমাটিকে ব্যবহার করার শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবার কোনো অধিকারই তাঁদের আর ছিলনা। যাঁরা স্রষ্টা, তাঁদেরই ভোক্তা হওয়া উচিত কিনা, সে প্রশ্ন আলাদা। কিন্তু এখানে স্রষ্টা যে ভোক্তা হতে পারেননি তার কারণ, ভোক্তৃত্ব সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া উচিত,—সমাজ-প্রচারিত তাঁদের এই বহুযুগ-পোষিত দৃঢ়মূল ধারণা। সেইজন্যই তাঁরা তাঁদের সাধনার গজদন্ত-মিনারে নির্লিপ্ত সাধনায় মগ্ন। সেই-খানটিতে থেকেই বস্তুবিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁরা এতদূরে এগিয়ে গেছেন যে, সমাজ কর্তৃক আরোপিত ধারণাটি যে তাঁদের উপর গুরুভার হয়ে রয়েছে, প্রথম থেকেই তা যেন তাঁরা বুঝে উঠতে পারেননি। একদিকে ওঁদের প্রচণ্ড গতি, আর একদিকে অমানুষিক স্থিতি-জাড্য। কিন্তু গতি আর আপেক্ষিক-স্থিতির সামঞ্জস্যমূলক দ্বন্দ্বই যেখানে বিশ্বপ্রকৃতি তথা সমাজপ্রগতির প্রাণ স্বরূপ, সেখানে ঐ সামঞ্জস্য বা সাম্যটুকু ভেঙে যাওয়াতেই সমাজপ্রগতিটি তাই প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়ে বিধ্বংসী বোমার আকারেই রূপ পরিগ্রহ করল। গতি ছাড়া যাঁরা অনন্যোপায়, প্রগতিই যাঁদের সাধনার মহিমা—মস্তকার্পিত জগদ্দল পাথরটি সম্বন্ধে তাঁরা উদাসীন,—এর চাইতে ব্যথাবিধুর করুণ দৃশ্য আর কি হতে পারে!

সুতরাং আপোসমূলক মনোভাব প্রকাশ করে যথার্থ প্রকৃতিবিজ্ঞানীবৃন্দ যখন একথা মনে করেছিলেন যে, অন্যায়টি অস্ত্র-আবিষ্কারের মধ্যে নেই, যা-কিছু অনিষ্ট তা লুকিয়ে আছে মানুষের যুদ্ধ-প্ররোচনা মূলক অভিপ্রায়ের মধ্যে, তখন তাঁরা বস্তুসত্য সন্ধানের অমোঘ প্রভাবে সত্য কথাই বলেছিলেন। কিন্তু বৃহত্তর ও জটিলতর বস্তুসংঘরূপ সমাজ-মানসের যে রীতিনীতি, ততদূর পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার বাসনাই তাঁদের ছিলনা। যেন ঐ রীতিনীতি কোনো বস্তুনীতি নয়, সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের একটি রীতি,—যার নাম সমাজ-নীতি বা রাজনীতি। সুতরাং বোমা-নিয়ন্ত্রণের অধিকারটি রাজনীতিরই অন্তর্ভুক্ত থেকে গেল। নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় রাজতুল্য ব্যক্তিকেই ওঁরা পরমাণু-বোমার অধীশ্বর করে দিলেন। সর্বমানবিক বলেই যে-বিজ্ঞানের এমন মাহাত্ম্য, রাজকীয় হয়ে গিয়ে তা যেন অমানুষিক হয়ে দাঁড়াল। ইতিহাস হলেও ওকে যদি গল্পকথা না বলি, গল্প আর বলব কাকে? ভগ্নপদ খঞ্জটি এগিয়ে চলেছে, কিন্তু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তকে

লঙ্ঘন করবার শক্তি তার নাই। 'সামরিক গুরুত্ব' আর 'গুহ্য তথ্যে'র ডোবায় পড়ে তাকে হাবুডুবু খেতে হয়।

কিন্তু প্রথমেই বলেছি, বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানসাধনা কোনো প্রকৃতি-বহির্ভূত ব্যাপার নয়। বিশ্বপ্রকৃতির চিরন্তন পরীক্ষার অঙ্গীভূত সে-সাধনা। প্রকৃতির গবেষণাগারে এক মহামানবিক বিজ্ঞানমানস ক্রমাভিব্যক্ত হয়ে চলেছে। সুতরাং মহামানবের কোনো বিচ্ছিন্ন মানসসত্তা সমগ্রসমাজকে বহু পশ্চাতে ফেলে রেখে একক-অগ্রগতির নেশায় বহু দূরে পালিয়ে যেতে পারেনা। বিজ্ঞানীকে তাই তাঁর অবিমিশ্র গবেষণার দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসতেই হয়। নেমে আসতে হয় পবিত্র সাধনার গজদন্ত-মিনার থেকে। দশ বছরের মধ্যেই ১৯৫৫ সালে বসে যায় 'শান্তির জন্য পরমাণু' নামের প্রথম আন্তর্জাতিক জেনেভা-সম্মেলন। "এতে করে বিজ্ঞান যে আন্তর্জাতিক এ-ধারণাটা বেশ ভাল মতন ফুটিয়ে তোলেন আমেরিকার প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিকেরা।"—নিশ্চয় ওঁরা এক ধাপ এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি আবিষ্কার যে তজ্জন্য আন্তর্জাতিক বা সর্বমানবিক হয়ে উঠছে, মানবমানসের প্রতিভূ বিজ্ঞানমানসকে সেই নীতিবোধটুকু দেখাতেই হয়। সে যদি ধর্মনীতি বা ত্যাগনীতি হয় ক্ষতি নাই। কিন্তু যদি তা ভোগ-নীতি বা রাজনীতিও হয়ে থাকে, তাতেই বা কি এসে যায়? মানবসমাজকে এগিয়ে নিয়ে তাঁরা নিশ্চয় ইতিহাস রচনা করে চলবেন। সেই হবে মহান প্রকৃতির সাথে একযোগে মহামানবের মানস-সৃষ্টির ইতিহাস। কিন্তু সমাজের একাংশ সাধনা ও আবিষ্কার করবে, অন্যাংশ সেই সাধনা ও আবিষ্কারের ফলকে রক্ষা করবে,—এ কর্মবিভাগ যখন থাকছেনা, তখন সমাজের অগ্রসরমাণ অংশকে পুরো দায়িত্ব বহন করে নতুন ইতিহাস রচনা করতে হয় বৈকি!

কিন্তু অসত্য অসুন্দর ও দানব-প্রকৃতিকে বিনষ্ট করে সত্য, সুন্দর ও সভ্যতাকে রক্ষা করার দায়িত্ব যে হস্তটির, তার বেইমানি সত্ত্বেও বিগত দুর্ঘটনা এবং আসন্ন দুর্বিপাকের মধ্যেই সত্যকে অনুসন্ধান ও যাচাই করে নেওয়ার খণ্ডিত হস্তটি প্রসারিত হয়ে চলেছে। পার্থিব প্রকৃতি ইউরেনিয়ামে এসে তার যাত্রা শেষ করলেও মানবের হস্ত আরও বহুদূরে এগিয়ে গিয়েছে। কেবল পরিচিত কেন্দ্রক থেকে অন্য একটি পরিচিত কেন্দ্রকে রূপান্তর-সাধন নয়, পরিচিত কেন্দ্রক থেকে অপরিচিত কেন্দ্রক, তথা ইউরেনিয়াম-উত্তর (৯২ নং-ইউরেনিয়ামের পরবর্তী) অভাবিতপূর্ব উপাদানের সৃষ্টিকেও সে-হস্তটি সম্ভব করে তুলেছে। মানুষের হাতে গড়া নতুন উপাদান,—নিশ্চয় তথাকথিত প্রকৃতিকে ছেড়ে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু তার জন্যে তাকে প্রাকৃতিক উপাদানগুলির অন্তঃপ্রবণতাকে চিনে নিতে হয়েছে। ইউরেনিয়ামটিতে এসে কেন প্রকৃতিকে থমকে দাঁড়াতে হল, সে-তত্ত্ব তাকে বুঝে নিতে হয়েছে। বুঝে নেওয়ার সে-সংকেতটিও অবশ্য প্রকৃতিদত্ত সেই তেজস্ক্রিয়তারই

সংকেত। রেডিয়াম, থোরিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি পর্যায়িক ছকের শেষের উপাদানগুলি তেজস্ক্রিয়। তেজ-বিকিরণ করতে করতে ক্রমেই ওরা ক্ষয়ে চলেছে। ছকের শেষদিকে পৌঁছে দেখা যায় ওদের অস্থায়ী অশান্ত অবস্থা ক্রমেই যেন বেড়ে চলেছে। ইউরেনিয়ামে সেই অস্থিরতার চূড়ান্ত। তারপরেও পারস্পরিক বিকর্ষণী প্রোটনের সংখ্যা আরও বেড়ে গেলে ওরা দাঁড়াবে কেমন করে?

কেন্দ্রকে নিউট্রনের সংখ্যা বাড়িয়ে কমিয়ে মানুষ তার নিজের হাতে ইউরেনিয়ামের অন্তত নয়টি আইসোটোপ তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে। ওরা সকলেই তাই অস্থায়ী এবং একটি (২৩৩) ছাড়া সবগুলিরই আয়ু অত্যন্ত কম। কিন্তু প্রকৃতিতেই যে-তিনটি আইসোটোপ মেলে, তারাও স্থায়ী হতে পারেনি। তারাও ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পেতে পেতে রূপান্তরিত হয়ে শেষে সীসায় পরিণত হয়ে যায়। তবে সে প্রক্রিয়া এত ধীরগতিতে চলতে থাকে যে, পৃথিবীর মোট ইউরেনিয়ামের অর্ধেকটা ক্ষয় পেতেই ৪½ শ' কোটি বছর লেগে যাবে। কিন্তু যত ধীরেই তার ক্ষয় ক্রিয়া চলুক না কেন, ঐ ইউরেনিয়াম আর তার নিকটবর্তী পরমাণুগুলি যে অস্থির, তাতেই বুঝতে পারা যায়, কেন ঐ পর্যায়িক ছকের পরমাণু-সংখ্যাটি একটি জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল। অন্তত এই পার্থিব আবহাওয়ায় আর অধিক সংখ্যক প্রোটন-কণাকে একত্রে বেঁধে রাখা সম্ভব হচ্ছেনা। কিন্তু মানুষের আর কামনার বুঝি শেষ নাই। তার অস্তিত্ব-আবির্ভাবের প্রথম থেকেই তাই সে প্রকৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্বলিপ্ত। প্রকৃতি-জয়ের আন্তঃপ্রেরণায় তাই সে ইউরেনিয়াম-উত্তর পরমাণু সৃষ্টি করে প্রকৃতির উপর বিজয়ী হতে চাইল। ১৯৩২ সালে এক ফরাসী বিজ্ঞানী যখন কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তাকে সম্ভব করে তুলেছিলেন, তার দু' বছরের মধ্যেই তাই আর এক ইটালীয় বিজ্ঞানী সে-তত্ত্বের সাহায্যে নিউট্রন উৎপন্ন করে তার দ্বারা ঐ ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রক রূপান্তরিত করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। আন্দাজ করেছিলেন যে ঐ অতিভার কেন্দ্রকে একটি নিউট্রন ছুঁড়ে মারলে, কেন্দ্রকের সাম্যটি পালটে যাবে। সাম্যে পৌঁছবার জন্যে তখন কেন্দ্রকের একটি নিউট্রন থেকে একটি বিটা-কণিকা ছিটকে পালাবে, —আগে আগে যেমন ঘটেছে তেমনি। সাম্য ফিরে আসবে, কিন্তু বিটা-বিচ্ছিন্ন হওয়ায় নিউট্রনটি হয়ে উঠবে প্রোটন। কেন্দ্রকের মধ্যে তখন একটি নতুন প্রোটনের আবির্ভাব ঘটায় তার পারমাণবিক সংখ্যাটিও ৯২ থেকে ৯৩-তে উঠে যাবে, অভূতপূর্ব এক পার্থিব পরমাণুর সৃষ্টি হবে। কিন্তু অত সহজে প্রকৃতির ওপর টেক্কা মারা চললনা। ঘটনা ঘটে গেল অন্যভাবে। ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রক নিউট্রনের ধাক্কায় ভেঙে গিয়ে খান খান হয়ে গেল। কিন্তু যাদের পাওয়া গেল, তাদের সনাক্ত করতে প্রায় বছর পাঁচেক লেগে গেল। '৩৯ সাল নাগাৎ জানা গেল যে, উপজাত বস্তুগুলি মোটেই ৯২-উত্তর কোনো উপাদান নয়। ওরা সব আমাদের অতি পরিচিত বন্ধুরাই—ক্রিপ্টন, বেরিয়াম প্রভৃতি

মাঝারি ভরের উপাদান। অর্থাৎ যাদের ভার ইউরেনিয়ামের অর্ধেক। এর অর্থ, ইউরেনিয়াম রূপান্তরিত না হয়ে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। কিন্তু ওখান থেকে কিছু বাড়তি মুক্ত নিউট্রন পাওয়া গেল (পৃ. ৩৭৭)। প্রায় একই সময়ে জোলিও-দম্পতী, ফের্মি, বোর, জেল্‌দভিচ্‌ এবং খারিতন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক তার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে বলেছিলেন যে ঐ মুক্ত নিউট্রনগুলিই আবার ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রকে ধাক্কা মেরে ক্রমে ক্রমে পরম্পর-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এক অকল্পনীয় পরিমাণ শক্তিকে জাগিয়ে তুলবে।

শক্তি জেগে উঠবে বিভাজন-প্রক্রিয়া মারফতে। কিন্তু কি করে এটা সম্ভব যে, একটি মাত্র নিউট্রন তার ভরের অন্তত ১৩৫ গুণ ভরবিশিষ্ট একটি পিণ্ডকে ভেঙে খান্ খান্ করে দেয়? এরকম ক্ষেত্রে বড় জোর কেন্দ্রকটি না হয় একটু নড়ে উঠতে পারে, কিংবা, একটি নিক্ষিপ্ত মার্বেল-গুলি যেমন একটি বড় কাচের বলকে ভেঙে টুকরো করে দেয়, সে রকমও হতে পারে। কিন্তু তাহলে এক্ষেত্রে কেন্দ্রকটি বার বার প্রায় মাঝারি ভরের দু'টি কেন্দ্রকে ভগ্ন হয়ে যায় কেন? কিন্তু সত্যই কি ওরা দু'টি টুকরোতে ভেঙে যায়? তা যদি হয়, তাহলে নিক্ষিপ্ত নিউট্রনের বেগবৃদ্ধিই তো এ ব্যাপারে বেশি উপযোগী হত। অথচ বেগবৃদ্ধি তো দূরের কথা, নিক্ষিপ্ত নিউট্রন ধীরগতি না হলে বিভাজন ঘটবেইনা। এ থেকেই বুঝতে পারা যায়, বিভাজন-ব্যাপারটি সম্পূর্ণ এক নূতন ধরনের প্রক্রিয়া। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, নিউট্রন-কণিকাটি কেন্দ্রকের কাছ বরাবর এসে পৌছলে কেন্দ্রকের যোটন-তেজ কেমন যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে। তখন সেই তেজই যেন নিউট্রনটিকে কেন্দ্রকের মধ্যে টেনে আনে। সুতরাং নিউট্রনের গতিবেগ প্রবল হলে ঐ রকম টেনে আনা আর সম্ভব হতনা (দ্র., পৃ. ৩১২)। টেনে আনা হয় অবশ্য অত্যল্প সময়েই, প্রায় $১০^{-২১}$ সেকেণ্ডের মধ্যে। সংখ্যায় লিখলে সেটি হয় ১ সেকেণ্ডের ১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০-ভাগের ১ ভাগ মাত্র। তারপর বিভাজন ঘটতে অবশ্য একটু সময় লাগে—প্রায় $১০^{-১২}$ সেকেণ্ড্। কিন্তু সেটিও আমাদের ধারণার বাইরে। কারণ, তাহলে ধরতে হয় যে, প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় $১০^{১২}$ অর্থাৎ ১০০০০০০০০০০০০-টি করে বিভাজন ঘটে যায়। অর্থাৎ হাজার, লক্ষ বা দু'চার কোটিও নয়; একেবারে এক লক্ষ কোটি পরমাণু এক সেকেণ্ডের মধ্যেই, অথচ পর পর ভেঙে যায়। কিন্তু আমাদের জানা আছে (পৃ. ৩১৬-১৯) কেন্দ্রকীয় ঘূর্ণি-শক্তির বলে কেবল যে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন পরস্পরকে আকর্ষণ করে কেবল তাই না, দু'টি প্রোটন বা দু'টি নিউট্রনও পরস্পরকে টেনে রাখে এবং তারই ফলে কেন্দ্রকীয় সকল কণিকা একটি প্রচণ্ড টানে একত্রে বাঁধা পড়ে থাকে। কিন্তু ভারি কেন্দ্রকের ক্ষেত্রে প্রোটনগুলি দ্বৈতশক্তি; বিদ্যুৎশক্তিও সেখানে কাজ করার সুযোগ পায়। তবে কেন্দ্রকীয় ঘূর্ণিশক্তির সঙ্গে সে পেরে উঠেনা বলে যেন চুপ করে থাকে। কিন্তু যখনই নিউক্লিয়নগুলি বহিরাগত নিউট্রনটিকে অন্দরমহলে বরণ করে আনল,

তখনই তাকে বাঁধবার প্রচেষ্টায় ওদের নিজেদের বাঁধন-শক্তি থেকে সামান্ত একটু করে তেজ ব্যয় করতে হল। কিন্তু বাস্। ওইতেই বিকর্ষণী বিদ্যুৎশক্তিটি সুযোগ পেয়ে গেল। সব প্রোটনই তখন সবগুলিকে ঠেলা মারতে লাগল। তার ফলে এক ফোঁটা জলের মধ্যে আর সামান্য একটু জল-পরিমাণ এসে পড়লে যেমন ঘটে থাকে, এখানেও তাই ঘটল। দু'দিকে টান পড়ল। একটি ফোলান বেলুনের মাঝখানটিতে চেপে ধরলে যেমন হয়, যেন সেইভাবেই মধ্যবর্তী স্থলে একটি সংকোচন দেখা দিল। তারপর সেকেণ্ডে প্রায় ৬০০০ মাইল বেগে দু'দিকের দু'টি অংশ পরস্পর থেকে ছিটকে চলে গেল।

কিন্তু কেন্দ্রকশক্তি যে-নিউট্রনটিকে দখল করে নেয়, তার অবস্থাটি ঠিক তার পূর্বেকার মত আর থাকেনা। পুরোপুরি ফোলান একটি রাবার-বেলুন থেকে কিছুটা বাতাস বেরিয়ে গেলে সে যেমন একটু নেতিয়ে পড়ে, নিউট্রনটিও যেন তখন সেইভাবে একটু চুপসে যায়। সেটি তখন কেন্দ্রকের মধ্যে এসে অন্যান্য নিউট্রনের সঙ্গে এমনভাবে মিশে যায় যে তাকে আর পৃথকভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হয়না। ওকে কেন্দ্রক থেকে আবার টেনে এনে মাপ জোখ করে ওর কতটা ওজন বা ভর কমে গেল, তা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। কারণ, হাইড্রোজেন-পরমাণু থেকে একটি ইলেক্ট্রন খসিয়ে আনতে যেখানে ১৩½ ই. ভো. তেজ খরচা করতে হয়, সেখানে কেন্দ্রক থেকে কোনো নিউক্লিয়ন-কণাকে খসিয়ে আনতে হলে ৮০ লক্ষ ই. ভো.-এরও বেশি তেজ লাগে। কিন্তু তার চাইতেও অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, নিউট্রন-কণিকাটিকে বাইরে টেনে আনা মাত্রেই দেখা যায় যে সেটি আবার ঠিক তার পূর্বের মতই হয়ে যায়। নিশ্চয়ই এক বিস্ময়েরই বিষয়। মুক্ত নিউট্রনের ভর এক রকম, কিন্তু কেন্দ্রক কর্তৃক গ্রেপ্তার হওয়ার পর তার ভর আর এক রকম, অর্থাৎ কিছুটা কম। আবার যখন সে বিভক্ত কোনো খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে, তখন তার ভরটি আরও কমে গেল। কিন্তু যেই তাকে আবার কেন্দ্রকমুক্ত করা হল, তখন তার ভর বেড়ে গিয়ে পূর্বের মতই হয়ে গেল। শুধু ঐ একটি নিউট্রন নয়, মূল কেন্দ্রকটি বিভক্ত হওয়ার সময় তার প্রত্যেকটি নিউক্লিয়নই একইভাবে একটু করে চুপসে যায়। তাতে মোট হিসাব ধরলে বেশ কিছু পরিমাণ ভর কমে যাওয়ার কথা। তাহলে কি সেই ভরটি ধ্বংস অর্থাৎ বিশ্ব থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়?

পূর্বেই আমরা কয়েকবার দেখেছি যে, ভর তেজে পরিণত হচ্ছে, এবং একটি নির্দিষ্ট সূত্র ($E=mc^2$) ধরেই সে-রূপান্তর ঘটে। এখানেও কি তাহলে ঐ ভরটির তেজে রূপান্তর ঘটছে? ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রকের বিভাজন-প্রক্রিয়াতে যখন বিপুল পরিমাণ তেজ ছাড়া পেয়ে যায় তখন সেই তেজটিই যে তাহলে ঐ ভর থেকে বেরিয়ে আসে তাতে আর সন্দেহ থাকেনা। প্রত্যেকটি নিউক্লিয়ন থেকে একটু একটু করে মোট হ্রাসপ্রাপ্ত ভর-পরিমাণ নানাভাবে প্রকাশিত তেজ-পরিমাণে পরিণত হয়ে যায়। প্রথমত, খণ্ড কেন্দ্রকগুলি

প্রচণ্ড তেজে দু'দিকে ছুটে যায়। দ্বিতীয়ত, যে নিউট্রনগুলি ওখান থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তাদের গতিবেগটিও নেহাৎ মন্দ হয়না। তৃতীয়ত, বোমা-বিস্ফোরণের সময় যে-আলোক ঝর্ণা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে, গামা-রশ্মি হিসাবে প্রকাশিত সেই তেজপরিমাণও অতি বিপুল। চতুর্থত, আলামোগর্দো মরুপ্রান্তরে প্রথম বোমাপতন-জনিত গহ্বর-মুখে দীর্ঘকাল যাবৎ যে সবুজ আভাটি জ্বল্ জ্বল্ করছিল, কিংবা হিরোশিমা-নাগাসাকি ঘটনার দীর্ঘকাল পরেও সারা অঞ্চল জুড়ে যে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ চলছিল, তার তেজ-পরিমাণও যেন অপরিমেয়। কণিকাগুলি থেকে ভরহ্রাস প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাওয়ার পর অবিচ্ছিন্ন ধারায় সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জাড্যের প্রভাবেই তেজ-বিকিরণ চলতে থাকে। বিকিরণ-তেজের (radiation energy) মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশ হল গামা-রশ্মি, আর এক-চতুর্থাংশ ইলেক্‌ট্রনেরই গতি-তেজ এবং মোট তেজের প্রায় অর্ধেকটিই হল নিউট্রনের তেজ। এ সমস্ত তেজেরই উৎস ঐ নিউক্লিয়ন-কণিকাগুলির হ্রাসপ্রাপ্ত ভর। একদিকে হ্রাসপ্রাপ্ত বিপুল ভর-পরিমাণ, আর অন্যদিকে যুগপৎ আবির্ভূত ঐ তেজ-পরিমাণ। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সত্যদ্রষ্টা ঋষির কম্বুকণ্ঠে উচ্চারিত মহামন্ত্র বা মহাতত্ত্বটি : $E = mc^2$।

অপরপক্ষে, তেজ-পরিমাণও যে ভর-পরিমাণে রূপান্তরিত হয়ে যায়, এও আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি। একটি প্রচণ্ড বেগবান ইলেক্‌ট্রন- বা পজিট্রন-কণিকা থেকে যে তেজরূপী ফোটনের আবির্ভাব ঘটে থাকে, সেই ফোটন-তেজও তার প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে ইলেক্‌ট্রন-পজিট্রন রূপ এক জোড়া ভরমুখী কণিকার জন্ম দেয় (পৃ. ৩৩৮)। তারপর এক থেকে দুই, দুই থেকে চার, চার থেকে আট—এভাবে ভরধর্মী কণিকার সংখ্যা বেড়ে চলতে থাকে। এভাবেই দীর্ঘকাল যাবৎ একই প্রক্রিয়া মারফতে ভর আর তেজের পারস্পরিক রূপান্তর চলতে থাকে। সুতরাং ইউরেনিয়াম-বিভাজনের ক্ষেত্রেও যখন দেখা যায় মূল কেন্দ্রকটি বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর সেখান থেকে ছিটকে-যাওয়া মুক্ত নিউট্রন কয়েকটিরও ভরবৃদ্ধি ঘটছে, তখন কিভাবে ঐ ভরবৃদ্ধি সম্ভব হল, তা বুঝতে বিলম্ব হয়না। এখানেও, ঐ কেন্দ্রক-বহির্ভূত বিশ্বজাগতিক তেজ-ক্ষেত্র থেকেই ভর-সংহতি ঘটে উঠে। তাহলে ইউরেনিয়াম-বিভাজনের এই একই প্রক্রিয়ার মধ্যেও দেখা যাচ্ছে ভর থেকে তেজ, আর তেজ থেকে ভরের রূপান্তর চলছে। একের আবির্ভাবে অন্যের তিরোভাব, বা একের তিরোভাবে অন্যের আবির্ভাব,—এই জন্ম-মৃত্যুর খেলা এখানেও চলছে। কিন্তু পরমাশ্চর্যের বিষয়, এখানে উদ্ভব আর অন্তর্ধান ঘটছে ভর আর তেজের, পার্থিব সকল বস্তুর মূল উপাদান রূপ ভর বা তেজ এই গুণদ্বয়ের। তাহলে শেষ বিশ্লেষণে কি এই গুণ দু'টিই হল একমাত্র মূল পার্থিব পদার্থ?

কিন্তু আগেই জেনেছি বিশ্বের মোট ভরপরিমাণ যেমন সুনির্দিষ্ট, তার তেজপরিমাণও তেমনি অপরিবর্তনীয়। বস্তুত, ভর-তেজ 'সমতুলতা'র তত্ত্বই (Law of Equivalence)

সর্বব্যাপ্ত। তবে এক প্রকারের ভর যে অন্য প্রকারের ভরে নিয়তই রূপান্তরিত হয়ে চলে, তার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তেমনি এক প্রকারের তেজও অন্য প্রকারের তেজে রূপান্তরিত হয়ে যায়,—গতিতেজ থেকে তাপতেজ, বা তাপতেজ থেকে যান্ত্রিক-তেজ, বা হয়ত যান্ত্রিক-তেজ থেকে বিদ্যুৎ-তেজের উৎপত্তি ঘটে। তাহলে এ কী করে সম্ভব যে, ভর বা তেজের জন্ম ও মৃত্যু ঘটে চলেছে? না কি, তাহলে ওদের কারও জন্ম বা মৃত্যু ঘটছেনা, কেবল আমাদের মনে হচ্ছে যে ওদের আবির্ভাব আর তিরোভাব ঘটে চলেছে?

১৯০০ খ্রী.-এ রুশ পদার্থবিদ্ লেবেদেভ (Lebedev) আবিষ্কার করেন যে, আলোরও চাপ আছে। বিভিন্ন বস্তুর ওপর সেই চাপের প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। রাত জাগার পর ভোরের দিকে যখন প্রগাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হওয়া যায়, তখন পুব দিকের জানলা হঠাৎ খুলে গিয়ে চোখের ওপর সূর্যালোক এসে পৌঁছলেও এর সম্যক উপলব্ধি ঘটে। আবার বিজ্ঞানীরা এও দেখেছেন যে, গতিবান হলে প্রস্তর খণ্ড বা যেকোনো বস্তুর ওজন তার নিশ্চল অবস্থার ওজনের চাইতে বেড়ে যায়; কিংবা কোনো ধাতুখণ্ডকে প্রচণ্ড উত্তাপে গালিয়ে ফেললেও তার শীতলাবস্থার ওজনের চাইতে উত্তপ্তাবস্থার ওজনটি বেড়ে গিয়ে থাকে। এসব ঘটনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, যত সামান্যই হক না কেন, ঐ আলো, বা ঐ গতি, বা ঐ তাপতেজেরও কিছু ওজন (মাধ্যাকর্ষণ জনিত) আছে। তাহলে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়, যাকে আমরা তেজ বলে জানি, তারই তেজরূপের অন্তরালে একটি ভাব বা ভরও তার নিজ স্বরূপকে ঢেকে রেখেছে। অপরপক্ষে, ভর-কপাত্মক আয়নাদি কণিকার মধ্যেও যে তেজপরিমাণ লুকিয়ে থাকে, তাও আমরা দেখেছি। শুধু আয়ন কেন? যেকোনো পরমাণুর মধ্যেই কী থাকে? তার মধ্যে ইলেক্ট্রন আর প্রোটনরূপী দু'রকমের তেজকণিকা থাকতে বাধ্য। অমন যে নিরপেক্ষ নিউট্রন, যাকে দিয়ে বিজ্ঞানীরা বিশ্বজয় করতে এগিয়েছেন, তার নিরপেক্ষতাও কি কথার কথা মাত্র নয়? তার মধ্যেও তো দেখেছি একটি ধনাত্মক তেজের প্রোটন আর একটি ঋণাত্মক তেজের মেসন বা ইলেক্ট্রনের সম্মেলন। বস্তুত, যখন একটি ধনাত্মক তেজাধান ও একটি ঋণাত্মক তেজাধান একত্র যুক্ত হয়, তখনি তার তেজপরিমাণের শূন্যপ্রতীতি ঘটে। কেবলমাত্র তখনই তাকে আমরা বিদ্যুৎতেজ-নিরপেক্ষ বিদ্যুৎ-ধর্মহীন কণিকা মনে করে নিই। আসলে কিন্তু ঐ জোটের মধ্যে তড়িৎধর্ম বা তেজসত্তাটি ধ্বংস হয়ে যায়নি। এবং যায়নি বলেই নিরপেক্ষ নিউট্রন বা নিরপেক্ষ পরমাণু, উভয় ক্ষেত্রেই ওদের আবার দু'-রকমের তড়িৎ-কণিকায় পৃথক করা যায়। সুতরাং পৃথিবীর পারমাণবিক কোনো বস্তু থেকেই তার বিদ্যুৎ-সত্তা বা ভর-সত্তা কোনোটিকেই বিলুপ্ত বা ধ্বংস করে ফেলা সম্ভব নয়। বস্তুত, পরমাণু বা নিউট্রনের মধ্যে ঐ বিপরীতধর্মী বিদ্যুৎ-কণিকাগুলি পরস্পরকে চির-সক্রিয় রাখে বলেই অন্য কোনও বহিঃসত্তার পক্ষে তা হয়ে দাঁড়ায় বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ বা

তড়িৎ-নিষ্ক্রিয়। ওদের পারস্পরিক ক্রিয়াটিই অন্যের পক্ষে নিষ্ক্রিয়তার নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। তাই এখানে অন্তর্দ্বন্দ্বটিই বহিঃসাম্যের মূল কারণ হয়ে উঠে। ওখানকার সাম্য বা **শান্তি অন্যের কাছে প্রতীয়মান শান্তি মাত্র। আসলে কিন্তু তা দ্বন্দ্বাত্মক।** পরমাণুবিধৃত বিশ্বব্যবস্থাও তাই অপ্রতিরোধনীয় বা অনিবার্যভাবেই দ্বন্দ্বাত্মক। আর ঐ **দ্বন্দ্বমূলক প্রধান শক্তি বা সত্তাদ্বয়ের মধ্যে সাম্যরক্ষার নামই নিরপেক্ষ-ভাব বা সাম্য বা শান্ত অবস্থা। অর্থাৎ, শক্তি-সমতা ও শক্তি-দ্বন্দ্বকে যুগপৎ সমুত্থত রাখার নামই শান্তি বা শান্তিমূলক প্রগতি।** নিউট্রন বা পরমাণুও পরিবর্তনশীল বলে বিশ্বব্যবস্থাও পরিবর্তনশীল বা গতিমূলক। তারই স্বাভাবিক ফল বশত সমাজ-ব্যবস্থাও প্রগতিমূলক বলে এবং সেই গতি বা প্রগতি দ্বন্দ্বনির্ভর বলেই চির শান্তিও তাই অসম্ভব কল্পনা মাত্র (দ্র., পৃ. ৩১২)। তাই নিউট্রনের (তড়িৎ-) নিরপেক্ষতা যেমন আসলে কোনো না কোনো তড়িৎপক্ষ সৃষ্টির সাহায্যকারী ভূমিকা মাত্র, পক্ষপাতিত্বের নিপুণতম ছলনা শুধু,—সাম্যহীন বা দ্বন্দ্বহীন শান্তির কথাও তেমনি আসলে মহা-অসাম্য বা মহা-অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এক প্রচণ্ড ছলনা মাত্র। এখানে শান্তি বা সাম্যের অর্থ, দু'টি বস্তু বা দু'টি ঘটনার মধ্যে কোনো আপোসমূলক শান্তি, বা বহিঃসমতা, বা অবয়বগত সাম্য নয়। এর অর্থ, প্রকৃতি-প্রক্রিয়ার সঙ্গে দু'টি বস্তু বা দু'টি বিষয়ের মধ্যবর্তী উদ্ভূত প্রক্রিয়ার সাম্য। প্রাকৃতিক চিরদ্বন্দ্বকে অব্যাহত রাখার জন্য দু'টি ভিন্ন শক্তির মধ্যে স্থান-কালোচিত অবস্থার সঙ্গে সাম্য- বা সামঞ্জস্য-অনুযায়ী সংঘর্ষকে জাগ্রৎ রেখে তাদের প্রগতিকে অব্যাহত করার নামই সাম্য। বা এক কথায় বলতে হলে, **বিশ্বপ্রকৃতি-ক্রিয়ার সঙ্গে মানবপ্রকৃতি-প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্য বিধানই সাম্য।**

বস্তুতপক্ষে, ঐ সাম্য এবং ঐ দ্বন্দ্বই ভর-তেজের দ্বন্দ্বরূপে নিউট্রন বা পরমাণু থেকে আরম্ভ করে পার্থিব সকল সত্তার মধ্যেই নিজেদের জানান দিচ্ছে। বা বলা যায়, ঐ **ভর-তেজের মিলন-দ্বন্দ্ব বা দ্বন্দ্ব-মিলনই সর্বপ্রকার পার্থিব সত্তারূপে ফুটে উঠছে। ঐ সত্তারই নাম পদার্থ।** নচেৎ, পার্থিব পদার্থ বলে পৃথক কিছু আর কোথাও তো খুঁজে পাওয়া গেলনা। ভর বা তেজ দু'টি গুণ হতে পারে। কিন্তু কোনো বস্তু বা কোনো পদার্থই ভর বা তেজ বিহীন হতে পারেনা। বা, ঐ ভর-তেজ ব্যতিরিক্ত কোনো পৃথক পদার্থও কোথাও নাই। "উপযুক্ত পরিস্থিতিতে ভরের মধ্যে যেমন তার 'তেজ' পোটেনশিয়াল প্রকাশ পায়, ঠিক তেমনি যোগ্য অবস্থায় তেজের মধ্যেও প্রকাশ পাবে তার 'ভর' পোটেনশিয়াল।" অর্থাৎ ভর বা তেজ পরস্পর থেকে অবিচ্ছেদ্য। ওরা কেউই বিদেহী বা অপার্থিব বা লৌকিক কোনো পদার্থ, বা পদার্থহীন কোনো গুণ নয়। **চিরন্তন গতির মাধ্যমেই ভর আর তেজ নিজেদের চিরপ্রকাশমান করে**

রেখেছে। গতিবান সেই ভরতেজাত্মক প্রক্রিয়ার নামই পদার্থ বা পদার্থ-প্রক্রিয়া। পদার্থের চিরন্তন ধর্মই ঐ গতি, ভর আর তেজ। দেশ-কালও (পরে দ্রষ্টব্য—ভরতেজের দ্বন্দ্বমিলন) তার চিরন্তন ধর্ম। সুতরাং যেখানে যে-কালে যা কিছু আছে, তা সবই চির-গতিময় ভর ও তেজের দ্বন্দ্বমূলক সম্মিলিত সত্তারূপ পদার্থ ছাড়া অন্য কিছু নয়। কেবল ঐ সূক্ষ্ম কণিকাগুলি নয়, সংখ্যাতীত গ্রহনক্ষত্রময় বিশ্ব, তার ধূলিমেঘময় বহুব্যাপ্ত নীহারিকা, সূর্যাদিগ্রহ আর চন্দ্র-পৃথিবী প্রভৃতি উপগ্রহের মধ্যে যা কিছু অবস্থান করছে তা সব। এমন কি, ঐ তেজ আর তার বিকিরণ, সকল প্রকার রূপ-পরিবর্তন ও দেহান্তরকরণের বিদ্যুচ্চৌম্বক এবং কেন্দ্রকীয় ক্ষেত্র, এক কথায় **যেখানে যা কিছু বাস্তবভাবে অবস্থান করছে, সবই ঐ গতিময় ভর-তেজাত্মক পদার্থ-প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। প্রক্রিয়াবদ্ধ এবং সত্তাবান সমস্ত কিছুই পদার্থতত্ত্ব। এ তত্ত্বের আশ্রয় ঐ ভর আর তেজ, তাদের দ্বন্দ্বাত্মক মিলন, আর তাদের গতি।**

সুতরাং ভর বা তেজ অজরামর, ওদের জন্ম মৃত্যু নাই। ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়ন থেকে যে ভরটি বিলুপ্ত হয়ে যায় বা তেজের মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে যায় বলে মনে হয়, তার কোনোটি তাহলে সত্য নয়। ভরটি কণিকা থেকে সরে যায় অবশ্যই। কিন্তু তা বিলুপ্ত না হয়ে তেজের মধ্যেই ব্যাপ্ত হয়ে যায়। তখন যেন তার এক অব্যক্ত রূপ। সুতরাং $E=mc^2$-অনুযায়ী ভরটিকেই যে কেবল তেজে রূপান্তরিত করা যায়, বা ভরের মধ্যেই তেজটি লুকিয়ে থাকে, তা শুধু নয়, তেজের মধ্যেও ভরটি লুকিয়ে থাকে। অর্থাৎ বলতে পারি তেজেরও ভর আছে। সুতরাং আসলে বিশ্বের মোট ভর-পরিমাণ কমে গেলনা। কেবল নিউক্লিয়নের অধীনে যেটি ছিল, সেটি তার অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বা সার্বজনীন হয়ে গেল। পক্ষান্তরে, নতুন কিছু তেজও যে জন্মলাভ করে বিশ্বের মোট তেজপরিমাণকে বাড়িয়ে তুলল তাও নয়। বিস্ফোরণের পর যাকে স্বপ্রকাশ দেখেছি, বিস্ফোরণের পূর্বেও সে ছিল। তবে ইউরেনিয়াম-নিউক্লিয়নের অধীন হয়ে। সেই অধীনতার বন্ধন ছিন্ন হওয়ায় এখন সে পরিণত হল 'স্বয়ংসার্থক বস্তু (thing in itself)' থেকে 'অয়ংসার্থক বস্তুতে (thing for us)'। অর্থাৎ আপনাতেই যা সার্থক ছিল, তা এখন জগতের জন্য মুক্তিলাভ করেই সার্থক হল। সুতরাং **ভর যে তেজে রূপান্তরিত হল, এর অর্থ এই নয় যে, ভরের মৃত্যু ঘটল বা তেজ জন্ম লাভ করল। এর অর্থ এই যে, পদার্থ তার ভরপ্রধান গুণ বা অবস্থা থেকে তেজ প্রধান গুণ বা অবস্থায় প্রতীয়মান হল, ভর-গুণ বা ভর-অবস্থাটি আপাতদৃষ্টিতে অদৃশ্য বা দৃষ্টিবহির্ভূত হয়ে গেল।** এ ক্ষেত্রে **'জন্ম-মৃত্যু,' 'পরিবর্তন'** বা **'রূপান্তর'** কথাগুলির পরিবর্তে **'স্থানান্তর' 'অবস্থান্তর'** বা **'প্রক্রিয়ান্তর'**

কথাগুলিই বোধ করি অধিকতর উপযোগী হতে পারে। বিশেষত ঐ **'প্রক্রিয়ান্তর'** কথাটি। **ভরকে বা তেজকে তাহলে যেমন পদার্থেরই গুণ বলতে পারি, তেমনি বলতে পারি ভর তেজেরই এক অবস্থা, এবং তেজও ভরের এক অবস্থা।** আর এও বলা চলে যে, **ভর ও তেজের অবিচ্ছেদ্য সমন্বয়ের নামই পদার্থ।** তবে ওরা একে অন্যেরই এক অবস্থা বলে কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারেনা। এবং ভর বা তেজ যেখানেই বিদ্যমান, পদার্থও সেখানে সত্তাবান্। **পদার্থ তাই অবিভাজ্য। অর্থাৎ ভর থেকে তেজকে বা তেজ থেকে ভরকে পৃথক করা যায়না। ওরা নিজেরা পৃথকভাবে যত ক্ষুদ্রপরিমাণে বিভক্ত হক না কেন, ওদের দু'য়ের পারস্পরিক বিভাজ্যতা বা একটিকে ছেড়ে অন্যটির পৃথকভাবে অস্তিত্বযুক্ত হওয়া অসম্ভব।** তবে মানুষের দৃষ্টিনৈপুণ্য অত্যন্ত পরিমিত ও সীমিত (সীমাবদ্ধ)। তাই বিদ্যুৎ, আলো প্রভৃতি পদার্থে তেজের প্রকাশটি তার চোখে সম্যক্‌রূপে ধরা পড়লেও তাদের ভরটি যেন সেখানে চঞ্চল হয়ে ব্যাপ্ত হতে চায় বলে তাকে ইন্দ্রিয়ানুভবের মধ্যে ধরা যায়না। আবার কঠিন তরল গ্যাসীয় প্রভৃতি পদার্থের মধ্যে তেমনি ভরেব অস্তিত্বটি সম্যকরূপে ধরা পড়লেও তাদের তেজটি কিন্তু সেখানে যেন নিথর হয়ে ভরমুখী থাকে বলে তাকে ঠিক অপরিণত ইন্দ্রিয় মারফতে চিনে নেওয়া যায়না। এজন্য পূর্বোক্ত ঐ **চলতামুখী বা সচলভরযুক্ত সচলতেজকে আমরা সাধারণভাবে তেজ বলেই গ্রহণ করে থাকি।** আর ঐ পরবর্তী **নিশ্চলতামুখী বা নিশ্চলতেজযুক্ত নিশ্চলভরকে আমরা ভর, বা আরও স্থূল-ভাবে পদার্থ বলেই মনে করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তেজও পদার্থ, তারও ভর আছে। তার গড়নটিও তথাকথিত পদার্থের মত 'টুকরো টুকরো'। নিত্য নবায়মান পথে ভরের গতিপরিণতির নামই তেজ।**

পদার্থ বা বিশ্বপদার্থের অর্থই তাহলে দাঁড়ায় ভর-তেজ। সারা বিশ্বময় ওদের গতিবিধি। **কিন্তু ওরাই কোথাও সংহত হয়ে এলো কখন প্রাথমিক-কণিকা রূপে।** ভরমুখী হল পদাৰ্থ। তারপর সে-পদার্থ পরমাণুর মধ্যে ভরপ্রধান হয়েই জানান দিলে। সেই পরমাণুই হয়ে উঠল এ পৃথিবী-সৌধের ভিত্তিপ্রস্তর। ওরই পরিণামটি যেন তাই কতকটা আমাদের এই পৃথিবীর পরিণামও। সেই পরিণাম-সাধনের দায়িত্বকে মানুষ আজ ক্রমে ক্রমে প্রকৃতির হাত থেকে নিজের হাতে টেনে আনছে। তাই শিক্ষানবীশির প্রথম পর্বে কত ভাঙা-গড়া, কত ভুলচুক। কিন্তু আসলে সে ভুল জীবনেরই ভুল। পদাথ বা ভরতেজের অপরূপ পরিণতি সেই তার জীবন-প্রক্রিয়ায়, অর্থাৎ তার দেহপদার্থের সঙ্গে তার স্নায়ু বা মস্তিষ্কপদার্থের এক অভিনব সংযোগ-সাধনে। একটি জীবকে তাই

ভরপ্রধান, না তেজপ্রধান বস্তুসংঘ হিসেবে দেখতে হবে, সে সম্বন্ধে ধাঁধা লাগে। একদিকে তার দেহ, অন্যদিকে তার চেতনা—বস্তুচেতনা, আত্মচেতনা ও সমাজচেতনা। একদিকে যেন যন্ত্র-প্রক্রিয়া, সেখানে ভরের প্রাধান্য। অন্যদিকে যন্ত্রী-প্রক্রিয়া, সেখানে তেজপ্রাধান্য। আবার দেহভিত্তিক চেতনা, আর চেতনানুরূপ দেহেরও ক্রমবিবর্তন চলছে, এবং সেখানেও কত ভাঙা-গড়া কত ভুলচুক। সুতরাং মানুষের চিন্তা-ভাবনাতেও তাই ভুল-ভ্রান্তি থাকতে বাধ্য। কিন্তু সত্যসন্ধান বা পারমাণবিক আবিষ্কারের মধ্যে সে ভুল নয়। সে ভুল সেই আবিষ্কৃত সত্য দিয়ে বৃহত্তর বা মহত্তর জীবনের ধ্বংসসাধনের মধ্যে। তাই সে ভুলটি বৈজ্ঞানিক নয়, রাজনৈতিক। কিন্তু সত্যসন্ধানী বিজ্ঞানী কি কেবল ভরপ্রধান পরমাণুর মধ্যেই সত্যকে সন্ধান করবেন, আর সেই কারণেই চেতনাপ্রধান জীবন আর সমাজের মধ্যে যে সত্য লুণ্ঠিত হতে চলেছে, তার দিকে ফিরে তাকাবারও সময় পাবেননা? সত্য কি কেবল নিশ্চলভরের মধ্যেই নিহিত, চলমানতেজের মধ্যে প্রতিপ্রকাশিত নয়, খণ্ডতাই তার স্বরূপ?

কিন্তু তার ফল হয়েছে কি! ঐ খণ্ডসত্যের পথ ধরে বিজ্ঞানীসমাজের একাংশ ১৯৪৫-এর আগস্ট ঘটনার পরেও আরও বহুদূরে এগিয়ে এসেছেন। তারপর এক দেশ এগিয়ে গেলে প্রতিপক্ষ অন্য দেশকেও অনিবার্যভাবেই এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হয়। এভাবে বিষাক্ত-চক্র (vicious circle) গড়ে উঠে এবং তারই পরিধি-পরিক্রমা ব্যতিরেকে অন্যপথ থাকেনা। তার ফলে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ আর বিজ্ঞানীদের হাতে নেই। অথচ যাঁরা তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভান করছেন, তাঁদের ফাঁদের মধ্যেই বিজ্ঞানী আজ যেন স্বেচ্ছাবন্দী। বস্তুতপক্ষে, যে-বিজ্ঞানী আজ দেশকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেবার জন্যে অনন্যচিত্ত ও বিনিদ্রচিন্ত,—আত্মপ্রতারিত সেই বিজ্ঞানীই আজ দেশকে তথা মানবজাতিকে অবনতির অন্ধ-গহ্বরে নিক্ষেপকারী জীবনলুণ্ঠক মহাদানবের হস্তে যেন এক আত্মসমর্পিত মহাস্ত্রে পরিণত। কিন্তু এত সত্ত্বেও ভরসা পাওয়া যায়, যখন শোনা যায়, বিজ্ঞানীসমাজের যে অংশটি আজ অচিন্তিতপূর্ব মহাসম্পদ সৃষ্টি করে চলেছেন, কার জন্য তা রচনা করছেন—সে-সম্বন্ধে তাঁর প্রশ্ন জেগেছে জোলিও-কুরির মতই, 'লোভ হয়েছিল, আমার গবেষণাগারটিকে নিয়েই আমি থাকি, শেষ পর্যন্ত নিজেকে শুধালাম, কে কাজে লাগাবে আমার আবিষ্কার?'

কিন্তু যে সম্পদকে তাঁরা আজ সমুচ্চ করে তুলেছেন, 'তুলনা তার নাই'। কেন্দ্রক-প্রতিক্রিয়া-ঘটকযন্ত্রের (nuclear reactor) মধ্যে নিউট্রন-কণিকার উৎপত্তি ঘটল। তার গতিবেগ মন্দীভূত হল। তারপর সেই কণিকাটি একটি ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রক বিধ্বস্ত করে আরও দ্রুতগতির কিছু নিউট্রন সৃষ্টি করল। তাদেরও গতিবেগ মন্দীভূত হল। তারাও প্রত্যেকে আবার বিভিন্ন কেন্দ্রক বিধ্বস্ত করে পরস্পর-প্রতিক্রিয়া

মারফতে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিল। আর তৎক্ষণাৎ নতুন কেন্দ্রকের নতুন সন্নিবেশ বশত বিপুল পরিমাণ যোটন-তেজ ছাড়া পেয়ে গেল। সেই তেজ নিঃশেষ হয়ে যেতে চাইল ঐ নূতন কেন্দ্রক আর নূতন নিউট্রনগুলিকে সজোরে দূরনিক্ষিপ্ত করে, গামা-রশ্মি বিকীর্ণ করে, আর দীর্ঘকাল যাবৎ তেজস্ক্রিয়তা চালিয়ে গিয়ে। কিন্তু যে-তেজকে বিজ্ঞানী স্বহস্তে পরমাণু ভেঙে মোচন করেছেন, তার অতবড় অপব্যয়কে তিনি স্বীকার করে নিলেননা। কী প্রচণ্ড ঐ তেজ! একটি মাত্র ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রক থেকে বেরিয়ে আসছে ২০০০০০০০০ (২০ কোটি) ই. ভো. তেজ। এ-রকম পরমাণু সংখ্যাতীত। এক গ্রাম মাত্র ইউ-২৩৫ থেকেই পাওয়া যাবে ২৫০০০ কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ [১ ওয়াট = সেকেণ্ডে ১০^{৭} আর্গ্ (পৃ. ২০১) বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা। ১ কিলোওয়াট = ১০০০ ওয়াট। ১ কিলোওয়াট ক্ষমতা(সেকেণ্ডে ১০^{১০} আর্গ্ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা)-বিশিষ্ট যন্ত্র ১ ঘণ্টা কাজ করলে মোট যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তা ১ কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ]। আবার ঐ নিউট্রন-রশ্মি ও গামা-কোয়াণ্টামের পারস্পরিক ঠোকাঠুকিতেও না কত তেজ উৎপন্ন হচ্ছে! বিভিন্ন কণিকার ঐ সব গতিতেজের সূচক বা নির্দেশক তাদের যে তাপমাত্রা, সেই অকল্পনীয় তাপমাত্রাকে ধরে রাখবার জন্যই ঐ রি-অ্যাক্টার যন্ত্রটি তাই বিজ্ঞানীর এক অপূর্ব সৃষ্টি। যে-রকম গতিবান কণিকারাজিকে এই যন্ত্রটি ধারণ করে থাকে, সেই রকমের বেগবান কণিকা দিয়ে গ্যাস সৃষ্টি করলে তার তাপ হবে অন্তত ১০০০০০০০০০০০০ (১০ হাজার কোটি) ডিগ্রী।

কিন্তু ঐ পরিমাণ তেজকে নিমেষের মধ্যে সরিয়ে না নিলে সত্যিসত্যিই কি কোনো পার্থিব বস্তু দিয়ে প্রস্তুত কোনো আধার তাকে ধারণ করে রাখতে পারে? যে তেজ দিয়ে বিরাট কলম্বিয়া নদীর জলপ্রবাহ পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠে? তাই তাকে মুহূর্ত মধ্যেই সরিয়ে এনে কাজে লাগিয়ে দেওয়া দরকার। আলো আর বিদ্যুতের চাইতে ক্ষিপ্রগতি আর কোনো বস্তু এ জগতে নাই। সুতরাং ঐ তাপকে নিমেষের মধ্যে দূরে সরিয়ে আনতে গেলে ওদেরই সাহায্য ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু আলো তো চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়ে নিমেষের মধ্যেই আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। তাকে সংরক্ষণ করার বিদ্যা জানা হয়নি। সেদিক থেকে মানুষের কাজে নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে বিদ্যুতেরই অধিক উপযোগিতা। তাকে সংরক্ষিত করারও ক্ষমতা মানুষের করায়ত্ত। কিন্তু সৃষ্টি হওয়া মাত্রেই অতটা তাপকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করা, সেও তো কম কথা নয়। সুতরাং প্রাথমিক কর্তব্য, ইউরেনিয়াম থেকে উৎপন্ন হওয়া মাত্রে তাকে কোনো প্রকারে দূরে টেনে আনা। বিজ্ঞানী তাই সর্বাগ্রে সেই সমস্যারই সমাধান করলেন। কেন্দ্রক-প্রতিক্রিয়া ঘটাবার জন্য রি-অ্যাক্টারের মধ্যে যেসব ইউরেনিয়াম-দণ্ড ঢোকান হয়, তার মধ্যে ইস্পাতের ফাঁপা নল রেখে সে নলের মধ্য দিয়ে অত্যুচ্চ চাপ দ্বারা ক্রমাগত জলপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখার

ব্যবস্থা করা হল, যেন প্রতিক্রিয়া জনিত উত্তাপ তার উৎপত্তির পর মুহূর্তেই জলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু জলের মধ্যেও এমন সব বস্তু থাকে, যাদের পরমাণু-কেন্দ্রক নিউট্রন-কণিকাকে রীতিমত হজম করে ফেলে ঐ প্রতিক্রিয়ার কাজকে ব্যাহত করে তুলতে পারে। সেইজন্য জলকে দু'বার পাতন করে তা থেকে ঐসব বস্তুকে পূর্বাহ্নেই সরিয়ে ফেলতে হয়। তারপর উত্তপ্ত জল বিস্তীর্ণ তাপতেজকে তার সর্বাঙ্গে বহন করে নিয়ে নলের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। বায়ুমণ্ডলের শতগুণ চাপের মধ্যে সে আর বাষ্পীভূত হতে পারেনা। একটি ইস্পাত নল দিয়ে সে তখন রি-অ্যাক্টার থেকে বেরিয়ে বাইরের কক্ষে এসে পৌছায়। নলটিকে জলপূর্ণ অন্য একটি পাত্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে তার কিছুটা তাপ ঐ জলাধারের জলের মধ্যে চালান হয়ে যায়। সে জল তখন নিমেষের মধ্যে বাষ্পে পরিণত হয়ে উঠে। কিন্তু মূল নলের জলের তাপ যায় কমে। সেই কমতি তাপের জল ঐ নলের মধ্য দিয়েই আবার রি-অ্যাক্টরে ফিরে আসে। কিন্তু বাষ্পের মধ্যে যে তাপ চলে গেল, তাকে রীতিমত কাজে লাগিয়ে দেওয়া হল। বাষ্প দিয়ে বাষ্পীয় টার্বাইন চালু হয়। টার্বাইন ঘুরিয়ে দেয় বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র বা জেনারেটার বিদ্যুতের উদ্ভব ঘটে। সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কি. মি. (১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল) বেগে সে-বিদ্যুৎ এসে পৌছোয় দেশময় ছড়িয়ে থাকা কৃষকের ক্ষেতে আর মজুরের খনিতে। কারখানায় যন্ত্রের কাজ শুরু হয়, দূরে দূরান্তরে বার্তা-বিনিময় চালু হয়ে যায়, রেডিওর কলরব কানে ভেসে আসে, পথে-প্রান্তরে আঙিনায় গৃহকোণে জ্বলে উঠে বিজলি-দীপ।

অনেক রকমের রি-অ্যাক্টার যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং তাদের নিয়ে বিচিত্র প্রকারের পরীক্ষার কাজ চলছে। কিন্তু রি-অ্যাক্টরের মধ্যে সব চাইতে বিস্ময়োৎপাদক বস্তু হল বুঝি তার উৎপন্ন নিউট্রন-কণিকাগুলি। বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ বলেই যেমন নিউট্রন-কণিকার পক্ষে পরমাণুর সুবিস্তীর্ণ শূন্য আকাশে যদৃচ্ছ উড্ডয়ন সম্ভব, তেমনি তার ঐ বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষতার জন্যই তাকে পরমাণু-কেন্দ্রক থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে একটি শক্তিশালী নিউট্রন-স্রোত প্রাপ্ত হওয়াও দুঃসাধ্য। কিন্তু রি-অ্যাক্টারের মধ্যে কোনো প্রকারে একটি বার ঐ পরস্পর-প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে দিতে পারলে আপনাআপনিই ঐ নিউট্রনধারা ফুলে, ফেঁপে বেড়ে উঠতে থাকে। তখন এক বর্গসেন্টিমিটার জায়গার উপর প্রতি সেকেণ্ডে ৫০ লক্ষ কোটি করে কণিকা ছুটে এসে আছড়ে পড়ে। এমন এক ভয়াবহ ব্যাপার হয়ে উঠে যে তার সেই আবেগকে তৎক্ষণাৎ কাজে লাগাতে না পারলে মুহূর্তের মধ্যেই প্রলয় কাণ্ড ঘটে উঠবে। কিন্তু তাকে কাজে লাগাবার সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও সে তার নিরপেক্ষতা গুণের জন্যই রি-অ্যাক্টার ভেদ করে অতি সহজেই বেরিয়ে আসতে পারে। সেজন্য গ্রাফাইট ইত্যাদির মত নিউট্রন-খাদক মন্দন-সামগ্রী (retarding agent—পৃ. ৩৮৩) দিয়েই তেজস্ক্রিয় ক্ষেত্রের দেয়ালটি তৈরি করা হয়। নিউট্রনবাহিনীর কেউ কেউ তাতে ধাক্কা

খেয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। কেউ কেউ আবার দেয়ালে ঢুকে থেকে যায়। আবার কেউ কেউ হয়ত বেরিয়ে আসে। কিন্তু তাদেরও শেষ পর্যন্ত বায়ুনিরুদ্ধ ইস্পাতের আবরণে ধাক্কা খেয়ে রি-অ্যাক্টারকে ঘিরে থাকা এক মিটার পুরু জলস্তম্ভের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। এত সব বাধাও যারা মানবেনা, তাদের জন্য শেষে আছে তিন মিটার (১০ ফুট) পুরু এক কংক্রিটের দেয়াল। কিন্তু তবুও ঐ ভয়াবহ নিউট্রনকে পুরাপুরি রোধ করা যায়না। সত্যিই ওরা ভয়াবহ, ভীষণ। কেবল ভেদশক্তির জন্যই যে ওরা এমন ভয়াবহ তাই না। যদি কোনো রকমে কিছু কণিকা চুইয়ে এসে জীবদেহে ঢুকে পড়তে পারে, তাহলে ওরা জীবদেহটাই কেন্দ্রক-প্রতিক্রিয়ার এক লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে। হয়ত সে দেহের কোনো নাইট্রোজেন-পরমাণুতে এসে ধাক্কা মারল; আর তার কেন্দ্রকের একটি প্রোটনকে হটিয়ে দিয়ে তার জায়গা দখল করে বসল। অমনি তৎক্ষণাৎ নাইট্রোজেন-কেন্দ্রকটি দেহক্রিয়ার বিরুদ্ধবস্তু যে কার্বন, তারই কেন্দ্রকে রূপান্তরিত হয়ে গেল। ওদিকে ছাড়া প্রোটনটিও হয়ত তার ধনাত্মক বিদ্যুদাধান বশত পার্শ্ববর্তী পরমাণুর ঋণাত্মক ইলেকট্রনকে কাছে টেনে আনল। অমনি ইলেকট্রনহারা ঐ পরমাণু বা আয়নটিও আবার অপর কোনো পরমাণুর ইলেকট্রন খসিয়ে তার শূন্যস্থান পূরণ করতে চাইবে। এ দেহের মধ্যেই এভাবে আয়নায়ন-ক্রিয়া ছড়িয়ে পড়বে। প্রতিক্রিয়াভূমি রূপে দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়াটি হয়ত তখন বন্ধ হয়ে যাবে। তাতে করে দেহের মধ্যে যেসব ব্যাধির সৃষ্টি হতে পারে, তার করাল গ্রাস থেকে মুক্তির কোনো আশাই আর থাকবেনা।

অবশ্য সেজন্য স্বয়ং প্রকৃতিই দেহের মধ্যে পূর্ব থেকে পটাশিয়াম প্রভৃতির মত কিছু কিছু তেজস্ক্রিয় বস্তু ঢুকিয়ে রেখে তার দ্বারা কিছুটা প্রতিক্রিয়া সহ্য করবার ক্ষমতা অর্জন করিয়ে রয়েছেন। যেমন ঐ পটাসিয়াম-আইসোটোপ মিনিটে মিনিটে ক্যালসিয়ামে পরিণত হচ্ছে, আর লক্ষ লক্ষ বিটা-কণিকা সৃষ্ট হয়ে দেহাভ্যন্তরে বিঁধে থাকছে। তাছাড়া তেজস্ক্রিয় কার্বন আইসোটোপ এবং গামা-কোয়াণ্টামও ওর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। সুতরাং কিছু সংখ্যক নিউট্রন এসে শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়লেই যে বিপৎপাত ঘটে যাবে, তা নয়। তবে মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই নিউট্রন-রশ্মি ভয়ংকর হয়ে উঠবে। সেজন্য যাতে কোনোপ্রকারেই এরকম অবস্থা না ঘটতে পারে, তার জন্য উপরোক্ত রি-অ্যাক্টার যন্ত্রের সঙ্গেই উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যদি কিছু নিউট্রন-কণিকা অত সত্বেও বেরিয়ে আসে, তাহলে আয়নায়ন কক্ষে তার আয়নায়ন জনিত প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হওয়া মাত্রেই লাল-সংকেত জ্বলে উঠে, বিপদ-ঘণ্টা বাজতে শুরু করে। তখন সকলকেই সারা অঞ্চলটি ছেড়ে ছুটে পালাতে হয়। কোনোক্রমে রি-অ্যাক্টারের মধ্যে পরস্পর-প্রতিক্রিয়া যদি সীমা ছাড়িয়ে যায়, তাহলেও আয়নায়ন-কক্ষের মধ্যে আয়নায়ন জনিত প্রতিক্রিয়ার ফলে বিদ্যুৎস্রোত ছুটতে থাকে এবং তৎক্ষণাৎ বিপদসূচক লাল আলো জ্বলে উঠে। কিন্তু স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার প্রভাবে তৎক্ষণাৎ

বোরন প্রভৃতির মত নিউট্রনভুক্ হাল্কা-কেন্দ্রকের উপাদান দিয়ে তৈরি মন্দন-দণ্ডগুলি রি-অ্যাক্টারের মধ্যে নেমে এসে প্রয়োজনমত-পরিমাণের নিউট্রন-কণিকাকে জঠরস্থ করে নিয়ে নিউট্রন-প্রবাহের সামগ্রিক শক্তিকে মন্দীভূত বা একেবারেই স্তিমিত করে দেয়।

কিন্তু শুনলে অবাক লাগবে যে, এ-রকমের ধ্বংসাত্মক ও ভয়াবহ প্রকৃতির বেগবান নিউট্রন-রশ্মিও বিজ্ঞানীর কাছে নতশির হয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নিত্য নূতন ভঙ্গিতে ঐ রি-অ্যাক্টার যন্ত্রের মধ্যেই সৃজনের সমারোহ জাগিয়ে তুলছে। কতকগুলি সংকীর্ণ পথ-প্রণালি যন্ত্রের বহির্দেশ থেকে তার অন্তঃপুর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। ওদের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন মত কতকগুলি বস্তুকে যন্ত্রের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের মত নিউট্রন-কণিকা তখন তার কাজ শুরু করে দেয়। ওদের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-প্রকৃতির সকল তত্ত্ব বা সকল হিসাব এখনও ঠিকভাবে বিজ্ঞানীর জানা হয়ে যায়নি। কিন্তু কী মন্ত্র ওরা পাঠ করে চলে, আর ঐ প্রবিষ্ট বস্তুনিচয় সঞ্জীবনী শক্তিতে নব নব রূপে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে,—তার মূল মর্মটি আর অজানা নেই। বস্তুগুলির স্বভাব চরিত্র সবই পালটে যায়। হয়ত একটি সহজপ্রাপ্য অকেজো অল্পমূল্যের বস্তুকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু যখন সে ফিরে আসে, তখন হয়ত সে এসে পৌছায় আর এক দুষ্প্রাপ্য অতি প্রয়োজনীয় মহার্ঘ বস্তুরূপে। ধরা যাক না কেন ঐ ইউরেনিয়ামটিরই কথা। ইউ-২৩৫ ভস্মীভূত হয়ে গেল। তার থেকে বিপুল পরিমাণ তেজ মানুষের হাতে এসে পৌছল। কিন্তু নিউট্রন-রশ্মি তার কেন্দ্রক-বিদ্ধ হয়ে গিয়ে তাকে ইউ-২৩৮ আইসোটোপে পরিণত করে তুলল। এভাবে এমন সব নতুন নতুন আইসোটোপের সৃষ্টি হতে লাগল, যার প্রয়োজন জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে—শিল্পে, কৃষিতে ও চিকিৎসায়। ওদের অনেক আইসোটোপই তেজস্ক্রিয় এবং স্বল্পস্থায়ী (পৃ. ২৪৪, ৩৬৬)। কিন্তু তাদের ঐটুকু জীবৎকালেই দ্রুতগতির যান-বাহনে করে বহুদূরে নিয়ে গিয়েও তাদের দিয়ে কাজ সেরে নেওয়া হয়। নিউট্রনের আঘাতে কোন্ নিয়মে যে কেন্দ্রক ভেঙে বেরিয়াম, ক্রিপ্টন, জেনন, স্ট্রন্সিয়াম, টেলুরিয়াম প্রভৃতি মাঝারি আকৃতির উপাদানগুলি উৎপন্ন হয়ে থাকে, তা জানা হয়ে গেলে বিভাজন-প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে ঐ রি-অ্যাক্টার যন্ত্র থেকেই ইচ্ছা মাফিক বস্তুসম্ভার চয়ন করে নেওয়া আর অসম্ভব হবেনা।

কিন্তু নিউট্রনরা সত্যিই বিজ্ঞানীর সাধ মিটিয়েছে। একদিনেই তিনি প্রকৃতির উপর টেক্কা দিতে পারেননি সত্য কথা। কিন্তু বছর ছয়েক যেতে না যেতে এক বিজ্ঞানীর হিসাব মতই (পৃ. ৩৭৪) ১৯৪০ খ্রী.-এ ঐ নিউট্রন-কণিকা আর এক বিজ্ঞানীর হাতে ইউরেনিয়াম-উত্তর ৯৩-সংখ্যার এক মৌলিক উপাদান এনে হাজির করে দিল। সুদূরের এক গ্রহের নামে তার নাম দেওয়া হল নেপচুনিয়াম। নেপচুন গ্রহ আগে থেকেই ছিল, বিজ্ঞানীরা তাকে আবিষ্কার করেছিলেন মাত্র। কিন্তু পার্থিব প্রকৃতিতে নেপচুনিয়াম সেদিন ছিলনা।

মানবমস্তিষ্কের সে যেন এক অপ্রাকৃত উদ্ভাবন। পরের বছরেই আর এক উপাদানের আবির্ভাব ঘটল (পৃ. ৩৮৫)—প্লুটোনিয়াম। পরমাণু-সংখ্যা ৯৪। আরও দূরের এক গ্রহ প্লুটোর নামেই এর নামকরণ হল। জাপানের উপর নিক্ষিপ্ত পারমাণবিক বোমাটিকে এই প্লুটোনিয়ামের সাহায্যেই তেজবান করা হয়েছিল। কিন্তু মানুষ যেন ক্রমেই পৃথিবীতে নূতন প্রকৃতির আবির্ভাব ঘটিয়ে দিলে। পরমাণুর প্রকার বেড়ে যেতে লাগল—আমেরিসিয়াম, কুরিয়াম, বার্কেলিয়াম, ক্যালিফোর্ণিয়াম, আইনস্টাইনিয়াম, ফের্মিয়াম। ১৯৫৫-তে আমেরিকার পদার্থবিদদের দ্বারা ১০১-সংখ্যক উপাদান উদ্ভাবিত হল—মেন্দেলেভিয়াম। ১৯৫৮-তে তৈরি হয়ে গেল পরবর্তী সংখ্যার উপাদান—নোবেলিয়াম। তারপরেও দু'টি উদ্ভাবন ঘটেছে এবং এভাবে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়ে চলেছে। কিন্তু বিজ্ঞানীপ্রদত্ত ফিনিক্স্ নাম গ্রহণ করে রি-অ্যাক্টার যন্ত্র আজ সত্যই সার্থকনামা। যাদের সে একবার আশ্রয় দেয়, তারা সব নব যৌবনে ফিরে ফিরে আসে। "রি-অ্যাক্টরে পুড়ে গেল ইউ-২৩৫। পরস্পর-প্রতিক্রিয়ায় কতকগুলি নিউট্রন কিন্তু বাঁধা পড়ল ইউ-২৩৮ কেন্দ্রকে। দু'বার বিটা-ক্ষরণের পর তারা পরিণত হয় প্লুটোনিয়াম-কেন্দ্রকে। একজন মরল তো আর একজন বেঁচে উঠল। সব চেয়ে আশ্চর্য এই যে এমন ব্যবস্থা করা যায় যাতে যে-পরিমাণ ইউ-২৩৫ ক্ষয় হচ্ছে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ প্লুটোনিয়াম পাওয়া সম্ভব—প্রায় দেড়গুণ বেশি। তাজ্জব ব্যাপার নয় কি? দুই কিলোগ্রাম জ্বালানি পুড়ল তাতে বিপুল পরিমাণে তেজ ছাড়াও পাওয়া গেল আরো তিন কিলোগ্রাম সমান কার্যকরী জ্বালানি। কিন্তু পাওয়া গেল কার বিনিময়ে? জবাবটা সোজা। পাওয়া গেল তিন কিলোগ্রাম ইউ-২৩৮ থেকে যা অনেক সস্তা। অর্থাৎ তেজ নিষ্কাশনে শুধু লঘু আইসোটোপ ইউ-২৩৫ নয়, সমস্ত স্বাভাবিক ইউরেনিয়ামকে ব্যবহার করার সম্ভাবনা মিলছে।" ওদিকে নিউট্রনযুক্ত হয়ে থোরিয়ামও এক উত্তম জ্বালানিতে পরিণত হয়ে উঠেছে। সেটি হল ঐ ইউরেনিয়ামেরই আর এক কৃত্রিম আইসোটোপ—ইউ-২৩৩। এ উপাদানটিও বিভাজিত হয়ে বিপুল তেজপরিমাণকে মুক্ত করে দিতে পারে।

এ-রকম ভাবে পাওয়া তেজ মানুষের জীবনযাত্রা-পদ্ধতির মধ্যে যুগান্তর এনে দিতে চলেছে। কয়লার খনি খুঁজে বার করার জন্য বিজ্ঞানীকে হন্তদন্ত হয়ে হয়ত আর সারা দেশময় ছুটে বেড়াতে হবেনা। তেলের খনি দখল করবার জন্য সৈনিকদের হয়ত আর পররাজ্য গ্রাস করতে গিয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতে হবেনা। পরমাণুশক্তিই পণ্যবাহী জাহাজকে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে টেনে নিয়ে যাবে, মালবাহী সুদীর্ঘ রেলগাড়িকে ছুটিয়ে নিয়ে যাবে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে,—কয়লার ধোঁয়া গায়ে লাগবেনা, কোথাও দাঁড়িয়ে সময় ব্যয় করে জ্বালানি ভরে নিতে হবেনা; কে জানে, হয়তো বা কুলিদেরও দুর্দশা ঘুচে যাবে। কিংবা এক কৌটো কেন্দ্রক-গ্যাস নিয়ে মোটর গাড়ি ছুটবে

দিনের পর দিন, মাস আর বছর। কিংবা হয়ত ঐ পরিমাণ গ্যাস নিয়ে সারা পৃথিবী পরিক্রমা করে আসবে বিমান, কোথাও তাকে খাদ্যসংগ্রহের জন্য মাটিতে নেমে আসতে হবেনা।

কিন্তু এত সত্ত্বেও পৃথিবী বক্ষে লুক্কায়িত ইউরেনিয়াম-থোরিয়াম সম্পদ সীমাহীন নয়। বিজ্ঞানীরা হিসাব কষে দেখেছেন, ঐ সম্পদ আর তেল-কয়লা প্রভৃতি দিয়ে বড় জোর কয়েক শ' বছর যাবৎ পৃথিবীর সব কাজ চলে যেতে পারে। তবে হাজার বছর নিশ্চয় না। কিন্তু তারপর? তারপরের কথাও যে বিজ্ঞানী আজ ভাবছেন, তা শুধু কোনো বিশেষ দেশের নয়, সমগ্র মানবসমাজেরই এক পরম সৌভাগ্যের কথা। শুধু সেই কল্পনার মধ্যেই মানবচিন্তার কী বিপুল ঔদার্য আর সমুন্নতি!

যেন এক অদমিত আশা নিয়ে সম্পদস্রষ্টা বিজ্ঞানী কোনো অফুরন্ত তেজের উৎস-সন্ধানে ঘরছাড়া অভিযাত্রীর মত দলে দলে পথে বেরিয়ে পড়েছেন। মাথার উপর সূর্য—পার্থিব সকল প্রক্রিয়ার, সকল তেজের একমাত্র উৎস। প্রত্যহ ৩০,০০০ কোটি টন পদার্থ তার দেহ থেকে খসে পড়ছে। আর তাই থেকে রূপান্তরিত যে-তেজ অক্লান্ত আবেগে বিকীর্ণ হয়ে অবিরতভাবে 'নিরুদ্দেশ লোকে' 'তিমির তেপান্তরে' 'কল্পকল্পান্ত'ব্যাপী ধেয়ে চলেছে, তার কতটুকু অংশই বা আমাদের এই পৃথিবীর 'অতি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্রের 'পরে' এসে পৌঁছোয়! কিন্তু তাইতেই তো আমাদের পৃথিবীর সব কাজ সারা হয়ে যায়! বিজ্ঞানীরা দেখলেন, সূর্যের অভ্যন্তরে অবিশ্রান্তভাবে হাইড্রোজেন-কেন্দ্রকের হিলিয়াম-কেন্দ্রকে রূপান্তর চলছে। সকল মৌলিক উপাদানের মধ্যে হিলিয়াম-কেন্দ্রক সব চাইতে স্থায়ী (পৃ. ৩১৮)। অর্থাৎ হাইড্রোজেন-কেন্দ্রক বা প্রোটনগুলি যখন হিলিয়াম-কেন্দ্রকে নব-সন্নিবেশ লাভ করে, তখন তাদের খরচার পরিমাণটিও হয় বিপুল। বাস্তবিকই সে এক বিপুল তেজ! একটি একটি প্রোটন যুক্ত হয়, আর তার ভর-পদার্থটি তেজের মধ্যে প্রক্রিয়ান্তর লাভ করে। এভাবে যখন একটি হিলিয়াম-কেন্দ্রক সংঘটিত হয়ে উঠে, তখন তার তেজপরিমাণ দাঁড়ায় ইউরেনিয়াম থেকে নিউট্রন খসানোর তেজের প্রায় চার গুণ। প্রায় ২৮০০০০০০ (২ কোটি ৮০ লক্ষ) ই. ভো.। এভাবেই সূর্যদেহ থেকে যে ৩০০০০০০০০০০০ (৩০ হাজার কোটি) টন করে পদার্থ প্রত্যহ খোয়া যায়, তার সবটাই তেজপ্রক্রিয়া রূপে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে বলে পৃথিবীতে কখনও সূর্যালোক জনিত তেজের অভাব ঘটেনা। শুধু সূর্যের ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য নক্ষত্রের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। সেখান থেকেও যে জ্যোতি অনবরত ছড়িয়ে পড়ছে, তার কারণও ঐ হাইড্রোজেন-কেন্দ্রকের হিলিয়াম-কেন্দ্রকে রূপান্তর। বর্ণালি মাপক যন্ত্রের সাহায্যে হিসাব করে তাই দেখা গেছে, যে-সব নক্ষত্র যত পুরাতন, তাদের হাইড্রোজেন-সমৃদ্ধিও তত কম। তাই যদি হয়, তাহলে এই পৃথিবীতে কি ঐ রকম প্রক্রিয়া ঘটিয়ে যদৃচ্ছ তেজপরিমাণ সংগ্রহ করে নেওয়া যায়না? হিলিয়াম-কেন্দ্রকের মধ্যে আছে প্রোটন আর নিউট্রন। গুরুজলের

হাইড্রোজেন-কেন্দ্রকের উপাদানও তো ঐ প্রোটন আর নিউট্রন। অথচ পৃথিবীতে গুরুজলের তো অভাব নাই! সাগরজলের ছ'হাজার ভাগের এক ভাগই ঐ গুরুজল। ৪০০ টন ডিউটেরিয়াম (গুরুজলের হাইড্রোজেন) যখন ১০০ কোটি টন তেল আর কয়লার কাজ চালিয়ে দিতে পারে, তখন ঐ অফুরন্ত গুরুজল-সম্পদকে ফেলা-ছোঁড়া করে খরচ করলেও ১০ কোটি বছরের সমস্ত খরচ তা থেকেই উঠে আসতে পারে। বিজ্ঞানীরা সেই মহাযজ্ঞ সাধনের ব্রত গ্রহণ করেছেন।

নিউট্রন-রশ্মি উৎপাদন, পরম্পর-প্রতিক্রিয়া সংঘটন, এবং ইউরেনিয়ামের মত ভারি উপাদানের কেন্দ্রক-বিভাজনের জন্য বিজ্ঞানীরা পরমাণু রি-অ্যাক্টার বানিয়েছিলেন। কিন্তু হিলিয়াম, লিথিয়াম প্রভৃতি ধনাত্মক হাল্কা কেন্দ্রকের সংগম (fusion) ঘটিয়েও যখন অভাবিত পরিমাণ কেন্দ্রকীয় তেজকে মুক্ত করা সম্ভব হয়, তখন হিলিয়াম-ঘটনের জন্য তাঁরা আর একটি অপূর্ব ও অভিনব যন্ত্র বানাতে শুরু করে দিয়েছেন। স্বভাবতই পূর্বোক্ত রি-অ্যাক্টারের চাইতে তার কতকগুলি সুবিধার দিকই থাকবে। প্রথমত, সে-যন্ত্রের মধ্যে পরম্পর-প্রতিক্রিয়াজনিত তেজস্ক্রিয় খণ্ডগুলির উৎপাদনের সম্ভাবনা না থাকায়, তেজস্ক্রিয় বিপদ সেখানে থাকবেনা। দ্বিতীয়ত, বিদ্যুৎ কণিকার সংগমকালে একেবারে সরাসরিই বিদ্যুৎ-কণিকা থেকে বিদ্যুৎশক্তি আহরণ করা সম্ভব হবে,—তার জন্য পূর্বের মত আর বিপুল তাপ-তেজ, বাষ্পীয় টার্বাইন এবং বিদ্যুৎ-যন্ত্রের (পৃ ৪০৪) প্রয়োজনই থাকবেনা। তৃতীয়ত, কণিকা-সংগমের জন্য জ্বালানির (হাইড্রোজেন-আইসোটোপ) অভাব আমাদের নাই।—এমন যে যন্ত্রটি বিজ্ঞানীরা বানাতে চাইছেন, তার নাম 'তাপ'-কেন্দ্রক রি-অ্যাক্টার। 'তাপ' কথাটি বিশেষ তাৎপর্যময়। কিন্তু সমধর্মী তড়িদাধানে বিচ্ছিন্ন প্রোটনরা প্রচণ্ড বিকর্ষণ বশত পরস্পরকে ধাক্কা মেরে যখন দূরে সরিয়ে দেয়, তখন কি করে তাদের মিলন ঘটিয়ে হিলিয়াম-কেন্দ্রক গড়ে তুলা যাবে? তবে একবারটি কোনো রকম ঠেলেঠুলে কেন্দ্রক-শক্তির প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে ওদের এনে ফেলতে পারলে কাজ চুকে যায়। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে এত গতিশক্তি, যা দিয়ে ওদেরকে ধাক্কা মেরে সেই ঘূর্ণি-ঘরের মধ্যে এনে ফেলা যাবে? বিপুল পরিমাণ উত্তাপ হয়ত ঐ কণিকার মধ্যে সেই রকম বেগ সঞ্চার করে দিতে পারে। কিন্তু তাহলেও তো সেই তাপ-মাত্রাকে উঠতে হয় অন্তত ৪০ বা ৩০ কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। 'তাপ' কথাটির তাৎপর্য এইখানেই। কিন্তু এত উষ্ণতার তাপই বা পাওয়া যাবে কি করে? আর সে উত্তাপের ডিউটেরিয়ামকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য এমন কঠিন আধারই বা পাওয়া যাবে কোথায়?

কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরকালই আমরা দেখে এসেছি, কখনও কোনো বিষয়েই বিজ্ঞানীরা হাল ছেড়ে বসে থাকেননা, তা সে সমস্যা যত দুরন্তই হক না কেন। কারণ, তৃষ্ণা ওঁদের আরও দুরন্ত। সত্যকে খুঁজে বার করবার অশান্ত আবেগে তাই ওঁরা সকল

সমস্যারই সমাধানও পেয়ে যান। যুক্তি ওঁদের একটি। প্রকৃতির রাজ্যে তার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব (চিরপ্রবাহমান পক্ষপাতিত্ব, দ্র., পৃ. ৩৯৯)-মূলক সত্য সম্বন্ধে কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই; সকল বস্তু যখন একই সর্বব্যাপ্ত সত্যে গ্রথিত, যখন একই পদার্থতত্ত্বে সকল ঘটনাই বিধৃত, তখন প্রকৃতির রাজ্যে যা ঘটছে, মানুষের পক্ষেও তাকে ঘটিয়ে তুলা সম্ভব। সূর্যদেহের ঘটনাকেও তাই ওঁরা গবেষণাগারের ক্ষরণ-নলের মধ্যে ঘটিয়ে তুলবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়েছেন। তার জন্য ওঁরা যে পরিকল্পনা গড়ে তুলেছেন, তা যেমনি অভিনব, তেমনি বিস্ময়াবহ। ক্ষরণ-নলের ডিউটেরিয়াম-গ্যাসের মধ্য দিয়ে যথাসম্ভব উচ্চশক্তির বিদ্যুৎ-ঝিলিক পাঠিয়ে এক প্রচণ্ড উষ্ণতাযুক্ত তাপের উদ্ভব ঘটান যেতে পারে। কিন্তু সে তাপকে ধারণ করবার জন্য যে-পাত্রের দরকার হবে, ১৯৫০ সালে রুশ বিজ্ঞানী সাখারভ্ (A. D. Sakharav) এবং তাম্‌ম্ বললেন, তা তৈরি হবে শূন্য দিয়েই। তা না হলে কোনো উপায় নাই। কারণ, কোটি কোটি ডিগ্রি উষ্ণতায় পার্থিব সকল বস্তুই নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতে বাধ্য। কিন্তু শূন্যে সৌধ নির্মাণ সম্ভব না হলেও শূন্য দিয়ে যে তপ্ত ডিউটেরিয়ামের আধার নির্মাণ সম্ভব, তা' ঐ বিজ্ঞানীদের পরিকল্পনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ক্ষরণ-নলের মধ্যে ডিউটেরিয়াম-গ্যাসকে কোনোরূপে আংশিকভাবেও আয়নায়িত করে নিয়ে তার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠান হয়। আয়ন-ইলেক্‌ট্রনের পথ ধরে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলতে থাকলে তাতে আপনাআপনি গ্যাসের তাপ অত্যন্ত বেড়ে উঠে। এদিকে নলের প্রান্তদ্বয়ে বিভবপার্থক্য রাখতে হয় যতদূর সম্ভব বেশি। তার ফলে ওদের মধ্যে বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ার সময় তার ধাক্কায় পরমাণুরা যখন ভীমবেগে ছুটতে থাকে, তখন তাদের পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে ঐ তাপ আরও বেড়ে চলে। এভাবে গ্যাসের পরমাণুগুলি ক্রমেই যত বেশি আয়নায়িত হতে থাকে, ততই ঐ গ্যাসের তাপ বাড়তে থাকে এবং ক্যাথোড্-কণিকার অভিঘাতে ততই ঐ আয়নদের অতিকেন্দ্রকীয় ইলেক্‌ট্রনগুলি মূল পরমাণু থেকে একে একে খসে পড়তে বাধ্য হয়। তখন নলের মধ্যে যে বস্তুটি ছোটাছুটি করতে থাকে, তা আর ডিউটেরিয়াম গ্যাস থাকেনা। তা হয়ে উঠে ইলেক্‌ট্রন এবং ডিউটেরনের (ডিউটেরিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রক) এক সতত-সংঘর্ষময় সংমিশ্রণ,—বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন প্লাজমা। তার কণিকাগুলির প্রত্যেকটি তড়িদাত্মক হলেও সামগ্রিকভাবে ঐ মিশ্রণটি নিরপেক্ষ থাকে। কারণ, সেখানকার মোট প্রোটন-সংখ্যা (অর্থাৎ প্রোটন-নিউট্রন যুক্ত ডিউটেরনের সংখ্যা) মোট ইলেক্‌ট্রন-সংখ্যারই সমান।

ক্রমে ক্রমে বিদ্যুৎমাত্রা বাড়ান হতে থাকে। প্লাজমা একটি খুব ভাল পরিবাহী বস্তু বলে ওর কণিকাগুলির মধ্য দিয়ে তখন নলের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুৎ-তেজ ঝিলিক্ মেরে ছুটে চলে। নলের তাপমাত্রা লক্ষ ডিগ্রির ঘরে উঠে যায়

এ সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। কারণ, এ সময়ে নলের অভ্যন্তরস্থ গ্যাসের কণিকাগুলি নলের গাত্রে ধাক্কা দিয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে যে-পরিমাণ তাপকে নল-গাত্রের মারফতে সরিয়ে দেয়, সেটি আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে একটি বিরাট অপচয় হয়ে দাঁড়ায়। তখন তাপমাত্রাকে আর বেশি উঁচুতে উঠান শক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ঐ তাপমাত্রা কয়েক লক্ষ ডিগ্রিতে পৌঁছলে তখন সাখারভ্ এবং তাম্‌ম্-এর তত্ত্ব মাফিক নলের মধ্যে আচমকা এক ভৌতিক কাণ্ড ঘটে যায়। ভোজবাজির খেলা শুরু হয়। ঐ যে মুহুর্মুহু বিক্ষিপ্তগতির প্রচণ্ড বেগবান সংঘর্ষময় মিশ্রণ—যার নাম দেওয়া হয়েছে ডিউটেরিয়াম-প্লাজ্‌মা, সেই অপূর্ব বস্তুটি তখন দেয়াল ছেড়ে হঠাৎ নলের মধ্যরেখার পাশে এসে লম্বালম্বি জড় হয়ে যায়। দেয়ালের সঙ্গে তখন আর তার কিছুমাত্র যোগ থাকেনা।
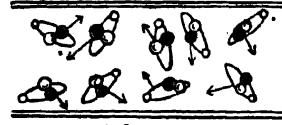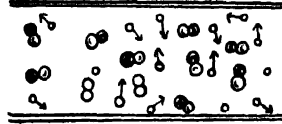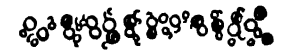
সত্যিই তখন সে শূন্য মার্গে অধিষ্ঠিত হয়। একটি প্রচণ্ড অদৃশ্য শক্তি যেন তখন তাকে ঐ মধ্যবর্তী অঞ্চলটিতে চেপে ধরে। আসলে ঐ শক্তিটি হল চৌম্বক শক্তি। বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলেই তার উদ্ভব। আগেই আমরা জেনেছি, বিদ্যুৎপ্রবাহ যত প্রবল হতে থাকে তজ্জনিত চৌম্বক ক্ষেত্রটিও ততই জোরাল হয়ে উঠে। এক্ষেত্রেও প্লাজ্‌মা কণিকাগুলি তজ্জনিত অতিশক্তিশালী চৌম্বক বলরেখাগুলিকে অতিক্রম করে নলের মধ্যে আর ছড়িয়ে পড়তে পারেনা। চৌম্বক ফাঁদেই ওরা বন্দী হয়ে যায়। তারও পরে চৌম্বক শক্তি ক্রমবর্ধিত হতে থাকার জন্য বিদ্যুৎ-কণিকাগুলির পথ ক্রমাগতই বক্র হতে থাকে। সেই বদ্ধ বক্ররেখা বা কণিকার পথবৃত্তের ব্যাসও ততই কমে আসে এবং কণিকাগুলি অত্যল্প স্থানের মধ্যে ধাবমান হতে বাধ্য হয়। তখন ওদের পক্ষে আর কিছুতেই নলের গাত্র পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে সেখানে ধাক্কা মেরে ঐ গাত্র মারফতে নিজেদের তাপকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠেনা। অথচ যতই বিদ্যুৎমাত্রা বাড়তে থাকে, ততই নল মধ্যস্থ তাপমাত্রাও বেড়ে চলে। কণিকাগুলিও ততই বেগবান হয়ে দূরধাবিত হতে চায়। কিন্তু প্রকৃতির নির্বন্ধ, তারা তা পারেনা। চৌম্বক বলরেখাগুলিও ততই শক্তিমান হয়ে তাদের চেপে ধরে। তখন প্রকৃতি-প্রভাবেই প্রচণ্ড উত্তাপে কণিকার দল স্ফীত হয়ে উঠে। ফুলে, ফেঁপে, ক্রুদ্ধ ফনিনীর মত সর্পিল ভঙ্গিতে ওরা তখন যেন চৌম্বক বলরেখাগুলিকেও সহস্র নাগপাশে জড়িয়ে ধরে তার চারদিকে পাক

খেতে থাকে। বলরেখার জোর আরও বেড়ে যায়। আলাদাভাবে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করেও সেই জোরকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া যায়। তখন একমাত্র বিদ্যুতের পথরেখা ধরে চলা ছাড়া প্লাজ্‌মা-কণিকার কোনো গত্যন্তর থাকেনা। কিন্তু দু'টি একমুখী সমান্তরাল বিদ্যুৎপথ তো পরস্পরকে আকর্ষণ করে। তার প্রোটন (বা ইলেকট্রন)-কণিকার পারস্পরিক বিকর্ষণী প্রভাব সত্ত্বেও প্লাজ্‌মা রেখাগুলি তখন তাই পরস্পরকে আকর্ষণ করতে বাধ্য হয়। একদিকে চৌম্বক বলরেখার প্রচণ্ড চাপ, আর অন্যদিকে বিদ্যুৎরেখার প্রচণ্ড আকর্ষণের ফলে ওদের বিকর্ষণী শক্তি যেন ক্রমশ লোপ পেতে থাকে, ওরা যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড বেগে ঘুরপাক খেতে বাধ্য হয়। ক্রমশ যেন এক নূতন পার্থিব শক্তির উদ্ভব হতে থাকে,—বিজ্ঞানীরা কি এরই নাম দিয়েছিলেন সেই কেন্দ্রকীয় শক্তি (পৃ. ৩১৭-১৮)?

বিজ্ঞানীরা ডিউটেরিয়াম-প্লাজমার ওরকম অবস্থার নাম দিয়েছিলেন নাক্ষত্রিক পদার্থ। পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে ওরকমের অবস্থা সত্যিই ঘটেনা। তা ঘটে হয়ত নক্ষত্র-প্রকৃতিতে। সূর্যের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে ওরকম অবস্থা ঘটে দিয়া। ওখানে কেন্দ্রকসংগম সম্ভব হয়ে উঠেছে, এবং তা থেকে অকল্পনীয় তেজ-পরিমাণ বিকীর্ণ হয়ে চলেছে। কিন্তু পৃথিবীতেও ঐ রকম অবস্থা ঘটিয়ে তোলা এখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তার কারণ, অত উত্তাপে যেমন প্লাজমা-কণিকারা কিছুতেই বাগ মানতে চায়না, তেমনি আবার ঐ তাপতেজও অত্যল্প সময়ের মধ্যে বিকীর্ণ হয়ে যায়, বা অন্যভাবে ক্ষয়ে যায়। তবে এতসত্ত্বেও অত্যল্প সময়ের (১।১০০০ সেকেণ্ড) জন্য হলেও বিজ্ঞানীরা প্লাজ্‌মাকে ৫০ লক্ষ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু বিজ্ঞানীর সামর্থ্য অর্জনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকেনা যে, এই তথাকথিত পাথিব-ভরপদার্থের কাছ থেকেই তাঁরা ঐ তথাকথিত অপার্থিব-তেজপদার্থও আদায় করে নিতে পারবেন। কিন্তু তাঁরা তা পারুন বা না পারুন, একটি মাত্র দেশে নয়, সকল দেশের মানবসমাজের বর্তমান এবং সমগ্র ভবিষ্যতের জন্য তাঁরা যে আজ ওরকমের একটি তেজনির্ঝর খুঁজে নিতে এগিয়ে চলেছেন, সত্যই সে মহান অভিযাত্রার তুলনা নাই।

কিন্তু ঐ 'তথাকথিত' কথাটির তাৎপর্য খুঁজতে বোধ হয় এখন আর আমাদের অধিক দূর এগিয়ে যেতে হবেনা। পূর্বের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে আসে যে, **ভর আর তেজ কোনো পৃথকসত্ত্ব পদার্থ নয়। কিংবা ভর-তেজ সম্বন্ধে 'পার্থিব' 'অপার্থিব' কথাগুলিও সম্ভবত কথার কথা মাত্র। সারা বিশ্বই ভরতেজময়। বস্তুতপক্ষে, 'বিশ্ব' কথাটি কেবল কল্পনা মাত্র, যেমন ঐ 'পদার্থ' কথাটিও। 'পদার্থ' নামটি দিয়ে আমরা কেবল বাস্তব ভর-তেজের একটি আংশিক**

রূপকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি, আর 'বিশ্ব' কথাটি দিয়ে ধরে নিতে চাই তার একটি সামগ্রিক রূপকে, সুতরাং এভাবে আমরা বিশ্বকেও পদার্থময় ধরে নিয়ে কাজ চালাতে পারি। সেইজন্যই আমরা এও বলতে পারি যে, **অ-পদার্থ** বা বিপরীত-পদার্থ বলেও কিছু নেই। অ্যান্টি-প্রোটন, অ্যান্টি-নিউট্রন, অ্যান্টি-ইলেক্‌ট্রন বা পজিট্রন, এবং অ্যান্টি-ডিউটেরন প্রভৃতি যেসব বিপরীত-সত্তার কথা আমরা আগে জেনেছি, সেগুলি সবই বিপরীত-কণিকা মাত্র। কিন্তু **বিপরীত-পদার্থ বলে কোনো কিছু থাকা একেবারেই অসম্ভব।**

বছর খানিক আগে ক'লকাতার দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান (২১।৬।৬৫) কাগজের বৈজ্ঞানিক সংবাদদাতার (Science Correspondent) 'In search of an Anti-Universe' (বিপরীত-বিশ্বের সন্ধানে)-নামক একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তার আরম্ভসূচক বাক্যটিতে লেখা হয়েছিল—

Speculation about a universe of anti-matter has been revived···

সংবাদদাতার বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার এরূপ:

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষদিকে ব্রিটিশ তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্ পল্ ডিরাক-উপস্থাপিত কতকগুলি মতামত থেকে বিপরীত-কণিকার (anti-particles) ধারণার উদ্ভব ঘটেছিল। কণিকার একটি বিশেষ গুণের (ঘূর্ণি—spin) সম্বন্ধে অবহিত হয়ে ১৯২৫ খ্রী. নাগাৎ ডিরাক যে ধারণা করেছিলেন ধনাত্মক ইলেক্‌ট্রনের বর্তমানতাও সম্ভব, ১৯৩২ খ্রী.-এ পজিট্রন আবিষ্কৃত হওয়ায় তার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে বিপরীত-প্রোটন (anti-proton), বিপরীত-নিউট্রন (anti-neutron) এবং প্রাথমিক-কণিকা নয় এমন যে প্রোটন-নিউট্রন সংঘরূপী ডিউটেরিয়াম বা গুরু-হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রক, তারও বিপরীত-কণিকার (anti-deuterium) আবিষ্কার ঘটায় অন্যান্য পরমাণুরও বিপরীত-কেন্দ্রকের অস্তিত্বের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যদিও কণিকার তুলনায় বিপরীত-কণিকার সংখ্যা অত্যল্প, তাহলেও এ বিষয়ে প্রকৃতিকে পক্ষপাতদুষ্ট মনে করার কারণ নাই। বিপরীত-কেন্দ্রকযুক্ত বিভিন্ন পরমাণু শুধু নয়, আমাদের বিশ্বের তুলনায় এর একটি বিপরীত-বিশ্বও (anti-universe) থাকতে পারে। সেখানে যদি লোকজন থাকে তাহলে তাদের আমরা আমাদের বিপরীত-মনুষ্য (anti-people) বলেও অভিহিত করতে পারি। আর তাহলে ঐ রকমের বিপরীত-ঘটনাগুলিও মুকুর-প্রতিসাম্য (mirror symmetry)-তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। আবদুস সালাম (Abdus Salam) বলেছেন, কাল-কাঠিমকে (reel of time) উল্টো পাকে খুলে ফেলা সম্ভব হলে দেখা যাবে যে যদি বিপরীত-কণিকামালা এসে ঘটনা-ঘটক আসল কণিকারাজির স্থলাভিষিক্ত হয়, তাহলে আসল ঘটনাগুলির কাল-প্রতিফলনটি তাদের

স্থান-মুকুরের সঙ্গেই সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলেছে (The time reflection of a given physical situation would correspond…to a situation in a space mirror except that all particles would be replaced by their anti-particles)। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লিডারম্যানও (Dr. Leon Lederman) প্রতিসাম্য-জনিত বিপরীত-জগৎ এবং বিপরীত-কণিকা এবং এমনকি বিপরীত-কালপ্রবাহের বিদ্যমানতা সম্বন্ধেও অনকূল মত প্রকাশ করেছেন।

প্রারম্ভের ঐ anti-matter (বিপরীত-পদার্থ)-এর পরিকল্পনা কৌতুকাবহ। কিন্তু পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের পূর্বোক্ত আলোচনার সঙ্গেও সংবাদদাতা-প্রদত্ত অন্যান্য সংবাদগুলির মিল খুঁজে পাওয়া যায়না। সে কথা বিবেচনার পূর্বে পদার্থ (ভর-তেজ) সম্বন্ধে আর একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে।

আজ পর্যন্ত জগতে সন্দেহাতীতভাবে এমন কোনো স্থান আবিষ্কৃত হয়নি, যেখানে কোনো না কোনো পদার্থ বিদ্যমান নাই। আবার যেখানে যা কিছু আছে তার নামই যখন পদার্থ, তখন বলা যায় যে, পদার্থবিহীন স্থান বলেও পৃথক কিছু নাই। আমরা যাকে শূন্যস্থান বা আকাশ বলে মনে করি, আসলে সেও পদার্থের অঙ্গ দিয়ে গঠিত আকাশ-পদার্থ। পদার্থ যখন সর্বত্রই বিদ্যমান, তখন পদার্থবিহীন অবস্থায় যা পড়ে থাকে, তাকে যে আকাশ বা দেশ বলব তার উপায় নাই। আবার এমন কোনো সময়ের কল্পনা করা যায়না, যে-সময়ে পদার্থ-ক্রিয়া একেবারেই অনুপস্থিত। সুতরাং স্থান বা দেশ যেমন পদার্থদেহের একটি বিশেষ ধরন, সময় বা কালও তদ্রূপ পদার্থক্রিয়ার একটি বিশেষ ভঙ্গি। পদার্থ ব্যতিরেকে পদার্থক্রিয়া বলে যখন কিছু থাকতে পারে না, তখন পদার্থবিহীন অবস্থায় দেশ বা কাল নামক কোনো মহামান্য চিরন্তন কিছুও যে বিরাজমান থাকবে, তাও বলার জো নাই। সুতরাং **দেশ ও কালের যা কিছু স্বীকৃতি, সে ঐ পদার্থ-স্বীকৃতি বশতই। পদার্থেরই টিকে থাকবার বিভিন্ন পদ্ধতির নাম দেশ ও কাল। ওগুলি পদার্থেরই প্রকৃতি। যেমন তার সার্বজনীন এক প্রকৃতির নাম গতি। এই সার্বজনীন গতিপ্রকৃতির মারফতেই তার স্থিতি অর্থাৎ টিকে থাকবার অন্যান্য প্রকৃতিগুলিও আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়ে উঠে। অর্থাৎ গতি হচ্ছে পদার্থের স্বপ্রকাশের একটি উপায়** (পৃ. ৩৯৯-৪০১)। **পদার্থের ঐ দেশগত বা কালগত প্রকৃতিও গতি মারফতেই নির্ণীত হয়।** গতি বাড়িয়ে দিলে কালপরিমাণ কমে যায়, আবার গতিহ্রাসের ফলে কাল-পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কোনো ট্রেন ঘণ্টায় ২০ মাইল বেগে চললে কলকাতা থেকে বর্ধমানে পৌঁছতে ৩ ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু ট্রেনের গতি বাড়িয়ে ঘণ্টায় ৩০ মাইল করা হলে, ঐ কালপরিমাণ ৩ ঘণ্টা থেকে ২ ঘণ্টায় নেমে আসে। এভাবে গতি বাড়িয়ে

দিলে স্থান পরিমাণও বেড়ে যায় এবং গতির হ্রাসে ঐ পরিমাণও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং বোঝা যায় যে, **পদার্থের ঐ গতিপ্রকৃতিই তার দেশ- ও কাল-প্রকৃতিকে নির্ণয় করে দেয়। তাহলে প্রকৃতি (বা ধর্ম) বলতেও আর কিছু নয়, তা ঐ পদার্থের টিকে থাকারই বিশেষ ভঙ্গি মাত্র। অর্থাৎ যে-বস্তু যেভাবে টিকে থাকে, তা'ই তার প্রকৃতি (বা গুণ, বা ধর্ম); কিন্তু সকল বস্তুর মূলেই সর্বব্যাপ্ত অতিসূক্ষ্ম গতিবান পদার্থ। এই গতিবেগ সর্বত্র এক নয়। সে-কারণে বিভিন্ন গতির আবর্তে বিভিন্ন বস্তু ফুটে ওঠে।** উৎপন্ন ঐ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুই আবার নানাভাবে নানা প্রক্রিয়ায় একত্র হয়ে নানাবিধ জটিল ও বিচিত্র বস্তুরাজি সৃষ্টি করে চলে। মূল পদার্থ একটি বিশেষ গতিভঙ্গিতে আবর্তিত বা ঘনীভূত হয়ে হয়ত প্রোটন বা ইলেক্ট্রন নামক প্রাথমিক বস্তুকণিকাদের ফুটিয়ে তোলে। আবার ঐ প্রাথমিক কণিকাগুলি হয়ত বিভিন্ন পদ্ধতিতে সম্মিলিত হয়ে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ প্রভৃতি বস্তুর পরমাণুকে ঘটিয়ে তুলে। তারপর হয়ত হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন পরমাণু একটি বিশেষ ছন্দে বদ্ধ হয়ে জলকণা গড়ে তুলে। এবং এভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বা ধর্ম নিয়ে বস্তুজগতের আবির্ভাব ঘটে উঠে।

সুতরাং **ভর-তেজের সঙ্গে পদার্থ, প্রকৃতি, দেশ** ও **কাল প্রভৃতি পদার্থ-গুণেরই একটি বাধ্যবাধকতা আছে।** তাদের আদি অন্তহীন ধারায় সকল রকমের কণিকা বা সকল রকমের বস্তুরই উদ্ভব ঘটতে পারে। **কিন্তু তাই বলে সেখানে কল্পিত বা অকল্পিত সকল প্রকার বস্তুরই কোনো বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে না।** অ্যান্টি-ইউরেনিয়াম, বা অ্যান্টি-সাইকেল, বা অ্যান্টি-আমেরিকা, বা অ্যান্টি-হিটলার কোথাও ঘটতে পারে হয়ত, কিন্তু তাদের সকলেরই কোনো বাধ্যবাধকতা আছে বলে মনে হয়না। পৃথিবীর দিকে তাকালেই দেখা যায় যে, সেখানে চেতন-বস্তু আছে, অচেতন-বস্তুও আছে। ভরতেজাত্মক অসংখ্য গুণরাজির বিশেষ বিশেষ কতকগুলি গুণের বিচারে ওদের আমরা চেতনা- এবং চেতনাহীনতা-গুণসম্পন্ন তার কোনো বিপরীত বস্তু বলেই মনে করি। কিন্তু একেবারে পুরোপুরি ভর-তেজের পরিমাণের বিচারেই (যেমন আমরা কতকগুলি ভরতেজসর্বস্ব কণিকাকে, অন্য কতকগুলি ভরতেজসর্বস্ব কণিকার বিপরীত-কণিকা—anti-particle বলে গ্রহণ করতে পারি সেভাবে) আমরা চেতনাহীন কোনো বিশেষ বস্তুকে বিপরীত-চেতন কোনো বিশেষ বস্তুর দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখতে পাইনা।

আজ থেকে আঠার দিন পূর্বে পূর্বোক্ত স্টেটস্‌ম্যান কাগজে (২৭।৬।৬৬) আর একটি ছোট্ট সংবাদ বেরিয়েছিল। এ. এফ্. পি.-প্রদত্ত ঐ সংবাদটি তার পূর্বদিনের

নিউইয়র্কের সংবাদ। তাতে বলা হয়েছে যে, ঐ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েরই পদার্থ তত্ত্ববিদ্‌রা আবিষ্কার করেছেন যে,—

> এটা-মেসন নামে একটি বিশেষ নিরপেক্ষ কেন্দ্রকীয় কণিকার ক্ষয়-প্রক্রিয়া থেকে যে ধনাত্মক কণিকার উদ্ভব ঘটে, তা' ঐ একই প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত ঋণাত্মক-কণিকার চাইতে অধিকতর তেজযুক্ত, এবং ক্ষয়স্থান থেকে তা' অধিকতর বেগেই ধাবিত হতে থাকে।

ঘটনাটি সত্য হলে মুকুর-প্রতিসাম্যের তত্ত্ব মিথ্যা হয়ে যায়। অনিবার্য দু'টি প্রতিসম বা হুবহু বিপরীত-কণিকা নিয়েই যে এটা-মেসন কণিকাটির দেহপ্রকৃতি গড়ে উঠেছিল তা আর বলা চলেনা। শুধু বলা যায় যে, একই ভরতেজ বা একই মূলপদার্থ বিভিঃ বিন্যাসের মারফতে ভিন্ন-প্রকৃতি ধারণ করে নিজেকে জানান দিতে পারে। কিন্তু প্রকাশ বৈচিত্র্য ওদের যেমনই হক না কেন, ওদের চিরন্তন প্রকৃতি একই—**ওরা ভরতেজ, ওর পদার্থ, গতিসর্বস্ব দেশকাল-রীতিদেহময় পদার্থ।**

ভর-তেজের দ্বন্দ্বমিলন—পদার্থগতি

চারজনে বসে তাস খেলছি। মন্দিরটি আমার সামনে। আমার খেলোয়াড়-সঙ্গী সেটি দেখতে পাচ্ছেননা, সেটি তাঁর পিছনে পড়েছে। আমার ডাইনে যিনি বসেছেন তিনি কিন্তু দেখছেন মন্দিরটি তাঁর ডান দিকে রয়েছে। আর তাঁর সামনে যিনি বসেছেন, তিনি বলছেন, না, মন্দিরটি তো বাঁ দিকেই। তাহলে আসলে ওটি কোন্ দিকে আছে? সামনে না পিছনে, না ডাইনে কি বাঁয়ে? এ বিষয়ে এমন কোনো চরম বা শেষ সত্য নাই, যার দ্বারা সকলেই যেকোনো জায়গায় যেকোনোভাবে থেকেই বলতে পারেন, ওটি সামনেই আছে, বা ডাইনে। সামনে আছে—এটিই আমার কাছে যেমন সত্য, আমার বামে যিনি বসেছেন, তাঁর কাছে বামে আছে এটিও ঠিক সেই রকমই সত্য। অথচ এবিষয়ে আমাদের চারজনের সকলের পক্ষেই খাটতে পারে এমন কোনো চরম সত্য নেই। সুতরাং ধরা যায় যে, কোনো বস্তুর দিক সম্বন্ধে চরম সত্য বলে কিছু নেই। সত্য এক এক জনের কাছে এক এক রকম।

অথচ মন্দিরের দিক সম্বন্ধে আমার বা তোমার সত্য কি রকম হবে, সেটি আমার বা তোমার অবস্থানের উপরই নির্ভর করছে। অর্থাৎ, আমি কোন্ স্থানে কিভাবে অবস্থান করব তার জন্য আমার ঐ দিক্ সম্পর্কিত সত্যটি অপেক্ষা করে আছে। এখন মন্দিরটি আমার সামনের দিকে আছে বটে, কিন্তু যেইমাত্র আমি উঠে গিয়ে আমার অংশীদার খেলোয়াড়ের স্থান গ্রহণ করব, তখনই মন্দিরটি আমার পিছনের দিকে পড়ে যাবে। যেন এতক্ষণ যাবৎ আমার এই নতুন-অনুভাব্য সত্যটি ঠিক ঠিক রূপ নিতে পারছিলনা, আমার স্থান পরিবর্তনের ফলেই সে একটি নূতন রূপ গ্রহণ করল। সে সত্যটি এতক্ষণ যাবৎ কেবল আমার নূতন অবস্থানের জন্যই অপেক্ষা করে রয়েছিল বলে সেটি একটি আপেক্ষিক সত্য। কিন্তু আমার যেকোনো অবস্থানের পক্ষে সেটি সর্বদা কোনো চরম বা পরম সত্য নয়। মন্দিরের দিক সম্বন্ধে তেমনি অন্যের সত্যটিও তার একটি বিশেষ অবস্থানের জন্য অপেক্ষা করে থাকে বলে তাঁর সম্বন্ধেও সেটিকে একটি আপেক্ষিক সত্য বলতে পারি। মোট কথা দিকগত সত্যটি দ্রষ্টা এবং দ্রষ্টব্য বস্তুর অবস্থানের জন্য অপেক্ষা করে থাকে বলে ওটি একটি আপেক্ষিক সত্য। কিন্তু সকলেরই সর্ব অবস্থানের পক্ষে এ সম্বন্ধে কোনো চরম সত্য নাই বলে সেটি স্থাননিরপেক্ষ কোনো চরম সত্য নয়। সুতরাং, দিক সম্বন্ধীয় সত্যটি স্থানের উপর নির্ভরশীল একটি আপেক্ষিক সত্য মাত্র।

আবার গাছটির ছায়া কোন্ দিকে এবং কোন্ স্থানে গিয়ে পড়বে, তা নির্ভর করছে সময়ের উপর। সকাল ছ'টায় সেই ছায়া একদিকের একস্থানে পড়বে। কিন্তু বিকেল

চারটায় দেখা যাবে তার দিক এবং স্থান দুইই পাল্‌টে গেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শুধু স্থানের ওপর নয়, ঐ দিকটি কোনো নির্দিষ্ট কালের উপরেও নির্ভরশীল। যেমন ঐ ছায়ার পতনস্থানটি কোন্‌টি হবে, তাও অপেক্ষা করে আছে তার সময়ের জন্য। সুতরাং স্থানটিও একটি আপেক্ষিক সত্য বই নয়। এখানে স্থান বা দেশ-গত সত্যটি সময় বা কালের উপর নির্ভরশীল।

কিন্তু কালগত সত্যটিই কি কোন্‌ চরম সত্য? কলকাতায় যখন বেলা বারটা, আমেরিকার কোনো স্থানে হয়ত তখন রাত্রি দশটা। অর্থাৎ যে মানুষটি কলকাতা থেকে বেলা বারটা বাজার সংবাদ ঘোষণা করলেন এবং সে সংবাদ সারা পৃথিবীর লোক জানতে পারল, ঠিক সেই একই সময়ে তাঁরই বন্ধুটি আমেরিকার একটি বিশেষ স্থানে বসে জানিয়ে দিচ্ছেন যে তখন রাত দশটা। সুতরাং কার সময়টি কি হবে, সে সত্যটিও অপেক্ষা করে আছে ঐ ব্যক্তিটির অবস্থানের উপর। তাই বলতেই হয়, কালটিও একটি আপেক্ষিক সত্য। এই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানবাসী বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে যখন একই সময়টি ভিন্ন ভিন্ন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে, তখন কাল সম্বন্ধেও কোনো চরম সত্য নাই। সেও কারও অবস্থান বা স্থান গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। বিশেষ করে এ পৃথিবীতে দেখা যাচ্ছে সূর্যের স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে কালও পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এখানে যদি অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার বিরাজ করত তাহলে কালের কোনো অর্থই আমাদের কাছে ধরা পড়তনা। সুতরাং কালও কোনো চরম সত্য নয়। সেও যখন কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা সূর্যের স্থান গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করে থাকে, তখন সেও একটি আপেক্ষিক সত্য মাত্র। অর্থাৎ কালগত সত্যটিও স্থানের উপর নির্ভরশীল। অথচ কিনা এই স্থানটিও কোনো চরম সত্য নয়, একটি আপেক্ষিক সত্য মাত্র।

বিশেষ করে যখন দেখতে পাই যে, কাল-পরিমাণ বা স্থান-পরিমাণটিও বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন রকম প্রতীয়মান হয়, তখন এদের সত্যের এই আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকেনা। আমার ট্রেনটি ঘণ্টায় ৭০ মাইল বেগে চললে আমার পক্ষে কলকাতা থেকে খড়্গপুর যাওয়ার সময় এক ঘণ্টা লাগে। কিন্তু তোমার ট্রেন যদি ঘণ্টায় ৩৫ মাইল বেগে চলে তাহলে তোমার পক্ষে সময় লাগবে দু' ঘণ্টা। অর্থাৎ একই পথ অতিক্রম করার কাল-পরিমাণটি দু' জনের কাছে দু'রকম। এখানেও কার সত্যটি কি রকম রূপ নেবে সেটি অপেক্ষা করে আছে তার গতির দিকে তাকিয়ে। সুতরাং এটিও একটি আপেক্ষিক সত্য। অর্থাৎ, গতির উপর নির্ভরশীল কালপরিমাণটিও কোনও চরম সত্য নয়।

আবার দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আমি মন্দিরটিকে যত বড় দেখব, এক মাইল দূর থেকে কোনো ব্যক্তি নিশ্চয় তাকে তত বড় দেখবেননা, এমনকি আমিও না। মন্দিরটি কতটা

জায়গা জুড়ে রয়েছে সেটি, অর্থাৎ তার জুড়ে থাকার স্থান-পরিমাণটি দু'জনের কাছে দু'রকম মনে হতে পারে। কার সত্যটি কি হবে, তা অপেক্ষা করে আছে তার দূরত্বের জন্যই। সুতরাং এই দেশপরিমাণটিও আপেক্ষিক সত্য, সে দূরত্বের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। অর্থাৎ, দেশপরিমাণটি দূরত্বের বা স্থানপরিমাণের উপর নির্ভরশীল।

আবার ধরা যাক, আমি দেয়ালটিব সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তার তলের আয়তন পাঁচ শ' বর্গগজের মত মনে হচ্ছে। কিন্তু দেয়ালটি যে রেখাটির উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেই রেখাটিকে কিছুদূর টেনে নিয়ে গিয়ে তার উপরে তুমি দাঁড়িয়ে থেকে একই সময়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলছ, দেয়ালের আয়তন আবার কোথায়, ওখানে তো দাঁড়িয়ে আছে একটি রেখা মাত্র। দেয়ালের বদলে ওখানে ঐ একই সরলরেখার ওপর কতকগুলি খুঁটি পোঁতা থাকলে আমার কাছে ওগুলির সংখ্যা যতই মনে হক না কেন, তোমার কাছে কিন্তু মনে হবে মাত্র একটিই। অর্থাৎ এখানেও স্থানপরিমাণ বা দেশপরিমাণ এবং এমনকি ঐ সংখ্যাপরিমাণও তাদের স্ব স্ব সত্যের কথা যাদের কাছে বলছে, তাদের অবস্থানের উপর নির্ভর করেই ভিন্ন জনের কাছে তারা ভিন্নভাবে কথা বলছে। সুতরাং দেশপরিমাণ এবং সংখ্যাপরিমাণের সত্যও কোনো চরম সত্য নয়। দেশপরিমাণ এবং সংখ্যাপরিমাণও দেশের উপর নির্ভরশীল। ওরাও আপেক্ষিক সত্য মাত্র।

সুতরাং উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি থেকে জানা যাচ্ছে, **দিক, দেশ, কাল, আয়তন** এবং **সংখ্যা** বা **পরিমাণ**—এরা সকলেই আপেক্ষিক সত্য মাত্র। কেউই কোনো চরম সত্য নয়। কোনো সার্বজনীন বা সার্বদেশিক বা সার্বকালিক অনন্যনির্ভব পবম (absolute) সত্য ওরা নয়। ওদেরই এক বা একাধিক বস্তুর উপর নির্ভর করে অন্য একটি বস্তু প্রতীয়মান হচ্ছে। কিন্তু ওদের বস্তু বলা যায় কেমন করে? কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর অনিবার্য গুণ হিসেবে ভর আর তেজ, এই যে দু'টি বস্তুর কথা আমরা জেনেছি, সেই গুণবস্তুত্ব ওদের কারও যে নাই! সুতরাং ওগুলিকে আপাততঃ গুণ না বলে বিষয় বা প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। কিন্তু ওগুলি কোন্ বস্তুর বিষয়, বা কোন্ বস্তুর প্রক্রিয়া? আমাদের হিসাব মত বস্তুমাত্রই যখন ভর-তেজাত্মক, তখন ওগুলি নিশ্চয় ঐ ভর-তেজেরই বিষয় বা ভর-তেজেরই প্রক্রিয়া। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি বলেই ফেলেন যে—বস্তু এবং বিষয়, দু'টিই যখন পৃথিবীর পক্ষে অনিবার্য, তখন ঐ বিষয়গুলির কোনোটিই কোনো বস্তুর নয়, আসলে ভর-তেজাত্মক বস্তুই ঐ উপরোক্ত বিষয়গুলির? বাক্-স্বাধীনতা সকলেরই আছে। কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে ওরকম কথা বলার আগে প্রমাণ করতে হয় যে, ঐ বিষয়গুলি আপেক্ষিক সত্য নয়, ওগুলি অনন্যনির্ভর চরম বা চিরন্তন সত্যই।

কিন্তু সত্যের প্রতি চোখ বন্ধ করে থাকা নাস্তিকের মুখ বন্ধ করারও পূর্বে বস্তু আর বিষয়ের সম্বন্ধটি জেনে নিতেই হয়। নাহলে ঐ অনিবার্য বিষয়গুলিকেও 'মায়া' বলে

উড়িয়ে দেওয়ার সেই একই দায়ে পড়তে হয়,—মায়াবাদী ব্যক্তিরা বস্তুজগৎকেও মিথ্যা মায়া বলে উড়িয়ে দেওয়ার যে দায়ে পড়ে থাকেন।

পূর্ববর্তী একটি দৃষ্টান্তে আমরা দেখেছি যে, কালপরিমাণটি নির্ভর করছে গতির উপর। কিন্তু গতিও কি কারও ওপর নির্ভরশীল? রাত্রিবেলায় হেড্ লাইট জ্বালিয়ে যখন ট্রেনটি ছুটে আসতে থাকে, তখন বহু দূরে সামনে এসে সরলরেখার মত ঐ লাইনটির ওপর দাঁড়ালে ট্রেনের গতিশীল আলোটিকেও স্থির বলে মনে হয়, অথচ ট্রেনে চড়ে যাওয়ার সময় দূরবর্তী স্থিতিশীল বা স্থির বৃক্ষগুলিকেও গতিশীল মনে হয়। আবার ৪০ মাইল বেগের কোনো ট্রেনে বসে থাকলে, ৬০ মাইল বেগের ট্রেনটি যখন পাশ দিয়ে একই অভিমুখে এগিয়ে যেতে থাকে তখন আমাদের অগ্রগতিকেও অন্য ট্রেনটির তুলনায় পশ্চাৎগতি বলেই মনে হয়। অথচ দু'টি ট্রেন একই গতিবেগ নিয়ে পাশাপাশি দু'টি সমান্তরাল পথ ধরে একই অভিমুখে ছুটতে থাকলে এক ট্রেনের জানালা দিয়ে অন্য ট্রেনের আরোহীদের দিকে তাকালে নিজেদের মত তাদেরকেও গতিহীন বা স্থির বলেই ধারণা জন্মে।

প্রথম দৃষ্টান্তটিতে গতিশীল বস্তুকে স্থির এবং তার পরেরটিতে স্থির বস্তুকেও গতিবান মনে হচ্ছে। বৃক্ষগুলিকে যে গতিবেগসম্পন্ন মনে হয়, তার কারণ ট্রেনেরই গতি (গাছের গতি নয়, কারণ, ট্রেনটি দাঁড়িয়ে গেলে গাছগুলিকেও আর গতিবান মনে হয়না)। সুতরাং এখানে বৃক্ষের ঐ আপাতগতিটি ট্রেনের আসল গতির উপর নির্ভরশীল। আবার প্ল্যাটফর্মে থেকে ধীরে ধীরে ট্রেনটির গতির অভিমুখে চলতে থাকলে, বা তার উল্টোদিকে যে কোনো গতিবেগ নিয়ে চলতে থাকলেও যখন একটি চলন্ত ট্রেনকে গতিশীল মনে হয়, অথচ অন্য একটি যানে চড়ে সমান বেগে পাশাপাশি চললে আর তাকে গতিশীল মনে হয়না, তখন বলা যায় যে ঐ ট্রেনের আসল গতিটিও অন্য একটি অল্পতর গতি বা বিপরীত গতির উপর নির্ভরশীল।

উপরোক্ত চারটি দৃষ্টান্তের তৃতীয়টি থেকে জানা যাচ্ছে যে, আপাত পশ্চাৎগতিটিও আসল অগ্রগতির উপর নির্ভরশীল। অথচ শেষ দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাচ্ছে, এক ট্রেনের আরোহী যে অন্য ট্রেনের আরোহীকে স্থির বা গতিহীন দেখেছেন তার কারণ, উভয় ট্রেনেরই একমুখী আসল গতি। তাহলে এখানে আবার দেখা যাচ্ছে, আপাতস্থিতি বা স্থিরতাটিও আসল গতির উপরেই নির্ভরশীল।

এখন উপরোক্ত চারটি নিম্নরেখ পর্যবেক্ষণকে একত্র করা যাক :

১।	আপাতগতি	আসল গতির	উপর	নির্ভরশীল
২।ক	আসল গতি	অল্পতর গতির	"	"
২।খ	আসল গতি	বিপরীত গতির	"	"
৩।	আপাত (পশ্চাৎ) গতি	আসল (অগ্র) গতির	"	"
৪।	আপাতস্থিতি বা স্থিরতা	আসল গতির	"	"

শেষেরটি ছাড়া পূর্ব-লিখিত আর সবগুলি পর্যবেক্ষণ থেকে ধরা যায় যে, গতির প্রকার যেরূপই হক না কেন, তা' অন্য এক প্রকার গতির উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ গতির প্রকারটি কেমন হবে, সে-সত্যটি অন্য এক প্রকার গতি-সত্যের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। সুতরাং গতির এই প্রকারটি নিশ্চয়ই একটি আপেক্ষিক বিষয়। কিন্তু তার প্রকার যাই হক না কেন, সেও যখন গতির উপরই নির্ভরশীল, তখন হয়ত বলা চলে যে, মূলগতিবেগ প্রক্রিয়াটি একটি অনন্যনির্ভর চরম সত্য।

কিন্তু একটি লোক যদি বাস্তবিকই প্ল্যাটফর্মের উপর স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে সেও তো চলন্ত ট্রেনটিকে গতিশীল দেখবে, অথচ সে যদি ঐ ট্রেনের সমবেগ সম্পন্ন কোনো যানে চড়ে পাশাপাশি থেকে সমান্তরাল কোনো সরলরেখার উপর দিয়ে একই অভিমুখে ধাবিত হতে থাকে, তাহলে তখন আর ঐ ট্রেনটিকে তার গতিশীল মনে হবেনা। সুতরাং এ থেকেও পূর্বের মত বলা যেতে পারে যে এখানে ট্রেনের ঐ আসল গতিটি অন্য একটি আসল স্থিতির উপরই নির্ভরশীল। সুতরাং প্রশ্ন হতে পারে যে, গতিও কি তাহলে কোনো আসল স্থিতির বা স্থিরতার উপরে নির্ভরশীল ?

চতুর্থ পর্যবেক্ষণটি কিন্তু বলে দিচ্ছে যে, আপাতস্থিতিটিও আসল গতির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, স্থিতি বা স্থিরতার সত্যটিও কি দু'রকমের ? একটি আসল এবং অন্যটি আপাতপ্রতীয়মান ? আসল স্থিতি বলে যদি কিছু না থাকে, সর্বপ্রকার স্থিতি বা স্থিরতাই যদি আপাতপ্রতীয়মান স্থিতি হয়, তাহলেই নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারবে যে, প্রকারভেদ নির্বিশেষে গতি একটি চরম সত্য বটে। কারণ একটি গতি অন্য একটি গতির উপর নির্ভরশীল হলেও সে চরম স্থিতির অর্থাৎ দ্বিতীয় কোনো চরম সত্যের উপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং দেখে নিতে হয় স্থিতি বা স্থিরতাও একটি আপেক্ষিক সত্য কিনা।

দু'টি ট্রেন যখন একই গতিতে দু'টি সমান্তরাল পথ ধরে একই অভিমুখে চলতে থাকে, তখন একের আরোহী কিন্তু অন্যের আরোহীকে স্থিতিবান বা গতিহীন বলেই মনে করেন। ওঁদের গতিটি কেবল ধরা পড়ে প্ল্যাট্‌ফর্মের অর্থাৎ ট্রেন বহির্ভূত ব্যক্তির নিকট। কিন্তু প্রথমে ট্রেনগুলিকে চলে যেতে দেওয়া হক। তারপর ওরা চলে গেলে কী দেখা যায় ? ১ নম্বর প্ল্যাট্‌ফর্মের দণ্ডায়মান বা স্থির ব্যক্তিটি তখন দেখতে পান যে, ২ নম্বর প্ল্যাট্‌ফর্মের বন্ধুটিও পূর্বের মতই স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। কেন ওরকম দেখবেন ? আমরা যখন নিশ্চিতভাবে জানি যে, পৃথিবীও গতিশীল, তখন নিশ্চয় দু'টি প্ল্যাট্‌ফর্মের দু'টি ভদ্রলোক বন্ধুও তো পৃথিবীর সঙ্গে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছেন। ঐ দু'টি চলন্ত ট্রেনের দু'টি যাত্রীর মত এঁরাও গতিবান হওয়া সত্ত্বেও দু'জনে দু'জনকে স্থির দেখতে পান কেন ? উত্তরটি খুব কঠিন নয়। যে দু'টি বিন্দুতে এঁরা অবস্থান করছেন, সে দু'টি বিন্দুও সমান্তরাল

সরলরেখা ধরে প্রতি মুহূর্তে একই গতিতে এক অভিমুখে ছুটে চলেছে বলেই ওরকমটি মনে হচ্ছে। সুতরাং এঁদের ঐ আসল স্থিতিও একটি আপাত প্রতীয়মান সত্য মাত্র। এ সত্যটিও অপেক্ষা করে আছে তিনটি শর্তের দিকে তাকিয়ে। সেগুলি হচ্ছে—(১) সমান্তরাল গতি, (২) সরলরেখায় গতি, (৩) প্রতি মুহূর্তে একই অভিমুখে সমান (equal) ও সম (uniform)-গতি। ট্রেন দু'টির ব্যাপারেও দেখুন, ঐ তিনটির একটিরও এতটুকু এদিক ওদিক করে দিলে ঐ স্থিতি বা স্থির ভাবটি আর বজায় থাকেনা। সুতরাং স্থিতির অর্থই দাঁড়িয়ে যায় একের তুলনায় অন্যেরও সমান্তরাল সরলরৈখিক একমুখী সমান ও সমগতি। তাহলে স্থিতিটিও নির্ভর করছে এক শর্তাধীন বিশেষ প্রকারের গতির উপর। অথচ পূর্বে আমরা দেখেছি যে, গতির প্রকারটি একটি আপেক্ষিক সত্য মাত্র। তাই বলতেই হয় যে, গতিপ্রকার জনিত আপেক্ষিক সত্যের উপর নির্ভরশীল স্থিতিটিও আপেক্ষিক সত্য মাত্র। বিশেষ করে এই দৃষ্টান্তে যখন দেখা যাচ্ছে যে এখানে স্থিতিটি এক বিশেষ প্রকার গতিরই নামান্তর মাত্র।

কিন্তু পৃথিবী না হয় চলছে। এমন তো হতে পারে যে, কোনো একটি বিশেষ গ্রহ আকাশের কোথাও স্থিরভাবেই দাঁড়িয়ে আছে! সেখানকার দু'টি প্ল্যাটফর্মের দু'জন লোকের স্থিরত্ব নিশ্চয় উক্ত প্রকার সমগতির উপর নির্ভর না ক'রে তাদের চরম স্থিতির উপরই নির্ভর করছে! সেখানকার ট্রেনটিকে হয়ত সেই চরম স্থিরতার তুলনায় গতিবান বলে মনে হয়! কিন্তু কোনো গ্রহ যে কোথাও স্থিরভাবে বসে আছে, তা প্রমাণ করাই সম্ভব নয়। কারণ, গতির মধ্যে প্রকারভেদ বা পরিবর্তনশীলতা আছে বলেই এক প্রকারের গতি দিয়ে অন্য প্রকারের গতিকে সনাক্ত করে দিতে পারি। কিন্তু স্থিতি বা স্থিরতা সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা, তা বাস্তবে একটি গতির তুলনায় পূর্বোক্ত প্রকারের অন্য একটি সমান ও সমগতির ধারণাই। সুতরাং পৃথিবী নিজে গতিবান থাকায় তার উপরিস্থিত যেসকল বস্তু অন্য কোনো শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে একমাত্র পৃথিবীর গতির দ্বারাই চালিত হয়ে চলেছে, তারা প্রত্যেকেই একমুখী, সমান ও সমগতিসম্পন্ন বলে তাদের প্রত্যেকের কাছেই প্রত্যেকে স্থির বস্তু, যদিও আসলে ওরা পৃথিবীর মতই গতিশীল। সুতরাং পার্থিব গতির বলে আমরা নিজেরাই অস্থির থাকায় অন্য একটি বস্তু চরমভাবে স্থির হয়ে আছে একথা উপলব্ধি করতে পারিনা। বরঞ্চ, পৃথিবী থেকে যাকেই আমরা দীর্ঘকাল যাবৎ গতিহীন বা স্থির মনে করব, বুঝতে হবে যে সে পৃথিবীর মতই একই অভিমুখের যাত্রী, সমান ও সমগতিসম্পন্ন।

দেখা যায় যে,—আমরা যদি আমাদের ব্যক্তিগত গতিবিধি থেকে সেই তুলনায় অন্য একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত নতুন জিনিসের গতিবিধি সম্বন্ধে ধারণা করতে যাই, তাহলে তা

ভ্রান্ত হয়। তাছাড়া, আমাদের ধারণাগুলিও কি সব সময় ঠিক থাকে নাকি? পাঁচ হাত দূর দিয়ে কোনো ট্রেন ৫০ মাইল বেগে ছুটে গেলে মনে হয় ঐ ট্রেনটি কী জোরেই না ছুটে চলেছে। অথচ দু' মাইল দূর দিয়ে ১০০ মাইল বেগে বিমান উড়ে গেলেও তাকে ধীরগতি মনে হয়। আবার একই ব্যক্তি হিসাবে যদি ট্রেনটিকে দু'মাইল এবং প্লেনটিকে সিকি মাইল দূর থেকে দেখা যায়, তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রতীতি ঘটে। সুতরাং দ্রুততা বা ধীরতার ধারণাটিই একটি আপেক্ষিক বিষয়। ভিন্ন জনের কাছে, বা ভিন্ন স্থান কালে অর্থাৎ ভিন্ন অবস্থায় একজনের কাছেই তার ভিন্ন ভাব। তবে যদি গতিবেগের মাপ সংক্রান্ত এমন কোনো একক পাওয়া যায়, যা সর্বাবস্থাতেই সুনির্দিষ্ট এবং সকলের কাছেই তা' এক, তাহলে অবশ্য সেই একক দিয়ে অন্য সব বস্তুর দ্রুততা বা ধীর গতিটি মেপে একটি সার্বজনীন সত্যে পৌছান যায়। আমরা দেখেছি যে, শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গ বা আলোর গতিবেগটি যে পার্থিব অন্য সকল প্রকার গতিবেগের চাইতে বেশি, কেবল তাই নয়; এটি একটি অনন্যনিরপেক্ষ সুনির্দিষ্ট গতিবেগ। তার পরিমাণ সেকেণ্ডে ৩ লক্ষ কি. মি. (বা ১,৮৬০০০ মাইল)। সুতরাং এই বেগটিকে গতিবেগ পরিমাপের একটি আদর্শ একক বলে নিঃসন্দেহে ধরা চলে।

আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ (special theory of relativity) অনুযায়ী আমরা জেনেছি (পৃ. ২২২-২৭), $E=mc^2$, বা, $E/m=c^2$। c-সংখ্যাটি আলোকের গতিবেগকে প্রকাশ করছে এবং এই গতিবেগ নির্দিষ্ট। সুতরাং c^2 সংখ্যাটিও একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা। অর্থাৎ কোনো বস্তুর স্থির অবস্থার তেজ (E) এবং তার স্থির অবস্থার ভরের ভাগফলটি একটি সুনির্দিষ্ট সংখ্যা। সুতরাং এই দু'টির মধ্যে একটির বৃদ্ধি ঘটলে অন্যটিরও বৃদ্ধি ঘটতে বাধ্য। নাহলে ভাগফলটি নির্দিষ্ট সংখ্যা (c^2) থাকেনা, শুধু তাই নয়। একটির যতগুণ বৃদ্ধি ঘটে, অন্যটিরও ততগুণ বৃদ্ধি ঘটবে (তবেই উভয়ের ভাগফলটি সুস্থির বা সুনির্দিষ্ট থাকা সম্ভব হয়)। ঐ স্থির তেজ বা আসল তেজটিকে গতিতেজ বা অন্য কোনো তেজে পরিণত করলেও একই ব্যাপার ঘটবে। এ থেকে বোঝা যায় যে, কোনো বস্তুর গতিতেজ বা তাপতেজ বেড়ে গেলে তার স্থিতিভরটিও (m—rest mass) বেড়ে যায়। গতিবেগ বাড়লে, যত নগণ্য পরিমাণেই হক না কেন, তার ভরও বেড়ে যাবে। বিষয়টি অন্যভাবেও বুঝতে পারা যায়। গতিবেগ বাড়তে থাকলে একটি বস্তু তার নিজেরই গতি-বিবর্ধক শক্তি বা বলকে ক্রমাগত বাধা দিতে চায় বলেই বস্তুটিকে তখন অধিকতর বেগসম্পন্ন করতে হলে তার উপর অধিকতর বহির্বল প্রয়োগ করার দরকার হয়। কিন্তু পার্থিব বলের সীমা আছে। তা না হলে কোনো বস্তুকে বল-প্রয়োগে আলোকের চাইতে বেশি বেগসম্পন্ন করা যাবেনা কেন? অপার্থিব বা অলৌকিক কোনো বল যদি অসীম হয়ে থাকে বলেও কল্পনা করা যায়, সে আর যেখানেই যেমন থাক না কেন,

এ পৃথিবীতে সে দুর্বল বা বলহীন। কিন্তু সে সব তো দূরের কথা, আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী কোনো স্থির বস্তুকে আলোকের সমান বেগসম্পন্ন করাও সম্ভব নয়। তা করতে গেলে বস্তুটি বাড়তে বাড়তে অসীম হয়ে উঠবে। কিন্তু বস্তু অসংখ্য, এবং অসংখ্য বস্তু থেকে অসংখ্য অসীম পাওয়া যেতে পারেনা। একটিমাত্র বস্তুই অসীম—সেটি এই বিশ্ব। হিসাবে দেখা যায়, পৃথিবীতে যে রকেটের ওজন ১০০ কি. গ্রা, সেকেণ্ডে ১১ কি. মি. বেগে চললে তার ভর ·৩৫ মিলিগ্রাম বেড়ে যায়। কিন্তু ঐ বেগ ১১ থেকে ২½ লক্ষ কি.মি -এ উঠে গেলে বর্ধিত ভরটি মূলভরের দ্বিগুণের চাইতেও বেশি হয়ে যাবে। তারপরও বেগ বাড়তে থাকলে ভেল্কি বা ভোজবাজি লেগে যাবে। অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটে উঠবে। গতিবান বস্তু যত ক্ষুদ্রই হক না কেন, তার গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে ভর প্রবেশ করতে থাকে। এমন কি, অতিক্ষুদ্র ইলেকট্রনরূপ অতিকণিকার ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যত্যয় নাই। তবে কোনো বস্তুর বা কোনো ইলেকট্রনের ঐ দেহ-কাঠামোতে বিদ্যুচ্চৌম্বক মূলপদার্থ বা ভর প্রবেশের একটি সীমা আছে। আলোবেগের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ গতিবেগ প্রাপ্ত হলে কণিকার গতিতেজ তখন তার আসল তেজের সঙ্গে সমান হয়ে উঠে। তখন হঠাৎই তার মধ্যে গুণগত পরিবর্তন দেখা দেয়, তার তরঙ্গ বা ক্ষেত্রধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। তার সমগ্র সত্তার মধ্যে তখন এক বিপ্লব বা হঠাৎ প্রায় আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। তার সংগৃহীত তেজ শুধু নয়, তার নিজস্ব আসল তেজটিও ক্ষেত্রের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যায়। গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে তার ঐ যে ভরবৃদ্ধি, সে যেন তার এক প্রকৃতি প্রদত্ত প্রেরণা,—ব্যক্তিসত্তাকে সে সর্বপ্রযত্নে টিকিয়ে রাখতে চায়। কিছুতেই সে তার ব্যক্তিসত্তাকে পরিত্যাগ করবেনা। তার আসল বা নির্দিষ্ট তেজসত্তার কোনো প্রকার নবসন্নিবেশের বিরুদ্ধেও সে রুখে দাঁড়াবে। তার ক্ষেত্রাবলুপ্তির পূর্ব মুহূর্তে তাই তার রোধটিও এমন প্রচণ্ড হয়ে উঠে।

একমাত্র আলোর গতিই তাই চিরস্থির। সুতরাং আমাদের প্রাত্যহিক সময়ের জ্ঞানটি যখন দিন-রাত্রি বা পৃথিবীর আহ্নিক গতি দেখে, এবং মাস বা ঋতুর জ্ঞানটি যখন তারই বার্ষিক গতি দেখে নির্ণীত হয়, বা, পৃথ্বীগতি রূপ কোনো অতি-সামান্য গতিশীল বস্তুর অত্যন্ত পরিমিত গতির সঙ্গে তুলনা করেই আমাদের সময় বা কালবোধটি উদ্দীপ্ত হয়ে থাকে, তখন সর্বাধিক বেগযুক্ত অতি-বিপুল আলোগতি সম্পন্ন কোনও সত্তার নিকট সময়ের কোনো অনুভূতিই থাকতে পারেনা। আর সেইজন্যই সেই অবস্থায় সে চিরস্থির, কাল তার কাছে স্তব্ধ। আপেক্ষিক তত্ত্ব তাই প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে, বাস্তবিকই যে-বস্তু যত বেগবান হতে থাকে, কালও তার কাছে তত সংকুচিত হয়ে আসে, তার ঘড়িটিও ততই স্লো হয়ে যায়। শেষে আলোগতি সম্পন্ন হলে সে বস্তু একেবারেই থেমে যায়। সুতরাং আলোগতি অপেক্ষা কিছু অল্পবেগ সম্পন্ন ফোটন-রকেটে করে কেউ যদি তার ঘড়ি

অনুযায়ী মাত্র দু'বছর বিশ্ব-পরিভ্রমণ করে ফিরে আসেন, তিনি ফিরে এসে দেখবেন যে তাঁর বন্ধুরা হয়ত তখন তাঁদের ঘড়ি অনুযায়ী চলতে চলতে অতিবৃদ্ধ হয়ে গেছেন, বা তিনি হয়ত অনেকের মুখ আর দেখতে পাবেননা, বা যাঁদের দেখবেন, তাঁরা তাঁকে চিনবেননা।

আলোর (বা বিদ্যুতের) গতি সেকেণ্ডে ৩ লক্ষ কি. মি.। প্রথমত, এত গতি আর কারও নাই। দ্বিতীয়ত, চলতে চলতে জল কাচ বা কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমের মধ্যে পড়ে গেলে আলোর গতিবেগ হ্রাসপ্রাপ্ত হলেও ঐ মাধ্যম পেরিয়ে যাওয়া মাত্রেই সে আবার সেকেণ্ডে ৩ লক্ষ কি. মি. গতিবেগ নিয়েই ধাবিত হতে থাকে। তৃতীয়ত, অল্পবেগ হলেও শব্দের এই পরবর্তী গুণটি থাকা সত্ত্বেও তার গমনের জন্য যেমন বায়ু জল প্রভৃতি কোনো পরিচিত মাধ্যমের দরকার হয়, আলোর তা হয় না। [একটি বদ্ধ কাচপাত্রের মধ্যে যদি একটি বিজলিবাতি জ্বলতে থাকে এবং একটি বিজলি ঘণ্টাও বাজতে থাকে, তাহলে সেখান থেকে যন্ত্রের সাহায্যে বাতাস টেনে নিতে থাকলে দেখা যায় যে, মাধ্যম বিহীন হওয়ায় ঘণ্টার শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে বিলীন হয়ে যায়, অথচ সেখান থেকে আলোরশ্মি সমান ভাবেই বেরিয়ে এসে আমাদের চোখে লাগতে থাকে।] অর্থাৎ বুঝতে পারা যায় যে, **আলো-বিচ্ছুরণ প্রক্রিয়াটি একটি অনন্যনির্ভর স্বয়ংক্রিয়া ব্যবস্থা।** কিন্তু যেহেতু আমাদের পূর্বচিন্তা (পৃ. ৪১৪) অনুযায়ী, পদার্থবিহীন শূন্য স্থান বলে কিছু নেই, তখন ধরে নিতে হয় যে, আলোই সেই ভর-তেজাত্মক মূল পদার্থের একটি প্রাথমিক প্রকাশমান সত্তা বিশেষ। বা, আমাদের এই পৃথিবীতে ভর-তেজাত্মক সেই **মূল পদার্থের একটি প্রাথমিক প্রকাশমান রূপই এই আলো** (তুলনীয়, পৃ. ৪৩২)। কিন্তু আমরা যা বলছিলাম, আলোর গতিবেগের সুনির্দিষ্টতার কথা,—অন্য গতির তুলনায় সেটি কিরকম থাকে ?

ধরা যাক একটি ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার আলো জ্বালালেন এবং শেষ কামরা থেকে গার্ড্ তা দেখতে পেলেন। কিন্তু জ্বালাবার কতক্ষণ পরে তিনি ঐ আলোটি দেখতে পাবেন ? সেকেণ্ডে ৩ লক্ষ কি. মি. বেগে ধাবিত হলে ট্রেনের দৈর্ঘ্যটুকু অতিক্রম করতে যত সময় লাগে ততক্ষণ পরেই। আবার গার্ড্ সাহেব আলো জ্বালালেও ড্রাইভার সাহেব ঐ একই সময় পরে আলো দেখতে পাবেন। কিন্তু ট্রেনটিও যদি সেকেণ্ডে ২ লক্ষ কি. মি. বেগে ছুটে চলে তাহলে অনুমান করা চলে যে, প্রথম ক্ষেত্রে সময় লাগে আরো কম। কারণ আলোরশ্মি গার্ড্ সাহেবের কাছ পর্যন্ত যেতে যেতে গার্ড্ সাহেবও ততক্ষণে আলোর দিকে অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়েছেন। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে গার্ডের বা ট্রেনের গতিবেগ আলোর বেগকে সাহায্য করায় আলোকের গতিবেগ হয়ে গেছে সেকেণ্ডে (৩ লক্ষ+২ লক্ষ=) ৫ লক্ষ কি. মি.। কিন্তু গার্ড্ সাহেব আলো জ্বালালে ড্রাইভার

সাহেব অত তাড়াতাড়ি সে আলো দেখতে পাবেননা। কারণ, সেক্ষেত্রে আলোরশ্মি সেকেণ্ডে ৩ লক্ষ কি. মি. বেগে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ড্রাইভারও সেকেণ্ডে ২ লক্ষ কি. মি. বেগে এগিয়ে যাচ্ছেন। ফলে আলোর মোট গতিবেগ এখানে হয়ে দাঁড়াবে (৩ লক্ষ —২লক্ষ=) ১ লক্ষ কি. মি./সেকেণ্ড। কিন্তু আলোর গতি যে এই দু'বার দু'রকম হল, তার কারণ বোঝা যাচ্ছে, নিশ্চয় ঐ ট্রেনেরই গতি। অর্থাৎ নিশ্চল ট্রেনটিতে দু'দিকেই আলোর গতি এক হওয়া সত্বেও গতিবান ট্রেনে তার গতি দু'দিকে দু'রকম হল। এ থেকেই ধরা যেতে পারে, এমন যদি কোনো জায়গা খুঁজে বার করা যায়, যেখানে আলোর গতি চতুর্দিকেই সমান, তাহলে সে জায়গাকে নিশ্চয় স্থির জায়গা বলা যাবে। আর তাহলে চরম স্থিরতার তত্ত্বটিও তাতে প্রমাণিত হয়ে যাবে।

আমরা দেখেছি (পৃ. ১৭৫), ১৮৮৭ খ্রী.-এ মাইকেলসন এবং মর্লে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করলেন যে আমাদের এই পৃথিবীর উপরেই আলোর গতি চতুর্দিকে সেকেণ্ডে ৩ লক্ষ কি. মি.। অথচ এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে, পৃথিবী ভ্রাম্যমাণ [সেকেণ্ডে ৩০ কি. মি. বেগে সে সূর্যের চারদিকে ঘুরে চলেছে। তার নিজের অক্ষের চারদিকেও সে সেকেণ্ডে প্রায় ½ কি. মি. গতিবেগ নিয়ে ঘুরছে। তাহলে পৃথিবীর গতিটি ট্রেনের গতির মত সরলরৈখিক গতি নয় বলেই কি এরকমটি সম্ভব হচ্ছে? কিন্তু তাও কি করে বলি? পৃথিবীর যে দু'টি বিন্দুর মধ্যে আলোকের গতিবেগ নির্ণয় করা হয়, তার মধ্যবর্তী দূরত্ব অতিক্রম করতে আলোরশ্মির যে সময় লাগে, তা ১ সেকেণ্ডের লক্ষ লক্ষ ভাগের ভাগ মাত্র। সেই অত্যল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবী তার বিপুল কক্ষপথের পরিধির উপর দিয়ে যে অতি সামান্য পথটুকু এগিয়ে যায়, তাকে সরলরেখা বললে এমন কিছুই এসে যায়না। তার নিজ অক্ষের চতুর্দিকে ঘুরতে থাকায় ঐ সেকেণ্ডে ½ কি. মি. গতিবেগটি আলোর গতির তুলনায় এত নগণ্য যে তাকেও এক্ষেত্রে সহজেই বাদ দেওয়া যেতে পারে।]। সুতরাং আমাদের পূর্বোক্ত অনুমানটি ভ্রান্ত। ট্রেন বেগে ছুটে চললেও গার্ড্ সাহেব বা ড্রাইভার সাহেবের কাছে আলোরশ্মি পৌছতে সময় লাগবে একই। সুতরাং কোনো জায়গায় আলোরশ্মি চতুর্দিকে সমান বেগে ছুটে চললেও জায়গাটি ভ্রাম্যমাণ বা গতিবান হতে পারে। তাহলে পূর্বোক্ত চরম স্থিরতার তত্ত্বটিকেও আর টিকিয়ে রাখা যায়না। আলোর গতির তুলনায় পৃথিবী চিরস্থির নয়, তার স্থিরতা একটি আপেক্ষিক সত্য মাত্র। সুতরাং পৃথিবী বা অন্য যেকোনো গতির তুলনাতেও আলোর চরম স্থিরত্ব কল্পনা করা চলেনা। অথচ এ কথা আমরা বলতে বাধ্য যে, পৃথিবী বা অন্য যেকোনো গতির তুলনাতেও তার গতিবেগটিই চিরস্থির। তাই **আলোকের গতিবেগ অন্য সকল প্রকার গতিবেগ [বিশেষে একটি চরম সত্য**। কিন্তু চিরস্থিতি বা চরম স্থিরতার তত্ত্ব যদি না টেকে, তাহলে আমাদের ৪২১ পৃষ্ঠার বিবেচনা অনুযায়ী কোনো চরম স্থিরতার

উপর নির্ভরশীল নয় বলেই সাধারণ ভাবে **গতিকেও তাই একটি চরম সত্য বলেই মেনে নিতে হয়।** এমন কি, আলোকের গতি ব্যতিরেকে অন্য যেকোনো বিশেষ প্রকারের গতির সত্য আপেক্ষিক সত্য মাত্র হলেও।

আবার ওদিকে সাধারণভাবে স্থিরতার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা একই প্রকার বলেই স্থিরতাকে একটি চরম সত্য বলে মনে হয় বটে। কিন্তু স্থিরতারও বিভিন্ন প্রকার ভেদ আছে এবং তারা সবই গতির প্রকারের উপর একান্তভাবেই নির্ভরশীল। সেই কারণেই গতির প্রকার পরিবর্তনের সঙ্গে স্থিতিরও প্রকারটি পালটে যেতে পারে। যেমন পূর্বোক্ত শর্তাধীনে ৩০ মাইল বেগে দু'টি ট্রেন চলতে থাকলে আরোহীদের মনে পারস্পরিক স্থিতি বা স্থিরতা সম্বন্ধে যে রকম ধারণার সৃষ্টি হয়, ৬০, ১০০, বা ১০০০ বা অন্য যে কোনও সমান ও সমবেগ নিয়ে তারা সরলরেখা ধরে সমান্তরাল ভাবে একই অভিমুখে চলতে থাকলেও আরোহীদের মনে স্থিতি বা স্থিরতা সম্বন্ধীয় সেই একই ধারণার সৃষ্টি হয়। সুতরাং স্থিতি বা স্থিরতাও এক রকমের নয়, বহু প্রকার। আর তাদের ঐ প্রকারভেদটিও নির্ভর করছে গতিরই প্রকারভেদের উপর। সুতরাং তৎসংক্রান্ত সত্যটি গতির প্রকারভেদের জন্যই অপেক্ষা করে থাকে বলে **সর্বপ্রকার স্থিতিসত্যও আপেক্ষিক সত্য মাত্র।** আবার স্থিতি-বিভিন্নতার দ্বারা স্থিতির মধ্যেও (এক স্থিতি থেকে অন্য প্রকার স্থিতির ঘটনে) যে পরিবর্তনশীলতা প্রমাণিত হয়, তা সম্পূর্ণতই গতিপরিবর্তনশীলতার জন্যই। সুতরাং সমগ্র বস্তুজগতের অস্তিত্ব বা অবস্থান সম্বন্ধীয় আমাদের যে দু'টিমাত্র প্রতীতি বা বোধ (গতি ও স্থিরতার বোধ), তাদের মধ্যে প্রথমত বা প্রত্যক্ষভাবে গতির, এবং দ্বিতীয়ত বা পরোক্ষভাবে স্থিরতার, এই উভয়েরই পরম বা শেষ নির্ভর স্থল ঐ পরিবর্তনশীলতা ব'লেই ঐ পরিবর্তনশীলতার সত্যটিও কোনো আপেক্ষিক সত্য হতে পারেনা। তাই এ পৃথিবীতে **পরিবর্তনশীলতাও একটি চরম সত্যই।** আর এই **পরিবর্তনশীলতার অর্থেই গতিও একটি চরম সত্য।**

কিন্তু গতির কারণ সম্বন্ধে অ্যারিস্টটল বলেছিলেন (পৃ. ৭) যে, কোনো বস্তুর উপর শক্তি প্রয়োগ করলেই তবে সে গতিবান হয়, কিন্তু সে-শক্তির প্রভাব ফুরিয়ে গেলেই সেখানে গতিও আর থাকেনা। ক্যাথলিক গির্জা এ মতকে লুফে নিয়ে প্রায় দু' হাজার বছর যাবৎ এই বলে পৃথিবী শাসন করেছিল যে, তাহলে জগতে সর্বপ্রকার গতি বা ক্রিয়ার পশ্চাতে এক অদৃশ্য শক্তি বিরাজমান। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কিছু করতে পারেনা। কারো কিছু করাও আহাম্মকি। তবে তাঁর ইচ্ছাটি যে কি, তা জানে একমাত্র ঐ ক্যাথলিক গির্জাই। সুতরাং যাকে যা কিছু করতে হবে, তা ঐ গির্জার অনুশাসন মেনেই। তাতেই চরম শান্তি, পরম প্রাপ্তি,—তাতেও যদি কোনো কিছুকে অশান্তি বা অপ্রাপ্তি বলে মনে হয়, তাহলে সেটি শুধু ভ্রান্তি, ভুলের পাপের জন্য গির্জার

বিধান অনুযায়ী শাস্তি মাথায় পেতে নিতে হবেই।—প্রায় দু' হাজার বছর পরে গ্যালিলিও কিন্তু নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করলেন যে, গতি থেমে যেতে পারে কেবল মাত্র বাধা (friction) পেলেই। বাধা না পেলে গতিবান বস্তু চিরকালই এগিয়ে চলতে থাকে। চলন্ত বস্তু যে চিরকাল ধরে চলতে পারে, তা আমরা বুঝতে পারি এই দেখে যে, কোনো জায়গার উপর কোনো বলকে গড়িয়ে দিলে সে কতক্ষন গড়িয়ে চলবে তা নির্ভর করে বলের নিজের অঙ্গ (বস্তুভেদে কর্কশ বা মসৃণ অঙ্গ) এবং যার উপর দিয়ে (ভূমি বা কাচের মত অন্য কোনো শক্ত মসৃণ বস্তু ইত্যাদি) এবং যার মধ্য দিয়ে (ঘন বা হাল্কা বাতাস ইত্যাদি) সে গড়িয়ে চলেছে তাদের সকলের বাধাদানের উপর। বাধা কম হলে গড়িয়ে চলার সময়টি অনেক বেড়ে যায়। আবার চলন্ত বস্তু যে চিরকাল ধরে চলতে পারে, তা আমরা প্রত্যক্ষ করছি বাধাহীন গতিতে শূন্য মার্গের মধ্য দিয়ে স্পুৎনিককে ছুটে যেতে দেখে। তবে গতিবেগ না থেমে যাওয়া সম্বন্ধে বল বা স্পুৎনিক যাই বলুক না কেন, উভয় ক্ষেত্রেই আমরা দেখি যে, তার কারণ সম্বন্ধে অ্যারিস্টট্লের কথাই বুঝি ঠিক হয়ে যায়! দু'টি ক্ষেত্রেই নিক্ষিপ্ত বস্তুতে কেউ না কেউ একটি প্রাথমিক বেগ সঞ্চার করে দেন।

কিন্তু আবার সেই চলন্ত ট্রেনের দৃষ্টান্তে ফেরা যাক। আমরা জানি ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে যে ট্রেনটি ছুটে যাচ্ছে, তার কামরার মধ্যে বসে একটি বলকে একটু উপরের দিকে ছুড়ে দিলে কামরার ছাদের কাছ থেকে সে আবার হাতেই ফিরে আসে। অথচ উপরে উঠে আবার হাতে ফিরে আসতে তার যে সময় লাগে, ততক্ষণে ট্রেনটি হয়ত ৬০ গজ এগিয়ে যায়। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, বলটির প্রায় দু' সেকেণ্ড্ যাবৎ শূন্যমার্গে উত্থান-পতন কালে সে নিজেও ঐ ট্রেনের সঙ্গে ৬০ গজ এগিয়ে যায়। কিন্তু কেন? বলটি তার উত্থান-পতনের গতিবেগ পায় নিশ্চয়ই আরোহীর কাছ থেকে। কিন্তু ৬০ গজ এগিয়ে যাওয়ার গতিবেগ তাকে দেয় কে? ট্রেনের (তথা আরোহীর) সঙ্গে গতিবেগের মিল দেখে উত্তর দেওয়া যায়, ঐ ট্রেনটিই (বা গতিবান আরোহী) ওকে সেই গতিবেগ দিয়েছে। কিন্তু ট্রেনটিকে গতি দান করছে তো ইঞ্জিন বা জলীয় বাষ্প, সেই বাষ্পের সঙ্গে এই বলের সম্পর্ক এল কোথা থেকে?

সুতরাং অ্যারিস্টট্লের সিদ্ধান্তকে নির্ভুল বা অভ্রান্ত বলা যায় কি করে? কিন্তু এরকমের অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখে একথা বলা চলে, কোনো বস্তু যে-কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করতে থাকে সে যেন অনিবার্যভাবেই সেই কাঠামোর আবেগটিও লাভ করে থাকে। সেই কাঠামোটিকে তার জাড্য-পিঞ্জর বা আবেগ-পিঞ্জর বলা চলে। গতিশীল পৃথিবীর জাড্য-পিঞ্জরে থেকে আমরাও সেই পৃথিবীর গতিবেগ পেতে বাধ্য। উড়োজাহাজ তার মনুষ্য-প্রদত্ত শক্তির দ্বারা দূর আকাশের মধ্যে (আপেক্ষিকভাবে স্থির বা গতিসম্পন্ন) যে-কোনো প্রকার অবস্থায় থাকুক না কেন, পার্থিব পিঞ্জরে বা তার আওতায়

মধ্যে থাকার জন্ত স্বয়ং পৃথিবীই তাকে সমান গতিতে টেনে নিয়ে চলেছে। পৃথিবীর বেগ তার মধ্যে অনিবার্যভাবেই সংক্রমিত। তবে কোনো বস্তুকে তার ঐ প্রভাবশালী আবেগ-পিঞ্জরটি (inertial frame) থেকে দূরে সরিয়ে দিলে তখন তার ওপর তার পরবর্তীকালীন অবস্থান-ক্ষেত্রের প্রভাব এসে পড়লে সে তখন তার পূর্ববর্তী পিঞ্জরের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে। ট্রেনের মধ্যে যে বলটি ট্রেনটির গতি লাভ করছে, তাকে জানলা দিয়ে পাশের দিকে বা উপরের দিকে একটু জোরে ছুড়ে ট্রেনের প্রভাবের বাইরে পাঠিয়ে দিলে তখন আর ট্রেনের গতিটি তার ওপর নিজের আবেগটিকে সংক্রমিত করে দিতে পারেনা। কিংবা, গতিবান ট্রেনের আরোহী ও স্থিতিবান (পৃথিবীর তুলনায়) প্ল্যাট্ফর্মের অপেক্ষাকারী ব্যক্তি দু'জনে যদি একই রকমের দু'টি বল নিয়ে প্রায় একই জায়গায় থেকে তাদের কোলের ওপর একটু উৎক্ষিপ্ত করে দেন, তাহলে দু'টি বলই দু'জনার কোলে ফিরে আসে বটে, কিন্তু ট্রেনের বলটি তখন ইতিমধ্যেই ট্রেনের যাত্রীর সঙ্গে বেশ খানিকটা এগিয়ে যায়। উৎক্ষেপণ মুহূর্তে দু'টি বলের মধ্যে যে দূরত্ব ছিল, আপতন মুহূর্তে তার অনেকটাই হের ফের হয়ে যায়। স্পষ্টতই, এর মূল কারণ ঐ গতি। তার প্রভাবও বড় বিচিত্র। গতিবেগ যতই বাড়তে থাকে, ততই যেন সব অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায়।

ধরা যাক একটি ৩০ লক্ষ কি. মি. দীর্ঘ ট্রেন সেকেণ্ডে ২ লক্ষ কি. মি. গতিবেগ নিয়ে চলেছে। একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার ফলে ট্রেনের মাঝামাঝি একটি কামরায় আলো জ্বালিয়ে দিলে তার ধাবমান রশ্মির চাপের ফলে ১৫ লক্ষ কি. মি. দূরস্থ ড্রাইভার এবং গার্ডের ঘরের দরজা দু'টি খুলে যায়। মাইকেলসনের প্রমাণ অনুযায়ী আলোরশ্মি ট্রেনের ঐ আবেগ-পিঞ্জরের প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে চতুর্দিকে সমান অর্থাৎ সেকেণ্ডে ৩ লক্ষ কি. মি. গতিতে ছুটে চলায়, আলো জ্বালাবার ঠিক ৫ সেকেণ্ড পরেই দরজা দু'টি খুলে যাবে। ট্রেনের মাঝামাঝি কামরার যাত্রীরা দেখবেন যে, একই সময়ে দরজা দু'টি খুলে গেল। কিন্তু প্ল্যাট্ফর্মের লোকেরা দেখবেন কী? আলোর গতি একটি চরম গতি বলে তাঁদের কাছেও সে গতি একই থাকবে। কিন্তু ভিন্ন আবেগ-পিঞ্জরে থাকায় তাঁদের ক্ষেত্রে পৃথক পিঞ্জরের ঐ ঘটনা সন্দর্শনের মধ্যে একটু তফাত হয়ে যাবে। গার্ডের গাড়িটি সেকেণ্ডে ২ লক্ষ কি. মি. বেগে আলোর উৎস অভিমুখে এগিয়ে যাওয়ার ফলে আলোরশ্মিকে আর পুরো ১৫ লক্ষ কি. মি. পথ অতিক্রম করতে হবেনা। তখন মনে হবে যে, আলোর গতি হয়ে গিয়েছে সেকেণ্ডে (৩ লক্ষ+২ লক্ষ=) ৫ লক্ষ কি. মি.। সুতরাং মনে হবে পিছনের দরজা খুলতে তার সময় লাগছে (১৫ লক্ষ÷৫লক্ষ=) ৩ সেকেণ্ড। অথচ ড্রাইভারের গাড়িটি আলোর উৎসমুখ থেকে ক্রমেই সেকেণ্ডে ২ লক্ষ কি. মি. বেগে দূরে পালাতে থাকায় মনে হবে যে, সেকেণ্ডে আলোর রশ্মির গতিবেগ (৩ লক্ষ−২ লক্ষ=) ১ লক্ষ কি. মি. হয়ে গেছে। সুতরাং ড্রাইভারের দরজা খুলতে তার সময়

লাগবে (১৫ লক্ষ ÷ ১ লক্ষ =) ১৫ সেকেণ্ড্। সুতরাং প্ল্যাটফর্মের অপেক্ষমাণ যাত্রীরা দেখবেন, পিছনে গার্ডের দরজাটি যখন খুলে গেল, তার (১৫ – ৩ =) ১২ সেকেণ্ড্ পরে ড্রাইভারের দরজাটি খুলল। গতিবান যাত্রীর কাছে যে ঘটনাদ্বয় এক মুহূর্তে ঘটে গেল, অপেক্ষমাণ যাত্রীর কাছে মনে হল, তারা ঘটল ১২ সেকেণ্ড্ ব্যবধানে! পরমাশ্চর্য ঘটনা! কিন্তু তাহলে সময় বা কালেরও আর কোনো মূল্য রইলনা! অর্থাৎ তাহলে এ ক্ষেত্রেও প্রমাণ হয় যে **কালও ঐ গতির উপর নির্ভরশীল** হয়ে আছে!

অবশ্য উপরোক্ত হিসাবের ১৫ সেকেণ্ডের স্থলে যদি ওটি কিছু কমও হয় তাতেও আমাদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী কালকে নিশ্চয় গতিনির্ভর বলা যাবে। তবে স্বীকার করা ভাল যে, কাল-ব্যবধানটি কিছু কম হবে। কারণ, অপেক্ষমাণ যাত্রীদের কাছে গতিবান ট্রেনটির দৈর্ঘ্যও কিছু কম মনে হয়। কারণটি বেশ মজার।

বৃষ্টি পড়ছে। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আমি দেখছি আমার মাথার উপর লম্বভাবে বৃষ্টি নামছে। কিন্তু আমারই দু'হাত দূরে গতিবান ট্রেনের আরোহী দেখে গেলেন, আমার মাথার উপর বৃষ্টি পড়ছে তির্যকভাবে। গতি বেশি হলে সেই তির্যক ভাবটি তাঁর বেশিই মনে হবে। আবার ঠিক একই মুহূর্তে ঐ আরোহীটি ট্রেন থেকে আমার গায়ে পিচ্‌কিরি দিয়ে জলের ফিন্‌কি ছুঁড়ে মারলে নিক্ষিপ্ত ধারাটিকে আমি নিজে তির্যক মনে করলেও তিনি ওটিকে সিধে বা সোজা জেনে হাসতে হাসতে চলে যাবেন। এসব জিনিস আমাদের জানা। কিন্তু এসব থেকেই কল্পনা করা যাক। এবার আমি ট্রেনে উঠেছি এবং আমার পূর্ব সুহৃদটি প্ল্যাটফর্মে নেমেছেন। আমার ট্রেনটি খুব উঁচু, কয়েক লক্ষ কি. মি. হবে। যাচ্ছেও খুব বেগে, সেকেণ্ডে ২ লক্ষ কি. মি.। ট্রেনের একটি সিট থেকে টর্চ্ জ্বালিয়ে উপর দিকে আলোর রশ্মি পাঠান হল। লম্বভাবে উপর দিকে উঠে গিয়ে ছাতের আয়নাতে লেগে সেটি আবার আমার কাছে ফিরে এল। কিন্তু ট্রেনে বসে আমি যাকে এমন লম্বভাবে ওঠা নামা করতে দেখলাম, আমার প্ল্যাটফর্মের বন্ধুটি কিন্তু তাকে মোটেই সে ভাবে ওঠা নামা করতে দেখবেননা। তিনি দেখবেন, রশ্মিটি তাঁরই দিক ঘেঁযে যেন তির্যকভাবে উপরে উঠে গেল এবং পুনরায় তাঁরই দিক ঘেঁষে তির্যকভাবেই নিচে নেমে এল। তার ওঠা নামার পথটি তাঁর কাছে ত্রিভুজের দু'টি বাহুর মতই মনে হল। তাহলে তাঁর অনুভব অনুযায়ী, দু'বার তির্যক পথে যাওয়া আসাতে তার মোট পথটি দীর্ঘতর হয়ে গিয়েছে, সুতরাং তার ওঠা নামাতে সময়ও লেগেছে অনেক বেশি। ট্রেনের গতি বাড়লে (অবশ্য কোনো ক্ষেত্রেই তা আলোর গতির চাইতে বেশি হতে পারেনা—) রশ্মির আরোহণ-অবরোহণ পথের তির্যক ভঙ্গিও তাঁর বেশি মনে হবে। ফলে গমনাগমনের সময়টিও তাঁর কাছে বেশি প্রতীয়মান হবে। সুতরাং এখানেও দেখা যাচ্ছে, সময় বা কালপরিমাণটি গতিপরিমাণের উপর নির্ভর করে আছে। কিন্তু এ থেকেই বোঝা যায়,

গতিবান আরোহীর সময়ের তুলনায় প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষমাণ যাত্রীর সময়টি বেশি এবং গতি বাড়লে সে সময়টিও বেড়ে যাবে। ফলে, প্ল্যাটফর্মের যাত্রীটির কাছে ট্রেনের সময়ের তুলনায় প্ল্যাটফর্মের সময় যত মনে হবে, আরোহীর কাছে সে সময় আরও কম মনে হবে। তার ফলে তখন ট্রেন কর্তৃক প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে যাওয়ার সময় দেখে, প্ল্যাটফর্মের যাত্রীর কাছে প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্যও বেশি মনে হবে। সে তুলনায় আরোহী কিন্তু ঐ দৈর্ঘ্যকে কম মনে করবেন। অপরপক্ষে, স্বয়ং আরোহী ট্রেনটির দৈর্ঘ্য যা দেখবেন, দণ্ডায়মান যাত্রীটি সে দৈর্ঘ্য দেখবেন আরও কম। সুতরাং এখানেও আবার দেখা গেল যে, স্থান বা দেশপরিমাণটি গতির উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে।

এখন পূর্ববর্তী নিম্নরেখ এবং স্থূল অক্ষরে লিখিত পর্যবেক্ষণগুলিকে একত্র সন্নিবিষ্ট করা যেতে পারে :

	যে বস্তুর অস্তিত্ব অন্যের উপর নির্ভরশীল			যার উপর নির্ভরশীল
(১)	দিক	...	...	দেশ
(২)	দিক	...	...	কাল
(৩)	দেশপরিমাণ	...	...	অন্য দেশপরিমাণ
(৪)	সংখ্যাপরিমাণ	...	...	দেশ বা দিক
(৫)	দেশ	...	...	কাল
(৬)	কাল	...	...	দেশ
(৭)	কাল, কালপরিমাণ	...	...	গতি
(৮)	দেশপরিমাণ	...	...	গতিপরিমাণ
(৯)	স্থিতি বা স্থিরতা	...	...	বিশেষ গতি
(১০)	বিশেষ গতি	...	...	অন্য বিশেষ গতি
(১১)	আলো-গতি	...	...	×

প্রথম আটটি পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দিক, দেশ, কাল এবং পরিমাণ —এদের সকলেরই অস্তিত্ব বা স্থিরতা গতির উপর নির্ভর করে আছে। অথচ ৯ম. পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায় যে, স্থিতিভাব বা স্থিরতাও গতির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং ওদের সকলকার অস্তিত্বই নির্ভরশীল বা আপেক্ষিক সত্যমাত্র। কিন্তু ১০ম পর্যবেক্ষণটি জানিয়ে দিচ্ছে যে, গতিও নির্ভরশীল বটে, কিন্তু সে নির্ভরশীলতা কোনো না কোনো অন্য গতির উপরেই। আবার ৪২ পৃষ্ঠার পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা জেনেছি যে, **সকল গতিরই শেষ গতি ঐ আলোর গতিই। সে জন্য কোনও গতিকেই পরোয়া করেনা।** তার গমনপথে বাধা সৃষ্টি না করলে সে দেশকাল নির্বিশেষভাবে একই আবেগে ছুটে চলে। তাই তার

অস্তিত্বটি কোনো আপেক্ষিক সত্য নয়। অর্থাৎ **আলোর গতিবেগের অস্তিত্বটি একটি চরম সত্য।** কিন্তু ৪২৭ পৃষ্ঠার সিদ্ধান্ত থেকে যখন জানতে পারি যে, **পরিবর্তনশীলতা অর্থেই গতি একটি চরম সত্য,** তখন একথাও সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, **পরিবর্তনশীলতা বা আলোর গতিবেগ একই বিষয় বা একই অভিন্ন তত্ত্ব।** [শুধু তাই নয়। ৪২৫ পৃষ্ঠার আলোচনা অনুযায়ী ধরে নিতে হয় যে, পার্থিব প্রকৃতিতে মানুষের কাছে আলো বস্তুটিই হচ্ছে মূল পদার্থের প্রথম পরিচয়।]

পরম তত্ত্বটি তাহলে আলোর গতিবেগ, স্বয়ং আলো নয়। কিন্তু আমরা জেনেছি, পার্থিব সকল বস্তুরই মত আলোরও (ফোটনের) উপাদান হল ভর (শূন্য ভর) আর তেজ। সুতরাং গতি (বা পরিবর্তনশীলতা) সেই ভর-তেজেরই,—যাদের অস্তিত্ব আপেক্ষিক কিনা আমরা জানিনা। কিন্তু যদি সেটিও একটি আপেক্ষিক সত্য হয়, তাহলে সেই আপেক্ষিক সত্যকে অবলম্বন করে কি আলোগতির পরম সত্যটি প্রকাশ পেতে পারে? তাছাড়া উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পরিবর্তনশীলতা ও আলোগতি যদি এক অভিন্ন তত্ত্ব হয়, তাহলে ধরে নিতেই হয় যে, **আলোর গতিবেগের অর্থই হল ভর-তেজের পরিবর্তনশীলতা।** কিন্তু জন্ম-মৃত্যুহীন এই ভর-তেজই যদি পার্থিব বস্তুর একমাত্র মূল উপাদান হয়ে থাকে,—যার উপর নির্ভর করেই আর সকল পার্থিব উপাদানের সৃষ্টি, তাহলে তাদেরকেও চরম সত্য বলে স্বীকার করে নিতেই হয়। সেক্ষেত্রে **ভর-তেজের পরিবর্তন-শীলতার অর্থ যে ভর-তেজের পারস্পরিক রূপান্তর,—একথা বলা ছাড়া উপায় থাকেনা।** কিন্তু সত্তাবান্ সকল পার্থিব বস্তুই যদি আপেক্ষিক হয়ে থাকে, তাহলে ভর-তেজ রূপ পদার্থ-সত্তাও আপেক্ষিক হবেনা কেন? কিন্তু ওরা তাহলে কার জন্য অপেক্ষা করে থাকে? অন্য কোন্ সত্যের ওপর ওরা নির্ভরশীল? উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, পরস্পরের ওপর। অর্থাৎ ওদের নির্ভরশীলতা পারস্পরিক। এ থেকে ধরে নিতে হয়, ওদেরকে বিচ্ছিন্নভাবে ধরলে পার্থিব সত্য অনুযায়ী আর সব পার্থিব বস্তুর মতই ওরা **একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু** ওদেরকে এক বলে ধরলে **ওরা পরম সত্য, আলোগতি রূপ পার্থিব ও পরম সত্যেরই জন্মদাতা। সুতরাং যে মুহূর্তে ওরা এক, সেই মুহূর্তেই ওরা দুই হতে বাধ্য। আবার যে মুহূর্তে ওরা দুই, সেই মুহূর্তে ওরা অনিবার্যভাবেই এক হয়ে উঠছে। অর্থাৎ,** মূলত বা প্রধানত পরিবর্তনশীলতাটি একমাত্র চরম সত্য বলে, **মিলনে বা বিচ্ছিন্নতায় বা একের মধ্যে অন্যের আত্মবিলোপে, কোনওভাবেই ওরা অপরিবর্তনীয় 'এক' বা অপরিবর্তনীয় 'দুই' হয়ে দাঁড়িয়ে রইতে পারেনা।** পরিবর্তনশীলতার নিয়তম- বা একান্ত-

শর্ত ঐ দুইটি সংখ্যার ('এক' এবং 'দুই') মধ্যেই ওরা ক্রমপরিবর্তিত হয়ে চলেছে। পরমসত্যরূপ পরিবর্তনশীলতার কারণেই সেই স্বতোমিলন ও স্বতঃ-সংযোগের পরিণতিটিই পদার্থরূপে ফুটে উঠছে; আর অন্যদিকে স্বতো-বিচ্ছেদ বা স্বতঃসংঘর্ষের পরিণামেই গতির আবির্ভাব ঘটে উঠছে। সুতরাং বাস্তবিক পক্ষে ওদের ঐ পারস্পরিক অকল্পনীয় দ্রুত পরিবর্তনশীলতাই গতির (বা আলো-গতির) জন্মদাতা। সুতরাং আলো যে সর্বব্যাপ্ত ইথার-তরঙ্গের উপর দিয়ে চলতে থাকে তা বলার আর দরকার হয়না। আলো বা সর্বব্যাপ্ত ভর-তেজ নিজেই তরঙ্গ তুলে চলে। অর্থাৎ ভর-তেজের স্বতোদ্বন্দ্ব-মিলনই ঐ তরঙ্গের কারণ। দ্বন্দ্ব-মিলন যতই নিবিড় বা জোরাল হয়, তার সেই ক্রিয়া ততই দ্রুতগতিতে ঘটতে থাকে। এতেই বুঝতে পারা যায়, আমাদের এ বিশ্বটি সীমিত দেশ-কালের মধ্যবর্তী হওয়ায় সেই তরঙ্গদৈর্ঘও ততই ক্ষুদ্র হয়ে যায়। মিলনের গতি একটানা। দ্বন্দ্ব তাকে ভেঙে দিলেই গতি-বিভঙ্গে তরঙ্গের অভ্যুদয় ঘটে। তেজ বেশি হলেই বিভঙ্গ ও তরঙ্গ বেড়ে যাওয়ায় তরঙ্গদৈর্ঘ্য হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং ভর, তেজ, সংযোগ, সংঘর্ষ, পরিবর্তন-শীলতা ও তজ্জনিত গতি,—এরা সকলে মিলেই যুগপৎ একটি পরম সত্যকে দ্যোতিত করছে। ওদের একটি থেকে অন্যটিকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব বলে তাই ওরাও প্রত্যেকেই পরম সত্য। সংযোগ এবং সংঘর্ষ রূপ ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে যে ক্রম থাকতে পারে, বর্তমান অবস্থায় তা সম্পূর্ণতই বোধাতীত বলে তারা যুগপৎ, এবং যুগপৎ হওয়ার জন্যই গতির এমন প্রচণ্ডতা। অথচ ওদের ক্রম আছে বলেই সে-গতিরও একটি রীতি বা সীমা (সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কি. মি.) আছে। তারই নাম পদার্থের দেশ (মিটার, মাইল প্রভৃতি)-কাল (মুহূর্ত, সেকেণ্ড প্রভৃতি) রীতি। কিন্তু ভর আর তেজের মিলনের ফলেই যখন পদার্থের উদ্ভব, আর তাদের সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্বের ফলেই তাদের পারস্পরিক পরিবর্তন, তখন সেই ভর-তেজের যুগপৎ সংযোগ-সংঘর্ষ জনিত পারস্পরিক পরিবর্তনশীলতার একটি মাত্র উপযুক্ত সংজ্ঞা হতে পারে তাই পদার্থগতি। আপেক্ষিক তত্ত্বই তার প্রাণ। সে কিন্তু পরম সত্যই। তবে এই পরম সত্যের অন্তর্ভুক্ত আপেক্ষিক তত্ত্বটি বহুবিচিত্র রূপ লাভ করতে পারে। তাই তদন্তর্গত সংঘর্ষটি যখন চূড়ান্ত রূপ নেয়, তখন পদার্থগতি আলো-গতি হিসেবেই আমাদের নয়নেন্দ্রিয়ের গোচর হয়, এবং তদন্তর্ভুক্ত সংযোগটি চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করলে তা পার্থিব বস্তু হয়ে আমাদের চর্মেন্দ্রিয়ে এসে ধরা পড়ে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের দু'টি সীমান্তে এসে পরম সত্যটি এভাবে আমাদের কাছে জানান দেয়।

প্রাকৃতিক জগৎ এভাবে এই দু'টি সীমার মধ্যে নিজ-রূপ অর্থাৎ স্বীয় তত্ত্ব বা স্বীয় সত্যকে (সম্পূর্ণত বা সম্ভবত অংশত) প্রতিফলিত করছে। **পরম পদার্থ আর তার চরম গতি,—এর মধ্যেই একটি বিশেষ ছন্দে উদ্ভূত হয়ে উঠছে পার্থিব দেহেন্দ্রিয় বা জীব-জীবন। এ জীবন তাই (সমগ্র বা আংশিক ভাবে) প্রকৃতি-জগতের পরম সত্যরূপ মিলন-ছন্দের এক অপরূপ মহাসামঞ্জস্য,** প্রকৃতিপ্রিয় এক ছন্দোবদ্ধ কবিতা।

কিন্তু ভর-তেজের পারস্পরিক স্বতঃপরিবর্তনশীলতার জন্যই যে পদার্থ তথা পার্থিব বস্তুমাত্রের মধ্যেই এক স্বতোগতি বিদ্যমান, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্বত্রই। এই স্বতোগতির প্রতিফলন পড়ছে মাধ্যাকর্ষণ-আবেগে, আলো আর বিদ্যুৎতেজের প্রবাহে, নিউট্রনের বিটাক্ষরণ স্রোতে, কেন্দ্রকীয় নিউক্লিয়ন আর অতিকেন্দ্রীয় ইলেক্ট্রনের ঘূর্ণিতে, তরল পদার্থের অণু-ঝর্ণায়, তরু-জীবের প্রাণস্পন্দনে, ইচ্ছাশক্তির পরিস্ফুরণে, আর জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর মহানৃত্যে। শক্তিপ্রয়োগ করে কি প্রকৃতি বহির্ভূত পৃথক কোনো সত্তা কোনো বস্তুর মধ্যে গতিসঞ্চার করে দিতে পারে? সে সত্তার প্রভাব নিয়ে আমরাই কি তা পারি নাকি? তেজ বা শক্তি দিয়ে আমরা কোনো বস্তুর ভরটি বাড়িয়ে দিই মাত্র, যত নগণ্যই হক না কেন সে ভর-পরিমাণ। তাপ-তেজ দিয়ে কোনো বস্তুকে উত্তপ্ত করলে তাই তার ভরটিই শুধু বেড়ে যায়। ৩০০০ টন জল বাষ্পে পরিণত হয়ে গেল। তার জন্য অনেকটা তেজ ব্যয়িত হল। কিন্তু এ বিশ্বের মোট পদার্থ থেকে তা খরচা হয়ে বিনষ্ট হয়ে গেলনা। সে ভর-রূপেই আবার তহবিলে এসে জমা হয়ে গেল। মোট যে তেজ লাগল, তার ভরপরিমাণ হল এক গ্রাম। সুতরাং অতটা জল যে কেবল বাষ্পেই পরিণত হয়ে গেল, তাই না। ঐ আপাত অদৃশ্য বাষ্পের মধ্যেই ঐ আপাত অদৃশ্য তেজটি এসে বাসা বাঁধল। আর তার ফলে মোট জলের ভরটিও আরও এক গ্রাম পরিমাণ বর্ধিত হয়ে গিয়ে যথাযথভাবে টিকে রইল।

আবার কোনো বস্তুর অন্তর্গত পদার্থসত্তাটি তেজপ্রধান হয়ে উঠলে পদার্থভরটি অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও কেবল বস্তুভরটিই কমে যায়। ৩০০০ টন কয়লা বস্তুকে পোড়ালে তার মোট ওজন থেকে এক গ্রাম ওজন কমে যায় কি করে? আসলে কমে যায় বস্তুরই ওজন, পদার্থের ভর নয়। পদার্থ সংযোগপ্রধান হলেই তার যে-ভরটি বোধগম্য হয়ে উঠে, সেটি কয়লা প্রভৃতি ভারপ্রধান বস্তুর ভরই। আবার পদার্থ সংঘর্ষপ্রধান হলেই তার যে তেজটি বোধগম্য হয়, সেটি আলো তাপ প্রভৃতি তেজপ্রধান বস্তুর তেজই। বারুদের সংঘর্ষে সংযোগপ্রধান পদার্থের ঘুম ভাঙল, সে আলোবস্তু রূপ সংঘর্ষপ্রধান পদার্থে উদ্দীপিত হল। তেজপ্রধান আলোবস্তু আবার সংযোগপ্রধান পদার্থের বা ভারময় কয়লা-বস্তুর ঘুম ভেঙে দিল। কয়লা-বস্তুর অন্তর্গত তেজপদার্থের উদ্দীপনা এল। পদার্থ

সংঘর্ষমুখী হয়ে উঠল। ভর-তেজের মিলন-বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ল। পদার্থের তেজসত্তার প্রাধান্য ঘটল। ঐ এক গ্রাম ভর তখন তার মধ্যে লুকিয়ে গেল।

তাহলে বলটি যে আমরা গড়িয়ে দিলাম, রকেটটিকে যে ছুঁড়ে মারলাম, তাদের মধ্যে কি আমরা গতি সঞ্চার করে দিলামনা? এর উত্তরটি বুঝে নিতে হয়। আমাদের (অর্থাৎ প্রক্ষেপকের) বস্তুসত্তার মধ্যে লুকিয়ে আছে পদার্থসত্তা। বল বা রকেটটিতেও ঠিক তাই। **পদার্থের পরিবর্তনশীলতা বা আবেগই বস্তুগতির জন্মদাতা।** সুতরাং চোখে আমরা দেখতে পাচ্ছি বটে একদিকে (১) মানুষ এবং তার যন্ত্রপাতি, আর অন্য দিকে (২) বল-রকেট। আসলে কিন্তু ওখানে আছে—(১) মনুষ্যসত্তার অন্তর্নিহিত পদার্থ-আবেগ, (২) মনুষ্যসত্তার বস্তুবেগ, (৩) বল-রকেটসত্তার বস্তুবেগ এবং (৪) বল-রকেটসত্তার অন্তর্গত পদার্থ-আবেগ। **আবেগ-বেগ-বেগ-আবেগ—এভাবেই পদার্থ-সংযোগ বজায় থাকছে।** পদার্থের আবেগের মধ্যেই বস্তুজগতের বেগটি ফুটে উঠছে, অথচ সাধারণ দৃষ্টিতে বস্তুবেগের অন্তরালে পদার্থ-আবেগ লুকিয়ে থাকছে। **জীবন-প্রক্রিয়ার মধ্যে ভর আর তেজের, মিলন আর সংঘর্ষের, ঐ আবেগ আর বেগের একটি অপরূপ সামঞ্জস্য স্থাপিত হওয়ায় সে জ্ঞাতা হয়ে চলেছে, তার মধ্যে একটি ইচ্ছাশক্তির উজ্জীবন ঘটছে। বিশ্বপ্রকৃতির সেই ভর-তেজাত্মক, মিলন-দ্বন্দ্বাত্মক এবং আবেগ (প্রেরণা)-বেগরূপ মহাপ্রকাশের নামই তাই জীবন। কিন্তু জীবজগতের মধ্যে আবার মানবজীবনেই ঐ আবেগ বা প্রেরণাপ্রধান ইচ্ছা এবং বেগপ্রধান জ্ঞানের একটি সুসামঞ্জস্য ঘটে উঠছে বলে সে তার প্রেরণা আর জ্ঞানের প্রভাবে পদার্থের আবেগটিকে বস্তুবেগ রচনায় ইচ্ছামত লাগিয়ে দিতে পারে।** বলটি গড়িয়ে যায়; কিন্তু সেটি ঠিক মূল পদার্থ নয়, পদার্থের বিভিন্ন সমাবেশের একটি সংঘমূলক বস্তুসংস্থা মাত্র। বলটি যে-ভূমির উপর দিয়ে বা যে-বাতাস ঠেলে এগিয়ে চলে, ওরাও সব ঐ রকমের এক একটি বস্তুসংস্থা। সুতরাং বলের বস্তুগতি আর ভূমি ও বায়ুর বস্তুগতি, এরা সব পৃথক হওয়ার জন্য একে অন্যের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ তার সেই বস্তুগতির বাধাগুলিকে যে পরিমাণে দূরীভূত করে দেয়, সেই পরিমাণেই সে (বলটি) মূল পদার্থের আবেগ লাভ করে, তার গতি বেড়ে যায়। যেমন রকেটের ক্ষেত্রে তার ঐ গতিটি বলের চাইতে অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু বস্তুগতি কখনও মূল পদার্থের প্রথম প্রকাশমান বস্তুসংঘ রূপ আলোকের গতির চাইতে বেশি হতে পারেনা। কারণ, **পরম পদার্থের আবেগ বা পরিবর্তনশীলতা অনন্তনির্ভর এবং স্বয়ংক্রিয় হওয়া সত্ত্বেও এক বিশেষ রীতি বা গতি-পরিমাণের মারফতে নিজেকে প্রকাশ করে চলেছে,**

এবং পদার্থের সেই প্রথম প্রকাশ রূপ বস্তুসত্তার (পৃ. ৩৯৯-৪০১, ৪১৪, ৪২৫) **নামই আলো। আলোবস্তুর বেগ তাই পদার্থ-আবেগেরই তুল্য। সুতরাং তার গতিটিও ভর-তেজ বা পদার্থ-আবেগের মতই অনন্যনির্ভর, স্বয়ংক্রিয় এবং পরম।** জল বা কাচের মাধ্যমের বাধার মধ্যে তার স্বয়ংক্রিয়া জনিত গতি হ্রাসপ্রাপ্ত হলেও, সেই বাধা পেরিয়ে গেলেই তার অনন্যনির্ভর চির-স্বয়ংক্রিয়তা ফিরে আসে। সে তখন তার পূর্ণ আবেগ বা গতিবেগকেই জাগিয়ে তুলতে পারে। আর যেখানে মনে হয় যে সে আটকা পড়ে যায়, সেখানেও আসলে মূল পদার্থের স্বয়ংক্রিয়া কখনও স্তব্ধ হয়ে যায়না। আলোবস্তু বা তার আলোদেহটি তখন তাপবস্তু বা তার তাপদেহে রূপ প্রাপ্ত হয়। বা বলতে পারি, তার **আলো-তেজের প্রক্রিয়াটি তার তাপ-তেজের প্রক্রিয়ায় সাজবদল করে ফেলে। কিন্তু পদার্থ (ভরতেজ)-প্রক্রিয়া চির অক্ষুণ্ণ থেকে যায়।**

আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব (general theory of relativity) অনুযায়ী বস্তু তার পারিপার্শ্বিক স্থান বা দেশের (space) উপর প্রভাব বিস্তার করে। বস্তু না থাকলে সর্বত্র তার সর্বপ্রকার প্রকৃতি একই থাকে। কিন্তু ঐ রকম সমসত্ত্বদেহ (homogeneous) দেশের মধ্যে বস্তুর আবির্ভাব ঘটলেই তার ঐ প্রকৃতি আর একরূপ থাকেনা। এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, বিজ্ঞানীরা যাকে ক্ষেত্র নামে অভিহিত করে বিদ্যুচ্চৌম্বক, কেন্দ্রকীয় ও মাধ্যাকর্ষণীয় প্রভৃতি **ক্ষেত্রের কল্পনা করেছেন** [এবং এক রকম সেই সূত্রেই আমরাও যাকে প্রাণক্ষেত্র এবং চিন্ময়-ক্ষেত্র বলে ধরে নিয়েছিলাম —পৃ. ৩৪২], **তাকেই আমরা আমাদের সুচির অনুসন্ধিত মূল পদার্থের এক মহাজগৎ বলে ধরে নিতে পারি।** এ সিদ্ধান্তের কারণ নিম্নোক্ত রূপ।

ক্ষেত্র আর বস্তুর (পদার্থসংঘের) মধ্যে পার্থক্য এই যে, বস্তু সীমাবদ্ধ, সে ইন্দ্রিয়ে ধরা দেয়। কিন্তু ক্ষেত্র অসীম, সে ইন্দ্রিয়াতীত। এই ক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত প্রথম সত্তাকেই বিজ্ঞানীরা ক্ষেত্র-কণিকা নাম দিয়েছেন। যেমন, ফোটনরূপী ক্ষেত্র-কণিকাটি বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্রের ঘনায়ন ও কণিকায়ন মাত্র। এই কণিকা যে বস্তুধর্মী তার প্রমাণ তার চাপ আছে, তার প্রমাণ সে ধাতু থেকে ইলেকট্রনরূপ বস্তু-কণিকাকে তুলে দিতে পারে। সুতরাং এ থেকে ক্ষেত্রেরও বস্তুপ্রকৃতি প্রমাণিত হয়; ওদিকে ইলেকট্রনের দেহতরঙ্গ আছে। সে তাই ক্ষেত্রদেহে বিস্তৃত ও বিলেপিত হয়ে যায়। তাই সে একই মুহূর্তে এখানে থেকেও এখানে নাই। দেশ সম্বন্ধে তার এই অনির্দিষ্টতা বা সর্বত্রবিরাজমানতাই তার ক্ষেত্রপ্রকৃতির লক্ষণ। সুতরাং এখানে বস্তুসত্তার ক্ষেত্র-প্রকৃতির প্রমাণ মিলে যায়। ক্ষেত্রকণিকার খুব উচ্চতেজের মাধ্যমে যেমন তার নিজের

তথা তার ক্ষেত্রেরও বস্তুপ্রকৃতি প্রকাশ পায়, তেমনি বস্তু-কণিকারও সুউচ্চ তেজ মাধ্যমে বস্তুরও ক্ষেত্রপ্রকৃতিটি প্রকাশিত হয়। এ কারণে যেমন একদিকে খুব উচ্চ তেজী গামা-ফোটন থেকে ইলেকট্রন-পজিট্রনের উদ্ভব ঘটে, তেমনি আবার অন্য দিকে ইলেকট্রন-পজিট্রনের সংগমের ফলে গামা-রশ্মিও উদ্ভূত হয়। একটি প্রক্রিয়াতে অসীম 'সীমার নিবিড় সঙ্গ' চাইছে, অন্যটিতে সীমাও 'অসীমের মাঝে' হারিয়ে যাচ্ছে। এভাবে উপরি উক্ত তত্ত্ব দু'টি একে অন্যের পরিপূরক হয়ে দেখা দিয়েছে।

যখন বস্তুর ক্ষেত্রধর্মের এবং ক্ষেত্রেরও বস্তুধর্মের প্রমাণ মিলে যাচ্ছে, তখন স্বভাবতই মনে আসে যে হয়ত উভয়েই মূল একই পদার্থ থেকে উদ্ভূত হচ্ছে। ক্ষেত্রকণিকা থেকে বস্তু-কণিকার উৎপত্তি ঘটছে, কিংবা বস্তুকণিকা থেকে ক্ষেত্র-কণিকার উৎপত্তি ঘটেছে, সে প্রশ্ন নিরর্থক। কারণ, উভয় কণিকাই চিরসক্রিয় থেকে একে অন্যের উদ্ভবকে সম্ভব করে তুলছে। কিন্তু একথা মনে করার কারণ আছে যে, ক্ষেত্রাংশই ঘনীভূত হয়ে পরিমাণ-কণিকার সৃষ্টি করে চলেছে, এবং পরিমাণ-কণিকাই বিকীর্ণ হয়ে ক্ষেত্রলীন হয়ে যাচ্ছে। বস্তুকণিকা স্থির অবস্থায় থাকতে পারে; এবং তার যে ভর আছে তা শূন্য-ভরও নয়। কিন্তু তেজ পরিত্যাগ করে ইলেকট্রন আর পজিট্রন যখন মিলিয়ে যায়, তখন তাদের তেজটি ক্ষেত্রকণিকায় অর্থাৎ ফোটনের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করলেও তাদের ভরটির আর পদার্থপ্রকৃতি থাকেনা, সে ক্ষেত্রলীন হয়ে যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রটি কার ক্ষেত্র? এ কি ফোটনাদি ক্ষেত্র-কণিকার ক্ষেত্র? তা যদি হত, তাহলে তো ইলেকট্রনের ভরটি ফোটনেই বর্তে যেতে। তেমনি ফোটন যখন ইলেকট্রনে রূপ নিয়ে বস্তু হয়ে উঠে, তার তেজটি কোথায় যায়? ইলেকট্রনের ভরটিই বা কোথা থেকে আসে? তাহলে নিশ্চয় ঐ ভর বা তেজ যেখানে লুকিয়ে যায় বা যেখান থেকে ভেসে উঠে, তাকে কোনো কণিকাক্ষেত্র বলা যায়না, তাকে ভর-তেজের ক্ষেত্রই বলতে হয়। কিন্তু ক্ষেত্র তো কণিকার। সুতরাং ঐ ভর-তেজের সমাহারকে ক্ষেত্রেরও উপাদান অর্থাৎ মূল পদার্থ বলেই ধরে নিতে হয়,—একেই আমরা এতকাল যাবৎ খুঁজে এসেছি।

এই ভরতেজেরই রূপান্তরশীলতা তথা পরিবর্তনশীলতা বা গতির কথাই আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। ঐ স্বতঃপরিবর্তনশীলতাকে অবলম্বন করেই ভরতেজাত্মক মূল পদার্থ ভরপ্রধান বা তেজপ্রধান পদার্থরূপে স্বপ্রকাশমান বা বিলীয়মান হয়ে চলে। মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের স্বরূপই হল তার ভর, আর ভর-সংকোচন জনিত গতিবেগ। বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্রের মূলই ঐ তেজ এবং ভর আর ঘূর্ণিবেগ। আবার কেন্দ্রকীয় ক্ষেত্রের মর্মই ঐ তেজ, ভর, ঘূর্ণি আর স্বতঃরূপান্তর বেগ। সর্বত্রই ভর, তেজ আর পরিবর্তনশীলতা বা গতি। সুতরাং পার্থিব বস্তুনিচয় এবং তাদের মূল কণিকা ও কণিকাক্ষেত্র,—এসব কিছুর মূল উপাদানই ঐ পদার্থজগৎ। সেই পদার্থজগতেরই অংশবিশেষ ঘনীভূত হয়ে বস্তুর উদ্ভব ঘটলেই ঐ

বস্তুর সংলগ্ন অঞ্চলের উপর টান পড়ে। তখন তার প্রকৃতি পালটে যায়। সেই অঞ্চল বা দেশটিও তখন বক্রতাসম্পন্ন হয়ে উঠে।

বহু পূর্বেই আইন্‌ষ্টাইন্ জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, কোনো বস্তুর সংলগ্ন অঞ্চলে দু'টি বিন্দুর মধ্যবর্তী ক্ষুদ্রতম দূরত্বটি সরলরেখার দ্বারা প্রকাশ পায়না। তার প্রকাশ ঘটে বক্ররেখা-পথেই। আলোরশ্মির চাইতে অধিক সোজা পথ ধরে কে আর চলতে পারে? সুতরাং স্বভাবতই প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে ঐ আলোরশ্মিও কি কোনো বস্তুর পাশ দিয়ে চলবার সময় বাঁকা পথ ধরে চলবে? উপরোক্ত তত্ত্ব সত্য হলে বুঝা যায় যে, রেখার ঐ বিন্দুদ্বয় ঐ বস্তুর যত কাছে থাকবে এবং ঐ বস্তুটিও যত বড় বা বেশি ভরযুক্ত হবে, বিন্দুগ্রাহী দেশও স্বভাবতই তত বেশি বক্র হবে, বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক রেখাও ততই বেঁকে যাবে। আমাদের জানা শোনা বস্তুর মধ্যে সূর্যই বৃহত্তম বস্তু। তাহলে দূর গগনের কোনো নক্ষত্র থেকে কোনো আলোরশ্মি বহুবিস্তৃত দেশকে অতিক্রম করে বিপুলায়তন সূর্যের পাশ দিয়ে আমাদের কাছে এসে পৌছবার সময়ে কি সিধে পথ ধরে আসতে পারেনা? সূর্যের কাছ বরাবর এসে তাকে কি তাহলে বেশ বড় একটি বাঁক নিতে হয়? রাতে টেলিস্কোপ দিয়ে কোনো নক্ষত্রের অবস্থানের দিকটি (direction) জেনে নেওয়া যায়। তারপর একদিন দিনের বেলায় সূর্যের পূর্ণগ্রহণকালে যখন ঐ নক্ষত্রের আলোরশ্মি সূর্যের পাশ ঘেঁষে পৃথিবীর দিকে আসতে থাকবে, তখন যদি গ্রহণের আঁধারে তার অবস্থানের দিকটি পুনর্নির্ণয় করা যায়, তাহলে ব্যাপারটি সম্বন্ধে একটি নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। ১৯১৯ সালের আগষ্ট মাসে এক বিশেষ অভিযাত্রীদল আরবের মরুভূমিতে সূর্যের পূর্ণগ্রহণকালীন গবেষণার কাজ করতে গিয়েছিলেন। তাঁরা ঐ পূর্বোক্ত পরীক্ষার কাজটিও নিষ্পন্ন করেন। পরীক্ষা করে বোঝা গেল যে, আলোকরেখা সত্যিই সূর্যের পাশ ঘেঁষে বেঁকে আসছে।

বস্তুসংশ্লিষ্ট দেশ তাহলে বক্রতা ভাবাপন্ন!! আর তার সেই বক্রতা বস্তুর দেহপ্রকৃতির উপর নির্ভরশীল!! সে তাহলে শূন্য নয়,—বস্তু আর তার অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র অর্থাৎ পদার্থ দিয়েই সর্বতোভাবে আক্রান্ত! তাহলে নিশ্চয় বলা যায়, **দেশ বলে আর পৃথক কিছু নাই। যাকে আমরা দেশ বলি, সে ঐ বস্তু আর তার ক্রিয়াক্ষেত্র বা মুল পদার্থ ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নয়। অপর পক্ষে, নিষ্ক্রিয় পদার্থ বলেও কিছু নাই। সর্বত্রই এক বস্তু অন্য বস্তুর সঙ্গে ক্রিয়ালিপ্ত। এমনকি, বস্তুর অভ্যন্তরেও কণিকাবৃন্দের ক্রিয়া চলছে।** সে ক্রিয়ার আসল তৎপর্য বা প্রকৃত রূপটির পরিচয় পাওয়া দুঃসাধ্য। কারণ, অতিকণিকাবৃন্দের দেহ-কাঠামোর কোনো স্থায়ী ভঙ্গি নাই। প্রথমত, তারা সর্বদাই পরিবর্তনশীল। দ্বিতীয়ত, যে যন্ত্রের সাহায্যে তাদের প্রত্যক্ষ করা যাবে, সেই যন্ত্রের ক্রিয়া বা প্রভাব (যেমন রশ্মিপ্রভাব) যত সূক্ষ্মই

হক না কেন, তা তাদের উপর পতিত হওয়ামাত্রেই তারা পালটে যাবে। অর্থাৎ অতি-কণিকারা রূপান্তরশীল বলেই চির-সক্রিয়, এবং চির-সক্রিয় বলেই যেকোনো প্রভাবেই তারা পরিবর্তনশীল। কেন্দ্রকীয় ক্ষেত্র মধ্যে তারা যেমন স্বেচ্ছারূপান্তরশীল, যেকোনো গতির প্রভাবে বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যেও তারা সেইরূপ পরিবর্তনশীল। স্থির অথবা গতিশীল আধান দিয়ে বৈদ্যুৎক্ষেত্র, এবং গতিশীল আধান দিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্রের দেহটি গঠিত। সেই কারণে গত্যাত্মক প্রতিক্রিয়ার জন্য বিদুচ্চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রয়োজন। সেখানেই মৌলিক আধান-কণিকা রূপ ইলেক্ট্রনদের প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। আইনষ্টাইনের পূর্বোক্ত তত্ত্ব অনুযায়ী সে-ক্রিয়া বক্ররেখা ধরেই চলে। কারণ, বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্রের ঘনায়ন বশত সেখান থেকে ইলেক্‌ট্রনরূপ বস্তু-কণিকার উদ্ভবের ফলে তার পরিবেশ-অঞ্চলটি বক্র হতে বাধ্য। সুতরাং সে-বক্রতাটির কারণ বস্তুকণিকার আধান নয়, তার ভরই। সুতরাং আধানাত্মক কণিকার ঐ ভরের জন্যই তার অপরিহার্য বিদ্যুচ্চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে তার মাধ্যাকর্ষণীয় ক্ষেত্রটিও অবিচ্ছেদ্যভাবে লিপ্ত হয়ে আছে। সেই অবিচ্ছেদ্য বিমিশ্র ক্ষেত্রটির মধ্যেই ইলেক্‌ট্রন-প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। সে-প্রতিক্রিয়ার মূল মর্ম তার দেহ-পরিবর্তনে অর্থাৎ ফোটন-ত্যাগে। কিন্তু অন্য কোনো বস্তুর অর্থাৎ পরমাণুর অভ্যন্তরে তার যে ফোটন-বর্জন ক্রিয়া, তার সঙ্গে এর মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। পরমাণুর মধ্যে সে সর্বদাই ফোটন বর্জন করেনা। কিন্তু এখানে যখন সে সর্বদাই রূপান্তরশীল থাকে, তখন বুঝা যায় যে এখানে সে সর্বদাই ফোটন ত্যাগ করে চলেছে। কিন্তু একটি ইলেক্‌ট্রন থেকে প্রবাহিত ফোটনধারা যদি অফুরন্ত হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হয় যে, সে কেবল ফোটন-বর্জনই করে না, সে অবিরতভাবেই ফোটন-গ্রহণও করে চলেছে। খুব জোবাল একটি ফোটন যুগপৎ ইলেক্‌ট্রন এবং পজিট্রন নির্গত করে। হাইসেনবার্গ্‌ সূত্রানুযায়ী $১০^{-২১}$ সেকেণ্ডে এবং $১০^{-১১}$ সে. মি. দূরত্বের মধ্যে ঐ নির্গত ইলেক্‌ট্রন থেকে উদ্ভূত ফোটন-কণিকাও আবার যুগপৎ আর এক জোড়া ইলেক্‌ট্রন-পজিট্রন উৎপন্ন করে (দ্র., পৃ. ৩৩৮)। তা থেকে আবার ইলেক্‌ট্রন। এভাবে বাহ্যত একটি ইলেক্‌ট্রন বা একটি ফোটন থেকে অসংখ্য ইলেক্‌ট্রন ও ফোটনের উদ্ভব ঘটলেও আসলে যারা উৎপন্ন হচ্ছে সেই সব ফোটনরাই আবার তাদের পূর্বপুরুষদের তেজভাণ্ডার পূর্ণ করে দিয়ে তাদেরকে চিরন্তনভাবে তেজোগর্ভ ও জননশীল করে রাখছে। এভাবেই তারা চির-সক্রিয় থাকছে। আশ্চর্য যে, দু'টি ইলেক্‌ট্রনের উদ্ভব ক্ষেত্রের ঐ যে $১০^{-১১}$ সে. মি. দূরত্ব, ঐ দূরত্বই দ্য-ব্রগলি ইলেক্‌ট্রন-তরঙ্গেরও দৈর্ঘ্য। অর্থাৎ **ইলেক্‌ট্রনের তরঙ্গ-প্রকৃতিটি যেন ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া দিয়েই গঠিত।** ইলেক্‌ট্রনের মেঘ-বিলেপনের কারণটিই হচ্ছে তার ক্ষেত্র সহ একীভবন। এভাবেই সে যেন পুনঃ পুনঃ শূন্যে ডুবে যাচ্ছে আর সেখান থেকে পুনরায় ভেসে উঠছে। তাই সে কম্পমান ইলেক্‌ট্রন (trembling electron) নামে অভিহিত হয়েছে। তার তেজ

যা ইলেকট্রন-পজিট্রনের জনয়িত্রী ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিমাপ করে তার সেই আবির্ভাব ও তিরোধান ক্ষেত্রের পরিমাপ পাওয়া যায়।

ইলেকট্রন→ফোটন→পজিট্রন-ইলেকট্রন→ফোটন→

এভাবে সেকেণ্ডের মধ্যে কোটি কোটি বার রূপান্তর চলছে। বিকর্ষণী প্রভাবে ইলেকট্রনরা পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়। সে দূরত্ব তার মেঘ-বিলেপন দৈর্ঘ্যের চাইতে খুবই বেশি। ফোটনতেজ আবার তাদেরকে আরও দূরে ঠেলে দেয়। তাতে সে যে অনুপাতে ব্যবধান বাড়ায়, সেই অনুপাতে তার তেজও কমে যায়। তখন সে কুলমের সূত্রানুসারে (পৃ. ২৩৮) ইলেকট্রনদের বিকর্ষণী প্রভাবকে কমিয়ে আনে। কিন্তু শুধু ইলেকট্রন নয়। সকল প্রকার আধানাত্মক কণিকার মধ্যে এই প্রকার অনধিগম্য-বাস্তব (virtual) ক্রিয়া ঘটতে থাকে। **এই আকর্ষণ আর বিকর্ষণ, এই মিলন আর দ্বন্দ্ব,—এই নিয়েই প্রকৃতি; বা, এই দ্বন্দ্ব-মিলনের নামই প্রকৃতি।** দ্বন্দ্ব-মিলন বলছি এই জন্য যে, **দ্বন্দ্বের মধ্যেই মিলন এবং মিলনের মধ্যেই দ্বন্দ্ব চির-সক্রিয় হয়ে আছে। ওরা যেন একই প্রক্রিয়া। প্রকৃতি তাই এক দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্বই।** একই ভর-তেজ বিশিষ্ট দুইটি কণিকা (মুকুর প্রতিসম কণিকা) একত্র প্রতিক্রিয়াবদ্ধ হলেই আধানমুক্ত হয়ে ক্ষেত্রকণিকায় পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু যা অনধিগম্য-বাস্তব, তাই আবার পর মূহূর্তে অধিগম্য-বাস্তব বস্তু রূপে ধরা দেয়। পরমাণুতে ইলেকট্রনরা মেঘরূপ ধরে একটি কোনো সংযোগমূলক স্তরকে অবলম্বন করে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে চলে যায়। কিন্তু তার পরিবেশ-ক্ষেত্রের কম্পমান ইলেকট্রন তার মধ্যে তেজ সংক্রমিত করে তাকে পুনরায় তার পূর্ববর্তী স্তরে গিয়ে পৌঁছতে সাহায্য করে। এভাবে পরমাণুর আভ্যন্তর-ক্রিয়াটিও তার পরিবেশ-প্রভাবের বা পারস্পরিক ক্রিয়ার সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য ক্রিয়া-সূত্রে জড়িয়ে থাকছে। কিন্তু ঐ পরিবেশ বা ক্ষেত্রতেজের প্রভাব বা প্রকৃতিটি গামা-রশ্মি বা কোনো দৃশ্য রশ্মির সমপর্যায়ভুক্ত নয়। তাই তাকে বর্ণালিতে ধরা যায়নি। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর খুব উচ্চশক্তির যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় তার সাহায্যে জানা গেছে যে সেই তেজটি উচ্চ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট রেডিও-তরঙ্গযুক্ত তেজ বিশেষ। ইতিপূর্বে আমরা ইলেকট্রনের ঘূর্ণি এবং গতিবেগ সংক্রান্ত দ্বি-চুম্বক শক্তির কথা জেনেছি (পৃ. ২২৮)। চৌম্বক ক্ষেত্রে এরা একত্রে মিলে একটি নির্দিষ্ট চৌম্বকশক্তির প্রকাশ ঘটায়। তার মান ঐ উভয় চৌম্বক শক্তির যোগফলের চাইতেও বেশি। এর কারণও, ইলেকট্রনের সঙ্গে তার ঐ ক্ষেত্র বা পরিবেশের স্বতঃপ্রতিক্রিয়া। পরমাণুর পরিক্রমারত ইলেকট্রন তার ক্ষেত্রাধিষ্ঠিত প্রতিবেশির সঙ্গে যে প্রতিক্রিয়া চালায় তার ফলেই ক্ষেত্রস্থ ইলেকট্রনের মধ্যে একটি তরঙ্গপ্রবাহ চলতে থাকে। এই অনধিগম্য স্রোতের চৌম্বক ফলটি অন্য চৌম্বক শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়ে একযোগে বাস্তব ইলেকট্রনটিকে সরিয়ে দিতে সাহায্য করে।

এসব থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, প্রকৃতির রাজ্যে ক্রিয়াবিহীন অবস্থায় কোনো ইলেক্‌ট্রনের অস্তিত্ব অসম্ভব। সর্বদাই সে ফোটন গ্রহণ করে আকৃষ্ট এবং ফোটন-বর্জন করে বিকৃষ্ট হচ্ছে। ফোটন-মেঘমালায় সে আবৃত, বিলেপিত। সে মেঘের শেষ নাই। তবুও তারই মাঝে (সেই $১০^{-১১}$ সে. মি. স্থানেই) ফোটন-মেঘ ঘনীভূত হয়ে ইলেক্‌ট্রনকে ফুটিয়ে তুলছে, আবার পর মুহূর্তে তাকে বিলেপিত বা বিলীন করে দিচ্ছে। সুতরাং কি করে তার সত্য পরিমাপ মিলবে? প্রোটনেরও সেই দশা। তারও চারদিকে আরও ক্ষুদ্র পরিসরে ($১০^{-১৩}$ সে. মি.) পাই-মেসনের মেঘ। তারই অভ্যন্তরে আবার কে-মেসন মেঘের সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া চলছে। প্রোটন এবং বিপরীত-প্রোটনের বিলুপ্তি-ব্যবধানে সেও কম্পমান। সেই মেঘ-বিলেপিত কম্পমান কণিকার আবার পরিমাপ কি? এক একটি অতিকণিকা তো তার আন্তঃক্রিয়ার সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য সত্তায় আবির্ভূত হয়। তার **কাঠামোটি তার সেই আন্তঃক্রিয়ারই বহিঃপ্রকাশমান রূপ মাত্র।** অর্থাৎ কণিকার কাঠামোটি **তার আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ারই প্রকাশ-ভঙ্গিমা।** তাই একমাত্র ক্রিয়াগুলি দিয়েই তার যা পরিমাপ। সেই কারণেই আবার তার ঐ কাঠামোর পরিমাপ দিয়েই তার ক্রিয়া-পরিচয় লাভ করা যায়। এভাবেই কণিকার **আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার সূচক হিসাবে তার তেজ এবং বহিঃকাঠামোর সূচক হিসাবে তার ভর, উভয়ে এক অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়াতে মিলিত থেকে এক অভিন্ন সত্তা হিসাবে আবির্ভূত। যন্ত্রী-প্রক্রিয়া ও যন্ত্র-প্রক্রিয়ার** (দ্র., পৃ. ৪৪৪-৪৫) **সম্মিলিত ফল হিসাবেই বস্তু প্রক্রিয়াটি উত্তানমান।**

দেশ সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটি কি রকম? ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই মানুষের দেশ সন্দর্শন ঘটেনা। প্রথমে আমরা কতকগুলি বস্তুকে চোখ দিয়ে দেখি। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সে সব বস্তুকে স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরখ করতে না পারি ততক্ষণ পর্যন্ত তার অবয়ব সম্বন্ধে আমাদের কোনো যথার্থ জ্ঞান জন্মায়না। তাই দূর নীহারিকা বা নক্ষত্রের সম্বন্ধে যেমন, দূর থেকে প্রথম দেখা পাহাড় বা ধাবমান উড়োজাহাজের অবয়ব সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা তেমনি অস্পষ্ট থেকে যায়। কোনো একটি স্থির গোলকের অর্ধেকটি বহিস্তল দেখে যে আমরা অপরার্ধের অদৃশ্য বহিস্তলটি সম্বন্ধেও ধারণা করে নিতে পারি, তার কারণ সেই বাকি অংশটির সম্বন্ধে আমাদের চক্ষু বা স্পর্শেন্দ্রিয়গত পূর্ব পরিচয় বা পূর্ব প্রতীতি। আবার একটি অপরিচিত বস্তুকে অন্ধকারে কেবল স্পর্শ ক'রে তার অবয়ব সম্বন্ধে পূর্ণ পরিচয় লাভ করতে পারিনা। অথচ যে-বস্তুকে আমরা একবার দেখেছি এবং স্পর্শ করে পরীক্ষা করেছি, অন্ধকারে তার অংশমাত্র স্পর্শ করে বা আলোকের মধ্যে তার অংশমাত্র দেখে তার অস্পৃষ্ট বা অদৃশ্য অংশাবশেষ সম্বন্ধেও ধারণা করে নিতে

পারি। এবং একবার তার সর্বাঙ্গটি দেখা এবং ছোঁয়ার পর যদি ভাষা দিয়ে তার কোনো নামকরণ করে দিই, তাহলে তারপর তাকে একেবারেই না দেখে বা না ছুঁয়ে শুধু তার ঐ নামটি শুনেই সে-বস্তুর ঐ বহিরবয়ব সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট ধারণা করে নিতে পারি। বার বার দেখে বা স্পর্শ করে আমাদের ধারণাটি যত স্পষ্ট বা জোরাল হয়, আমাদের স্মৃতিতে তার স্থায়িত্বও তত বেশি হয়। তারপর বস্তুটি হয়ত আর একেবারেই নাই, তবুও তার সম্বন্ধে আমাদের সেই পূর্বলব্ধ ধারণাটি থেকে যায়; সেইটিই আমাদের দেশ সংক্রান্ত ধারণা। সুতরাং বস্তু না থাকলে, বা তার সম্বন্ধে আমাদের কোনো পূর্বধারণা না থাকলে দেশ সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণাই থাকতে পারেনা। সুতরাং **দেশ সম্পূর্ণই পদার্থ- বা বস্তু-নির্ভর।**

আবার কোনো বস্তুকে যে আমরা বড় বা ছোট, কিংবা নিকটবর্তী বা দূরবর্তী দেখতে পাই, তার কারণ সে-বস্তু থেকে একসঙ্গে যথাক্রমে বেশি বা কম সংখ্যক ফোটন এসে আমাদের চক্ষু যন্ত্রটিতে আঘাত করে। অন্ধকারে যে আমরা কোনো বস্তুকে বড় বা ছোট, নিকটবর্তী বা দূরবর্তী দেখতে পাইনা, তার কারণ সেখানে বস্তুর ফোটন-ক্রিয়া এবং চক্ষু-যন্ত্রের উপর তার প্রভাবটি সম্পূর্ণতই স্তব্ধ হয়ে গেছে। এতেই বোঝা যায় যে, বস্তুর ফোটন-ক্রিয়া যদি কখনও না ঘটত, তাহলে বস্তুকে আমরা কখনও দেখতে পেতামনা। তার সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণারও উদ্ভব হতনা। তার ফলে আমাদের দেশ সংক্রান্ত কোনো বোধও জাগ্রত হতে পারতনা। তাহলে প্রথমে **বস্তুর অস্তিত্ব,** তারপরে তার **কণিকার বহিঃক্রিয়া** বা গতি, তারপরে আমাদের ইন্দ্রিয়-যন্ত্রের উপর **তার প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব,** তারপর সেই প্রতিক্রিয়া বা প্রভাবজাত ফলের উদ্ভব ও অবস্থান, ক্রমসংগ্রহ ও ক্রমধারণ এবং এভাবে আমাদের **ধারণা** ও ধারণাসংগ্রহের সমাহার জনিত স্মৃতি বা **মনের সৃষ্টি,** এবং তারপর আবার সেই মানসপটেই অন্যান্য সকল বস্তুর মতই **দেশ সম্বন্ধীয় ধারণার** সৃষ্টি সম্ভব হয়। সুতরাং ঐ **বস্তু ও বস্তুক্রিয়া,** (এবং তজ্জনিত) **ইন্দ্রিয় যন্ত্র ও বস্তুক্রিয়ার** ফলে ইন্দ্রিয় যন্ত্রের প্রতিক্রিয়া এবং **ধারণা, মন ও সুদৃঢ় প্রত্যয়**—এরা সকলেই বাস্তব সত্তা। কিন্তু পর পর এদের **সৃষ্টি হয়েছে।** এরা ক্রম-উজ্জীবিত। অর্থাৎ বস্তু ও তার অবিচ্ছিন্ন প্রকৃতির (ক্রিয়ার) উপর নির্ভর করেই ইন্দ্রিয় যন্ত্র ও তার সহাবস্থিত ইন্দ্রিয়-প্রতিক্রিয়া, এবং ইন্দ্রিয় ও তার প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করেই ধারণা মন ও প্রত্যয়ের অভিব্যক্তি ঘটেছে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় না থাকলে মনের কোনো অস্তিত্ব, বা বস্তু না থাকলে ইন্দ্রিয়ের কোনো অস্তিত্বই থাকতে পারেনা। সুতরাং (**ভরতেজাত্মক** পদার্থ—পদার্থসংঘ বা বস্তু—মন বা মস্তিষ্কপদার্থ) **চিরন্তন ভাবে যা আছে, তা ঐ বস্তু বা তার উপাদানমূলক পদার্থ। ইন্দ্রিয়-যন্ত্র বা ধারণা-মনের কোনো চিরন্তন অস্তিত্ব অসম্ভব, ওরা উপজাত বাস্তব সত্তা**

হলেও ওদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং **মননির্ভর দেশ সম্বন্ধেও** একথা খাটে। আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ীও দেশ কেবল একটি ধারণা মাত্র।

এ জগতে যখন বস্তু বা পদার্থ-বিহীন দেশ বলে কিছু নাই, তখন বস্তু বা পদার্থক্রিয়া-বিহীন সময়সম্বন্ধেও কাল বলেও কিছু নাই। কালও একটি ধারণা মাত্র। সে ইন্দ্রিয়নির্ভর, বহির্বস্তুনির্ভর। কারণ, পূর্বোক্ত ফোটন-ক্রিয়া না থাকলে চোখের কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং তাতে কাল-ধারণাটিও বিলুপ্ত হয়। অন্ধের কাছে কাল প্রতীতি যেমন, সূচীভেদ্য অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ চক্ষুষ্মাণ ব্যক্তির কাছেও কালের পরিচয়টি তেমনই। বহির্বস্তুর ক্রিয়া দৃষ্টেই আমাদের কাল-প্রতীতি জন্মায়। বস্তুত পক্ষে, ক্রিয়াসমূহের ক্রমের ধারণাই আমাদের কাল-ধারণাটিকে সৃষ্টি করছে। তাই বস্তুক্রিয়া বা ঘটনা বন্ধ হয়ে গেলে ঘটনাকালও স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বস্তুক্রিয়া দু' রকম হতে পারে। অতিকণিকা বা ভরতেজমূলক পদার্থমেঘ জনিত আন্তঃক্রিয়া এবং পদার্থসংঘ-রূপ সূর্যাদির মত বস্তুজনিত বহিঃপ্রতিক্রিয়া। এজন্য কাল সম্বন্ধীয় ধারণাটিও দুই প্রকার হতে পারে। তবে এই থেকে আবার অন্তঃক্রিয়া ও বহিঃক্রিয়া বিভিন্ন হলে **কাল-ধারণাও বহু প্রকার** হয়ে যায়।

পৃথিবী ও সূর্যের বহিঃক্রিয়া সকলেরই প্রত্যক্ষগোচর বলে তজ্জনিত কালটি সার্বজনীন। কিন্তু ভূগর্ভের আঁধার প্রকোষ্ঠের লোকটির কাছে পৃথিবী ও সূর্যের ঐ বহিঃক্রিয়ার কোনো প্রভাব না থাকায় তার কাছে পার্থিব সার্বজনীন কালটির কোনো পরিচয় নাই। তবে তার নিজের অন্তঃক্রিয়া বা হৃৎপিণ্ডের কাঁপন থেকে তার একটি কাল-ধারণা জাগতে পারে। কিন্তু সেটি হবে তার একেবারেই নিজস্ব কাল-ধারণা। অন্য ব্যক্তির হৃৎকম্পনের সঙ্গে তার কোনো যোগ না থাকায় তা সার্বজনীন হতে পারেনা। সুতরাং প্রত্যেকেই তাহলে এক একটি পৃথক পৃথক কালবোধায়ক বা কালমাপক যন্ত্র বা ঘড়ির দ্বারা চালিত হচ্ছে। বা আরও ঠিকভাবে বললে বলা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির অন্তঃক্রিয়া যেন ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের এক একটি নিজস্ব ঘড়ি তৈরি করে নিচ্ছে। যার অন্তঃছন্দ যত দ্রুত, তার কালও ততই দ্রুতগতি। যার ধীর লয়, তার কাল যেন চলতেই চায়না। সুতরাং **কালও বস্তুক্রিয়ার একটি ধর্ম মাত্র। বস্তু ব্যতিরেকে সে মূল্যহীন ও অসার্থক।** তবে কাল-বোধের সঙ্গে ঐ ক্রিয়াছন্দটি কিন্তু জড়িয়ে থাকে। সে-ছন্দের শৃঙ্খলা না থাকলে তা থেকে উদ্ভূত কালধর্মের কোনো শৃঙ্খলাই থাকবেনা। তবে শৃঙ্খলা যে আছে, মনই তাকে প্রমাণ করবার জন্য হাত-ঘড়ি বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তাতে কি সে-শৃঙ্খলা ধরা পড়েছে? আজ যতক্ষণে পৃথিবী তার কক্ষের চারদিকে একবার ঘুরে এল, আগামী কাল যদি সেজন্য তার চাইতে কম সময় লাগে, তাহলে কি হাত-ঘড়িতে তা ধরা পড়বে? তা পড়বেনা। কারণ, পৃথিবী অধিকতর জোরে ঘুরলে তার সবগুলি ঘড়িই একই রীতিতে (uniformly) আরও স্লো চলতে থাকবে। সুতরাং ছন্দের মধ্যে শৃঙ্খলা থাকছে কি না, তা হয়ত জানা যাবেনা। কিন্তু তা না হলেও একটি জিনিস জানা যাবে যে, গতিবেগের সঙ্গে ঘড়িটি বা কাল-পরিমাণের বোধটি চিরসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে থাকছে। **বস্তুর গতিবেগ থেকেই কালবোধের উদ্ভব ঘটছে। দেশের মতই তারও নিজস্ব কোনো পৃথক সত্তা নাই। বস্তুবিবর্তনের ফলেই বহিরেন্দ্রিয়রূপ যন্ত্রের সৃষ্টি।**

আবার বহিরেন্দ্রিয়ের বিবর্তনের ফলে যে মনেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি ঘটছে, সেই মনই আবার বস্তুকে দেখছে বা জানছে। এবং জানছে দেশ ও কালরূপ আর দু'টি ধারণা-বস্তুকে বা আর দু'টি সূক্ষ্ম যন্ত্রকে তৈরি করে নিয়ে। অথচ এ-যন্ত্র তৈরি করার জন্য তাকে পৃথক প্রযত্ন বা পৃথক জ্ঞান প্রয়োগ করতে হয়নি। সুতরাং **ইন্দ্রিয়, মন, দেশ, কাল, এগুলি বস্তুর টিকে থাকার বিভিন্ন অবস্থাগত ভঙ্গি মাত্র; সবই যন্ত্র-প্রক্রিয়ার অন্তর্গত, অথচ সবগুলির ঐ ভঙ্গিসমূহ তার যন্ত্র-প্রক্রিয়ার নিশ্চিত পরিণতি।**

কিন্তু সেই যন্ত্র-যন্ত্রী প্রক্রিয়ার মূল মর্ম ও আসল তাৎপর্যটি আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে :

ভর-তেজের চিরন্তন ও অনিবার্য পারস্পরিক স্বতঃরূপান্তর—গতিময় ভর-তেজাত্মক পদার্থ

গতিময় ভরতেজাত্মক পদার্থ→পদার্থসংঘ বা বস্তু→প্রাণময় ইন্দ্রিয়→মন বা মস্তিষ্ক পদার্থ

এভাবেই বর্তমানে আমাদের এই পৃথিবীতে মূল পদার্থের বিবর্তন বা পদার্থ-প্রক্রিয়া অক্ষুণ্ণ ও অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সে প্রক্রিয়া যে কেবল এক তেজ থেকে অন্য তেজে রূপান্তর, তাই না। তেজ থেকে ভর, এবং ভর থেকে রূপান্তর ঘটনাও সেই প্রক্রিয়ারই নামান্তর মাত্র। সুতরাং **ভর আর তেজের পার্থক্যটিও সম্পূর্ণভাবে গুণগত নয়। সে পার্থক্য পরিমাণগত। একই বিশ্বব্যাপ্ত মূল** পদার্থের তেজাংশ বিশেষ কোথাও ঘনীভূত বা সংকুচিত হয়ে এসে ভরবস্তুতে রূপ নেয়। **ঘনীভূত তেজাংশ বিশেষই তখন একটি ভরসত্তায় পরিস্ফুট হয়ে উঠে।** তখন সে রীতিমত ভার বা ওজন বিশিষ্ট। কিন্তু তাই বলে তখন পদার্থনভের মধ্যে কোথাও কোনো শূন্যস্থান সৃষ্টি হয়ে যায়না। পরিবেশের অবিচ্ছিন্ন পদার্থধারা তখন প্রসারিত হয়ে তার জায়গাটি ভরে দেয়। অর্থাৎ **যে মুহূর্তে পদার্থের ভরধর্মের মধ্যে তার দেশধর্মটি সংকুচিত হয়ে যায়, সেই মুহূর্তেই পরিবেশ-পদার্থের তেজধর্মের মধ্যে তার দেশধর্মটি প্রসারিত হয়ে পড়ে।** —আবার যখনই ঐ ঘনীভূত তেজ বা ভর বস্তুটি বিস্তৃত হতে থাকে, তখনই সেই ভরবস্তুও তেজবস্তুতে বিস্তার লাভ করে মূল পদার্থের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। সেই তেজটিকে ধরে নেওয়ার জন্য তখন আবার তার পরিবেশ-পদার্থের মধ্যে সংকোচন দেখা দেয়। অর্থাৎ **ভরধর্মের মধ্যবর্তী পদার্থের দেশধর্মটি প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরিবেশ-পদার্থের দেশধর্মটি সংকুচিত হয়ে পড়ে।** এভাবেই বিশ্বপদার্থের দেশধর্মের সংকোচন-প্রসারণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সূত্রেই চিরকাল ধরে ভর ও তেজের প্রতীয়মানতা এবং অপ্রতীয়মানতা কিংবা বহিঃপ্রকাশ ও অন্তর্লীনতা সংঘটিত হয়ে চলেছে। পদার্থমহাসমুদ্রের এই চিরন্তন আবেগ-তরঙ্গের যেন কোনো বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই।
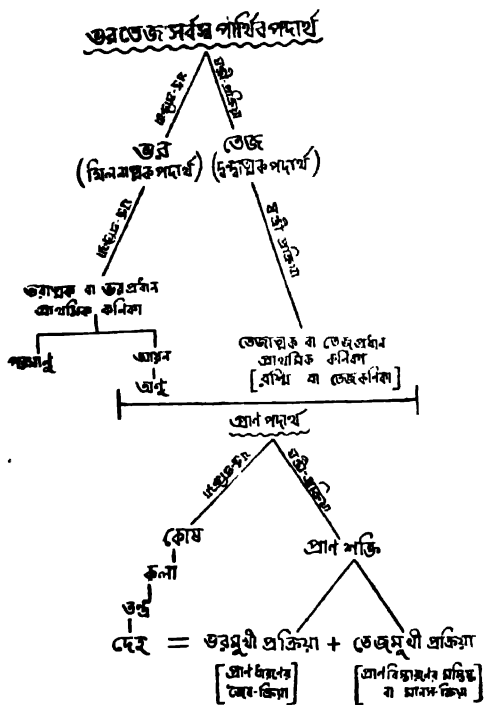
মূল পদার্থের বিবর্তন*

[বা, প্রকৃতি-প্রক্রিয়ার প্রকাশভঙ্গিমা]
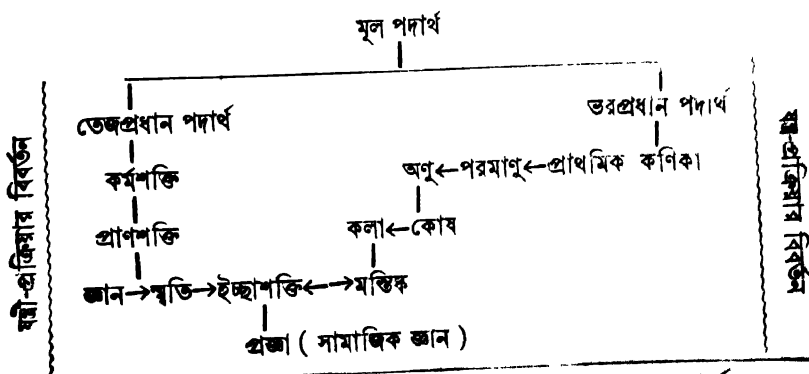
* [তেজপ্রধান পদার্থের মধ্যে যেমন ভরও আছে, তেমনি ভরপ্রধান পদার্থের মধ্যেও তেজ বিদ্যমান থাকে। কর্মশক্তি যেমন প্রাথমিক কণিকাদির সাহায্যে নিজেকে প্রকাশ করে, তেমনি প্রাথমিক কণিকাদিও কর্মশক্তির সাহায্যেই প্রকাশ পায়। এইভাবে

পদার্থ আর তার আবেগ নিয়েই পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, নীহারিকা, 'মহতো মহীয়ান্' সর্ববিশ্ব ; পরমাণু আর অতিপরমাণু, 'অণোরণীয়ান্' সর্বসত্তা। কিন্তু নভোমণ্ডল আর তার গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে মানুষ একদা কত কথাই না ভেবেছে। আকাশে সূর্য ধেয়ে চলে। মানুষ তাকে জড়ও দেখেছে, জীবও ভেবেছে, মানুষ বলেও কল্পনা করে নিয়েছে। আবার চেতনাবান জীবের চাইতে সে তাকে অনেক বড় বলেও জেনেছে, জেনেছে দেবতা বলে। কখনও সেই জ্বলন্ত ভরপিণ্ডটি হয়েছে অগ্নির মুখ, কখনও বিরাট নয়ন। কখনও বা রথচক্র, —গগনে গড়িয়ে চলে। বা নিজেই সে ধাবমান অশ্ব,—আকাশ পথে নিত্য ধাবমান। বা সুপর্ণ-গরুত্মান্ (গরুড় পক্ষী),—আকাশে উড়ে বেড়ায়। বা হয়ত সে প্রথম মানব, যে সোম তৈরি করেছিল। কখনও তিনি দেবতা,—অশ্ব-রথে চড়ে চলেন, সপ্তরশ্মি তাঁর সপ্তাশ্ব। তিনি ত্বষ্টা,—কারু-শিল্পী, তিনি পুষ্টিম্ভর,—পুষ্টি আনেন। তিনি মার্তাণ্ড, তিনি ধাতা ; তিনি পূষণ, মিত্র, সবিতা (এগুলি বেদবর্ণিত সূর্যের সংজ্ঞা বা নামভেদ বিশেষ) ; তিনি বিষ্ণুর চাইতেও বড় দেবতা। আকাশই তাঁর পিতা।—কিন্তু আজ আমরা সেই জনয়িতা আকাশকে জেনেছি। জেনেছি তাকে ভরতেজসর্বস্ব পদার্থময় সত্তা বলে। জন্য-জনক সম্বন্ধও আজ আমরা বুঝে নিই। বুঝে নিই সবিতৃদেবকে হিলিয়াম আদি গ্যাসে ভরা পদার্থ বা বস্তুসংঘ বলে। সে মুখ নয়, বা নয়ন নয় ; পক্ষী নয়, বা অশ্ব নয়, বা নরও নয়। নয় সে শিল্পী, নয় সে দ্যুলোক-দেবতা।

আকাশের বায়ুবাহিত মেঘমালা দেখেও কি আমরা কম ভেবেছি নাকি, বা আজও কি কম বিস্মিত হই ? পাহাড়ের মত সে দাঁড়িয়ে থাকে, তার চাইতে গহন গম্ভীর আর মহান্ কে ? পাখীর মত সে উড়ে চলে ;—তার চাইতে চলমান বা জীবন্ত কে ? ক্ষণে ক্ষণে সে রূপ পাল্টায়,—তার মত লীলাময় কে ? রূপের কি তার শেষ আছে ? সে শুভ্র, সে কৃষ্ণ, সে নীলাঞ্জন। কৃপার কি তার সীমা আছে ?—সে যে বর্ষণ করে ! কিন্তু কে সে মেঘ, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের পরমাণু ছাড়া ? বস্তু-বাষ্পের তেজগর্ভ অণুপুঞ্জ বই কী আর সে ? দ্যুলোকের সূর্য, অন্তরীক্ষলোকের বায়ু বা মেঘ (ইন্দ্র), আর

ইচ্ছাশক্তি (অর্থাৎ সর্বব্যাপ্ত পদার্থতত্ত্ব) প্রভৃতিও মস্তিষ্ককে অবলম্বন করে সত্তাবান্ থাকে এবং মস্তিষ্কও ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতির সাহায্যে নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়। বা অন্যভাবে বলা যায়। মস্তিষ্ক বা ইচ্ছাশক্তি, এদের একের বিবর্তনের ফলে অন্যটিও বিবর্তিত রূপ পরিগ্রহ করে।—এখানেও নিশ্চয় ভর-তেজের 'সমতুলতা'র তত্ত্ব (law of equivalence) অব্যাহত থাকে এবং সম্ভবত তা কেবল ওজনের দিক থেকে নয়, অনেকাংশেই আয়তনের (volume) দিক থেকেও (তু., পৃ. ৪০)। সেই জন্যই সম্ভবত ক্রমবর্ধিত প্রচণ্ডগতিযুক্ত হলেও বস্তুর হঠাৎ আকৃতি বা আয়তনগত ও গুণগত পরিবর্তন ঘটে যায়। বস্তুর এই হঠাৎ উল্লম্ফন বা বিপ্লবের তত্ত্বও তাই এর সঙ্গে জড়িত।]

পৃথিবীলোকের বরুণ (জল) আর অগ্নি,—পদার্থলোকোদ্ভূত উদ্ভাসমান ভঙ্গি বই কি আর ওরা ?

সমগ্র বিশ্ব আর তার সকল জীব জড়াদি সত্তা সেই পদার্থ থেকেই উদ্ভূত। তারা সেই পদার্থ-ক্রোড়েই সত্তাবান্। সেই পদার্থের বুকেই আবার তারা বিলীয়মান। সুতরাং সর্বসত্ত্ববিশ্ব যেখানে তারই ক্রোড়লগ্ন 'নীড়', সেখানে সেই পরম পদার্থকে অগ্নি তো তুচ্ছ কথা, 'সূর্য-চন্দ্র-তারকা-বিদ্যুতে'র পারও নিশ্চয় বলা চলে। সে প্রকাশমান বলেই তাকে অবলম্বন করে সর্ব বিশ্ব প্রকাশ পায়, তারই আবেগে 'ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল' হয়ে উঠে। তারই প্রেরণায় 'প্রথম প্রাণ' জেগে উঠেছে। আর তারই তাড়নায় 'মৃত্যু উঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে।' বস্তুকে সে ফুটিয়েছে, দেহকে মূর্ত করেছে। চেতনাকে সে অভিব্যক্ত করে তুলেছে, ইচ্ছাশক্তিকে সে শতদল কমলের মত বিকশিত করে দিচ্ছে। আকাশের নীলিমা তো শুধু তারই সন্নিবেশ! পুষ্পের মধুরিমা, সে তো তারই বিন্যাস! ঝর্ণার মুখে হাসি ঝরায় তার গতি-উচ্ছ্বাস। তটিনীর মুখে বাণী দেয় তার কল্লোল। পাখির গানে জেগে ওঠে তার কাকলি। জীবের মুখে ভাষা দেয় তার চেতনা। তারই মহিমা এসে পাহাড়ের বুকে বিস্ময় জাগিয়ে তোলে। তারই মন্ত্রণা এসে মরুবক্ষে হাহুতাস লাগিয়ে দেয়। ভুজঙ্গের মুখে তার বিষ, জননীর বুকে তার পীযূষ, শিশুর মুখে তার হাসি। দাদুরী ডাকে,—সে তো তারই আশা। বাবুই বাসা বাঁধে,—সে তো তারি ভরসা। দেহের লাবণ্যে তারই শিহরণ জাগে। মুখের সুষমা,—তারই কাঁপন মাগে। বজ্রের নিনাদে সে গর্জন করে। সেই তো বর্ষণ করে বৃষ্টির ধারে। প্রলয় তো সে তারি তাণ্ডব লীলা—সে যে ভীষণ ভয়াল! সৃষ্টির মধু ক্ষরে তারই উচ্ছ্বাসে—সে যে মধুক্ষরা! বর্ষণ আর গর্জন আর ক্রন্দন, নীলিমা আর মধুরিমা আর সুষমা, গরল আর অমৃত, বিস্ময় আর হাহুতাস, হাসি-গান-বাণী আর চেতনা,—এতো তারই প্রেরণার ভাষা, তারই আবেগের ক্রমাভিব্যক্ত ভঙ্গিমা। বৃষ্টি-বজ্র-আকাশ, মরু-পর্বত-অরণ্য, নির্ঝর-তটিনী-তরু-লতা-জীব রূপে সেই একই পদার্থ পরিস্পন্দিত, ক্রমবিকশিত।

ভর আর তেজের মিলন আছে,—ওদের নিত্যমিলন। বস্তুপিণ্ডের 'ভারাবর্তন' বা মহাকর্ষ আছে,—ওরা চিরকাল একে আর একজনকে টানছে। বাধা সরিয়ে দিলে প্রচণ্ড আবেগে এক বস্তুভর আর এক বস্তুভরের বুকের 'পরে আছড়ে প'ড়ে আত্মলীন হতে চায়। কিন্তু বড়ো ভীরু ওরা,—আপনা থেকে কিছু করবেনা। আর বড়ো দীন যেন,—বাধার বুকেই এসে হয়ত ফেটে পড়বে। চুম্বকের বিদ্যুৎ আছে। ওরা কিন্তু কেউ কাউকে ছাড়েনা, বা বাধার বুকে এসে ফেটে পড়েনা। ওরা তেজ, ওদেরও নিত্যলীলা। পরম পদার্থের আবেগ এসে পৌঁছলে ওরা অস্থির হয়ে উঠে। যতই সে বেগ আসে, ততই ওরা পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে। পরমাণু-ভরের আবার প্রোটন-ইলেক্ট্রন রূপ তেজ আছে।

দু'টি তেজকণিকা দিয়ে যেন ভরের এক কণা। যেন ভরকে ভরে দেওয়ার জন্যই চিরকাল ধরে ওরা একজনে আর একজনকে টানছে। কিন্তু পদার্থনভ থেকে ফুটে ওঠার সময় ওরা যেন স্বতোগতি হরণ করে এনেছে। আপনা থেকেই তাই ওরা দূরে সরে যেতে পারে, আবার কাছেও ছুটে আসে।—ওরা লীলাময়। পতঙ্গেরও যুগল আছে। পদার্থের ভর এসে পৌছলে তারা কাঁপতে থাকে; তার ভাব এসে লাগলে তারা শিহরিত হয়। একে অন্যের পানে অন্ধ আবেগে ছুটে যায়। যেন এক ভর আর এক ভরকে ভারাবর্তনে (মহাকর্ষ-বলে) টানছে, বা এক তেজ আর এক তেজকে বিদ্যুচ্চৌম্বক টানে আকর্ষণ করছে। কিন্তু ভর আর তেজের এক অভিনব সংহতি তারা,—পদ বা পক্ষ চালনা করে তারা স্বেচ্ছায় ছুটে যায়।

কিন্তু ভর ও তেজের দ্বন্দ্বও আছে।—ওরা চিরবৈরী। চুম্বক আর বিদ্যুতের সমমেরু আছে,—তারা কিছুতেই কেউ কাউকে সহ্য করেনা। কাছে এসে পৌছলে একজন আর একজনকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আর জীব যে? যে কিনা ভর আর তেজের সংগতিময় মহাসত্তা, ভর-তেজাত্মক গতি বা শক্তিপ্রক্রিয়ারাজির মহাসমাহার? অন্য এক জীবের সাথে তার মিলনও আছে, দ্বন্দ্বও আছে। মিলনতৃষ্ণায় অন্ধ আবেগে একজন আর একজনের কাছে ছুটে যায়। পরস্পরকে কাছে টানে, ভালবাসে,—শাবককে জড়িয়ে ধরে হয়ত ব্যাঘ্রী-মা। কিন্তু জীবের মধ্যে আবার বিকর্ষণও আছে। পতঙ্গের কোমলাঙ্গে ছোঁয়া লাগলে সে হয়ত নিমেষের মাঝে সংকুচিত হয়ে সরে পড়তে চায়। সারা অঙ্গ ছুড়ে সিলিণ্টেরাটা লাফিয়ে উঠে, সাপেরা ছোবল মারে।

ওদিকে আবার কেন্দ্রকের মাঝে নিউট্রন-প্রোটন আছে। আর আছে তাদের কেন্দ্রকাবেগ। যেন এক সৃষ্টিছাড়া মিলনাবেগ,—সমমেরুরও আকর্ষণ! আর সেজন্যে ওরা আবার ভীরু নাকি? কী প্রচণ্ড বেগ ওদের,—পরোয়া করেনা অন্য কাউকে। অথচ কাছ থেকে একটু দূরে সরে গেলে কী প্রচণ্ড বিকর্ষণ! যেন কেউ কাউকে চেনেনা, জানেনা,—এত বিভিন্ন ওরা, এত পরদেশী। কিন্তু একটিবার কোনো রকমে কেন্দ্রকে বাঁধা পড়লে ওরা মিলনোন্মাদ হয়ে উঠে। একে অন্যের মধ্যে আত্মবিলুপ্ত না হতে পারলে যেন তখন ওদের শান্তি নেই, এমনই ভাব,—তাই প্রমত্ত বেগে ওরা পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে। দূর থেকে আঘাত হানলে তারা পালটাবে, কিন্তু যেন মরবেনা বা ছাড়বেনা কেউ কাউকে।

আর জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের নাই কি? ভরতেজময়ী প্রকৃতি যন্ত্র আর যন্ত্রী হয়ে এক অবিচ্ছেদ্য রূপ পরিগ্রহ করে চলেছেন। সর্বব্যাপ্ত পদার্থ তার যন্ত্রপ্রক্রিয়ায় ভররূপ পরিগ্রহ করে সর্বভূত হয়ে উঠল। তার যন্ত্রীপ্রক্রিয়া তেজরূপকে আগ্রহ করে সর্বভূতান্তরাত্মা হয়ে গেল; কান্তি-রূপে, চেতনা-রূপে, স্মৃতি-বুদ্ধি-শক্তি- আর তৃষ্ণা-ও শান্তি-রূপে সর্বভূতে

সংস্থিত হল। ক্রমেই ভারাবর্তন, কেন্দ্রকাবেগ, বিদ্যুৎ আর চুম্বকের আকর্ষণ বিকর্ষণাদি তেজপ্রক্রিয়াগুলি সব নানাবিধ ভর-রূপের মধ্যে নানাভাবে সংস্থিত হয়ে নানা প্রকার সত্তার অভ্যুদয় ও বিকাশ ঘটিয়ে দিলে। ভরের বিকাশ হল দেহে। তেজের নব অভ্যুদয় ঘটল প্রাণে। প্রাণীদের বিবর্তন চলতে লাগল। রসায়ন-প্রতিক্রিয়া বিবর্তিত হয়ে উঠল বিপাক-বিক্রিয়ায় (metabolism)। অনিবার্যভাবে তার ক্রিয়াক্ষেত্রও যেন আবর্তিত হয়ে উঠল বিদ্যুৎ-কোষ থেকে দেহকোষ রূপে। এখানে আর রাসায়নিক ক্রিয়ার মত এক বস্তুসংঘের বদলে আর এক বস্তুসংঘের উদ্ভব নয়। এখানে এক বস্তুসংঘের বদলে আবার সেই বস্তুসংঘেরই পুনরাবির্ভাব, বা তার দ্বিতীয়-প্রকাশ বা নব-সন্নিবেশ। দেহকোষ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে ভেঙে যায়। কিন্তু আবার তারা পূর্ণ দু'টি কোষ হয়েই দেখা দেয়। কোষ হয়ত কোষই থেকে গেল কিন্তু মাঝখানে ভাঙা আর গড়ার খেলা খেলে যায়। রসায়ন-প্রতিক্রিয়ার মতই মাঝখানে ধ্বংস-সৃষ্টিরূপ তেজলীলা দেখিয়ে এক ভর আর এক ভরে চলে আসে। কিন্তু পদার্থ (বস্তু)- বা রসায়ন-প্রক্রিয়ায় যে ক্ষয়-বৃদ্ধি, তার শৃঙ্খলা থাকলেও তার সংগীত কই ? অথচ জীবকোষের যে বিপাক-ক্রিয়া !—সে যাকেই ভাঙে, তাকেই গড়ে। যাকে গড়ে তোলে সে ভঙ্গুর, যাকে ভেঙে ফেলে সে সৃজ্যমান। ক্ষণে ক্ষণে তার এই লীলা। তাই তো সে কেবল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার রূপান্তর নয়, যে একবার ঘটেই শেষ হয়ে গেল, বা তেজস্ক্রিয় প্রক্রিয়ার মত ক্রমেই ক্ষয়ে ক্ষয়ে চলল। সে যে ভর-তেজের পারস্পরিক ক্রমরূপান্তর ! রসায়ন আর কেন্দ্রক-প্রক্রিয়ার উপাদান আর ক্রিয়া একযোগে মিলিত হয়ে তাই কোষক্রিয়ার জীবোপাদান হয়ে উঠেছে। কিন্তু পদার্থ সে নিশ্চয়, —সেই মধু (carbohydrate), সেই স্নেহ (fat), সেই প্রাণ (protein),—কার্বন-হাইড্রোজেন-অক্সিজেন, নাইট্রোজেন-সালফার-ফসফরাস, ক্লোরিন-পটাসিয়াম-সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম-লোহা-তামা। কিন্তু সে প্রাণপদার্থ। আবার নিশ্চয় সে ক্রিয়া, কিন্তু বিপাক-ক্রিয়া। এই প্রাণপদার্থ আর বিপাক নিয়ে যে দীর্ঘস্থায়ী লীলা তারই নাম জীবলীলা বা জীবন।

রসায়ন প্রক্রিয়ায় পরিবেশের সঙ্গে যে ভর-তেজের আদান-প্রদান চলে, তাতেও সংগীত কই ? সেখানেও একজন আর একজনকে প্রভাবিত করে সত্য, কিন্তু সে তো জুলুম ক'রে। আর জৈবক্রিয়ায় কী ঘটে ? কোষের প্রাণপদার্থ তার কোষ-ঝিল্লীর পার থেকে যে পদার্থগুলো পান করে, সে তো তারই প্রাণপদার্থে রূপ পায়। তারপর সে তার পরিবেশকে যা দিয়ে দেয়, সে তা' গ্রহণ করে তাকে সরিয়ে দেয়। পদার্থ-ভর নিয়ে খাদ্য-বস্তু কোষে এসে পৌছায়। তারই সাথে আড়াল দিয়ে তার তেজটিও চলে আসে। কোষের নিভৃত অন্তঃপুরে একান্তে ঘটে উঠে ভর আর তেজের রূপান্তর। কিছু ভর অখাদ্য বস্তু হয়ে আবার বাইরে পালায়। কিন্তু বাকি যা থেকে গেল, সবটাই

কি তার তেজ হয়ে ওঠে না কি? তারও কিছু অংশ সত্যিই তাপ-তেজ হয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু বাকি অংশটি ভর ও তেজের মিলনবিন্দু হয়ে অভিব্যক্ত হতে থাকে। তখন তাকে পুরোপুরি ভর বা সম্পূর্ণ তেজ বলা চলেনা। সে-ই তো প্রাণপদার্থ হয়ে প্রাণধর্মকে প্রকাশ করে। দেহবস্তুর বৃদ্ধি ঘটায়, তার রূপলাবণ্য সৃষ্টি করে, তাকে জীবনচঞ্চল করে তোলে।

পদার্থ তার কোষ-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দেওয়া-নেওয়ার সংগীত গেয়ে চলেছে। কোষের মধ্যে খাদ্যবস্তু গিয়ে পৌছল, কোষ থেকে অখাদ্য বস্তু চলে গেল। ভর তার তেজটিকে ছেড়ে দিলে। কিন্তু সেই তেজও হয়ত বহিরাগত আর একটি তেজের সঙ্গে জুটে ভরকে ফুটিয়ে তুলল। এ পৃথিবীতে এক মহাবিস্ময় ঘটে গেল। তেজ ফুটে উঠল ভর-শতদল হয়ে মস্তিষ্কপদার্থ রূপে। বহির্বিশ্ব থেকে চোখ দিয়ে রূপ এল, কান দিয়ে গান এল,—কোথায় গেল তারা? রাসায়নিক ক্রিয়ায় তো পরিবেশপ্রভাব সর্বাঙ্গে বা অংশবিশেষের মধ্যে বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়, কিন্তু তার উত্তেজনা কই? তার উদ্দীপনা নেই। কিন্তু বিপাক-ক্রিয়ায় বহির্বিশ্বের আলো-গানরূপী তেজ বা তেজনা তো দেহের এক অভিনব-অভিব্যক্ত স্নায়ু-অংশ দিয়ে মাথায় গিয়ে পৌছল। করোটির মধ্যে গিয়ে সে যেন ভর হয়ে জমে রইল। মস্তিষ্কপদার্থের উদ্ভব ঘটে গেল। কখনও বা মুহূর্তের মধ্যে সে তেজনা মস্তিষ্ক থেকে আর এক স্নায়ু-অংশ বেয়ে চলে গেল দূরে দূরাঙ্গে, যেখানটিতে তার এখনি যাওয়ার দরকার। তখন সে উত্তেজনায় রূপ পেল। আবার কখনো বা সে তেজনা ভবিষ্যতের জন্য মাথায় ধরা রইল, ক্রমে সে হয়ে উঠল উদ্দীপনা, ভাবনা। এভাবেই তেজ-পদার্থ প্রেরণারূপ নিয়ে মস্তিষ্কের ভর-পদার্থে পরিণত হয়ে থাকছে। জীবদেহের মধ্যে তেজের ভরে রূপান্তর ঘটছে। পদার্থের ভর-তেজের পারস্পারিক রূপান্তরের মহাসংগীত দেহ-ছন্দেই ছন্দোময় হয়ে উঠছে।

মানুষ তাই কত সার্থক! ভর আর তেজ, দেহ আর আবেগের মহাসংগীত তার প্রত্যঙ্গে, প্রতি ভ্রূভঙ্গে,—চেতনাপদার্থ তার স্নায়ুতে-মস্তিষ্কে মানসে। সে হাসে, গায় ভালবাসে, কথা কয়। আক্রোশে কাঁপে, হিংসায় ফেটে পড়ে, কাঁদে, কাঁদায়; আবার কাছে টানে। সে জানে আর সে জানায়, অতীতকে সে ভেঙে ফেলে, ভবিষ্যৎকে সৃজন করে চলে। ভর-তেজের ঐ মহাসংগতির নামই তো তাই মহাসংগীত। গ্রহ বা পরমাণু বলো, জড় বা জীব বলো, আলো-বিদ্যুৎ-তাপ-শব্দ বলো, বা চেতনা-ইচ্ছা, তেজনা-দীপনা, বা এমনকি দেশ-কালরূপ ধারণা বলো, সবই তো তার ভাষা, তারি তাল-মান-লয়, আর তারই আবেগ-ঝংকার।

বিশ্বসত্যের মূল চাবিকাঠি তাই এই মূল পদার্থ বা ভর-তেজের দ্বন্দ্ব-মিলন রূপ প্রক্রিয়ার মধ্যে লুকিয়ে আছে। ভর-তেজের সেই রীতি-নিয়মের মধ্যেই তাই পরম

সত্যের ব্যঞ্জনা বা উদ্দেশ। সেই থেকেই ঘটে উঠছে মানবেরও পরম উদ্দেশ্য, বিজ্ঞানীর জিজ্ঞাসা-অনুসন্ধা। তারই সেই বিচিত্র রীতি-শৃঙ্খলার আবিষ্কার করাই তাই বিজ্ঞানীরও সকল সাধনার চরম উদ্দেশ্য। ভর-পদার্থের বহু নিয়মই আজ বিজ্ঞানীর করায়ত্ত। তেজ-পদার্থেরও অনেক রীতি-নীতি তাঁর বিজ্ঞানমানসে এসে ধরা দিয়েছে। কিন্তু ওদের গত্যাত্মক দ্বন্দ্ব-মিলন প্রক্রিয়ার কোথায় বা কখন ওরা ভর-প্রধান হয়ে উঠবে, বা তেজপ্রধান হয়ে যাবে, সে তত্ত্ব আজও বিজ্ঞানীর জানা হয়নি,—তাই সেখানে 'সম্ভাবনার' প্রশ্ন (পৃ ২৮৩) দেখা দিয়েছে। এ রকম চিন্তার একটি উজ্জ্বল দিক আছে যে, বিজ্ঞানীরা ব্যষ্টিগত অর্থাৎ এক একটি পৃথক ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে না পারায় সমষ্টি মূলক ঘটনাকেও অসমাধেয় বলে থেমে যাননি। তাছাড়া সব কিছু সমাধানের সম্ভাবনাও তো থেকে যাচ্ছে। কিন্তু এর একটি বেদনাময় দিকও আছে। একই কারনে তাঁর নৈরাশ্যেরও সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে যে, ঐ ব্যষ্টিগত ঘটনাগুলি হয়ত বা তাহ'লে কোনো রহস্যময় অজ্ঞেয় সত্তার নিয়ন্ত্রণাধীন। এই রহস্যময় অজ্ঞেয় সত্তা সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, তা' যে চিরকাল ধরেই কুহেলিকাময় থেকে যাচ্ছে, তার কারণ, তা' অজ্ঞতাপ্রসূত। প্রকৃত সত্যকে জানবার পক্ষে তা' বিরোধী। মানুষ যতদিন যাবৎ তার জীবনকে অপ্রতিরোধনীয়ভাবেই ঐ কল্পিত সত্তার নিয়ন্ত্রণাধীন মনে করে, ততদিন মিথ্যাকে প্রতিরোধ করার সম্যক প্রচেষ্টাই তার থাকতে পারেনা,—কোনো মিথ্যাকেই ঐ সর্বশক্তিমান সত্তার ইচ্ছাপ্রসূত সত্য বলে কোনো রকমে একবার ধারণা জাগিয়ে দিলেই কাজ হয়ে যায়। স্বার্থান্ধ ব্যক্তি ঐভাবেই তাব কাজ হাসিল করে জগতের উপর তার কর্তৃত্ব বজায় রাখে, জগৎ-শোষণ করে সুখে কাল কাটায়। এবং এই উদ্দেশ্যেই বার বার ঐ রহস্যময় সত্তা সম্বন্ধে একটি সুদৃঢ় প্রত্যয় জাগিয়ে তোলার দরকার হয়। এই উদ্দেশ্যেই পুনঃ পুনঃ প্রচারের মারফতে ঐ সত্তা সম্বন্ধে একটি সংস্কার সৃষ্টি করে দিতে পারলে সেই সংস্কারই তখন সর্বাপেক্ষা শক্তিমান অস্ত্রে পরিণত হয়ে যায়। তারপর শক্তিমান কোনো কিছুকেই আর সহজে হঠিয়ে দেওয়া যায়না। পুরানো ধারণাই সংস্কার হয়ে বাধা সৃষ্টি করে। গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার বস্তুরই ভর বা ওজনটি বেড়ে গিয়ে বহির্বেগের পক্ষে সেটি একটি আভ্যন্তরীণ ও বস্তুপ্রকৃতিগত বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আলোগতির কাছাকাছি এলে সে এক সময় প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি ক'রে তারপর ভেঙে পড়তে বাধ্য হয় (পৃ. ৪২৪)। মতবাদও সেইরূপ পুরানো হওয়ার সাথে সাথে বেগবৃদ্ধি জনিত আন্তঃরোধটিকে বাড়িয়ে নিজে ভারি হয়ে ওঠে। পুরানো সংস্কার-গুলিই সেই ভারিত্ব বা গুরুত্ব সৃষ্টি করে সমাজের অগ্রগতির পথে প্রচণ্ডতম বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তারপর অবশেষে সেও একদিন একটি বিশেষ ক্ষণে হঠাৎ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তাই মানুষের কাজ,—যা নিশ্চিত নবীন, তাকে বরণ করে নেওয়া, যা

নিশ্চিত পুরতিন, তার সংস্কারগত জড়ত্বের সকল বাধা সত্ত্বেও তাকে ভেঙে ফেলে প্রাকৃতিক বিবর্তনধারাকে অব্যাহত রাখা। প্রকৃতির হাতে-গড়া মানুষের কাছে সেইটিই যে প্রকৃতির চূড়ান্ত নির্দেশ, তার প্রমাণ এই যে, মানুষ তাকে ভেঙে না ফেললে স্বয়ং প্রকৃতি সে-পুরাতনকে ভেঙে ফেলবেই। কিন্তু ঐ নির্দেশই যখন মানুষের উদ্দে হয়ে দাঁড়ায় তখনই সে স্রষ্টা।

সেই সৃষ্টির কাজ তাই বিজ্ঞানীর। তাই বিজ্ঞানী সংস্কারসৃষ্ট জগৎকে পরিবর্তন করে চলেন। তাই তাঁর দু'টি সত্তাও। দার্শনিক রূপে তিনি প্রথমে জগৎকে দেখেন এব তাকে ব্যাখ্যা করেন। সেই ব্যাখ্যার অর্থ প্রকৃতিনির্দেশ-দর্শন। কিন্তু তাঁর স্রষ্টা রূপটি তখনই দেখা যায়, যখন তিনি সেই ব্যাখ্যার মারফতে প্রাকৃতিক নির্দেশের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এবং সে নির্দেশকে স্বীয় উদ্দেশে পরিণত করে নিয়ে প্রাচীন জগৎকে পরিবর্তন করে দেন। এই পরিবর্তন সাধনের, অর্থাৎ বিপুল প্রাকৃতিক গতির অভিমুখে জগতের রূপান্তর সাধনের মাধ্যমে মানবজীবনের যা কিছু সার্থকতা, সকল চরিতার্থতা কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, মানবপ্রকৃতিই সংস্কার হয়ে তাকে এ কাজে বাধা দিয়ে থাকে। সেই-প্রকৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্বে তাকে জয়লাভ করতে হয়। প্রকৃতির অভ্যন্তরে পিছনে টেনে ধরবার বা মূল গতিতে বাধা সৃষ্টি করবার জন্য ভিন্ন প্রকৃতি সর্বদাই উপজাত হতে থেকে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে চলেছে, তার মূল মর্মকে উপলব্ধি না করলে তা চলেনা। অর্থাৎ কোন্ প্রকৃতি অগ্রগতির প্রকৃতি, সেইটুকু জানার নামই ঐ মূল মা বা নির্দেশের উপলব্ধি। তারপর মানবকর্তৃক পরিবর্তন-সাধনের পরের কাজটি উদ্দে বা উদ্দেশ্যমূলক, তাই সৃষ্টিমূলকও বটে।

কিন্তু মাতা প্রকৃতি আমাদের বাঁচিয়ে দিচ্ছেন। বিজ্ঞানমানসে সত্যানুসন্ধানের যে ঝোঁক সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে, যতদূর মনে হয়, এ থেকে আর সেই সন্ধানী চিন্তার রেহাই নাই। নতুন চিন্তা আজ প্রাচীন চিন্তার মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে। মহাজীবনের আবেগ স্বার্থান্বেষী শয়তানের চক্রান্তকে যেন জড়ীভূত প্রস্তরে পরিণত করে ফেলার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে। সে আজ একটি প্রত্যক্ষীভূত পার্থিব বিপুল শক্তি। শয়তান-সৃষ্ট সহস্র সহস্র বর্ষের প্রাচীন চিন্তাও মরণ-কামড় দেওয়ার জন্য মুখ ব্যাদান করে দন্তবিকাশ আরম্ভ করেছে। সমগ্র মানবসমাজে আজ তারই প্রতিচ্ছবি।

আজ সমগ্র সমাজই ঐ দু'টি চিন্তাধারার দ্বারা আক্রান্ত। সর্বত্রই সেই মূল দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত, পরিপ্রকাশিত। যে সকল ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন এবং পবিত্রভাবে নিরপেক্ষ বা নির্লিপ্ত সত্য মনে হয়, তারা কেউই প্রকৃতির বা মানবপ্রকৃতির বহির্ভূত ঘটনা নয়। আপাতবিচ্ছিন্ন বা আপাতসত্য প্রত্যেকটি ঘটনার মধ্যেই ঐ দু'টি ধারা সূক্ষ্মভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। একদিকে প্রকৃতির বিস্তৃতি-বেগ,—তার তেজ, অন্যদিকে প্রকৃতির

সংকীর্ণতা-বেগ,—তার ভর। যে কারণেই হক না কেন, এ পৃথিবীতে প্রকৃতি আজ প্রসার- বা তেজ-মুখী বলেই ঐ আবেগকে আমরা বিস্তৃতির বেগ বলছি। নাহলে কোনো বিশেষ বেগের ক্ষেত্রে আর বিস্তৃতি বা সংকীর্ণতার অর্থ কী হতে পারে? ভর তেজের মূল আলোকাবেগ ছাড়া নির্দিষ্ট কোনো বেগ তো মাত্র আপেক্ষিকভাবেই সত্য। এই অর্থেই ভরমুখী সংকীর্ণতা আজ জড়ভরত বা যেন এক প্রস্তরীভূত সত্তায় পরিণত হতে চলেছে।

কিন্তু মানবজীবনের সার্থকতা এইখানে যে, সে প্রকৃতির পার্থিব বিবর্তনমূলক সর্বশক্তি সমন্বিত এক মহাসত্তা। পার্থিব সর্বপ্রকার শক্তির চাইতে তাই সে সেরা। তাই সে অন্যান্য সর্বপ্রকার পার্থিব সত্তার প্রকৃতি-দ্রষ্টা, পার্থিব প্রকৃতির বিজয়ী স্রষ্টাও। প্রাকৃতিক মহাদ্বন্দ্বের কোন্ এক বিশেষ পর্যায়ে কোন্ সে প্রাচীন কালে ভর-প্রতীক হয়ে জন্ম নিল গ্রহ-নক্ষত্র, আর আমাদের এই পৃথিবী। তেজ-রূপ লুকিয়ে গেল ভর-রূপের মধ্যে। মনে হল সে যেন ঘুমিয়ে গেল। আসলে ঘুম এল কিন্তু ভরেরই। দ্বন্দ্বটিও নেমে গেল অনেক অনেক গভীরে। কিন্তু যত গহনেই যাক না কেন, বিশ্বপ্রকৃতির দ্বন্দ্ব-প্রক্রিয়া সেখানে পৌঁছবেই। মহাযুদ্ধ শেষে মহামিলনের পর ভর শান্ত হয়ে গেল। কিন্তু তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে ঘুম পাড়িয়ে তেজ আবার প্রকাশমান হতে চাইল। তার ক্রিয়া তাই প্রতীয়মান হতে লাগল। কিন্তু সুদৃঢ় বিপুল পৃথ্বী-ভরের অভ্যন্তরে থেকে কি করে সে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারবে? তার পন্থা কী হবে?—ভরের কোমলাঙ্গ বেয়ে উজিয়ে উঠল জেলি-ছত্রাক-শৈবাল, ভেসে উঠল জীব; স্থলভাগও ভেদ করে উত্থিত হল তরুলতা, ঘুরে বেড়াতে লাগল জীবজন্তু। বিপুলা পৃথ্বীর সর্বাঙ্গে গড়ে উঠল জীবন প্রক্রিয়া,—তার প্রকাশোন্মুখ তেজসত্তার অভিব্যক্তি। তারপর কোটি কোটি বছর পরে বিবর্তিত হয়ে এল মানবসত্তা। পৃথিবীর বাইরে থেকে, মহাবিশ্ব থেকে বিশ্বপ্রকৃতির আরো সব তেজপ্রক্রিয়া তাকে সাহায্য করবার জন্য হাত বাড়াল। তার ভর যেন তখনও সুষুপ্ত। তারা সব এসে জোট বাঁধল ভররূপী জৈব দেহটিতেই। ক্রমেই বিবর্তিত হয়ে উঠল সমাজসত্তা,—তেজ-বিস্তারণের অনিবার্য প্রেরণা। ভর-প্রেরণায় টান পড়তে লাগল। তার সংকোচন ব্যবস্থা চিড় খেল। আজ সমগ্র সমাজে তারই অস্বস্তিময় ধ্বনি।

কিন্তু এই সমগ্র সমাজব্যাপী দ্বন্দ্বে সত্য চিন্তা বা নতুন চিন্তা যদি সমাজব্যাপ্ত না হতে পারে, তাহলে অনিবার্য বিজয়ের দিন অনিবার্যভাবেই পিছিয়ে যেতে বাধ্য। প্রাকৃতিক শক্তি অপ্রতিরোধনীয় ব'লেই তার বিজয়ও অনিবার্য। কিন্তু এ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা ব'লে মানুষই আবার তাকে অনিবার্যভাবেই পিছিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এই পিছিয়ে দেওয়ার অর্থ বিশ্বপ্রকৃতির গতিমুখকে চিরতরে ব্যাহত করা বা উল্টিয়ে দেওয়া নয়। এর অর্থ, বিশ্বপ্রকৃতিকে নতুন পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য করা। সেই নবীন পন্থাটি

কিভাবে রূপ পরিগ্রহ করবে, তা কেউ জানেনা। জীববির্তনের পথটি হয়ত তখন বাতিল হয়ে যেতে পারে। হয়ত তখন নিমেষের মধ্যেই মানবসমাজেরই অপমৃত্যু ঘটে যেতে পারে। কিন্তু যা আমরা প্রায় নিশ্চিতভাবেই জানতে চলেছি, তা তার এই জীববিবর্তন ও সমাজবিবর্তনের মাধ্যমে তেজবিস্তারণেরই পন্থা। অবশ্য আমরা তা জানছি প্রকৃতিরই দৌলতে, আর বিজ্ঞানচিন্তার মধ্য দিয়েই। আর অবশ্যই সে প্রেরণাকে সার্থক করা চলে প্রকৃতির সেই বিজ্ঞানমানস গঠনের সহায়তা করে, অর্থাৎ সমগ্র সমাজের সর্বস্তরে বিজ্ঞানচিন্তার উদ্বোধন ও ক্রমপ্রসার ঘটিয়ে দিয়ে। বিজ্ঞানী যে আজ তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে বা বৃহৎ সত্য সম্বন্ধে সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, বা হয়ত আপনার অজ্ঞাতেই জড়াত্মক ভরপ্রকৃতির ভাবে ভরগ্রস্ত বা মোহগ্রস্ত হয়ে ভুল করে বসেন, যতদূর মনে হয়, তার প্রধান কারণই হল, একদিকে যেমন তাঁরা সমাজের সর্বস্তরে নতুন চিন্তা অর্থাৎ নতুনভাবে চিন্তা করার ভাবকে প্রসারিত করে দিতে পারেননি, তেমনি অন্যদিকেও তাঁরা সত্যের সর্বব্যাপ্ত দ্যুতিকে জড়বস্তুমাত্রের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে সন্ধান করতে গিয়ে সাহিত্য-শিল্প-সংগীত, অর্থনীতি-রাজনীতি-মনোনীতি, মুটে-মুজুরি, কুলি-কামারি চাষী-চামারি, ইতিহাস-দর্শন-বাণিজ্য প্রভৃতি জীবনের সর্বশাখা পরিব্যাপ্ত সত্যকে অঙ্গীকার করে নিতে পারেন নি। কিন্তু প্রকৃতিবিজ্ঞানী তো শুধু জড়বস্তুবিজ্ঞানী নন। পৃথিবীর তথা মানবসমাজের যা-কিছু, সবই তো প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত!

সত্য সন্ধান করতে গিয়ে বস্তুপ্রকৃতির সংকীর্ণ খাত ধরেই চলতে চলতেও বিজ্ঞানী আজ বহু দূরে এসে পৌচেছেন,—সত্য কথা। কিন্তু যে-মানবসমাজ আজ এ পৃথিবীতে বস্তুবিবর্তনের সার্থক ফল রূপে আবিভূ'ত, যে-সমাজগত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়েই প্রাকৃতিক সত্য অনেক বেশি পরিস্ফুরিত হয়ে চলেছে, এবং যাকে জানলে অনেক জানাই সহজ হয়ে যায়, বস্তুপ্রকৃতি সন্ধানের ঝোঁকে সেই বিস্তারমুখী সমাজপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টি দিতে না পারায়, তাঁদের অমন মহান প্রচেষ্টা বা অত বড় সাধনাও কলঙ্কলিপ্ত হয়ে গেল! পারমাণবিক বোমার মত বস্তুর অধিকার-ত্যাগের সেই কলঙ্কটি তাঁর আর না মুছে ফেললে নয়। ভ্রমসংশোধন তাঁকে নিশ্চয় করতে হবে। বোমার চাইতে অনেক বড় যে সত্য,—বস্তু, চেতনা ও সমাজ বিধৃত সেই বৃহত্তর সত্য যদি তাঁর চেতনায় এসে না প্রতিফলিত হয়, তাহলে কতদিনে তা এই বিড়ম্বিত মানবসমাজের আর কোথায় এসে ঠাঁই পাবে? আর মানবচেতনার পরমনির্ভর বিজ্ঞানমানস যদি আজ বোমার চাইতেও বড় অস্ত্র উদ্ভাবন করে বোমা-নিক্ষেপের সেই বেইমান হাতখানিকে ছিন্ন করে ফেলতে না পারে, তাহলে নিছক সত্যসন্ধানের বা অংশ-সত্য আবিষ্কারের কোনো দোহাই দিয়ে কি বিজ্ঞানী আত্মসন্তুষ্ট থাকতে পারেন? সত্য আবিষ্কারের মর্যাদা তো তাঁরই। কিন্তু সে সত্যকে রক্ষা করবার পুরো দায়িত্বটিও যে আজ তাঁরই উপর এসে বর্তাচ্ছে,—তার কারণটি কি তাঁর পবিত্র

সাধনার নামে সমাজ-প্রকৃতি তথা মানব- ও দানব-প্রকৃতির প্রতি সেই পূর্বকথিত ঔদাসীন্য, বা তাদের যে কোনও একটির উপর নির্বিচার বিশ্বাস স্থাপনের মধ্যে লুকিয়ে নেই? মানুষের শিক্ষা-সভ্যতা ও চিন্তা-ভাবনার অন্তরালে সমাজচেতনার অন্তর্গূঢ় আঁধার স্তর বেয়ে সহস্র সহস্র বছর ধরে যে অদৃশ্য এক সমাজশাসননীতি ক্রমবিবর্তিত হয়ে একটি সর্বশক্তিমান নীতিতে পরিণত হয়ে উঠেছে, যার অমিতপ্রভাব শক্তিকে স্ববশে রাখতে পারার জন্যই মুষ্টিমেয় একদল লোক বহুব্যাপ্ত সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গুঁড়ি মেরে মেরে গোপনে প্রবেশ করে সমগ্র জনশক্তিকে অক্টোপাশ ও নাগপাশের মত আঁকড়ে ধরেছে, যে নীতির একমাত্র স্বেচ্ছাসম্রাটরূপী এক অতি নগণ্য জনপরিমাণের ইচ্ছামাত্রেই মজুর-কৃষক-সৈনিক, ছাত্র-শিক্ষক-শিল্পী, দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক নির্বিশেষে সমগ্র মানব-সমাজের সমগ্র শ্রমসম্পদ, এমনকি তার প্রাণসম্পদও ঐ নগণ্যজনের দেহ-শোনিতে পরিণত হয়ে যায়,—অথচ তার ইচ্ছা ব্যতিরেকে শিশুর স্তন্য, শ্রমিকের অন্ন, মানবের ধর্ম, ছাত্রের শিক্ষা, শিল্পীর প্রেরণা, বিজ্ঞানীর সাধনা সবই নিমেষের মধ্যে মিথ্যে অভিমান বা মায়া-মরীচিকাতে পর্যবসিত হয়ে উঠে,—সেই জীবননীতিকে কি সুকৌশলে কেবল তথাকথিত 'রাজনীতি' নামে প্রচারিত করে রাখার জন্যই চিরকাল যাবৎ তা ঐ একক অপরাধ-হস্তে সমর্পিত হয়ে থাকবে, না কোনো মহাস্ত্র বা মহদুপায় উদ্ভাবন করে তারই সাহায্যে জীবনের এতটুকু স্ফুরণ বা এমনকি শুধু তার স্পন্দনটুকুর জন্যও মানুষ মাত্রকেই জীবননীতি সচেতন করে তুলতে হবে,—সে কথা সত্যের আবিষ্কারক, জীবনের রক্ষক, বিস্ময়ের স্রষ্টা, অস্ত্রের উদ্ভাবক বিজ্ঞানী ছাড়া ভাববে কে? এই কথা ভেবেই কি 'ভূ-রসায়নের অন্যতম স্রষ্টা ও রুশ রেডিয়াম ইন্‌স্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা আকাদেমিশিয়ান ভেরনাদ্‌স্কি' এক সময় ঘোষণা করেছিলেন :

> "আবিষ্কারের ফলাফলের জন্য দায়িত্ব বোধ করতে হবে বৈজ্ঞানিকদের। মানব জাতিকে আরো ভালভাবে সংগঠিত করার কাজে লাগাতে হবে তাদের কীর্তিকে"?

প্রকৃতির রুদ্ধ আবেগ আজ পথ খুঁজছে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে যে আবেগ পদার্থ আর বস্তু আর জীববিবর্তন ঘটিয়ে তার পথ রচনা করে নিয়েছে, সে আজ তার মানবিক পথেই অভিব্যক্ত হতে চাইছে। হাজার হাজার বছরের অমানুষিক অবরোধ আর পর্বতপ্রমাণ গুরুভার তাকে আর দাবিয়ে রাখতে পারছেনা। 'বিচারের বাণী' দীর্ঘকাল ধরে 'নীরবে নিভৃতে' কেঁদেছে। তারপর সুদীর্ঘকালের অবদমিত বিজ্ঞানবোধ বা জীবনচেতনা মুহূর্মুহু গুমরে উঠছে। যুক্তিবোধ মর্যাদা চায়, বিবেচনা আর বিচারণা প্রতিষ্ঠা চায়। প্রচণ্ড চাপ সইতে না পেরে সে কাঁপছে, কিন্তু তবুও মাথা তুলছে। সেই কম্পন দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে,—সে তো বিভ্রান্তি নয়! ছাত্রের অভিযোগ, শিক্ষকের অনুযোগ, শ্রমিকের বিদ্রোহ, কৃষকের আন্দোলন, পুলিসের বিক্ষোভ,

শোষিতের বিপ্লব,—এসব কিছুর মধ্য দিয়েই বিচারবোধ পথ খুঁজছে, সুদীর্ঘ অবিচারের প্রতিকার চাইছে। যে সুদীর্ঘ সঞ্চিত সংস্কার সারা সমাজকে আক্রান্ত ক'রেছে, সে আজ যুক্তিবাদের সঙ্গে চূড়ান্ত দ্বন্দ্বে সমাজের সর্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিচ্ছে। সারা সমাজ তাই রুধিরাপ্লুত। এ কিছুতেই প্রবৃত্তিবিলাস নয়, এ মহাজিজ্ঞাসারই নিবৃত্তি প্রয়াস।

কিন্তু ঐ 'বিচারের বাণী' কেঁদে কেঁদে কেঁদে বুড়ো হয়ে গিয়েছে। আর সে কাঁদেনা। আজ সে বসে বসে ছেনি আর হাতুড়ি দিয়ে কেবল পাহাড় কাটে, অবরোধের পাহাড়। তার পণ,—সে তার সামনের ঐ গুরুভার বাধাকে একটু একটু করে হলেও কেটে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাবে। নির্বোধ বুড়োটা তার ছেলেপুলেদের নিয়ে পথরোধী উত্তুঙ্গ গিরিদ্বয়ের পাদদেশ খোঁড়ে,—অজ্ঞতা আর সংস্কার-শৈলদ্বয়ের তলদেশ দু'টি। তাই দেখে না চালাক বুড়োটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে। বোকা বুড়ো কেবল বলে, "আমি মরব, কিন্তু আমার ছেলেপুলেরাও খুঁড়ে যাবে। তারপর আমার নাতি-নাতনীরা। পাহাড় তো আর উঁচু হতে পারেনা। কিন্তু যতটুকু তারা খুড়বে, ততটুকুই শো ওদের মাথা নিচে নেমে যাবে।" কিন্তু তারপর একদিন দেখা গেল, লক্ষ কোটি মানবের হস্তস্পর্শে সত্যিই পাহাড় কেঁপে উঠল। কোথায় যেন চিড খেয়ে গেল।

পার্থিব পদার্থধারা এগিয়ে চলেছে। প্রকৃতির পার্থিব গবেষণাগারে বিজ্ঞানমানসের সংহতি শুরু হয়ে গিয়েছে। তারই অনিবার্য সহ-প্রক্রিয়ায় তৎসংলগ্ন পুরানো মানসের সংস্কার-শৈলে ধ্বস নামছে। সংস্কৃতির অভ্যুদয় ঘটছে। তাই বুঝি আজ সর্ব বিড়ম্বনা সত্ত্বেও মানব-প্রগতির জয়ধ্বনি শোনা যায়। বিজ্ঞানীসমাজের অন্তত সেই বুড়ো অংশটি আজ সাধনার সেই গজদন্ত-মিনার ছেড়ে মাঝে মাঝে পশ্চাৎপদ সমাজের কাছে পথে নেমে আসে। তাঁদের সাথে ছাত্র-শিক্ষক, শিল্পী-সাহিত্যিক, দার্শনিক-ঐতিহাসিক, শ্রমিক-কৃষক-সৈনিক আর সর্বহারাদের নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে শোভাযাত্রা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। Criminal hand-কে (বেইমান হাতখানিকে, পৃ. ৩৯৩) তাঁরা খুঁজে বার করে তাকে ছিন্ন করে ফেলবেনই,—অপরাধ-ক্রূর যে হস্তের সম্বন্ধে ১৯০৩-সালে নোবেল প্রাইজ গ্রহণের সময় বিজ্ঞানীপ্রবর পিয়ের কুরি বলেছিলেন :

> অপরাধ-বিষাক্ত হাতে এসে পৌঁছলে রেডিয়ামও মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং প্রশ্ন জাগে প্রকৃতির রহস্য আবিষ্কার করে কি মানবজাতির কল্যাণ হবে, অথবা, সে-সত্য থেকে মঙ্গলকে বরণ করে নেওয়ার জন্য কি আমরা যথেষ্ট যোগ্য হয়েছি, অথবা, তৎসম্বন্ধীয় সেই জ্ঞানটিই কি আমাদের পক্ষে অনিষ্টকর হয়ে উঠবে না? নোবেলের (Dr. Alfred Bernard Nobel—1833-'96) আবিষ্কারের দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক,—খুব শক্তিমান বিস্ফোরক দ্রব্যগুলি মানুষের জন্য শ্লাঘনীয় সামগ্রী এনে দিয়েছে; কিন্তু যেসব মহাঅপরাধী

দুর্বৃত্ত এক একটি জাতিকে যুদ্ধের মুখে টেনে ফেলছে তাদের হাতে তা হয়ে উঠছে ধ্বংস সাধনের এক ভয়াবহ উপায়। আমি তাঁদেরই দলে যাঁরা নোবেলের মত মনে করেন ভবিষ্যতের আবিষ্কার থেকে মানবসমাজ অনিষ্টের চাইতে প্রভূত কল্যাণই লাভ করবে।

সে কল্যাণ বুঝি আজ সমুপস্থিত। কল্যাণস্রষ্টা যে বিজ্ঞানী আজ তাকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য আত্মরক্ষার তথা সত্যরক্ষার মারণাস্ত্র হাতে তুলে নিচ্ছেন, তাঁকে প্রণাম জানাই।

কতকগুলি শব্দের অর্থ

শব্দ	অর্থ
অকিঞ্চিৎকর	অতিতুচ্ছ, নগণ্য
অক্ষ	কেন্দ্র-রেখা ; গোলা বা ঐরূপ বস্তুর কেন্দ্র ভেদ করে উভয় সীমা পর্যন্ত কল্পিতরেখা ; পৃ. ২৯৬
অঘটনঘটন-পটীয়সী	যা অসম্ভবকেও ঘটায় এমন
অঙ্গার	কয়লা
অচ্ছেদ্য	যাকে ছেদ করা যায়না
অজরামর	যার জন্ম মৃত্যু নাই
অজৈব	জীব নয়, জড় সম্বন্ধীয়
অণুবীক্ষণ যন্ত্র	যে যন্ত্রে খালি চোখে দেখা যায়না এমন ক্ষুদ্র বস্তুকেও দেখা যায়
অণোরণীয়ান্	অণুর চাইতেও ছোট
অতিপ্রাকৃত	অলৌকিক, অস্বাভাবিক
অতীন্দ্রিয়	যাকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বোঝা যায়না
অদৃষ্টপূর্ব	যা পূর্বে দেখা যায়নি
অদ্বৈত	যার দ্বিতীয় সত্তা নাই
অধঃক্ষিপ্ত	থিতিয়ে তোলা পৃ, ১৭৭
অধরা	যাকে ধরা যায়নি
অধিবৃত্ত	ডিম্বাকৃতি ক্ষেত্র বিশেষ
অনধিগম্য-সত্য	ফলত সত্য, বাহ্যত নয়
অনন্যচিত্ত	যার ভাবনা একটি মাত্র বিষয়ে স্থির
অনন্যনির্ভর	কারও উপর নির্ভরশীল নয় এমন
অনাকাঙ্ক্ষিত	যা কেউ চায়না
অনাদি	যার আরম্ভ নাই
অনিত্য	যা চিরকাল থাকবেনা
অনির্বাণ	যা নেভেনা
অনু	পশ্চাৎ, পিছনে
অনুধাবনীয়	অনুসরণ বা আলাচনার যোগ্য
অনুপাত	তু., পৃ. ২৫-২৬, ৪৬
অনুপ্রবিষ্ট	যা ভিতরে ঢুকছে
অনুপ্রবেশ্য	যার সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে কোনো বস্তু চলে যায়
অনুপ্রভা	প্রতিপ্রভা
অনুভাবনা	পরবর্তী চিন্তা-ভাবনা
অনুভূমিক	দ্র., পৃ, ২৩২, ২৬৯
অনুরূপ	তুল্য, মত, অনুযায়ী
অনুশাসন	আদেশ, বিধান, উপদেশ
অনুসংহিত	খোঁজ করা হয়েছে এমন
অনুসন্ধা	অনুসন্ধানের ইচ্ছা
অনুসন্ধেয়	অনুসন্ধানের যোগ্য
অনুসারী	যা অনুসরণ করে
অনুস্যূত	গাঁথা, সম্বন্ধযুক্ত
অনূদিত	অন্য ভাষায় পরিবর্তিত
অন্তঃপ্রবণতা	ভিতরকার ঝোঁক
অন্তঃসলিলা	যার জলস্রোত চক্ষুর অন্তরালে বয়ে চলে
অন্তরক, (-রিত)	যা দুটি বস্তুর মধ্যে থেকে ব্যবধান ঘটায় দ্র., পৃ. ৯৭
অন্তরীক্ষ	আকাশ
অন্তর্গূঢ়	যার ভিতরে বিশেষ তত্ত্ব লুকিয়ে থাকে
অপ্	জল
অপনয়ন	দূর করা, সরিয়ে দেওয়া
অপরিমেয়	যাকে মাপ করা যায়না
অপরিসীম	সীমাহীন, প্রভূত
অপরিহার্য	যা না হলে নয়

অপসৃত — দূরীভূত
অপ্রতিরোধনীয় — যাকে আটকান যায়না
অপ্রমেয় — যা আছে মনে করা হলেও প্রমাণ করা যায়না
অবধারিত — নির্ধারিত ; নিরূপিত
অবভাস — যে আভাসের দ্বারা সত্যকে জানা যায়না, অথচ তার বিকৃত রূপ সম্বন্ধে ভ্রান্তি জন্মায়
অবাঙ্‌মনস-গোচর — যাকে বোঝাবার ভাষা, বা ভাবার মন নাই
অবিচ্ছেদ্য — যাকে বিচ্ছিন্ন করা যায়না
অবিনশ্বর — যার বিনাশ বা মৃত্যু নাই
অবিভাজ্য — যাকে ভাগ করা যায়না
অবিমৃশ্যকারী — হঠকারী
অবিসংবাদী — সর্বজনস্বীকৃত
অব্যয় — যার ব্যয় বা খরচ হয়না
অভাবনীয় — যা ভাবা যায়না
অভাবিতপূর্ব — যা পূর্বে ভাবা যায়নি
অভিঘাত — গুরু বা প্রচণ্ড আঘাত
অভিব্যক্ত — ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত
অভিমুখী — নির্দিষ্ট দিকের প্রতি ঝোঁক-বিশিষ্ট
অভিযাত্রী — দুঃসাহসিক পথের যাত্রী
অভিযান — যুদ্ধ বা কোনো আবিষ্কার হেতু সদলবলে গমন
অভিসার — মিলনের জন্য সংকেত স্থানে গমন
অভিসিঞ্চিত — ভিজা
অভেদ্য — যাকে ফুঁড়া যায়না
অভ্যুদয় — উন্নতিমূলক উত্থান
অমানিশা — অমাবস্যার রাত্রি
অমিত — অপরিমিত ; অসীম
অমোঘ — অব্যর্থ ; সার্থক
অয়ন — পথ, গতি, পথচলা
অয়স্ — লোহা
চুম্বক-লোহা
অর্থনীতি — ধন বা অর্থ সম্বন্ধীয় নিয়ম কানুন
অর্থী — অভিলাষী ; ইচ্ছুক
অর্ধপ্রবেশ্য — যার ভিতর দিয়ে কোনো বস্তুর মাত্র কিছু অংশ ভেদ করে যেতে পারে
অলক — চুল
অলকানন্দা — কল্পিত স্বর্গগঙ্গা
অলিন্দ — বারান্দা
অলৌকিক — অপার্থিব
অশরীরী — যার দেহ নাই
অসমাধেয় — যে রহস্যের সমাধান দেওয়া যায়না
অ্যাটম — পরমাণু
অ্যালকেমিষ্ট্ — যিনি অ্যালকেমিষ্ট্রি বা মধ্যযুগীয় রসায়ন শাস্ত্রে পারদর্শী
আকাশচুম্বী — আকাশ পর্যন্ত উঁচু
আক্রান্ত — যাকে আক্রমণ করা হয়েছে এমন
আণুবীক্ষণিক — অণুবীক্ষণ যন্ত্র না হলে দেখা যায়না এমন সূক্ষ্ম
আত্মম্ভরী — স্বার্থ চিন্তায় পরিপূর্ণ
আদিষ্ট — আদেশপ্রাপ্ত
আধান — বলপরিমাণ ; সঞ্চার
আন্তর্জাতিক — পৃথিবীর সব জাতি বা সব সম্বন্ধীয়
আপাত — বাহ্যত, দৃশ্যত

আপেক্ষিক	অপেক্ষায় ; তুলনায় ; তু., পৃ. ২৪	উদ্দেশ	অভিপ্রায় ; অভিসন্ধি ; অনুসন্ধান
আবর্ত	ঘূর্ণি ; পাক ; কুণ্ডলী	উদ্‌বর্তন	জীবন সংগ্রামের ফলে টিকে থাকা
আবর্ত-কুণ্ডলী	দ্র., শঙ্খিল		
আবর্তন	চক্রাকারে ভ্রমণ	উদ্‌বন্ধন	ফাঁসি
আবহ	বায়ুমণ্ডল	উদ্‌বোধন	বোধের উদয়, চেতনার সঞ্চার
আবেশ	বিহ্বলতা ; অধিষ্ঠান ; ভর ; পৃ. ১৩৮-৪১	উদ্‌ভাবনী	আবিষ্কার মূলক
আভাষিত	পূর্বেই আভাস প্রদত্ত বা অস্পষ্টভাবে ঘোষিত	উদ্‌ভাসমান	প্রকাশ পাচ্ছে এমন
		উন্মীলিত	মুক্ত; চোখ-খোলা
আয়নায়ন	আয়নে বিচ্ছিন্ন হওয়া	উপচিত	সঞ্চিত ; সংগৃহীত ; পুষ্ট
আরব্ধ	আরম্ভ-করা	উপজাত	প্রধান দ্রব্যের উৎপাদন কালে উৎপন্ন অন্য দ্রব্য
আর্দ্র	ভিজা		
আলোকবর্ষী	যে আলো ছড়ায়	উপনিবেশ	যেখানে বহু লোক উঠে গিয়ে বস-বাস করে এবং হয়ত পরে সেখানে রাজ্য স্থাপনও করে
আলোচ্যমান	আলোচনা হচ্ছে এমন		
আশীঃপুত	আশীর্বাদ দ্বারা পবিত্র		
আসন্ন	প্রায় এসে গেছে এমন		
আহিত	আধানযুক্ত ; দ্র., পৃ. ৮৯	উপাদান	যে মূল জিনিস দিয়ে অন্য জিনিস তৈরি হয়
ইতিবাচক	আছে এই সম্পর্ক যুক্ত		
		উল্লম্ফন	লাফ
ঈপ্সিত	বাঞ্ছিত ; আকাঙ্ক্ষিত	ঊর্মি	ঢেউ
উজ্জীবন	মৃতপ্রায়ের দেহে চেতনাসঞ্চার	একক	নির্দিষ্ট ছোট মাপ—যা দিয়ে একই ধরণের বড় জিনিস মাপা যায়
উড্ডয়ন	উড়া		
উৎক্ষেপ (-পণ)	উপরে নিক্ষিপ্ত হওয়া	একচ্ছত্র	অর্থাৎ বাধাহীন
উত্তর	পরবর্তী, ভবিষ্য	একেশ্বরবাদ	ঈশ্বর এক, এবং দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই - এইরূপ মত
উত্তরণ	উত্তীর্ণ হওয়া ; উপরে উঠে যাওয়া	ওতপ্রোত	সর্বাঙ্গব্যাপ্ত
উত্তাল	উচ্চশব্দকারী ; উচ্চ	কংকর	কাঁকর
উত্তুঙ্গ	অতি উচ্চ	কক্ষ	ঘর
উৎপাদক	দ্র., গুণনীয়ক	কটোরা	বাটি
উদ, উদক	জল	কণ্ডিশান	শর্ত
উদ্গত	উত্থিত	কপোল	গাল
উদ্ঘাটন	খোলা ; উন্মুক্ত করা	কবোষ্ণ	ঈষৎ উষ্ণ
উদ্দিষ্ট	অভিপ্রেত ; ইচ্ছানুযায়ী	কম্পমান	কাঁপছে এমন

কম্বুকণ্ঠ শঙ্খ-গম্ভীর ধ্বনি যুক্ত
করঙ্ক থালা, ডিবা
করায়ত্ত হস্তগত
করোটি মাথার খুলি
কল্প কোটি কোটি বছর
কল্লোল উচ্চশব্দযুক্ত জলতরঙ্গ
কাকলি অস্ফুট ধ্বনি ; অস্পষ্ট গুঞ্জন
কান্তার নিবিড় অরণ্য
কান্তি শোভা ; সৌন্দর্য ; দীপ্তি
কি. মি. কিলোমিটার
কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটি মাপ (একক)
কিলোওয়াট দ্র., পৃ. ৪০৪
কুয়াশা
কুন্তল চুল
কুপিত রাগান্বিত
কূললগ্ন তীরে-লাগা
কুহেলিকা কুয়াশা ; অস্পষ্টতা
কৃশয়িত ক্ষীণ ও শীর্ণ হয়ে-যাওয়া
কেন্দ্রক কেন্দ্রীভূত সত্তা ; যে বস্তু কেন্দ্রে থাকে বা কেন্দ্র গঠন করে
কেন্দ্রাতিগ কেন্দ্র থেকে দূরে (ধাবিত)
কেন্দ্রানুগ কেন্দ্রের দিকে (ধাবিত)
ক্রম পর পর,— এরূপ পদ্ধতি
ক্রমবর্ধমান ক্রমাগত বা পর পর বেড়ে যাওয়া
ক্রমবৃহৎ পর পর বড
ক্রমানুসারী ক্রমাগত অনুসরণকারী
ক্রান্তি ভিন্ন দশা পাওয়া ; অন্য অবস্থায় যাওয়া
ক্রিয়মাণতা কার্যকারিতা
ক্লিষ্ট যাতনাপ্রাপ্ত
ক্ষণপ্রভা বিদ্যুৎ
ক্ষরণ নিঃসরণ ; চুয়ান
ক্ষিতি মাটি ;

ক্ষিতিজ মাটি থেকে জাত বা তৈরি
খাস নিজের
গজদন্তমিনার হাতির দাঁতের তৈরি মন্দির বা স্তম্ভের মত চূড়া
গত্যাত্মক গতিই যার প্রাণ
গবেষণা পরীক্ষা-প্রয়োগ ইত্যাদির দ্বারা বস্তুসত্য অনুসন্ধান
গবেষণাগার গবেষণার ঘর, দ্র., ঐ
গাথা কাহিনীমূলক কবিতা
গুণনীয়ক দ্র., পৃ. ২৫-২৬
গুণিতক দ্র., পৃ. ২৫-২৬
গুহ্য গোপনীয়
গোচর প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ধৃত
গোলক বলের মত ফাঁপা বস্তু
গোষ্পদ গো-ক্ষুরের গর্ত সদৃশ ছোট
গ্রথিত গাঁথা হয়েছে এমন
গ্রন্থি গাঁট
গ্রহীতা যে গ্রহণ করে
গ্রাম ওজনের একক (দ্র., একক)
ঘটিত প্রকৃতির নিয়মে সৃষ্ট
ঘনাঙ্ক আপেক্ষিক গুরুত্ব ; দ্র., পৃ. ২৩০
ঘনায়ন ঘন হওয়া
ঘনাকারক যা ঘন করে দেয়
ঘূর্ণায়মান ঘুরছে এমন
ঘূর্ণ্যমান যাকে ঘোরান হচ্ছে
চকমকি আগুন জ্বালাবার পাথর
চক্ষুষ্মান যার চোখ আছে ; সত্যদ্রষ্টা
চতুষ্টয় চারিটি বস্তুর সমবায়
চয়ন সংগ্রহ
চলমান গমনরত
চাপদণ্ড দ্র., পৃ. ৪৬ ; [পিস্টন]
চ্যুত বহিষ্কৃত ; ছাড়িয়ে নেওয়া
ছত্রাক ছাতা (ব্যাঙের ছাতা)

ছায়াপথ	আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের আভা দিয়ে গঠিত নদীর মত পথ
ছিন্নশির	যার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে এমন
জগদ্দল	অত্যন্ত ভারী
জগদ্ধিতায়	জগতের হিতের জন্য
জঠর	উদর, গর্ভ, জরায়ু
জড়ভরত	একজন রাজার নাম, অত্যন্ত অকর্মণ্য ও জড়ের মত সত্তা বিশিষ্ট
জড়িমা	জড়তার ভাব
জনয়িত্রী	জন্মদানকারিণী
জন্য	জন্মপ্রাপ্ত
জাড্য	স্থির বা গতিবান যে বস্তু যেভাবে আছে, তার সেভাবে থাকার ঝোঁক
জাল	সমূহ
জায়গীরদারী	সামন্ততান্ত্রিক
জৈব	জীব সম্বন্ধীয়
ঝাঁপি	ঢাকনাযুক্ত বেত বা তাল পাতা ইত্যাদির পেটরা
ঝিল্লি	অতি সূক্ষ্ম পাতলা চামড়া
টের	কোন্ (যেমন, ঘরের এক কোণা)
ডাইন	বল বা শক্তির একটি একক (মাপ); দ্র., পৃ. ২০৮
ডেভালাপ	বিবর্ধন জনিত পরিস্ফুটন
তড়িদাহিত	বিদ্যুতের আধান যুক্ত
তত্ত্ব	বস্তু সত্য বা মূল সত্য
তথাকথিত	ঠিক হোক বা বেঠিক হোক ঐ নামে বা ঐভাবে কথিত
তদ্	তাহা ; সেই
তন্তু	তাঁত ; সূতা
তন্ত্র	সম্বন্ধযুক্ত বিষয় সমূহের সমবায়; শাসনব্যবস্থা; ব্যবস্থা, কোনো কিছু সিদ্ধান্ত বা মতবাদ
তমিস্রা	অন্ধকার
তিয়াষ	তৃষ্ণা ; পিপাসা
তির্যক	বাঁকা ; তেরছা
তূনির	শর বা বাণ রাখার আধার
তেজ	আগুন
ত্রয়ী	তিনটি বস্তুর সমবায়
ত্বরণ	গতিবেগ বৃদ্ধির হার
ত্বরান্বিত	সত্বর বা শীঘ্র
দক্ষিণাবর্ত	ডান-মুখে ঘোরান
দর্পণ	আয়না
দর্শক	দশ বছর পরিমাণ
দহন	জ্বলন ; পোড়া
দাক্ষিণ্য	দয়া ; উদারতা ;
দাদুরী	ব্যাঙ্
দানবদমন	যে দানবকেও দমন করে
দাম	দল ; গুচ্ছ
দার্শনিক	যিনি মূল সত্যকে দর্শন করেন
দাহ্য (-তা)	(পুড়ে যাওয়ার গুণ)
দিব্য	স্বর্গীয় ; অলৌকিক
দীপ্যমান	প্রকাশমান , জ্বলন্ত
দুর্দম	যাকে দমন করা কষ্টসাধ্য
দুর্ধর্ষ	যাকে জব্দ করা দুঃসাধ্য
দুর্ব্যবহার্য	কষ্টে ব্যবহার করার মত
দৃশ্যমান	দেখা যাচ্ছে এমন
দেওদার	দেবদারু বৃক্ষ
দোদুল্যমান / দোলায়মান	যা দুলছে বা ঝুলছে

দোসর	সঙ্গী ; সহচর
দ্যুলোক	স্বর্গ
দ্যোতক	যা আভাস দেয়
দ্যোতনা	আভাস ; প্রকাশ
দ্রবণ	তরল দ্রব্যে গলা বস্তু
দ্রাব্য (-তা)	তরলপদার্থে যা গলে যায়
দ্রাবক	যে তরলে অন্য দ্রব্য গলে যায়
দ্বন্দ্ব	সংঘর্ষ
দ্বৈত	দুই বা দুই-এর ভাবযুক্ত
দ্বৈতাদ্বৈত	দুই হলেও একভাব
দ্বৈতীয়িক	দ্বিতীয় বারের
ধনতান্ত্রিক	দ্র., পৃ. ১১
ধাতবতা	ধাতুর গুণ
ধাবন	বেগে গমন
ধাবন পাল্লা	ধাবনের দূরত্ব সীমা [রেঞ্জ্]
ধুপ ছায়া	রৌদ্র ও ছায়া ; ময়ূরকণ্ঠী রং
নতশির	যার মাথা নিচু হয়েছে
নবায়মান	যা ক্রমশই নূতন হচ্ছে
নবোদ্ভাসিত	নতুন প্রকাশিত বা আলোকিত
নাট্যশালা	যেখানে নাটকাদির অভিনয় করা হয়
নিউট্রনভুক	যা নিউট্রন শোষণ করে
নিকষ	কষ্ঠি পাথরের মত কালো
নিত্য	যা চিরকাল থাকে
নিথর	নিশ্চল ; নিস্তব্ধ
নিবন্ধ	প্রবন্ধ ; রচনা
নিবৃত্তি	বিরতি ; উপশম-অবস্থা
নিয়ন্ত্রণ	পরিচালন
নিয়ামক	যা নিয়ন্ত্রণ করে চালায়
নিরক্ষরেখা	বিষুবরেখা
নিরসন	খণ্ডন ; ভঞ্জন
নির্গম	বাইরে বেরিয়ে যাওয়া
নির্বন্ধ	বিধান
নির্বিশেষে	বাছ বিচার না করে
নিরীক্ষা	মনোযোগ দিয়ে দেখা
নিরুদ্ধ	অবরুদ্ধ ; আবদ্ধ
নিশিত	শানিত ; ধারাল
নিষ্কাশন	বার করে দেওয়া ; ক্কাথ বা সারবস্তু টেনে বার করে আনা
নীলাঞ্জন	তুতে ; তুঁতে-রং সদৃশ
নীহারিকা	দূর আকাশের নক্ষত্র সমষ্টি বা উজ্জ্বল বাষ্পীয় পদার্থ
নেতিবাচক	না, এইভাব প্রকাশক
পরচুলা	বানানো চুল গোছা
পরবশ	পরের বশীভূত
পরম্পর	পর পর চলিত
পরিক্রমা	কিছু বেষ্টন করে ঘোরা
পরিণতিসম্ভব	কোনো উদ্দেশ্যে পরিণত হওয়া সম্ভব এমন
পরিণীতা	বিবাহিতা
পরিধি	বৃত্তের সীমারেখা
পরিবর্ত্যমান	যা পরিবর্তিত হচ্ছে
পরিবাহক	যা এক জায়গা থেকে অন্যত্র বয়ে নিয়ে যায়
পরিমিতশক্তি	যে শক্তিকে মাপা যায়
পরিসংখ্যান	কোনো বিষয়ে তথ্য সংক্রান্ত সংখ্যার সংগ্রহ
পরিসীমা	সীমারেখাগুলির যোগফল
পরিস্ফুরণ	ব্যাপকভাবে কম্পন
পরোক্ষ	প্রত্যক্ষের বিপরীত
পর্যবেক্ষণ	ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখা
পর্যায়ক্রমিক	পর্যায়ের পর পর্যায়
পর্যালোচনা	উত্তমরূপে বিচার

পল্লব	নতুন পাতা ; কিশলয়
পশারিণী	পণ্যসামগ্রী বিক্রেতা
পাতন	জল প্রভৃতি বিশুদ্ধ করার একটি প্রণালী
পাবক	যা শুদ্ধ করে ; অগ্নি
পারস্পরিক	প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে
পার্থিব	পৃথিবীতে উৎপন্ন
পিয়াসী	পিপাসার্ত, ইচ্ছুক
পীযূষ	অমৃত
পুচ্ছ	লেজ
পুঞ্জিত	রাশীভূত ; জমে-যাওয়া
পেটিকা	পেটরা
পেলব	কোমল ; মৃদু
প্রজনন	জন্ম দেওয়া
প্রজ্ঞা	তত্ত্বজ্ঞান ; বিশেষ জ্ঞান
প্রতিক্রিয়া	কোনো কাজের ফলে বিপরীত ক্রিয়া ; ক্রিয়াকালেই তা ঘটে থাকে
প্রতিচ্ছন্দিত	পুনরায় ছন্দপ্রাপ্ত
প্রতিপ্রভা	প্রভার দ্বারা উৎপন্ন অন্য বস্তুর বিকীর্ণ প্রভা
প্রতিভূ	প্রতিনিধি
প্রতিরূপতা	প্রতিবিম্ব ; তুল্য ; দ্র., পৃ. ৩৩২, ৩৫৭-৫৮
প্রতিসাম্য	দ্র., প্রতিরূপতা
প্রতীক	কিছুর প্রকাশক বা চিহ্ন
প্রতীতি	দৃঢ় ধারণা ; সংস্কার
প্রতীয়মান	বোধ বা পরিচয় প্রাপ্ত
প্রত্যক্ষ	সাক্ষাৎ ; সোজাসুজি
প্রত্যন্ত	প্রান্তবর্তী ; সীমাবস্থিত
প্রত্যয়বাদ	নিশ্চিত ধারণা সম্বন্ধে মতবাদ
প্রবণতা	ঝোঁক
প্রবহমাণ	যা প্রবাহিত হয়ে চলেছে
প্রবুদ্ধ	প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্ত
প্রমাদ	ভ্রান্তি ; বিমূঢ়তা
প্ররোচক	যে উস্কানি দেয়
প্রসৃত (-তি)	বিস্তারিত ; প্রসারিত
প্রাক্	পূর্ব ; পূর্ববর্তী
প্রাণনা	প্রাণস্পন্দন ; প্রেরণা
প্রান্তিক	প্রান্তে বা শেষে অবস্থিত
প্রোজ্জ্বল	বিশেষ উজ্জ্বল
প্রোথিত করা	পুঁতে ফেলা
প্রোথিতমূল	যার শিকড় গাড়া হয়েছে
প্লবতা	ঊর্ধ্বচাপ ; তু., পৃ. ১৬২
ফণিনী	সর্প
ফলক	ফলা ; ঢাল
ফলশ্রুতি	কোনো পুণ্য কর্মের ফল সম্বন্ধীয় বিবরণ, বা তা শোনা
ফেনিল	ফেনাযুক্ত
বংকিম	বাঁকা
বকযন্ত্র	যে যন্ত্রের সাহায্যে কোনো পদার্থের অংশকে বাষ্পীভূত ও চোলাই করে পৃথক করা হয়
বদান্য	দানশীল ; উদার
বন্ধ্যা	বাঁঝা ; নিঃসন্তান ; ফলহীন
বলবিদ্যা	যান্ত্রিক বলের বিজ্ঞান
বলয়	বালা বা বালার মত আকার
বস্তুবাদী	যারা বস্তুকেই সব কিছুর আদি ও প্রধান সত্য মনে করেন
বস্তুসত্ত্ব	বস্তুই যার সত্তা

শব্দ	অর্থ
বহুদেববাদ	দেবতা বহু এই মতবাদ
বাতায়ন	বায়ু প্রবেশের জানালা
বামাবর্ত	বাম পাকে ঘোরানো
বায়ুচাপমানযন্ত্র	যে যন্ত্রের সাহায্যে বায়ু-চাপ মাপা যায় [ব্যারোমিটার]
বাসর	দিবস ; যে কক্ষে বর-বধূ বিবাহ-রাত্রি কাটায়
বাষ্পীভবন	বাষ্পে পরিণত হওয়া
বিকর্ষণ	আকর্ষণের বিপরীত
বিকলাঙ্গ	যার অঙ্গ অচল হয়েছে
বিকীর্ণ	ছড়ানো
বিকীর্যমাণ	যা বিকিরণ ঘটিয়ে চলেছে
বিকৃষ্ট	দূরে ঠেলা, আকৃষ্ট (আকর্ষণ)-এর বিপরীত
বিক্ষেপ	দিক পরিবর্তন ও তার পার্থক্যজনিত মাপ বা মাত্রা ; দ্র. পৃ. ১৮২
বিচ্ছুরণ	বিশ্লেষণ ; বিকিরণ
বিদেহী	দেহহীন
বিধুর	কাতর ; যন্ত্রণাযুক্ত
বিধৃত	কোনো কিছুতে ব্যাপ্ত বা অধিষ্ঠিত
বিনিদ্র চিন্ত	চিন্তায় যার ঘুম হয়না
বিন্দুগ্রাহী	যা কোনও বিন্দুকে গ্রহণ ক'রে স্থান দিয়েছে
বিন্যস্ত	পর পর সজ্জিত
বিপাক	দেহে খাদ্যের পরিণাম ঘটা
বিবর্তন	ক্রমাগত পরিবর্তন
বিবর্ত্যমান	যার বিবর্তন ঘটছে
বিবর্ধক কাচ	দ্র., পৃ. ২২০
বিভব	শক্তি ; সম্পদ
বিভাজ্য	যা সম্পূর্ণ ভাগ হয়ে যায়
বিমূঢ়	মুগ্ধ ; হতভম্ব
বিয়োজন	বিচ্ছিন্ন বা বিযুক্ত হওয়ার কাজ
বিলীয়মান	বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এমন
বিলোড়ন	মন্থন ; আলোড়ন
বিশ্রস্ত	আল্গা
বিশ্লিষ্ট	বিশ্লেষণ হয়েছে এমন
বিশ্লেষণ	পৃথক বা বিচ্ছিন্ন করা
বিশ্লেষ্য	যাকে বিশ্লেষণ করা যায়
বিষুবরেখা	উভয় মেরু (দ্র., মেরু) থেকে সমদূরবর্তী কল্পিত রেখা
বিসারী	প্রসারিত
বিস্ফোরণ	হঠাৎ সশব্দে ফাটা বা জ্বলে উঠা
বিহার	ক্রীড়া ; আনন্দ-বিচরণ
ব্যঞ্জনা (-ময়)	গূঢ় অর্থ বা গূঢ় ভাবের আভাষ
ব্যতিরিক্ত	ব্যতীত ; অতিরিক্ত
ব্যত্যয়	ব্যতিক্রম ; বিপরীত
ব্যষ্টি	পৃথক পৃথক ভাব
ব্যস্তানুপাতী	দ্র., পৃ. ২২৮
ব্যাখ্যাতৃ	যে ব্যাখ্যা করে
ব্যাদান	হাঁ ; ফাঁক
ভগ্নপদ	যার পা ভাঙা
ভর	একটি বস্তুতে যতটা পদার্থ থাকে সেই পদার্থভাবের সমষ্টি
ভরপ্রধান	ভরকে অবলম্বন করেই যার মূলভাব প্রকাশ পায়
ভারাবর্তন	দ্র., মহাকর্ষ
ভোক্তা	যে ভোজন বা ভোগ করে
ভোজ্য	খাওয়ার জিনিস
ভৌত	স্থূলদেহ বিষয়ক

ভ্রূণ	গর্ভস্থ সন্তান	মোক্ষণ	টেনে বার করে বা সরিয়ে দেওয়া
ভ্রূভঙ্গ	ভুরুর ভঙ্গিমা		
মধু	মিষ্ট দ্রব্য বা শর্করা	মোচন	মুক্তি ; মুক্তিদান
মধুরিমা	মাধুর্য	মৌলিক	মূলগত ; মূলের
মনন	চিন্তন ; বিচার ; ধারণা	যথাক্রমে	প্রথমের সঙ্গে প্রথমের, দ্বিতীয়ের সঙ্গে দ্বিতীয়ের এভাবে
মনীষা	বুদ্ধি ; জ্ঞান ; জ্ঞানী		
মন্দ	মৃদু ; অল্প		
মন্দন	যা মন্দ করে বা কমায়	যদৃচ্ছ	ইচ্ছামত
মন্দ্র	গম্ভীর ধ্বনি	যুগপৎ	একসঙ্গে ; একই কালে
মরুৎ	বায়ু	যুগান্তকারী	নূতন যুগ সৃষ্টিকারী
মস্তকার্পিত	মাথায় তুলে-দেওয়া	যৌগ	যৌগিক বস্তু
মহত্তোমহীয়ান্	মহত্তের চাইতেও বড়	যৌগিক	দ্র., পৃ ২৩
মহাকর্ষ	বৃহত্তম ভর কর্তৃক অল্পতর ভরকে আকর্ষণ ; তু., পৃ ২২৮	রঙ্গমঞ্চ	নাট্যশালা
		রজন	এক প্রকার ধুনা ; এক প্রকার গাছের নির্যাস
মাধ্যাকর্ষণ	নিজ আত্ততার মধ্যে আছে এমন বস্তুকে আকর্ষণ	রঞ্জক	রং করার দ্রব্য
		রঞ্জিত	রঙানো
		রসায়ন	তু., রাসায়নিক
মান	মূল্য ; মাপ	রাগ	রং ; রক্তিমা ; রঞ্জন
মানবক	ক্ষুদ্র মানব	রাসায়নিক	গুণ ও ধর্ম অনুযায়ী সংযোগ বা বিচ্ছিন্ন করে বিভিন্ন বস্তুর যে গঠন হয়, সেই সম্বন্ধীয়
মানমন্দির	গবেষণার জন্য গ্রহ-নক্ষত্রাদি পর্যবেক্ষণের সুউচ্চ গৃহ		
মানস দর্শন	পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রভৃতির সাহায্যে মন দিয়ে বিচার করে দেখা	রুধিরাপ্লুত	রক্তমাখা
		রোধ (-ক)	দ্র., পৃ. ১৩১
		লঘুতম	সব চেয়ে হাল্কা
মারণাস্ত্র	ধ্বংস করার অস্ত্র	লাবণি	লাবণ্য ; সৌন্দর্যের ভাব
মার্ত(া)ণ্ড	সূর্য	লিটার	এক হাজার সি. সি.
মুকুর	আয়না	লোকান্তরিত	মৃত
মৃৎপাত্র	মাটির পাত্র	লোলুপ	অত্যন্ত লোভী
মেরু	অক্ষ রেখার প্রান্তদ্বয়	লৌকিক	পার্থিব ; সামাজিক
মেরুজ্যোতি	আঁধার মেরুদেশের আকাশজোড়া পরিবর্তনশীল বিচিত্র আলোকচ্ছটা	শঙ্খিল	শাঁখের মত পর পর প্যাঁচাল
		শতক	একশ বছরের কাল
		শতাব্দী	ঐ

শম্বুকগতি — শামুকের মত ধীরগতি
শলাকা — শেল ; কাঁটা ; কাঠি ; অস্ত্র বিশেষ
শান্তা — যে শান্তি দেয়
শিক্ষানবীশি — কর্মে বাহাল হওয়ার জন্য যোগ্যতা লাভার্থে শিক্ষা গ্রহণ
শৈবাল — শেওলা
শৈল — পাহাড়
শোধনীকরণ — বিশুদ্ধ করার কাজ
শ্লথ
শ্লাঘনীয় — প্রশংসনীয়
শ্বাপদ — মাংসাশী পশু শিকারী
শংকর — দো-আঁশলা
শংকুল — পরিপূর্ণ
সংক্রমণ (-মিত) — এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা অন্য কিছুর মধ্যে চলে যাওয়া
সংক্রান্ত — সম্বন্ধযুক্ত ; বিষয়ক
সংক্ষুব্ধ — অত্যন্ত আলোড়িত
সংঘ — দল ; সমিতি
সংঘটিত — ঘটিয়ে-তোলা
সংঘর্ষনির্ভর — টিকে থাকার জন্য সংঘর্ষের উপর নির্ভরশীল
সংবেদন — সাড়া ; বোধ
সংবেদনশীল — সূক্ষ্ম অনুভূতিযুক্ত
সংযোজন — সংযুক্ত হওয়ার কাজ
সংশ্লেষণ — এক সাথে মিলিয়ে অন্য বস্তুতে পরিণত করা
সংসক্ত — লিপ্ত ; সংলগ্ন ; আসক্ত
সংস্থা — সমিতি ; প্রতিষ্ঠান
সংস্থিত — বিশেষভাবে অবস্থিত বা সজ্জিত
সংহত — মিলিত ; ঘনীভূত
সঙ্কলন — সংগ্রহ
সহগ — সঙ্গে গমনকারী (সংখ্যা)

সহস্রক — এক হাজার বছরের কাল
সঞ্চরণ — বিচরণ ; চলন ; কম্পন
সঞ্চালন — ঐ
সঞ্জীবনী — যা প্রাণের সঞ্চার করে
সত্ত্ব — সত্তা বা অস্তিত্বযুক্ত
সত্যাপিত — বাস্তব সত্যের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলিত
সনাতন — চিরস্থায়ী
সন্নিবদ্ধ — বিশেষ ও দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ
সন্নিবেশ — বিন্যাস ; বিশেষ সজ্জায় থাকা
সমক্ষে — সামনে
সমন্বিত — সমেত ; সংযুক্ত ; মিলিত
সমসত্ত্বদেহ — যে বস্তুর সারা দেহের গঠন একই প্রকার
সমাধেয় — যার রহস্য সমাধান করা যায়
সমানুপাতী — দ্র., পৃ. ২২৮
সমাবেশ — একত্র অবস্থান বা সজ্জা
সমাহার — সমষ্টি ; সমবায় ; সংগ্রহ
সমাহিত — যার সমাধান হয়ে গিয়েছে
সমীক্ষা — বিশেষ বিবেচনা
সমুৎসুক — বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত
সমুত্থিত — বিশেষভাবে উত্থিত
সমুদ্ভূত — উদ্ভূত ; উৎপন্ন
সমুন্নত — বিশেষভাবে উন্নত
সম্পাত — পতন ; প্রবেশ
সম্পুটিত — কৌটায় বা ঠোঙায় ভরা
সম্পৃক্ত — সর্বাঙ্গে পরিপূর্ণ
উৎপন্ন ; জাত
সর্বক্রিয়াশ্রয় — সকল ক্রিয়ার আধার ; যেখানে সর্বপ্রকার ক্রিয়াই ঘটে থাকে
সর্বগত — সর্বত্রই যার গতি সম্ভব
সামন্ততান্ত্রিক — দ্র., পৃ. ৯

সিক্তিত	ভিজা
সিল	এঁটে রাখার দ্রব্য
সিলিণ্টেরাটা	জীবের একটি শ্রেণী (যেমন জলের সাপ), এদের দেহে কোনো আঘাতাদির উত্তেজনা একই কালে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে
সিলিণ্ডার	নলাকৃতি পাত্র
সি. সি.	১ সে.মি. দৈর্ঘ্য, ১ সে. মি. প্রস্থ ও ১ সে মি. উচ্চতা বিশিষ্ট ক্ষেত্র
সীসক	সীসা
সুদূরপ্রসারী	দূরভবিষ্যৎ পর্যন্ত যার প্রভাব প্রত্যক্ষ হয়
সুপর্ণ	সুন্দর পাখা বিশিষ্ট
সুবেদী	যা সামান্যেই সাড়া দেয়
সুষম	সামঞ্জস্যপূর্ণ ; সর্বাঙ্গসুন্দর
সুষমা	লাবণ্য ; শোভা
সূচক	যা পরিচয় জানায়
সৃজ্যমান	সৃজনরত
সেণ্টিগ্রেড	উষ্ণতা মাপার একটি মাপকাঠি
সে. মি.	সেণ্টিমিটার
সেণ্টিমিটার	দৈর্ঘ্য মাপার একটি একক
সোৎসুক	আগ্রহযুক্ত
সোপান	সিঁড়ি
সোম	সোম-লতার মাদক রস
স্কোয়াশ কোর্ট্	টেনিস খেলার মাঠ
স্ট্যাণ্ড্	দাঁড়নোর জায়গা
স্তিমিত	নিশ্চল ; ক্ষীণ
স্থপতি	গৃহাদিনির্মাতা
স্থাণু	খোঁটা ; স্তম্ভ ; নিশ্চল
স্থিতিস্থাপক	টেনে ছেড়ে দিলে যা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে
স্থৈতিক	যা স্থির হয়ে থাকে
স্নাতক	গ্রাজুয়েট ডিগ্রি প্রাপ্ত
স্নেহ	চর্বি বা তৈল জাতীয় পদার্থ
স্পর্শমণি	যে পাথরের ছোঁয়ায় কোনো বস্তু সোনা হয়ে যায় বলে লোকে বলে
স্পাইর‍্যাল	দ্র, শঙ্খিল
স্ফটিক	স্বচ্ছ প্রস্তর বিশেষ
স্মারক	যা মনে করিয়ে দেয়
স্বতঃ	আপনা থেকেই
স্বতোদীপ্তিমান	যা আপনা থেকেই আলো দান করে
স্ববিরোধ	নিজের তৈরি বিরোধ
স্বয়ংপ্রকাশমান	আলো ছাড়াও যা নিজে থেকে প্রকাশ পায়
স্বোপার্জিত	নিজের দ্বারা অর্জিত
হতবাক্	অবাক
হনন	হত্যা
হোমানল	যজ্ঞে হোমের আগুন
হ্রাস	খাট ; ছোট

নাম-সূচী

ব্যক্তি

স্থান

বিষয়-সূচী

যে সব গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি

(১) গ্রীক দর্শন [১৩৫৩] — শুভব্রত রায় চৌধুরী

(২) ভূত পরমাণু [১৯৬৫ ?] — দানিন [অনুবাদ, ননী ভৌমিক]

(3) A. B. C.'s of Quantum Mechanics [1965 ?] V. Rydnik—[Trans.—George Yankovsky]

(4) Atomic Age Physiscs [1959] — Henry Semat & Harvey E. White

(5) Atomic Nucleus, The [1958] — M. Korsunsky [Trans.—G. Yankovky]

(6) Atoms in the Family [1955] — Laura Fermi

(7) Evolution of Physics, The [1961] — Albert Einstein & Leopold Infeld

(8) General Chemistry [1960] — N. Glinka [Trans.—David Sobolev]

(9) Historical Background of Chemistry, The [1956] — Henry M. Leicester

(10) History of Chemistry, A [1939] F. J. Moore [Revsn—W. T. Hall]

(11) History of Physics, A [1962] — Florian Caj?ri

(12) History of the Theories of Ether and Electricity, A [Vol-1, 1960]—Sir Edmund Whittaker

(13) „ „ „ [Vol.-2, 1966] „ „

(14) Pierre Curie [1963] — Marie Curie

(15) Text Book of General Chemistry [1962] — B Nekrasov [Trans.—J. Vegoda ; Trans.-Edtr.—D. Sobolev]

(16) What is the Theory of Relativity — L. Landau & Y. Rumer [Trans.—A. Zdornykh ; Edtr.—V. Schneierson]